লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৪৮

১ম সংখ্যা

সমুদ্র ও গিরিরাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে সমুদ্র, চিরকাল কি তোমার ভাষা ?
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব, ওগো গিরিবর ?
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর !

—০—

পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ, অজানা অক্ষরে
কত যুগযুগান্তের প্রভাতে সন্ধ্যায়
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত, অনন্ত অধ্যায় !
মহান্ সে গ্রন্থপত্র, তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে রাখিবে কি লিখে
তব শৃঙ্গ-শিলাতলে দু-দিনের খেলা,
আমাদের ক'জনের আনন্দের মেলা ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ই জ্যৈষ্ঠ
১৩০৭

আনন্দেল হৌস
দার্জিলিং

[স্বর্গগতা শ্রীমতী নলিনী নাগের স্বাক্ষর-পুস্তকে কবির স্বহস্ত-লিখিত কবিতাবর]

নাম ও মন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যশের বোঝা তুলিয়া নিয়ে কাঁধে
নামটা মোর মরুক ঘুরে ঘুরে।
মনটা মোর যেন অপ্রমাদে
শান্ত হয়ে রহে অনেক দূরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২

[ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের Golden Book of Tagore-এর প্রথম পৃষ্ঠায় কবির স্বহস্ত-লিখিত কবিতা]

অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়া"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবন,

কী চমৎকার—তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠলো। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি-চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে—এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে—এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে। ২৭ জুন, ১৯৪১

রবিকাকা

অবন,

এক দিন ছিল যখন জীবনের সকল বিভাগে প্রাণে পরিপূর্ণ ছিল তোমাদের রবিকাকা। তোমরাই-তাকে অন্তরঙ্গভাবে এবং বিচিত্র রূপে নানা অবস্থায় দেখতে পেয়েছ। তোমাদের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আজ তাকে যদি না জাগিয়ে তুলতে, তবে তার অনেকখানি দেশের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যেত। আজকের যখন দিনান্তের শেষ আলোতে মুখ ফিরিয়ে দেশ তার ছবি একবার দেখে নিতে চায়—তখন তোমার লেখনী তাকে পথ নির্দ্দেশ করে দিলে—এ আমার সৌভাগ্য। যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি—সে দেশে পূর্ণ আসন থাকবে না—এই আশঙ্কা আমি অনুশোচনার বিষয় বলে মনে করি নি। অনেকবারই ভেবেছি আমি আজন্ম নির্ব্বাসিত—এ আমি বার বার মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছি। আজ তুমি যে ছবি খাড়া করেছ সে অত্যন্ত সত্য, অত্যন্ত সজীব। দীর্ঘকালের অবমাননা সে দূর করে দিয়েছে—সেই নিরন্তর লাঞ্ছনা ও গ্লানির মধ্যে আজ যেন তুমি তার চার দিকে তোমার প্রতিভার মন্ত্রবলে এক দ্বীপ খাড়া করে দিয়েছ। তার মধ্যে শেষ আশ্রয় পেলুম। ২৯ জুন, ১৯৪১

তোমাদের রবিকাকা

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩

আর মাত্র দুইটি দিন ছুটি। ইচ্ছা ছিল আরও দুইটা দিন বাড়াইয়া লইব; কিন্তু মীরা আসিয়া পড়াতে সে উপায় রহিল না; বিশেষ করিয়া অম্বুরীর কাছে মীরা যাহা বলিয়া গিয়াছে সে-কথা শোনার পর।

সকালে অম্বুরী বলিল, "সদু-ঠাকুরঝি দু-দিন এসেছিল ঠাকুরপো, তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি বলি কি, একবার দেখে এস না ওর বরকে; আহা, ঐ এক পোড়া-কপালী! অমন মানুষ, আর ভগবান্ ওরই উপর···"

জিহ্বা আর দন্তমূলের সাহায্যে অম্বুরী "চ্যু" করিয়া একটা সহানুভূতি শব্দ করিল।

অনিল আমার পানে চাহিয়া বলিল, "ওকে তো বলেছিলাম সেদিন—একবার দেখে আসা উচিত, যাব তো বলেও ছিল।···কি, যাবি নাকি শৈল?"

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিল মনে। অস্বীকার করিব না, তাহার মধ্যে মীরার আগমনের কথাটা খুব স্পষ্ট এবং প্রবল। একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "নাঃ, গিয়ে কি হবে? ভাল ক'রে দিতে পারব না তো?"

অনিল তাহার নিজস্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল আমার মুখের পানে, যেন খোলা পাতার মত আমার মনটা পড়িয়া লইল, বলিল, "তবে থাক্, আর সত্যিই তো···।"

অম্বুরী অবশ্য বুঝিল না; একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলিল, "ভাল ক'রে দিতে না পারলে আর যেতে নেই? দুঃখ-কষ্টের সময় মানুষে চায় আত্মীয়স্বজনে এসে একটু জিজ্ঞেসবাদ করে। তোমাদের দু-জনের কথা এত বলে বেচারি···।"

প্রসঙ্গটা কি করিয়া চাপা দেওয়া যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

কিন্তু মানুষে ভাবে এক, হয় আর। যাহা এড়াইতে চাহিতেছিলাম তাহা অন্য এক অসন্দিগ্ধ পথে একেবারে ঘাড়ে আসিয়া পড়িল।—

অনিল বলিল, "আজ আর আমি নাইতে যাব না, শৈলেন; পরশু বৃষ্টিতে ভিজে মাথাটা বড় ভার হয়েছে, তাতে আবার গঙ্গায় নতুন জল নেমেছে। তুই নেয়ে আয়, আমি পারি তো এইখানেই দু-ঘটি তোলা জল মাথায় ঢেলে নেব এর পরে।"

নিরুপায়ভাবে বলিলাম, "একলা যেতে হবে?"

সাঁতু উঠানটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, সহসা থামিয়া সতর্ক করিবার ভঙ্গিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "না শৈলটাকা, খবরডার একলা যেয়ো না, টুমীরে টেনে নিয়ে যাবে!"

ওর মুরুব্বিয়ানার রকম দেখিয়া আমরা তিন জনেই হাসিয়া উঠিলাম। অনিল বলিল, "ভেঁপোর একশেষ হয়েছে!"

আমি বলিলাম, "তুই চল্ না সান্তু; সত্যিই যদি ধরে কুমীরে···"

"ঠামো।"—বলিয়া সান্তু প্রজাপতি শিকার ভুলিয়া তিন লাফে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। আমার সদ্য কিনিয়া দেওয়া জাপানী খেলনা-বন্দুকটা আনিয়া স্পর্ধিত ভঙ্গিতে বলিল, "টলো।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "তাই তো গা; কি বীরপুরুষ! কাকার আর ভাবনা রইল না।···যাচ্ছিস্ তো তেলটা মাখিয়ে দিই; দাঁড়া, নেয়ে আসিস্।"

তেল মাখা হইলে সান্ত্রী-সমন্বিত হইয়া স্নানের জন্য বাহির হইলাম।

গলি থেকে সদর রাস্তায় পড়িয়া একটু দ্বিধায় পড়িলাম, গঙ্গায় না গিয়া বড়পুকুরে স্নান করিয়া আসিলে কেমন হয়? বহু দিন স্নান করা হয় নাই বড়পুকুরে—বহু দিন। অনিল সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত; অনিল থেকে আলাদা করিয়া বড়পুকুরের কথা ভাবা যায় না; আরও এক জন থেকে আলাদা করিয়া, সে সৌদামিনী। সৌদামিনীর কথা মনে পড়িতেই মনস্থির করিয়া ফেলিলাম—না, ও-পথে নয়। মীরা আসিয়া পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছে; বড়-পুকুরে ডুব দেওয়ার অর্থ যদি হয় সৌদামিনীর স্মৃতিতে ডুব দেওয়া তো বড়পুকুর থাক্। সহানুভূতি? তা আছে বইকি সদুর দুঃখে; কিন্তু সেই 'আহা'টুকু স্পষ্ট করিয়া মুখে বলিলেই কি তাহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে?"

সানু মীরাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিল, বোধ হয় আমায় একটু ইতস্তত করিতে দেখিয়া তাহারও মনে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। বলিল, "মীরা মাসীর গাড়ি এইঠানেই ডাঁড়িয়েছিল, না শৈলটাকা?···মীরা মাসী টোমার কে হয়?"

বলিলাম, "কেউ নয়।"

সানু ক্ষণমাত্র কি একটা যেন চিন্তা করিয়া লইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "কে হবে?"

প্রশ্নটার মধ্যে অসুরীর অলক্ষ্য ইঙ্গিত আছে। কথাটা বদলাইয়া লইয়া বলিলাম, "পা চালিয়ে চল্ দিকিন, নয়তো আবার কুমীর এসে পড়বে গঙ্গায়।"

নিজের মনকে লোকে কি নিজেই চেনে যে কারণটা বলিব? যাহা করিলাম তাহাই বলিতে পারি মাত্র, কয়েক পা অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িলাম। সানুকে বলিলাম, "গঙ্গায় আজ বড্ড কুমীর সানু, তুই অতগুলো মারতে পারবি নে একলা, তার চেয়ে চল্ বড়পুকুরে নেয়ে আসি।"

সানু একটু নিরাশ হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "বড়পুকুরে টুমীর নেই শৈলটাকা?"

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "একটা দুটো আছে বইকি, চল্।"

"টলো।" বলিয়া সানু অগ্রসর হইল।

ফিরিয়া যাইতে যাইতে একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম ব্যাপারটা। বুঝিলাম সৌদামিনীর স্মৃতিও ততটা নয়, আসলে পরশু রাত্রে বড়পুকুরের যে রহস্যময় রূপ দেখিয়াছিলাম তাহাই টানিতেছে, অবশ্য তাহার সঙ্গে সৌদামিনী যে নাই এমন নয়। তবে আসল কথা ঐ,—বড়পুকুর পাড়াগাঁয়ের প্রতীক—আমার কলিকাতা-শ্রান্ত মন যে পাড়াগাঁকে অণু অণু করিয়া সন্ধান করিতেছে।

বড়রাস্তা হইতে নামিয়া ঘন আগাছার মধ্যে দিয়া সরু বিসর্পিত পথ ধরিয়া চলিয়াছি। সানু বন্দুকটা বাগাইয়া ধরিয়া খানিকটা আগে আগে চলিয়াছে; অবশ্য আমি ঠিক আছি কিনা মাঝে মাঝে দেখিয়া লইয়া ভরসার পুঁজি পূর্ণ করিয়া লইতেছে।···আসিয়া পড়িয়াছি—চৌধুরীদের পোড়ো বাড়ির একটা কোণ ঘুরিলেই বড়পুকুর দেখা যাইবে। দিনের বেলা কেমন দেখায়, একটা উন্মুখ আগ্রহ লাগিয়া আছে। এমন সময় হঠাৎ সানু কোণ ঘুরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল। কাপড় আলগা হইয়া গেছে, বাঁ-হাতে সেটা গুটাইয়া ধরিয়া বলিল, "শৈলটাকা, টুমীর!"

হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি নাকি?—তা চল্, মারবি চল্।"

"টুমি নাও।" বলিয়া অসুরীর বীরসন্তান আমার হাতে বন্দুকটা দিয়া বাঁ-হাতে আমার কোমর জড়াইয়া পাশে দাঁড়াইল।

অগ্রসর হইয়া দেখি ঘাটের উপর কেহ নাই। জলে খানিকটা দূরে একটি স্ত্রীলোক যেন আধডোবা সাঁতার কাটিতে কাটিতে ঘাটের পানে আসিতেছে। শরীরের এখান-ওখান জলের উপর জাগিয়া আছে। মাথা আর পা অনুমান আধ হাত জলে মগ্ন।

আমি ফিরিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, সানু বলিল, "মার না শৈলটাকা, ভয় করছে?"

বলিলাম, "হ্যাঁ ভয় করছে, চল্।"

সানু আমার কোমরের কাপড়টা খামচাইয়া ধরিয়া ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গে সঙ্গেই হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও শৈলটাকা, টুমীর নয়, ড্যাকো, মাসীমা।"

ঘুরিয়া দেখি সৌদামিনী কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সাঁতারের পরিশ্রমে হাঁপাইতেছে। আমায় ফিরিতে দেখিয়াই শরীরটা জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া দিল।

১৪

ক্ষণমাত্র দ্বিধা, তাহার পর আমি আবার ফিরিয়া পা বাড়াইলাম। সৌদামিনী ডাকিল, "ও সানু, যাচ্ছ কেন? তোমরা নাইবে এস, আমি ও-ঘাট দিয়ে উঠে যাচ্ছি।"

আমি ওকে ও-ঘাটে যাইবার অবসর দিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরে চাহিয়া দেখি সৌদামিনী সেই ভাবেই চিবুক পর্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; উর্ধাঙ্গের বস্ত্র ভাল করিয়া সংবৃত্ত করিয়া লইয়া তাহার উপর গামছাটা ঘুরাইয়া দিয়াছে। নড়ন-চড়নের কোন লক্ষণ নাই। আমি ফিরিয়া চাহিতে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "শৈল-দার হঠাৎ পুকুরে নাওয়ার সখ হ'ল যে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "গঙ্গায় বড্ড কুমীর, তাই সানু আমায় এখানে নিয়ে এল। এখানে এসেও সানু তোমায় ডুব-সাঁতার কাটতে দেখে কুমীর ভেবে পালাচ্ছিল।"

সদু বলিল, "যাক্, ওর ভুলটা ভেঙেছে।···আপনার ভুলটা যেন এখনও রয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে"—বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া বলিল, "আপনি বসুন একটু ঘাটে এসে শৈল-দা, কতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে থাকবেন?—গো-

সাপের আড্ডা। সাঁতার কেটে হাঁপ ধরেছে, একটু জিরিয়েই আমি ও-ঘাট দিয়ে উঠে যাব।"

চুপ করিয়া রহিলাম একটু দু-জনে। সাম্নু প্রশ্ন করিল, "তুমি এখন নাইবে না শৈলটাকা?"

বলিলাম, "না।"

"কেন?"

কাজেই সৌদামিনীর সঙ্গে কথা কহিতে হইল,—সাম্নুর অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার জন্য। বলিলাম, "তুমি রোজ এখানেই নাইতে আস নাকি সদু?"

সৌদামিনী উত্তর করিল, "হাঁা, এখানে থাকলেই আসি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের পানে চটুল হাস্যের সহিত চাহিয়া বলিল, "অব্যেস মলেও যায় না কিনা; তুমিই বল না শৈল-দা?"

আমি আর ওর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না, এবং যে-কারণে সাম্নুকে এড়াইয়া সদুর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই কারণেই আবার সদুকে ছাড়িয়া সাম্নুর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিতে হইল। বলিলাম, "তুমি না হয় নেমে নাও গে না সাম্নু ততক্ষণ।"

"একলা?"

বলিলাম, "একলা কেন? তোমার মাসীমা তো রয়েছেন।"

অতটা পছন্দ হইল না কথাটা সাম্নুর। আমার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "না, তুমিও চল।"

ভীষণ বিব্রত হইয়া আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "না।"

সাম্নু মুখটা উঁচু করিয়া নাছোড়বান্দার মত বলিল, "কেন? তুমি মাসীমার ঠেঙ্গে নাও না?"

আরও বিব্রত হইয়া কোন রকমে বলিলাম, "না"—এবং এর পরেও আবার "কেন?" বলিয়া যে প্রশ্ন হইবে তাহার ভয়ে কাঁটা হইয়া রহিলাম।

সদু কৌতুক দেখিতেছিল, হাসিয়া বলিল, "ওঁর কথা বিশ্বাস ক'রো না সাম্নু; উনি ছেলেবেলায় তোমার মাসীমার সঙ্গে অনেক নেয়েছেন—এই পুকুরেই; না হয় তোমার বাবাকেই জিজ্ঞেস ক'রো।"

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু আজকাল আর সে বড়পুকুর নেই; আছে শৈলদা?"

যেন পরিত্রাণ পাইলাম। বলিলাম, "সত্যিই নেই।"

"তার কিচ্ছুই নেই, মজে এসেছে, শ্যাওলা জন্মে গেছে, ঘাটে লোকও থাকে না; কষ্ট হয় দেখলে।"

বলিলাম, "তবুও তো তুমি আসতে ছাড় না দেখছি।"

সদু জলের মধ্যে তাহার শুভ্র বাহু দুইটি ঘুরাইয়া আনিয়া যেন আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "হাঁা, তবুও আমার বড়পুকুর বড্ড ভাল লাগে, চমৎকার লাগে। এখানে এলেই যেন মনে হয় শৈলদা যে আবার ছেলেমানুষ হয়ে গেছি; সেটা কি অল্প লাভ মনে কর?···কি রকম জান শৈলদা?—বয়েস হ'লে আবার প্রথম ভাগ কি দ্বিতীয় ভাগ পড়লে যেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছি ব'লে মনে হয়, সেই রকম।"

আমি অতিমাত্র বিস্ময়ে সদুর মুখের পানে চাহিলাম, এতটা ভাবসাম্য কি করিয়া আসে?—ঠিক এই কথাই যে অনিল বলিল সেদিন!

সদু আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিল, "তুমি বিশ্বাস করছ না শৈলদা? বড়পুকুরে এলে সত্যিই আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। মনেই থাকে না কোথাকার মানুষ, কাদের বাড়ির বৌ। তুমি তো দেখেই ফেলেছ আমায়—সাঁতার কাটছিলাম;—বৌ-মানুষ সাঁতার কাটে, এ আবার কে কোথায় শুনেছে বল? আবার যে-সে বৌ নয়, পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর মত যাকে সর্বদা সভ্যভব্য হয়ে থাকা উচিৎ"—বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, সত্যিই বলছি শৈলদা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাই; স্মৃতির পথ চেয়ে যে কোথায় যাই চলে! শুধু আমি কি একাই? তোমরা পর্যন্ত এসে জোট—তুমি, অনিল-দা, বন্ধু। পরশু এই রকম ঘাটে গা ডুবিয়ে ব'সে হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠেছি, রতন বাগদীর ভাদ্দর-বৌ জল তুলতে আসছিল, দেখতে পাই নি। বলে—'ওকি সদু ঠাকুরঝি, পাগল হ'লে নাকি?'···আসল কথা, অনেক দিনের একটি কথা মনে পড়ে গেল, বুঝলে শৈলদা?—জামরুল খেতে সাধ হয়েছে তোমাদের সদীর। দুপুর বেলা, অনিল-দা ঐ জামরুল গাছটায় উঠেছে, তুমি গুঁড়িটা জড়িয়ে ধ'রে উঠছ, আমি অনা-বাগদীর দাওয়ায় ব'সে দেখছি, এমন সময় ঠাকুরমা বুড়ী একটা আমের শুকনো ডাল হাতে ক'রে—'কোথায় গেল তারা—গেল কোথায়?'—করতে করতে হন হন ক'রে ঘাটের পানে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে বন্ধু। তাকে তোমরা কি জন্যে খেদিয়ে দিয়েছ বলে সেই গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে বুড়ীকে। যেমনি গলার আওয়াজ কানে যাওয়া, অনিল-দা তো সেই মগডাল থেকে কোঁচড়ে

আমরুলসুদ্ধ পুকুরে ঝপা' ক'রে সে লাফ,—আর—তুমি···"

সদু আর হাসির তোড় রুখিতে পারিল না, মুখখানা দুই হাতে ঢাকিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, জলে বেশ খানিকটা বীচিভঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির ছোঁয়াচ আমাকেও স্পর্শ করিল; কিন্তু অত প্রাণ খুলিয়া হাসিবার শক্তি কি সবার হয়? সদু যখন হাসে তখন হাসেই শুধু,—আমি যতটা না হাসিতেছি তাহার বেশী হাসি দেখিতেছি, তাহার চেয়ে বেশী ভাবনা লাগিয়া আছে কেহ দেখিয়া না ফেলে। সানুও আমার মুখের পানে তাহার অবুঝ মুখখানা তুলিয়া হাসিতে লাগিল। সদু হাসিতে হাসিতেই বলিল, "আর তুমি কি করেছ মনে আছে শৈলদা?—নেমে প'ড়ে একেবারে চৌধুরীদের ঐ জলের—নালাটার—ভেতরে···ওঃ!···"

সদু আরও ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির চোটে মুখ সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। আমি বলিলাম, "থাম, এক্ষুনি আজও আবার না রতন বাগ্দীর ভাদ্দর-বৌ এসে পড়ে।"

সদু চেষ্টা করিয়া নিজেকে থামাইয়া লইল, মুখে এক আঁজলা জল ছড়াইয়া দিয়া হাসির জেরটাকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আসুক গে, ব'য়ে গেল।" আবার একটু খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "শৈলদা, আমি দু-দিন তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম, বৌ নিশ্চয় বলেছে, ব'লতে পারবে না যে দু-দিনের জন্যে এলাম, সদী খোঁজও নিলে না একবার।"

বলিলাম, "কিন্তু সবুর ধ'রে তো একটু ব'সতে পার নি।"

সৌদামিনীর হাসি আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে ভয়ের ভান মিশাইয়া বলিল, "রক্ষে কর, তা হ'লে ছ-মাস ব'সে থাকতে হ'ত—কুম্ভকর্ণের ছ-মাস নিদ্রা, ছ'মাস জাগরণ।···আমার তো কোন কাজ ছিল না, মাত্র একবার দোষ খণ্ডন ক'রে আসা—কোন সময় বলতে না পার, সদী একবার খোঁজ নিতেও এল না।"

দুই বার কথাটা বলায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়াই আমার একটা মিথ্যা বলিতে হইল, কেন-না ওর যা অবস্থা তাহাতে আমারই আগে খোঁজ নেওয়া উচিত। বলিলাম, "আমিও তোমার ওখানে যাচ্ছিলাম সদু। আজ বিকেলে একবার যাব বোধ হয়।"

সদুর দীপ্ত মুখখানা যেন ফুৎকারে নিবিয়া গেল। বলিল, "আমার ওখানে কি করতে যাবে শৈলদা?···না, যেয়ো না।"

কলোচ্ছ্বসিত জায়গাটাতে খানিকক্ষণ একটা থমথমে নিস্তব্ধতা ছাইয়া রহিল। ইহার মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিলাম, সদু গামছার একটা প্রান্ত কামড়াইয়া ধরিয়া আড়চোখ তুলিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে। চোখো-চোখির পর আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে বলিল, "দেখছিলাম তুমি রাগ করলে কি না শৈলদা।"

বলিলাম, "রাগ করবার কি আছে এর মধ্যে?"

সদু শরীরটা আরও একটু ডুবাইয়া লইয়া, গোটা দুই কুলকুচি করিয়া বলিল, "রাগ করবার নেই—এ কথা শুনব কেন?—তুমি যাব বললে, অথচ আমি করলাম মানা। তবে কি জান? এই নিয়ে তোমাদের কেউ দুটো কথা বলে এটা আমার সহ্য হয় না। আমাকে বলে সে আমি গ্রাহ্য করি না—মোটেই নয়। যাদের সঙ্গে চিরটা কাল কাটালাম সুখে দুঃখে, আজ বয়েসের ওপর আরও গোটা-কতক বছর জুড়ে গেছে ব'লে তারা আর আমার কেউ হবে না, চিরকাল যেমন হেসে কথা কয়ে এসেছি সেই রকম হেসে কিম্বা সোজা মুখ তুলে কথা কইলেই আমার জাত যাবে, এসব কথা আমি বিশ্বাস করি না শৈলদা। অবশ্য জাত যেত যদি তোমরাও বদলাতে, কিন্তু তা বদলাও নি, বদলাবেও না।"

আমি ফিরিয়া চাহিতে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়া বলিল, "কি ক'রে জানলাম?—আমার মন বলছে, দেখছিও। আসল কথা সব মানুষ বদলায় না; এই দেখ না, আমি বদলেছি? এমন অবস্থাতেও পড়ে বদলাই নি। কি জানি, আমার যেন মনে হয় আমি বরাবরই এই রকম থাকব যত যাই ঘটুক না কেন।"

আবার এক ঝলক হাসিয়া জলে একটু একটু আঙুল চালাইয়া বলিতে লাগিল, "আমিই যখন বদলাই নি, তখন তোমরা কোন্ দুঃখে বদলাতে যাবে শৈলদা?···যাক্, কি যে বলছিলাম—হ্যাঁ, আমায় কিছু বললে আমি গায়ে মাখি না, কিন্তু তোমায় বললে আমার গায়ে লাগে। সেদিনে আমরা আসবার পর অনিলদা দেখতে এসেছিল; চ'লে গেলে ভাগবৎ-কাকা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'যার চেয়ে যার টান বড় তারে বলি ডাইন।'···কথাটা আমার যেন শক্তিশেলের মত বাজল শৈলদা। কিন্তু সে কি আমার জন্যেই?—আমি তো সেই দিনই দুপুরে তোমাদের ওখানে গেলাম। পাছে ভাগবৎ-কাকা টের না পায় সেই জন্যে তার পকেট থেকে চাবির খোলোটা

বের ক'রে নিয়ে তাকে গিয়ে বললাম—'এই তোমার চাবি নাও, কোথায় যে ফেল ভাগবৎ-কাকা!'···চাবি হাতে করে বললে—'কোথায় যেন বেরুচ্ছিস তুই এই দুপুর রোদ্দুরে?'··বললাম—'হ্যাঁ, একবার অনিলদার ওখানে যাব।' আমায় সচরাচর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করে না, কিন্তু আস্পদ্দাটার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় দেখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—'অনিলদাদা! শুনলাম তোর আর এক দাদাও এসেছে।' তার পর জিজ্ঞেস করলে—'তোকে ডেকে পাঠিয়েছে নাকি?'···এত বড় কথাটা বলতেও ওর মুখে একটু আটকাল না শৈলদা?···' বলিতে বলিতে সদুর গলাটা একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। মুখটা ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল, তাহার পর বলিল, 'আমিও কথা সইবার মেয়ে নয়, বললাম, "ডাকে নি বলেই তো যাচ্ছি ভাগবৎ-কাকা, যে দরদ দেখিয়ে ডেকে নেয় না তার কাছে যেতেই তো ভরসা হয়।"···কথাটা গায়ে নিশ্চয় বিষ ছড়িয়ে দিয়ে থাকবে ওর, বললে, 'আর একটা লোক যে ঘরে এখন-তখন হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই?'···কথাটা এবার আমার গায়ে আগুন ছড়িয়ে দিলে যেন, বললাম—'সম্বন্ধ আমার চেয়ে···'"

সদু হঠাৎ নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইল, কথাটা ঐখানেই শেষ করিয়া দিয়া সমস্ত ভঙ্গিটাই বদলাইয়া দিয়া বলিল, "এই দেখ! শৈলদা ভাববেন সদী সেই থেকে নিজের কথাই পাঁচ কাহন করছে। সত্যি!···তোমার কথা বল এইবার—কত দিন তোমায় যে দেখি নি শৈলদা—উঃ, তার পর?—শুনলাম বি-এ পাস করেছ—একটা খাওয়া পাওনা আছে। শৈলদা খাওয়ানোর কথায় আমার কি মনে হচ্ছে বলব? রাগ করবে না?"

শরৎ-আকাশের মত কথায় কথায় ভাবের পরিবর্তন, ভঙ্গির পরিবর্তন; আমি ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, "কি মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে বলি, শৈলদা, পাস করেছ, জামরুল পেড়ে দাও খাই, পেকেছেও কিছু কিছু দেখ না।" বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "শক্তই বা কি এমন? বকাও নেই, ঠাকুরমাও নেই।"

"তবুও পারবে না তুমি, এতক্ষণে একবার সে-সব দিনের মত সদী ব'লে ডাকতে পারলে না যখন···"—বলিয়াই এক মুখ জল লইয়া, মুখটা অপর দিকে ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে কুলকুচি করিতে লাগিল। একটু পরে আবার মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আরও শুনলাম বেশ ভাল একটা কাজও পেয়েছ—পড়াবার। আরও একটা কথা শুনলাম শৈলদা··"

থামিল বলিয়া ওর মুখের পানে চাহিয়া দেখি কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।—বহুদিনের পরিচিত একটা চাহনি—ছেলেবেলার কত ইতিহাস সে মনে করাইয়া দেয়···।

সদু বলিল, "যদি নেমন্তন্ন না পাই শৈলদা তো···কি ক'রেই বা বলি!—রাজকন্যাকে পেয়ে ছেলেবেলার কোন এক সদী-বাঁদীর কথা···"

আবার হঠাৎ থামিয়া গেল। প্রসঙ্গ, ভঙ্গি এবং উদ্দেশ্য—সবই বদলাইয়া দিয়া বলিল, "তাহলে তুমি এলে না নাইতে তোমার মাসীর কাছে সাদু? বেশ, আড়ি তোমার সঙ্গে, আর কখনও জামরুল আর গোলাপ জাম নিয়ে যাব না।"

তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এবার তুমি নাইবে এস শৈলদা; আবোল-তাবোল কি সব বললাম, কি মনে করবে জানি না। আসল কথা, তোমাদের দেখলে কি যে মনে হয় শৈলদা···না বাপু, তুমি বরং একটু ওদিকে গিয়ে দাঁড়াও, আমি এখান দিয়েই উঠে যাই; ও আ-ঘাটা দিয়ে আর উঠতে পারি না; একে তো অনেক ক্ষণ রয়েছি ব'লে এমনই গাটা একটু কুট কুট করছে—কি যে হয়েছে অবস্থা বড়-পুকুরের—আহা!"

বলিলাম, "হ্যাঁ, সেই কথা আমিও ভাবি। তা তুমি তো স্বচ্ছন্দে গঙ্গায় গেলেই পার সদু। তোমরা তো চাও-ও, তোমাদের ওখানে গঙ্গা নেইও তো শুনেছি।"

সদু এক রকম অদ্ভুত নিষ্প্রভ হাসির সহিত আমার পানে চাহিল। বলিল। "চাওয়া?···হ্যাঁ, অন্ততঃ উচিত তো চাওয়া, ঠাকুর-দেবতা!···দেখ না ভাগবৎ-কাকা দু-বেলা ধর্ণা দেন, সন্ধ্যে-আহ্নিকটি পর্যন্ত গঙ্গার তীরে হওয়া দরকার তাঁর।"

একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমার কিসের জন্যে ঠাকুর-দেবতার খোশামোদ শৈলদা?"

১৫

সাদু সঙ্গে ছিল বলিয়া আসিয়াই নিজে হইতে কথাটা বলিয়া দিলাম, তাহা না হইলে সাদু বলিতই; মাঝে পড়িয়া আমি চোর হইয়া যাইতাম। অনিল অম্বুরী দু-জনেই ছিল।

অম্বুরী গ্রামের সুবাদ ধরিয়া একটা ঠাট্টা করিতে

ছাড়িল না। মর্মার্থটা এই যে টানের প্রকারভেদ আছে—গঙ্গার টান—পুণ্যের টানই যে সব সময় শক্তিশালী হইবে এমন কিছুই কথা নাই। তাহার পর বলিল—"না, সত্যিই ভাল হয়েছে ঠাকুরপো, দু-দিন এল অথচ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তুমিও চলে যাচ্ছ, ও-ও থাকে না এখানে। ...মেয়েটা বড্ড ভাল ঠাকুরপো।"

আবার একটা ঠাট্টা করিল; কি কাজে ঘরে যাইতেছিল, ঘুরিয়া বলিল, "আর হ'লও ভাল জায়গাটিতে দেখা। —বড়পুকুর তো শুনেছি ছেলেবেলায় তোমাদের কালিন্দী ছিল—তোমার আর ঐ সাধুপুরুষটির।" বলিয়া অনিলের দিকে একটু চটুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় কথাটা সবিস্তারে অনিলকে বলিলাম। 'আমি বলিলাম' বলার চেয়ে অনিল বাহির করিয়া লইল বলাই ঠিক। তবু, অনিল কৌতূহলী না হইলেও তাহাকে বলিব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, কেন-না—গোপন করিব না—যতই সকালের কথা ভাবি সৌদামিনী একটা সমস্যার আকারে আমার সামনে ফুটিয়া ওঠে।

স্কুলের মাঠের শেষে, মজানদীর ধারে আমরা দুই জনে বসিয়া। সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই হাওয়াটা থামিয়া গিয়া একটা গুমট পড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে সৌদামিনীর কথা কি হয় শুনিবার জন্য সমস্ত জায়গাটা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

গল্প যখন শেষ হইল অনিল বলিল, "ভেবেছিলাম তোকে আরও দুটো দিন থেকে যেতে বলব শৈল, এখন দেখছি দুটো দিন আগে পাঠিয়ে দিতে পারলেই ভাল হ'ত।"

একটু হাসিয়া বলিলাম, "হঠাৎ?"

অনিল বলিল, "নিতান্ত হঠাৎ নয়। মীরা আসবার পর থেকেই কথাটা ভাবছি আমি,—মীরার দিক্ থেকেও, সতুর দিক্ থেকেও, আর তোর দিক্ থেকেও। একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি—নিশ্চয় বুঝুবি নি,—তোর কি মনে হয় না সতুর যে দুর্দিনের ঘূর্ণি অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে, খুব সাবধানে না থাকলে, অর্থাৎ খুব দূরে আর নির্লিপ্ত না থাকলে তুইও তার ঘুরপাকের মধ্যে পড়ে যাবি? —যেতেই হবে প'ড়ে, তুই যা-ই বলিস না কেন। অত দূর ভবিষ্যতের কথা ছাড়; 'ডি. গুপ্ত সেবনের পূর্বে ও পরে'র মত তোর মনের ফটো নেওয়া যদি সম্ভব হ'ত—'বড়পুকুরে নাওয়ার পূর্বে এবং পরে'—তাহ'লে ফটো দুটো যে সহজেই চেনা যেত আমার এমন মনে হয় না।"

এত গাম্ভীর্যের মধ্যেও হাসি পাইল, বলিলাম, "এত আজগুবি তুলনাও তোর মেলে অনিল!"

অনিল হাসিল না, বলিল, "তুলনা আমার তোদের মত সাহিত্য-সাজান না হোক, নিখুঁৎ হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্রমটা উলটে যাবে—ডি. গুপ্ত খাওয়ার আগে রুগ্ন, পরে পালোয়ান, বড়পুকুরে নাওয়ার আগে পালোয়ান, পরে রুগ্ন। ...কথাটা অস্বীকার কর্ একবার।"

বলিলাম, "বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে শুধু, অর্থাৎ ও রকম অবস্থায় ছেলেবেলার নিত্যসঙ্গিনী কেউ পড়লেই সহানুভূতি না হয়েই পারে না। তুই সহানুভূতি জিনিসটাকে অতিরিক্ত গাঢ় রঙে রঙিয়ে একেবারে অন্য জিনিস ক'রে তুলতে চাইছিস।"

অনিল বলিল, "আর একটা উপমা না দিয়ে পারলাম না। চোর যখন সিঁদকাঠি নিয়ে যথাপদ্ধতি গৃহস্থের ঘরে ঢোকে তখন ততটা সাংঘাতিক হয় না যতটা হয় সে যদি অতিথি-অভ্যাগতের বেশে এসে খোঁটা গেড়ে বসে। তুই যদি ভালবাসা ব'লে চিনতে পারতিস্ জিনিসটাকে তাহ'লে মীরার দিক্ দিয়ে বিপদটা কম ছিল; কিন্তু এই যে ভালবাসাকে ছেলেবেলার সতুর জন্যে সহানুভূতি ব'লে ভুল করছিস, এইটিই হয়েছে মারাত্মক। মনে রাখতে হবে আমি সমস্ত কথাই মীরার মুখ চেয়ে বলছি। মীরার কথা বাদ দিলে আমার মত যে কি এ-সম্পর্কে তা তোকে আগেই বলেছি, তুই চটেও গিয়েছিলি। এখন আবার তোকে উল্টা কথা বলব শৈল, তুই সৌদামিনীর কথা আর একেবারেই ভাবিস নি, ভাবলে মীরার ওপর ঘোর অন্যায় হবে। সৌদামিনীর সম্বন্ধে উদাসীন থাকা তোর পক্ষে অপরাধ নয় একটা, কিন্তু কাল যা দেখলাম তাতে মীরার সম্বন্ধে আর অন্য রকম ব্যবহার শুধু অপরাধ নয়, পাপ তোর পক্ষে। মীরা তোকে ভালবাসে শৈল, আর এই ভালবাসার জন্যে সে অনেক কিছু ত্যাগ করতে বসেছে।"

অনিল চুপ করিল এবং ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহ আর কোন কথাই বলিলাম না। অনেকক্ষণ। চারিদিক্ আরও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, শুধু মজানদীর গহ্বর থেকে একটা পোকার একঘেয়ে সঙ্গীত উঠিয়া শব্দের একটা পাতলা কুহেলী বিস্তার করিতেছে।

অনিল হঠাৎ "শৈল" বলিয়া এমন উত্তেজিত ভাবে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিল যে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। অনিল কখন উত্তেজিত হয় না; এ এক অভিনব ব্যাপার! বলিল, "শৈল, সব ভুল বলেছি, ভাই চুপ ক'রে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। সতুকে বাঁচাতেই হবে। আমার উপায় নেই, মাঝখানে অঙ্কুরী, সানু, খুকী। তুই জানিস আমি আমাদের ছেলেবেলার

রবীন্দ্রনাথ—বয়ঃক্রম ৯ বৎসর, পাশে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ, বসিয়া—শ্রীকণ্ঠবাবু
জীবন-স্মৃতিতে এই চিত্রের উল্লেখ আছে

রবীন্দ্রনাথ—বয়ঃক্রম   বৎসর

ব্রাইটন থ বয় বৎসর

বিল' লণ্ডন রবী থ বয়ঃ ৯ বৎসর

প্রথম ল্মীকি- ভনয়ে বাল্মীকি
বয়ঃক্রম ২০ বৎসর

রওয়ার (বোম্বাই প্রদেশ) প্রবাসী রবীন্দ্রনাথ।
বয়ঃক্রম ২২ বৎসর

কবি-সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী

কবির প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) দেবী

ওঁ

বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন —

আমার কাছে আমার ছবি একখানিও নাই। অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। Hop Sing কোম্পানী আমার ছবি তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে থাকিতেও পারে।

আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই নাই এবং আমার জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য নহে।

আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ। বাল্যকালে ইস্কুল পালাইয়াছি। কিন্তু লেখার অভ্যাস ছিল নিতান্ত শিশুকাল হইতে কেবল লিখিতেছি। যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময় ভারতী পত্রিকা বাহির হয়। প্রধানত এই পত্রিকাতেই আমার গদ্য লেখার অভ্যাস হয়।

আমার ১৭ বছর বয়সে মেজদাদার সঙ্গে বিলাত যাই — এই সুযোগে ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। ও লণ্ডনে কিছুকাল অধ্যাপক হেনরী মর্লির ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলাম।

এক বৎসরের কিছু উর্দ্ধকাল বিলাতে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসি। তাহারই ভগ্নহৃদয় নামক এক কাব্য লিখিতে শুরু করি — দেশে আসিয়া তাহা শেষ হয়। অল্পকালের মধ্যে সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ২৩ বৎসর বয়সে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়।

ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, চিত্রা ও সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগুলি পরে পরে বাহির হইয়াছে — তাহাদের প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি আমার মনে নাই।

সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সমস্তই পদ্মায় লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন — চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পাদনভার আমাকে

লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয় কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত — কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল সুরেন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবু সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে একবৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ ~~[illegible]~~ কতকগুলি লিখিতে হয়।

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদকভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। অল্প বয়সে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প।

এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন — তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অঙ্কুরমাত্রও কোনোদিন দেখি নাই — তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোমানক্যাথলিক খৃষ্টানধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। কোনোকালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের দুই এক বৎসর চলার পর ১৩০৯ সালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসর চালাইয়া তাহার সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে বিদ্যালয় লইয়া নিযুক্ত আছি।

উপাধ্যায় মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন — কিছুকাল ইহাতে তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আমার

কাব্যগ্রন্থাবলী বিস্তর অভিপ্রায়ে Edit
করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে বিষয়ভেদ অনুসারে
আমার সমস্ত কবিতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে
বিভক্ত করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

— ॥ —

আমার জীবন ও জগতের ইতিহাস
সংক্ষেপে উপরে লিখিয়া দিলাম।
বড় ঘটনাত কোনো দিন ঘটে নাই।
আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা
গিয়াছিলেন — তখন বোধ হয় আমার
বয়স ১১/১২ বৎসর হইবে। তাঁহার
মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বে আমার
পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃত-
সর হইয়া ড্যালহৌসী পর্ব্বতে ভ্রমণ
করিতে যান — সেই আমার বাহিরের
জগতের সহিত প্রথম পরিচয়।
সেই ভ্রমণটি আমার জীবনের মধ্যে
নিঃসন্দেহ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া
ছিল। সেই তিন মাস পিতৃদেবের
সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার
নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষা
শিক্ষা করিতাম এবং মুখে মুখে
জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র
তাহাতে আমার সময় কাটিত।
এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত
প্রকৃতির মধ্যে তিনমাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া-
ছিলাম ইহাতেই অবশেষে আমার
বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব বিচ্ছিন্ন
হইয়া গেল। এই শেষবয়সে বিদ্যালয়
স্থাপন করিয়া তাহার শোধ দিতেছি-
এখন আমার আর পালাইবার
পথ নাই — ছাত্ররাও যাহাতে
সর্ব্বদা পালাইবার পথ না

[illegible]

ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Babu Padminimohan Neogi
Bengalee Office
70 Colootola Street
Calcutta

আমরা রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটির ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম তাহা তিনি ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র শ্রীযুক্ত পদ্মিনীমোহন নিয়োগী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মিনীমোহন নিয়োগী সেই সময় "বেঙ্গলী" কাগজখানির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সেই সময় পর্যন্ত তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া দিতে অনুরোধ করায় কবি তাঁহাকে এই চিঠিটি লেখেন।

কবির জীবনের সমুদয় ঘটনার ছবি এবং তাঁহার সকল বয়সের ছবি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য—হয়ত বা অসম্ভব। আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়া এই সংখ্যায় ছাপিতেছি, তাহার মধ্যে তিনখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পিতৃব্য যে স্বর্গগত শ্রীকণ্ঠ সিংহের বৃত্তান্ত আছে, তিনি বালক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে লইয়া এক জন ইংরেজ ফোটোগ্রাফারের দোকানে যে ফোটোগ্রাফ তুলাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে আমরা তাহার অনুলিপি দিলাম। (২) যে বিখ্যাত চিত্রকর সর্ উইলিয়ম রোটেনস্টাইন মডার্ন রিভিয়ু হইতে প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যখ্যাতি জানিতে পারেন এবং যাঁহার ও যাঁহার বন্ধুদের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল প্রাইজের জন্য সুপারিশ হয়, তাঁহার সহিত ও সেই সময়কার লণ্ডন-প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের সহিত কবির যে ছবি তোলা হয়, তাহার অনুলিপিও দেওয়া হইল। (৩) কবি নোবেল প্রাইজ পাইবার পর শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেকে গিয়াছিলেন; সেই অভিনন্দন অনুষ্ঠানের ফোটোগ্রাফও দেওয়া হইল। এই সকল ও অন্যান্য ফোটোগ্রাফের সংক্ষিপ্ত নাম বা পরিচয় ছবিগুলির নীচে দেওয়া আছে।

২৫ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ।   দক্ষিণে ইন্দিরা দেবী, বামে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ।   সঙ্গে কন্যা বেলা দেবী

ত্রিশ বৎসর বয়ঃকালে রবীন্দ্রনাথ

ত্রিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্র
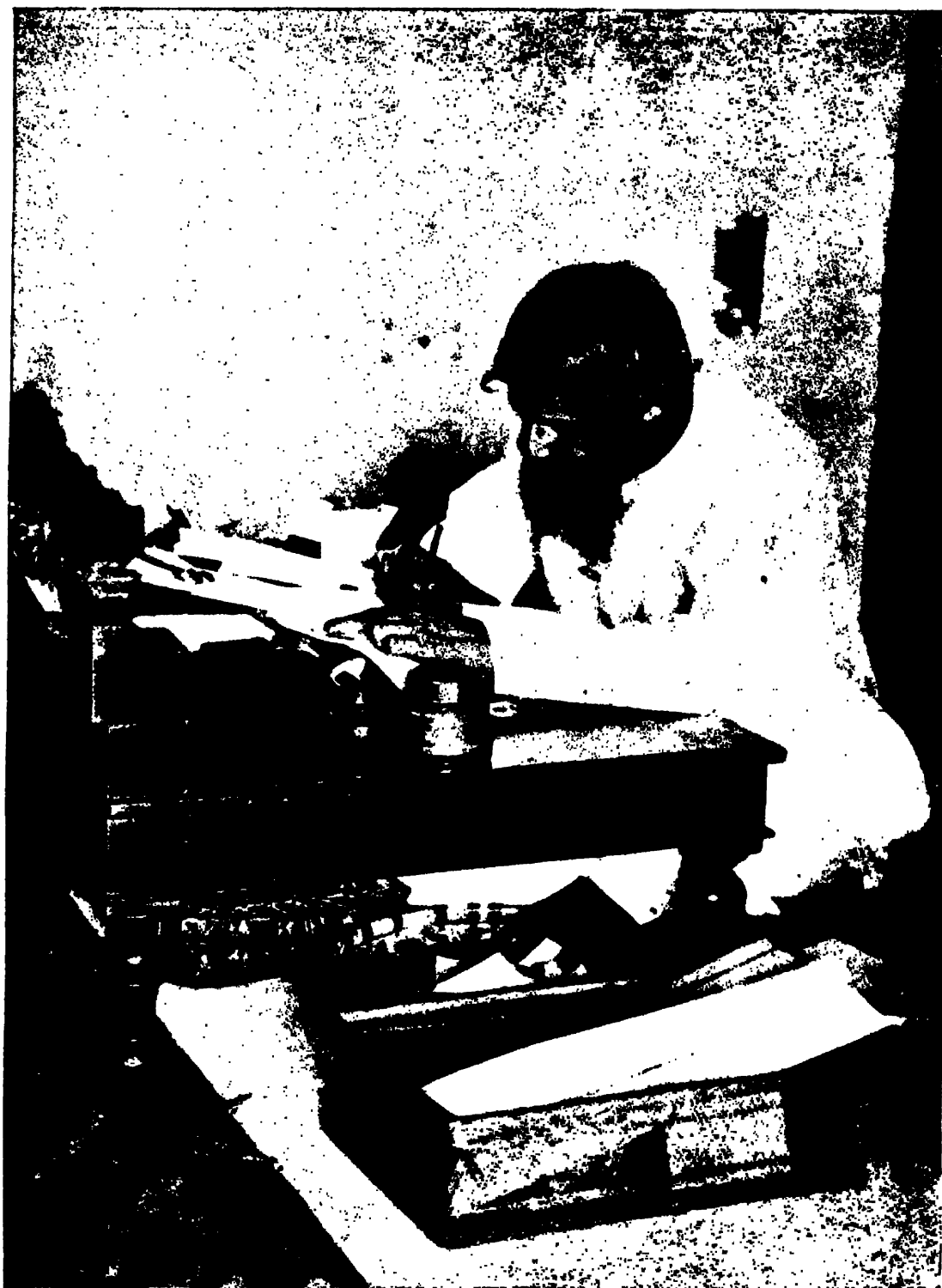
পঞ্চাশৎ বৎসরে অভিনন্দন দানের সময়কার চিত্র
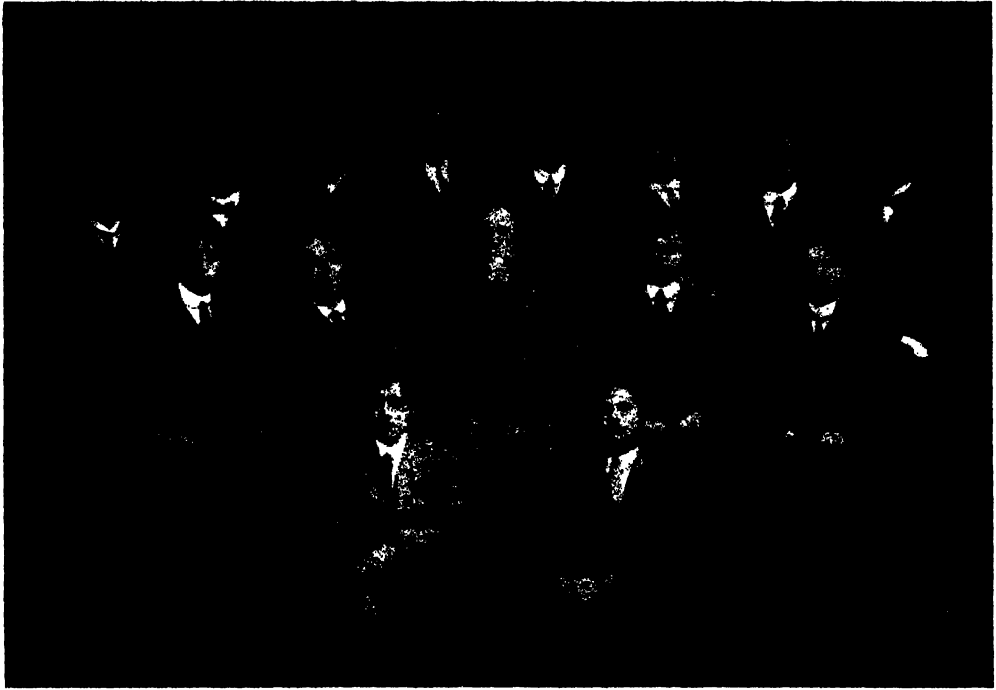
১৯১৩ খৃঃ লণ্ডনে গৃহীত চিত্র। কবির দক্ষিণে স্যর উইলিয়ম রোটেনস্টাইন

নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তির পর শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে অভিনন্দন উৎসব। কবির সম্মুখে সার্ জগদীশচন্দ্র বসু (মাল্য-গলে)

নিত্যসহচরীকে ভুলি নি, তবে আমি ছেলেবেলাতেই বাঁধা পড়ে গিয়ে নিতান্ত নিরুপায়। আমি যা পারলাম না তোকে তাই করতে হবে শৈল; সদুকে ভাগবতের গ্রাস থেকে বাঁচাতেই হবে। ঐটিই তোর জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য—এর সামনে মীরার ভালবাসা একটা সৌখীন বিলাস মাত্র। কে বলতে পারে মীরা তোকে সত্যিই ভালবাসে? আর যদি বাসেই তো অঙ্কুরে রয়েছে সে ভালবাসা এখন। তোর নিজের মনের অবস্থা তুই নিজেই জানিস। যদি খুব এগিয়ে গিয়ে থাকিস তো কিছু বলতে পারি না। তা যদি না হয় তো একটা কথা তোকে ভেবে দেখতে হবে—সত্যিই কি মীরা তার ঐ হেরেডিটির গুমর—ঐ বেয়াড়া রকম আভিজাত্যের গর্ব ঠেলে তোকে গ্রহণ করতে পারবে? কাল যে ছুটে এসেছিল এটা খুব বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই ভাবটা কি স্থায়ী হ'তে পারবে ওর জীবনে? যদি কোন সময় এই ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তো তোর জীবনটা কি বিষময় হয়ে উঠবে না? সামাজিক স্তরে তোদের দু-জনের প্রভেদটা অত্যন্ত বেশী। ভালবাসা এ-প্রভেদ মেটাতে পারে; কিন্তু সে অসাধারণ ভালবাসা। তোদের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটা ডেভেলাপ্ড্ হয়েছে ব'লে অনুভব করিস শৈল?"

যেন আরও একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ধরে নিলাম হয়েছে, তবু তোকে ঘুরতে হবে। জীবনে কত বড় বড় জিনিস ছাড়তে হয়, নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে হয়, সে তো মানুষেই করে? তার জন্যেও তো মানুষে মানুষের দিকেই চেয়ে থাকে?···সদু বসেছে মরতে,—মরলেও ছিল ভাল—মরার চেয়ে একটা ভীষণ অবস্থা ওর সামনে, এ সময় একটা হালকা ভাব নিয়ে বিচার করতে বসা,—আমার মাথায় ঠিক আসছে না ব্যাপারটা শৈল। Nero fiddled while Rome burnt,—এটা হচ্ছে যেন তার চেয়েও একটা উৎকট বিলাসিতা।"

একদমে কথাগুলা বলিয়া গিয়া অনিল একটু চুপ করিল। আমি অবশ্য কোন উত্তর দিলাম না; কেন-না অনিল আমাকে কোন প্রশ্ন করে নাই, ওর উত্তেজিত কথাগুলা ছিল সেই ধরণের জিনিস যাহাকে ইংরেজীতে বলে thinking aloud—অর্থাৎ শব্দিত চিন্তাবলি।

অনিল অন্ধকারে সম্মুখের পানে চাহিয়া একটু অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমে মুখের উত্তেজিত ভাবটা মিলাইয়া আসিল; ধীরে ধীরে সেইরূপ শব্দিত চিন্তার ভঙ্গিতেই বলিল, "এদিকেও কি সহজ? আমি যেন ব'লে গেলাম গড়গড় ক'রে।···বিধবা-বিবাহ, তার মানে নিজের পরিবার, নিজের সমাজ থেকে চিরনির্বাসন। তাও আবার ইচ্ছে করলেই কি হবে?—ভাগবতের দুর্গ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা সদুকে···"

সহসা উঠিয়া পড়িয়া অনিল বলিল, "ওঠ্, যা হবার হবে; আর ভাবতে পারি না।"

* * * *

পরদিন বিকালে সাঁতরা ছাড়িলাম। জেঠাইমা বলিলেন, "সুবিধে পেলেই আসবি শৈল, তুই এলে অনা বরং ভাল থাকে, না হ'লে কী যে আকাশপাতাল ভাবে সর্বদা!···আর বিয়ে-থা কর একটা—যা বুঝি।"

বাইরের উঠানে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া অম্বুরী একটু আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "এত কাছে আছ ঠাকুরপো, ইচ্ছে করলেই টুপ ক'রে চলে আসতে পার, কিন্তু এমনি ভুলেছ আমাদের যে মনে হয় যেন কত দূরেই যাচ্ছ, কত দিনের জন্যেই না বিদেয় দিতে হচ্ছে···"

সাহুকে শিখাইয়া দিল, "বল্, শৈলকাকা নিশ্চয় আসবে শীগ্গির।"

সাহু ঝাঁকড়া মাথাটি ঈষৎ হেলাইয়া বলিল, "শৈল-টাকা নিচ্চয় ঠেলনা নিয়ে আসবে,—ঠীগ্গির।"

বলিলাম, "সেয়ানা ছেলে তোমার অম্বুরী।"

বিদায়ের বিষণ্ণ আকাশে হাসির একটু বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। গাড়ি ছাড়িবার পূর্বে অনিল বলিল, "একটা বোধ হয় দুর্ভাবনা নিয়ে যাচ্ছিস শৈল। কিন্তু উপায় কি?—দেখলি তো ভেতরে ভেতরে ও কত ক্লান্ত; কত নির্ভর ক'রে রয়েছে আমাদের ওপর?" ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র

[ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু—

আমার শরীর কিছুকাল হইতে অসুস্থ ও দুর্ব্বল আছে। ইতিমধ্যে শিলাইদহে গিয়া কতকটা ভাল ছিলাম। কিন্তু শরীর একবার ভাঙ্গিলে তাহাকে টানিয়া খাড়া করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

আমি আমার বিদ্যালয়ের কাজ লইয়াই ব্যাপৃত আছি। বেশ শান্তির সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ চলিয়া যাইতেছে। কেবল অর্থাভাবে ও যন্ত্রাভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। তুমি কাঠের কাজ অভ্যাস করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম।

আমার এখানে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম হোরি—নিজেকে সে চিদানন্দ নাম দিয়াছে। বড় নম্র শান্ত প্রকৃতি—তাহার অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া এই দূরদেশের প্রান্তে মাঠের মধ্যে একাকী সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের কঠোর চেষ্টা বড় বিস্ময়কর। তাহার সৌম্যমূর্ত্তি ও বিনীত ব্যবহারে এখানকার ভৃত্যেরাও মুগ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্র মূল সংস্কৃত গ্রন্থে অধ্যয়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিখিতে তাহার সুদীর্ঘ কাল লাগিবে। কারণ সংস্কৃত শব্দ সে উচ্চারণই করিতে পারে না—বার বার বিফল হইয়াও সে হতোদ্যম হয় না। মধ্যে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহার উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। তুমি যদি এখানে থাকিতে, এই জাপানী ছাত্রের সহিত নিশ্চয় তোমার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইত।

আশা করি তোমার পড়াশুনা অগ্রসর হইতেছে। আগামী মাসের বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের ইতিহাস নামে আমার একটি প্রবন্ধ বাহির হইবে, মনোযোগপুর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিয়ো।

আশীর্ব্বাদ করি তুমি সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক কর। ইতি
১৩ই শ্রাবণ ১৩০৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কার্য্যাদি সম্বন্ধে

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। Cadet Corpsএ প্রবেশ করিয়া তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে ইহা কল্পনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজপুত্র ইংরাজ শিক্ষক সংসর্গে আপন জাতীয়ত্ব, এমন কি, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে—তাহারা আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে, স্বদেশীর প্রতি বীতরুচি হইয়াছে, স্বজাতির ভাষা সাহিত্য শিল্পের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা জন্মিয়াছে—দিবারাত্রি জুয়া খেলিয়া, মদ খাইয়া, নাচিয়া ইংরাজের প্রমোদ-সভায়

অহোরাত্র উন্মত্তভাবে সঞ্চরণ করিয়া নিজেকে সর্ব্বতোভাবে হেয় করিয়াছে—ইহারা বিজাতীয় স্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া রক্তবর্ণ বিস্ফোটকের মত ভারতবর্ষের বক্ষশোণিত বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। তোমাকে এরূপ মত্ততা কখনই অভিভূত করিবে না, তাহা আমি নিঃসন্দেহ জানি। তুমি সংযত অপ্রমত্ত থাকিয়া সুদৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে; যাহা গ্রহণ করিবার তাহা একাগ্র মনে গ্রহণ করিবে কিন্তু সংসর্গের আকর্ষণে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়ো না। কাহারো স্তুতিনিন্দায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ধৈর্য্যের সহিত স্তব্ধভাবে নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে ভারতবর্ষীয় পবিত্র ক্ষাত্রধর্ম্মের নির্ম্মল হোমানলকে সর্ব্ব-প্রকার ইন্ধনের দ্বারা সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখিবে—তোমার সেই চিরসঞ্চিত তেজ কেবল তোমার অন্তর্যামীর এবং তোমার অন্তর্দৃষ্টির গোচর থাকিবে সে আর কেহ জানিবে না। সেইখানেই তোমার ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই তোমার ইষ্টমন্ত্রের সাধনা। ত্রিভুবনদেবতার যে তেজ জ্যোতিরূপে সমস্ত বিশ্বজগতে বিকীর্ণ হইতেছে এবং যে তেজ বুদ্ধি ও চেতনারূপে তোমার অন্তঃকরণে দীপ্যমান রহিয়াছে প্রাতঃকালে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা তোমার অন্তর্বহির্ব্যাপী সেই মহাতেজকে স্মরণ করিবে, অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবে—সেই তেজের দ্বারা প্রতিদিন তোমার অভিষেক হইবে—প্রাতঃকালে সূর্য্যের যে আলোক দেখিবে তাহা যেন প্রতিদিন তোমার অন্তঃকরণকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তাহাকে সমস্ত দিনের মত তোমার দেহমনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিবে—তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না, কোন গ্লানি তোমাকে আক্রমণ করিবে না, চতুর্দ্দিকের সমস্ত ধূলিপঙ্কের মধ্যেও সুরধুনিধারাস্নাত তরুণ দেবকুমারের মত তুমি অম্লান সুন্দর নির্ম্মলতা লইয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারিবে—তোমার গৌরব কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না—ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্য একান্ত মনে এই প্রার্থনা করি। ইতি ১৬ই শ্রাবণ [১৩০৯]।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশীয় রাজ্যের রাজকুমারদের সম্পর্কে—

যোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু—

আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। তুমি মহৎ হইবে, বীর হইবে, তুমি আমাদের আর্য্য পিতামহদিগের ঋণ পরিশোধ করিবে এই ইচ্ছা আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যখন কিছু লিখি তুমি আমার স্মরণপথে জাগরূক থাক। তোমাকে আমি নিকটে রাখিতে পারি নাই কিন্তু আমার হৃদয়ের স্নেহের দ্বারা তোমাকে আমি অভিষিক্ত করিয়াছি। তোমার জীবন সার্থক হউক ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনা করি। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩০৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্রখানি পাইয়া আমার হৃদয় স্নিগ্ধ হইল। তুমি অল্প দিন এখানে থাকিয়াই তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছ। তাঁহার স্বভাব মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি তোমাকে আপন

সন্তানের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। এখানকার বিদ্যালয়ে তুমি আসিবে এবং তাঁহার যত্ন শুশ্রূষার অধীনে থাকিবে ইহার জন্য তিনি ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার কাছে থাকিলে কখনো মাতার অভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিতে পারিতে না ইহা নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না—তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

তোমার কল্যাণ-কামনা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে—তুমি সকল বাধাবিপত্তি সুখদুঃখের ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাক; স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের জন্য আপনার জীবনকে প্রস্তুত করিয়া তোল ইহাই আমি একান্ত চিত্তে কামনা করি। ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-গৃহিণীর মৃত্যুর পর লিখিত। কবি-গৃহিণী মহারাজকুমারকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্ররূপে যাইবেন শুনিয়া কবি-গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। দীর্ঘকাল হইতেই আমার মেঝ মেয়ে রোগ ভোগ করিতেছে সেই জন্য উদ্বেগে আছি। হয়ত বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে লইয়া হাজারিবাগ প্রভৃতি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি—সুখ-দুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইব না এই আমার সাধনার লক্ষ্য।

আশা করি অধ্যয়নে তুমি ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছ। এখানে আমার বিদ্যালয় উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রতি সাধারণের অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে।

কিছু দিনের মত আমি ভ্রমণে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি—আমার রুগ্না কন্যার সম্বন্ধে একটা কোন সুব্যবস্থা করিতে পারিলেই আমি বাহির হইয়া পড়িব।

ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমাকে কল্যাণ পথে রক্ষা করুন। ইতি ১লা ফাল্গুন ১৩০৯

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যালয় সম্পর্কে—

ওঁ

হাজারিবাগ

কল্যাণীয়েষু—

পীড়িত শরীর ও পীড়িতা কন্যাকে লইয়া হাজারিবাগে আসিয়াছি। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

তুমি ক্যাডেট কোরে যোগ দিয়া মীরাটে শিক্ষালাভ করিতে যাইতেছ এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। ইহাতে তোমার সর্ব্বপ্রকারে উপকার হইবে আশা করি। ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন।

আমি সংসারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া আমার একটিমাত্র কাজে জীবনকে উৎসর্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে লোকহিতের পথ দিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যদি দুই দিনের মানব জীবনকে সার্থক করিতে পারি তবে ধন্য হইব। আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। ঈশ্বর আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে প্রত্যহ অযাচিত ভাবে সার্থক করিতেছেন। এক সময়ে যখন সংসারীদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া অনেক লাঞ্ছনা ও কদাচিৎ মুষ্টিভিক্ষা লাভ করিতাম সে এক দুঃখের দিন ছিল।

এখন ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছি। এখন সহায়তা আপনি আসিতেছে। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৫০৲ টাকা মাত্র বেতন পান—কলিকাতায় বাসাভাড়া করিয়া তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়—তিনি একদিন বোলপুরে আসিয়া নিঃশব্দে আমাকে ১০০০৲ এক সহস্র টাকা দিয়া গেলেন। ঈশ্বর অক্ষমকে দিয়াই নিজের কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে অভাবনীয়-রূপে সম্পন্ন করান, ইহাতেই তাঁহার মহিমা প্রকাশ পায়। এই ঘটনার পর হইতে আমি ভিক্ষার ঝুলি ফেলিয়া দিয়া নিজের প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কাজ বলিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। পূর্ব্বে ভয় হইত খরচে কুলাইবে কি করিয়া—এখন আর ভয় করি না। ছেলেদের থাকিবার ঘর বাড়াইয়া দিয়াছি—ইংরাজী শিখাইবার জন্য ইংরাজ অধ্যাপক রাখিয়াছি—কারখানার উপযোগী একটি বড় ঘর বানাইতেছি—একজন বন্ধু আমাকে Engine ও অন্যান্য যন্ত্র দিবেন কথা দিয়াছেন। এত ব্যয় যে কি করিয়া করিলাম ও কি সাহসে করিতেছি তাহা নিজেই জানি না—কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্য্য উপায়ে আমার অভাব পূরণ করিয়া দিবেন।

আমার শরীর অত্যন্ত অপটু কেবল আনন্দের আবেগে তোমাকে এতখানি পত্র লিখিলাম। আমি জানি তোমার প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে—মঙ্গলের প্রতি তোমার নিষ্ঠা, স্বদেশের প্রতি তোমার ভক্তি আছে—এই জন্যই আমার আশা আনন্দের কথা তোমাকে জানাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

মহারাজকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আমার সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়ো। তাঁহার স্নেহঋণে আমি বদ্ধ কিন্তু নিজের ক্ষীণ শক্তিকে ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত রাখিয়া অনেক সময় বন্ধুকৃত্য পালনের অবকাশ পাই না। আমাকে যেন তিনি নিজ ঔদার্য্যগুণে মার্জ্জনা করেন। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি ৭ই চৈত্র ১৩০৯।

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উন্নতিকল্পে ঈশ্বরপদে সমস্ত উৎসর্গ। আর্থিক চিন্তা হইতে অব্যাহতি। অপ্রত্যাশিতরূপে অভাব পূরণ। অপ্রত্যাশিত দান। যে শিক্ষকের বিষয় লিখিত হইয়াছে তিনি স্বর্গীয় অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়।

বোলপুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

এখনো জাপানী ছুতারকে এখানে মাস দুই-তিন রাখিতে হইবে। তাহার পরে যদি তোমাদের প্রয়োজন থাকে ত আগরতলায় পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে সে বাংলা আরো খানিকটা শিখিয়া লইবে।

অরুণ কাগজে দেখিলাম তোমাদের জন্য একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, আশা করি সেটা ভাল নিয়মে উপযুক্ত লোকের দ্বারা চালিত হইবে। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্র-গুলা অব্যবহারে অনাদরে ও চৌর্য্যে যেন নষ্ট না হইয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়ো—তোমাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাটা ভাল করিয়া প্রচলিত হয় এই আমার ইচ্ছা।

আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ সুন্দর চলিতেছে। কেবল একটি কারখানা ও ল্যাবরেটরি হইলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম—ঈশ্বরের প্রসাদে ধীরে ধীরে আমাদের অভাব দূর হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

তোমার শরীর এখন ভাল আছে ত? যতী এখনো আগরতলায় গেল না দেখিয়া তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। তাহার সংবাদ ভাল ত?

মহারাজকে সাদর অভিবাদন জানাইবে। তুমি আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।

শুভৈষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যালয় সম্পর্কে

[ক্রমশঃ

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

বৈশাখেরই এক মধ্যাহ্নে যোগমায়ার শাশুড়ী একখানি চিঠি হাতে করিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ওঘরে চরকা-চালনারত পিসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরঝি, শুনেছ—বট্‌ঠাকুর যে আসছেন।

পিসিমা চরকা থামাইয়া আধঘোমটা টানিয়া ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, এই দেখ, চিঠি লিখেছেন। আজ বিকেলেই আসচেন। এই অবেলায় কোথায় বা কি পাই! ও বেলা বাজার অবধি গেলাম না, ভাল মাছ-টাছ কিছু নেই, দেখি গোয়ালাবাড়ি এক ছটাক (কাঁচি আধ সের) যদি দুধ পাই।

বড়ঠাকুর মানে আপন কেহ নহে, নিকট প্রতিবেশী হিসাবে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ওপাশের শিবমন্দির—যেখানে কমলার সঙ্গে প্রথম বার শ্বশুরবাড়ি আসিয়া যোগমায়া প্রণাম করিতে গিয়াছিল—তাহারই গায়ে তাঁহাদের বাড়ি। বাড়িতে পোষ্য কম। ছেলেপুলে এক দম নাই, কেবল যোগমায়ার জেঠ্-শাশুড়ী এক জন বিধবা ননদকে লইয়া ওই বাড়িতে বাস করেন। জেঠ-শ্বশুর মহাশয় প্রবাস-জীবন-যাপন করেন। এক বিবাহের সময় ছাড়া যোগমায়া কোন বারই তাঁহাকে দেখে নাই। আর বিবাহের সময় যে দেখা—তাহাতে লোকটিকে চিনিয়া রাখিবার কথা নহে। লজ্জায় সঙ্কোচে চক্ষু মুদিয়া একটি প্রণাম করিবার অতি সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যে পরিচয়ের অবসরই বা মিলিবে কি করিয়া? তিনি থাকেন রাঢ় অঞ্চলের কোন একটি গ্রামে। সেখানে খুড়ি না জেঠি কাহার দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছেন—প্রায় দুই শত বিঘা ধানের জমি। কিন্তু বিষয়ের একটি সর্ত্ত নাকি—দান-বিক্রয়ের অধিকার তাঁহার নাই, শুধু দেবতার সেবক হিসাবে বার মাসে তের পার্ব্বণ সুসম্পন্ন করিয়া সেই সম্পত্তি ভোগদখল করা চলিবে।

বেশ রাশভারি লোক। তিনি বাড়ি আসিলে জেঠি-মা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। খাওয়া শোওয়া সবেতেই তিনি নিয়মানুবর্ত্তিতা ভালবাসেন। এই নিয়ম পালনের ঠেলায় বাড়ির মেয়েদের সন্ত্রস্ততার আর অন্ত নাই।

ইদানীং জেঠিমার বাড়িখানি বন্ধই রহিয়াছে। জেঠা মহাশয়ের খুড়ির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাতে তিনি সপরিবারে রাঢ় দেশের সেই গ্রামে গিয়া উঠিয়াছেন। শাশুড়ী তো যখন-তখন বলেন বট্‌ঠাকুর বোধ হয় এখানকার বাস উঠ্‌লেন। যে ভাবগতিক!

পিসিমা বলেন, তাই তো, মহেশরা চলে গেলে এ বাড়িটা একেবারে বনের মধ্যে পড়বে।

বিকালের দিকে একখানা গরুর গাড়ী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া লাগিল। ময়লা কাপড়ে মালকোঁচামারা এক গাড়োয়ান কয়েকটি মোট মাথায় করিয়া বাড়ির উঠানে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল, কৈ গো মাঠাকরোণ, নাবাব কোথায়?

উই রোয়াকে থো। গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে ঘরে তুলতে হবে।

সবশুদ্ধ গোটা চারেক মোট। দুটি বস্তায় কি বাঁধা রহিয়াছে, একটি কাপড়ের পুঁটুলি আর একটি মাটির হাঁড়ি। সর্ব্ব পশ্চাতে জেঠ্-শ্বশুর দেখা দিলেন। হাতে মোটা একটা বাঁশের লাঠি—তাহারই উপর ভর দিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে তিনি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। রং তাঁহার খুব ফরসা, নাকটি টিকলো, কিন্তু এত রোগা চেহারা যোগমায়া খুব কমই দেখিয়াছে। রোয়াকের উপর পৈঠা দিয়া উঠিবার কালে মনে হইল, তিনি হাঁপাইতেছেন। শাশুড়ী মাথায় ঘোমটা টানিয়া রান্না-ঘরের দিকে সরিয়া গেলেন। পিসিমা মাথায় ঘোমটা দিয়া আগাইয়া আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন, কেমন আছ মহেশ? বৌ ভাল আছে?

আর ভাল! রোয়াকের উপর উঠিয়া তিনি ততক্ষণে দেওয়াল ধরিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নিশ্বাস ত্যাগের ফাঁকে ফাঁকে বলিতে লাগিলেন, আর ভাল হব চিলুতে শুয়ে। দেখছ না টান—শীতকালে তো বিছানা থেকে উঠতে পারি নে—এখনই এই। বলিয়া সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সত্য বলিতে কি, বৃদ্ধ বয়সে মুখে-চোখে যে একটি রমণীয় প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে, ইঁহাকে দেখিয়া সে ধারণা ভুল বলিয়াই মনে হয়। সারা জীবনে তিনি যেন সংসারে বিরক্তি আর অশান্তিই সঞ্চয় করিয়াছেন। কথা বলিবার সময় অনেকগুলি সরু-মোটা শিরা গলদেশ হইতে ললাট পর্য্যন্ত এমন বিশ্রী ভাবে ফুটিয়া উঠে! সারা মুখখানির লোলচর্ম্মে সেই কুঞ্চন রেখা এমনই ভাবে ছাইয়া যায়! তা ছাড়া গলার স্বরটিই বিরক্তিব্যঞ্জক। উঁহার অবস্থা সচ্ছল; প্রায় দুই শত বিঘা জমির উপস্বত্ব ভোগ করেন। বার মাসে তের পার্ব্বণ ঠেকাইয়াও রীতিমত ধান-চাল ধার দিয়া কিছু সঞ্চয়ও করিয়াছেন, শোনা যায়। কিন্তু অদৃষ্ট! ধনের সুখে সুখী হইয়া—মানের মুকুট মাথায় পরিয়া—দেহের জন্য তিনি সদাই অসুখী হইয়া আছেন!

পিসিমা বলিলেন, নিতাইকে নাকি পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছ?

হাঁ। না নিলে এত বড় বিষয়টা কে দেখবে, দেবতার সেবা চালাবে কে?

তা নিতাই সব দেখে শোনে তো? এখন কত বড়টি হয়েছে?

দেখে আর ছাই! সারা বছর ম্যালেরিয়াতে ভুগছেই। পেটজোড়া পিলে—বার মাস জর লেগেই আছে। বাঁচবে বলে বোধ হয় না।

ওমা—সে কি! তা চিকিচ্ছে-পত্তর কি করাচ্ছ?

চিকিৎসা? তার খুব ঘটা আছে, দিদি। বছরে এক পিপে কুইনিন ওর পেটে যায়। এত মিছরি—এত সাগু। কুইনিন খেয়ে খেয়ে ছোড়াটা কানের মাথা খেয়ে বসে আছে।

আহা—বাছারে। পিসিমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

জেঠ্‌শ্বশুর বলিলেন, কেন এলাম' জান? দু-জায়গায় টানা-পোড়েন আর করব না। বয়সও বটে, শরীরের এই অবস্থা। যে দিন যায় সেই দিনই ভাল। বাড়িটা বেচেই দেব মনে করেছি।

পিসিমা বলিলেন, বেচে দেবে? জন্মভিটে কি বেচতে আছে?

জেঠ্‌শ্বশুর মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, সে কাদের? যাদের ছেলেপুলে নাতি-নাতনীতে সংসার গম গম করছে। আঁটকুড়োর আবার জন্মভিটে! তুমিও যেমন!

পিসিমা বলিলেন, তা হোক, তবু বাপপিতামোর নাম—

আমি গেলেই তো অন্ধকার। এক ফোঁটা জল তাঁদের মুখে ঠেকাবে কে শুনি? তুমি তো জান, দিদি, তোমাদের বউ হেন ঠাকুর-দেবতা ভূভারতে নেই যাঁর দোর ধরেন নি। কিছু ফল হ'লো কি? যাদের হয়, মা-ষষ্ঠী ঢেলে দেন দু-হাতে।

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন কি না বোঝা গেল না। হাঁপানির টানটা বেশি বলিয়াই মনের নানা প্রকারের ভাবকে তিনি ঐ একটি মাত্র পথ দিয়াই প্রকাশের সুযোগ দিয়া থাকেন।

একটু থামিয়া বলিলেন, এখানকার বাড়িটা বেচেই দেব। কিছু টাকার আমার দরকার। বছরাবধি একটা মামলা চলছে। দুঁদে জমিদার, দেবোত্তর সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে চায়। ব্যাটা উকিল মোক্তার যেন জোঁকের মত লেগেছে, দিদি। হাতে যা ছিল গেছে, তোমাদের বউয়ের গহনা—

পিসিমা বলিলেন, তা মিটিয়ে ফেল না।

ফেলব—ফেলব। বলিয়া হাসির মাত্রাটা উচ্চগ্রামে তুলিতেই তিনি হাঁপানির টানে কাতর হইয়া পড়িলেন। আপন মনে খানিকক্ষণ সৃষ্টিকর্ত্তাকে গালি বর্ষণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ছোট আদালতে জিতলাম, বড় আদালতে গেল। আর ক'টা মাস গেলে দেখ না—বাছাধনকে আদা-জল খাইয়ে দিই কেমন। জানে না তো মহেশ চাটুয্যেকে!

পিসিমা বলিলেন, আচ্ছা, এইবার মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল মুখে দাও তো।

আরে, তুমিও যে কুটুম্বিতে আরম্ভ করলে দেখতে পাই। এ কি আমার পরের বাড়ি? হবে'খন, হবে'খন, বৌমাকে ব্যস্ত হ'তে বারণ কর। কাজের কথাটা হয়ে যাক্ আগে। কাল দশটার আগেই আবার রওনা হ'তে হবে আমায়। হাঁ, বৌমাও শোন, বাড়ি আমি বেচবই। তোমরা তো জানই, গেলবারে যখন কথা ওঠে তিলিরা হাজার টাকা দেবে বলেছিল। মনে নেই তোমার, দিদি?

পিসিমা ঘাড় নাড়িলেন।

আমি বলেছিলাম, না, বাড়ি আমি বেচব না। সবাই বলে জন্মভিটে—নিজেরও একটা মায়া ছিল বরাবর। কিন্তু—

হাঁপানির টানটা বেশি হওয়ায় তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, ছুত্তোরি জন্মভিটে! বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তা তোমরা যদি নাও, অমনি দেওয়াই আমার উচিত ছিল, কিন্তু বুঝছো তো?

টাকার দরকার। পাঁচশো টাকা পেলেই কাল রেজেষ্ট্রি করে দিতে পারি।

পিসিমা বলিলেন, দাঁড়াও, বউ কি বলছেন শুনে আসি। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বউ বলছেন, হাতে তো এখন টাকা নেই, এখন কিছু নিয়ে আর মাসখানেক বাদে যদি—

হাঁ—হাঁ—তাই হবে—তাই হবে। এখন আমার শ'খানেক টাকা হ'লেই চলবে।

শাশুড়ী ব্যস্ত হইয়া সেই সন্ধ্যাবেলাতেই পাড়ায় কয়েক বার ছুটাছুটি করিলেন। মাইপোষটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ছোট টিনের বাক্স বাহির করিলেন। টিনের বাক্সের মধ্য হইতে যে কি বাহির করিয়া আঁচলের তলায় লুকাইলেন তাহা যোগমায়া দেখিতে পাইল না, কিন্তু খানিক পরে টাকা বাজাইবার শব্দে সে বুঝিল, বাড়ি কেনার একটা পাকা বন্দোবস্তই হইয়া গেল।

পিসিমা বলিলেন, কাল অমাবস্থে পড়বে বলে বউ তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে এলেন। লেখাপড়া তুমি কালই করে দিয়ো, ভাই।

হাঁ, কালই লেখাপড়া হবে। রেজেষ্ট্রি আপিসে যেতে আসতে বড় জোর তিন ঘণ্টা। হাঁ, কালই রেজেষ্ট্রি হবে। তবে বউমাকে বলো, দিদি, আসছে মাসের শেষাশেষি টাকাটা যেন উনি দিয়ে দেন। বড্ড ধারেকর্জ্জে জড়িয়ে পড়েছি কি না।

পরদিন প্রাতঃকালে শাশুড়ীর কথামত যোগমায়া জেঠ্‌শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করিতে আসিলে তিনি মুখখানিতে যথাসম্ভব প্রসন্নতা ফুটাইয়া বলিলেন, রামের বউ বুঝি? আঃ বিয়ের সময় কতটুকুটি দেখেছিলাম! দেখি মা—তোমার হাতখানি একবার? লজ্জা কি, দেখি?

যোগমায়ার সঙ্কুচিত হাতের মধ্যে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া পিসিমাকে বলিলেন, বেশ বউ, সুশীলা, লক্ষ্মী।

তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটি যোগমায়ার কানে একটু প্রখর বলিয়াই বোধ হইল।

২

রেজেষ্ট্রি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাশুড়ী সেই দিন দুপুরবেলায় দা ও শাবল লইয়া ওই বাড়ির দুয়ার খুলিয়া বন পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন। অন্ধকার ঘরে চামচিকারা বাসা বাঁধিয়াছিল। তাহাদের পক্ষসঞ্চালনজনিত দুর্গন্ধে সে ঘরে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও দুঃসাধ্য; কিন্তু পরের বাড়িকে নিজের বলিয়া পাইবামাত্র শাশুড়ী এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বিরাগকে দমন করিয়া সেই সবের যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। তা পথে বাহির হইলেও দিনে অন্তত তিনি আট-দশ বার স্নান করেন, বাড়ির বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা বেলায় একবার মাত্র স্নান তাঁহার পক্ষে এমন কিছু বাহুল্যের নহে। যোগমায়ারও কাজ জুটিয়া গেল। ওই পড়ো বাড়িটার সুবিস্তৃত উঠানে কুমড়া শাক, মিষ্টি ডাঁটা ও নটেশাকের জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া প্রত্যহ সে পাতকূয়া হইতে জল তুলিয়া সেই সব জমিতে সিঞ্চন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাঙা নটের অঙ্কুর বাহির হইল, কুমড়ার ডগা সাপের মত ফণা বিস্তার করিয়া প্রাচীরের গায়ে ঊর্দ্ধমুখী হইল, সতেজ ডেঙ্গু ডাঁটার পত্রবিস্তারের মধ্যে যোগমায়ার প্রসন্ন মন আত্মগোপন করিল।

কুমড়ার ফুল ফুটিলে শাশুড়ী বলিলেন, বউমার হাত ভাল। কেমন গাছগুলি হয়েছে দেখেছ, ঠাকুরঝি?

পিসিমাও চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, হবে না, ও মেয়ের আঁচলে লক্ষ্মীঠাকরুণ বাঁধা। দেখো, এই বউ হতেই—

কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি আবার শাশুড়ীকে চিন্তাকুল দেখা গেল। কয়দিন তিনি ভাল করিয়া আহার করিলেন না, বাড়িতে অল্পক্ষণ থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। বাড়ি পরিষ্কার করিবার নেশাটা তাঁহার এই কয় দিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যজনকভাবে কমিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সেদিন যোগমায়া ঘরের কোণে প্রদীপটিকে উস্কাইয়া দিয়া একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি খুলিয়া বসিয়াছিল। আজ পিসিমা আসেন নাই, শাশুড়ীও নয়। উঁহারা আসিলে যোগমায়া মৃদুকণ্ঠে পাঠ আরম্ভ করিবে। প্রথম প্রথম লজ্জা করিত। গলার স্বর বুজিয়া আসিত, বর্ণাশুদ্ধি বাঁচাইয়া পাঠ করাও এক দুরূহ ব্যাপার। পাঠের গুণে এক শব্দের অর্থ অন্য হইয়া দাঁড়াইত। সে জন্য যোগমায়াকে অবশ্য খুব বেশি লজ্জিত হইতে হইত না। কারণ পাঠ আরম্ভ হইবামাত্র শাশুড়ী ঢুলিতে থাকিতেন; পিসিমা হাতের মালা করাঙ্গুলির সাহায্যে ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে সভক্তি অন্তরে চক্ষুকে অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া কখনও আনন্দ প্রকাশের মধ্য দিয়া, কখনও বা খেদোক্তির দ্বারা—কাহিনীকে যে সারা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেছেন—তাহা জানাইতেন। দেবতার

কথায় ভুল ধরিবার দুর্মতি তখনকার রীতি ছিল না, পাঠ বা বর্ণাশুদ্ধির খাতিরেও নহে। সাহস পাইয়া এই কয় সপ্তাহে যোগমায়ার কণ্ঠস্বর শুধুই স্বাভাবিক হয় নাই, রামায়ণপাঠ কালে পয়ারের যে একটি সুন্দর সুর নারীকণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া কাহিনীর বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত করে, সেই সুললিত সুরটিও এখন যোগমায়ার আয়ত্তীভূত হইয়াছে। রামায়ণ পাঠ করিয়া সে অনায়াসে অন্যের চক্ষুকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে। কাল রাম-নির্ব্বাসনের কালে দশরথের বিলাপ-গাথা পাঠ করিবার কালে পিসিমা ও শাশুড়ী দুই জনেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিলেন।

পাঠে যোগমায়ার মন বসিবার পূর্ব্বে তার মনে হইল, ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে পিসিমা ও শাশুড়ী কি বলাবলি করিতেছেন। দুই ঘরের সংযোগসেতু সিঁড়ির দুয়ারটা আধভাঙ্গা বলিয়া ওঘরের অনুচ্চ কণ্ঠের কথাবার্ত্তা এঘরে বসিয়াও দিব্য শোনা যায়। বই খোলা পড়িয়া রহিল, যোগমায়া উৎকর্ণ হইয়া উঁহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

পিসিমা বলিতেছিলেন, তা হোক, বিয়ের কনে কিছু নয়, বয়সও হয়েছে।

শাশুড়ী বলিলেন, বেয়াই-বেয়ান যদি কিছু মনে করেন?

পিসিমা বলিলেন, তা তাঁরা মনে করতে পারেন। নতুন কুটুম তো!

শাশুড়ী বলিলেন, তবে তাঁরা কি বুঝবেন না যে, ওদের জন্যই আমাদের এই হাকুলি-বিকুলি। আমি তো গঙ্গার পাউড়িতে বসে আছি, যা থাকবে ওরাই ভোগদখল করবে।

পিসিমা বলিলেন, আর একটা মাস সময় নাও না কেন? মহেশকে এক খানা চিঠি লিখে—

শাশুড়ী বলিলেন, আর এক মাস পরেই বা টাকা কোত্থেকে আসবে শুনি? রাম তো মাইনে পায় কুড়িটি টাকা। দশটি টাকা মাত্তর পাঠায়, তাতে কি—

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর পিসিমা বলিলেন, সাত তাড়াতাড়ি জমিটা না কিনলেই হ'ত। ধারে কর্জ্জে লুণ্ডুভুণ্ডু। এই ত বিয়ের পর পাঁচিল তুলতে যে দেনা হ'লো—তা অতি কষ্টে পোষ মাসে শোধ দিয়েছ। আবার—

শাশুড়ী ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, জমি কিনব না ত কি পর এসে বাস করবে আমার বাড়ির গায়ে? আমার সোমত্ত বউ ঘরে—যে-সে এসে বসলেই হ'লো?

পিসিমা চুপ করিয়া রহিলেন।

শাশুড়ী বলিলেন, জমি নেবার জন্যে পাড়ার লোক মুকিয়ে আছে। একবার খবর পেলে হ'ত, পাঁচ ছ' কুড়ি টাকা বেশি দিয়ে তারা জমি কিনে নিত না!

তথাপি পিসিমা কথা কহিলেন না।

শাশুড়ী বলিলেন, ভারি তো বাপেরা গহনা দিয়েছে—পায়জোড়, জশম, মৌরিফুল আর সাতনরী। কতটুকু সোনা হবে শুনি?

পিসিমা বলিলেন, তা ভরি দশেক তো বটেই।

তবে? আর আমরা দিয়েছি কিছু না হোক পনেরো-যোল ভরি সোনা। ছেলে চাকরি করছে, গহনা বাঁধা পড়ে ছাড়িয়ে আনতে ক'দিন!

পিসিমা বলিলেন, বেয়াইরা কিছু মনে না করেন—তাই বলছি।

মনে করেন তো কি আর করব। মেয়ে না হয় পাঠাব না। বলিয়া সব চিন্তার নিষ্পত্তি করিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সেদিন রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ অবধি যোগমায়ার ঘুম আসিল না। সব-কিছু না বুঝিবার বয়স তার নাই। বাপেরবাড়িতে একবার মৌরিফুল বাঁধা পড়িয়াছিল, তিন মাসের মধ্যে বাবা সে জিনিস খালাস করিয়া আনিয়াছিলেন। বাপেরবাড়িতে তো নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যাওয়া ছাড়া যোগমায়া গহনা গায়ে দিত না, কাজেই নিজের বাড়ির সিন্দুকেই থাকুক আর পরের বাড়ির হাত-বাক্সেই থাকুক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। শ্বশুর-বাড়িতে আলাদা কথা। যখন তখন লোকে বউ দেখিতে আসে। বউ এবং গহনা দুইটিই যে দেখিবার ও আলোচনার বস্তু তাহা যোগমায়া বেশ বুঝিতে পারে। যে বাড়ির কুৎসিত বউ, এবং যে বাড়ির বউয়ের রূপ আছে অথচ গায়ে অলঙ্কার নাই—তাহাদের প্রতিকূল সমালোচনা একই পর্য্যায়ভুক্ত। তফাৎ রূপহীনা বধূর অপরাধ শুধু তার নিজের আর গহনার অভাব তার পিতৃকুল ও শ্বশুর-কুলের। যদিও অর্থ ও রূপের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখে সারগর্ভ কথাও যখন-তখন শুনিতে পাওয়া যায়।

অন্ধকারে সারা গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া যোগমায়া অলঙ্কারের অবস্থানটুকু ভাল করিয়া অনুভব করিল। আরসী থাকিলে—সেখানা সম্মুখে রাখিয়া নিজের অলঙ্কার-সমৃদ্ধ দেহবিম্ব সেই দর্পণে ফুটাইয়া সে হয়ত মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিত। কিন্তু রাত্রি যতই গভীর হইতে থাকে, যোগমায়ার মন ততই চঞ্চল হইয়া উঠে। অলঙ্কার চুরি করিবার জন্য

চোর বুঝি ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতেছে! দেহচ্যুত হইলে এ জিনিস আর দেহাশ্রয় করিবে না! সংসারকে না বুঝিবার বয়স এখন তো যোগমায়ার নাই।

শুধু সে বুঝিতে পারে না ভবিষ্যতকে। তাহাকে অলঙ্কারবিহীনা করিয়া ভবিষ্যৎ যে কি সুফল প্রসব করিবে। অন্ধকার রাত্রিতে নির্ব্বাপিতদীপ কক্ষে উপাধান চোখের জলে ভিজাইয়া প্রিয়বিয়োগব্যথার দুঃখে যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে কাঁদিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

অবাধ্য অশ্রু—কিছুতেই কি যোগমায়া তাহাকে রোধ করিতে পারে না! দুপুরের নির্জ্জন মুহূর্ত্তে যত বার সে আভরণহীন দেহের পানে চাহিয়াছে, তত বারই দুটি চোখের বাধা ঠেলিয়া সে অশ্রু গণ্ডপ্লাবিত করিয়া দিয়াছে।

পিসিমা অনেক ভাল ভাল কথা শুনাইয়াছেন। পতি-অনুগামিনী বল্কলধারিণী সীতার কথা সে পরশুই তো পড়িয়াছে। রাজরাণীর কিসের অভাব ছিল? অথচ সোনারূপার অলঙ্কার তুচ্ছ করিয়া পতিকেই তিনি শ্রেষ্ঠরত্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তেমন অলঙ্কার নাকি মেয়েমানুষের ত্রিভুবনে আর! কিন্তু কাহিনীর কথা কল্পনার ক্ষেত্রে মনকে অনেকখানি-উপরে তুলিয়া মনোরম একটি স্বর্গ রচনা করে, বাস্তবের হাওয়ায় সে স্বপ্ন কোথায় উড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সারা দুপুরবেলাটা তার সীতার কথা মনে পড়ে নাই, তাঁহার আত্মজ্ঞানের দৃষ্টান্ত ভাবিয়া মন প্রবোধ মানে নাই। সে শুধু ভাবিয়াছে, বইয়ে যাঁহাদের কথা আছে—তাঁহারা ছিলেন দেবদেবী। দেবদেবীদের দুঃখ-কষ্ট শুধু তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য—তাঁহাদের মহিমাকে বৃদ্ধি করিবার জন্য। আর মানুষের দুঃখকষ্ট অনন্তকালের জন্য। যে জিনিস একবার চলিয়া যায়, সে জিনিস তত শীঘ্র ফিরিয়া আসে না। আজ যদি রামচন্দ্র এখানে থাকিত, কিংবা সে বাপেরবাড়িতে থাকিত—এই ব্যাপার কখনই ঘটিতে পারিত না। এখন কেহ বউ দেখিতে আসিলে ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া থাকা ছাড়া আর সহজ উপায় কি! ভাগ্যে রাধারাণী এখানে নাই।

বৈকালে সে ওবাড়িতে শাকসব্জীর চারায় জল ঢালিতে গেল না, ঘরের কোণে বসিয়া রামায়ণখানি কোলের উপর খুলিয়া রাখিয়া মনটিকে কোন তেপান্তরের মাঠে ছাড়িয়া দিল।

কৈ গো রামের মা, কি হচ্ছে? বলিয়া এক বর্ষীয়সী প্রবেশ করিলেন। বর্ষীয়সীর হাতে হরিনামের ঝুলি, গায়ে নামাবলী এবং মুখে পান। তামাকপোড়া খান বলিয়া দাঁতগুলি মিশ কালো। মাথার চুলে সবেমাত্র পাক ধরিয়াছে, অথচ বলেন বয়স তিন কুড়ি পার হইয়া গিয়াছে। পাড়ার সকলেই তাঁহাকে হরি-ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকে। অতি শৈশবকালে বিবাহ এবং বৈধব্য ঘটিয়া গিয়াছে। ভাইয়ের সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া আছেন। তাঁহার মুখের উপর কথাটি কহিবার সামর্থ্য সে সংসারে কাহারও নাই। বেলা দুইটা আন্দাজ আহার শেষ হইলেই থান কাপড়ের উপর নামাবলীখানি চাপাইয়া হাতে হরিনামের ঝুলিটি লইয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ির তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরেন। তামাকপোড়াটুকু না হইলে চলে না বলিয়া সেটুকু অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লন। তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিলে পড়শীবধূ বা ঝিয়ারীরা পান দিতেও ভুলে না। শুধুই পরচর্চ্চার হজমিগুলি গলাধঃকরণ করিয়া তাঁহার মনের স্বাস্থ্য অটুট থাকে না। হরি-ঠাকুরঝির পরোপকার-প্রবৃত্তিরও একটা খ্যাতি আছে। যেখানে রোগ বা অভাব সেইখানেই হরি-ঠাকুরঝির সুকোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন চলে। মুখরা বলিয়া তাঁহার দুর্নাম রটিলেও, চরিত্র-গৌরবে তাঁহার খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত।

শাশুড়ী আজকাল ও বাড়ি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। ও বাড়ির শাল কাঠের দুয়ারজানালাগুলিতে উই ধরিয়াছে বলিয়া একটা হাঁড়িতে কিছু আলকাতরা ও ছেঁড়া ন্যাকড়া লইয়া তিনি ওগুলির সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

পিসিমা ওঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এস, ভাই, এস। বউমা, কম্বলের আসনখানা পেতে দাও তো—তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে।

কুণ্ঠিত যোগমায়া বাহির হইয়া আসন পাতিয়া দিল।

আসনে বসিয়া হরি-ঠাকুরঝি বলিলেন, বউমা, তুমিও এইখানটিতে ব'স।

পিসিমা বলিলেন, পান সেজে আন, বউমা।

হরি-ঠাকুরঝি হাসিয়া বলিলেন, ওই আমার এক রোগ, ওটুকু মুখে না দিলে প্রাণ যেন আইঢাই করে। তা আজ কি রান্না হ'লো, দিদি?

তুমিও যেমন, কোন রকমে গর্ত্ত বুঁজুনো। বউমা রয়েছেন তাই দু'বেলা দু'খানা তরকারি রাঁধতে হয়। হ'লো নটে শাখের তেলশাক, পটল ভাজা, মুগের ডাল, আর কুমড়োর ডাঁটা দিয়েছিল সরি গয়লানী—তারই চর্চ্চড়ি! আমড়ার টক।

কচি আমড়া আছে গাছে? আমায় চারটি দিয়ো তো, দিদি, একদিন পোস্ত দিয়ে টক করে খাব।

যে সগ্‌গে গাছ! ওই নগা দিয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কোন কমে পাড়া। তা চারটি ঘরে আছে—এনে দেই।

থাক, থাক, কাল আবার একাদশী। পরশু নিয়ে াব। আজ দশমীর দিন কি জলখাবার খাবে?

দেখি যদি একটু ছানা পাওয়া যায়। গ্রীষ্মিকালে ইম-হিম ছানা মন্দ লাগে না।

যা বলেছ দিদি,—আমার তো বারমাসই ছানা লছে। এত বারণ করি, হারু কিছুতে শোনে না।

তা হারুর মত ভাই এ পাড়ায় তো একটিও দেখি নে। দিদির ওপর কি ছেদ্দা ভক্তি।

হরি ঠাকুরঝি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমাদের াঁচ জনের আশীর্ব্বেদে এখন ওকে রেখে—ছেলেদের রেখে চাখ বুজতে পারি তবে তো! হরিবল।

এমন সময়ে ছোট একটি রেকাবিতে পান ভরিয়া যাগমায়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি যোগমায়ার র্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, ওমা, বোয়ের াত খালি করে রেখেছ কেন গা? পরশু দেখলাম একহাত বঙ্গফুল, মুড়কি মাদুলি, মৌরি ফুল—! গলা খালি, ওপর াত খালি, অমন সোন্দর বউ, ভাল দেখাচ্ছে না, দি!

পিসিমা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—কথাটা লিবেন কি না। রামের মায়ের নিষেধ আছে কোন থা প্রকাশ করিতে। গহনা বন্ধকের মত সম্মানহানি-র কাজ নাকি এ জগতে আর নাই।

অভাব সব সংসারেই আছে, গহনাও প্রায় প্রত্যেক াড়িতে বাঁধা পড়ে, এবং কাহার গহনা কোথায় কি য়োজনে বাঁধা পড়িয়াছে তাহাও হরি-ঠাকুরঝির মত ত্য সংবাদসংগ্রহকারিণীর না জানিবার কথা নহে; বু মিথ্যা কথা বলিয়া সম্মান বাঁচাইবার রীতি এই গ্রামে, ধু এই গ্রামেই বা কেন, সব গ্রামে চিরকাল এমনই ভাবে লিয়া আসিতেছে।

হরি-ঠাকুরঝি নূতন রহস্যের সন্ধান পাইয়া পুলকিত ও াগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, ছি মা, গহনা ক বাক্সে বন্দ করে রাখতে আছে। সদা সর্ব্বদা পরে াকবে। এই তো পরবার বয়েস। এখন পরবে না ত ক…আমাদের বউ বলেন কি—সংসারের কাজ করতে য়—সোনা ক্ষয়ে যাবে। শুনেছ কথা? সোনা ক্ষয়ে যায়, াবার গড়িয়ে দেবে। হারু যতক্ষণ বেঁচে আছে— তামার গহনার ভাবনা!

তা তো বটেই।

দেখি, গলা দেখি, মা। ওমা, চিকটাও খুলে রেখেছ! যাও পরে এস। বলিয়া গোটা দুই পান গালে পুরিয়া অঞ্চলগ্রন্থি হইতে দোক্তা খুলিতে লাগিলেন।

পিসিমা বুঝিলেন, আসল কথা লুকাইতে যাওয়া বৃথা। আজ না হয় কাল হরি-ঠাকুরঝি সমস্তই জানিতে পারিবেন। থার যোগমায়ার শাশুড়ীর মত অতটা চালাক-চতুরও তিনি নন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, আর ভাই, রাম বেঁচে থাকুক—গহনা পরবেন বইকি বউমা। একটা দরকারে কিছু টাকার অনটন হ'লো—

ও, তাই বল! মস্ত একটা দুর্ভাবনা কাটিয়াছে এমনই ভাবে তাঁহার মুখে-চোখে আনন্দজ্যোতি খেলিয়া গেল।

তা ধার আর কোন্ সংসারে হয় না বল। পাঁচটা ঝঞ্ঝাট থাকলেও রকম হয়েই থাকে। ওই দেখ না, মিত্তিরদের গিন্নী, বোয়ের হাত খালি দেখে যেমন জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাঁগা, ছেলেমানুষ বউ অমন রাঁড়হাত ক'রে রেখেছ কেন? বললে, নতুন প্যাটানের চুড়ি গড়াতে দিইছি। ধম্মের ঢাক এক দিন বাজেই দিদি, পাপ কখনো লুকো-ছাপা থাকে না। ঠিক তিনটি দিন পরে বাঁড়ুজ্জেদের রাখালের সঙ্গে দেখা। হাতে তার কাগজের মোড়ক দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ওতে কি রাখাল? বললে, মা বুড়ো মানুষ জানে না তো, মিত্তির-গিন্নীকে এক কুড়ি টাকা ধার দিয়েছে এই ক গাছা লবঙ্গফুল রেখে। আজ স্যাকরাবাড়ি যাচাই করতে গিয়েছিলাম। সে বললে, মরা সোনার জিনিস, পানে ভর্ত্তি, মেরে কেটে ওর দাম কুড়িটে টাকা হতে পারে—সুদ এক পয়সাও পাবে না। বোঝ একবার কলিকালের ধম্ম!

ধর্ম্মের কাহিনী চাপা থাকিবার কথা নহে, বিশেষত যাহারা সে কাহিনী অন্যের মন হইতে টানিয়া বাহির করিতে সুদক্ষ—তাহাদের কাছে। পিসিমা আনুপূর্ব্বিক সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। হরি-ঠাকুরঝি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটার এইখানেই শেষ হইল না। শাশুড়ী আলকাতরা মাখা হাত লইয়া ওবাড়ি হইতে আসিয়াই পিসিমাকে প্রশ্ন করিলেন, কেউ এসেছিল বেড়াতে? যেন হরি-ঠাকুরঝির গলা শুনলাম।

হাঁ—তিনিই তো এসেছিলেন।

তা বউ এখানে বসে বসে কি করছে? গল্প শুনছে বুঝি? শাশুড়ীর স্বর বিরক্তিতে অপ্রসন্ন।

পিসিমা মৃদু স্বরে বলিলেন, ঠাকুর-ঝি বসতে বললেন, তাই।

তাই! শাশুড়ীর স্বর তীব্র হইয়া উঠিল। ওসব পাড়া-বেড়ানোর ছুতো আমরা বুঝি। লোকের পেটের কথা টেনে বার করতে না পারলে রাতে ওদের ঘুম হয় না।

পিসিমা কথা কহিলেন না, যোগমায়াও আড়ষ্টের মত দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই জনেরই অন্তর ভয়ে কাঁপিতেছিল।

শাশুড়ী বলিলেন, ওসব মৌটুসকিপনা আমরা আজন্ম দেখে আসছি। পাড়ার খবর নিতে আসা নয় তো, মজা দেখতে আসা। তিন কুল খেয়ে বসে আছে কি না—তাই মজা দেখতে আসে। ভাইয়ের সংসারে তো হাঁড়ি ঢুন্ ঢুন! আবার বড়মানুষী ফলিয়ে বেড়ানো হয়!

বলে,

'কে নেবে মোর শাকের পেতে কে নেবে মোর কেঁড়ে,
আমার গা থর থর করে।'

বহির্মুখী আক্রমণের বেগ অন্তর্মুখী হইল। আর তোমাদেরও বলিহারি যাই! যার-তার কাছে পেটের কথা খুলতে যাওয়ার কি দরকার। অত আদিখ্যেতা করে পান সেজে দেওয়াই বা কেন? পান না দিয়ে মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দিতে পার নি?

পিসিমা ধীরে ধীরে আমতলার ঘরে চলিয়া গেলেন। শাশুড়ীও রাগ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় দোকান হইতে ছানা আনিলেন না, দশমীর কোন আয়োজনই করিলেন না। ভয়ে শোকে মুহ্যমান যোগমায়ারও সারারাত্রির মধ্যে আর ক্ষুধা বোধ হইল না। এ ধরণের আঘাত তার পক্ষে এই প্রথম। ক্রমশঃ

ছবির "স্বৈরাচার"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরায়ণ
ওঁ ২৩।৬।৪১

কল্যাণীয়েষু,

আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার সাধনা করছি। সুতরাং তার সমস্ত কৌশল তার গতিবিধির নিয়ম সে আমি এক রকম জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ছবি যা অকস্মাৎ আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ চেনাশোনা হয় নি। তার স্বৈরাচার আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু স্বৈরাচারের অন্তর্নিহিত যে নিয়ম তাকে ভিতরে ভিতরে চালনা করে, সে আমার কাছে অত্যন্ত গোপনে আছে। প্যারিসের আর্টিষ্টরা যখন আমাকে বলেছিলেন যে, আমরা যা চেষ্টা করে আসছি তুমি তাতে কৃতার্থ হয়েছ—আমি কথাটা কিছু বুঝতে পারি নি। তাঁদের বলেছিলুম সেই কৃতকার্যের কী লক্ষণ, আমাকে বলে দাও। তাঁরা বললেন, বলবার দরকার নেই। তোমার কাজ তুমি করে যাও। অল্প দিন হোলো, নন্দলাল যখন আমার চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, আমি তার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারি নি। এই চিত্রকলা আমাকে এড়িয়ে চলে। এর গতিবিধি আমার এমন অগোচর যে আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী—কো বেদঃ অর্থাৎ কে জানে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন। কিংবা জানেন না, এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় জগতে আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয় নি—যে, যাঁর সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে চলে। আসল কথা চরম প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। আমরা সাহিত্যকে অপেক্ষাকৃত ভাবে চিনি তার কারণ সাহিত্যের বাহন হচ্ছে ভাষা, ভাষা আপন অর্থ আপনি নিয়ে চলে। সেই অর্থের কৈফিয়ৎ দিতেই হয়। কিন্তু বর্ণবিন্যাস ও রেখাবিন্যাস, সে নিস্তব্ধ, তার মুখে বাণী নেই, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেয় যে, ঐ দেখো। আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। এই চিত্রকলা সম্বন্ধে আমি কলাবিৎ যামিনী রায়ের প্রশ্নের উত্তরে কিছু লিখেছিলেম। তাতে আমার আন্দাজের কথা হয়তো কিছু প্রকাশ হয়ে থাকবে। "প্রবাসী"-সম্পাদকের যদি পছন্দ হয় তবে সে লেখাটা হয়তো বেরোতে পারে। * এখনকার মতো আমি চুপ। ইতি।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

* ১৩৪৮ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে।—'প্রবাসী'র সম্পাদক।

প্রাইভেট সেক্রেটারী

(একাঙ্ক নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

[ঘরে কতকগুলো বইঠাসা আলমারি, মাঝখানে একখানা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে বিস্তর কাগজপত্তর, একটা টাইপরাইটার, ফোন ইত্যাদি। ঘরের উত্তরে ও পূবে দুটি দরজা, পূবের দরজায় পর্দা ফেলা। ঘরের সব আস্‌বাবপত্রই কেবল দামী নয় সুন্দরও।

সেই বড় টেবিলটায় বসে একটি যুবক খটাখট্ শব্দে টাইপ ক'রে চলেছে। যুবকের নাম অমল রায় এম-এ, বি-এল। অমল রায় হচ্ছেন মিস্ চম্পা চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। মিস্ চম্পা চৌধুরীর পরিচয় হচ্ছে বিদুষী, অভিভাবকহীনা, সুন্দরী ধনী-কন্যা।]

পূব দরজার পর্দা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন মিস্ চম্পা চৌধুরী।

চম্পা। (নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে) অসম্ভব !

অমল। (কাজ বন্ধ ক'রে—মুখ তুলে) কিছু বলছেন আমাকে মিস্ চৌধুরী ?

চম্পা। হ্যাঁ—বলছি।

অমল। কি বলছেন?

চম্পা। আপনার ঐ মেশিনটা পিয়ানো নয়, সেই জন্যে ওটা থেকে যে আওয়াজ বেরুচ্ছে তা খুব শ্রুতিমধুর হচ্ছে না। একটা গুরুতর বিষয়ে গভীর চিন্তা করছিলুম—কিন্তু আপনার টাইপরাইটারের আওয়াজ অনবরত খটাখট্ ঘা মেরে চিন্তার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যগুলোকে ভেঙে দিচ্ছিল। মেশিনটা কি দয়া ক'রে বন্ধ করবেন?

অমল। মেশিন বন্ধ করলে যে কাজের ক্ষতি হবে। তা ছাড়া, মস্তিষ্ক-পরিচালনার মত সহজ ও বাজে কাজগুলো করবার জন্যেই তো আমাকে রেখেছেন—আদেশ করলে ও কাজ আমিই করবো।

চম্পা। আমার তো মনে হচ্ছে না আপনাকে কিছু টাইপ করতে দিয়েছি—আমি কি জানতে পারি ওটা কি টাইপ হচ্ছে?

অমল। নিশ্চয় মিস্ চৌধুরী। ঈভ্স্ 'ওন্ ম্যাগাজিনে' আপনার লেখাটা পাঠাতে হবে—অর্থাৎ যেটা আমি আপনার আদেশে লিখছি, সেইটাই টাইপ করছিলাম। অতএব কাজ জরুরি।

চম্পা। ও—সেই মডার্ন হাসব্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধটা। দেখুন অমলবাবু, প্রবন্ধগুলো লেখেন আপনি, ছাপা হয় আমার নামে—খ্যাতি লাভ হয় আমার, এটা কি সঙ্গত হচ্ছে?

অমল। মোটেই অসঙ্গত হচ্ছে না। কারণ যেখানে আপনার খ্যাতি লাভ হচ্ছে, সেখানে আমার অর্থ লাভ হচ্ছে। লেখা কাজটা অ্যারিষ্টোক্র্যাটিক নয়, কোন অ্যারিষ্টোক্র্যাট যদি লেখকের যশ অর্জন করতে চান তাহলে আমাদের মত প্রফেসনাল লিখিয়ে নিযুক্ত করেন। আমরা অ্যারিষ্টোক্র্যাটিক রাষ্ট্রনীতিকদের জন্যে বিবৃতি ও বক্তৃতা লিখে থাকি। আপনি যদি কোন দিন অ্যাসেমব্লি বা কাউন্সিলে প্রবেশ করেন তাহলে আপনার সারবান ও ধারাল বক্তৃতাগুলো লিখবার আশা আমিই রাখি।

চম্পা। ধন্যবাদ—শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। এখন কথা হচ্ছে এই যে, আপনার মেশিন বন্ধ থাকবে কারণ আমাকে ভাবতে হবে।

অমল। কিন্তু মিস্ চৌধুরী—

চম্পা। মিস্ চৌধুরী, মিস্ চৌধুরী—অসহ্য! আচ্ছা অমলবাবু, আমার মা বাবা যে আমার অমন সুন্দর চম্পা নামটি রেখেছিলেন সে কি বরাবর উহ্য থাকবার জন্যে! বলুন তো চম্পা বললে সুন্দর শোনায় কি না?

"চারি চক্ষের মিলন হবে
চা পান করতে করতে।"

ভবিষ্যতে আপনি আমাকে আর মিস্ চৌধুরী ব'লে ডাকবেন না, চম্পা ব'লে ডাকবেন—এই আমার ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার রইল।

(পর্দা ঠেলে পাশের ঘরে প্রস্থান)

অমল মেশিন বন্ধ করলো, তার পরে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একখানা বই এনে পড়তে লাগলো।

মিনিট-দশেক কেটে গেল। হঠাৎ পর্দা ঠেলে প্রবেশ করলেন চম্পা।

চম্পা। অমলবাবু, আপনি কি ঘুমুচ্ছেন?

অমল। আজ্ঞে না, পড়ছি।

চম্পা। এই কথা আমি বলতে এলুম যে আপনি যদি ঘুমুতে চান ঘুমোন—কিন্তু নাক যেন আপনার ডাকে; আর যদি ঘুমুতে না চান তাহলে টাইপরাইটার নিয়ে বসুন।

অমল। তার মানে?

চম্পা। তার মানে একটা কিছু আওয়াজ না হ'লে আমি বুঝবো কেমন ক'রে যে পাশের ঘরে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী রয়েছেন?

অমল। কিন্তু এই যে বললেন আপনার চিন্তার ব্যাঘাত হয় তাতে!

চম্পা। দেখলুম সাড়া না পেলে চিন্তার ব্যাঘাত হয় আরও বেশী।

অমল। (চম্পার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর ভাবে) আপনি অসুস্থ চম্পা!

চম্পা। অসুস্থ! কই—না তো। স্বাস্থ্য আমার চমৎকার আছে।

অমল। আপনি নিশ্চয় অসুস্থ—দয়া ক'রে বসুন চম্পা। আপনি গুরুতরভাবে অসুস্থ।

চম্পা। (ব'সে) ব্যাপার কি বলুন তো অমলবাবু, নিজে তো কিছুই বুঝতে পারছি নে হঠাৎ অসুখটা কি হ'ল আমার!

অমল। আপনার হয়েছে সাইলেনশিয়ামফোবিয়া (Silentiumphobia.)

চম্পা। তার মানে?

অমল। তার মানে নির্জনতাভীতি—আপনি একা থাকতে ভয় পান। নিউরলজিষ্টরা বলেন এটা একটা অদ্ভুত ব্যাধি। আপনি ভয় পাবেন না চম্পা, এ ব্যাধি অদ্ভুত হ'লেও মারাত্মক নয়, ত্রিশের নীচে যাদের বয়েস তাদের মধ্যে আজকাল শতকরা ৯৯ জন এই রোগে ভুগছে।

চম্পা। মারাত্মক নয় শুনে আশ্বস্ত হলুম। এ রোগের লক্ষণ বা বর্ণনা করলেন অমলবাবু, তাতে আমার মনে হচ্ছে আমার দু-জন বিশেষ বন্ধুকেও এই রোগে ধরেছে।

অমল। খুবই সম্ভব।

চম্পা। মিষ্টার গুপ্ত বলেন—

অমল। ব্যারিস্টার হীরক গুপ্ত! কি বলেন তিনি?

চম্পা। মিস্টার গুপ্ত বলেন দিনের কাজের মধ্যে যতক্ষণ তিনি ডুবে থাকেন ততক্ষণ থাকেন ভাল, কিন্তু রাত যখন তার স্তব্ধতা নিয়ে আসে তখন তাঁর হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, মুহুর্মুহু দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে থাকে। আর আকাশে যদি চাঁদ উঠলো তাহলে ঘন ঘন মূর্চ্ছা—একেবারে জীবন নিয়ে টানাটানি। সাইলেনশিয়াম-ফোবিয়া কি না বলুন!

অমল। খাঁটি।

চম্পা। আমার দ্বিতীয় বন্ধু মিস্টার মিত্রের অবস্থা আরও খারাপ।

অমল। মিস্টার মিত্র কি রঞ্জত মিত্র? মিত্র মশায়ের অবস্থা আরও খারাপ কিসে?

চম্পা। বেচারা আজকাল বহু লোকের মধ্যেও নিজেকে একা বোধ করেন। সর্বদাই বুকের মধ্যে একটা হাহাকার ভাব!

অমল। খুবই খারাপ, আশু চিকিৎসার দরকার।

চম্পা। এঁরা দু-জনাই একটা টোটকা ব্যবহার ক'রে খুব উপকার পেয়েছেন।

অমল। বটে! সেটা আপনার জেনে নেওয়া দরকার।

চম্পা। আমি জানি অমলবাবু—তাঁরা দু-জনেই আমাকে বলেছেন, একসঙ্গে অবিশ্যি নয়—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। তাঁরা বলেছেন আমার কথা ভাবলে নাকি তাঁরা অনেকটা সুস্থ থাকেন। আমাকে এক দিন দেখলে উপরি উপরি কয়েক দিন ভাল থাকেন।

অমল। (উঠে দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে) বলেন কি চম্পা? এ কি সত্যি?

চম্পা। (মৃদুভাবে হেসে) খুব সত্যি অমলবাবু। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মিস্টার গুপ্তের মত কুসংস্কারবর্জ্জিত লোকও মাদুলির মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন।

অমল। তাই নাকি?

চম্পা। আমার খোঁপার একটা শুকনো ফুল আধুনিক মাদুলি বা লকেটে পুরে দেহে ধারণ ক'রে মিস্টার গুপ্ত আশাতীত ফললাভ করেছেন।

অমল। (হতাশ ভাবে ব'সে পড়ে) নির্জনতাভীতির পরের অবস্থা।

চম্পা। খুব সাংঘাতিক?

অমল। খু—ব সাংঘাতিক—এর নাম ভালবাসা।

চম্পা। ভালবাসা সাংঘাতিকই বটে! আচ্ছা অমল-বাবু, ভালবাসা ব্যাপারটা একক হয় না?

অমল। পুরাকালে এক বার নাকি হয়েছিল, তার পরে আর হয়েছে ব'লে জানি না।

চম্পা। হ'লে কিন্তু অনেক সুবিধে হ'ত, জীবনের জটিল সমস্যাগুলো থাকতো না—ভাবতে কম হ'ত।

অমল। আপনি কি আজকাল খুব ভাবছেন চম্পা?

চম্পা। নিশ্চয় ভাবছি, খুব গভীর ভাবে, খুব গম্ভীর ভাবে ভাবছি। কিন্তু ভেবেও যে কিছু কিনারা করতে পারছি না তার জন্যে আপনি ও আপনার টাইপরাইটার দায়ী। অতএব এ সমস্যা সমাধানের ভার আপনার উপর রইল।

অমল। গুরুভার চম্পা। সাধারণতঃ এ রকম সমস্যা যাদের সামনে আসে, তারা নিজেরাই তার সমাধান ক'রে থাকে।

চম্পা। ও বিষয়ে আমি অসাধারণ হবার আশা রাখি। তা ছাড়া অমলবাবু, দীর্ঘ দু বছর ধরে আপনাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী রেখে আমার অনেক কাজ অনভ্যাসে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ ক'রে মাথার কাজগুলো।

অমল। এ সমস্যার সমাধান করতে শুধু মাথার দরকার হয় না—হৃদয়ের দরকারও হয় অনেকখানি।

চম্পা। বেশ তো, মাথার কাজটা আপনি ক'রে দিন, হৃদয়ের কাজটা আমি করবো।

অমল। নিতান্তই যদি করতে হবে তাহলে আপনার সমস্যাটা বিশদভাবে বলুন আমাকে।

চম্পা। লিখে নিন, এ সমস্যা সৃষ্টি করেছে দুটি পুরুষ ও একটি নারী। পুরুষদ্বয় সেই এক নারীকে ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। পুরুষ দু-জন হচ্ছেন মিস্টার গুপ্ত এবং মিস্টার মিত্র আর নারী হচ্ছি এই আমি। এখন প্রশ্ন এই যে আমার কর্তব্য কি?

অমল। আপনার কর্তব্য হচ্ছে এই দু-জনের মধ্যে এক জনকে বেছে নেওয়া।

চম্পা। বুঝলুম এক জনকে বেছে নিতে হবে; কিন্তু এই বাছাই ব্যাপারটা বড় গোলমেলে—এইখানেই আপনার মাথার দরকার।

অমল। সাধারণতঃ বাছাইয়ের কাজে মেয়েদের মাথা খেলে ভাল এই তো এত কাল শুনে এসেছি, আপনার বেলা তার ব্যতিক্রম দেখলাম। যা হোক, আমি যত দূর পারি তা করবো। আচ্ছা, বলুন দেখতে কে কেমন!

চম্পা। দৈর্ঘ্যে দু-জনেই প্রায় সমান, প্রস্থেও তাই। স্বাস্থ্য দু-জনারই ভাল, তবে মিস্টার গুপ্ত মাঝে মাঝে কাশেন, আবার মিস্টার মিত্রও মাঝে মাঝে হাঁচেন। মিস্টার গুপ্ত বেশী সময় প'রে থাকেন সুট্ আর মিস্টার মিত্র বেশী সময় প'রে থাকেন ধুতি পাঞ্জাবী।

অমল। উঁহু—বেশভূষায় কথা এখন নয়, ওসব বলবেন অভ্যাস সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করবো।

চম্পা। আচ্ছা বেশ। তার পরে মিস্টার গুপ্তের মুখখানা গোল, মিস্টার মিত্রের কিঞ্চিৎ লম্বা।

অমল। তার পরে?

চম্পা। তার পরে মিস্টার গুপ্তের আছে গোঁফ, মিস্টার মিত্রের আছে দীর্ঘ জুলফি। আর, আর তো কিছু মনে পড়ছে না অমলবাবু!

অমল। এই যথেষ্ট। দৈহিক রূপে মিত্র এবং গুপ্ত দু-জনেই প্রায় সমান নম্বর পেলেন। আচ্ছা, এবার বিদ্যা সম্বন্ধে বলুন।

চম্পা। মিস্টার গুপ্ত অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট ও ব্যারিস্টার, মিস্টার মিত্র স্বদেশী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.।

অমল। অনেক তফাৎ। মিস্টার গুপ্ত পেলেন বেশী নম্বর। আচ্ছা, বলুন সম্পদে?

চম্পা। সম্পদে মিস্টার মিত্র পাবেন বেশী নম্বর।

অমল। তাহ'লে মোটের মাথায় দু-জনের নম্বরই সমান হ'ল, মীমাংসা হ'ল না—আমার মাথা হেঁট হ'ল। এইবার আপনার হৃদয়কে কাজে লাগান, হয়ত মীমাংসা হবে।

চম্পা। আপনার এই প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি অতি চমৎকার অমলবাবু। আপনি প্রশ্ন করুন আমি উত্তর দিচ্ছি, হৃদয়ের গলদ বেরিয়ে পড়বে।

অমল। সাধারণতঃ হৃদয়ের ব্যাপারগুলো গোপন রাখা হয়। আমার সামনে আপনার মর্মকথা প্রকাশ পাওয়া কি উচিত হবে?

চম্পা। অমলবাবু, আপনার ঐ সাধারণতঃ দিয়ে আরম্ভ করা বক্তৃতাগুলো ভবিষ্যতে আর দয়া ক'রে দেবেন না। প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে আবার প্রাইভেসি কি? আপনি প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দিচ্ছি।

অমল। আপনার হুকুম তামিল করতে আমি বাধ্য। আচ্ছা বলুন তো চম্পা, কখনো কোনদিন চেয়ারের হাতায় বা টেবিলের কোণে আঁচল বাধিয়ে মিঃ গুপ্তকে বা মিঃ মিত্রকে ফিরে ফিরে দেখেছেন?

চম্পা। না, কাকেও দেখি নি।

অমল। কালিদাস-টেস্ট ব্যর্থ হ'ল, আচ্ছা বলুন তো কখনো কোন দিন ফাউণ্টেন পেন দিয়ে খাটের বাজুতে 'ক' 'খ' 'মানুষ' 'গাছ' 'গরু' ইত্যাদি লিখতে লিখতে মিঃ গুপ্তের বা মিঃ মিত্রের নাম লিখেছেন?

শারদ প্রভাতে
শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চম্পা। না লিখি নি, খাটের বাজুতে লেখা আমার অভ্যাস নেই।

অমল। (হতাশ ভাবে) দেখছি বঙ্কিম-টেস্টও বিফল হ'ল। আচ্ছা বলুন তো—

চম্পা। দাঁড়ান, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে; এই সমস্যার এক অতি সহজ সমাধান আছে—আপনার সূক্ষ্মদৃষ্টির দূরবীন খুঁজেছে দূরে দূরে, তাই এত কাছের সহজ জিনিসটা এড়িয়ে গেছে।

অমল। সেই অতি সহজ সমাধানটা জানবার জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হয়েছি জানবেন।

চম্পা। আমাদের সমস্যা বা প্রশ্ন কি ছিল, মিষ্টার গুপ্ত, না মিষ্টার মিত্র—এই না?

অমল। হ্যাঁ।

চম্পা। উত্তর হচ্ছে দু-জনের কেউ না। কেমন—অত্যন্ত সহজ নয়?

অমল। খুব সহজ—এত সহজ যে কোনকালে কোন সমস্যা ছিল বলেই মনে হচ্ছে না। সমস্যা তো গেল, এখন রহস্য যে ঘনীভূত হ'ল!

চম্পা। রহস্য আবার কোথায়?

অমল। রহস্য হচ্ছে এই যে ১ নং মিষ্টার গুপ্ত এবং ২ নং মিষ্টার মিত্র যখন নেই, তখন ৩ নং মিষ্টার এক মাত্র কেউ আছেন।

চম্পা। (উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে) নিশ্চয় আছেন, তিনি আছেন আমার মনের মন্দিরে। আমার কল্পলোকে যে মিষ্টার একমাত্র বিরাজ করছেন তিনি রূপে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, বলে শ্রেষ্ঠ, তিনি কবিশ্রেষ্ঠ, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ, প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, রসিকশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এই অতিমানবের স্পষ্ট ধারণা আপনার কিছুতেই হবে না অমলবাবু, রূপকের সাহায্যে যদি কিছু ধারণা করতে পারেন—যেমন বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানচন্দ্রের কাঁধের উপরে সুন্দরশ্রেষ্ঠ অ্যাপোলোর মাথা; হাতও থাকবে অনেকগুলো, কোন হাতে রাইফেল, কোন হাতে সিগারেট, কোন হাতে স্টিয়ারিং চক্র, কোন হাতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চেক-বই, কোন হাতে প্রাইম-মিনিস্টারের পোর্টফোলিও—।

অমল। আর তাঁর নাম হবে শ্রীঅ্যাপোলোপবনন্দন-কনফুসিয়াস্ কালিদাসরকফেলার।

চম্পা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কল্পনা আর বাস্তবে ভয়ানক গরমিল।

অমল। দুঃখ করবেন না, কারণ কল্পনার চেয়ে বাস্তব বড়। এই যেমন ধরুন কল্পনার জগতে রোগা পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে গোঁয়ার রাজপুত্র আসে হাঁপাতে হাঁপাতে, সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে জেগে ওঠে নিউরটিক রাজকন্যা, চারি চক্ষের মিলন হয় ধোঁয়াটে প্রদীপের আলোয়; আর বাস্তব জগতে দেখুন টেলিফোন বেলের আওয়াজে রাজকন্যার ঘুম ভাঙে, মোটর হাঁকিয়ে আসে স্যুটপরা রাজপুত্র—চারি চক্ষের মিলন হয় চা পান করতে করতে। সুন্দর কি না বলুন!

চম্পা। না—সুন্দর নয়। যা নেই—যা হবে না তাই সুন্দর, যা আছে যা হবে তা সুন্দর নয়।

অমল। গুরুতর কথা।

চম্পা। না না, আর গুরুতর কথা নয়; অনেকক্ষণ গুরুতর বিষয় আলোচনা ক'রে মাথা গুরুভার হয়ে উঠেছে। এখন নিতান্ত সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে খানিক হাল্কা ধরণের আলোচনা ক'রে হাল্কা হওয়া যাক। আচ্ছা, বলুন তো অমলবাবু, আপনি কি কাউকে ভালবেসেছেন?

অমল। এটা খুব হাল্কা কথা হ'ল!

চম্পা। আপনার কাছে ভারী হ'তে পারে কিন্তু আমার কাছে তো হাল্কা।

অমল। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা কি সঙ্গত হবে?

চম্পা। আপনি বোধ হয় ওল্ড স্কুল, তাই ভালবাসার কথা বলতে লজ্জিত হচ্ছেন!

অমল। লজ্জিত হচ্ছি না, ভীত হচ্ছি।

চম্পা। আমি অভয় দিচ্ছি, আপনি বলুন।

অমল। ভালবাসি।

চম্পা। অ্যাঁ, তাই নাকি! আমি তো এ উত্তর আশা করি নি অমলবাবু।

অমল। সে বিষয়ে আগে একটু ইঙ্গিত করলেই আপনার আশানুরূপ উত্তর দিতে পারতাম।

চম্পা। এত দিন তো কিছুমাত্র টের পাই নি!

অমল। ব্যাপারটা নিতান্ত তুচ্ছ ব'লে।

চম্পা। আমি আপনাকে অভিনন্দিত করছি অমলবাবু।

অমল। অভিনন্দিত না ক'রে সমবেদনা প্রকাশ করলেই সমীচীন হ'ত।

চম্পা। তাই কি আধুনিকতম পদ্ধতি?

অমল। আমি সনাতনপন্থী। সাধারণতঃ—

চম্পা। "নো মোর্" সাধারণতঃ। বোধ হয় বুঝতে পেরেছি, আপনি বুঝি হতাশ প্রেমিক অমলবাবু!

অমল। আমাকে কি কখনো জমাখরচের খাতায় কবিতা লিখতে দেখেছেন ?

চম্পা। তা হ'লে নিশ্চয় আপনার গুপ্তপ্রেম।

অমল। আপনার মৌলিক গবেষণা করবার ক্ষমতা আছে।

চম্পা। গবেষণা করবার জিনিস বটে! আচ্ছা বলুন তো, প্রেম কখনো গুপ্ত থাকে ?

অমল। যে প্রেম প্রকাশ পেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে সে প্রেম গুপ্তই থাকে।

চম্পা। বিপদ তো প্রেমের সাথী, বিপদ চলে প্রেমের হাত ধ'রে। যে বিপদকে এড়িয়ে প্রেম চায় সে তো কাপুরুষ।

অমল। কিন্তু প্রেম যেখানে সার্থক হবে না, সেখানে প্রেম বাদ দিয়ে বিপদটা বরণ করলে সাহসী বলব না—মূর্খ বলব।

চম্পা। প্রেম যদি গোপন রইল, সে সার্থক হবার সুযোগ পেল কোথায় ?

অমল। হয়ত প্রকাশ এক দিন পাবে—যদি সুযোগ আসে।

চম্পা। সুযোগ আবার আসে নাকি! সুযোগ ক'রে নিতে হয়। পুরুষ যদি তার স্বাভাবিক অধৈর্য্য এবং কিঞ্চিৎ বর্ব্বরতা না দেখাল তবে সে পুরুষ কিসে ?

অমল। (চিন্তিত ভাবে) আপনার এ কথাটা ভেবে দেখব।

চম্পা। ভাববার সুযোগ ও অবসর আপনাকে দেবার ব্যবস্থা আমি করছি অমলবাবু। বলতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি যে আপনাকে আমার আর দরকার নাই।

অমল। (কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে) আমি খুবই আশ্চর্য্য হলুম চম্পা, আমার অপরাধ ?

চম্পা। আপনার অপরাধ এই যে আপনি ভাল-বেসেছেন।

অমল। ভালবাসা কি অপরাধ ?

চম্পা। প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। জানেন অমলবাবু, আদর্শ প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর মন ব'লে কিছু থাকবে না—সে হবে যন্ত্র, হবে রো বোট। না, আপনাকে দিয়ে আমার আর কাজ চলবে না।

অমল। আপনি আমার উপর অত্যন্ত অবিচার করলেন চম্পা।

চম্পা। কিছুমাত্র অবিচার করি নি, যে-লোক প্রেমকে গোপন করতে পারে সে-লোক ডাকাতি করতে পারে, মানুষ খুন করতে পারে।

অমল। আপনার কাজে আমি কোন দিন অবহেলা করি নি।

চম্পা। নিজের কাজে যার এত অবহেলা, অন্যের কাজ অবহেলা করতে তার কতক্ষণ ? সে থাক—আমি আর এখানে ব'সে সময় নষ্ট করতে পারি না, (হাতঘড়ি দেখে) আমি চললুম। (উঠে, চলতে সুরু করা)

অমল। তাহলে সত্যিই আমাকে কাজ ছাড়তে হবে ?

চম্পা। (দরজার কাছ থেকে) নিশ্চয়।

অমল। যাক, এক দিক্ দিয়ে ভালই হ'ল।

চম্পা। (ফিরে দাঁড়িয়ে) তাহলে আমি খুব অন্যায় করি নি !

অমল। না—এক ভাবে আপনি আমার উপকারই করলেন।

চম্পা। (আশ্চর্য্য হয়ে) উপকার করলুম !

অমল। হ্যাঁ, উপকারই করলেন। কিছু দিন থেকে কলকাতার কোলাহল আর ভাল লাগছিল না, মন যেন কেমন বিকল হয়ে যাচ্ছিল—যেন একটা সুদূরের ডাক মাঝে মাঝে কানে আসছিল।

চম্পা। তাই নাকি ?

অমল। হ্যাঁ, তাই মনে করছিলুম এক দিন লোটাকম্বল সম্বল ক'রে পথে বেরিয়ে পড়ব।

চম্পা। কিন্তু সে কি আপনাকে যেতে দেবে, আপনার সেই বাঞ্ছিতা !

অমল। যেতে না দেবার কোন হেতু নাই। সে তো জানে না আমি তাকে ভালবাসি। যদি জানে তাহলেও এ পৃথিবীর এমন নিয়ম নয় যে শ্রবণ মাত্রই সে আমাকে ভালবাসবে।

চম্পা। কিন্তু তাকে ব'লে আপনি যাবেন নিশ্চয়ই।

অমল। বলেই যাব। বলব "প্রিয়া, তোমাকে আমি ভালবাসি", তার পরে বদরিনাথের পথ ধরে দ্রুতপদে অগ্রসর হব।

চম্পা। তার পর ?

অমল। তার পর বদরিনাথ পিছনে পড়ে থাকবে, আমি হিমালয়ের চিরতুষারের দেশে প্রবেশ করব। প্রচণ্ড শীত, অথচ আমার কাঁধে মাত্র একখণ্ড কম্বল; নগ্নপদে বরফের উপর দিয়ে উত্তরমুখে ছুটব—একা।

চম্পা। (খানিক এগিয়ে এসে) কিন্তু খাবেন কি ?

অমল। খাবার কথা ভাববার অবকাশ আমার থাকবে

না, শীতে যদি জমে বরফ হয়ে যাই তাহলে সেইখানেই শেষ, তা না হলে সেই বিশাল তুষারতরঙ্গ পার হয়ে তিব্বতে উপস্থিত হব।

চম্পা। তিব্বতে উপস্থিত হবেন?

অমল। হ্যাঁ, বিদেশীবিমুখ তিব্বতে উপস্থিত হব। হয়ত একদা এক তিব্বতী লামার হাতে জীবন যাবে, নয়ত কোন পার্ব্বত্য মঠে সমস্ত জীবন বন্দী হয়ে কাটাতে হবে। তিব্বত পার হ'তে পারলে চীন।

চম্পা। দেশের কথা একবারও মনে হবে না?

অমল। (চোখে মুখে একটা কঠোর ভাব ফুটিয়ে) না, দেশ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম —চীন? অচেনা চীন আমাকে কেমন ভাবে অভ্যর্থনা করবে জানি না, হয়ত চিয়াং কাই-শেকের সৈন্সরা এসে ধরবে, হয়ত মনে করবে জাপানের গুপ্তচর—বেঁটে তলোয়ার দিয়ে গলা কেটে হোয়াংহোর জলে ফেলে দেবে।

চম্পা। (আরও এগিয়ে এসে) এত বিপদের মধ্যে আপনি যাবেন?

অমল। (উদাস ভাবে একটু হেসে) বিপদ তো প্রেমের সাথী, বিপদ চলে প্রেমের হাত ধরে। চীনেরা যদি ছেড়ে দেয় ধরবে জাপানীরা—বলবে মতলব কি? বিশ্বাস করবে না আমি প্রেমিক, নগুচির কবিতা আওড়ানো ব্যর্থ হবে। চীনের প্রাচীরের পাশে দাঁড় করিয়ে তারা গুলি করে মারবে।

চম্পা। জাপানীরা অত নিষ্ঠুর নয়।

অমল। সাকুরাপায়ী জাপানীরা প্রেমিক—হয়ত আমাকে ছেড়ে দেবে। তাহলে আমার চলার বিরাম থাকবে না, সাইবেরিয়ার মধ্যে দিয়ে আমি চলবো রাত্রি দিন—চলতে চলতে এক দিন উপস্থিত হব এশিয়ার শেষ প্রান্তে।

চম্পা। (সামনে এসে) অত দূরে যাবেন আপনি?

অমল। দূর কাকে বলে আমি জানব না। এশিয়ার শেষপ্রান্তে আমি উপস্থিত হবই। তখনকার সে চেহারা আমার দেখলে আপনি চমকে উঠবেন চম্পা। মাথায় জটাভার, আবক্ষ দাড়ি, জীর্ণ বসন, লোটা পথে কোথায় হারিয়ে গেছে বা চুরি গেছে—কম্বল শতছিন্ন। সেই ছিন্ন কম্বল এশিয়ার উপকূলে ফেলে দিয়ে আমি বেরিং প্রণালীতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

চম্পা। (ব্যগ্র ভাবে) তার পরে?

অমল। তার পরে যদি হাঙরের দল এসে বণ্টন ক'রে না খায় আর ক্লান্ত দেহে যদি কিছুমাত্র শক্তি থাকে তাহলে বেরিং প্রণালী সাঁতরে পার হয়ে আমেরিকায় গিয়ে উঠব।

চম্পা। এমন দুঃসাহসের কাজ আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না অমলবাবু।

অমল। আমি করবোই। (উঠে চম্পার সামনে

এসে) চম্পা, আপনার এখানে আমার আর আসবার প্রয়োজন থাকবে না; ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে যাচ্ছে, আমাকে এখনি চলে যেতে হবে—এই মুহূর্তে একটি কথা যদি আমি না বলি তাহ'লে তা আর কোন কালে বলা হবে না। চম্পা আমি তোমাকে, তোমাকেই ভালবাসি, আমাকে ক্ষমা ক'রো—বিদায়, চিরকালের জন্যে বিদায়। (চলে যাবার উদ্যম)

চম্পা। (চমকে এক ইঞ্চি সরে এসে) আমাকে ভালবেসে আপনার অপরাধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে একটা উপদেশ আমি দিতে চাই। অত কষ্ট ক'রে এশিয়াখণ্ড পদব্রজে পার হয়ে সমুদ্র সাঁতরে আমেরিকা যাওয়ার চেয়ে কলকাতা থেকে জাহাজে উঠে নিউইয়র্কে গিয়ে নামলে কিছু সুবিধে হয় না?

অমল। না না চম্পা, আমার ভিতরে যে প্রচণ্ড আবেগ, সে কি অত সহজে শান্ত হবে?

চম্পা। আর একটা কথা, একখানা টিকিট না কিনে বরং দুখানা টিকিট কিনলে হয় না? একখানা আপনার জন্যে, আর একখানা—

অমল। কার জন্যে?

চম্পা। আমার জন্যে।

অমল। চম্পা! চম্পা!

মাতুল ও ভাগিনেয়

ডক্টর শ্রী কালিকারঞ্জন কানুনগোয়

ইতিহাস এক হইয়াও সাধকের অভীষ্টানুযায়ী বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; ভাবিতেছি ইহার কোন্ রূপ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিব। ঐতিহাসিক দিক্-দেশরূপী (Space) শিবের বক্ষে উদ্দাম-নৃত্যপরায়ণা সর্ব্ব-সংহারিণী মহাকালীর (Time eternal) পূজারী। এই পূজার পুষ্পাধার স্বয়ং ধরিত্রী, অর্ঘ্যপাত্র কৃতি মানবের নর-কপাল; মাল্য কাল-সূত্র-গ্রথিত শূর-শ্রেষ্ঠগণের মুণ্ডমালা; বস্ত্র প্রথিতযশা বীরবৃন্দের শস্ত্রভিন্ন বাহুপুঞ্জ-নির্ম্মিত কাঞ্চী; গন্ধ বিদ্বৎ-মণ্ডলীর যশঃ-সৌরভ; দেবীর আবাহন-সঙ্গীতের রাগ মালকোষ,* রাগিণী ভৈরবী; ইহার বলি অখিল জীবগ্রাম এবং বাদ্য প্রলয়ের বিষাণ। এই পূজার অঙ্গ-স্বরূপ "আবরণ-দেবতা" বা "বীরপূজা" (Hero-worship). ঐতিহাসিকের অবশ্যকর্ত্তব্য; এজন্য স্থূলদৃষ্টিতে ইতিহাসকে "বীরপূজা" বলিয়া ভ্রম হয়। বাস্তবিক পক্ষে যিনি বীর, তিনি কালজয়ী; তাঁহাদের কীর্ত্তি ইতিহাসের প্রাণবস্তু। স্বয়ং মহাকাল শ্রদ্ধাসহকারে বীরের স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করিয়া থাকেন—যোগীশ্বরের জপমালায় এজন্য বীর-মুণ্ডই স্থান পাইয়া থাকে। বঙ্গ-জননী সদ্য বীর-পুত্র-হারা হইয়াছেন; কিন্তু শূর-কবির (Hero as a Poet) মহিমান্বিত কীর্ত্তি মহাকালের যুগান্ত-বিস্তৃত দশনান্তরাল হইতেও বিপুলতর; তাই কবি রবীন্দ্রনাথ কালগ্রাসে পতিত হইলেও তাঁহার যশঃশরীর অনাগত কাল পর্য্যন্ত মহাকালের "দশনান্তরেষু বিলগ্ন" হইয়াই থাকিবে। বীরসাধকের ধ্যানের বিষয়ীভূত ইতিহাসের এই বিরাট্ রূপ দর্শনের অধিকারী সকলেই নয়; সুতরাং সার্ব্বজনীন দুর্গা পূজার আসরে ইতিহাসের মহাকাল-রূপ দর্শনীয় নহে। ইতিহাসের নামে চিত্রগুপ্তের খাতার এক পৃষ্ঠা নকল করিয়া দিলে উহা হয়ত প্রেতপক্ষে কাহারও প্রয়োজনে লাগিত; কিন্তু দেবীপক্ষে উহা অচল। "আবুল-ফজল" উবাচ, "বদায়ূনী" উবাচ অথবা "লাহোরী" উবাচ গোছের নজীর-প্রমাণ যুক্ত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অবতারণা করিলে পাঠক মনে করিবেন, মোগলাই-মহাভারত পাঠ না করিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠই ভাল ছিল।

এই প্রবন্ধের শিরোনামা পড়িয়া কেহ কেহ হয়ত আশঙ্কা করিয়াছেন কংস-কৃষ্ণ-সংবাদের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা শকুনি-দুর্য্যোধনের চরিত্র-সমালোচনাই আমার উদ্দেশ্য। পুরাণ-মহাভারত কিন্তু আমার ইতিহাস-চর্চ্চার গণ্ডীর বাহিরে; সুতরাং কংস কিংবা মাতুল শকুনি সম্বন্ধে গবেষণা আমার কর্ম্ম নয়। উত্তরাধিকার-সূত্রে আমি পাইয়াছি মোগলাই আমল; অতএব এই আমলের মামা-ভাগিনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১

আমীর তাইমুর—যাঁহার পায়ের খোঁড়া গোড়ালির অস্থি পর্য্যন্ত সম্প্রতি কবর হইতে বাহির হইয়াছে শুনিতেছি—তিনিই ছিলেন মোগল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ। বাবরের মামা উলুঘ বেগ মির্জ্জার কুলজীতে দেখা যায় তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ ছিলেন বিশ্বজয়ী চেঙ্গিস খাঁ। উলুঘ বেগ মির্জ্জা এবং অন্যান্য মোগল-সর্দ্দারগণের গুপ্ত শত্রুতা বাবরের পিতৃরাজ্য ফরগণা হইতে নির্ব্বাসনের অন্যতম কারণ। তবুও বাবর মাতুল-বংশের প্রতি সুদিনে যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুঁর মাতুল-ভাগ্য ভাল ছিল না। ইয়াদ্গার মির্জ্জা হুমায়ুঁর মামা এবং শ্বশুর—ডবল লৌকিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া গুজরাট-সুলতান বাহাদুর শার পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। লোকে বলে "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল"; দুর্ভাগ্যের বিষয়, আকবর বাদশার একজন আপন কাণামামাও ছিল না। হামিদা বানুর এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিল খ্াজা মোয়াজ্জম। মোয়াজ্জম হুমায়ুঁ-রাজত্বের শেষভাগে রাজ-শ্যালক এবং আকবরের রাজ্যারোহণের প্রথম নয় বৎসর পর্য্যন্ত পাগ্‌লা-মামার

* মালকোষের ধ্যান :—

আরক্তবর্ণো ধৃত রক্তযষ্টিঃ
বীরঃ সুবীরেষু কৃত-প্রবীরঃ
বীরৈর্ধৃত—বৈরী কপালমালা
মালামতো মালবকৌশিকেয়ং...

ভূমিকা অভিনয় করিয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। স্ত্রীর খাতিরে হুমায়ুঁ এবং বাদশার ভয়ে দরবারী আমীরগণ মোয়াজ্জমের অনেক মারাত্মক উৎপাত সহ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে হুমায়ুঁ নিরুপায় হইয়া শ্যালককে হজযাত্রার জন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যেও মোয়াজ্জমের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল না, দুনিয়ার যত দুষ্কর্ম্ম মক্কায় থাকিয়া সে কিছুই বাদ দেয় নাই। ভাগিনার রাজ্যারোহণের পর হাজী মোয়াজ্জম সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হইয়া হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে পাগলামির মাত্রাও বাড়িয়া গেল। বৈরাম খাঁর উজীরী আমলে এক দিন বাদশার প্রকাশ্য দরবারে মামা হঠাৎ ক্ষেপিয়া মির্জ্জা আবদুল্লা মোগলকে লাথি ঘুষি মারিতে লাগিল—আবদুল্লার অপরাধ তিনি নাকি মোয়াজ্জমকে পাগল-ক্ষেপার কোন কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। পাগলের বিবাহ করিবার সখ হওয়ায় স্নেহশীলা হামিদা বানু সম্রাট্ হুমায়ুঁর উর্দ্দুবেগী বিবি ফাতেমার কন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী জোহরার সহিত মোয়াজ্জমের বিবাহ দিলেন। বিবাহ পাগলের এবং জরাতুর বৃদ্ধের পক্ষে হেকিমী মতে একটি অব্যর্থ ঔষধ। কিন্তু মোয়াজ্জমের উপর ঔষধের ক্রিয়া স্থায়ী হইল না। কিছু দিন পরে নানা প্রকার কুভাব তাহার মাথায় ঢুকিল এবং প্রত্যহ স্ত্রীকে সে অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এক দিন মোয়াজ্জমের শাশুড়ী বিবি ফাতেমা আকবর বাদশার কাছে নালিশ করিলেন, জামাতা তাঁহার মেয়েকে আগ্রা হইতে অন্যত্র সরাইয়া খুন করিবার মতলব করিয়াছে। ফাতেমার অনুরোধে আকবর মামাকে শাসাইবার জন্য বিশ জন অনুচরসহ যমুনার অপর পারে মোয়াজ্জমের হাবেলীর দিকে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মোয়াজ্জম অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং সদ্যস্নাতা প্রসাধনরতা জোহরার নিষ্পাপ বক্ষে মুহূর্ত্তমধ্যে উন্মত্তের শোণিত-লোলুপ তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল প্রোথিত হইল। ইহার পর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া মোয়াজ্জম বাদশার অগ্রগামী অনুচরদ্বয়কে জানাইল, কাজ শেষ হইয়াছে এবং প্রমাণস্বরূপ রক্তাক্ত ছুরিকাখানি তাহাদের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিল। আকবরের হুকুমে বন্দী মোয়াজ্জমের অবস্থা ভীমের হাতে জয়দ্রথের ন্যায় হইল। কিল চড় লাথি মারিতে মারিতে সম্রাটের অনুচরগণ মামাকে যমুনার ধারে লইয়া গিয়া জলে চুবাইয়া ধরিল। কিন্তু পাগলের শক্ত প্রাণ অনেক বার চুবানি খাইয়াও খাঁচা-ছাড়া হইল না। অবশেষে মোয়াজ্জম শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রেরিত হইল—সেখানেই তাহার প্রাণ ও পাগলামির অবসান হইল (১৫৬৩ খ্রীঃ)। ইতিহাসের পাতায় মামার কুকীর্ত্তি এবং ভাগিনার বজ্রকঠোর ন্যায়দণ্ডের কাহিনী এখনও সজীব। রাজত্বের প্রারম্ভে আকবর যে সমস্ত কার্য্যের দ্বারা প্রজারঞ্জক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, মাতুল-দমন উহার অন্যতম।

বাপ-পিতামহের আমল হইতে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত মুসলমান-মামার অভিজ্ঞতা-তিক্ত আকবর তাঁহার পুত্র-পৌত্রের জন্য হিন্দু-মামার জোগাড় করিয়াছিলেন।

আম্বের-পতি বিহারীমল্লের দৌহিত্র জাহাঙ্গীরের ভগবন্ত দাস, ভগবান দাস প্রভৃতি মামাগণ সকলেই শূরবীর এবং চতুর রাজনীতিবিৎ ছিলেন। কিন্তু পিতৃদ্রোহী সেলিম মাতুল-বংশকে আকবরী আমলের নেকড়ে বাঘ বলিতেন; কেননা তাঁহার শ্যালক আম্বের-রাজ মানসিংহ তাঁহার ভাগিনা শাহজাদা খুসরুকেই আকবরের উত্তরাধিকারী-রূপে দিল্লী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের অপর পুত্র শাহজাদা খুর্রমের মামা যোধপুর-রাজ সুরজসিংহ রাঠোর ভাগিনার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। মিবার এবং দাক্ষিণাত্য অভিযানে সুরজসিংহ শাহজাদা খুর্রমের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই সুরজসিংহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন; তবুও তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বে দিল্লী-সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিল যোধপুরের রাঠোর; সম্রাট্ শাহজাহানের ইঙ্গিতে রাঠোরের লক্ষ তরবারি কোষমুক্ত হইয়া বিনা বিচারে মারাঠা-যুজবেগ্ উভয়ের শোণিতে সমান পরিতৃপ্ত হইত। প্রিয়পুত্র দারা এবং পৌত্র সুলেমান শুকোর উত্তরাধিকার নিষ্কণ্টক করিবার জন্য শাহজাহান তাঁহার পৌত্র সুলেমান শুকোকে রাঠোর অমরসিংহের পুত্রীর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাঠোর-চৌহানের প্রচণ্ড বিক্রম এবং আত্মাহুতি সামুগড়ের যুদ্ধে নিয়তিকে অতিক্রম করিতে পারিল না।

২

ভাগিনা চতুষ্টয়ের ভ্রাতৃ-বিরোধে তাঁহাদের এক মাত্র মাতুল শায়েস্তা খাঁ শাহজাদা আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মামা এবং মাতামহের [ইতিমাদ-উদ্দৌলা আসফ্ খাঁ] সদ্গুণসমূহ একমাত্র আওরঙ্গজেবই পাইয়াছিলেন। রাজধর্ম্মে হৃদয়দৌর্ব্বল্যের স্থান নাই; সদ্য-বৈধব্যগ্রস্তা রোরুদ্যমানা নুরজাহানকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আসফ খাঁ যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই

অমানুষিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন আওরঙ্গজেব; প্রমাণ শাহজাহান ও জাহানারার আগ্রা-দুর্গে আজীবন কারাবাস এবং পুত্র মহম্মদের শোচনীয় পরিণাম। শায়েস্তা খাঁ সুযোগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়িতে বাপ ও ভাগিনার এক ধাপ নীচে ছিলেন; সুতরাং তাঁহার স্বভাবও উভয়ের চেয়ে অনেক মোলায়েম ছিল। মামা ছিলেন পাকা জহুরী; মানুষ এবং হীরা মোতি পান্না সবই ভাল রকম চিনিতেন। ফরাসী-সদাগর তের্ভানিয়ার সাহেব শায়েস্তা খাঁর নিকট হীরা বিক্রী করিতে গিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। মামার চেয়ে ভাগিনা মানুষ বেশী চিনিতেন; কিন্তু জহরত ক্রয় করিবার সময় দাম ঠিক করিবার জন্য বন্দী শাহজাহানের কাছে পাঠাইতেন। মামা-ভাগিনা তাঁহাদের সময়ে সত্যবাদী* এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সচরাচর সাধারণ লোকের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিতেন না; কূটনীতির ধাপ্পা কিংবা সাংবাদিকগণের নিকট বিবৃতি একালের মত মোগলাই আমলেও মিথ্যার পর্য্যায়ে পড়িত না। মামা-ভাগিনা ভীষ্ম-শুকদেবের মত জিতেন্দ্রিয় না হইলেও মধ্যযুগের moralityর মাপে এই প্রশংসা তাঁহারা পাইতে পারেন। দু-একটা হীরাবাঈ উদীপুরী সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের নৈতিক চরিত্র প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের নৈতিক চরিত্র হইতে যে বহু অংশে উন্নত এবং নিষ্কলঙ্ক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মামা শায়েস্তা খাঁও সে-কালের আমীরদের তুলনায় সংযমী পুরুষ ছিলেন; ঘরে বাহিরে তিনি বেগম সাহেবাকে ভয় করিয়া চলিতেন। বেগম সাহেবার এক জন কবিরাজ ছিল; তেভার্নিয়ার সাহেব কবিরাজের কাছে শুনিয়াছিলেন, বেগম সাহেবা (বুজুর্গ উমেদ খাঁর মাতা) ব্যতীত নবাব সাহেবের হারেমে অন্য কোন স্ত্রীর জীবন্ত সন্তান প্রসব করিবার উপায় ছিল না; এ কার্য্যের জন্য কবিরাজ মহাশয়ের আট বার মাত্র ডাক পড়িয়াছিল; শুনা যায়, চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিঃসন্তান সৈদ্ খাঁ খান্-জাহান্ শাহজাহান বাদশার "কোশ্তা" [জারন] সেবন করিয়া এক বৎসর পরে তাঁহার পুত্র-কন্যার সংখ্যা গণিবার জন্য বাদশার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ যুগে শায়েস্তা খাঁকে সংযমী না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

আওরঙ্গজেব এবং শায়েস্তা খাঁ দু-জনেই পাকা নমাজী, রোজাদার এবং পরহেজগার ছিলেন; উভয়েই রণকুশল যোদ্ধা, কূটনীতিজ্ঞ এবং দারার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সুতরাং প্রথম হইতে স্বাভাবিক প্রীতি এবং স্বার্থের আকর্ষণে মামা-ভাগিনার দাড়ির গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। শরিয়ৎ-নিষ্ঠ মাতুল দারার বেশরা অদ্বৈতবাদ [? *Pantheism*] কাফেরী চাল এবং হিন্দুপ্রীতি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার পিতা আসফ খাঁ জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নয়-হাজারী মনসবদার এবং উজীর-ই-আজম্ হইয়াছিলেন; সুতরাং শাহজাহানের সুযোগ্য তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে শাহী তক্তে বসাইতে পারিলে তিনিও ঐ রকম কিছু লাভ করিবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পীড়িত সম্রাট্ শাহজাহানের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাসের ভান করিয়া বাংলা দেশে শুজা এবং গুজরাটে মোরাদ বক্শ রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন মামা-ভাগিনা মালব এবং দাক্ষিণাত্যে বসিয়া কূট-নীতির কপট দ্যূতে শুজা-মোরাদ, দারা-শাহজাহানকে প্রথম বাজিতেই হারাইয়া দিলেন। আওরঙ্গজেব ভাই মোরাদকে লিখিলেন—আমি মক্কা যাত্রার সংকল্প করিয়াছি; কাফের দারার চক্রান্তে ইসলাম বিপন্ন—যাওয়ার পূর্ব্বে আহেল-ই-ইসলামের পক্ষে দীন ও দুনিয়ার হেফাজতি করিবার জন্য তোমাকেই ময়ূর-তক্তে বসাইয়া যাইব। এজন্যই আমার যুদ্ধায়োজন। সরলবিশ্বাসী মোরাদ মনে করিল, দাদা বুঝি সত্য সত্যই দিল্লীর বাদশাহী তাহাকে বকশিশ্ করিয়া জাহাজে চড়িবেন। অন্য দিকে আওরঙ্গজেব চতুর শুজাকে বুঝাইলেন মোরাদ ছেলেমানুষ, তাহার সাহস আছে বুদ্ধি নাই; দারা কুচক্রী কাফের; আপনি বাঁচিয়া থাকিতে শাহী তাজ আমার পক্ষে হারাম—বিশেষতঃ আমি দুনিয়া হইতে ফারেগ হইয়া মক্কাবাসী হইব। শুজা চালাক হইয়াও ঠকিয়া গেলেন। তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন—ভাই বুঝি সত্যই কোহিনূরকে

---

* . . . . the King's uncle, *had the reputation of never to have told a lie* [Tavernier, *Voyages* (1677, London), p. 39.]

শায়েস্তা খাঁ একদিন আওরঙ্গজেবকে বলিয়াছিলেন তিনি এক বৃদ্ধ বানিয়ার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন—যে সারাজীবন মিথ্যা কথা বলে নাই। সম্রাটের আদেশে বৃদ্ধ ৩০।৪০ দিনের রাস্তা সফর করিয়া আগ্রায় বাদশাকে কুর্ণিশ করিতে আসিয়াছিল। আওরঙ্গজেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম? উত্তর—লোকে বলে সত্যবাদী। তোমার বাপের নাম? উত্তর—আলা হজরত, ঐটি আমি বলিতে পারি না।

মামা এবং তাঁহার মক্কেল বানিয়াকে আওরঙ্গজেব জব্দ করিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু নিজেই ঠকিয়া গেলেন। একটি হাতী এবং দশ হাজার টাকা নগদ বানিয়াকে বকশিশ দেওয়া হইল। -[ibid.]

মাটির ঢেলার মত ত্যাগ করিয়া মক্কাশরীফে চলিল; ছেলেবেলা হইতে ভাইয়ের যেরূপ মতিগতি, দুনিয়াদারী ছাড়িয়া ফকীর হওয়া তাহার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নহে; যে-ব্যক্তি সারাজীবন শরাব খাইল না, নাচ দেখিল না, যে গান শুনিলে কানে আঙ্গুল দিয়া তৌবা করে, বাঁদী দেখিলে মুখ ফিরাইয়া থাকে, রাত্রিটাও আরাম-আয়েশে না কাটাইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে তশ্‌বী জপ আরম্ভ করে, দিনের বেলা ফুরসৎ পাইলেই কোরান-শরীফ নকল করিয়া যে ব্যক্তি কফনের পয়সা রোজগার করে, তাহার পক্ষে তক্‌ত্-ই-তাউস্ এবং গাছতলা একই কথা! যাহা হউক্, মামা-ভাগিনার কারসাজী টের পাইয়া শাহজাহান শায়েস্তা খাঁকে হুজুরে তলব করিয়া আগ্রায় নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন; কিন্তু আওরঙ্গজেব কাহারও পরামর্শ কিংবা সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন না—তিনি একাই সওয়া লাখ। তবুও মামা আগ্রায় বসিয়া ভাগিনার মঙ্গলার্থে তশ্‌বী জপ এবং দরবারের গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ করিতে লাগিলেন।

৩

সামুগড়ের যুদ্ধে (২৯শে মে, ১৬৫৮ খ্রীঃ) দারার সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। শাহজাদা দিল্লীর দিকে সে রাত্রে পলাইয়া গেলেন। আগ্রার উপকণ্ঠস্থিত নূর-মঞ্জিল বাগে বিজয়ী আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হইয়া শায়েস্তা খাঁ রাত্রি প্রভাতেই ভাগিনাকে মোবারক-বাদ জানাইলেন। ১১ই জুন তারিখে স্বয়ং জাহানারা বেগম আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দেখা করিয়া পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকারের কথা পাকাপাকি স্থির করিয়া গেলেন। পর-দিন জয়োৎফুল্ল পুত্র বন্দী পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাড়ম্বরে আগ্রা-দুর্গে প্রবেশ করিবেন এমন সময় মামা দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া ভাগিনাকে সংবাদ দিলেন—"সর্ব্বনাশ! মৃত্যুর ফাঁদে পা দিও না। ভীষণ ষড়যন্ত্র! অন্তঃপুরের ভীম-দর্শনা তাতারী প্রতিহারিণিগণ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে।" ভাগিনা সত্যই এ যাত্রা মামার কৃপায় রক্ষা পাইলেন। আগ্রার দুর্গপ্রাকার পুত্র সবলে অধিকার করিল; কিন্তু শাহজাহান আত্ম-সমর্পণ করিলেন না। তাঁহার কষ্টসঞ্চিত বহুমূল্য হীরা-মুক্তা তিনি একটা বোঁচকায় বাঁধিয়া শয়ন-কক্ষ অর্গলবদ্ধ করিলেন; পাশেই একটা হামান্‌দিস্তা! সেখান হইতে পুত্রকে শাসাইলেন—জবরদস্তি করিলে কোহিনূর হামান-দিস্তায় ফেলিয়া ছাতু করিয়া ফেলিবেন; জালিমের জন্য জহরতের এক টুক্‌রাও অবশিষ্ট থাকিবে না।

সামুগড়ের যুদ্ধজয়ের পর আওরঙ্গজেব মোরাদকে "বাদশাজীউ" বলিয়া প্রথমেই সেলাম জানাইয়াছিলেন। দু-ভাইয়ের গলায় গলায় ভাব; মোরাদ দাদাকে পীর জ্ঞান করিয়া "হজরতজী" ছাড়া কথাই বলিতেন না। আগ্রা-দুর্গ অধিকার করিবার পর "হজরতজী" পশ্চিমমুখী না হইয়া উত্তরাপথে দার্‌-উল্-খিলাফৎ হজরত্ দিল্লীর দিকে চলিলেন। দুষ্টলোক তাঁহার মতলব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মোরাদকে ইঙ্গিত করিল—দাদার কিব্‌লার মোড় মক্কা হইতে দিল্লীর দিকে ফিরিয়াছে; সেখানে গিয়া তিনিই তক্তে বসিবেন। কিছু দিন হইতে মোরাদও দাদার কিছু ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন; লুটের মাল ভাগা-ভাগির সময় ঝোলটা তিনি আপন কোলে টানিবার সময় চক্ষুলজ্জা করেন না ইত্যাদি। চতুর আওরঙ্গজেব স্থির করিলেন আর বিলম্ব করা উচিত নয়; বেয়াড়া হাতীকে ধরিবার জন্য মথুরায় তিনি ফাঁদ পাতিলেন। কিন্তু মোরাদ বক্‌শ বহু অনুরোধ এমন কি নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের শিবিরে পা দিলেন না। অবশেষে এক বিশ্বাসঘাতক গোলাম অতর্কিত মুহূর্ত্তে শিকারে পরিশ্রান্ত মোরাদকে ভুলাইয়া আওরঙ্গজেবের শিবিরে লইয়া আসিল। দাদার মেহেমান্-দারীর ঘটা দেখিয়া মোরাদ মুগ্ধ হইলেন; যিনি শরাব কোন দিন স্পর্শ করেন নাই তিনি ছোট ভাইকে খাতির-তোয়াজ্ করিবার জন্য শরাব ও স্নেহের ভরপূর পেয়ালা মোরাদের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টার পর নেশা ও নিদ্রাভঙ্গের পর মোরাদ দেখিলেন সম্মুখে সোনার পা-বেড়ী; আওরঙ্গজেবের সেনাধ্যক্ষ শেখ মীর তাঁহাকে কুর্নিশ করিয়া অনুমতির অপেক্ষায় সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র খেলার ছলে বাপের ইঙ্গিতে চুরি করিয়াছিল। অসহায় মূর্খ মোরাদ কৌশলে বন্দী হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রেরিত হইল; কিন্তু তবুও আওরঙ্গজেব ধর্ম্ম, ন্যায়পরতা, ইসলামের স্বার্থ এবং মোরাদের হিত-কামনার বুলি ছাড়িলেন না—বন্দী মোরাদের কাছে লিখিত পত্রের প্রতি ছত্রে ইহার প্রমাণ আছে। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তিনি অগত্যা নিজেই আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর শাহী তক্তে বসিয়া পড়িলেন, পলায়িত দারার চিন্তায় শুজার কথা তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন! ইসলামের দৃষ্টিতে আকবরী আমলে যে "অধর্ম্মে"র অভ্যুত্থান, এবং "ধর্ম্মে"র গ্লানি আরম্ভ হয়, দারার কার্য্যের ফলে উহা চরমে উঠিয়াছিল; দারা-সরমদের মত "দুষ্কৃত"গণকে বিনাশ এবং মৌলানা আব্দুল-করী ও

শেখ আব্দুল ওহাব শ্রেণীর "সাধুগণে"র পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই স্বয়ং খোদাতালা আওরঙ্গজেবের হাতে রাজদণ্ড দিয়াছিলেন এই সরল এবং অকপট বিশ্বাস শাহান্‌শাহ আলমগীরের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, এবং এ বিশ্বাস লইয়াই তিনি মরিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি মুক্ত পুরুষ। ভাল মন্দ যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন, সমস্তই খোদার মর্জ্জিতেই হইয়াছে—তিনি শুধু নিমিত্ত মাত্র। শিবাজীকে অবতার বলিয়া মানিয়া লইলে আলমগীরের দাবীও অগ্রাহ্য করা যায় না। যাহা হউক, এখন হইতে আমরা ভাগিনাকে বাদ দিয়া মামা শায়েস্তা খাঁর কথাই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

৪

এক বৎসর পরে ২৯শে জুলাই (১৬৫৯ খ্রীঃ) সন্ধ্যাবেলা দিল্লীর দেওয়ান্‌-ই-খাস্‌ প্রাসাদে মাতুল শায়েস্তা খাঁর ডাক পড়িল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দানেশমন্দ খাঁ, মহম্মদ আমিন খাঁ [মীর জুমলার পুত্র], বাহাদুর খাঁ, হেকিম দাউদ এবং কয়েক জন দরবারী উলেমা; সিংহাসনে স্বয়ং বাদশাহ আলমগীর, পর্দ্দার আড়ালে উগ্রচণ্ডা ভগ্নী রৌশন্‌-আরা বেগম। নিয়তির কবলগ্রস্ত বন্দী শাহজাদা দারার বিচারের জন্য সেদিন সন্ধ্যায় তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন। দারা কোন দিন দানেশমন্দ খাঁর উপকার কিংবা রৌশন্‌-আরার অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু দানেশমন্দ খাঁ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন দারা যেন প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। মূর্ত্তিমতী ঈর্ষা রৌশন্‌-আরা পর্দ্দার আড়াল হইতে হুঙ্কার ছাড়িলেন, কাফের দারাকে মরিতেই হইবে। মামা এবং অন্যান্য সকলে শাহজাদীর মতে সায় দিলেন। প্রাণদণ্ড স্থিরীকৃত হওয়ার পর মৌলানারা বা-কায়দা ফতোয়া জারি করিলেন—শরিয়তের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিবার অপরাধে মৃত্যুই বেইমান দারার একমাত্র শাস্তি।

ভাগিনেয়ের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়া আসল কাফের "শিবা"কে দমন করিবার জন্য মামা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিলেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল অর্দ্ধরাত্রের পর মামার কি দশাই ঘটিয়াছিল উহা আমরা বাল্যকালেই কবি নবীনচন্দ্রের "রঙ্গমতী" কাব্যে পড়িয়াছি। এখনও মনে পড়ে—

> পুণা দুর্গে,… নিশীথ নিদ্রায়
> …দস্যুধ্বনি, অস্ত্র ঝনৎকার
> সেনাপতি সায়াখাঁর কক্ষে অকস্মাৎ।
> * * *
> সেনাপতি-পুত্র সহ প্রহরি-নিচয়
> রক্তাক্ত ভূতলে, তীব্র বিক্রমে শিবজী
> আক্রমিছে সেনেশ্বরে, প্রহারিছে অসি ;—
> …বাতায়ন পথে
> মুহূর্ত্তেকে সেনাপতি হ'লো অন্তর্দ্ধান।

কবি মামার বুড়ো আঙুলের কথাটা বোধ হয় জানিতেন না—জানিলে তিনি হয়ত "বিসর্জ্জিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শিবজীর করে" এ রকম একটা কিছু লিখিতেন। এখানে হাল্‌কা গবেষণার কিছু গুঞ্জায়েশ আছে—শায়েস্তা খাঁ ডান হাতের না বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি হারাইয়াছিলেন? স্বয়ং স্যর যদুনাথেরও এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল; সেজন্য তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু লেখেন নাই। মহারাষ্ট্রের ভীষ্মপ্রতিম ঐতিহাসিক রাওবাহাদুর সরদেশাই এ-বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি স্ব-প্রণীত "মারাঠী রিয়াসৎ" ইতিবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন, গোলমালের সময় শায়েস্তা খাঁ একটি "ভালা" [ভল্ল] হাতে লইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। আক্রমণকারীদের মধ্যে এক জন তাঁহার হাতের উপর কোপ মারিতেই ভালাটি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। মামা "সব্যসাচী" ছিলেন না; সুতরাং বাম হাতে ভল্ল চালনা করা অনুমান-সিদ্ধ নহে। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় "ভালা"র সহিত নবাব বাহাদুরের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই ভূতল চুম্বন করিয়াছিল।

পবিত্র রমজান মাসের রাত্রিতে এই উৎপাত ঘটাইয়া শিবাজী মামার অঙ্গহানি অপেক্ষাও গুরুতর ক্ষতি করিয়াছিলেন। শেষ রাত্রের খানা না খাইয়া মোগল-শিবিরে পরের দিন কেহ রোজা রাখিয়াছিল কি না সন্দেহ। আঙুলের কাটা ঘা না শুকাইতেই সকালবেলা মহারাজা যশোবন্ত সিংহ সমবেদনা প্রকাশের ছলে উহার উপর নুনের ছিটা দিতে আসিলেন। শায়েস্তা মোলায়েম মোগলাই কায়দায় বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিলেন—আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম, গত রাত্রে মহারাজের মত বাহাদুর নিমকহালালী করিয়া হয়ত স্বর্গবাসী হইয়াছেন। এই ঘটনার পরে মুসলমান সিপাহী মনসব্‌দার সকলের মনে "শিবাতঙ্ক" জুজুর ভয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল—মামা পুণা হইতে তাঁবু গুটাইয়া আওরঙ্গাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁ সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—"শিবা" আদমের বাচ্চাই নয়—সে একটা জীন্‌-দেও; তাহার শরীর কেবল হাওয়া ও আগুন দিয়াই খোদাতালা বানাইয়াছেন—উহাতে জল মাটি নাই; সে বিশ গজ লাফাইয়া শিকারের ঘাড় ভাঙে, শিবা একটা যাদুকর;

তাহার হাড়ে ভেল্কী খেলে ইত্যাদি। আলমগীর এ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মনে করিলেন মামার ভীমরতি ধরিয়াছে। তিনি সরাসরি আরাম-নিয়ামৎ-বহুল বাঙ্গালার দোজখে যাইবার জন্ম মামাকে হুকুম দিলেন।

৫

নবাব আমীর-উল্‌-উমরা শায়েস্তা খাঁ প্রথম দফে ১৪ বৎসর (জানুয়ারি ১৬৬৪ খ্রীঃ হইতে ১৬৭৭), এবং দ্বিতীয় বার ৯ বৎসর (জানুয়ারি ১৬৮০-১৬৮৮) মোট ২৩ বৎসর সুবে বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। মামার পরমায়ু-হ্রাস করিবার জন্ম ভাগিনা তাঁহাকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে-কালে আসাম এবং বাঙ্গালা দেশ মানুষ-মারা জায়গা ছিল। আসামের কালা-জ্বরের কথা শুনিলেই যেমন বাঙ্গালীর গায়ে জ্বর আসে, তেমনই হিন্দুস্থানের লোকেরা সে-কালে বাঙ্গালা ও আসামের জলবায়ুকে মিঠা-বিষের মত ভয় করিত, এবং এখনও করিয়া থাকে। কারণ নিরীহ বাঙ্গালীর দেশে খুন-অপমৃত্যুর আশঙ্কা না থাকিলেও প্রায় অকালমৃত্যুই ঘটিত। আওরঙ্গজেব এই উদ্দেশ্যেই সন্দেহভাজন অথচ সাহসী এবং সুচতুর মীরজুমলাকে বাঙ্গালা ও আসাম জয় করিবার জন্ম পাঠাইয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ রাজমহল পৌছিবার পূর্ব্বে মীরজুমলা আসামের ব্যারামে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আওরঙ্গজেব দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্ত হইলেন।

নবাব শায়েস্তা খাঁ যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বাঙ্গালার বড়ই দুরবস্থা। শুজার নয় বৎসর শাসনকালের শান্তি ও সম্পদ পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরের অবিরাম গৃহযুদ্ধ, আহম-আক্রমণ এবং মঘ-ফিরিঙ্গী হারমাদের অত্যাচারে অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল। নবাব মীরজুমলা যে সৈন্যদল এবং নৌবাহিনীর সাহায্যে বাঙ্গালা দেশ হইতে শুজাকে বিতাড়িত করিয়া আলমগীর-শাহী আমল কায়েম করিয়াছিলেন, আসাম-অভিযানে উহা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মামার জন্ম ঢাকার মালখানায় কয়েক বস্তা কড়ি এবং চাঁদনী ঘাটে কয়েকখানা ভাঙ্গা নৌকা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নায়েব-নাজিমের পুত্র মোগল-নওয়ারার মীর-বহরকে শহরের নিকট হইতে চাটগাঁর জলদস্যুগণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তখন প্রকৃতপক্ষে মঘের মুল্লুক।*

রাজমহল হইতে ঢাকায় আসিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁ শুনিলেন আরাকান-রাজ নাকি সমস্ত সুবে বাঙ্গালা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেই ফিরিঙ্গী হারমাদদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর দিয়াছেন; এবং এ যাবৎ তাহারা এ মুল্লুক ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। নবাব স্থির করিলেন, মঘ-ফিরিঙ্গীর আড্ডা চট্টগ্রাম অধিকার না করিলে ঢাকাও নিরাপদ নয়। ভাগিনার ভেদনীতি প্রয়োগে মামাও সুনিপুণ ছিলেন। ফিরিঙ্গী হারমাদের সাহায্য ব্যতীত মগদিগকে দমন করা অসম্ভব; সুতরাং তিনি মোটা মাহিনা, নগদ ঘুষ এবং জায়গীরের লোভ দেখাইয়া প্রথমে ফিরিঙ্গীদিগকে হাত করিলেন। মঘেরা ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণফুলীর মোহানার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পর্ত্তুগীস্ নৌ-বাহিনীর আড্ডা দেয়াঙ্গ শহরে ফিরিঙ্গীদিগকে কচুকাটা করিয়াছিল। প্রতিহিংসা ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মোগল-পক্ষে যোগ দিল। শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নৌ-বাহিনী পুনর্গঠন করিলেন। কিছু দিন পরেই তাঁহার আদেশে সন্দীপের বৃদ্ধ রাজা দিলাবরকে পরাজিত করিয়া মোগল নৌ-সেনাপতি আবুলহাসান নবেম্বর মাসে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ স্থান অধিকার করেন। ডিসেম্বর মাসে ৬৫০০ স্থলসৈন্য এবং ২৭৮খানা* জঙ্গী নৌকা নবাবজাদা বুজুর্গ উমেদ খাঁর অধীনে ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া নোয়াখালী পৌছিল। জগদিয়ার নিকট ফেণী নদী অতিক্রম করিয়া ১৪ই জানুয়ারি (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) ফরহাদ খাঁ-চালিত অগ্রগামী সৈন্যদল আরাকান-রাজের রাজ্য আক্রমণ করিল। নৌ-বাহিনী ফেণী নদীর মোহানা মেঘনা হইতে পাড়ি দিয়া ইতিপূর্ব্বেই কুমিরা পৌছিয়াছিল এবং ২১ তারিখে স্থলবাহিনীও ঐ স্থানে তাহাদের সহিত মিলিত হইল। চট্টগ্রাম ও কুমিরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গভীর জঙ্গলে পথ না পাইয়া ফরহাদ খাঁ দিশাহারা হইলেন।

২৩শে জানুয়ারি ইবন হোসেনের অধীনে মোগল নৌ-বাহিনী কুমিরা হইতে পাড়ি দিয়া প্রসিদ্ধ সমুদ্র-স্নানের

---

* বর্গীর ভয় বাঙালীর মন হইতে পলাশীর যুদ্ধের পর তিরোহিত হইলেও চট্টগ্রামের মঘের নামে এখনও অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। চট্টগ্রামে সে কালের মঘ-হারমাদ্ নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই; প্রমাণ স্বয়ং কবি নবীনচন্দ্র; ইংরেজী আমল না হইলে ডেপুটিগিরি ছাড়িয়া তিনিও ডাকাতি করিতেন—"বীরেন্দ্র! দাসত্ব হ'তে দস্যুত্ব উত্তম" তাঁহারই মনোভাব—চটল-প্রকৃতির বাণী।

* আলমগীর-নামা কিংবা শিহাব-উদ্দীন তালিশের গ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলেও এক জন সমসাময়িক ইংরেজ কর্ম্মচারী দিনেমারেরা চট্টগ্রাম-জয়ে নবাবকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—Indian Records Series: Streynsham, Vol. II. p. 41.

তীর্থ কাটুলী [কাঠালিয়া] উপস্থিত হইল। এই স্থানে মঘদের হাল্কা জঙ্গী নৌকার এক ছোট বহর মোগল জঙ্গী জাহাজের মুকাবিলা করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইল। মঘদের বড় বড় জাহাজ হুরলার* (পতেঙ্গা ?) খাড়িতে নঙ্গর ফেলিয়াছিল। বিজয়ী মোগল নৌ-সেনাপতির যুদ্ধাহ্বানে ক্রোধান্ধ মঘ-বাহিনী বাহির-দরিয়ায় আসিয়া লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু দূর হইতে সারারাত্রি কামানের গোলা খরচ করিয়া কোন পক্ষ সুবিধা করিতে পারিল না। পরদিন সকালে মোগল রণতরী-বহর প্রবল বেগে মঘদিগকে আক্রমণ করিল। এবার মঘেরা চালে ভুল করিয়া বসিল। তাহারা কর্ণফুলীর ভিতর না ঢুকিয়া বাহির-দরিয়ায় পলাইয়া গেলে মোগলেরা মঘের লেজও নাগাল পাইত না; অথচ অটুট মঘ-বাহিনী পিছনে রাখিয়া মোগলেরা কর্ণফুলীতে ঢুকিলে বিপন্ন হইয়া পড়িত। যাহা হউক, মোগল নৌ-সেনাপতি মঘদিগকে তাড়া করিতে করিতে বেলা তিনটার সময় (২৪শে জানুয়ারি, ১৬৬৬ খ্রী:) নদীতে প্রবেশ করিয়া চট্টগ্রাম শহর এবং একটি চরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (বর্ত্তমান ডবল মুরিঙের কিনারায় ?) ব্যূহ স্থাপন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিল। এই পর্য্যন্ত শিহাব-উদ্দীন তালিশের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য; কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী কাহিনী স্যর্ যদুনাথ আলমগীর-নামার বিবরণ হইতে অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহা আমাদের কাছে কিছু গোলমেলে মনে হয়। শিহাব-উদ্দীন লিখিয়াছেন, ব্যূহবদ্ধ মোগল রণতরীর উপর ফিরিঙ্গী বন্দরে† স্থিত একটি সুরক্ষিত স্থান হইতে মঘেরা অজস্র কামান-বন্দুকের গোলা বর্ষণ করিয়া মোগল-বাহিনীকে বিব্রত করিতেছিল। এজন্য সেই দিনই মোগল নৌ-সেনাপতি জল স্থল উভয় পার্শ্ব হইতে হামলা করিয়া ফিরিঙ্গী বন্দর দখল করেন। শিহাব-উদ্দীনের মতানুসারে "বন্দর"-বিজয়ে উল্লসিত মোগল নৌ-বাহিনী সেই দিনই চট্টগ্রাম-দুর্গের (অর্থাৎ বর্ত্তমান কাচারী পাহাড়ের নীচে যে দিক্ দিয়া কর্ণফুলী সে যুগে প্রবাহিত হইত) নিম্নস্থ নদীবক্ষে অবস্থিত মঘ-রণতরী-বহরের উপর প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর উহা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে; এবং ১৩৫ খানা জঙ্গী নৌকা মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইহার পর মোগল নৌবাহিনী শহরের কিছু ভাটিতে নঙ্গর ফেলিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে।* শীতকালের বেলা তিনটা এবং চট্টগ্রামের সূর্য্যাস্তের মধ্যে একটি সুরক্ষিত স্থান (বন্দর) দখল এবং একটি বড় রকমের নৌযুদ্ধজয় সম্ভবপর মনে হয় না; বিশেষতঃ জোয়ার-ভাটার বাধা এবং বন্দর হইতে বর্ত্তমান সদর ঘাটের দূরত্বও (জোয়ারের সময় নৌকায় প্রায় ১॥ ঘণ্টার রাস্তা) উপেক্ষণীয় নয়। এক্ষেত্রে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়, ২৪শে জানুয়ারি সকালবেলা মোগল নৌবাহিনী হুরলা কিংবা পতেঙ্গা ঠোটার বাহির-দরিয়ায় মঘদিগকে পরাজিত এবং বন্দর দখল করিয়া ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা শহরের কিছু ভাটিতে নঙ্গর ফেলিয়া মঘ-রণতরী-বহরের পলায়নের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল; এবং পরদিন ২৫শে জানুয়ারি শেষ যুদ্ধে মঘ-বাহিনী ধ্বংস করিয়া বিকালবেলা হইতে স্থলবাহিনীর অগ্রগামী দলের সাহায্যে চট্টগ্রাম-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। ইহা ধরিয়া লইলে শিহাব-উদ্দীন তালিশ এবং আলমগীর-নামার মধ্যে চট্টগ্রাম-জয় সম্বন্ধে সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর হয়।

ফরহাদ খাঁ মোগল স্থলবাহিনীর অগ্রগামী দল সহ ২১শে জানুয়ারি নৌবাহিনীর সহিত কুমিরায় মিলিত হইয়াছিলেন। সেনাপতি নবাবজাদা বুজুর্গ উমেদ খাঁ ঐ দিন কুমিরা হইতে তিন কিংবা আট ক্রোশ দূরে ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর আদেশ ছিল নৌবাহিনী এবং স্থলবাহিনীর বরাবর কাছাকাছি থাকিয়া অগ্রসর হইবে। নৌ-সেনাপতি জাহাজী লস্করদিগকে ডাঙ্গায় নামাইয়া জঙ্গল কাটিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নৌবাহিনীর পরবর্ত্তী লক্ষ্যস্থল ছিল কাঠালিয়া বা বর্ত্তমান কাটুলী; সুতরাং স্থলসৈন্য কুমিরা হইতে সমুদ্রের ধার দিয়া কাটুলী যাওয়ার জন্যই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিল ধরিয়া লইতে হইবে। দুদিন জঙ্গল কাটার পর নৌবাহিনী এবং ফরহাদ খাঁর সৈন্যদল ২১শে জানুয়ারি কাঠালিয়ার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু কুমিরা এবং কাটুলীর মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ফরহাদ খাঁর অগ্রগতি বন্ধ হইল; সম্মুখে গভীর জঙ্গল। এই স্থানে ২৩শে জানুয়ারি রাত্রিবেলা ফরহাদ খাঁ প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন কাটুলীর যুদ্ধে নৌবাহিনী জয়লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি হুকুম হইল তিনি যেন

---

* হুরলা বা এ রকম কোন খাড়ি কুমিরা এবং চট্টগ্রামের মধ্যে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কুমিরা হইতে পাড়ি দিলে পতেঙ্গার ঠোটা [promontory] ঘুরিয়া কর্ণফুলীতে প্রবেশ করিতে হয়। ফার্সি অক্ষরে লেখা "হুরলা"র স্থলে "পতেঙ্গা" পাঠ অসম্ভব। হয়ত সেকালে "হুরলা" নামে কোন জায়গা ছিল।

† বর্ত্তমান বন্দর গ্রাম—দেয়াঙ্গ হইতে ৫৷৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কর্ণফুলীর মোহানায়।

* Sarkar's *History of Aurangzib*, Vol. III, p. 210 ff.

জঙ্গল কাটার জন্ত অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি নৌবহরের সহিত যোগ দেন। এখনকার দিনে কুমিরা হইতে পায়ে হাঁটিয়া লোক এক দিনেই চট্টগ্রাম শহরে কাজকর্ম্ম সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে; অবশ্য রেলের রাস্তা ধরিয়া নয়। কাট্টলীর পূর্ব্ব দিকে বর্ত্তমান কৈবল্য-ধাম পাহাড় এবং ষোলশহরের ভিতর দিয়া যে রাস্তা আছে কুমিরা হইতে উহার দূরত্ব ৬ মাইলের বেশী নয়। সুতরাং এই দুর্গম পথে—তখন অবশ্য রাস্তা ছিল না—ফরহাদ খাঁর পক্ষে পরদিন (২৪শে জানুয়ারি) বিকাল বেলা চট্টগ্রাম-দুর্গের কাছে পৌছা অসম্ভব* নয়। চট্টগ্রাম শহরের আন্দার-কিল্লার পূর্ব্বদিকে হাসপাতাল পাহাড়ের অপর দিকে (পূর্ব্ব) ঘাট-ফরহাদ বেগ নামক প্রসিদ্ধ মহল্লা এখনও বিদ্যমান। ফরহাদ বেগ বোধ হয় এখানেই অগ্রগামী সৈন্যদলসহ ২৪শে জানুয়ারি ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন; ঐ দিন নৌবহর ছিল শহরের কিছু ভাটিতে। সুতরাং জল স্থল কোন দিকেই মঘদের পলাইবার রাস্তা ছিল না। ২৫শে তারিখের যুদ্ধে ফরহাদ খাঁর পক্ষে মোগল নৌ-বাহিনীকে কোন প্রকার সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না; কেন না "ঘাট-ফরহাদ বেগ" কাচারী পাহাড় হইতে নদীর এক মাইল উজানে চাথ্তাই (মোগল) ঘাটের কাছাকাছি জায়গা। সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খাঁ ২৪শে জানুয়ারি কুমিরা হইতে যাত্রা করিয়া ফরহাদ খাঁর এক দিন পরে অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম পৌছিয়া বিজয়ী নৌ-বাহিনীর সহিত একযোগে চট্টগ্রাম অবরোধ করেন। ৩৬ ঘণ্টা অবরোধের পর দুর্গরক্ষী মঘ-সৈন্যাধ্যক্ষ বুজুর্গ উমেদ খাঁর হাতে কেল্লার চাবি সমর্পণ করিয়াছিলেন। শিহাব-উদ্দীন তালিশের মতে মোগল নৌ-সৈন্যই চট্টগ্রাম-দুর্গ জয় করিয়াছিল এবং ২৬শে তারিখ সকালবেলা নৌ-সেনাপতি ইবন হোসেনের কাছেই মঘ-দুর্গাধ্যক্ষ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। স্যর যদুনাথ অনুমান করেন, মোগল স্থলবাহিনী দুর্গ দখলের পরে পৌছিয়া "আল্লা হো আকবর" "নবাব সাহেব কী জয়" চীৎকার, লুটপাট, এবং অগ্নিসংযোগ ছাড়া অন্য কোন কাজ করে নাই।

মোগল-বিজয়ের পর চট্টগ্রামের নামকরণ হইল ইসলামাবাদ—কেন-না আলমগীর বাদশাহ তখন আসমুদ্র-হিমাচল সারা হিন্দুস্থানকে ইসলামাবাদ বা পাকিস্থান করিবার অলীক স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তিনি মামার কাছে লিখিলেন, চাটগাঁর জমার পরিমাণ কি? জমার ঘরে তখন পর্য্যন্ত শূন্য, কিন্তু মামা কৌশলে রসিকতা করিয়া লিখিলেন, তামাম আহেল-ইসলামের দিলের "জমিয়ৎ" [সোয়াস্তি] এই মুলুকের "জমা" [রাজস্ব]। চট্টগ্রাম-বিজয়ের পর বাঙ্গালা দেশের সীমা বৌদ্ধ যুগের রম্যক বা রামু [চট্টগ্রামের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম] পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান মঘের গোলামী হইতে উদ্ধার পাইয়া বিজয়ী নবাবকে আশীর্ব্বাদ করিল। চট্টগ্রামের আন্দর-কিল্লা স্থিত জুম্মা মসজিদ এখনও শায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম-জয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চট্টগ্রামে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহা জুম্মা মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের প্রশস্তির তারিখ এবং নবাব আমীর-উল-উমরা উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে। সুতরাং জনপ্রবাদের কোন ভিত্তি নাই। "মামা-ভাগিনা" প্রবন্ধে চট্টগ্রাম-জয় অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও হাল্কা-গবেষণার লোভ এবং চট্টলজননীর প্রতি নাড়ীর টান বশতঃ উক্ত বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে; জ্ঞানকৃত অপরাধ হয়ত অনেকে মার্জ্জনা করিবেন না।

৬

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে সমস্ত খরচ বাদ থোক্ পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বাদশাহী খাজনাখানায় প্রেরিত হইত। তেভার্নিয়ার সাহেব আগ্রা হইতে ঢাকা আসিবার পথে এক স্থানে (আগ্রা হইতে ৬৪ মাইল পশ্চিমে) দেখিয়াছিলেন, এক শত দশখানা গরুর গাড়ী বোঝাই বাঙ্গালার রাজস্ব আগ্রা চলিয়াছে, প্রত্যেক গাড়ীতে তিন জোড়া বলদ পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকার বোঝা সুদীর্ঘ পথ টানিয়া চলিয়াছে* কিন্তু এই ৫৫,০০০০০ লাখ টাকা ছিল নবাব শায়েস্তা খাঁর সমস্ত খরচ বাদ মাত্র দু-মাসের আয়। সমসাময়িক এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কাশিমবাজার হইতে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে লিখিতেছেন:—...ইনি ১৫ বৎসর (প্রকৃত পক্ষে **বার বৎসর**) যাবৎ বাঙ্গালার নবাব; তাঁহার ন্যায় ধনশালী ব্যক্তির কথা আজকালকার দিনে পৃথিবীতে শুনা যায় না। যাঁহারা এ-দেশের খবর রাখেন তাঁহারা বলেন তিনি ৩৮ কোটী

* স্যর যদুনাথ লিখিয়াছেন, ১৬।১৭ মাইল দুর্গম জঙ্গলের রাস্তা এক দিনে সফর করিয়া ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম পৌছান ফরহাদ খাঁর পক্ষে কিরূপে সম্ভব?

তিনি কুমিরা হইতে এই দূরত্ব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ২৩শে তারিখ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফরহাদ খাঁ অন্ততঃ কুমিরা হইতে দু-মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন; বাকী রাস্তা ৪।৫ মাইল মাত্র। **History of Aurangzib, iii. p. 215.**

* **Tavernier, *Travels in India*, Part II, Book I, p. 51 (London, 1677).**

টাকা বা ৪০,০০,০০০ পাউণ্ডের মালিক। তাঁহার দৈনিক আয় দু-লক্ষ; প্রত্যেক দিন এক লক্ষ টাকার কিছু বেশী খরচ হয়। তবুও অন্য লোক অপেক্ষা তাঁহার অর্থ-গৃধ্নুতাই অধিক। দেওয়ান [রায় নন্দলাল; রাজ্যের মধ্যে ধূর্ত্ত-শিরোমণি] এবং আমিলগণ তাঁহার তহবিলে টাকা আমদানী করিবার জন্য অবিরত এত বিভিন্ন রকম ফন্দী বাহির করিতেছে যে উহা আপনাদের কাছে লিখিয়া শেষ করা যাইবে না; তাহাদের দুষ্টবুদ্ধি ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এই সমস্ত ফন্দি বাস্তবিকই লোককে অবাক করে।* রাজস্ব আদায়ের বেলা তাঁহার দেওয়ান ৮ মাসে বৎসর গণিতেন। কিন্তু অন্যান্য খাতে আয়ের তুলনায় জমির মালগুজারী ছিল তাঁহার আয়ের একটা সামান্য অংশ। মামা অন্যান্য বিষয়ে পাকা মুসলমান হইলেও হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে টাকা দাদন দিয়া সুদ নেওয়া তিনি হালাল বলিয়া গণ্য করিতেন। হুগলীর হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ সুদে ধার দিয়া ছয়-সাত মাসে বৎসর গণিয়া নবাব সাহেব আসল টাকা বার মাসের সম্পূর্ণ সুদ সহ আদায় করিতেন।† ইহা ব্যতীত নবাব সাহেব নিজের নামেও ব্যবসা চালাইতেন। এই সরকারী কারবারের নাম ছিল **সওদা-ই-খাস**; উৎপীড়িত জনসাধারণ ইহাকে **সওদা-ই-খাম্** বা নিন্দনীয় ব্যবসা আখ্যা দিয়াছিল। বাস্তবিকই এটা বেচা-কেনার নামে দস্তুরমত লুট ছাড়া কিছুই নয়। দেশের লাভজনক পণ্যদ্রব্য দিনেমার এবং ইংরেজগণ কর্ত্তৃক আমদানী করা বিলাতী মালের পছন্দসই জিনিসগুলি তিনি নিজ দামে কিনিয়া দেশীয় ব্যবসায়িগণের কাছে নিজের দামেই বেচিতেন। নবাব সাহেবের সঙ্গে দর-কষাকষি কিংবা বেচা-কেনায় ওজর-আপত্তি করিলে কাহারও রক্ষা ছিল না। নবাব শায়েস্তা খাঁ হুগলীর দিনেমারগণের‡ নিকট হইতে কম দরে মাল কিনিয়া শহরের ব্যবসায়িগণকে অত্যন্ত চড়া দামে ঐ সমস্ত পণ্যদ্রব্য সরাসরি কিনিতে বাধ্য করিতেন। হিন্দী জানা থাকিলে বাবা ধরমদাসের সহিত গলা মিলাইয়া নবাব সাহেব হয়ত গান ধরিতেন—

পুঁজী ন টুটে নফা চৌগুনা;
বনিজ কিয়া হম্ ভারী।

একচেটিয়া (monopoly) বাণিজ্যের মঞ্জুরী বেচিয়া আয়-বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে আমাদের মামা রাণী এলিজাবেথকেও এক ছবক্ (পাঠ) পড়াইতে পারিতেন। তাঁহার আমলে জিলার আমিলগণ অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য—এমন কি গরুর বিচালি, বেত, জ্বালানি কাঠ, ঘর-ছানির শন-ঘাস পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইত এবং দেশী-বিদেশী সমস্ত ব্যবসায়িগণের উপর জুলুম করিত। নবাব সাহেব কাগজে কলমে হাসিল আবওয়াব রদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে জুলুমের কোন অভিযোগ হইলে যদি নবাব সাহেব ভুলক্রমে তদন্তের হুকুম দিতেন তাহা হইলে তাহাদের এক কথায় সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইত—"হুজুর! আপনার হক্ (স্বার্থ) মাটি না হয় এজন্যই ত আমরা খবরদারী করিতেছি!" লবণের ব্যবসা সে-কালেও সরকারের একচেটিয়া ছিল। বার্ষিক এক লক্ষ টাকা খাজনায় এক কালা-ফিরিঙ্গী (পর্ত্তুগীস) হুগলী জেলার লবণের ব্যবসা ইজারা লইয়াছিল। যিনি ঢাকায় আট মণ চাউল এক টাকায় বিক্রী হইত বলিয়া অপরিসীম আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন এবং যাঁহার আমলকে আমরা বাঙ্গালায় মুসলমান-যুগের রামরাজ্য বলিয়া জানিতাম, তিনি কি স্বপ্নেও চিন্তা করিতেন গরীব চাষী টাকায় আট মণ চাউল বিক্রী করিয়া ডাল-ভাত দূরের কথা নুন-ভাত* কেমন করিয়া জোগাড় করিত?

মোট কথা, সরকারী ইতিহাস এবং বে-সরকারী মুসলমান ঐতিহাসিক—যথা শিহাবউদ্দীন তালিশের উপর নির্ভর করিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁর চরিত্র এবং নবাবী আমলের ছবি আঁকিলে উহা সঠিক ইতিহাস হইবে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গালার দোজখকে মামা বেহেশ্‌ত্ করিয়া তুলিয়া-ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে স্বর্গ শুধু আমীর-উম্‌রা এবং আলেমগণের ভোগ্য ছিল; প্রজাসাধারণ যে-নরক সে-নরকেই পচিতেছিল। বর্ত্তমানের ন্যায় সেকালেও মূর্খ গরীব প্রজা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সরকার বাহাদুরকে শ্বেত হস্তীর ন্যায় ভক্তি করিত; কিন্তু সাদা কিংবা হলদে হউক আর মেঘবর্ণই হউক ইতিহাস এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সরকারী হাতীর দাঁত বরাবরই দুই প্রস্থ—খানেকা এক, দেখলানেকা আউর।

স্থানাভাব ও সময়াভাব, সুতরাং মামার কাহিনী এই-খানেই শেষ করা গেল।

---

* *The Indian Records,* Master Streynsham, Vol. I, p. 493.

† *Ibid,* Vol. II, p. 80.

‡ *The Indian Records,* Master Streynsham, Vol. I, pp. 53, 81.

* সেকালে নুন-ভাত দুধ-ভাতের মত একটা বড় রকম আশীর্ব্বাদ বলিয়া গণ্য হইত। লবণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত চট্টগ্রামে এখনও সচ্ছল অবস্থাকে "নুনে-ভাতে" থাওয়া বলে। তিন-চার পুরুষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা এবং আসামের গরীব চাষীরা "নুন-ছাই" তৈয়ার করিয়া উহার ঢোয়ান জল দ্বারা লবণের কাজ চালাইত।

খোকা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

খোকাকে আপনাদের মনে থাকিতে পারে, কিছু পূর্বে তাহাকে গৃহদেবতা গোপালের জন্য সঞ্চিত ক্ষীর চুরি করিতে দেখা গিয়াছিল। ছেলেটি এখন আরও একটু বড় হইয়াছে। এখন তাহার মায়ের কোলে তাহার সেই সময়কার বয়সের একটি বোন।

খোকার ধারণা অবশ্য—একটু নয়, সে খুব বড় হইয়াছে। এত বড় যে কত বড় সে নিজেই ঠিক মত ধারণা করিতে পারে না। আন্দাজটা পাকা করিবার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। এ-বিষয়ে তাহার সহায়িকা খুকী। অমন লক্ষ্মী সহায়িকা থাকিলে পরীক্ষার সুবিধাও অনেক। খোকা যখন পাশের বাড়ীর গৃহশিক্ষক নিবারণ পণ্ডিত হইয়া বসে, খুকী পাশের বাড়ীর মন্টুর চেয়েও বেশি দুলিয়া দুলিয়া পড়া করিতে থাকে। দোলন একটু কমিলে নিবারণ পণ্ডিতের মতই খোকা গম্ভীর ভাবে বলে, "খুকু, তোমার বাবাকেও পড়িয়েছি, তোমাকেও পড়াচ্ছি—আমার কাছে ফাঁকি চলবে না! পড়।"···তুমি এইবার এই রকম ক'রে বল—'বাবাকেও পড়িয়েছেন মাষ্টার-মশাই ?—ওরে ব্বাবা'!"

খুকু অতটা পারে না, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করে, বলে, "প'লেছিলে মছাই ? ওলে ব্বাবা!"

খোকা চোখ পাকাইয়া হাত দোলাইয়া বলে, "হুঁ! এই হাতে কত কানমলা খেয়েছে, জিগ্যেস ক'রো না তোমার বাবাকে!···এইবার তুমি আবার এই রকম ক'রে চেয়ে বল—'ওরে ব্বাবা'!"···

বড়র রূপান্তরিত হওয়া ব্যতীত খোকা এক এক সময় নিজেই বড় হইয়া গিয়া বড় বড় কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়—বাবার জুতা পরিয়া, কি কাকার মোটা ডাক্তারী বই লইয়া ঘোরাঘুরি করিতে থাকে, তাহার পর হঠাৎ খেয়াল বদলাইয়া আসল বয়সের খেলার ঝোঁকে বই, জুতা কোথায় থাকে পড়িয়া—যথাস্থানে যথাসময়ে সেগুলার খোঁজ পড়ে—খোকার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে কাকার কিল, বাবার চাপড়, মায়ের গঞ্জনা।

পূজার সময় খোকাকে এখন আর ক্ষীর চুরি করিতে দেখা যায় না। নৈবেদ্য উৎসর্গের সময়টিতে খুকীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কাছটিতে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; বড়র উপযোগী সব উপদেশ দিতে থাকে—"খুকু, তুমি ওটা খাবো মনে করছ নাকি? করতে নেই! নোলায় খবরদার জল আসতে নেই খুকুমণি—ঠাকুর তাহ'লে···"

নিজের নোলা জলে অচল হইয়া পড়ায় বোধ হয় থামিয়া যাইতে হয়।

খুকীর লোভটা অন্যত্র, রসনা আশ্রয় করিয়া ততটা নয়। রংচঙে কাপড়চোপড়-জড়ান মূর্তিটির পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে—"ঠাকুল নোব।"

এবার খোকা একেবারে অকৃত্রিম ভাবে বড় হইয়া পড়ে। খুকীর মুখটা খপ করিয়া চাপিয়া ধরে এবং যাহাতে এত বড় অনুচ্চারণীয় কথাটা ঠাকুরমা বা ঠাকুরের কানে না যায় সেই জন্য খুকীর একেবারে মুখের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া খুব চাপা গলায় বলে—"বলতে নেই খুকু, চুপ কর।"

এমন ভীষণ অন্যায়টা খুকী যাহাতে আবার না করিয়া বসে সেই জন্য তাহার মুখটা চাপিয়া বসিয়া থাকে এবং ঠাকুরমার পূজা সাঙ্গ হইলেই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া ওঠে—"খুকুর কথা শোন ঠাকুমা, বলছিল ঠাকুর নেবে! ঠাকুরকে পুতুল ভেবেছে! এবার ঠাকুর ওকে কি করবেন?"

ঠাকুরমা চারিটি মুঠা ক্ষীরে কলায় ভরিয়া দিতে হাসিয়া বলে—"কিছু করবেন না এবারটি, আমি ব'লে দেব'খন।"

খোকা করুণায় মুখ-চোখ কুঞ্চিত করিয়া ঠাকুরমার পানে চাহিয়া বলে—"হ্যাঁ ঠাকুমা, ব'লে দিও; কচি মেয়ে বলে ফেলেছে একটা কথা—ওর তো জ্ঞান হয় নি এখনও তত।"···

ঠাকুরমার সঙ্গে কথাবার্তায় ঠাকুর যদি তাহার কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, সেই জন্য খোকা আগে থাকিতেই সাবধান হইয়া প্রশ্ন করে—"আমি কখন বলেছি ঠাকুমা?"

২

না, খোকা বলিবে কি করিয়া? তাহার পক্ষে তো বলা সম্ভবই নয়। সে যদি খুকুর মত না জানিত তবে তো বলিত? সে যে জানে ওটা পুতুল নয়, গোপাল। অবশ্য

গোপালকে ঠাকুর ভাবিতে ওর এক এক সময় কি রকম মনে হয়—মনকে ভয় দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়া মনে করাইতে হয়; কিন্তু ওটা যে রথযাত্রায় পাঁচুর মার দোকানের পুতুল নয়, এটা খোকা ঠিক জানে। এটা যে গোপাল তাহার একটা মস্ত বড় প্রমাণ এই যে, দিনমানে এটা পুতুল হইয়া থাকে। এই যে লুকোচুরি এইটিই গোপালের পরিচয়—গোপালের স্বরূপ। এ-পরিচয় খোকার জানা আছে—অবশ্য কথাটা খোকা আর গোপালের মধ্যে একটা গোপন রহস্য।··· ঠাকুরমা রাত্রে বৃন্দাবনের গল্প করিতে করিতে যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন হইতে আরম্ভ হয় গোপালের লুকাচুরির এই খেলা। আরম্ভটা খোকা ঠিক ধরিতে পারে না। খুব চেষ্টা করে তবে এখন পর্য্যন্ত পারে নাই ধরিতে।

গল্প বলিতে বলিতে ঠাকুরমা ঘুমাইয়া পড়িলে গোপাল আসিয়া তাহার খুব নরম হাতে খোকার চক্ষু দুইটি টিপিয়া ধরে—নীচের এই গোপালই, কিন্তু কেমন করিয়া ওর পাথরের হাত অমন ঘুমের মত নরম হইয়া যায় খোকা ঠিক বুঝিতে পারে না। গোপাল যখন ছাড়িয়া দেয় চোখ, তখন খোকা দেখে সে একেবারে তাদের খেলার জায়গায় —বিছানায় তাহার ঠাকুরমার পাশে আর শুইয়া নাই। সেখানে তালপুকুরের মত কালো-জলে-ভরা যমুনার ধারে কদমগাছের আড়ালে আড়ালে তাহাদের লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে। তাহাদের বাড়ীর মুংলীর মত অনেক গরু, বুধীর মত অনেক বাছুর—তাহাদের হাম্বারবের সঙ্গে গোপালের বাঁশীর শব্দ খেলায় ভরা যমুনার তীরে যেন ছুটা-ছুটি করিয়া ফেরে। ঠাকুরমা যে গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়ে সব সেই রকম—সুদাম আছে, শ্রীদাম আছে, বলাই আছে, সুবল আছে—আরও কত সব আছে। গোপাল সকালে ঠাকুরমার কাছে পূজায়-পাওয়া ক্ষীর সব বিলি করে—যতই বিলি করে, ফুরায় না। কি করিয়া যে ফুরায় না খোকা এক এক দিন জিজ্ঞাসা করে।

ঘরের মধ্যে পূজার সময় গোপালের দিকে চাহিতে ভয় করে বটে, কেন না, গোপাল একদৃষ্টে ঠাকুরমার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে; কিন্তু যমুনার তীরে খেলার সময় গোপালকে তো মোটেই ভয় করে না—তাহা হইলে তো ওদের নন্দকেও ভয় করিত। না, পূজার গোপাল যখন খেলার গোপাল হইয়া যায় তখন করে না ভয়, তাই খোকা করে জিজ্ঞাসা এক এক দিন, বলে, "তুমি এত ক্ষীর সব পাও কোথায়? ঠাকুমা তো তোমায় একটুখানি করে দেন।"

গোপাল বলে, "পৃথিবীতে যত মা আর যত ঠাকুমা যত ক্ষীর সর লুকিয়ে রাখে আমি সব খুঁজে নিয়ে আসতে পারি।" যত ছেলেরা খেলে সবাই দুষ্টামির হাসি হাসিতে থাকে। খোকা চোখ বড় বড় করিয়া গোপালের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু কথাটা খোকার একটুও মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, কেন না, ঠাকুরমাও তো খোকাকে এই কথা বলিয়াছে কয়েক বার। খোকা জিজ্ঞাসা করে, "তারা কেউ কিছু বলে না তোমায়?" ঘরের ঠাকুরের হাতে যেখানটায় বালা পরান আছে, যমুনাতীরের গোপাল সেইখানটা খোকার সামনে বাড়াইয়া ধরিয়া বলে, "এই দেখ না দাগ, মা বেঁধেছিল" ··খোকা দেখে একটুও মিছে কথা নয়, কড়া-বাঁধা রাঙা দাগে হাতটা ফুলিয়া গিয়াছে,··· আবার লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে—অবাধ খেলা—কাহারই বাবা, কি কাকা কাছে নাই যে ধমক দিবে, এমন কি মা কি ঠাকুরমাও নাই যে মুখের ঘাম মুছিয়া—কি গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া খেলার মধ্যে বিরতি আনিবে।

রোজ, প্রত্যহ গোপাল আসিয়া যখন থেকে চোখ টিপিয়া ছাড়িয়া দেয় এই খেলা আরম্ভ হয়—শেষ হয় যমুনাতীরের সন্ধ্যাবেলায় সূর্য্য ভোরবেলায় যখন খোকাদের ঘরের সামনে নন্তদের অশথগাছের পাতায় পাতায় রঙের ছিটে ছড়াইতে থাকে।·

খুকী ভাবে ঠাকুর পুতুল। কচি মেয়ে—ভাবুক; কিন্তু খোকা জানে ঠাকুর কে; খোকা জানে ঠাকুরের হাতের বালার নীচে তাঁর মায়ের বাঁধনের রাঙা দাগ আছে। ঠাকুরমাও বলে—আছে। খোকা যেমন ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছে, ঠিক তেমনই করিয়া গোপাল বলে, "এ দাগ আমার সোনার বালার চেয়ে ভাল লাগে।"—খোকা ঠিক বোঝে না কথাটা—বাঁধনের দাগ কেন লাগিবে ভাল?

গোপাল পাথরের গোপাল হইয়া লুকায়, যখন যমুনাতীরের গোপাল হইয়া যায়, মায়ের বাঁধনের রাঙা দাগ মেলিয়া ধরে।

এক এক দিন পূজার সময় প্রসাদের জন্য বসিয়া বসিয়া খোকা এই লুকোচুরির ঠাকুরের চোখের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার যেন এক একবার মনে হয় কালো পাথরের ওপর টানা সাদা চোখে কি একটা হয়—মনে হয় একটা দুষ্টু হাসি চোখের কোণে আস্তে আস্তে ঢুকিয়া পড়িয়া গোপালের সমস্ত মুখটাতে ছড়াইয়া পড়ে। প্রায় কথা কওয়ার মত কি এক ধরণের হাসি, কত দিনের চেনা—যমুনাতীরের কত কি সব যেন চারি ধারে ওঠে জাগিয়া।

আবার সব মিলাইয়া যায় ;—হাসি, বাঁশি, সুদামভাই, ফোটাফুলে ভরা কদমগাছ, পেখমধরা ময়ূর—সব। খোকা ঠাকুরের চোখের দিকে চাহিয়া খোঁজে, যত খোঁজে ততই আরও পায় না ; ভাবে ঠাকুরমার গোপালের হাসিটি পর্য্যন্ত কি লুকোচুরিই না জানে !—ভয়ানক আশ্চর্য্য বোধ হয় খোকার।

৩

আজ কয়েক দিন হইতে সমস্ত বাড়ীটি বড় বিষণ্ণ হইয়া আছে। ঠিক এ-ধরণের অভিজ্ঞতা খোকার জীবনে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বাবা ডাকিয়া আদর করিতেছে না, খোকাকে তো নয়ই, এমন কি খুকীকে পর্য্যন্ত নয়। কাকা বই হারাইলে আগে মারিত, তাহার পর আদর করিত ; বেশী মারিলে খেলনা পর্য্যন্ত কিনিয়া দিত এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও ঘটিয়াছে কয়েক বার। আজ দুই দিন হইতে বই কোথায় আছে তাহারই খোঁজ করে না। খোকার মনটা এক একবার যেন কান্নায় ভরিয়া ওঠে, শুধু কি লইয়া কাঁদিবে বুঝিতে পারে না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে। আজ সকালে বাবা কোথায় গেল। আগে যখন কোথাও যাইত, খোকাকে খুকীকে চুমা খাইয়া যাইত ; আজ ঠাকুরমাকে আর কাকাকে কি বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। খোকার ঠোঁট ফুলিয়া যাইতেছিল বলিয়া কপাটের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বাবা তো ডাকিলও না একবার।

ওদিকে মায়েরও অসুখ। কাকা বলে খুব শীঘ্র ভাল হইয়া খোকাকে আর খুকুকে আদর করিবে বলিয়া খুব ঘুমায়। কাকা ঘুম ভাঙাইতে বারণ করিয়াছে খোকাকে। খোকা কখনও তো মাকে জ্বালাতন করে না খুকীর মত। বড়রা কখনও মাকে জ্বালাতন করে? …কিন্তু মাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মনটা যে ছটফট করিতেছে।

খোকা দিনগুলাকে আবার সেই পুরানো খাতে চালাইবার জন্য নিজেই একবার ওপরপড়া হইয়া চেষ্টা করিল। কাকার সবচেয়ে মোটা ডাক্তারী বইটা কাঁধের ওপর সাপটাইয়া লইয়া কাকার ঘরের দরজার পাশে গিয়া দু-একবার উঁকি মারিল, তাহার পর প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করিয়া চৌকাঠ ডিঙাইয়া বলিল, "কাকা, কি দুষ্টু খুকু!—তোমার বইটা লুকিয়ে রেখেছিল, ভাগ্যিস আমি…"

কাকা ফিরিয়া চাহিতে খোকা দেখিল, কাকার চোখ জলে ভরা! কাকাকে তো কেহ মারে নাই, তবে?… খোকার মনটা কি রকম হইয়া উঠিল। কাকা যদি বলিত—'খোকা, তোমারই কাণ্ড বই লুকুন'—তাহার পর যদি চিরাচরিত পদ্ধতিমত একটা চাপড় বসাইয়া দিত, খোকা রাজী ছিল—তাহার পর আদর না করিলেও তাহার দুঃখ ছিল না। চোখে জল দেখিয়া সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। এ দৃশ্য সে কখনও দেখে নাই,—বড়রা কাঁদিবে কেন? কে তাহাদের মারে?

বইটা আস্তে আস্তে কোন রকমে এক জায়গায় রাখিয়া দিয়া খোকা চোরের মত গা লুকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার মনটাতে কি রকম একটা হইতেছে—কেমন একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব—খোকা চাহে না কেহ তাহাকে এ-অবস্থায় দেখিয়া ফেলে—কাকা, ঠাকুরমা, কেহই নয়, এমন কি খুকী পর্য্যন্ত নয়। তাহার পর আবার কি হইল খোকা বুঝিতে পারিল না—তবে এই না-মার খাওয়া, না-বকুনি খাওয়ার অপমানে খোকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কাকা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে কোলে জড়াইয়া মুখ নীচু করিয়া প্রশ্ন করিল, "খোকা, তুই কাঁদছিস? কেন রে? মার জন্যে মন কেমন করছে? মাকে তো গোপাল ভাল ক'রে দেবেন, কান্না কিসের? চল্ দিকিন, সারদার দোকান থেকে তোকে নতুন একটা খেলনা কিনে দিই…"

মায়ের নামে খোকার মনের সেই কেমন-কেমন ভাবটা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। আবার অন্য দিক দিয়া সে যেন একটা কূল পাইল—কিছু বুঝিতে পারিতেছে না অথচ যে একটা কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তাহার জায়গায় মাকে লইয়া দুঃখ, অভিমান—খোকা যেন একটা আশ্রয় পাইল। মা'র সে তত ভক্ত নয়, ঠাকুরমা আর কাকা লইয়াই তাহার জীবন, তবু খোকা ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"মা'র কাছে যাব আমি…"

ভাল করিয়া প্রকাশ্যে কাঁদিয়া বাঁচিল যেন।

কাকা বলিল, "নিশ্চয় যাবি, বাঃ যাবি নি!…তোর মা এখন ঘুমুচ্চে খোকা, যেই উঠবে তোকে নিয়ে যাব। ততক্ষণ খেলনা নিয়ে আসি গে চল।…খুকুর জন্যে কি খেলনা নিবি খোকা?…খুকুকে যে বড্ড ভালবাসে খোকা আমাদের ; দাদা হয়, বাসবে না?—বা রে!"

খোকার আর কান্না নাই, তবে চোখে জল আছে এবং কান্নার বিরামে এক-একবার ফুঁপাইয়া উঠিতেছে। বলিল, "খুকু ভারি দুষ্টু—মা'র মুনা খা'ব বলে।"

"হ্যাঁ, খুকু ভা—রি দুষ্টু, মাকে ঘুমোতে দেবে না,

খালি বলবে মুনা খাব। কৈ খোকা তো বলে না··· খোকাকে খুব বড় খেলনা দিতে হবে। চল, কিনে নিয়ে আসি।"

নামিয়া উঠান দিয়া যাইবে। ওদিককার ঘর থেকে ঠাকুরমা বাহির হইয়া আসিলেন, ডাকিলেন, "বড়খোকা, কোথায় যাচ্ছিস ওকে নিয়ে? এদিকে আয়।"

খোকা হওয়ার পর খোকার কাকা বড়খোকা হইয়াছে, কতকটা শঙ্কিত ভাবে মার পানে চাহিয়া খোকাকে লইয়া অগ্রসর হইল। কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছে বৌদি? আবার বাড়ল নাকি?"

মা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "বুঝছি না। খোকাকে দেখতে চাইচে, আয় নিয়ে একবার বাছা, কোন দোষ হবে না।"

ছেলে একটু ভাবিল। ডাক্তার বলিয়া গেছেন, ছেলেমেয়েকে দূরে দূরে রাখিতে একটু—কাছে থাকিলে ভাবাবেগে মুমূর্ষু রোগিণীর আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা আছে।··অথচ যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন অভাবের বেদনাও তো কম আশঙ্কার বিষয় নয়।

সে মাত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বৌদির সঙ্কটের কথা শুনিয়া আজ তিন দিন আসিয়াছে। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার করুণাবাবু মহকুমায় গিয়া কি করিয়া আটকাইয়া গিয়াছেন, কাল রাত্রে আসিবার কথা ছিল, আজ এখন পর্য্যন্ত আসেন নাই, এদিকে রোগিণীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডাক্তার আসে না দেখিয়া দাদা নিজে আজ সকালে মহকুমায় গিয়াছে, করুণাবাবু না আসিতে পারেন, অন্য ডাক্তার লইয়া আসিবে। বড়খোকা একলা অকূল পাথারে পড়িয়াছে।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, একটু দাঁড়াও মা, বুকটা একবার দেখে নিই।"

ঘর হইতে ষ্টেথস্কোপটা আনিয়া রোগিণীর ঘরে প্রবেশ করিল। একটু পরে বাহির হইয়া আসিল—মুখটা খুব বিষণ্ণ।

মা চক্ষু মুছিয়া পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না।

বড়খোকা খোকার হাতটা ধরিয়া বলিল, "চল্ খোকা, মা'র তোর ঘুম ভেঙেছে।"

খোকা আজ দু-দিন পরে মা'র কাছে আসিল। ঘরের বাতাসটার মধ্যে কি একটা আছে, খোকার বড় ভয় করিতেছে। মাকে এ রকম কখনও দেখে নাই, এত রোগা···পরশুও তো মা'র অসুখ ছিল, দাওয়ার রোদে বসিয়া তাহাকে গল্প বলিয়াছে, খুকুর পুতুলকে কাপড় পরাইয়া দিয়াছে। মাকে দেখিয়া ভয় করে আজ···

মা ইসারা করিয়া খোকাকে ডাকিল। খোকা পা উঠাইতে পারিল না, ঠাকুরমা'র কাপড়টা খামচাইয়া ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠাকুরমা এক হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "চল দাদু, মা ডাকছে।"

কতকটা জোর করিয়াই খোকাকে তুলিয়া খাটের ওপর মা'র কাছে বসাইয়া দিল। খোকার এমন বিচিত্র অনুভূতি জীবনে কখনও হয় নাই, ভয়ে লজ্জায়, আরও সব কিসে-কিসে সে জড়সড়, মায়ের দিক্ থেকে মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল।···মা আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে, চোখ দিয়া আস্তে আস্তে জল গড়াইয়া পড়িতেছে···অনেকক্ষণ পরে—প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, এই রকম আওয়াজে বলিল—"কেঁদ না যেন, সোনা আমার।"

ঠাকুরমা কোলে করিয়া নামাইয়া লইয়া বাহিরে আসিল। কাকা ঘরেই রহিয়া গেল।

৪

একটা অব্যক্ত ভয় যেন খোকার অন্তরে অন্তরে ছাইয়া ফেলিল। খোকা অসুখ কাহাকে বলে—জানে। অসুখে লেপ মুড়ি দিয়া কাঁপে লোকে, সাবু খায়, কাজ না করিয়া দাওয়ার রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর গোপাল ভাল করিয়া দেন—দু-দিন পরে রুটি খায়, তাহার পর ভাত। খোকার কাছে অসুখের এই স্বরূপ বিশেষ অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ এটা কি? গোপাল এখনও ভাল করিয়া দেন নি কেন?···এর পরের অবস্থাটা খোকার অভিজ্ঞতার একেবারেই বাহিরে—চিন্তার মধ্যেই আসিল না···তবে অন্য সব নানান রকম প্রশ্ন—বিশেষ করিয়া গোপালের এই নিশ্চিন্ততা তাহার সমস্ত চিন্তাকে জুড়িয়া তাহার মনটা ভার করিয়া রাখিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনা;—মা'র কত কষ্ট হইতেছে। না, মা ভাল হইয়া যাক,—এ-মাকে দেখিলে ভয় হয় —মিছি মিছি কান্না আসে, বড় কষ্ট হয়···

মাকে দেখার পর হইতে সমস্ত বিকালটা খোকা খুব শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হইয়া রহিল, সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সে বায়না ধরিল।

বায়নার কোন হিসাব নাই। আরম্ভ করিল মা'র কাছে যাইবে বলিয়া, সন্ধ্যার সময় রোগিণী আরও নিঝুম

হইয়া পড়িয়াছে, কাকা বলিল, "একটু থাম্ খোকা, আবার তোকে যাব নিয়ে···খোকা গিয়ে মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে, তাইতেই তো ওর মা ভাল হয়ে যাবে।··· খোকা, তুমি বড় হয়েছ, দাদার চেয়েও বড় খোকা, খোকাই তো বাড়ীর কর্তা এখন। কই, খোকা তোর মাকে ডাক্তার হয়ে দেখছি—টাকা দে···।"

রহস্যটা করিয়া কাকা হাসিয়া উঠিল, খোকা কিন্তু যোগ দিল না। তিনটা আঙুল মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "মার কাছে যাব।"

কাকা অশেষ প্রকারে খোকাকে বড়, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মী প্রতিপন্ন করিল, কত রকমের প্রলোভন দিল; সব কথার শেষেই খোকার ওই একটি কথা—"মার কাছে যাব।"

আব্দার যখন কান্নায় দাঁড়াইল খোকাকে বাহিরে লইয়া যাইতে হইল, এবং সেখানে বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, কাকাকে হার মানিয়া রাজি হইতে হইল। খোকা বলিল, "না, যাব না, আগে কেন নিয়ে যাও নি।"···কত সাধ্যসাধনা, ওদিকে মাও একবার দেখিতে চাহিয়াছে—কোন মতেই যাইবে না খোকা—তাহাকে আগে কেন লইয়া যাওয়া হয় নাই?··· মা ছাড়িয়া জিদটা দাঁড়াইল খাওয়া লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গেই না-খাওয়া লইয়া—আরও যত রকমের সব আদাড়ে জিদ। কোল মানে না, শাসন মানে না—কাকা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল···।

রোগিণীর কাছ থেকে উঠিবার জো নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরমাকে উঠিয়া আসিতেই হইল। বলিলেন, "তুই বোস্ গিয়ে বড়খোকা বৌমার কাছে, আমি আসি একটু সামলে ওকে।"···যতীন এ-গাড়িতেও এল না··· আজকের রাতটা···"

নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া আঁচলে চক্ষু দুইটা মুছিয়া বলিলেন, "শ্রীহরি শ্রীহরি···এস তো দাদু, আজ অত আব্দার করতে আছে? মাকে তাহ'লে গোপাল ভাল ক'রে দেবেন কি ক'রে?"

ঠাকুরমার কাছে আসিয়া খোকা অল্পক্ষণেই শান্ত হইয়া গেল। বধূ অসুখে পড়া পর্য্যন্ত নবীনের মা রান্না করিয়া দিতেছে। ভাত লইয়া কত গল্পের সহযোগে নাতিকে খাওয়াইয়া ঠাকুরমা বিছানায় উঠিলেন। নবীনের মা'র মেয়ে খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া শোওয়াইয়া গিয়াছে, এক দিকে নাতনী আর এক দিকে নাতিকে লইয়া ঠাকুরমা শুইলেন। তাহার পর গল্প আরম্ভ হইল।

"গোপালকে ক্ষীর নাড়ু দিও না ঠাকুমা, আগে মাকে ভাল ক'রে দিন···কি করছেন গোপাল, ঠাকুমা? তুমি বলেছিলে গোপালকে ঠাকুমা?"

"বলেছিলাম বইকি দাদু, আজ থেকে বলছি? কতবার বলেছি—তোমাদের ভালয় ভালয় রেখে যেন যেতে পারি। কতবার বলেছি—ঠাকুর, আমার তো হ'ল ঢের, এবার ডেকে নাও আমায়। তা কাকে ডাকতে কার ডাক পড়ল···"

কান্নাটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

খোকা ঠিক বুঝিতেছে না—প্রশ্ন করিল, "কেন ডাকবেন ঠাকুমা?—খেলবার জন্যে?"

ঠাকুরমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ঘুমো দাদু একটু তাড়াতাড়ি আজ। মনটা তোর মা'র কাছে পড়ে রয়েছে।"

খোকা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল একটু, কিন্তু গোপালের আচরণ লইয়া মনে অজস্র প্রশ্ন যাওয়া-আসা করিতেছে, ঘুম আসিবার পথই বন্ধ। একটু পরে ধীরে ধীরে ডাকিল, "ঠাকুমা।"

ঠাকুরমা বোধ হয় নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, বলিল, "ঘুমোস্ নি এখনও? এই দেখ!"

খোকা তাহার দুর্ভাবনার একটা যেন সমাধান পাইয়াছে অনেক ভাবিয়া; বলিল, "তোমার কথা গোপাল বোধ হয় শুনতে পান নি।"

ঠাকুরমা বলিল, "হবে," তাহার পর উদ্গত অশ্রুর সঙ্গে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "তিনি সব শোনেন, শুধু আমার কথাই শুনতে পান না কেন দাদু—কি দোষ করেছি আমি?"

এ তো আরও গুরুতর সমস্যা। খোকা আরও ভাবিল, তাহার পর বলিল, "বোধ হয় বাঁশী বাজাচ্ছিলেন, ঠাকুমা।"

ঠাকুরমা বলিল, "ঠিক ধরেছিস দাদু তুই, ওঁর বাঁশীই হয়েছে কাল। ঘরে ঘরে আগুন লেগে যাচ্ছে এত লোকের হাহাকার কান্না ওঁর কানে যায় না। চাষের মাঠ ফেটে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে, গেরস্তর গোলায় ধান নেই, অত সাধের ধেনু তাঁর—তারাও এক মুঠো খড় পায় না। এদিকে নাড়ীছেঁড়া ধন শ্মশানে দিয়ে আসছে—ঘরের লক্ষ্মী সোনার প্রতিমে বিদায় দিতে বসেছি—এত দুঃখ, এত হাহাকার তাঁর কানে যায় না। বাঁশী নিয়েই তিনি বিভোর। থাকুন, কিন্তু আমায় আর এত দগ্ধাচ্ছেন কেন দাদু?"

কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ দু-জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় ঠাকুরমা প্রশ্ন করিল, "ঘুমোলি দাদু?"

খোকা বলিল, "ঠাকুমা, বাঁশী ভেঙে দেবে? কুটিলা যেমন দিয়েছিল।"

এত দুঃখেও ঠাকুরমার মুখে হাসি আসিয়া পড়িল, না ঘুমাইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া নাতি একটা মতলব ঠাহর করিয়াছে বটে। বলিলেন, "তাই হবে'খন; তুই এখন ঘুমো দাদু একটু। পিদ্দিমটাও নিবে আসছে।"

চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খোকার কিন্তু আজ অনেক সমস্যা—গোপালের এই এত ব্যাপারের মধ্যে বাঁশী বাজানোর ব্যাপারটা তাহার অধিকতর দুর্বোধ্য এবং ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ খেলার সময় খুব রাগিয়া গোপালকে বলিবে সে।

অনেকক্ষণ কাটিল—অন্য বারের চেয়েও কিছু বেশীক্ষণ—তাহার পর খোকা আস্তে আস্তে ডাকিল, "ঠাকুমা।"

"কি রে ডাকাত? দেখ ত কাণ্ড!"

"আমি ঘুমুচ্ছি কিনা জিগ্যেস করলে না?"

"তুই তো জেগে রয়েছিস্ দেখছি।"

"এইবার ঘুমুব। সত্যি, তুমি চোখে হাত দিয়ে দেখো..."

ঠাকুরমা খানিকক্ষণ পরে ডাকিয়া সাড়া পাইল না। কিন্তু কি ভাবিয়া একবার চোখে হাত দিয়া বুঝিল, খুব জোরে চোখ বুজিয়া থাকিবার জন্য খোকার নাক মুখ সব কুঁচকাইয়া রহিয়াছে এবং চোখের পাতা একটু একটু কাঁপিতেছে। হার মানিয়া বলিল, "এই তোমার ঘুম? তবে থাক শুয়ে তুমি—নবীনের মাকে ডেকে দিই। আর তোমার সঙ্গে গল্প করলে আমার চলবে না।"

৫

সমস্ত রাত বধূকে লইয়া মাতাপুত্রে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। পুত্র প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভ্রাতৃজায়াকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের অসম্পূর্ণ ডাক্তারী বিদ্যায় যতটা কুলায় চেষ্টা করিয়াছে—মা করিয়াছে অতন্দ্রিত প্রার্থনা—গোপালের কাছে—"হে ঠাকুর বাঁশী ছাড়, ফিরিয়ে দাও আমার সোনার কমল—ছাড় বাঁশী একদিনের তরেও, নইলে শিশুর মুখেও তো দুর্নাম র'য়ে যাবে চিরদিনের জন্যে..."

রোগিণীর অবস্থা ঠিক বোঝা যাইতেছে না। ভোরের একটু আগে একবার খোকা আর খুকীকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তুলিয়া দু-জনকেই দেখান হইল। তাহার পর হইতে আরও নিঝুম হইয়া রহিয়াছে।

ভোর হইয়া গেছে। বড়খোকা নিজের ঘর হইতে একটু যেন ব্যস্ত হইয়া আসিল। রোগিণীর বিছানার এদিক ওদিক, বালিসের নীচে কি একটা খুঁজিতে লাগিল উদ্বিগ্ন ভাবে। মা প্রশ্ন করিতে বলিল, "ষ্টেথস্কোপটা পাচ্ছি না,—একটু আগে বৌদির বুকটা দেখে নিয়ে গেলাম ওঘরে—"

মা প্রশ্ন করিল, "নেই?"

"না—একবার বুকটা দেখতে হবে যে! বেশ মনে পড়ছে নিয়ে গিয়ে বাইরে চেয়ারের হাতলটায় রেখে মুখটুক ধোয়া সেরে নিতে গেলাম। আধ ঘণ্টাও হয় নি, ফিরে এসে দেখি!..."

পাড়ায় হনুমানের উপদ্রব, কি যে হইয়াছে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। মায়ের হাতটা বধূর মাথার উপর জপে নিরত ছিল, উগ্র নিরাশায় টানিয়া লইয়া বলিলেন, "সব নাও ঠাকুর, চিকিচ্ছের সান্ত্বনাটুকুও আর রেখ না—"

চোখে অঞ্চল দিয়া বধূর শিয়র হইতে নামিয়া কতকটা জোরেই কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় বাহিরে কড়া-নাড়ার শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলের গলার আওয়াজ—"মা বড়খোকা!"

বড়খোকা তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দাদা আর করুণা ডাক্তার। দাদা শুধু প্রশ্ন করিল, "আছে?"

করুণা ডাক্তার গিয়া রোগিণীর পাশে বসিল। শান্ত প্রকৃতির লোক, ধীরে ধীরে হাতটা তুলিয়া লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ীটা পরীক্ষা করিল, তাহার পর "হু—" করিয়া ধীরে ধীরে একটা শব্দ করিয়া বড়খোকার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দিয়েছিলে?"

"খুব খারাপ অবস্থা দেখে একটু মকরধ্বজ..."

ডাক্তার রোগীর দিকে চাহিয়া ভেতর পকেটে হাত দিয়া একটু থমকিয়া গেল, বলিল, "হু, ঠিক ফেলে এসেছি, যতীন যা তাড়া দিলে, দেখি তোমার ষ্টেথস্কোপটা।"

বড়খোকার মুখটা একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "সেটা পাচ্ছি না, বাইরে রেখেছিলাম, বোধ হয় হনুমানে..."

মা একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও করুণা, তুমি ওকে রাখতে পারবে না বাবা, গোপালই আজ বিমুখ আমার ওপর—সব পথ বন্ধ করে..."

ডাক্তার বৃদ্ধার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "চুপ্ কর খুড়ী। বড়খোকা তুমি একবার ছোট আমার ওখানে সাইকেলটা নিয়ে। আর যতীন তুমি দেখ ভাল ক'রে খুঁজে...হনুমানেরা এখন ঘুমুচ্ছে, ষ্টেথস্কোপের লোভে কেউ ঘুম ছেড়ে উঠবে না।"

হারাইলে লোকের প্রকৃতিই হইতেছে, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাতেই খোঁজে। সম্ভবপর জায়গায় গেল না পাওয়া, তখন অসম্ভব জায়গায় খোঁজ পড়িল এবং গেল পাওয়া।

পূজার ঘরটা একটু ওদিকে একটেরে। দেখা গেল—ঘরের দুয়ারটা খোলা এবং চৌকাঠের সামনে একটা কাঠের চেয়ারের উপর একটা বেতের মোড়া বসান। স্বভাবতই একটু কৌতূহল হয়।

ঘরের মধ্যে গিয়া যতীন যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—

ঠাকুরের হাতে রূপার ডাণ্টির ছোট বাঁশীটা নাই, নীচে দুই খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে!

শুধু তাহাই নয়, বাঁশীর জায়গায় দুই হাতের আঙুল দিয়া গলান একটা ষ্টেথস্কোপ।…ঠাকুরের সাদা সাদা চোখের নির্ব্বিকার দৃষ্টি শূন্যে চাহিয়া আছে।

হাত পা ধুইয়া রাত্রের কাপড় ছাড়িয়া ষ্টেথস্কোপটি গোপালের হাত হইতে সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। ততক্ষণে বড় খোকাও ওদিক হইতে ডাক্তারের নিজের ষ্টেথস্কোপ লইয়া সাইকেল হইতে নামিল।

ডাক্তার সব শুনিল। নিজের ভাল ষ্টেথস্কোপটাই হাতে করিয়াছিল, একবার কি ভাবিল।…সমস্ত গ্রামটাই বৈষ্ণব-প্রধান।…ধীরে ধীরে ফিরাইয়া দিয়া যতীনকে বলিল, "দাও, তোমারটাই দেখি।"

ভাল করিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া একটা শান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "মকরধ্বজটা কাজ করছে। হার্টের এক্শনটাও ভাল।—কই, গোপালের শাসকটি কোথায় লুকুলেন?"

আর্ট ও জীবন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অনেকে বলেন, সাহিত্যের সঙ্গে নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এ কথা অবশ্যই সত্য যে সাহিত্যিককে আমরা পাদ্রী সাহেবের কোঠায় ফেলতে পারি নে। কবি, নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিক সত্যকেই প্রকাশ করেন সুন্দরের মধ্য দিয়ে। সুন্দরকে আশ্রয় ক'রে সত্য যেখানে আপনাকে প্রকাশ করে সেখানে তার দাম অনেক বেড়ে যায়। যেখানে সুন্দর নেই, কেবল সত্য আছে—সেখানে সত্য অতি সাধারণ ছেঁদো কথা হয়ে দাঁড়ায়। 'সদা সত্য কথা বলিবে'—এ রকম নীতিকথা আমাদের চিত্তে কদাচিৎ রেখাপাত করে। কবি যখন মহাকাব্যে সত্যনিষ্ঠার আদর্শকে রসলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দেন তখন সেই আদর্শ যুগ যুগ ধ'রে অসংখ্য মানুষের জীবনকে শাসন ক'রে চলে। আমাদের প্রাণ যে সুন্দরের কাঙাল! সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে সুন্দরের মূল্য যে অনেক কমে যায়—এ কথা বলাই বাহুল্য।

খুব উঁচুদরের আর্টিস্টরা নীতির নামে সমাজের যে-সব বিধিনিষেধ চলে আসছে তাদের সবাইকে স্বীকার যে করেন নি, এ কথা সত্য। নীতির মুখোস প'রে এই সব বিধি-নিষেধ মানুষের আত্মাকে অনেক সময়ে পঙ্গু ক'রে রাখে। এই পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে মানুষের আত্মপ্রকাশের পথকে সুগম ক'রে দেবার জন্য বড়ো বড়ো সাহিত্যিকেরা সমাজের প্রচলিত নীতির আদর্শকে আঘাত দিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন নি। ফলে সোরগোল উঠেছে বিস্তর। নীতি-বাগীশেরা রব তুলেছে, সমাজ জাহান্নমে গেল। নূতন আদর্শের স্রষ্টারা কালাপাহাড় ব'লে নিন্দিত হয়েছে। এই নিন্দা শেলীর ভাগ্যে জুটেছে, ইবসেনের এবং তদীয় শিষ্য বার্ণার্ড শ'এর ভাগ্যে জুটেছে, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছে। দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগে এঁরা সবাই হয়েছেন অভিযুক্ত।

কিন্তু যে কথা বলবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। আর্টের মুকুরে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। আর্ট জীবনের criticism, ম্যাথু আর্নল্ডের এই সংজ্ঞায় অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। জীবনের সংস্পর্শে এসে আমাদের আত্মা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সাহিত্যে

তারই রসময় প্রকাশ। আর জীবন আমাদিগকে কি শেখায়? জীবন শেখায়, বর্ব্বর বাসনায় যে আনন্দ তার মধ্যে স্থায়িত্ব নেই। পোকা-লাগা দাঁতের মতো তারা আমাদের আনন্দকে কেবল নষ্টই করে। তারা আমাদের বাঁধে আর সেই বন্ধনের মধ্যে আমাদের রুগ্ন আত্মা শুধু দুঃখের পর দুঃখ পায়। তাদের পাল্লায় পড়লে আমাদের ব্যবহারের সঙ্গে উন্মাদের ব্যবহারের কোনো তফাৎ থাকে না। আমাদের হিতাহিত বোধ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, দৃষ্টিতে আবিলতা আসে। টলস্টয়ের অথবা বঙ্কিমের মতো প্রথিতযশা লেখকদের রচনায় দেখতে পাই, উদ্দাম বাসনার ফেনিল তরঙ্গে ভেসে গিয়ে মানুষ দুঃসহ মানসিক যাতনা ভোগ করছে। অনুতপ্ত শৈবলিনীর বেদনা কি মর্ম্মন্তুদ! রোহিণীর হত্যাকারী গোবিন্দলাল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পশ্চাত্তাপের তুষানলে দগ্ধ হয়েছে। এ্যানা কেরেনিনা বেদনা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে রেলগাড়ীর তলায় জীবন দিয়েছে। টলস্টয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র পাদ্রীসাহেব ছিলেন না—তাঁরা আর্টিস্টই ছিলেন। গোবিন্দলালের অথবা এ্যানা কেরেনিনার কাহিনী জীবন থেকেই তাঁরা আহরণ করেছিলেন। এ্যানা আত্মহত্যা করেছে—আর্টিস্টের কোনো উদ্দেশ্যকে সফল করবার তাগিদে নয়; বাসনার উদ্দাম স্রোতে ভেসে গিয়ে আপনার জীবনে এমন একটা পরিস্থিতি সে ঘটিয়ে বসেছে যেখানে আত্মহত্যা ছাড়া তার পক্ষে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনো পথ্ মুক্ত ছিল না। টলস্টয়ের অথবা বঙ্কিমের লেখার পিছনে আদর্শ প্রচারের যে কোনো আগ্রহ ছিল না, এমন কথা বলছি নে। কিন্তু সেটা গৌণ। তাঁরা জীবনের ছবিই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন আর জীবন আমাদিগকে যা শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষাই তাঁদের উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে।

রোমা রল্যাঁর বিখ্যাত উপন্যাস জ্যাঁ ক্রিস্তফে নায়ক ক্রিস্তফ তার বন্ধুপত্নী Annaর সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। কামনার উদ্দাম বন্যায় দু'জনেই ভেসে গেল। শুরু হ'ল গোপনে গোপনে ব্যভিচারের পঙ্কিল পালা। কিন্তু সুখ পেল না দু'জনের একজনও। দু-জনেই ভাবতে লাগল আত্মহত্যার পথে বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা। ক্রিস্তফ অবশেষে পালালো। কিন্তু পালিয়েও নিস্তার নেই। বাসনার দুর্ব্বার টানে রাতের অন্ধকারে প্রণয়িনীর দ্বারে আবার সে মন্ত্রাবিষ্টের মতো ফিরে এল। সে যেন যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকা। নিজের উপরে নিজের একটুও জোর নেই। প্রণয়িনীর দরজার হাতলে হাত দিয়ে সে যখন ভিতরে ঢুকতে যাবে—হঠাৎ তার তন্দ্রা ভেঙে গেলো। সে এ কি করতে যাচ্ছে! মুহূর্ত্তের মধ্যে সব জিনিসটা তার সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিলো। জড়তা কাটিয়ে সে সোজা দৌড় দিলে দেয়ালের দিকে। তার পর দেয়াল টপকিয়ে পলায়ন করলো। আর ফিরলো না। ক্রিস্তফ যে পালিয়ে গেল—কেন? কারণ ভোগের বন্ধনের মধ্যে তার মন একটুও আনন্দ পাচ্ছিল না। না পালিয়ে তার কোনো উপায়ান্তর ছিল না।

রল্যাঁর *The Soul Enchanted*এর নায়িকা এ্যানেত্ (Annette) যৌবনের শেষ ধাপে পা দিয়েছে। এমন সময় উদ্দাম বাসনার ধাক্কায় স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলে সে এক জন চিকিৎসকের প্রেমে পড়লো। চিকিৎসক আবার বিবাহিত; ঘরে তার পত্নী আছে। এ্যানেতের জীবনে সুরু হ'ল আপনার সঙ্গে আপনার নিষ্ঠুর সংগ্রাম। প্রেমকে সে ঠেলতেও পারে না, প্রেমকে সে বইতেও পারে না। দেহ যখন পরপুরুষের সঙ্গকে কামনা করছে—আত্মা তখন আপনাকে মিথ্যার কলুষ থেকে মুক্ত রাখবার জন্য প্রেমাস্পদকে দূরে ঠেলে রাখতে চাইছে। এ্যানেতের অবস্থা সাপের ছুঁচো গেলার মতো। অবশেষে সে পালিয়ে গেল শহরের বাইরে একটা বাগানবাড়ীতে। বাসনার বন্ধন শিথিল হয়ে এল। দু-মাস ধ'রে এ্যানেতের চোখের উপরে জেগে ছিল দুরন্ত কামনার একটা রক্ত পর্দ্দা। সেই পর্দ্দা জীবন্ত জগতকে আড়ালে রেখে দিয়েছিল। পর্দ্দা যখন স'রে গেল, বাসনার রাহুগ্রাস থেকে নায়িকার শৃঙ্খলিত চিত্ত যখন মুক্তি পেল, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বাঁচল। গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি আবার তার কানে এল, গাছে গাছে পাখীরা ডাকছিল—তাদের গান সে শুনতে পেল, সুন্দরী পৃথিবীর রূপ তার চোখে পড়ল। এত দিন নিজের ছেলেকে পর্য্যন্ত তার মনে পড়ে নি। এর মধ্যে হঠাৎ এক দিন ফিলিপ্ এসে পড়ল মোটর নিয়ে। ফিলিপ্ তার প্রণয়ীর নাম। দূর থেকে তাকে চিনতে পেরেই এ্যানেত্ বেড়ার পাশে লুকালো। সর্ব্বনাশ! আবার যদি শুরু হয় গোপনে গোপনে প্রেমের সেই পঙ্কিল পালা—আপনার সঙ্গে আপনার নিষ্করুণ যুদ্ধ—তবে দুঃখ রাখবার আর ঠাঁই থাকবে না। নায়িকা মাটি আঁকড়ে চুপ ক'রে প'ড়ে থাকল। নিজেকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না। রক্ত বলে 'যাই' 'যাই', বুদ্ধি বলে 'না'। অবশেষে সে শুনতে পেলে মোটর চলে গেল। ছুটে এসে এ্যানেত্ চীৎকার ক'রে ডাকে, 'ফিলিপ্'! প্রণয়ী তখন অনেক দূরে চলে গেছে। এ্যানেতের জীবনের এই কাহিনী ক্রিস্তফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্রিস্তফের

জীবনেও নিজের সঙ্গে নিজেরই চলেছে সুকঠিন সংগ্রাম। ক্রিস্তফও শেষ পর্য্যন্ত পালিয়ে চরম মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

রলঁ্যার উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার জীবনের এই যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—এর মধ্যে লালসাকে জাগিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই। এই সব বর্ণনা পড়লে রলঁ্যা যে Sunday School-এর এক জন উপদেষ্টা—এমন কথাও মনে হয় না। মনে হয় শুধু একটা কথা। ভোগের বন্ধনের মধ্যে মানুষের আত্মার চরম তৃপ্তি নেই। তৃপ্তিই যদি থাক্‌বে তবে মুক্তির জন্য ক্রিস্তফও পালাতো না, এ্যানেতও পালাতো না। ব্যভিচারের পঙ্কিলতার মধ্যে দিব্যি তারা আনন্দে ডুবে থাকতো যেমন ক'রে পঙ্কিল জলের মধ্যে মোষ ডুবে থাকে। কিন্তু A spark disturbs our clod; সেই জন্যই ভোগের বন্ধনের মধ্যে দুঃসহ ক্লান্তিতে আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে। আমাদের চিত্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকে দূরের নীলাভ দিগন্ত। বিপুলতর জ্ঞান, বিপুলতর প্রেম এবং বিপুলতর শক্তির মধ্যে আমাদের প্রাণ চায় মুক্তির প্রাচুর্য্যকে আস্বাদন করতে। যাকে আমরা Evolution বলি সে হচ্ছে এই অন্তহীন জ্ঞান, শক্তি আর প্রেমের আদর্শের দিকে মানুষের পথিক-চিত্তের চিরন্তন অভিসার। মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ কেবল একটা জায়গায়—মানুষ জ্ঞানের পথে, প্রেমের পথে, শক্তির পথে জানোয়ারকে পিছনে রেখে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। মুক্তির জন্য মানুষের অন্তরে এই কান্না রয়েছে ব'লেই সে সুখকে আঁকড়ে ব'সে নেই। একটা গভীর অতৃপ্তি তাকে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে কেবলই চালিয়ে নিয়ে চলেছে। এই অতৃপ্তিকেই লক্ষ্য ক'রে ব্রাউনিং লিখেছেন, Each sting that bids nor sit nor stand but go! রলঁ্যার নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পূর্ণতার জন্য এই ব্যাকুলতাকেই আমরা আবিষ্কার করি। তারা সবাই চলমান জীব—জীবনের চাঞ্চল্য তাদের শিরায় শিরায়। পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটছে তাদের জীবনে—কিন্তু তাকে চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার মতো মানুষ তারা নয়। ব্রাউনিং আর রলঁ্যা—একই উপাদানে দু'জনেই তৈরী। দু-জনেরই মন্ত্র বীর্য্যের মন্ত্র। দু-জনেই মানুষকে ডেকেছেন কঠিনের পথে বাধাকে ঠেলে ঠেলে আপনাকে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ গরিমার মধ্যে অবারিত করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথকেও কি আমরা এই দলেই ফেল্‌তে পারি নে?

ইন্দ্রিয়ের স্থূল আনন্দের মধ্যে চিত্তের যে চরম তৃপ্তি নেই—এই গভীর সত্য আর এক জন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকের শক্তিশালী লেখনীকে আশ্রয় ক'রে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমি বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক Flaubert-এর মাদাম বুভারের (Madam Bovary) কথা বলছি। জুনের *Modern Review*-তে দেখলাম, হিন্দীতে 'অভিসারিকা' নাম দিয়ে এই বইখানির অনুবাদ বেরিয়েছে। মাদাম বুভারের অভিসারিকার জীবন শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তির দুঃসহ ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। ব্যভিচারের মধ্যে আনন্দ কোথায়? স্বামীকে ক্রমাগত বঞ্চনা ক'রে পরপুরুষের পিছনে ছুটে ছুটে অবশেষে সে কি লাভ করলো? অসহনীয় আত্মগ্লানি, নিজের প্রতি নিজের নিদারুণ ঘৃণা। বিবাহিত জীবনে যে শূন্যতা সে অনুভব করেছে ব্যভিচারের মধ্যেও তাই। In adultery Emma was finding all the platitude of marriage. সুখ কর্পূরের মতো উবে গেছে। আনন্দ দেখা দিয়েছে অভিশাপ হ'য়ে; ভোগ পর্য্যবসিত হয়েছে ক্লান্তিতে; হাসি মিলিয়ে গেছে একটা অসহনীয় অবসাদকে পিছনে রেখে; অধরে চুম্বনের স্পর্শ একটা বিপুলতর আনন্দের জন্য রক্তে জাগিয়ে দিয়েছে পিপাসার দাহ। নায়িকার মনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখছেন,

> Everything, even herself, was now unbearable to her. She wished that, taking wings like a bird, she could fly somewhere, far away to regions of purity, and there grow young again.

কুমারী-জীবনের সেই নির্ম্মলতার জন্য অভিসারিকার চিত্তে আকুলতার অন্ত নেই। তার ব্যাকুল হৃদয় কেবলই কেঁদেছে জীবনের নিষ্কলঙ্ক দিনগুলিতে ফিরে যাবার জন্য। সে জীবনে ফিরে যাওয়া তখন অসম্ভব। নিয়তির দুশ্চ্ছেদ্য জালে এমা তখন বন্দিনী। আত্মহত্যা ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ তার সামনে খোলা ছিল না। অভাগিনী বিষ খেয়ে দুঃসহ যাতনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলো।

সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের (Sinclair Lewis) Babbit, Main Street প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতেও আমরা মানুষের ক্লান্তহৃদয়ের কান্নাকেই শুনতে পাই। আকাশ-ছোঁয়া বিরাট্ বিরাট্ অট্টালিকায় সভ্যতার সহস্র উপকরণের মধ্যে মানুষের শৃঙ্খলিত আত্মা কাঁদছে মুক্তির জন্য। ডলারের মধ্যে, ফোর্ডের মোটর গাড়ীর মধ্যে ব্যাবিটের আত্মা তার তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না। আমেরিকায় ভোগের কারাগারে বন্দীমানুষের ক্লান্ত আত্মার এই দুর্গতির ছবি আঁকতে গিয়ে লুইস লিখেছেন,

> A savourless people, gulping tasteless food, and

sitting afterward, coatless and thoughtless, in rocking chairs prickly with innane decorations, listening to mechanical music, saying mechanical things about the excellence of Ford automobiles, and viewing themselves as the greatest race of the world.

মানুষের অন্তরের দারিদ্র্যের কি নগ্ন কুৎসিত ছবি!

পৃথিবীর বড়ো বড়ো ঔপন্যাসিকদের লেখায় যে সত্যের সন্ধান মেলে তার মধ্যে দেহের ক্ষুধাকে খুব লোভনীয় ক'রে দেখানো হয়েছে ব'লে তো মনে করি নে। এই সব ঔপন্যাসিকদের লেখায় বৈরাগ্যসাধনের খুব মহিমাকীর্ত্তন আছে—এমন মনে করবারও কোনো কারণ নেই। জীবনকে তাঁরা মোটেই অস্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন নি, নাক টিপে সবাই প্রাণায়াম করতে লেগে যাও—কারণ জীবনটা নিশার স্বপনের মতোই অলীক। বরং জীবনের জয়গানই তাঁদের লেখা থেকে উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু জীবনকে স্বীকার করা মানে কামনার পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে থাকা নয়। তাকে ভাল ক'রে ভোগ করতে পারে তারাই যারা স্থূল-আনন্দের পিছনে কাঙালের দীন মন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না, যারা চিন্তাশক্তির গভীর অনুশীলন করেছে, যারা আপনাদের চেতনাকে সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে পেরেছে। গভীর ভাবে ভাবতে এবং অনুভব করতে যারা না শিখেছে তাদের কাছে জীবনের আনন্দরস অনাস্বাদিত থাকতে বাধ্য। সত্যকে অনুসরণ করবার যে আনন্দ—সে আনন্দ তরুণীর পিছু পিছু ছুটে তরুণ যে আনন্দ পায় তার চেয়ে কোনো অংশে কম তো নয়ই, বরং বেশী। নারী এক দিন বাহুর মধ্যে ধরা দেয়, তাকে ভালোবেসে এক দিন ক্লান্তি আসে। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব নয়। সে আমাদের কাছে কখনো নিঃশেষে ধরা দেয় না। জ্ঞানের তো শেষ নেই। কত মাস, কত বৎসর অতীতে মিলিয়ে যায়, কালো চুলে পাক ধরে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে তবুও জ্ঞানসমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড আমরা কুড়াতেই থাকি, সত্যকে অনুসরণ করবার পালা আর শেষ হয় না! হাতছানি দিয়ে সে আমাদিগকে ক্রমাগতই ডাকতে থাকে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে। জ্ঞানকে লক্ষ্য ক'রে চিত্তের এই যে অভিসারের আনন্দ—ব্রাউনিং-এর A Grammarian's Funeral শীর্ষক বিখ্যাত কবিতায় তার চমৎকার অভিব্যক্তি। আমাদের চারিদিকে যে অন্তহীন জীবন-সিন্ধু তরঙ্গিত হচ্ছে—তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনার মধ্যে ডুবে থাকাতে আনন্দ নেই। পৃথিবীতে আনন্দকে পেতে হ'লে নিখিলের সঙ্গে এক হয়ে যেতেই হবে, চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে সকলের মধ্যে। জ্ঞানের এবং প্রেমের নিঃসীমতার মধ্যে চিত্তের এই যে মুক্তি, এ মুক্তির মধ্যেই আমাদের যথার্থ আনন্দ। চতুরঙ্গে এই তত্ত্বকেই অপরূপ ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শচীশের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,

"তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ।"

খুব উঁচুদরের আর্টিস্ট যাঁরা তাঁদের দৃষ্টি জীবনের মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। তাকে বাহিরের চাকচিক্য দিয়ে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সেই দৃষ্টি এমন অন্তর্ভেদী বলেই সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য্য। দৃষ্টি না হ'লে সৃষ্টি হয় না। বড়ো বড়ো সাহিত্যিকেরা জীবনকে এই অনন্য-সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন বলেই তাঁদের রচনায় বল্গাহীন বর্ব্বর-বাসনার জয়গান নেই। দৃষ্টি যাদের স্বচ্ছ নয়, জীবনকে দেখেছে যারা ভাসা-ভাসা ভাবে তারাই প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে লোভনীয় ক'রে দেখায়।

সুন্দরের কোল

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

সুন্দরের কোল—
মৃত্যুরে দিতেছে নিত্য আনন্দের দোল;
মৃত্যুভয়ে ভীত লোক, মৃত্যু সর্ব্বজিৎ
কাঁপায় সে এ সৃষ্টির আনন্দের ভিৎ
মুহুর্মুহু, কেহ তারে বাঁধিতে না পারে
চঞ্চল গতিতে মৃত্যু ফিরে এ সংসারে।

সুন্দর তোমার কোলে নব সৃষ্টি রস
মৃত্যুরে করিয়া রাখে সুন্দরের বশ;-
শুকাইছে তৃণদল, ঝরাইছে ফুল
নব তৃণে পুষ্পে পুনঃ সৃষ্টি ঢুলঢুল,
সুন্দর আনন্দে ভব নূতনের জয়,
সুন্দরের কোলে ঘটে মৃত্যুর প্রলয়।

নির্ভীকতার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য-জগতের সর্ব্বশক্তিমান! কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, 'সর্ব্বশক্তিমান' একমাত্র ভগবানেরই বিশেষণ। Almighty যার ইংরেজী। রক্তমাংসের দেহধারী জরামৃত্যুধর্ম্মী মানুষকে এই বিশেষণ দান করা অপরাধজনক; এবং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে এতে অপমান করা হয়। কিন্তু আমি বলবো, তা বলায় কোন দোষ হয় না। মানুষ চিরদিন ধরেই রক্তমাংসের উপাদান নিয়ে তৈরি হয়েছিল, এখনও হচ্ছে। অথচ সেই পুরাকালে পুরাতন ঋষিবর্গ, যাঁদের আজও আমরা সত্যদ্রষ্টা ও মন্ত্রদ্রষ্টা ব'লে গৌরব জানাই; যাঁদের কথার নজির দিয়ে প্রামাণ্য বাক্যকে আমরা আজও বেদবাক্য বলে থাকি; তাঁরাই আমাদের এ অধিকার দিয়ে স্পর্দ্ধিত করে গেছেন। উপনিষদ বহু স্থলে এবং বহুভাবেই, জগতে অপূর্ব্বতম আবিষ্কার আত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব স্বীকার ক'রে গেছেন। বলেছেন,—"ভূতে ভূতে সর্ব্ব নিবসন্তি গূঢ়া"।

বলেছেন;—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,"

এই বাক্যে তিনি মৃত্যুধর্ম্মী মানবকে অমরত্ব প্রদান ক'রে তাকে মৃত্যুঞ্জয় আখ্যা দিয়েছেন।

দার্শনিকশ্রেষ্ঠ আদি শঙ্করাচার্য্যও তাঁর সমগ্র গ্রন্থমালার মধ্য দিয়া এই পরম সত্যকে সুপ্রমাণিত এবং সুপ্রচারিত ক'রে রেখেছেন। তিনি একদা বলেছেন;—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং নশোকভাক্
সচ্চিদানন্দ রূপোহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্।"

অন্যত্র বলেছেন, "ব্রহ্মতত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি"। রবীন্দ্রনাথে যদি সর্ব্বশক্তিমত্তার আরোপ করি, তা'তে দূষ্য কিছুই নেই! সর্ব্বশক্তিমানের অংশ সবার মধ্যেই তো রয়েছে। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁর সর্ব্বশক্তিমৎ স্বরূপ সুপরিব্যাপ্ত কল্পার্ণবের মতই তাহা সমস্ত বিশ্বজগৎকে সমাচ্ছন্ন ক'রে আছে। কিন্তু যেমন গীতাকার শ্রীভগবান্ বলেছেন;—

"বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।"

যদুকুলে কৃষ্ণরূপ দেহ ধারণ করে ব্রহ্মবিদ্যা দান, অর্জ্জুন রূপে অন্যান্য বহুতর গুণের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ, বেদব্যাসে বেদ সঙ্কলন, ভাগবত, মহাভারতাদি পুরাণ রচনা প্রভৃতি এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের রচয়িতাত্ব, আর উশনা বা শুক্রাচার্য্য নামক কবি-বিশেষে শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য এই সব জন্য তাঁদের মধ্যে ভগবানের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। আবার তিনিই বলেছেন, "জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্"। জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নেই, তাই জ্ঞানই ভগবানের বিশেষ বিভূতি। রবীন্দ্রনাথে আমরা একাদিক্রমে শ্রীভগবানের বহুতর উচ্চ বিভূতিসমূহের একত্র-সমাবেশ দেখতে পাই। বিদ্যাবুদ্ধিতে সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর-কুলেও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সব্যসাচীর মত তাঁরও এক সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের অপূর্ব্ব পরিচালনা-শক্তি ছিল। কাব্যে, দর্শনে, নীতি ও রাজনীতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কলাশাস্ত্রে কোনখানেই তাঁর মধ্যে অপূর্ণতার আরোপ করা যায় না। প্রত্যেক বিষয়েই তাঁকে সেই সেই বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে, নিতান্ত অজ্ঞ ভিন্ন কেহই অস্বীকার করতে পারবে না। তাই তাঁর সর্ব্বতোমুখী অপরাজেয় শক্তি লক্ষ্য ক'রে, আজ ব'লে নয়, বহু কাল থেকেই আমার মনে হয়েছে, তিনি যেন সাহিত্যজগতের সর্ব্বশক্তিমান!

যদিও সাহিত্যজগতেই তাঁর প্রধানতঃ স্থান বটে, তথাপি এও এক পরম বিস্ময়, কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, চিত্রকলাবিদ্, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষকতাকার্য্যে একনিষ্ঠতাসম্পন্ন ছাত্র-সমাজের গুরুদেব একাধারে একসঙ্গে তিনি সবই। নিজের অবশ্য সে সৌভাগ্য হয় নি, শুনেছি তাঁর শিক্ষকতা নাকি এক অপূর্ব্ব বস্তু। তা' এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তুচ্ছ বস্তুর উদ্ভব যে সম্ভবই হ'তে পারে না। যে কাজে হাত দিয়েছেন, কিশোর-বালক হ'তে আরম্ভ ক'রে অশীতিপরবৃদ্ধত্ব পর্য্যন্ত কোন্ কাজটাই বা তাঁর দ্বারা কোন্‌কালে অসুন্দর অসমাপ্ত, অপরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন হ'তে পেরেছে? প্রথম কবিতা হ'তে শেষ কবিতাটি পর্য্যন্ত সমান শক্তিমত্তার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করছে। স্বদেশী মেলা থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীনিকেতন পর্য্যন্ত, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্" থেকে আরম্ভ ক'রে;—

"যার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা,
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহা মানবের
সাগরতীরে।"

অবধি কর্ম্মে রচনায় কোথায়ই কি ত্রুটি আছে?

রবীন্দ্রনাথের লেখা গানের বোধ হয় শেষও হয় না, তুলনাও হয় না। মহামূল্য সম্পদের মত, দেশ ও জাতিকে জাগিয়ে তোলার যোগ্য, অর্দ্ধমৃতকে জীবনীশক্তি-প্রদান-সমর্থ সঙ্গীতে ও কবিতায় শুধু বঙ্গ-ভারতীকেই নয়, বিশ্ব-ভারতীকেও তিনি সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন, শুধু এই একটি মাত্র দানেই তিনি অমর হয়ে থাকতে পারতেন।

কংগ্রেস থেকে যত বড় বড় সভাসমিতিতে, এই সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতটি শুনতে শুনতে বহুবার মনে হয়েছে, যেন বাস্তবিকই এই কলহবিচ্ছিন্ন ভারতের কণ্ঠে অবিচ্ছিন্ন প্রেমহার গাথা হয়েই গেছে!

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা।
পুরব পশ্চিম আসে,
তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।"

সমস্ত উচ্চ-হৃদয়সম্পন্ন, দেশাত্মবোধপূর্ণ মহৎ ব্যক্তিদের মতই রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশের ও সমাজের ক্রমিক অধঃপতনে যথার্থ ভাবেই আহত হয়েছিলেন! ধর্ম্মের নামে, অজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা তাঁকে তীব্র ভাবেই আঘাত করতো। হয়তো অনেককেই তা করেওছে, ও করে। কিন্তু তাঁর মত কবিত্বের কষাঘাতে, এতখানি লজ্জা-জর্জ্জরিত তো সবাই এমন করে করতে পারে না! দেশের কোনরূপ অগৌরব তিনি কোন ভাবেই সইতে পারেন নি। আত্মজনের অবিচারে ব্যথাহতচিত্তে ব'লে উঠেছেন—

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

আবার দৃপ্তকণ্ঠে নিশ্চেষ্ট দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলে প্রোৎসাহিত করতে চেয়েছেন;—

"দিন আগত ওই,
ভারত তবু কই,
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে,
লউক বিশ্ব কর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে।
জাগ্রত ভগবান হে।"

আবার বাইরে থেকে যখনই আঘাত এসেছে, সেও তিনি সহ্য করতে সমর্থ হন নি।

যখন রাথবোনের অপমানজনক পত্র, অপমানপীড়িত, আশাহত ভারতের বক্ষের উপর নির্ম্মম আঘাত করলে, সেদিনে বর্ত্তমান ভারতের সবাই রইলেন নিশ্চুপ! কিন্তু অস্তাচলাবলম্বী মুমূর্ষু রবি তো তা সয়ে থাকতে পারলেন না। মেঘমুক্ত দিবাকরের মত তাঁর শেষ রশ্মি যেন মুহূর্ত্তের তেজে দীপ্ততর হয়ে উঠলো। মেঘমন্দ্রে গর্জ্জে উঠলেন;— "ব্রিটিশগণ বিদেশী বলিয়াই যে আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত তাহা নয়। আমাদের হৃদয়ে স্থান করিতে পারে নাই তাহাও নহে। আমাদের মঙ্গল ও স্বার্থরক্ষার ভার গ্রহণ করিবার ভান করিয়া সেই মঙ্গলকার্য্যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ও নিজ দেশের মুষ্টিমেয় ধনিকের পকেট স্ফীত করার জন্য ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের সুখশান্তি জলাঞ্জলি দিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম শিষ্ট ইংরেজ এই সকল অবিচার সম্বন্ধে নীরব থাকিবে এবং আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু আমাদের ক্ষতে ক্ষার ক্ষেপ করায় সে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।"

ঐ পত্রেই তিনি লিখিয়াছেন:—

"আমরা যে কোন ইউরোপীয় ভাষার মারফৎ পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের আর সকল লোক কি বৃটেন কর্তৃক জ্ঞানলাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল? ইংরেজেরা যদি আমাদের "শিক্ষা" না দিতেন, তাহা হইলে আমরা এখনও অন্ধকারেই থাকিতাম, তথাকথিত ইংরেজ বন্ধুদিগের এইরূপ মনে করা ধৃষ্টতাব্যঞ্জক, আত্মতুষ্টিমাত্র! ভারতে বৃটিশ সরকার যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফলে আমাদের বালক-বালিকারা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা ইংরেজী চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ জিনিস নহে, উহার জঞ্জাল! উহারা নিজেদের সংস্কৃতির মন্দিরে যে সুখাদ্য পাইতে পারিত, ঐ ইংরেজী শিক্ষা তাহাদের তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আমাদের জ্ঞানলাভের জন্য ইংরেজী ভাষাই একমাত্র উপায়, ইহাই যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবার পরও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দুই শতাব্দী কাল বৃটিশ শাসনের পর দেখা যায়, সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র প্রায় একজন ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত।"

তিনি যে ভগবান্‌কে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন;—

কর আশীর্ব্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্য্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।"

জীবনের প্রতি কার্য্যেই তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গিয়েছেন। রোগ শোক জরা বার্দ্ধক্য কিছুই তাঁকে তাঁর যে দেশের, "শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার"—

সুরুল ১৯১৪। ক্রোড়ে দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ

সুরুলে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও কবির দক্ষিণে এল্‌ম্‌হার্স্ট। খৃ ১৯২৩

জাপানযাত্রী জাহাজে রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু ও কালিদাস নাগ। খৃঃ ১৯২৪

চীনযাত্রার পূর্বে জাহাজঘাটায় রবীন্দ্রনাথ। দর্শকদিগের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ ও ডাঃ নীলরতন সরকার। খৃঃ ১৯২৪

পিকিঙে রবীন্দ্রনাথ, মিস্ লিন, কালিদাস নাগ ও ক্ষিতিমোহন সেন। ১৯২৪ খৃঃ

পিকিং (চীন) সহরে রবীন্দ্রনাথ।
১৯২৪ খৃঃ

"ক্রেসেন্ট মুন' ক্লাবের সভ্যদের সহিত রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৪ খৃঃ

বরবুদুরে রবীন্দ্রনাথ

দ্বীপময় ভারতে রবীন্দ্রনাথ। বরবুদুর মন্দির পরিক্রমায়

শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ (১৯২৯)

বার্লিনের চিত্রশিল্পী বোরিস জর্জিয়েভ-অঙ্কিত মেজোটিন্টের অনুসরণে

[গোল্ডেন বুক অব টেগোর হইতে]

রবীন্দ্রনাথ (১২৩০)

ইয়েষি আর্ট ই ডিও (টোকিও) কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র
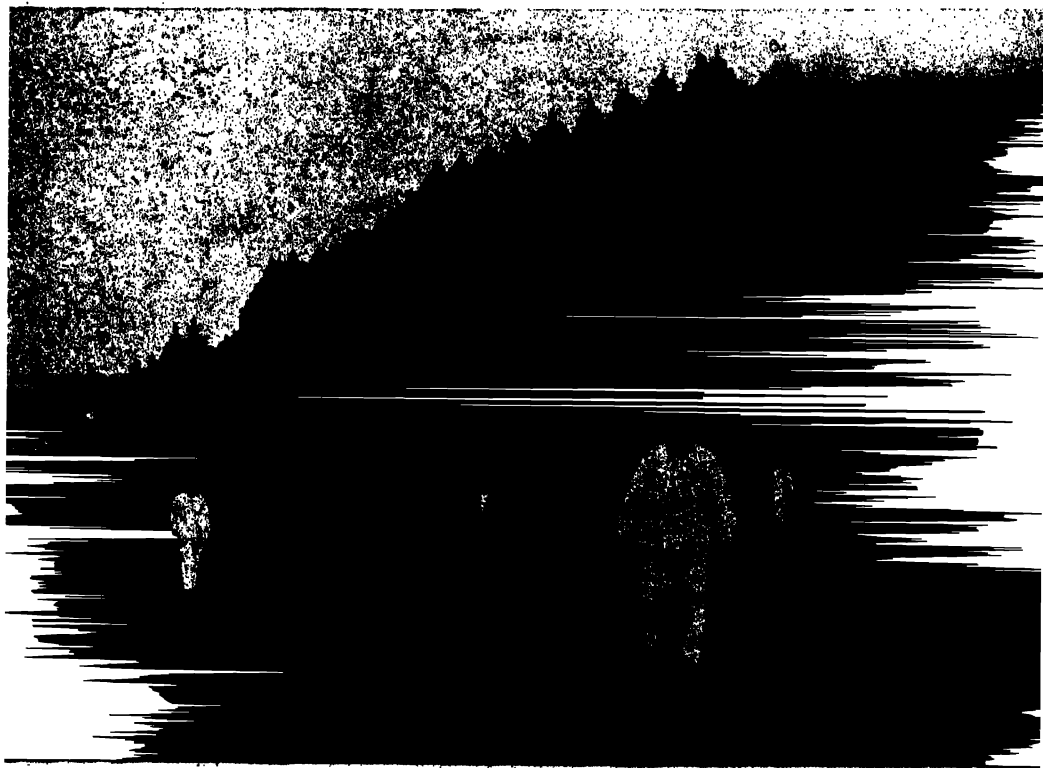
তার অপমান-মুক্তির কোন সুযোগকেই ব্যর্থ করতে দেয় নি। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মুক্তপক্ষ নবীন বিহঙ্গের মত অবাধ গতিতে তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছুটে চলে গেছেন। অথচ "রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ কর নি," বলে যে বঙ্গ-জননীদের তিনি তীব্র ক্ষোভে তিরস্কার করেছেন, তিনি নিজেও তাঁদেরই একজনকার সন্তান।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়" এই বৈষ্ণব-তন্ত্রতা তাঁর প্রত্যেক আচরণেই সুব্যক্ত। যে কবি বসন্তপ্রদোষে লতাকুঞ্জে অর্দ্ধশায়িত হয়ে কাব্যকল্পনার রোমন্থন করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কেহই নন। তিনি কবি হলেও তিনি বীর।

"ডান হাতে তাঁর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ" তাঁর এই কবি-বর্ণিত রূপটি আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই। শুধু মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযান সীমাবদ্ধ নয়; ভগবানের অবিচারকেও তিনি আঘাত দিতে ছাড়েন নি। "প্রশ্ন" কবিতাটিতে কি সুগভীর অভিমানভরেই বলিয়াছেন;—

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা ব'লে গেল ক্ষমা ক'রো সবে, ব'লে গেল ভালবাসো—
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

বোধ হয় আর বল্‌বার অবসর হবে না বলেই, এ বৎসরের প্রথম দিনেই নিজের মনের মধ্যে জমেওঠা অন্তর্বেদনাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে, কি মর্ম্মন্তুদ বেদনায়ই ব'লে গেছেন—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্ব্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম, ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল!"

পঞ্জাব জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারে তাঁর ভাবপ্রবণ কবিচিত্ত, তাঁর স্বদেশবৎসল প্রেমিক চিত্ত, তাঁর জাতীয়তা-বাদের মর্য্যাদায় গৌরবান্বিত চিত্ত, এমনি করেই আর এক দিন তাঁর সমস্ত উপাধিধারী অভিজাত স্বদেশবাসীর দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেদিন বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডকে তিনি এই পত্র লিখেছিলেন;—

"অন্ধকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দ্দিক-বর্ত্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে; অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাদের অকিঞ্চিৎ-করতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের বিশেষ সম্মানচিহ্ন বর্জ্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। * * উপরে বিবৃত কারণ বশতঃ আমি বড় দুঃখেই যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, এই নাইট পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করা হয়।"

ঘরের বাইরের সমুদয় দীনতা ও হীনতাকে সহ্য ক'রে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাবার মত সহ্যগুণ রবীন্দ্রনাথের ছিল না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই মহাবাক্যকে তিনি তাঁর কাব্য কবিতা গীতিনাট্যে প্রবন্ধে নিবন্ধে পুনঃপুনঃই প্রকাশ করেছেন। শুধু কাব্য মারফৎই নয়; কার্য্য-দ্বারায়ও তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। মুসলিনীর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ ক'রে, ইটালীর কত বড় সহায়তা থেকে তাঁর জীবনস্বরূপ বিশ্বভারতীকে তিনি বঞ্চিত করতেও দ্বিধা করেন নি। অনেকেই হয়ত সে ইতিহাস জানেন না। আবার অনেকেই হয়ত জানেন। শুধু দেশের কোলে বসেই নয়; নির্ব্বান্ধব বিদেশেও তাঁর বীরচিত্তের কোনরূপ ক্লৈব্য প্রাপ্তি ঘটে নি! তাই তিনি কবি, শাস্ত্রব্যাখ্যাত যথার্থ কবি।

"শ্লথপ্রাণ দুর্ব্বলের স্পর্দ্ধা আমি কভু সহিব না
লোলুপ সে লালান্বিত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা,
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার,
কলুষ কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার;
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ্ সে প্রার্থনা জানায়;
আলোক বঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়।"

এই তাঁর অন্তরের সত্যকার অভিব্যক্তি। কি ঘৃণার সুর এর মধ্যে ধ্বনিত হ'য়ে রয়েছে! যাচকের এই ঘৃণিত রূপটি তাঁর রচনাতে মূর্ত্তি ধরেই যেন মার খেয়েছে।

"বেপথুর্মলিনং মূর্ত্তিং হীনবাক্ গদ্‌গদস্বর,
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে।"

আজ ভারতবর্ষ ভিক্ষুকের দেশ। এখানকার হাওয়াতে আজ যাচ্ঞার কলুষিত জীবাণু অনুক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে! যাচ্ঞার পাত্রাপাত্র নেই, যে যাকে সুবিধা পাচ্ছে হাতজোড় ক'রে অভাব জানাচ্ছে, কিছু পাবার জন্যে টানাটানি করছে। আত্মমর্য্যাদা যেন দেশ থেকে, সমাজ থেকে ব্যক্তি থেকে বহুদূরে স'রে গেছে। পৌরুষ বলে, বংশ মর্য্যাদা বলে, বর্ণ মর্য্যাদা বলে, জাতীয় মর্য্যাদা বলে কোন কিছুরই যেন কোথাও স্থান নেই। চাকরীর জন্যে ছেলেরা, রাজ-কর্ম্মচারীর স্ত্রী হবার জন্যে মেয়েরা, সম্পূর্ণরূপেই আত্মমর্য্যাদাকে ধ্বংস ক'রে ফেলছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্ত এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। প্রবল ঘৃণাভরে তিনি এই সব মেয়েদের লক্ষ্য ক'রে বলে উঠেছিলেন,—

"জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে, নারী যদি গ্রাহ্য করে,
লজ্জিত দেবতা তারে দুষে—
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে স'পিতে সম্মান।"

এই যে বীর-উপাসিকা নারী—এ কি জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে অর্থলোভে কোথাও বিপত্নীককে কোথাও পত্নী-ত্যাগীকে আত্মদান করা?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিশ্বসাহিত্যিক, বিশ্ববন্ধু, বিশ্ববরেণ্য। নারীজাতির প্রতি তাঁর কর্ত্তব্যবোধের ও সম্মান প্রদানের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটে নি। তাঁর কাব্যে, বিশেষতঃ নাট্যে, ছোট গল্পে ও উপন্যাসে নারীর বিচিত্র চিত্র এঁকে তাদের মহামহিমান্বিতারূপেই তিনি প্রচার করেছেন। মাতৃ-চরিত্রে তাঁর উপন্যাস থেকে ধার না নিয়ে কোন বড় লেখকই পার পান নি। মেয়েদের উন্নতির জন্যেও চিরদিন ধরে তাঁদের পরিবারশুদ্ধ মেয়েপুরুষেই প্রচেষ্টা করে এসেছেন। তাদের যখন আঘাত দিয়েছেন, সে তাঁর বুকে কত বড় হয়ে বেজেছে তা বুঝতে আটকায় না।

আজকের দিনে শোকাশ্রুপূত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে আমরা সেই অমরাত্মার উদ্দেশে সামান্য মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের এই মাত্র সান্ত্বনা যে তাঁর মত ছেলেকে একজন আমাদেরই মতন বাঙালী মা গর্ভে ধারণ করতে পেরে ধন্যা হয়েছিলেন।

সজাতো যেন জাতেন, যাতি দেশ সমুন্নতিম্
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃকোবা ন যায়তে?"

এই মৃত্যুময় জগতে অমরত্ব লাভের মত আর কোন লাভই বড় লাভ নয়! রবীন্দ্রনাথ জীবনে সর্ব্বসফলতা এবং মরণেও অবিনশ্বরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর কীর্ত্তি তাঁকে অমর ক'রে রাখবে, তাঁর সৃষ্টি তাঁকে জগতে অবিস্মৃতি দান করেইছে! আমরা তাঁর জন্যে নূতন ক'রে স্মৃতিফলক স্থাপন ক'রে তাঁকে যেন খর্ব্ব করতে যাই না। আমার সমস্ত দেশ-বাসীর কাছে আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন তাঁর বিশ্ব-ভারতীকে কিছুতেই ভুলতে চেষ্টা না করেন। অন্ততঃ তাঁর বই কিনে প্রিয়জনদের আশীর্ব্বাদে উপহারে দান করলেও বিশ্বভারতীকে কিছু অর্থসাহায্য এবং পরিজনদের হাতে অল্পমূল্যে বহুমূল্য রত্ন দানের সুযোগ যেন তাঁরা না ছাড়েন। সম্মুখে পূজার উপহার কেনবার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথকে ভোলবার উপায় নেই, সে পথ তিনি আমাদের জন্যে রাখেনই নি; কিন্তু বিশ্বভারতীকে ভোলা আমাদের পক্ষে এখন খুবই সহজ। আমাদের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এই! কিন্তু আশা করা যায়, যে, পূর্ব্বের বাঙ্গালী, আর ভবিষ্যতের বাঙ্গালী ঠিক এক থাকবে না। আজ সত্যই যে, "দিন আগত",—অখণ্ড ভারতকেই যে তার উপযুক্ত "কর্ম্মভার" গ্রহণ করতে হবে। আর তা "সবার সাথে মিলে" করতে হবে। আর সেই মহান্ কার্য্যধারার মধ্যে একটি অবশ্যপালনীয় প্রাথমিক কর্ত্তব্য, বিশ্বভারতীকে বাঁচিয়ে রাখা। যেখানে "পূরব পশ্চিম" একসঙ্গে বসে বাস্তবিকই প্রেমের মাল্য রচনা করতে সমর্থ! রহস্যাবৃত প্রাচ্যের গোপন ভাণ্ডার যেখানে বিজেতার কুঞ্চিত নাসার সম্বল নয়; বরঞ্চ বিদ্যার্থীর, অন্তেবাসীর সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসার নিকট উন্মুক্ত হ'য়ে, তাকে বিশ্ববরেণ্য করতে পারবে। তার জন্যে যে সম্ভ্রম তিনি সারা পৃথিবী ঢুঁড়ে কিনে এনেছেন, তা অক্ষয় হ'তে পারবে। তাঁর স্মৃতির তাজমহল তিনি নিজেই তৈরি ক'রে রেখে গেছেন, তাঁকে রক্ষা করা তাঁর সমগ্র জাতির, শুধু বাঙ্গালীরই নয়; প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য। আর সেই সঙ্গে চাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুল প্রচার।

আমরা আর এক জন মহাকবির একটি মহাকাব্য মাত্র উদ্ধৃত ক'রে এইখানেই নীরব হচ্ছি, নইলে তাঁর কথার যে শেষ নেই!—

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য পূজে সর্ব্বজন।"

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পুকুরের মাছ বর্ষায় বাহিরের জলস্রোতের সংযোগ বাহিয়া বাহির হইয়া যায়। নালা নদী নদ সমুদ্র ঘুরিয়া সে অবশ্য আর পুকুরে ফিরিয়া আসে না;—কিন্তু ফিরিয়া আসিলে যা ঘটে তাই ঘটিল। আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ দূরের কথা—মা পর্য্যন্ত চিনিতে পারিল না।

পরনে নীল রঙের পাৎলুন, ফুলহাতা কোমরটুকু অবধি খাটো জামা, জামার পিছনে পিঠের উপর আবার একটা চৌকা ফালি, মাথায় বিচিত্র টুপি—এই পোষাকপরা লোকটিকে দেখিয়া জেলেপাড়ার সকলে ভাবিয়াছিল কোন অদ্ভুত দেশের মানুষ। লোকটি পরম আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জেলেদের বিপন অর্থাৎ বিপিনের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। পিছনে একপাল ছেলে জুটিয়াছিল, সে দাঁড়াইতেই ছেলেগুলিও দাঁড়াইয়া গেল। বিচিত্র পোষাকপরা লোকটির দৃষ্টি জীর্ণ পতনোন্মুখ বাড়ীটার দিকে পড়িতেই সে-দৃষ্টি চকিত হইয়া উঠিল—ভ্রূর কুঞ্চনে জাগিয়া উঠিল নীরব প্রশ্ন। পিছন ফিরিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া হাতের একটিমাত্র আঙুল নাড়িয়া সে ডাকিল এই কাম হিয়ার—ইধার আও। শুন্ শুন্—ইখানে শুন্। এ-ই ছো-করা!

যে ছেলেটি সম্মুখে ছিল সে চট করিয়া পিছু হটিয়া চার-পাঁচ জনকে আড়াল রাখিয়া দাঁড়াইল। সে-চার-পাঁচ জনও পিছনে যাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি সুরু করিয়া দিল। লোকটি কৌতুক বোধ করিয়াও ঘৃণার সহিত বলিল—শুয়ার-কি-বাচ্চা!

তার পর সে বাড়ীর ভাঙা দরজাটা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইল। চারিদিক ভাঙা-ভগ্ন, উহারই মধ্যে ভাল অবস্থার ঘরখানার দাওয়ার উপর বসিয়াছিল এক প্রৌঢ়া;—খাটো-ছেঁড়া একখানা কাপড় পরিয়া কতকগুলা গুগলি শামুকের খোলা ভাঙিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। সে সন্ত্রস্ত হইয়া রূঢ় শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল—কে? কে গো তুমি?

আগন্তুক একমুখ হাসিয়া বলিল—মা!

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এবার মাথার টুপিটা খুলিয়া আগন্তুক বলিল—চিনতে পারছিস্ না মা? হামি পশুপতি! কথাগুলিতে অদ্ভুত একটি টান—'শ'কারগুলি সব কেমন শিষের মত তীক্ষ্ণ, উচ্চারণে শব্দগুলি সব যেন কেমন বাঁকা।

পশুপতি? পশু? পশো? প্রৌঢ়ার হাত দুইটি নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ হইয়া গেল; ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আকুল প্রশ্নভরা চোখে আগন্তুকের দিকে প্রৌঢ়া নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হারানো ছেলে 'পশো' পশুপতি? লম্বা, রোগা, দুরন্ত পনের বছরের ছেলে দশ বৎসর আগে পলাইয়া গিয়াছিল জগন্নাথের পাণ্ডার সঙ্গে;—সেই পশুপতি? পশো?

আগন্তুক আগাইয়া আসিয়া বলিল—চিনতে পারছিস না মা?

সত্যই প্রৌঢ়া চিনিতে পারিতেছিল না; পরনে অদ্ভুত পোষাক—সায়েবদের পোষাকও সে দেখিয়াছে—এ পোষাক সেই ধরণের হইলেও ঠিক তেমন নয়; নীলবর্ণ, এ এক অদ্ভুত পোষাক! জেলের ছেলে পশুপতি—যে কেবল নেংটির মত এক ফালি কাপড় পরিয়া থাকিত, কালো রং, নির্বোধ বোকা চেহারা, জলে থাকিয়া যাহার সর্ব্বাঙ্গ চুলকনায় ভরিয়া থাকিত,—সেই পশুপতি—পশো? মাথার পিছন দিকটা একেবারে কামানো—সামনের বড় বড় চুলগুলা আইবুড় মেয়েদের মত পিছনের দিকে আঁচড়ানো, চোখে মুখে এমন একটা চালাক-চতুর ভাব এই কি সেই?

আগন্তুক এবার পকেট হইতে একটা রুমাল বাহির করিয়া দাওয়াটা বার দুয়েক ঝাড়িয়া লইয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—বহুৎ মুল্লুক ঘুরে এলম মা। জাপান চীন বিলাত মার্কিন মুল্লুক ঘুরলম। জাহাজে খালাসী হইয়েছিলম। সে আবার একটা সিগারেট ধরাইল।

দশ বৎসর আগের কিশোর একখানি মুখের ছবির সহিত এই মুখখানি ক্রমশ মিলিয়া এক হইয়া আসিতেছিল—এক বিচিত্র জ্যামিতি ও পরিমিতির আঙ্কিক নিয়মে বিভিন্ন কালে পরিবর্ত্তিত একখানা জমির মত। নাকের বাঁকা ভাবটি ঠিক তো—সেই তো! ঠোঁটের

কোণ দুইটার ঠিক তেমনই নীচের দিকে টান! ভুরু দুইটা তো তেমনি মোটা!

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আগন্তুক বলিল—বুঢ়া কাঁহা?—শূয়ার-কি-বাচ্চা?

বুঢ়া—বিপিন জেলে—এই বাড়ীর মালিক, প্রৌঢ়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। পশুপতির সৎ-বাপ।

প্রৌঢ়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল—বুড়ো মইছে বাবা —আমাকেও মেরে যেইছে। পথে বসিয়ে যেল বাবা, সব দিয়ে যেইছে 'বেটী'দিগে।

বিপিন মরিবার সময় সব দিয়া গিয়াছে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাদের।

পশুপতি হাসিয়া বলিল—মর গেয়া বুঢ়া, শূয়ার-কি-বাচ্চা?

দশ বৎসরের পূর্ব্বে পশুপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। দুরন্ত নির্ব্বোধ জেলের ছেলে, সৎবাপ বিপিনের পোষ্য ছিল। বিপিন ছিল এখানকার মধ্যে অবস্থাপন্ন জেলে— এ অঞ্চলের ভাল ভাল পুকুর সে জমা করিয়া লইত, অদূরবর্ত্তী নদীটার খানিকটা অংশও সে খোদ সরকারের কাছে জমা লইত একা। বিপিন মাছ ধরিতে যাইত পশুপতিকে সঙ্গে যাইতে হইত; জলের তলায় কোন কিছুতে জাল আটকাইলে বিপিন পশুপতিকে জলে ডুবিতে বাধ্য করিত। জলের তলায় বুক যেন ফাটিয়া যাইত—পশুপতি জলের তলায় হাতড়াইয়া ফিরিত---কোথায় কিসে আটকাইয়াছে জাল। কতবার যে বোয়াল চিতলের কামড় সে খাইয়াছে তাহার হিসাব নাই। মাছ ধরিয়া ফিরিয়া বিপিন পশুকে পাঠাইত কাঠ সংগ্রহে। সন্ধ্যায় আকণ্ঠ মদ গিলিয়া পশুকে সে নিয়মিত প্রহার দিত। সেবার জগন্নাথের পাণ্ডার লোক আসিয়াছিল রথযাত্রার পূর্ব্বে যাত্রী সংগ্রহে। কেমন করিয়া জানি না এই বিদেশ-বাসীর সহিত পশুর আলাপ জমিয়া যায়। তাহার এটা ওটা কাজ-কর্ম্ম করিয়া দিত, এঁটো বিড়ি প্রসাদ পাইত, আর গল্প শুনিত। জগন্নাথের মন্দির, তাঁহার রথ, সে রথ নাকি আকাশ ছোঁয়, রথের উপর জগন্নাথ নাকি হাঁটিয়া আসিয়া চড়েন, লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয়; মধ্যে মধ্যে সে রথ নাকি আটকাইয়া যায়, লক্ষ লোকে টানিলেও সে রথ চলে না, তখন পাণ্ডারা জগন্নাথকে তিরস্কার করে—তবে সে রথ আবার চলে। সেখানে নাকি সমুদ্র আছে, তালগাছের সমান উঁচু এক একটা ঢেউ—নীল বর্ণ জল, সমুদ্রের না কি ওপার নাই।

পাণ্ডার লোক যাত্রী লইয়া ট্রেনে চড়িয়া কিছু দূর আসিয়া সন্ধান পাইল ট্রেনের বেঞ্চের তলায় লুকাইয়া শুইয়া আছে—পশুপতি। ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। বর্দ্ধমান তখন পার হইয়া গেছে। হাওড়ায় পৌঁছিয়া ট্রেন থামিল। নির্বিকার পাণ্ডা, হাওড়ায় রেল-কর্ম্মচারীর হাতে পশুকে সমর্পণ করিয়া যাত্রীর দল লইয়া চলিয়া গেল। নিঃসম্বল পশু, একখানি মাত্র জীর্ণ কাপড় তাহার পরনে; রেল-কর্ম্মচারী তাহাকে সঁপিয়া দিল কনেষ্টবলের হাতে। কিল, চড় ও কয়েকটা গুঁতা দিয়া কনেষ্টবলটা তাহাকে আনিয়া পুরিল হাজতে। হাজত হইতে কোর্ট—কোর্টের বিচারে কয়েক দিনের জন্য তাহার জেল হইয়া গেল। প্রকাণ্ড কালো রঙের ঢাকা একখানা গাড়ীতে তুলিয়া তাহাকে আনিয়া জেলে পুরিয়া দিল। আশ্চর্য্যের কথা অতিক্রান্ত এতগুলি অবস্থান্তরের মধ্যেও পশু কোন দিন কাঁদে নাই। একটা সভয় বিস্ময়ের অতিরিক্ত আর কিছু সে অনুভব করে নাই। যে কষ্টে মানুষের কান্না আসে তেমন কষ্ট এই অবস্থান্তরের মধ্যে ছিল না। অন্ততঃ তাহার কাছে ছিল না। কষ্ট অনুভব করিল বরং জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর। বিরাট্ শহর—বড় বড় বাড়ী— অসংখ্য পথ—যে পথ পিছনে ফেলিয়া আসে—সে পথ আর খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, গাড়ী—গাড়ী আর গাড়ী, মানুষ মানুষ আর মানুষ। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া সে যখন অকস্মাৎ অনুভব করিল---সে হারাইয়া গেছে, যে পথ ফেলিয়া আসিয়াছে সে পথ আর বাহির করা যাইবে না---তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। সমস্ত দিনটা সে কাঁদিয়াছিল। মায়ের জন্য কাঁদিয়াছিল, গাঁয়ের জন্য কাঁদিয়াছিল। তার পর সব সহিয়া গেল। ভিক্ষা করিয়া মোট বহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল অদ্ভুত একটা স্থানে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ী—মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধানো নদী—নদীর উপর বড় বড় বাড়ী ভাসিতেছে। বাড়ী নয়—জাহাজ। আশ-পাশের লোকজনের কাছেই সে শুনিল ও-গুলা জাহাজ। বড় বড় মই লাগাইয়া মোট মাথায় লোক উঠিতেছে, নামিতেছে, আকাশের উপরে একটা মই লোহার দড়িতে প্রকাণ্ড বোঝা-গুলাকে বাঁধিয়া লইয়া জাহাজের উপর আপনি তুলিয়া লইতেছে। জাহাজের মাথায় বড় বড় চোঙা, মধ্যে মধ্যে চোঙা হইতে কি ভীষণ ধোঁয়ার রাশি! অদ্ভুত লাগিল পশুপতির। জায়গাটার নাম শুনিল—খিদিরপুরের ডক। কত মানুষ—কত রকমের সায়েব। সুন্দর নীল পোষাক। খাটো মাথার সায়েবগুলার ছোট ছোট চোখ—খাঁদা নাক —পশুপতির বেশ লাগিল। পরে শুনিল—উহারা জাপানী

সায়েব। পশু ওইখানেই থাকিয়া গেল। কিছু দিনের মধ্যেই সে অনেক শিখিয়া ফেলিল। আকাশে যে মইগুলা জিনিস টানিয়া তোলে—ও-গুলা—"কেরেন"। জাহাজের গোল চোঙাগুলা চিম্‌নী। জাহাজের উপরের ঘরগুলি—কেবিন। জাহাজের ভিতরে—পাতালের মত গহ্বরটাও ক্রমশ তাহার পরিচিত হইয়া উঠিল। কল-ঘরের ভিতরেও সে দেখিল;—সে দিন সে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। বাপ রে! চারি পাশে রেলিং-ঘেরা, পিছল সিঁড়ি—নীচে ওই পাতালে নামিয়া গিয়াছে; মধ্যে ঝকঝকে বিরাট্ যন্ত্রপাতি। সে কি উত্তাপ—আর সে কি শব্দ!

খিদিরপুরের একটা খোলার পল্লীতে সে থাকিত, সেখানে কত লোক, কত জাতি, চীনেম্যান, মগের মুলুকের লোক, চাটগাঁয়ের খালাসীর দল, গোয়ানী,—মধ্যে মধ্যে সায়েব-খালাসীর দু-চার জনও মাতাল হইয়া আসিয়া জুটিত। কত প্রহারই সে প্রথম প্রথম খাইয়াছে! বড় হইয়া অবশ্য সেও কত জনকে প্রহার দিয়াছে। কত গল্প সে শুনিত, দেশ-দেশান্তরের কথা—বার্ম্মা মুলুক, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন, জাপান, মার্কিন, বিলাত, ফেরান্স—কত দেশ কত শহর! কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার অধিকাংশই নারী-সংক্রান্ত; পশুপতির পায়ের রক্ত মাথার দিকে উঠিত। সমুদ্রের গল্প—কূল নাই, দিক্ নাই শুধু সমুদ্র আর আকাশ, আকাশে ওড়ে কত পাখী—জাহাজের আশে পাশে ঘোরে হাঙ্গর, করাতের মত সারি সারি দাঁত—মধ্যে মধ্যে নাকি তিমিও দেখা যায়; আর ঝড়—আকাশ-ভরা কাল মেঘের কোল হইতে ঝড় নামিয়া আসে, সমুদ্রে তুফান উঠে সে তুফানে সমুদ্র যেন জাহাজ লইয়া লুফিতে থাকে। জাহাজের ডেক ভাসাইয়া জল চলিয়া যায়, কত সময় সেই ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া যায় কত জন। 'কালাপানি' আর 'মাডারিনে' (মেডিটেরিনিয়ান) নাকি ঢেউ খুব বেশী। পশুপতি স্তব্ধ হইয়া শুনিত। একদা ঐ খালাসী-দের সঙ্গেই জাহাজের আপিসে নাম লেখাইয়া একটা জাহাজে করিয়া সে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কত বার সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, কত বার গিয়াছে; এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে—এক মুলুক হইতে অন্য মুলুকে।

দীর্ঘ দশ বৎসর পর সহসা কি মনে হইয়াছে—কেমন করিয়া জানি না মনে পড়িয়াছে মাকে—গাঁকে; সে কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াছে।

* * *

সন্ধ্যায় জেলেপাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না, অপরাধ যাহাই হউক মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্ম্মরাজ তলায় জমিয়াছিল। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির প্রকাণ্ড পাত্রে প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই মদ ও মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল।

একটা বড় বাঁশের ঝুড়ি উপুড় করিয়া সেইটার উপর বসিয়াছে পশু, তাহার পরনে সেই পোষাক। সে নিজে এক বোতল পাকিমদ আনিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা ইহারই মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছে। মজলিসে চলিতেছে হুঁকা—সে টানিতেছে সিগারেট। দুই পয়সা দামের সিগারেটের বাক্স অনেকগুলিই সে সঙ্গে আনিয়াছে।

এক ছোকরা উঠিয়া জোড় হাত করিয়া বলিল—জ্ঞাত মশাইরা গো!

সমস্বরে দশ-বারো জনে বলিল—চুপ-চুপ-চুপ! তাহারা মজলিসের গোলমাল থামাইতেছিল।

—নিবেদন পাই!

—বল! বল!

—আজ্ঞে, পশু আমাদের খুব বাহাদুর।

—নিচ্চয়! একশো বার।

—কিন্তুক বেলাত যেয়েছিল।

—হাঁ-হাঁ-ঠিক কথা!

—তা, বেলাত গেলে আর জাত যায় না। এই আমাদের গেরামের ছোট হুজুরের ছেলে যেয়েছিল বেলাত, দেখেন তার জাত যায় নাই।

—ঠিক। ঠিক। বটে!

—তা' পশুর কেনে জাত যাবে?

—নিচ্চয়।

—কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়েছে—

এক জন বলিল—আরও দশ টাকা লাগবে। তা না দিলে—যাবে উয়োর জাত যাবে। আমি বলছি যাবে।

পশু বলিল—দশ রুপেয়াই দিবে হামি।

সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বলিল—একবার হরি হরি বল!

সমস্বরে সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। তার পর আরম্ভ হইল গল্প। পশু গল্প আরম্ভ করিল—দেশ-দেশান্তরের লৌকিক-অলৌকিক। একবার একজন আরব দেশের শেখকে তাহারা সমুদ্র হইতে তুলিয়াছিল। বুঝলি—জাহাজের ছামুতে মানুষটা—এই ভেসে উঠছে—বাস, ফিন্ ডুব যাচ্ছে। তিনবার-চারবার।

তখুন সারং বললো নামাও—বোট। নৌকো! নৌকো! বোট হ'ল নৌকো। বাপরে সিখানে কি হাঙ্গর—মাছের পোনার ঝাঁকের মতুন—কিলবিল করছে হাঙ্গর। তারই অন্দরমে মানুষ। তাজ্জব রে বাবা।

মজলিসসুদ্ধ মেয়েপুরুষ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। পশুপতি বলিয়া গেল বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে—লোকটাকে যখন তুললম রে ভাই—তখুন বলব কি, তাজ্জব কি বাত—লোকটাকে ছোঁয় নাই হাঙ্গরে। জাহাজসুদ্ধ লোকের তাজ্জব লেগে গেল। বাপ রে! বাপ রে! মানুষটার জেয়ান হ'ল—সারং উকে পুছলো—কেয়া নাম, কাঁহাকে আদমী, দরিয়াওমে গিরলো ক্যায়সে। আদমীঠো বললো, আরবী সেখ উ। দুসরা একটা জাহাজমে বম্বই যাচ্ছিলো। নামাজ পড়তে পড়তে গিরে যায় সমুন্দরে। বললো কি জানিস্? বললো—পড়লো তো ছুটে আইলো হাঙ্গর দশঠো, বিশঠো। তো, উ বললো—দুহাই আল্লাকে, দুহাই পয়গম্বরকে—মৎ কাটো হামকো। বাস্ হাঙ্গর ছুতে পারলে না। তার পর তো ভাই, সারং তার করলো—উ লোকটার জাহাজে। তারসে ফিন্ খবর আইলো—বাত ঠিক। উ জাহাজ তখুন একশো মাইল চলে গিয়া।

এমনি কত গল্প।

তার পর আরম্ভ হয় গান—নাচ। পুরুষেরাই নাচে গায়, মেয়েরা দেখে।

পশুপতি নিজে নাচে। পা ছুড়িয়া ছুড়িয়া অদ্ভুত নাচ। বিচিত্র সুরে শিস্ দিয়া গান করে। মত্ত মজলিসে খুব বাহবা পড়িয়া গেল। পশুপতি নাচ শেষ করিয়া বলিল—সবসে ভাল নাচ জোড়া মিলকে নাচ। বড়া বড়া ঘর, শালা, আলো কতো—আসবাব কি, বাজনা কি—আঃ হায়-হায়! সুদূর দেশের আলোকোজ্জ্বল আনন্দোৎসবের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল সে হায় হায় করিয়া সারা হইল। সহসা উৎসাহিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—দেখবি সি নাচ, দেখবি?

—হাঁ-হাঁ। নিচ্চয়।

পশুপতি বোতল হইতে আর এক চুমুক মদ গিলিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া লইল—একটা সিগারেট ধরাইয়া বার কয়েক টানিয়া এক জনকে দিয়া সে করিয়া বসিল একটা কাণ্ড। খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া বসিয়াছিল মেয়েদে দল। পশুপতি ব্যবধানের সেইখানি জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েদের দেখিয়া নবীন জেলের যুবতী মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ঠিক পারবে, আয় উঠে—আয়!

মজলিসে একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

* * *

পশুপতি মত্ত দৃষ্টিতেও নৃত্যসঙ্গিনী পছন্দ করিতে ভুল করে নাই। নবীনের মেয়েটি সুশ্রী তম্বী-তরুণী।

মজলিসে ভীষণ হৈ-চৈ উঠিল; নবীন ক্রোধে ফুলিয়া গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিল।—মেরেই ফেলাব শালাকে।

নবীনের ছেলেটা অতিরিক্ত মদ খাইয়াছিল। সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চীৎকার করিতেছিল—না না না, উ হবে না। ছেড়ে দাও, মাকে ছেড়ে দাও, উকে আমি ছাড়ব না—ছেড়ে দাও বলছি। অবশ্য তাহাকে কেহই ধরিয়া ছিল না, বারণও তাহাকে কেহ করে নাই।

নবীন বলিল—আমার মেয়েকে উকে সাঙা করতে হবে!

পশুপতি ইয়া বড় একটা ছুরি হাতে নির্ভয় কৌতুকে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল, সে বলিল—বাস্ মাৎ চিল্লাও, সাঙা করেগা হামি। ই বাত ঠিক আছে। কসুর হইছে, সাঙা করব হামি।

তম্বী তরুণী মেয়েটি সুধু সুশ্রী নয়, রূপবতী। জেলেদের মেয়েদের মধ্যে শ্রী আছে, কিন্তু নবীনের মেয়েটির মত মেয়ে দেখা যায় না। পর দিন সুস্থ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াও পশু আফশোষ করিল না। জেলের মেয়েরা মাছের পসরা লইয়া বিকিকিনি করিয়া বেড়ায়—তাহারা স্বভাবতই একটু উচ্ছলা, কিন্তু এ মেয়েটি শান্ত নিরুচ্ছ্বসিত। কাচ ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির ধীর।

পশুর মা কিন্তু আপত্তি তুলিল। উ মেয়ে সর্ব্বনেশে মেয়ে বাবা। বেউলো রাঁড়ী; তিন বার বিয়ে হইছে—তিনটে মরদের মাথা উ খেয়েছে। উ হবে না বাবা।

মিথ্যা নয়, এই বয়সে তিন বার বিধবা হইয়াছে নবীনের মেয়ে। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে, বিধবা হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে, দ্বিতীয় বার সাঙা হয় এক বৎসর পরে, ছয় বৎসরে, ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামী মারা যায়;—তার পর ছয় বৎসর তাহার আর বিবাহ হয় নাই। বৎসর দুয়েক আগে তাহার নিষ্কম্প দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া আসিল এক পতঙ্গ—সতেরো-আঠারো বৎসরের এক কাঁচা জোয়ান। মাসখানেকের মধ্যে সেও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল; জালখানা ফেলিয়া আর তুলিতে পারিল না। জালের ভিতর কি বজ-বজ করিয়া বুটবুটি কাটিয়া পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল; প্রকাণ্ড মাছ বুঝিয়া সে ডুব মারিল। তার পর এক বার সে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—প্রকাণ্ড একটা কুমীরের সঙ্গে

আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায়। পরমুহূর্ত্তেই কুমীরটার সঙ্গে যে ডুবিল আর উঠিল না।

এই কারণে মেয়েটার আসল নাম পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, নাম তাহার রমাদাসী—লোকে এখন ডাকে তাহাকে 'বেউলো' অর্থাৎ বেহুলা বলিয়া। মেয়েটি অস্বাভাবিক শান্ত—কিন্তু কঠিন; তাহার বড় চোখ দুইটির স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায়, তখন মনে হয় সে যেন তিরস্কার করিতেছে। পশুপতির বড় ভাল লাগিল।

পর দিন সকালে উঠিয়া নবীনের বাড়ী গেল। নবীন, নবীনের ছেলে মাছ ধরিতে গিয়াছে—নবীনের স্ত্রী পুত্রবধূ গিয়াছে ভোররাত্রের চুরি-করিয়া ধরা মাছ বেচিতে, বাড়ীতে ছিল কেবল রমা। সে স্থির শান্ত দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভাবী বধূত্ব স্মরণ করিয়াও সে একবার হাসিল না, চোখ নত করিল না।

পশুপতি বলিল—রাগ ক'রেছিস?

শান্তভাবে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—গোস্ত রাঁধতে জানিস? মান্‌সো-মান্‌সো?

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি জানাইল—হ্যাঁ।

—তু মদ খাস? মদ?

এবার মেয়েটি সেই দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল পশুপতিকেও সে দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল। কিন্তু পশুপতি ইহাতেই বেশী মুগ্ধ হইয়া গেল। শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েটি, ছোট একখানি ঘর, ছেলে-মেয়ে—পশুপতি কল্পনা করিল অনেক। পুলকিত প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে বিবাহের দৃঢ় সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মা আপত্তি করিল, কিন্তু সে কানেই তুলিল না। শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল, একখানা ঘর তাহাকে কিনিতে হইবে। মাকে সুদ্ধ লইয়া সংসার করা তাহার পোষাইবে না। সে, পাড়ার প্রান্তে খানিকটা জমি জমিদারের গোমস্তার কাছে বন্দোবস্ত লইয়া সেই দিনই ঘর আরম্ভ করিয়া দিল।

ঘর তৈয়ারী হইলে সে নবীনকে বলিল—ঠিক করো দিন।

সাত দিন পর দিন ঠিক হইয়া গেল। পশু বলিল—অলরাইট, হামি কলকাত্তা যাবে—চিজ-বিজ কিনতে।

পথে নির্জ্জন একটা গলির ভিতর হইতে কে ডাকিল—শোন!

রমাদাসী! সে আজ মৃদু হাসিয়া ডাকিতেছিল—শোন!

রমার মুখে হাসি আজ নূতন দেখিল পশুপতি, সে দ্রুত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। রমা আতঙ্কভরে বলিয়া উঠিল—না-না-না।

সে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে পশুও তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

রমা বিবর্ণ মুখে বলিল—এই কবচটি তুমি পর। মা-চণ্ডীর কবচ—আমি এনেছি তোমার লেগে। এক দিন উপোস করে থেকে কবচ এনেছি। সেই যি অসুখ করেছিল এক দিন—অসুখ মিছে কথা, উপোস করেছিলাম।

সে নিজেই পরাইয়া দিল—লাল সুতায় বাঁধা তামার একটি কবচ। হাসিয়া রমা বলিল—আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে লয়, রণে-বনে-অরুণ্যে মা তোমাকে রক্ষে করবেন!

*   *   *

ইহার পর পশুপতির সন্ধান নাই। কলিকাতায় বাজার করিতে গিয়া সে আর ফিরিল না।

উপরের কাহিনীটুকু আমার গ্রামের ঘটনা, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—জেলেপাড়ার একটি বিচলিত বিহ্বল মুহূর্ত্তে। পশুপতির নিরুদ্দেশের কিছু দিন পরেই পশুপতির ওই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছিল—আমি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। দারোগা কি বুঝিয়াছিল—কি লিখিয়াছিল জানি না, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম—তাহা এই। যাহা বুঝিয়াছিলাম—তাহাও মিথ্যা নয়—সে কথা শুনিলাম—আর মাস কয়েক পর, পশুপতির কাছে।

রেডিয়ো আপিসে একটা ছোট নাটিকা দিবার কথা ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম—এক অভিনব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। জার্ম্মান সবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের একমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয় নাবিক আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা চমৎকার লাগিল।

বন্ধুবর হীরেন থিয়েটারী ঢঙে প্রশ্ন করিল—শুনলে?

দাদা কমলবিলাস গম্ভীর মুখে বলিলেন—শুক্রাচার্য্য করে দিলে তোমাদের!

—মানে?

—কা-কা-কানা করে দিলে তোমাদের লেখাকে। মধ্যে মধ্যে কমল দাদার কথা ঠেকিয়া যায়।

স্বীকার করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম—

সেলারের পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে পশুপতি। সেও আমাকে চিনিল—বাবু!

—হ্যাঁ। তোর গল্প শুনলাম। খুব বেঁচেছিস।

সে হাসিল।

রমার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিলাম—তুই চলে গেলি কেন?

—আজ্ঞে খিদিরপুর গেলাম বেড়াতে। জাহাজ দেখলাম—বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'ল, আমোদ-টামোদ করলাম রেতে; কি হয়ে গেল, মনে হ'ল কি হবে বিয়ে ক'রে? দ্যাশ বিদ্যাশে কত;—সে লজ্জায় থামিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম—দেশ-বিদেশের বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্র বিলাসিনীদের আকর্ষণ সেদিন তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। ছোট একটি নীড়, রমার মধ্যেকার নারীত্বের শান্ত বিকাশ—তাহাকে ভুলাইতে পারিবার তো কথা নয়—সুতরাং তাহার দোষ কি? প্রেম তো তাহার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় আনন্দের—

চিন্তায় বাধা দিয়া পশুপতি বলিল—কিন্তুক ভুল হইছিল—মতিচ্ছন্ন হইছিল আমার বাবু। আজ মরে গেলে কি হ'ত? রমাদাসীর কবচই আমাকে বাঁচায়া বাবু। নইলে কেউ বাঁচল না—আমি বাঁচলাম! আর—;

পশুপতি বলিল—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজ ফাটিয়া গেল, বিকট শব্দ—দুরন্ত আঘাত—ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার! কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল সে জানে না। জ্ঞান ছিল না তাহার। যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল কে যেন তাহাকে একখানা ভাসমান কাঠের উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাথাটা ছিল হাতের উপর—রমার কবচটাই তাহার কপালে ঠেকিয়া ছিল।

কবচটা বাহির করিয়া সে কপালে ঠেকাইল। বলিল—ই কবচ যত দিন রহেগা তত দিন হামারা কিছু হবে না বাবু।

আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম রমার কথা।

স্তম্ভিত হইয়া গেল পশুপতি। তাহার সে মূর্ত্তি আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পর সিগারেট ধরাইয়া হাসিয়া সে বলিল—চললাম। সেলাম বাবু!

তাহাকে ডাকিলাম—শোন-শোন!

—আজ্ঞে!

—কি করবি এখন?

পিছনে গঙ্গায় ষ্টীমারের তীব্র সার্চলাইট আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চাকার জলকাটার আলোড়ন শব্দ শোনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে রকমারি আওয়াজের সিটি বাজিতেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি হাসিল, তার পর বলিল—লতুন জাহাজমে চলে যায়েগা। আজকাল খালাসীর ভারী আদর। কেউ যেতে চাইছে না। হাম যায়েগা।

সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথের উপরেই কি একটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল; ছোট শক্ত একটা কিছু। অগ্রসর হইতেই আমার নজরে পড়িল—বিবর্ণ সুতায় বাঁধা সেটা একটা তামার কবচ।

কবিতা

শ্রীকানাই সামন্ত

সন্ধ্যায়, হের, সোনার হরিণ
একা ঐ গিরিচুড়ে—
পাইনবনের ছায়া নাই যেথা
পথ যায় নাই ঘুরে'—

আমার স্বপ্ন, ও আমার আশা বটে-
একা উৎসুক নীল শূন্যের তটে।*

* ইংরেজীর ভাবানুবাদ।

অসুর জাতি ও লৌহশিল্প

শ্রীশৈলেন্দ্রবিজয় দাশগুপ্ত

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি ও পালামৌ জেলার এবং সুরগুজা ষ্টেটের সীমান্তবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে অসুর নামে এক আদিমজাতি বাস করে। কাজকর্ম, চলাফেরা ইত্যাদি বিভিন্ন জীবনধারায় ইহাদের সহিত ছোটনাগপুরের অন্যান্য উরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের গ্রামগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ে বা সানুদেশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। গ্রামে বসতিও খুব বেশী নয়। কেবলমাত্র একটি দুইটি ঘর লইয়াও এক একটি গ্রাম পাওয়া যায়। উর্দ্ধসংখ্যায় এক গ্রামে পনর ঘরের বেশী বসতি সচরাচর দেখা যায় না। এক হইতে অন্য গ্রামের দূরত্বও দুই মাইলের কম নয়; কোন কোন স্থানে ছয়-সাত মাইলেরও অধিক হয়।

অসুর বলিতে সাধারণতঃ পৌরাণিক অসুর জাতির কথাই মনে হয়। বর্ত্তমান যুগেও অসুর নামধারী কোন জাতি আছে জানিলে প্রথমতঃ একটু বিস্ময় বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে বৈদিক যুগের সেই সুরবিদ্বেষী অসুর জাতির কোন বংশধর আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে কি না সন্দেহ। অবশ্য পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন ভারতীয় অসুর আর্য্য ও দাস জাতি এখনও আছে, কেবল তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করাই কঠিন। ছোটনাগপুরের অসুর জাতিকে বৈদিক অসুরদিগের সগোত্রীয় করিবার মত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

১৯৩১ সালের আদমসুমারীর গণনাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান অসুর জাতির সংখ্যা কিঞ্চিদধিক দুই হাজার মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণনা হইতে দেখা যায়, ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। অসুরদিগের নিজেদেরও ধারণা যে এককালে তাহারা এক বৃহৎ জাতি ছিল, কিন্তু কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ খুঁজিতে গেলে এক পথে তাহার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তবে সম্ভবতঃ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ইহার একটি প্রধান কারণ।

পাহাড়ের শিখরদেশে বৃক্ষলতাময় জঙ্গল কাটিয়া অড়হর, মাড়ুয়া ও ঐ জাতীয় অন্যান্য ফসল উৎপাদন করিয়াই ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। অবসরসময়ে কেহ কেহ লৌহ নিষ্কাশন করিত বা কেহ কেহ বাঁশের ও পাতার ঝুড়ি চুপড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে জঙ্গলের গাছ কাটা প্রায় সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হওয়ায়

একটি অসুর বালক

পাহাড়ে চাষ তাহাদের এক প্রকার ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এখন লাঙ্গলের চাষ শিখিয়া সমতল ভূমিতে চাষ-আবাদের দিকেই সকলকে মনোনিবেশ করিতে হইতেছে। কিন্তু এই পথে অনেক দিন হইতেই তাহারা বাধা পাইতেছে। প্রথমতঃ, এই অঞ্চলে উপযুক্ত সমতল ভূমির বিশেষ অভাব, দ্বিতীয়তঃ, অনেকেরই লাঙল বা লাঙল টানিবার বলদ নাই—অধিক ভাড়ায় নিকটবর্ত্তী অন্য জাতিদিগের নিকট হইতে লইয়া কাজ চালাইতে হয়। তদুপরি যে ভূমি ইহারা চাষ করিতে পায় তাহার উর্ব্বরা শক্তি অত্যন্ত কম। তথাপি অবস্থাবৈগুণ্যে এই পথই

ছোট চুল্লীতে লৌহ নিষ্কাশন করা হইতেছে

সকলকে অবলম্বন করিতে হইতেছে। বলাই বাহুল্য, লাঙলের চাষে উৎপন্ন ফসলে তাহাদের বৎসর যায় না। সুতরাং অন্যান্য আয়ের পথ উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পূর্ব্বের মত এখনও ইহাদিগকে অবসরসময়ে লৌহ নিষ্কাশন ও বাঁশের কাজের সহিত সময়ে সময়ে শিকার, বন্য ফলমূল আহরণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতে হয়। সম্ভব হইলে চা-বাগানে গিয়া বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কুলির কাজ করিয়াও কেহ কেহ কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সংস্কার, পুরাতন কাহিনী ও জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধারা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই লৌহ-শিল্পের সহিত অসুর-সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে।

অসুরদিগের ভাষা মুণ্ডা ভাষারই অনুরূপ। গ্রীয়ারসন্ ইহাকে মুণ্ডা ভাষার অন্তর্গত "অসুরী" আখ্যা দিয়াছেন। জাতি-হিসাবেও কেহ কেহ বলেন ইহারা মুণ্ডাদেরই শাখামাত্র। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় বলেন যে "বর্ত্তমানে অসুর নামধারী জাতি প্রকৃতপক্ষে মুণ্ডাদেরই শাখাবিশেষ এবং অনুমান হয় 'অসুর' নাম তাহাদিগের লৌহ-নিষ্কাশন প্রথা অনুসরণ হইতেই আরোপিত হইয়াছে। কারণ অসুর নামীয় এক উন্নত জাতি ছোটনাগপুরে লৌহ-নিষ্কাশন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে।"

বৃদ্ধ অসুরদিগের মুখে শুনা যায়, জগতের প্রভু ভগবান্ ছত্রী প্রথম ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ অসুর-বীর ও অসুর-রাণীকে সৃজন করিয়া লৌহ-নিষ্কাশন প্রথা শিক্ষা দেন। প্রয়োজন ছিল ছত্রী ভগবানের নিজের। ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহাকে সমস্ত দুনিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত, সুতরাং ঘোড়ার গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য লাগামের প্রয়োজন অপরিহার্য্য ছিল। অসুরদম্পতি লৌহময় প্রস্তর গলাইয়া লৌহ নিষ্কাশন করিত ও তাহাকে পিটাইয়া লম্বা লম্বা লাগামে পরিণত করিত। কোন অস্ত্রশস্ত্র, কুঠার, হাতিয়ার তাহাদের ছিল না। বৃদ্ধ অসুর মুষ্ট্যাঘাতে বড় বড় শাল গাছ ভূপাতিত করিত এবং তাহাই জ্বালাইয়া কাঠকয়লা তৈয়ার করিত। তাহাদের আহার্য্যের কোন

উদূখলে ধান কোটা

নৃত্যরত অসুর পুরুষ ও নারী

অসুরগণ আজকাল কৃষিকর্মে লিপ্ত হইয়াছে

বৃদ্ধা অসুর-রমণী জঙ্গলে মূল খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে

বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। গলান লোহার টুকরা গলাধঃকরণ করিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। অবশ্য শাল ফল ভক্ষণ করিবার হুকুম তাহাদের ছিল। শাল ফল তখন নাকি বেশ সুস্বাদু ছিল। পরে উরাওঁদের নিকট হইতে তাহারা মাকুয়া খাইত ও মাকুয়া চাষ করিতে শিখে। এই অসুর-দম্পতির দ্বাদশ পুত্রসন্তান ছিল। ইহাদের সন্ততিরাই আপন আপন বংশধরগণকে লৌহ-নিষ্কাশন প্রথা শিক্ষা দিয়া বর্ত্তমান অসুর জাতির লৌহশিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছে।

এই প্রকারের বিভিন্ন প্রবাদ অসুরদিগের মধ্যে প্রচলিত। আখ্যায়িকার মূলে পার্থক্য থাকিলেও প্রায় প্রত্যেক কাহিনীতে দেখা যাইবে অসুরের সহিত লৌহ-শিল্পের কোন-না-কোন সংযোগ বর্ত্তমান।

প্রাচীন কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে লৌহ-নিষ্কাশন প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল যে নিষ্কাশিত হইত তাহা নহে, এই লৌহ হইতে অতি-উত্তম ইস্পাত প্রস্তুত হইত। কাহারও কাহারও ধারণা ডামাস্কাসে যে উন্নত ধরণের তরবারি নির্ম্মিত হইত, তাহার লৌহ-উপকরণ ভারতবর্ষ হইতেই যাইত। যাহা হউক, কালবশে সেই প্রাচীন শিল্প বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল মাত্র অসুর প্রভৃতি অনুন্নত আদিম জাতির মধ্যেই প্রাচীন পদ্ধতিতে লৌহ নিষ্কাশন প্রণালী প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন, এই আদিম জাতি-অনুসৃত নিষ্কাশন-প্রথা ভারতের প্রাচীন গৌরবময় লৌহশিল্পেরই অবশেষ মাত্র।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে লৌহের অবদান কতখানি কাহারও অবিদিত নাই। যত দিন যায়, লৌহের চাহিদা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯০০ সালে সমস্ত পৃথিবী প্রায় চারি কোটি টন ঢালাই লোহা (pig iron) ও তিন কোটি টন ইস্পাত উৎপাদন করে। ১৯২৯ সালে দেখা যায়, সেই ঢালাই লৌহের পরিমাণ প্রায় নয় কোটি সত্তর লক্ষ টন ও ইস্পাতের পরিমাণ এগার কোটি আশী লক্ষ টন। এই পরিমাণ যে পরে আরও অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের দৃষ্টিকোণ যদি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চাতে লইয়া যাই, তবে হয়ত সামান্য ২৯।৩০ বৎসরের ব্যবধানে লৌহের চাহিদার এইরূপ তারতম্য দেখিতে পাইব না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য—যে দিন হইতে মানুষ লৌহের মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে সেদিন হইতেই নানা উপায়ে অধিক পরিমাণে এই ধাতু উৎপাদনের দিকে তাহার সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়োজিত করিয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে নিকট-প্রাচ্যের (Near East) কোন এক স্থানে লৌহ-নিষ্কাশন প্রথা প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং পরে জাতি হইতে জাত্যন্তরে হস্তান্তরিত হইয়া ইহা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবে সঠিক কোন্ স্থানে এই প্রণালী আবিষ্কৃত হয় বলা কঠিন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লৌহশিল্প অসুর জাতির অন্যতম

একটি গ্রাম

জীবিকা। কিন্তু বহিঃসভ্যতার সংক্রমণে এই শিল্পের পরিণাম ক্রমে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আজকাল কয়েকটি মাত্র গ্রামে লৌহ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। মাটির তৈয়ারী ছোট ছোট চুল্লীতে লৌহ নিষ্কাশন করা হয় এবং সেই লৌহকে পুড়াইয়া, পিটাইয়া প্রয়োজনানুরূপ লাঙ্গলের ফাল, কুঠার, কাস্তে প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। চুল্লীগুলিকে 'কুঠী' বলা হয়। এক একটি 'কুঠী' প্রায় তিন ফুট উচ্চ ; আকারে গোল এবং নিম্ন হইতে উপর দিকে ঈষৎ সরু হইয়া উঠে। তলদেশে ইহার ব্যাস প্রায় দুই ফুট এবং উপরিভাগে প্রায় আঠার-উনিশ ইঞ্চি হইবে। উপর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটি ছিদ্রপথ কুঠীর মধ্যদেশ দিয়া বিস্তৃত। ইহাই চুল্লীর আসল অংশ। নিম্নে অর্দ্ধগোলাকৃতি একটি দরজা এই ছিদ্রপথকে বাহিরের সহিত সংযুক্ত করে। কাঠ-কয়লার দ্বারা এই ছিদ্র অংশ পূর্ণ করা হয়। তলদেশে কুঠীর দরজায় একটি নয়-দশ ইঞ্চি লম্বা মাটির নল লম্বালম্বি ভাবে স্থাপন করিয়া ধুলার দ্বারা দরজার মুখ বন্ধ করা হয়। এক জোড়া হাপরের সাহায্যে এই নলের মধ্য দিয়া কুঠীতে বাতাস দেওয়া হয় ; প্রথমে একটি দুইটি জ্বলন্ত কয়লা নলের মুখে রাখিয়া হাপর চালাইলে উহা সঙ্গে সঙ্গে কুঠীতে প্রবেশ করে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কয়লা জ্বলিয়া উঠে। হাপরগুলি আমাদের দেশের মত নয়। ইহাদিগকে "চাপুয়া" বলে। পায়ের দ্বারা ইহাদের চালাইতে হয় ও একসঙ্গে এক জোড়া চাপুয়ার দরকার হয়। দুই পায়ে দুইটি চাপুয়ার উপর দাঁড়াইয়া এক বার বাম ও এক বার দক্ষিণ পায়ে চাপ দিতে হয়। চাপুয়া দুইটির মুখ কুঠীর নলের মুখে থাকে। সুতরাং উভয় চাপুয়ার বাতাসই একই নল দিয়া কুঠীতে প্রবেশ করে। কুঠীর কয়লা যখন পুড়িয়া নীচের দিকে বসিতে থাকে তখন নূতন কয়লা ও লৌহময় প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা উপর হইতে কুঠীতে প্রক্ষেপ করা হয়। সাধারণতঃ কুঠীর দেওয়ালের উপর কয়লা ও লৌহ-ময় প্রস্তরের টুকরা সঞ্চিত থাকে। আঁকশির মত

একটি অসুর-পরিবার

একটি দণ্ডের সাহায্যে চাপুয়া-চালক ঐ কয়লা ও প্রস্তর-খণ্ডকে টানিয়া চুল্লীতে প্রক্ষেপ করে। প্রতি বারেই প্রস্তর ও কয়লা একসঙ্গে দেওয়া হয় এবং কয়লার পরিমাণ প্রস্তর অপেক্ষা পাঁচ-সাত গুণ অধিক থাকে। বলাই বাহুল্য, সর্ব্বক্ষণই চাপুয়া চালাইতে হয়। এইরূপে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিন-চারি সের ওজনের লৌহ নিষ্কাশিত হয়। এই সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ধুলার দ্বারা বদ্ধ কুঠীর দরজায় সরু কাঠি দ্বারা ছেদ করা হয় এবং সেই পথে গলিত লৌহমল (slag) বাহির হইয়া আসে। বাহিরে আসিয়াই উহা জমিয়া কঠিন আকার ধারণ করে এবং সাঁড়াশীর দ্বারা কিছুক্ষণ অন্তর উহা টানিয়া বাহির করিতে হয়।

নিষ্কাশিত লৌহকে সরাসরি পিটাইয়া লাঙ্গলের ফাল তৈয়ার করা হয়। কিন্তু কুঠার, কাস্তে প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ লৌহকে পুনরায় কামারশালে পুড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। যে-সমস্ত ময়লা অর্থাৎ অন্যান্য যৌগিক পদার্থ তখনও লৌহের সহিত মিশ্রিত থাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার অধিকাংশ তরল অবস্থায় বাহির হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে লৌহশিল্পী ভূমি হইতে ধুলা কুড়াইয়া উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করে। অসুরদের কথায় ইহার দ্বারা লৌহ পরিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃ ধুলায় মিশ্রিত যৌগিক পদার্থের সহিত লৌহে মিশ্রিত ময়লার রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া তরলাকারে লৌহমল

বাহির হইয়া যায়। এই প্রকারে যথাসম্ভব মল-বিমুক্ত লৌহকে পিটাইয়া বিভিন্ন হাতিয়ার প্রস্তুত করা হয়। ইস্পাত তৈয়ার করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ইহাদের জানা নাই।

অসুরদিগের অনুসৃত নিষ্কাশন-প্রথায় যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহাকে direct বা সোজাসুজি প্রণালী বলা চলে। কারণ কাঠ-কয়লায় কার্ব্বনের ভাগ খুব বেশী থাকায় সম্ভবতঃ কুঠীতে প্রথমেই পেটাই লৌহ (wrought iron) পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানের উন্নত প্রথায় প্রথমেই ঢালাই লৌহ (cast iron) প্রস্তুত হয় এবং এই ঢালাই লৌহ হইতে পেটাই লৌহ প্রস্তুত করা হয়।

অসুরদের দেশ

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহশিল্পের কেন্দ্র টাটানগর হইতে মাত্র দেড় শত দুই শত মাইল দূরে অবস্থিত অসুর দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠীর কথা চিন্তা করিতেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। দূরত্বের এই সামান্য ব্যবধানে মানব জাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশন প্রথার কি পার্থক্য!

কোথায় টাটানগরের ১০০, ১২৫ ফুট উচ্চ এক একটি ব্লাষ্ট ফারনেস্ (blast furnace) আর তাহার অনতি-দূরেই অসুরদের তিন ফুট উচ্চ কুঠী। উৎপাদনের পরিমাণও এক ক্ষেত্রে দিনে শতাবধি টন ও অপর ক্ষেত্রে আট-দশ পাউণ্ড মাত্র। এক স্থানে যেন লৌহ-নিষ্কাশন প্রথা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, আর অপর স্থানে যেন এই প্রথা সবেমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে!

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সবল প্রাণের প্রবল প্রবাহ বহে যা' দেশের বুকে,
জন-গণদেব যে কথা লিখিতে চাহে লেখনীর মুখে,—
হে পূজারী, তব নূতন পূজার মোহন ভঙ্গিমাতে
লেখা হ'ল তাই বঙ্গবাণীর চরণ-পদ্মপাতে।

সংস্কৃত কি অসংস্কৃত—প্রকাশের সঙ্গতি
মানি' যে-বা শুধু প্রাণের অর্ঘ্যে সেবিল সরস্বতী,
গতি আর যতি—দুই পায়ে তাঁর ভরি' দিয়া ঝঙ্কারে,—
সে নূতন সুর বাঁধা প'ল মা'র দিব্যবীণার তারে।

একাধারে যে-বা প্রবীণ-নবীন, গম্ভীর-নির্ভীক,
জ্ঞানে-গুণে যে-বা গরীয়ান, কবি, রস-ভাবে সুরসিক,
সুজন-সভায় বাজে চারিধার জয়-জয়ন্তী যাঁর,
তাঁহারই চরণে পাঠাইল কবি প্রণত নমস্কার।

দুই পিঠ

শ্রীজীবনময় রায়

উপমাটি রবীন্দ্রনাথের।

পশমের কাজের উল্টাপিঠ দেখিলে যখন শুধু কদর্য্যতা ও নোংরামি চোখে পড়ে তখন একবার উল্টাইয়া লইয়া সোজা পিঠের উপর চোখ রাখিয়া দেখ, মনে হইবে চোখ যেন জুড়াইয়া গেল।

* * *

বিগত ৩২শে শ্রাবণ, রবিবার, শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথ ও আশ্রমবাসিগণ, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন—সময়োচিত শ্রদ্ধা, গাম্ভীর্য্য ও আশ্রমোচিত প্রশান্ত নিষ্ঠার সহিত।

এই উপলক্ষ্যে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র বীরেন্দ্রমোহন সেনের শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে যাইয়া আমরা কয়েক জন প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক বাসা বাঁধিয়াছি। প্রবাসীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাক্তন অধ্যাপকও বটেন এবং বীরেনের বাড়ীতেই তিনি উঠিয়া থাকেন; তিনিও ঐখানেই আসিয়া উঠিয়াছেন, একটি ভিন্ন কক্ষে।

প্রাক্তন অধ্যাপকদের মধ্যে ছাত্রদের কক্ষে একমাত্র আমি। কিন্তু ছাত্র ও অধ্যাপকের সম্পর্ক শান্তিনিকেতনে নিতান্ত আপনার জনের মতই। আমার সঙ্গী ছাত্রদের অধিকাংশই এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় উপনীত এবং সামান্য মাত্র আড়ষ্টতাও আর আমাদের মধ্যে কোনও অন্তরাল সৃজন করে না। সরল সুন্দর স্বাভাবিক স্নেহের ও শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে আমাদের এ-সম্পর্ক সহজেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐখানেই ত খাঁটি শান্তিনিকেতন। কবির চিরমধুর ও একান্ত অন্তরঙ্গ স্নেহের স্পর্শে শান্তিনিকেতনের তরুলতা, আকাশপ্রান্তর, জীবজন্তু, নরনারী সকলকেই এক পরমরসমাধুর্য্যপূর্ণ আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিয়াছে। শ্রীমান্ বীরেন্দ্রের বাড়ীর সকলেই যেন আমাদের চিরপরিচিত পরমাত্মীয়—পূর্ব্ব পরিচয় বা অপরিচয়ের কোন কৃত্রিম বাধা সেখানে কাহারও চিন্তার মধ্যেই আসে না।

"শান্তিনিকেতনের না কি গো?"

"হ্যাঁ গো।"

অমনি কণ্ঠ গান গাহিয়া উঠে "সে যে সব হ'তে আপন, সে যে সব হ'তে আপন।"

দ্বিপ্রহরের হবিষ্যান্নের পর থাকিতে পারিলাম না—কে যেন আমায় টানিতে লাগিল। কত প্রিয় বন্ধু-অধ্যাপক, কত প্রিয়তর প্রাক্তন ছাত্র, শান্তিনিকেতনের আনন্দ উৎসবের স্মৃতিসম্ভারপূর্ণ কত গৃহদ্বার—আজ কোথাও যাইতে পারিলাম না। ক্ষান্তপ্রায় বর্ষণ আকাশের তলে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। বহুকালের অনাবৃষ্টির পর তৃষিত প্রান্তরের উপর শান্তিনিকেতনের বিপুল বর্ষণ-বন্যায় যেখানে অজস্রচঞ্চলস্রোতবিধৌত খোয়াইয়ের মধ্যে মধ্যে কবির শিশুকালের প্রিয় স্মৃতিবিমুগ্ধ ঝরণা-ধারাগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারই মধ্যে পা ডুবাইয়া ডুবাইয়া নিতান্ত অকারণেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ মনে হইল যেন আমি একলা নই। কিন্তু বস্তুত সেই নির্জ্জন গহ্বরগুলির মধ্যে জনমানবের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমি গুন্ গুন্ গুঞ্জরণে কবির গান গাহিয়া গাহিয়া নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই ঘুরিয়া ফিরিতেছিলাম। বুঝিলাম সত্যই আমি একলা নই, কারণ কবির কাব্যরসবোধের দ্বারা উদ্বোধিত এই বিশ্বপ্রকৃতির মোহ এবং কবির অদীনসত্তার অনুভূতি আমাকে প্রত্যক্ষস্পর্শে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় উত্তরায়ণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কবির তিরোধানের পর হইতে নিত্য নিয়মিত সেখানে কবিকে স্মরণ করিয়া কবির রচিত গান ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন "শান্তিনিকেতন" প্রভৃতি কবি-লিখিত অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন এবং প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা সঙ্গীত-অধ্যাপক শ্রীমান শান্তিদেব ঘোষ তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠে কবি-রচিত সময়োচিত গান করিয়া উপস্থিত জনগণকে কবির নিজস্ব অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পূর্ণ করিয়া তুলিতেন।

আমরা কয়জনে ধীর, নিঃশব্দ, নগ্নপদসঞ্চারে উপাসনা-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ বেদনা-বিধুর শোকভারাবনত বহুজনসমাগমের এক ঘন নিবিড়

একাত্মতার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। ধূপ ও পুষ্পের মৃদু-সৌরভে আভ্যন্তরীণ বায়ুমণ্ডল মন্থর। ভক্তিরসাপ্লুত সকল চিত্তের প্রণতিনিবেদনের ঐকান্তিকতা যেন পরস্পরকে সুনিবিড় ভাবে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।

উপাসনা শেষ হইলে কয়েক জন দ্বিতলে—রবীন্দ্রনাথের মরদেহের ভস্মাবশেষ যেখানে রাখা হইয়াছে সেই কক্ষে—গেলাম। সুন্দর ও সুচারুসজ্জিত সিংহাসনের উপরে অস্থি রক্ষিত। পুষ্পপ্রিয় কবির উদ্দেশে পুষ্পে পুষ্পে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। বিচিত্র ভঙ্গীতে শ্বেত পদ্ম ও রজনীগন্ধার বিপুল আয়োজনকে আশ্চর্য্য সুরুচিপূর্ণ পুষ্পসজ্জায় পরিকল্পিত করা হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব-আয়োজনের সময়ে প্রতীক্ষ্যমান ভক্তজনের মধ্যে যেমন করিয়া তিনি আবির্ভূত হইতেন, মনে হইতেছে তেমনই করিয়া অকস্মাৎ আসিয়া যেন তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনটি ও সকলের হৃদয়-মন পূর্ণ করিয়া বসিবেন। শান্তিদেব এখানে অনেকগুলি গান করিলেন। গৃহের দীপগুলি স্তিমিতপ্রায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহারই আবছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া মন আমাদের সুরে, কথায়, রসে, সান্নিধ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই উৎসব-আয়োজনের মধ্যে, এই আমাদের অত্যন্ত নিকটে, এই পুষ্পধূপছায়াচ্ছন্ন গৃহের অভ্যন্তরে তিনি যে কোথাও নাই একথা যেন আমাদের চেতনার অনুভূতিতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিতেছে না।

রাত্রে বৈতালিক দল বিশ্রামের পূর্ব্বে "প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে" এই গানটি গাহিয়া শালবীথি পরিক্রমণ করিল।

সকাল সকাল শুইতে গেলাম। পরদিন প্রাতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এদিকে সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামিতে চায় না, বৃষ্টিরও বিরাম নাই। ভোর না হইতেই বৈতালিক দল আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। বর্ষণ তখনও ক্ষান্ত হয় নাই। ঝরঝর বৃষ্টিধারার সঙ্গে বৈতালিক দলের দূর-প্রবাহীসুরধারা সম্মিলিত হইয়া আমার চেতনাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া, স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া লইলাম। শ্রাদ্ধবাসরে যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন দেখি জনতায় জনতায় সুবৃহৎ মণ্ডপতল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা ও আশ্রমবাসিগণ ছাড়া দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে সমাগত শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষী ও সাঁওতাল (যাহাদের আমরা অসভ্য বলিয়া থাকি) গ্রামের লোকে মণ্ডপ ও ছাতিমতলা ভরিয়া গিয়াছে। সকলেরই চিত্ত সময়োচিত শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে সন্নত, নীরব, আবেগবাষ্পসমাচ্ছন্ন।

ছাতিমতলার (মহর্ষির সাধনক্ষেত্রের) অব্যবহিত পার্শ্বে, ছোট বড় দুইটি মণ্ডপ, শিল্পীপ্রবর নন্দলাল বসু ও খ্যাতনামা শিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে, কবির রুচিরোচন করিয়া সাজান হইয়াছে। ছোটটিতে একটি বেদীর উপর দুইটি আসনে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়; তাঁহাদেরই পার্শ্বে দুইটি আসনে রথীন্দ্রনাথ ও সুবীরেন্দ্রনাথ। ইঁহাদের পশ্চাতে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং ঐ বেদীটির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া শান্তিনিকেতনের গানের দল। সকলেই স্তব্ধ গম্ভীর, শান্ত ও নিবিষ্ট। সঙ্গীতের পর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠ নিঃসৃত বিশুদ্ধ বেদোচ্চারণধ্বনি উত্থিত হইল। স্থির হইয়া শুনিতেছি আর অবাক্ হইয়া যাইতেছি এই বিরাট জনতার সংরুদ্ধচিত্তের শ্রদ্ধাগম্ভীর নিবিড়স্তব্ধতায়। প্রায় দেড় সহস্র বিচিত্র শ্রেণীর লোকের জনতা; সামিয়ানায় তিল ধারণের স্থান নাই। সামিয়ানার বাহিরে দাঁড়াইয়া নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া সকলে শুনিতেছে "যোদেবাগ্নৌ যোঽপ্সু—" এমন সময়ে বৃষ্টি নামিল মুষলধারে। ভাবিলাম এই বার বুঝি একটু হুড়াহুড়ি বাধিবে; সকলে অন্তত আচ্ছাদনের মধ্যে আসিবার জন্য একটা রীতিমত ঠেলাঠেলি করিবে। কিন্তু এ কী আশ্চর্য্য ব্যাপার!! অবিচলিত নির্ব্বিকার চিত্তে বাহিরের সকলে চুপ করিয়া ভিজিতে লাগিল। পলাইল না, নড়িল না, একটি শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিল না। সামিয়ানার তলে আমারই নিকটে একটি সাঁওতাল নারী ক্রন্দনপরায়ণ একটি শিশুকে আঁচলে চাপিয়া তাড়াতাড়ি বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া গেল। যেন এই পবিত্র অনুষ্ঠানের গম্ভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিলে কি একটা অপরাধ হইয়া যাইবে। ভাবিলাম, শিখিল কোথায়! এই সব অসভ্য গ্রাম্য অন্ধকারের জীব এই সংযম কোথায় শিক্ষা করিল! বুঝিলাম আর কিছু নয়—ইহারা সভ্য হইবার সুযোগ লাভ করে নাই।

মুষলধারে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই বিরাট জনতার অধিকাংশ লোকই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের উচ্চারিত একবর্ণও শুনিতে পাইল না। কিন্তু মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথের শান্ত গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের ধারায় প্রভাবিত হইয়া সমস্ত লোক যেন শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাবরসে নিমগ্ন ও সম্মোহিত হইয়া রহিল। শহরের উদ্ধত কোলাহল

ও শ্রদ্ধাবিহীন উত্তেজনার অবসাদের পর প্রাণ যেন একটা শান্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইলে শ্রদ্ধাবনত শান্তচিত্তে মহর্ষির সাধনবেদিকামূলে যাইয়া সকলে সমবেত হইলেন; এবং সেই মহাবৃক্ষ সপ্তপর্ণীতলে মহর্ষির বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ব্রহ্ম সঙ্গীত "কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে এই প্রাণ" এই গানটি গাওয়া হইল।

দ্বিপ্রহরে রথীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের রন্ধনশালায় সকলকে হবিষ্যান্নে পরিতৃপ্ত করিলেন। মুণ্ডিতমস্তকে, নগ্নপদে, শোকগম্ভীর আননে তিনি সকলের পরিচর্য্যার তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন।

বেলা প্রায় আড়াইটার সময়ে ভক্তিভাজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রাক্তন-গোষ্ঠীর এক সভায় শান্তিনিকেতনের মৌলিক আদর্শ ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা হইল।

অপরাহ্ণে মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কীর্ত্তনাঙ্গের গান গীত হইল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাক্তনগণ ও অন্যান্য অতিথিবর্গ আগ্রহের সহিত তাহাতে যোগ দিলেন। তার পর মন্দির হইতে বাহির হইয়া "আমাদের শান্তিনিকেতন" সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে আমরা সকলে আশ্রম ও উত্তরায়ণে কবির বিরাম-কক্ষটি পরিক্রমণ করিয়া আসিলাম।

শ্রাদ্ধের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইল কিন্তু আসল কাজ তখনও সম্পূর্ণ বাকী ছিল। ঐ দিন বেলা বারোটা হইতে রাত নয়টা পর্য্যন্ত প্রায় ছয় সহস্র দরিদ্র নরনারীকে ভূরি-ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমস্ত রাত ঝড় ও বৃষ্টির বিরাম ছিল না। খোলা মাঠের ঝড়ের দাপটে রন্ধনের ও আহারের জন্য যেসব বিরাট আচ্ছাদন প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভাঙিয়া উড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছিল। বৃষ্টিধারারও বিশ্রাম ছিল না। এই নৈসর্গিক উপদ্রবের অত্যাচারেও গুরুদেবের প্রতি অবিচলিত ভক্তিতে যাহাদিগকে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই এবং দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও যাঁহারা শ্রান্তি মানেন নাই, শান্তিনিকেতনের সেই সকল ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ সকলের বিস্ময়পূর্ণ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু সকলের অপেক্ষা চমৎকৃত হইয়াছি তাহাদের আচরণে, যাহাদিগকে আমরা "কাঙালী" বলিয়া কৃপা করিয়া থাকি। দূরদূরান্তরের গ্রাম হইতে সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভিজিয়া ভিজিয়া আসিয়া তাহারা স্থির হইয়া অপেক্ষা করিয়াছে—একটু চেঁচামেচি নাই, গোলমাল নাই, হুড়াহুড়ি নাই, সকলকে ঠেলিয়া আগে যাইবার জন্য তাড়া, কিছুই নাই। এমন হাজারে হাজারে আসিয়াছে, হাজারে হাজারে অপেক্ষা করিয়াছে, নিজের দলের সঙ্গে বসিয়া শান্ত সংযত ভাবে আহার শেষ করিয়াছে; তার পর দীর্ঘ অনাবৃষ্টির অন্তে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই বৃষ্টি-ধারাকে "গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও দয়া" বলিয়া সেই অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ মাথায় করিয়া নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। অশিক্ষিত অসভ্য বলিয়া ইহাদেরই আমরা আবার পরিহার করিয়া চলি! এ এক পরিহাস বটে।

সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে সেদিন শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করিলেন। কবির সহিত তাঁহার নিবিড় বন্ধুতা ও অধ্যাত্মযোগের দ্বারা প্রভাবিত শোকগম্ভীর উপাসনার প্রত্যেকটি বাক্য উপস্থিত সকলের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিল এবং শান্তিনিকেতনের শ্রাদ্ধবাসর হইতে শোকাশ্রুবিধৌত প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ একটি নিবিড় অনুভূতি লইয়া পরদিন কলিকাতায় ফিরিলাম।

* * *

এই গেল এক পিঠ।

পশমের কাজের অন্য পিঠটাও দেখিয়াছি। ক্লেদকুৎসিত বীভৎসতার লীলাভূমি—

কিন্তু কি হইবে সে সব কথা স্মরণ করিয়া? আজ আর ও-সব ভাল লাগিতেছে না। তাহার চেয়ে এস সেই সেদিনের মত কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গান করি—

শান্ত হ' রে ওরে চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হ' রে ওরে দীন।

রবীন্দ্রায়ণ

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালী জাতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু যে গ্রহণ করিতে অক্ষম তাহার প্রধান কারণ, প্রায় অর্দ্ধেক শতাব্দী ধরিয়া কবি শুধু যে তাঁহার কলমে লিখনের রীতি ও ভাষা অনেকটা দিয়াছেন তাহা নহে, তাহার মনও অনেকটা গড়িয়াছেন, তাহার প্রাণে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়াছেন এবং জাতির ঘোর আপদ-বিপদেও তাহার দিক্ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি। তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রে বাংলার সেই চির কলতান বিশাল নদনদীর নিরুদ্দেশের আকর্ষণ, ঋতু-পর্য্যায়ে বাংলার মাঠ-ঘাট বন-উপবনের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বাঙ্গালীর গৃহকোণের হাসি অশ্রু, সুখ ও স্বপ্ন যেমন ভাবে ফুটিয়াছে তাহাতে তিনি চিরকাল যত দিন বাংলার মাটি ও বাংলার জল থাকিবে তত দিনই বাঙ্গালীর চিরপরিচিত প্রিয় সঙ্গী হইয়া থাকিবেন।

বাঙ্গালী কবি ভারতেরও শ্রেষ্ঠ কবি। কবির বিচিত্র সৃষ্টিতে ভারতের সাধনা যে ভাবে চরিতার্থ হইয়াছে, এক দিকে উপনিষদের গভীরতা ও শান্তি, মধ্যযুগের মরমিয়া-গণের তুরীয় বোধ ও বৈষ্ণব কবিগণের বিহ্বলতা, অপর দিকে সমগ্র সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের রসপ্রাচুর্য্য তাহাতে তিনি ভারতীয় প্রতিভার অদ্বিতীয় প্রতীক হইয়াছেন। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালেই জন্ম লইয়াছিলেন। কিন্তু উজ্জয়িনীর রাজকবি তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশাল হিমালয়ের ক্রোড়ে, পার্ব্বতীর গৃহপ্রাঙ্গণে, মহেশ্বরের প্রিয় কবি-পুরোহিত, যাঁহাকে তিনি প্রভাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় রাত্রে শিবসুন্দরের গান শুনাইতেন আর পার্ব্বতী বিস্ময়পুলকে প্রতিদিনই তাঁহার কেশ হইতে অশোক, কর্ণ হইতে কর্ণিকার ও সিন্ধুবার খুলিয়া তাঁহার চূড়ায় পরাইয়া দিতেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সকল কালের ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। ছন্দ-সাম্রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র সম্রাট্। সারাজীবন তিনি কবিতার ছাঁদ ও ছন্দ লইয়া অফুরন্ত খেলা করিয়াছেন। মানব-মনের অগণিত ও অপরূপ ভাব তাঁহার বিচিত্র ছন্দ ও ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া অজস্র ধারায় উৎসারিত হইয়াছে। গীতিকবিতায় এমন নিত্য নূতন রূপায়ণ জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। কবি-প্রতিভা তাই বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া আপনার জীবন-দেবতাকেই সম্ভাষণ করিয়াছেন—

> কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
> কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
> কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
> তব অসংখ্য কাহিনী।
> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী।

জগতের শ্রেষ্ঠ রূপকার গীতিকবি শুধু কবি ছিলেন না, তিনি অপূর্ব্ব কুশলতাও দেখাইয়াছিলেন গল্পে, নাট্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধরচনায়, সঙ্গীতে এবং নূতন রীতির চিত্র-শিল্পে। জগতের আর কোন সাহিত্যিক এমন সর্ব্বতোমুখী রূপসৃজনকুশলতা দেখাইতে পারেন নাই। টেনিসন্ ভিক্টর হিওগোকে লক্ষ্য করিয়া যে লিখিয়াছিলেন, "নাটক-বিজয়ী, উপন্যাসবিজয়ী", "মানবের আশা ও অশ্রুর বিচিত্র রঙীন মেঘস্রষ্টা", "শিশুপ্রণয়ী" এ সবই ভিক্টর হিওগো অপেক্ষা তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে প্রযোজ্য। বিশ্ব-প্রকৃতির খণ্ড বা সমগ্র রূপের সহিত মানবচিত্তের নিবিড় যোগসাধন, কৌতুকপ্রিয়তা, সুররসিকতা, নাটকের ভাব ও কর্ম্মের চঞ্চলতা, গল্প উপন্যাস লিখনের নিছক ঔৎসুক্য সবই তাঁহার রূপসৃজনের অজস্র ও বিপুল ধারায় বিচিত্র ভাবে মিশিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে বিশিষ্ট পর্য্যায় লক্ষিত হয়। প্রত্যেক পর্য্যায়েই রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন রচনাভঙ্গী ও ছাঁদ আবিষ্কার করিয়াছেন, একটা নূতন ভাবাবেশ, সূক্ষ্ম ও গভীর মানব মনের একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। এই অপূর্ব্ব ভাব ও রূপ রচনার বৈচিত্র্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিগণের মধ্যে অসামান্য বলিয়াই জগতে সম্মানিত হইয়াছেন। যুগ অতিবাহের সঙ্গে তাঁহার প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধাঞ্জলি বাড়িবে বই কমিবে না।

কিন্তু বাঙ্গালী কবি, সাহিত্যিক ও রূপকার তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিবে গীতিকবি হিসাবে এবং আজ হইতে শত বর্ষ পরে যখন নীল নব ঘন মেঘে বাংলার আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, যখন বসন্তের আবির্ভাবে আগুন

লাগিবে বনে বনে, অথবা যখন শরতের আকাশ ও বাতাসের নিরাবিলতা বাংলার বিশাল শূন্য নদীতীরে অজস্র কাশফুলের শোভায় প্রতিফলিত হইবে, তখন আমাদের পরমপ্রিয় কবিটি লক্ষ লক্ষ যৌবন হৃদয়ে আবার জন্ম লইবেন, শতমুখে শত কবিতায় ও গানে তাঁহারই ভাব ও রূপ সৃজন প্রকৃতির ও মানব জীবনের সঙ্গে নূতন গ্রন্থি রচনা করিতে করিতে চলিবে।

মানুষ যে মেঘ ও রৌদ্র, আকাশ নদী ও বনকে দেখে শুধু যে তাহার চক্ষে দেখে তাহা নয়। কবির তুলিকা ধরণীর তলে, আকাশের গায় যে আর একটু রঙ্গীন আভা যোগ করিয়া দিয়াছে। বাংলার বন উপবন যখন কোকিলের কুহুরবে মুখরিত হয় কবি যে তাহাতে আর একটু বিরহের মিনতি আনিয়া দিয়াছেন। বাংলার অঙ্গনতলে যড়ঋতুর যে বর্ণগন্ধের লীলা বর্ষে বর্ষে রূপায়িত হয় তাহাতে তিনি কত না নূতন শোভা, সঙ্গীত ও আনন্দের হিল্লোল রাখিয়া গিয়াছেন। আম্রমুকুলের সৌরভ যেমন কবি আরও মদির করিয়াছেন, তেমনই ঘন ঘোর আষাঢ়ের বিজন সন্ধ্যার বিধুরতাকে তিনি আরও বিহ্বল করিয়াছেন। বৈশাখের নিদারুণ উত্তাপ ও অকরুণ ঝড় যখন সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ ও ধূলিধূসরিত করিয়া দেয় কবি এই রিক্ততার মধ্যে আনিয়াছেন একটু তীব্রতর বৈরাগীর সুর। তাই শত বর্ষ পরেও যখন পৃথিবী সর্ব্বহারা ও রিক্ত হইবে বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়, তখন পথে পথে এই আমাদের সুপরিচিত কবিটি একতারা লইয়া হঠাৎ দেখা দিবেন ও গাহিবেন "অন্তরে মোর বৈরাগী গায়, তাইরে নাইরে নাইরে না।" তেমনই যত কাল বাংলার মধু বসন্ত অধীর ও উন্মত্ত থাকিবে, যত কাল ঘন ঘোর বরষার ছায়া বাংলার মাঠ ঘাট গৃহপ্রাঙ্গণকে গভীর মায়াজালে ঘিরিবে, কিংবা শারদীয় উষার স্নিগ্ধ কিরণসম্পাত নবীন ধান্যশস্পশিহরণে মাঠ হইতে মাঠান্তরে প্রসারিত হইবে, তত দিনই কবির পরমাত্মীয় রূপটি বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য ও বাঙালীর মনোবিবর্ত্তনের মধ্যে ধরা দিবে। কবি গাহিয়াছেন,

> বেসেছি ভালো এই ধরারে
> মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
> ফুলের দিনে দিয়েছি রচি' গান,
> সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি
> সে গানে মোর বহুক স্মৃতি
> আর যা আছে হউক অবসান।

এই স্মৃতিই মানুষের চোখে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে। এই স্মৃতিতেই মানুষের ভালবাসা আরও মধুর হয়, মানুষের সুখ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশা আরও সত্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রকৃতির সহিত বাঙালীর ভাবরসের এমন নিবিড় ও অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইয়াছেন যে যত দিন বাংলার প্রকৃতিভূমি থাকিবে এবং যত দিনই বাঙ্গালীর হাসি ও অশ্রুর ঘরকন্নার লীলা চলিবে তত দিনই তিনি পরম প্রিয়জনরূপে তাহাদিগের মধ্যে রহিবেন।

কিন্তু কবি শুধু কবি নহেন, একজন যুগনির্দ্দেষ্টাও ছিলেন। বাংলায় দেশহিতৈষণার জাগরণের দিনে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার এক জন প্রধান পুরোহিত হইয়া সমগ্র দেশকে কত না উদ্দীপক গান ও প্রবন্ধে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার পরিকল্পনায় একটি আদর্শবাদ আছে যাহাতে দেশের শিক্ষাদীক্ষা, চারুশিল্পকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য, সবই জাতির পূর্ণ বিকাশের দিক হইতে অমূল্য ও অপরিহার্য্য। বাংলার জাতীয়তার সঙ্গে সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তার এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে তাহাতে দেশের যুগপরম্পরালব্ধ অন্তরের সাধনার ও কৃষ্টির নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার বাণী এই যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রিক গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া জাতীয় কৃষ্টির ভিত্তিতে নূতন শিল্প, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করিতে হইবে। শুধু রাষ্ট্রিক হইলে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় না। ইতিহাসের প্রগতি হিসাবে অন্ততঃ এই প্রকার স্বাধীনতার মূল্য কম।

রবীন্দ্রনাথের আরও দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতের সংস্কৃতি মাত্র এক জাতি, এক সম্প্রদায় গঠন করে নাই ও করিতেও পারে না। পৃথিবীতে ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য ঐতিহাসিক দান ব্যর্থ হইবে যদি সাম্প্রদায়িক হিংসা ও জাতিবৈরী ভারতীয় কৃষ্টির অখণ্ডতা চূরমার করিয়া দেয়। শেষ বয়সে তাঁহার নিতান্ত ক্ষোভ ও দুঃখ হইয়াছিল যে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এমন বাড়িয়া চলিয়াছে যে সংস্কৃতির ব্যাপক মিলন দূরে থাক, বাঙ্গালীর অর্জ্জিত শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিরোধ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাতে আমাদের কি রাষ্ট্রিক, কি সামাজিক, কি সাহিত্যের প্রগতি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য কবির এই সতর্কবাণী নিতান্ত অমূল্য।

কবি জাতীয় শিক্ষার একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। "জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ" ও "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" তিনি এক জন প্রধান উদ্যোগী ও স্থাপয়িতা। শান্তিনিকেতনে তিনি যে "বিশ্বভারতী"কে গড়িয়া তুলিয়া তাহার জন্য সমস্ত পণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন

তাহা ভারতবর্ষের নিকট তাঁহার এক অপূর্ব্ব দান এবং শ্রদ্ধার বস্তু। শুধু যে এখানে যাবতীয় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনুশীলন হইবে তাহা নয়, এই বিদ্যালয়ের তাৎপর্য্য হইতেছে যে ইহার বিজ্ঞান কৃষিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্নসংস্থানের ভার লইবে। মানুষের মন ও বাহুবল দু-ই একই সঙ্গে প্রযোজিত হইয়া শিক্ষাপরিষদ্‌কে এবং পারিপার্শ্বিক প্রদেশকে গড়িয়া তুলিবে। তেমনই শ্রীনিকেতনের ভিতর দিয়া কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রাম ও গ্রামবাসীর নিবিড় সংযোগ সংস্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষিত ও জনসমাজের এই ভাব ও কর্ম্মগত মিলন বাংলার পল্লীসংস্কারের এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। বৈজ্ঞানিক কৃষি ও সমবায়, গৃহশিল্প ও চারুকলা, যাত্রা ও লৌকিক উৎসব সকলে মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে "শ্রীনিকেতন" একটি "স্বদেশী সমাজ" গড়িয়া তুলিতেছে যেখানকার কৃষকেরা উদ্যোগী, কর্ম্মপটু ও স্বায়ত্তশাসন অভ্যস্ত এবং যাহার ফলে তাহারা এক দিকে যেমন প্রাচীন রীতিনীতি ও প্রথার দাসত্ব হইতে মুক্ত, অপর দিকে সমাজতন্ত্রবাদীর দুর্জ্জয় আক্রমণের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক আলেখ্য আঁকিয়াছেন তাহার ভিত্তি হইতেছে পল্লীর এই স্বাধীনতা ও সমবায়। অপর কোন পদ্ধতিতে ভারতীয় রাষ্ট্র গড়িতে চাহিলেই শ্রেণী-সংঘর্ষ, মধ্যবিত্ত ও ধনীর প্রভুত্ব দেখা দিবে এবং ভারতের কৃষকসমাজ ছত্রভঙ্গ হইবে। কবির এই রাষ্ট্রিক নির্দ্দেশ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ইউরোপের গতানুগতিক পথ বর্জ্জন করিবার সহায় হইবে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশের নূতন চিন্তা ও কর্ম্মের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া, সমগ্র ভূমণ্ডল বার-বার পর্য্যটন করিয়া বিশ্বকবি এক অসামান্য সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীর নিগূঢ় সমস্যা ও পরিস্থিতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি কি প্রতীচ্যে কি প্রাচ্যে মানবাত্মার উপর জড়শক্তি ও যন্ত্রতন্ত্রের আক্রমণ এবং ব্যক্তিত্বের উপর সমষ্টি ও অনুষ্ঠানের আক্রমণ বিংশ শতাব্দীর অতি কঠিন ও নিদারুণ সমস্যা বলিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং সভ্যতার নিষ্কৃতির উপায়ও ইঙ্গিত করিয়াছেন। জীবনব্যাপী তিনি সহজ সাধারণ মানুষের পূজারী যাঁহাকে তিনি অচিন্ পুরুষ, মনের মানুষ বা দেবতা-মানুষ বলিয়া অন্তরের অভিবাদন জানাইয়াছেন। বিরাট্ অনুষ্ঠান, সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্র, জাতি ও শ্রেণীর পীড়নে সহজ ও সাধারণ মানুষের মহিমা বিশ্বজগতে আজ খর্ব্বিত ও ধূলিধূসরিত। মানুষের সহিত মানুষের, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের মিলনক্ষেত্র হইতেছে মানবিকতার অদ্বৈত অনুভূতি, পুলকময় তুরীয় বোধ। এই অতীন্দ্রিয় বোধ না জাগিলে বিরাট্ ব্যবসায়, বিশাল রাষ্ট্র, বিপুলকায় নগর, সংঘর্ষণশীল শ্রেণী ও বুভুক্ষু জাতির অত্যাচার হইতে বিশ্বমানব রক্ষা পাইবে না।

বিশ্বমানবের এক সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে গৌরীশঙ্করের অভ্রভেদী ধবলশৃঙ্গ হইতে বিশ্বকবি দূরে বিশ্বসভ্যতার বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শুভ্র সুউন্নত শির নত করিয়াছেন ইতিহাসের নির্ম্মম কৌতুকভঙ্গীর নিকট। তবুও তিনি মানবিকতার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা হারান নাই। বরং অচিরে তাহারই জয়-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কবিই একমাত্র সত্যের বোদ্ধা ও সুন্দরের রসগ্রহীতা। সত্য ও সুন্দরের প্রকাশের সঙ্গে নব নব দিনে কবি নূতন করিয়া প্রকাশিত হন এবং নূতনকে অভিবাদন করেন। এই কথা যেমন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্যে আছে, তেমনই আছে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও রচনায়। 'নবো নবো ভবসি জায়মানোহ্নাং কেতুরুষ সামেষ্যগ্রম্'। কবি নব নব মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উষাকে নিত্য নব আবাহন করিয়া নব দিনের সূচনা করেন। কবির এই জন্মগ্রহণ, প্রকাশ ও গান যুগের পর যুগ ধরিয়া চলিতে থাকে। তাই রবি-কবি সুদূর নব দিনের কোন কবি, কোন পাঠককে তাঁহার সানুরাগ অভিবাদন পাঠাইয়াছেন।

"আজি হতে শত বর্ষ পরে।
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয় স্পন্দনে তব, ভ্রমর গুঞ্জনে নব,
পল্লব মর্ম্মরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে।"

কবি আজ ইহলোকে নাই, কিন্তু ভাবলোকের কবি অমর। রবি-কবি অস্তমহাসাগরতট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন মাত্র। আবার উদয়গিরিশিখরে দেখা দিবেন। "উদয়গিরি প্রণাম লহ মম।"

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীসীতা দেবী

পার্থিব জীবনের ভিতর আমরা নিত্য বলিয়া কি জানি? দিনের শেষে রাত্রি আসে, আবার পরদিন ভোরে সূর্য্যোদয় হয়। বায়ু নিত্য প্রবাহিত, আলোর ধারা কোথাও অন্ধকারের ভিতর নিঃশেষ হইয়া যায় না। আকাশ মেঘে ঢাকে, কিন্তু জানি তাহার আড়ালে নিত্যকার সূর্য্য তেমনই জ্যোতির্ম্ময়রূপে বিরাজ করিতেছে। হতভাগ্যতম যে মানুষ সেও এই অমরজ্যোতিকে সমস্ত অনুভূতি দিয়া গ্রহণ করে, এ সান্ত্বনা তাহার কেহ হরণ করিতে পারে না।

তেমনই এই হতভাগ্য বাংলা দেশে জন্মিয়া, যখন প্রথম চৈতন্যলোকে স্থান পাইলাম, তখন এই আকাশের সূর্য্যেরই মত নিত্য, অক্ষয়, অমর বলিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে জানিয়াছিলাম। আজ বিশ্বাস করিতে পারি না তিনি নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরেই তিনি আছেন ইহা মনে করিয়াও সান্ত্বনা পাই না। নশ্বর জীবনের শেষ আছে, মানুষমাত্রেই মর-জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা ত বুদ্ধি দিয়া বুঝি, কিন্তু তাঁহাকে সাধারণ নশ্বর মানুষ কোনদিন ভাবিতে পারি নাই বলিয়াই সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার মৃত্যুকে অস্বীকার করে। আশী বৎসর মানুষের জীবনে দীর্ঘকাল বটে, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় তাহা কতটুকু? যাঁহাকে রূপ দিতে এত যুগ লাগিল, তাঁহাকে এই সামান্য এতটুকু সময়ের মধ্যেই বিধাতা কেন হরণ করিয়া লইয়া গেলেন? সৃষ্টির কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হইল, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যের অতীত।

এই দরিদ্র দেশের তিনি যে কি ছিলেন, তাহা ত ভাষায় বলিয়া বুঝান যায় না। একাধারে তিনি ইহার স্রষ্টা, পাতা ও আনন্দঘন ছিলেন। পিতার ন্যায় শাসন করিয়াছেন, মাতার ন্যায় স্নেহ দিয়াছেন, প্রেমিকের মত ভালবাসিয়াছেন। তাই বাংলা দেশ আজ অনাথ, ইহার মাথার মুকুট ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ইহার দৈন্য আড়াল করিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ পুরুষ দাঁড়াইয়া ছিলেন, মহাকাল তাঁহাকে হরণ করিলেন। আজ দেশের নগ্নতা, দীনতা বিশ্বের নিকট উদ্ঘাটিত।

মানুষের আত্মা অমর, তাহার বিনাশ নাই, ইহা ত বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহাতে আজ সান্ত্বনা পাই কই? সেই দেবোপম মূর্ত্তি, সেই শুভ্র হাস্য, আয়ত নেত্রের সেই প্রদীপ্ত দৃষ্টি, অন্তরে ত চিরউজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া আছে। কিন্তু বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও কি তাহারা নাই? একেবারে হারাইয়া গিয়াছে? বিশ্ববিধাতা এতই কি নিরাসক্ত যে এমন অকল্পনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া তাহা একেবারে বিলুপ্তির ভিতর মিলাইয়া যাইতে দিবেন? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ভাবী কালের মানুষ তাঁহাকে কি ভাবে স্মরণ করিবে জানি না। হয়ত বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট বা শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার মানবতা লুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনি দেবতার মূর্ত্তি ধরিবেন। কিন্তু এ চিন্তাও আমাদের সান্ত্বনা দেয় না। আমরা যে তাঁহাকে মানুষ রূপেই জানিয়াছিলাম, পরমাত্মীয়ের মত জানিয়াছিলাম। অথচ শুধু মানুষও ভাবিতে পারি নাই। আত্মীয়ের সঙ্গে যে যোগসূত্র, তাহা রক্তের বন্ধন ও অভ্যাসের বন্ধন দিয়া গঠিত, সেভাবে আত্মীয়ও তিনি ছিলেন না। তবু আজ তাঁহার বিদায়ের ব্যথা, সাধারণ বিচ্ছেদদুঃখের অপেক্ষা এত গভীর, এত ভয়ানক কেন? শুধু মানুষ রবীন্দ্রনাথ ত চলিয়া গেলেন না, যেন এই হতভাগ্য দেশ হইতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ অবলুপ্ত হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ প্রথম পরিচয় আমার যখন হয়, তখন আমার বয়স চার-পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না। আমরা তখন এলাহাবাদে বাস করিতাম। তখনকার সিভিল্ লাইনসে সাউথ রোড বলিয়া এক রাস্তার উপর একটি বাংলো বাড়ীতে আমরা ছিলাম। বিকাল বেলা বাড়ীর ভিতরের উঠানে খেলা করিতেছি, বাবা তখন সবেমাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় আমাদের "মহারাজ" (পাচক ব্রাহ্মণ) ছুটিয়া আসিয়া তাহার দেহাতি হিন্দিতে মহা ব্যস্ত ভাবে খবর দিল যে বাহিরে দুই জন রাজা আসিয়াছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের কোথায় বসান হইয়াছে, মহারাজ বলিল সে তাঁহাদের নিজের খাটিয়া পাতিয়া বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। বাবা ব্যস্ত হইয়া বাহির

হইয়া গেলেন, আমিও তাঁহার পিছন পিছন রাজা দেখিবার আগ্রহে ছুটিয়া গেলাম। উপকথার রাজা ও রাজপুত্রদের অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা অনেক শুনিয়াছিলাম, রাজার চেহারা কেমন হয়, কল্পনায় তাহার একটা ছবিও ছিল। কিন্তু অভ্যাগত দুই জনের চেহারা দেখিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিলাম, রাজারা যে এত সুন্দর হয় তাহা জানা ছিল না। সত্যই আমাদের বুদ্ধিমান্ মহারাজের দড়ি-ছাওয়া খাটিয়ার উপরেই তাঁহারা বসিয়া ছিলেন। এক জনের পরিচ্ছদ কালো এবং অন্য জনের ধূসর। দুই জনই মাথায় ইরানী পাগড়ি পরিয়া আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণই তাঁহারা ছিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাবা আমাদের বলিয়া দিলেন যে, কালো পোষাকপরা যিনি তিনিই রবীন্দ্রনাথ ও ধূসর পোষাকপরা ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।

বাল্যকাল এলাহাবাদেই কাটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বাঙালী হইতে বাধে নাই। বাংলা সাহিত্যের স্বাদ অতি অল্প বয়সেই পাইয়াছিলাম। প্রবাসীতে 'মাষ্টারমশায়' পড়িয়া যে ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের ঢেউ বুকের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছিল তাহা এখনও মনে আছে। তাহার পর আসিল "গোরা"র যুগ। মাসের পর মাস কি আকুল আগ্রহেই অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম! এক মাসে যেটুকু খোরাক পাইতাম, তাহাতে ক্ষুধা ত একেবারেই মিটিত না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা তখনই হইত, যদিও বয়স তখন এগারো-বারোর বেশী নয়।

কিছু কাল পরে বাবা এলাহাবাদের বাস উঠাইয়া দিয়া, বরাবরের মত কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে একটি বাড়ীতে আমরা চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। প্রবাসী কার্য্যালয়ও ইহার নীচের তলাতেই ছিল। এই বাড়ীর পাশে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী, ইহার একতলায় ছিল 'দেবালয়'। শশিপদ বাঁচিয়া থাকিতে প্রতি সপ্তাহেই এখানে উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাদি হইত। এইখানে দ্বিতীয় বার রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। উহা বোধ হয় ১৩১৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেকালে তাঁহার সুকণ্ঠের সঙ্গীত শুনিবার আগ্রহ লোকের অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইতেই, চারিদিক্ হইতে অনুরোধ আসিতে লাগিল, একটি গানের জন্য। গান গাহিতে বলিলে আপত্তি তাঁহাকে তখনকার দিনে কখনও করিতে দেখিতাম না। শেষ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট খাতা বাহির করিয়া গান বাছিতে লাগিলেন। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার ক'রে আসে," গানটি বোধ হয় তখন সম্প্রতি রচনা করিয়াছিলেন, সেইটিই তিনি গাহিলেন। বক্তৃতার খবর বেশী লোকে পায় নাই, কাজেই 'দেবালয়ে'র ছোট ঘরখানি ভর্ত্তি হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও বাহিরে তেমন জনসমাগম হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর চারটি দেওয়ালের বাধা না মানিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবামাত্র 'দেবালয়ে'র সম্মুখের গলি ও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে লোক ভরিয়া উঠিল। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক এই গানটির ভিতরেও পৌত্তলিকতার আভাস পাইয়া রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন। তিনি কোনও উত্তর না দিয়া সস্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, ইহা এখনও মনে আছে।

ইহার পর ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়ী একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই; ডাঃ মৈত্র তখন মেয়ো হস্পিটালের উপরে বাস করিতেন। প্রকাণ্ড খোলা ছাদের উপর গানের আসর হয়। "তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি," গানটি সেদিন কবির কণ্ঠে শুনিয়াছিলাম।

১৩১৭ সালের ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক "রাজা" প্রথম অভিনীত হয় বোধ হয়। আমার দিদি কয়েকটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়া এই অভিনয় দেখিয়া আসেন। অসুস্থ থাকাতে সেবার আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারি নাই। দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যখন শান্তিনিকেতনের গল্প আরম্ভ করিলেন, তখন আমার আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার ত আর কোনও প্রতিকার নাই। স্থির করিলাম ২৫শে বৈশাখে যে উৎসব হইবে তাহাতে যাইবই যেমন করিয়া হোক। এক মাস আগে থাকিতে বাবা-মাকে বলিয়া কহিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম। সঙ্গিনীও আরও কয়েক জন জুটিয়া গেলেন।

২২শে বৈশাখ রাত্রির ট্রেনে আমরা একদল ছেলেমেয়ে বাবা ও স্বর্গীয়া ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই ট্রেনে আরও অনেকে শান্তিনিকেতনে যাইতেছিলেন। অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। "রাজা" অভিনয় এবারেও হইবে শুনিয়াছিলাম। তাহার অনেক সাজসরঞ্জাম আমাদের সঙ্গে এই ট্রেনেই চলিল দেখিলাম। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় তিন-চার ঘণ্টা

কাটিয়া গেল। রাত্রি দুইটা বা আড়াইটার সময় ট্রেন আসিয়া বোলপুর স্টেশনে থামিল। বোলপুর, বিশেষ করিয়া শান্তিনিকেতন অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্টেশনটি ত্রিশ বৎসর আগেও প্রায় এই রকমই ছিল। এখানে বেশীক্ষণ গাড়ী থামে না, এক রকম হুড়াহুড়ি করিয়াই ট্রেন হইতে নামিতে হইল। সবাই নামিয়াছে কিনা, কাহারও জিনিসপত্র ট্রেনে পড়িয়া আছে কিনা, এই লইয়া খানিক চেঁচামেচি, খোঁজাখুঁজি চলিল। তাহার পর সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী ও একটি বলদ-বাহিত বস্‌ অপেক্ষা করিতেছে দেখা গেল। আমাদের পরিচিত দুই জন যুবক শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। আমাদের সকলের ইচ্ছা যে হাঁটিয়া যাই, তাহা হইলে দুই ধারের দৃশ্য বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা তাহাতে একেবারেই নারাজ, তাঁহারা আমাদের গাড়ী না চড়াইয়া কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। ঘোড়ার গাড়ীতে চার জন, ও অন্য সকলে বস্‌-এ চড়িয়া যাত্রা করা গেল। শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোলপুরের বাজার ছাড়াইয়া আমরা খোলা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। বালিকার দৃষ্টিতে সেই আলোকপ্লাবিত প্রান্তর স্বপ্নলোকেরই মত সুন্দর লাগিয়াছিল। এখনকার চোখে যেন আর কিছুই তত সুন্দর লাগে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌছিলাম। ঘোড়ার গাড়ী আগে আগে আসিয়াছে, বলদের গাড়ীটি কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলাম। একজন চাকর আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। ফুলবাগানের ভিতর দিয়া গিয়া একটি চওড়া বারান্দা-ঘেরা বাড়ীতে উঠিলাম। বাড়ীটির চারিদিকেই বাগান, কয়েকটি সুন্দর আমলকী গাছ চোখে পড়িল। শুনিলাম ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী, তিনি এবং তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তখন পুরী বেড়াইতে গিয়াছেন, তাই অতিথিদের জন্য এখন এই বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীটির নাম শুনিলাম নীচু বাংলা। এখানে কেবল আমরা মেয়েরাই ছিলাম, একমাত্র কেবল বাবাকে কবি আমাদের অভিভাবক করিয়া সেখানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

একজন ভদ্রলোক আসিয়া এই সময় আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। দিদির কাছে শুনিলাম তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। আগের বার যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ফিরিয়া গিয়া ইঁহার ভদ্রতা ও অতিথিবৎসলতার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন দেখিলাম, তাঁহারা অত্যুক্তি ত করেনই নাই, হয়ত বা কমাইয়া বলিয়াছেন।

সামনের চওড়া বারান্দায় সতরঞ্চি বিছাইয়া আমাদের বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গিনীরা তখনও আসিয়া পৌছান নাই। বসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প হইতে লাগিল। আরও আধ ঘণ্টা পরে বলদ-যানটি আসিয়া পৌছিল। শুনিলাম আরোহীরা অর্দ্ধেক পথেই নামিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা ও কে কোথায় থাকিবে তাহার ব্যবস্থা করিতে খানিক সময় কাটিয়া গেল। কয়েক জন ছোট ছোট ছেলের উপর মেয়েদের আদরযত্ন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল বোধ হয়। তাহারা যত্নের আতিশয্যে আমাদের অস্থির করিয়া তুলিল। রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বালকগুলির ইচ্ছা আমরা আবার এখন শুইয়া ঘুমাই। বিছানা পাতিয়া দিতে তাহারা মহাব্যস্ত। অগত্যা অল্পক্ষণের জন্য আমাদের শুইতেই হইল। সন্তোষবাবু বলিয়া গেলেন, পরদিন সকালে বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্পোর্ট্‌স্ আছে। সুতরাং সকাল সকাল উঠিবার অনেক সংকল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিজে হয়ত যথেষ্ট ভোরে উঠিতে পারিব না, এই ভয়ে সঙ্গিনীদের একজনকে বলিয়া রাখিলাম, যেন তিনি আমাকে যথাকালে উঠাইয়া দেন। বেশীক্ষণ ঘুমান হইল না। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই উঠিয়া পড়িতে হইল। মুখ হাত ধুইয়া, কাপড়চোপড় পরিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দিনের আলোয় চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম। বাড়ীটির সামনে ও দুই ধারে বাগান, কিছু দূরে তালগাছবেষ্টিত একটি দীঘির মত দেখা যাইতেছে, পিছনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। বাগানে তখন ফুলের হাট বসিয়া গিয়াছে।

ছেলেদের খেলা মাঠেই হওয়া সম্ভব মনে করিয়া আমরা ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। এখনকার শান্তিনিকেতনের চেহারা যাঁহাদের কাছে পরিচিত তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না, যে, সেই ত্রিশ বৎসর আগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কি প্রকার ছিল। চারিদিকেই মাঠ আর খোয়াই, অনেক দূরে দূরে দুই-একটি সাঁওতাল-পল্লী দেখা যাইত। প্রথম যেবার গেলাম, শান্তিনিকেতনে তখন বোধ হয় দুইটির বেশী পাকা বাড়ী দেখি নাই। আর সব ছিল মাটির ঘর, খড়ের চাল। বিজলীর বাতি ছিল না, মোটরকার ছিল

না, বাঙালী ছাড়া বিদেশী মানুষও দু-একটির বেশী দেখি নাই। সেই মাঠগুলির অধিকাংশের উপরেই এখন ছোটবড় নানা আকারের পাকা বাড়ী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, পোয়াইগুলিও অনেক স্থানে শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। তখনকার পরিচিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের ভিতর অনেকেই এখন পরলোকগত, কেহ কেহ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৬ সালে, ৭ই পৌষের উৎসবে গিয়া শান্তিনিকেতনের যে-রূপ দেখিলাম, তাহা আমার কাছে একেবারেই নূতন। কিন্তু ছাতিমতলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনার বেদীর দিকে চাহিয়া, এবং মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কণ্ঠে উচ্চারিত বেদমন্ত্র শুনিয়া আবার মনে হইল, আমার মনের সেই শান্তিনিকেতন ত হারায় নাই, এই নূতন আবেষ্টনের ভিতরেও ত তাহাকে পাইলাম। কিন্তু আর সে সান্ত্বনাও ত রহিল না। এই প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা যিনি ছিলেন, তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনও যেন মনের মধ্যে অবাস্তব রূপ ধারণ করিতেছে।

সেদিনের দিকে আবার মুখ ফিরাইয়া তাকাই। মাঠের ভিতর দিয়া খানিক দূর যাইবার পরই একটি ছোট ছেলে আসিয়া খবর দিল যে, আমাদের জন্য খেলা আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া খেলার জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। খেলা অনেক রকমই হইল, এবং ছেলেরা দর্শকের নিকট হইতে প্রচুর প্রশংসা লাভ করিল। এইখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শিশুকাল হইতেই আমরা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে জানিতাম, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি হাতে লেখা প্রোগ্রাম আদায় করিলাম। শান্তিনিকেতনে তখন ছাপাখানা ছিল না। আশ্রমবাসিনী মহিলারা ও অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। সন্তোষবাবুর পত্নী শৈলবালার সহিত আলাপ হইল। মেয়েটির সরল ব্যবহারে আমরা সকলেই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম।

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ তখনও পাই নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। খেলার মাঝামাঝি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে গুরুদেব আসছেন।" সকলে ফিরিয়া তাকাইলাম। গেরুয়া রঙের দীর্ঘ পোষাকপরা তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, ধীরে ধীরে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মেয়েদের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়া তিনি ছেলেদের দিকে চলিয়া গেলেন।

খেলা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে নীচু বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ছেলের দল আমাদের জন্য জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা তখনই আমাদের খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আমরা তখন খাইতে একেবারেই নারাজ। কবিবরের পিছন পিছন সব কয়জন বাহিরের ঘরে গিয়া জুটিলাম ও তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া গেলাম। তাঁহার দুই-চারিটি কথা শুনিতে তখন আমরা উৎসুক, নিজে কথা বলিবার চেষ্টা বিশেষ করি নাই। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পরও প্রথম প্রথম সাহস করিয়া কথা বলিতাম না। কি কথা যে বলিব তাহাই ভাবিয়া পাইতাম না। অথচ তিনি যে ভয়ানক গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ নন, তাহা সেই স্বল্প পরিচয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আমাদের অভ্যর্থনা সমিতিটি কিন্তু হাল ছাড়ে নাই। জলখাবারের পাত্রসমেত তাহারা এই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অগত্যা আমাদের সেইখানে বসিয়াই জলখাবার খাইতে হইল, যদিও খানিকটা সঙ্কুচিত ভাবে। জলখাবারের সঙ্গে ছেলেরা দুধও আনিয়াছিল, আমাকে দুধ খাইতে বলায় আমি বলিলাম, "আমি কোনও জন্মে দুধ খাই না।" তিনি কথাটা শুনিয়া অত্যন্ত হাসিতেছেন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে অন্য অতিথিদের খবর লইবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন। আশ্রমবাসিনী কয়েক জন মহিলা আমাদের সঙ্গে খেলার মাঠ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও আর-একটুক্ষণ গল্প করিয়া নিজের নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন। একজন মহিলা শুধু থাকিয়া গেলেন আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে। তবে আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না, সেই ছোট ছেলেগুলি আমাদের সত্যই এত যত্ন করিয়াছিল যে এখন সে কথা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই। কোথা হইতে তাহারা মানুষকে এত যত্ন করিতে শিখিল? বাল্যকালে মানুষ আদর পাইতেই চায়, করিতে চায় না, জানেও না। সত্যের অপলাপ না করিয়াও বোধ হয় বলা যায় যে পুরুষ-জাতির এ বালাই আরও কম। কিন্তু এই দশ-বারো বৎসরের ছেলেগুলি দিনরাত হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করিত অতিথিদের জন্য। দারুণ রোদে ক্রমাগত খাবার বহিয়া আনা, জল তুলিয়া আনা, এ ত সারাক্ষণ ছিল।

টুড়ী
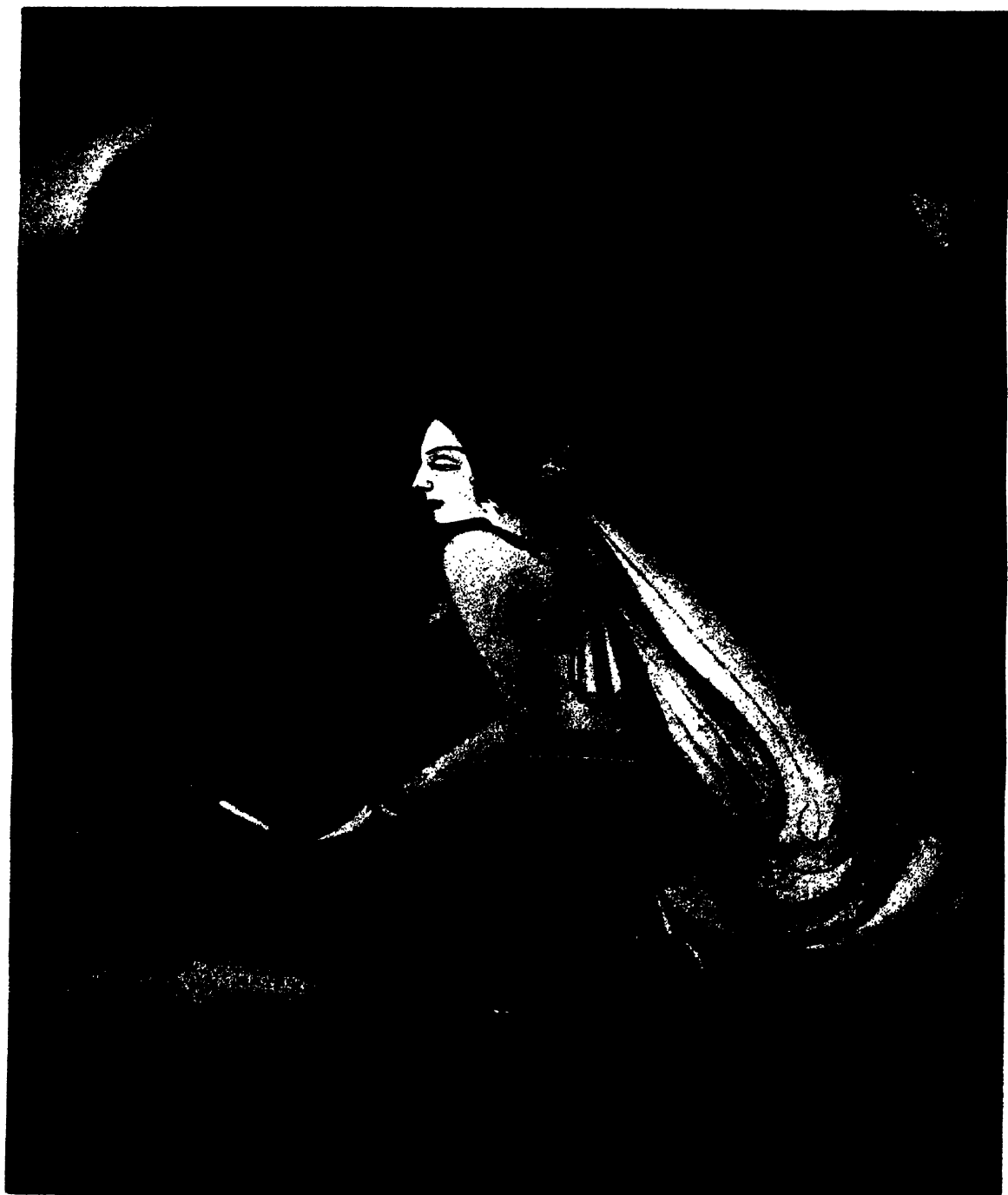
শ্রীমঙ্গল সিংজী (লাঠী)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাত জাগিতেও তাহাদের জুড়ি মিলিত না। অতিথিদের জন্য প্রয়োজন হইলেই নিজেদের বিছানাপত্র অকাতরে ধরিয়া দিত, ইহাও দেখিতাম। ইহা শিক্ষার গুণ এবং স্থানমাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে হইত না। সন্তোষবাবুকে এখনও যেন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাই। এতখানি পরিপূর্ণ ভদ্রতা আর কোনও মানুষের ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু সেই ভদ্রতার ভিতর কোনও কৃত্রিমতা, কোনও আড়ষ্টতা ছিল না, দুই দিনের পরিচয়েই তিনি যেন আমাদের পরমাত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলেগুলি ইঁহাদের আদর্শ দেখিয়াই শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। না হইলে স্কুলের ছেলে, বাংলা দেশে আর যেজন্যই বিখ্যাত হোক, ভদ্রতা এবং অতিথিবৎসলতার জন্য নিশ্চয়ই নহে। ছেলেগুলির যত্নের আতিশয্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা এক দিন সন্তোষবাবুরই কাছে নালিশ করিয়াছিলাম যে ইহারা ত আমাদের কিছুই করিতে দিতে চায় না, সবই তাহারা করিবে। সন্তোষবাবু বলিলেন, "এতেও গুরুদেব সন্তুষ্ট হন নি, বলছেন 'মেয়েদের কষ্ট হচ্ছে'।"

কষ্ট আমাদের বিন্দুমাত্রও হয় নাই। এখন সেই ত্রিশ বৎসর আগেকার দিন-কয়টির দিকে তাকাইয়া ভাবি, এইরূপ নির্ম্মল আনন্দ জীবনে আর কোনদিনও কি জুটিয়াছিল?

রবীন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর স্নানাহারের আয়োজন চলিতে লাগিল। শান্তিনিকেতনে তখন নিরামিষ খাওয়া চলন ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর বাহিরের বড় ঘরখানিতে ঢালা বিছানা পাতিয়া সকলে বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সকলের তখন আকণ্ঠ কথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, বিশ্রাম করিবে কে? সকলে কথাই বলিতে লাগিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ আবার এ বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়া শুনিলাম, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে আসিবেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

হঠাৎ আমাদের কলকোলাহলের ভিতরেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ শান্তশিষ্ট হইয়া বসিবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ রূপে সার্থক হইল না। যাহা হউক, সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, এবং তিনি বসিবার পর আবার সকলে বসিলাম। বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারাও তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নানা ঘরোয়া বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলাম। আমরা তখন তাঁহার গান বা পাঠ শুনিতে উৎসুক, ওসব আলোচনা আমাদের ভাল লাগিবে কেন? তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার জননী এই সময় উপস্থিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সহিত নানা প্রকার রসালাপ করিতেছিলেন। ইহাও আমাদের বিস্ময়ের খোরাক কিছু জোগাইয়াছিল। কবিবরকে আমরা পুরাকালের তপোবনের ঋষিরই মত একটা কিছু কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি যে আবার সাধারণ মানুষের মত সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করেন বা বৈবাহিকার সঙ্গে রসিকতা করেন, ইহা দেখিয়া মুগ্ধবিস্ময়ে আমাদের মন ভরিয়া গেল।

এক জন ভদ্রমহিলা শান্তিনিকেতনের দারুণ গ্রীষ্মের কথা তোলাতে তিনি বলিলেন, "গরমের আমি একটি মাত্র ওষুধ জানি, সেটি হচ্ছে কবিতা লেখা।"

ইহার ভিতর এক জন শিক্ষক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মহিলারাও সভাভঙ্গ করিয়া ভিতর-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গান বা পাঠ না শুনিতে পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম যে কবি তখনও চলিয়া যান নাই, বারান্দায় একটি বেতের ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। পরে শুনিয়াছিলাম ঐ চেয়ারখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল।

আমরা মেয়ের দল আবার আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের ভিতরে একজন তাঁহাকে 'খেয়া' পাঠ করিয়া শুনাইতে অনুরোধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। তখনকার দিনের কথা যখন স্মরণ করি তখন এই ভাবি, যে, কখনও ত তাঁহাকে কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে দেখি নাই, সে যতই ক্ষুদ্র, যতই অর্ব্বাচীন হোক্ না কেন। তাঁহার যেন শ্রান্তিক্লান্তিও ছিল না। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অম্লানবদনে এক আসনে বসিয়া গান গাহিয়াছেন, গল্প করিয়াছেন, কবিতা পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার অর্দ্ধেক বয়স যাহাদের, তাহারা পা বদ্‌লাইয়াছেন পঞ্চাশ বার, উঠিয়াও গিয়াছেন দুই-চারি বার। তিনি কিন্তু মর্ম্মরনির্ম্মিত মূর্ত্তির মত একই ভাবে বসিয়া থাকিতেন। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াও সকল দিক্ দিয়াই তিনি যেন মনুষ্যত্বের ক্ষুদ্র সীমানার বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই সামান্য জিনিসগুলি হইতেও বুঝা যায়।

কিন্তু কোন্ কবিতাটি পড়া হইবে? কেহই তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারে না। তখন তিনি বলিলেন, "তার চেয়ে আমি এক কাজ করি, সেটা তোমাদের বেশী

interesting লাগবে। আমার লেখা 'জীবনস্মৃতি' তোমাদের পড়ে শোনাই।"

সকলে মহোৎসাহে 'জীবনস্মৃতি' শুনিতে প্রস্তুত হইলাম। সেদিন 'জীবনস্মৃতি'র অনেকখানিই তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে এই বইখানি প্রকাশিত হইবার সময় কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি স্নেহ করিয়া তিনি আমাকে দান করিয়াছিলেন। সেটি সৌভাগ্যক্রমে এখনও আমার কাছে আছে। আরও কত অমূল্য রত্ন হাতে আসিয়াছিল। সংসারের কণ্টকময় পথে চলিতে চলিতে কিছু বা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিছু এখনও কাছে আছে।

সন্ধ্যা আসিয়া পড়াতে সেদিন আর পাঠ শেষ হইল না। আর একদিন বাকিটা পড়িয়া শুনাইবেন আশ্বাস দিয়া তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তিনি "শান্তি-নিকেতন" ভবনে বাস করিতেন। নীচু বাংলা সেখান হইতে কম দূর নয়। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি হাঁটিয়া আসিতেন, কখনও ছাতা লইয়া, কখনও না লইয়াই। বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটিতেন, দুই-চার বার তাঁহার সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, আমাদের সাধ্যে কুলায় না।

বিকালবেলাটা বাঁধের ধারে ও মাঠে বেড়াইয়া কাটাইয়া দিলাম। বাঁধটিতে তখন জল বেশী ছিল না। কিন্তু বৈশাখের গরমে বিদ্যালয়ের কুয়াগুলির জল শুকাইয়া উঠিতেছিল। তাই পুরুষ অতিথিদের ভিতর অনেকে এবং বিদ্যালয়ের ছেলেরা এই বাঁধের জলেই স্নান করিতে আসিতেন দেখিতাম। আমরা অবশ্য সেই ছোট ছেলেগুলির অনুগ্রহে জলের কষ্ট কখনও অনুভব করি নাই।

বিকালে আর একপাল৷ ছেলেদের খেলা দেখা গেল। সন্ধ্যার সময় শান্তিনিকেতন ভবনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা সকলেই তখন বালিকা, কেহ বা স্কুলে পড়ি, কেহ বা সবে স্কুলের গণ্ডি ছাড়াইয়াছি। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিলেন। সে-সব অমূল্য বাণী, কেন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি নাই, সেই ক্ষোভ এখন মনে জাগে।

শান্তিনিকেতনের তিনতলার ছাদে উঠিয়া সেদিন অনেকক্ষণ বেড়াইয়াছিলাম। মাঝে একজন যুবক আসিয়া খবর দিলেন যে গিরিধি ও কলিকাতা হইতে মস্ত আর একদল অতিথি আসিয়া পৌছিয়াছেন, এত লোকের আসিবার কথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে এই খবরে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন বোধ হইল। এত লোককে যথোপযুক্ত আদরযত্ন করা বা স্থান দান করা সম্ভব হইবে কি না সেবিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেয়েরাও অনেকে আসিয়াছেন শুনিয়া আমাদের দলের অনেকে নীচু বাংলায় ফিরিয়া গেলেন, নবাগতদের ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই সময় ঝড় আসিয়া পড়ায় আমরা তেতলার ছাদ হইতে নামিয়া দোতলার গাড়ী-বারান্দার ছাদে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ চাকর এবং আলো সঙ্গে দিয়া আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

নীচু বাংলায় আরও অনেকগুলি মহিলা ও বালিকা আসিয়াছেন দেখিলাম। কেহ বা পরিচিতা কেহ অপরিচিতা। দিদি এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে রাত্রিটা আমাদের বড়ই উদ্বেগের ভিতর দিয়া কাটিল। অতিথিদের ভিতর একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন, তিনি আসিয়া তাহাকে কয়েক বার দেখিয়া গেলেন। রাত্রিতে আরও একপাল৷ অতিথিসমাগম ঘটিল। নীচু বাংলায় আর তিল ফেলিবার জায়গা রহিল না। আমরা এক ঘরে বার-চৌদ্দজন করিয়া শুইতে আরম্ভ করিলাম। এক-জন মহিলা ট্রেনে কাপড়ের বাক্স ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, যে ক'দিন তিনি এখানে ছিলেন, নিজের ঐ হারান কাপড়-গুলির জন্য অবিশ্রাম বিলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা কাপড়চোপড় ধার দিয়া তাঁহাকে সেযাত্রা উদ্ধার করিয়াছিলেন।

২৪শে বৈশাখ সকালেও ছেলেদের খেলা ছিল। কিন্তু দিদির অসুস্থতার জন্য সেখানে যাইতে পারি নাই। সেদিন আর রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই নাই। অভিনয়ের নানা কাজে তিনি সকাল হইতে ব্যস্ত ছিলেন। অভিনেতাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ ত তিনি সবটাই করিয়াছিলেন, আবার তাহাদের সাজান, makeup করা, তাহাও সেকালে তাঁহাকেই করিতে হইত।

ছেলেরা আজ কিছু ব্যস্ত ছিল বলিয়া পরিবেশনের কাজে আজ মেয়েরা কিছু কিছু সাহায্য করিল। ইহাতেও অবশ্য সন্তোষবাবু ও তাঁহার ক্ষুদ্র চেলার দল যথারীতি আপত্তি করিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মহিলারা এক দল রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ শুনিতে গেলেন। প্রবন্ধটি অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রচিত। আমরা আর-এক দল নেপালবাবুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সেই দারুণ গ্রীষ্মে, নিদারুণ রৌদ্রে কিভাবে যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম তাহা ভাবিলে এখন অবাক লাগে। ওখানকার ছেলেরা জুতা

পরিত না, দেখাদেখি আমরাও খালি-পায়ে বেড়াইতাম। ছাতার বালাই ত প্রথম হইতে ছিল না।

সন্তোষবাবু তখন একটি গোশালা খুলিয়াছিলেন। অনেকগুলি গরু-মহিষ দেখিলাম, তাহারা বেশ যত্নেই আছে। একটি প্রকাণ্ড কালো মহিষ দেখিয়া ও তাহার বীর- ও রৌদ্র- রসের বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। ডেয়ারী ফার্ম্ম দেখার পরে বিদ্যালয়ের ঘরগুলি, লাইব্রেরি, হাসপাতাল ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছাতিম-তলার বেদীও দেখিয়া আসিলাম।

একটি ছোট ছেলেকে এই সময় দেখিলাম, তাঁহার ডাকনাম গুলু। ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, তবে মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর। ইহার অনেক গল্প আগেই শুনিয়াছিলাম। ছেলেটি আশ্রমে আসিয়া প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পায়, তাঁহাকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি নাকি কবিতা লেখ?" তিনি অপরাধ স্বীকার করায় গুলু বলিল, "আমিও লিখি।" খাতা বাহির করিয়া সে তাঁহাকে কবিতা শুনাইয়াও দিল।

বিকালবেলাটা এদিক্-ওদিক্ বেড়াইয়াই কাটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের জন্য মেয়েদের কতকগুলি ফুলের মালা গাঁথিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাও খানিকক্ষণ করা গেল। নীচু বাংলার সামনে তখন বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান ছিল, ফুলের কিছু অভাব হইল না।

সন্ধ্যার পর "রাজা" অভিনয় আরম্ভ হইল। তখন 'নাট্যঘর' নামক একটি বড় মাটির ঘরে অভিনয় হইত। ব্রাহ্মসমাজে লালিতপালিত হওয়াতে অভিনয় ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। "রাজা" অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন, আড়াল হইতে "রাজা"র ভূমিকাও তিনিই অভিনয় করিয়াছিলেন। 'ঠাকুরদাদা' সাজিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সদাসর্ব্বদা যে গেরুয়া রঙের পোষাক পরিতেন, তাহার উপর ফুলের মালা পরিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদাদা যেখানে রাজসেনাপতির বেশে আবির্ভূত হইলেন, সেখানে অবশ্য বেশের পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাদা রেশমের পোষাকের উপর চওড়া লাল কোমরবন্ধ পরিয়া তিনি বাহির হইলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব। তাঁহার সব-কিছুর তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই মিলিত। একটি জিনিস আমার সর্ব্বদা মনে হইত যখনই তাঁহার অভিনয় দেখিতাম। তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হোন্, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। আকাশের সূর্য্যকে যেমন সাজাইয়া তারকার মূর্ত্তি ধরান যায় না, তাঁহাকেও তেমনই অন্য কাহারও মূর্ত্তি ধরান যাইত না।

দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া, আলখাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাগল সাজিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া দুই-তিনটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রাণী সুদর্শনা, ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরঙ্গমা সাজিয়াছিলেন। কাঞ্চিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন জগদানন্দ রায় মহাশয়। নাটকের ভিতর অনেকগুলি গান ছিল, তাহার কয়েকটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। পরে শুনিলাম, অভিনয় বেশী দীর্ঘ হইলে অতিথিরা পাছে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাই এই ব্যবস্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন। ক্লান্ত অবশ্য কেহই হন নাই, হইতেনও না। ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ঠাকুরদাদারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পারিতেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের মূর্ত্তিই শুধু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন।

২৫শে বৈশাখ ভোর পাঁচটার সময় আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের আগেও অনেকে উঠিয়াছেন দেখিলাম। ভোর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক বাঁধ হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। আমরাও স্নানাদি সারিয়া আম্রকুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও বেশী লোক-সমাগম হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও আসেন নাই। উৎসবক্ষেত্র আল্‌পনা ও পত্রপুষ্পে অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। আমরা না বসিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, কবি শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইয়া উৎসবক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আম্রকুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। আশ্রমবাসী ও অতিথিবর্গে দেখিতে দেখিতে সভাস্থল ভরিয়া উঠিল। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। আচার্য্যের কাজ করিলেন তিনজন, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়। নেপালবাবু শেষের দিকে ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন। তাঁহার কয়েকটি কথা মনে আছে। তিনি

বলিয়াছিলেন, "তোমরা সকলেই গুরুদেবকে ভক্তি কর, কিন্তু তাঁকে কখনও যেন ঈশ্বরের স্থানে বসিও না।"

এখন মনে হয়, এ উপদেশের প্রয়োজন ছিল, শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, অন্য অনেকের জন্যও। এই হতভাগ্য দেশে তিনি মূর্ত্ত দেব-আশীর্ব্বাদ ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া মনে হয় দেবতাই আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন। একজন মানুষের মৃত্যুতে কোনও দেশ কখনও এমন রিক্ত আর কোথাও হইয়াছে কি? আজ যদি গৌরীশৃঙ্গ ভাঙিয়া পড়িত, বা ভাগীরথী শুকাইয়া যাইতেন, তাহা হইলে কি বাঙালী ইহার চেয়ে অধিক অভিভূত হইত? এই নিরাশার মহাতমস্বিনীর ভিতর আলোক-রেখা ত কোথাও দেখিতে পাই না?

রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের দিক্ হইতে অনেকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল। তিনি ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিয়া অল্প কিছু বলিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু মনে আছে। "আমাকে আপনারা যে উপহার দিলেন, সেগুলি পাবার আমি কতখানি যোগ্য তা যদি আমি মনে করতে যাই, তাহলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে মানুষের কোনো লজ্জা নেই, সেটা প্রীতির ক্ষেত্র। এই সব উপহার আমাকে আপনারা প্রীতির সহিত দিচ্ছেন, সেইজন্য এসব গ্রহণ করতে আমার কোনো বাধা নেই।"

কবিবরকে অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইয়াছিল। সভাস্থ অতিথিদেরও ফুলের মালা ও চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। এইখানে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিলাম।

সভার কার্য্য শেষ হইতেই কবিকে প্রণাম করিবার ধুম পড়িয়া গেল। প্রায় তিন শত ব্যক্তির প্রণাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে আধ ঘণ্টারও বেশী দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ছেলেদের প্রণামের পালা সাঙ্গ হইতেই তিনি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা এতখানি বঞ্চিত হইতে একেবারেই স্বীকার করিলাম না। সন্তোষবাবু গিয়া তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিলেন। মহিলা ও বালিকাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া তবে তিনি যাইতে পথ পাইলেন।

নীচু বাংলায় ফিরিয়া শুনিলাম অভ্যাগতদিগের ভিতর অনেকেই বেলা দুইটার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছেন। আমাদের নিজস্ব দলটি ও আর দুই এক জন মাত্র আরও এক দিনের জন্য থাকিয়া গেল।

ইহারই ভিতর একদিন সুকুমার রায় তাঁহার "অদ্ভুত রামায়ণ" গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উহা ২৪শে কি ২৬শে বৈশাখ হইয়া থাকিবে। এই রামায়ণ গানটি সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। "অদ্ভুত রামায়ণে" একটি গান আছে, "ওরে ভাই তোরে তাই কানে কানে কই রে, ঐ আসে, ঐ আসে ঐ, ঐ, ঐ রে।" আশ্রমের ছোট ছেলেরা ঐ গানটি শোনার পর সুকুমারবাবুরই নামকরণ করিয়া বসিল, "ঐ আসে।" একটি ছোট ছেলে মাঠের ভিতর গর্ত্তে পড়িয়া গিয়া আর উঠিতে পারিতেছিল না। সুকুমারবাবুকে সেইখান দিয়া যাইতে দেখিয়া, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও ঐ আসে, আমাকে একটু তুলে দিয়ে যাও ত।"

ক্রমশঃ

লেখিকার ডায়েরী অবলম্বনে লিখিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিশ্বভারতীর সভাপতিত্বের জন্য অবনীন্দ্র-নাথের নাম প্রস্তাব

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে বিশ্বভারতীর সভাপতির পদ শূন্য হ'য়েছে। আমরা জেনে খুশি হ'য়েছি বিশ্বভারতীর সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ ক'রেছেন যে, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করা হোক। আমরা সানন্দে সর্বান্তঃকরণে এই সুপারিশের সমর্থন করছি।

বাংলা দেশে, ভারতবর্ষে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ নাই। তাঁর শূন্য পদে বসাবার জন্যে তাঁর মত অন্য একটি মানুষ পাওয়া যাবে না। কিন্তু এমন কাওকে বিশ্বভারতীর সভাপতি করা চাই, যাঁর এর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মধারার সঙ্গে মনের মিল আছে, যিনি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সহিত পরিচিত, যাঁর নিজের সৃজনী প্রতিভা আছে, এবং যিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন। এই সব রকম যোগ্যতাই অবনীন্দ্রনাথের আছে। চিত্রে তাঁর সৃজনী প্রতিভা সুবিদিত। তিনি সুশিক্ষক। যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি ওস্তাদ। বাংলা সাহিত্যেও তিনি কীর্ত্তিমান।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রবীন্দ্র-স্মৃতি-সংবর্ধনা

গত ২০শে ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রমেশ-ভবনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। শিল্পী শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বসুর আঁকা ও তাঁর দেওয়া রবীন্দ্রনাথের একটি ছবির আবরণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উন্মোচন করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি সর্ যদুনাথ সরকার এই অনুষ্ঠানে সভাপতির কাজ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :—

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন আমরা কলেজে পড়িতাম তখন একটা চলতি কথা ছিল "মাইকেল বাঙ্গলার মিল্টন, নবীনচন্দ্র বাঙ্গলার বাইরণ এবং রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার শেলী"। সে যুগে আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতা-রচয়িতা বলিয়া লোকের কাছে পরিচিত ছিলেন। প্রভাত সঙ্গীত, ভানুসিংহের পদাবলী, বাল্মীকি প্রতিভা এ সব মাত্র তাঁহার দান ছিল; তখনও মানসী ও সাধনার যুগ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিকাশের এটা শৈশবমাত্র; যখন চিন্তা ও ভাবের, ভাষা ও ভঙ্গীর পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইলেন তখন এক দিকে মনস্তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখাইতে লাগিলেন, অপর দিকে পুরুষোচিত হৃদয়-বলের, সরলতার সহিত দৃঢ়তার, প্রকৃত মনুষ্যত্বের, ত্যাগ, শক্তি, যন্ত্রণা সহিবার বল, অসত্য অবিচারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার প্রেরণা তাঁহার লেখনী হইতে বাঙ্গালী সমাজের প্রাণে মৃত সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়াছিল। এই জিনিসটির তখন বড় আবশ্যক ছিল। কারণ তখন বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বলিয়া একটা জিনিস ছিল না। হেম ও বঙ্কিমের আহ্বান "বন্দেমাতরম্ ও ভারতসঙ্গীত" স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষণিক প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। অবসাদ ও অবহেলায় সেই প্লাবনে ভাঁটা আসে। এই সময় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও বল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কুসুমের মত মৃদু, বজ্রের মত কঠিন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এক দিকে যেমন কোমলতা ও মৃদুধ্বনি, অন্য দিকে আছে প্রকৃত মনুষ্যত্বের শক্তি ও পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া বাঙ্গালী জাতি যদি এই চিত্তবল সাধনা করে, তবেই রবীন্দ্রস্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে।

সর্ যদুনাথ সরকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণে তাঁর কোন কোন গ্রন্থের ঐতিহাসিক দিক সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি পূরা ন্যায়বিচার করেছেন। আবার রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক্ কথা বলা হ'য়েছে। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত অন্য লেখকদের কথা ভুলে যান, তাঁরা ঐতিহাসিক যদুনাথের কথাগুলি মনে রাখবেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কবিতায় ও গানে দেশভক্তি ও দেশহিতৈষণার উদ্দীপনা ও প্রেরণা প্রদান করেন নি, "আপনি আচরি" দেশভক্তি ও জনহিতৈষণা শিখিয়েছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অসুস্থ ও দুর্বল ব'লে স্বয়ং বক্তৃতা করতে বা নিজের অভিভাষণটি পড়তে পারেন নি। নীচে ছাপা তাঁর অভিভাষণটি অন্যের দ্বারা সভাস্থলে পঠিত হ'য়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ করা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। গল্পে, গানে, কবিতায়, নাট্যে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় বাঙ্গলা সাহিত্যে এই মহারথী তাঁহার প্রতিভার অমর অবদানে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বিজয়মাল্য আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গজননীর লজ্জানত শিরে তিনি বিজয়তিলক পরাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা আজ যে পৃথিবীর সর্বত্র আদৃত তাহার মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রাণপণ চেষ্টা। বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গলা ভাষা পাঠ করা ইংরাজ রাজত্বের প্রথম যুগে শিক্ষিত সমাজের রুচিবিকার বলিয়া গণ্য হইত। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লইয়া তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে যথেষ্ট বিদ্রূপও করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহিত্যক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু আত্মচেতনা প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে গড়িয়া ওঠে নাই, একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেক দিকপাল মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এবং ভাষাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ইহা ঠিক। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রাণশক্তি তাঁহাদের প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ অতি দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া পথ খুঁজিয়া লইতেই তাঁহাদের অনেকটা শক্তির অপব্যয় করিতে হইয়াছিল। সাধারণ লোক তখনও যেমন সাহিত্যের ধার ধারিত না, এখনও তেমনি তাহার সন্ধান রাখে না। রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ কালেও যে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাঙ্গলা সাহিত্য সম্পর্কে তেমন আস্থাবান ছিলেন না তাহা অনায়াসে বলা যায়। বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলে অবশ্য এই অবস্থা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার গতিবেগ খুব বেশী ছিল না। ঠিক এই রকম সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিলেন তাঁহার চিত্তের ঐশ্বর্য্য ও ভাষার ঝাঙ্কার লইয়া। কমপক্ষে ৬০ বৎসর বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহার অলোকসামান্য সৃজনী শক্তি ও অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার উপভোগ করিতে পারিয়াছে এবং কোন প্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বোধ হয় বলা যায় সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালে শ্রদ্ধানত শিরে তাঁহার সার্থক সৃষ্টির পূজা করিবে। রবীন্দ্রনাথের গুণকীর্ত্তন করার আজ প্রয়োজন কিছু আছে বলিয়া মনে করি না। বাঙ্গলার এই সত্যকার গুণীর গুণকীর্ত্তন সমস্ত জগতেই হইতেছে। বিজ্ঞাপন দিয়া, বক্তৃতা দিয়া প্রচার করিবার মত গুণী রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁহার প্রতিভার অমর অবদানে আমাদের এই পরিষদ্ আজ ধন্য হইয়াছে তাই পরিষদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে তাঁহার স্মৃতিপূজার। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া আজ আমরা ধন্য হইব, আমাদের অভিশপ্ত জাতীয় জীবন তাঁহার অস্তাচল গমনে আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জানি না ভগবানের আশীর্ব্বাদে কবে আবার নূতন উষার অরুণোদয় হইবে।

মাত্র এই কয়টি কথা বলিয়াই আমি আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করি।

প্রমথ চৌধুরী জয়ন্তী

গত ২০শে ভাদ্র কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে "বীরবল" জয়ন্তী অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী মশায়ের জয়ন্তী মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সুমুদ্রিত তাঁরই 'গল্পসংগ্রহ' এবং এক হাজার টাকা উপহার দেওয়া হয়। তাঁকে যে-সব মানপত্র দেওয়া হয়, সেই সবগুলির উত্তরে পঠিত তাঁর বক্তব্যে তিনি এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন, "শ্রীমান্ অমিয় চক্রবর্ত্তী ত এই অনুষ্ঠানের মূল; কারণ তিনিই প্রথম 'প্রবাসী' পত্রিকায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।"

এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত ও শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের পর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উৎসবের প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে মাল্যদান ও বরণের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ প্রশস্তি পাঠ করেন। সম্বর্ধনা-সমিতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রবিবাসর, বনফুল সমিতি প্রভৃতি মানপত্র দান করেন।

প্রমথ জয়ন্তীর আয়োজন চলছে শুনতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা থেকে উদ্যোক্তাদের নিকট এই আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন :—

"আমার এই নিভৃত কক্ষের মধ্যে সংবাদ এসে পৌঁছল যে প্রমথর জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ চলেছে—দেশের যশস্বীরা তাতে যোগ দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্তৃত্বপদ নেবার অধিকার স্বভাবতই আমারই ছিল। যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি তাঁর পেয়েছি সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িক পত্র চালনায় ক্লান্ত ও বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বান মাত্রে "সবুজপত্র" বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্যসাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রের সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথের প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি।

প্রমথের গল্পগুলিকে একত্র বার করা হচ্ছে এতে আমি বিশেষ আনন্দিত, কেন না গল্পসাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে। বাংলা দেশে তাঁর গল্প সমাদর পেয়েছে, এই সংগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবে।

অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয় নি, সেই জন্য আমি বিস্ময় বোধ করেছি। আজ ক্রমশ যখন দেশের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর কীর্তির অবরোধ উন্মোচিত হোলো, তখন আমি নিস্তেজ এবং জরার অন্তরালে তাঁর সঙ্গ থেকে দূরে পড়ে গেছি। তাই তাঁর সম্মাননা সভার দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করতে পারলেম না। বাহির থেকে তার কোন প্রয়োজন নেই অন্তরেই অভিনন্দনের আসন প্রসারিত করে রাখলুম, দলপুষ্টির জন্য নয়, আমার মালা এতকাল একাকীই তাঁর কাছে সর্বলোকের অগোচরে অর্পিত হয়েছে, আজও একাকীই হবে। আজ বিরলেই না হয় তাঁকে আশীর্বাদ করে বন্ধুকৃত্য সমাপণ করে যাব।

সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিম্নমুদ্রিত বক্তব্য শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী পড়েন।

"আমার সুনাম এবং দুর্নাম আছে যে, আমি বাংলার মৌখিক ভাষাকে লিখিত ভাষায় প্রমোশন দিয়েছি। যা কানের বিষয়, তাকে চোখের বিষয়ে রূপান্তরিত করেছি; এক কথায় শ্রুতিকে দর্শনে পরিণত করেছি।

একথা যদি সত্য হয় ত আমি নিজের কাছে নিজেই কৃতজ্ঞ। কারণ, আজকের দিনে প্রকাণ্ড সভায় নিজমুখে মনের কথা ব্যক্ত করতে অক্ষম হলেও লেখনী দ্বারা সেই কথাই ব্যক্ত করতে পারি, এবং অপরের মুখ দিয়ে তা আপনাদের কর্ণগোচর করতে পারি।

আমার শেষ বয়সে আপনারা আমাকে যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তা'তে যে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রথম বয়সে আমাকে বহু বিরোধী সমালোচকের বাক্যবাণ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সে সমালোচনায় আমি একদিনের তরেও উদ্‌ভ্রান্ত হই

নি। কেন না অনুকূল বা প্রতিকূল কোন সমালোচকই কোনদিন আমার লেখা উপেক্ষা করেন নি। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টিই হোক আর নিন্দার শিলাবৃষ্টিই হোক, উভয়কেই আমি শিরোধার্য করেছি। একমাত্র উপেক্ষাই লেখকের পক্ষে ভগ্নমনোরথের কারণ, আমার কলমের স্কন্ধে যে দুষ্টসরস্বতী ভর করেন নি, আর আমার লেখনীধারণ যে সার্থক হয়েছে তার প্রমাণ আজকের এই সভা। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি, তাতে আর বিচিত্র কি?

আজ আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করা ছাড়াও এই অনুষ্ঠানের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আজকের সভার যিনি উদ্বোধনকর্ত্তা, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তিনি তাঁর স্বনামধন্য পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁর স্বর্গীয় পিতাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষাকে স্থান দিয়েছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ তাকে উচ্চপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে আমার রচনা সাহিত্য ব'লে গণ্য এবং মান্য হয়েছে, সে আমার অতি সৌভাগ্যের কথা।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার আমার সহপাঠী। তিনি যে বাঙ্গালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক, তা' সর্ব্ববাদিসম্মত। ইতিহাসও সাহিত্যের একটি অঙ্গ। জাতিস্মর হবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলেরই আছে এবং সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে একমাত্র ইতিহাস। সরকার মহাশয় বেশীর ভাগ লেখেন ইংরেজি ভাষায়। এ সত্ত্বেও তিনি যে আমার মত বাঙলা লেখককে কৃতি সাহিত্যিক বলে গণ্য করেন, তা'তে আমি ধন্য হয়েছি। সাহিত্য-পরিষদের মুখপাত্র স্বরূপ তিনি আমাকে যে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাতে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আজকের সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার আ-কৈশোর বন্ধু। আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই; এবং আজীবন তাঁর আনুকূল্যে কখনো বঞ্চিত হই নি। তিনি যে কত বড় পণ্ডিত, সে বিষয়ে বাগবিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সেকথা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি যে কেবলমাত্র বড় দার্শনিক, তা নয়—সেই সঙ্গে অসাধারণ কর্ম্মী। আমাদের একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য সভাকে তিনিই বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদে পরিণত করেছেন। তার পর নানা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনকে তিনিই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অধ্যবসায়, প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা, পরিশ্রম-শক্তি ও ধৈর্য আমাকে চিরকালই বিস্মিত করেছে। এই সুযোগে আমি তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই।

এই অনুষ্ঠানের সম্পাদকদ্বয়ও আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীমান অমিয় চক্রবর্ত্তী ত' এই অনুষ্ঠানের মূল, কারণ তিনিই প্রথম 'প্রবাসী' পত্রিকায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং অসুস্থ শরীর ও নানাপ্রকার কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই সভার সাফল্য কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করেছেন। তিনি আবাল্য আমার স্নেহের পাত্র তাঁকে আর কি ধন্যবাদ জানাব। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এই কার্য্য সুসম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় যে কঠিন পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনা নেই। আমি সে ভাষা জানি নে, যে ভাষায় এই নিঃস্বার্থ বন্ধুঋণের পরিশোধ করতে পারি।—অন্যান্য যে সকল কর্মী এই সংবর্দ্ধনাকে জয়যুক্ত করার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন, স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নাম উল্লেখ না করলেও আশা করি তাঁরা আমার মনোভাব বুঝতে পারবেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এই আনন্দের দিনেও ঘোর বিষাদের ছায়ায় আমার মন আচ্ছন্ন। সাহিত্য সাধনায় যিনি আমার উত্তরসাধক ছিলেন, যাঁর মা-ভৈ বাণী আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর করেছে, সেই রবীন্দ্রনাথ আজ নেই। আজ তিনি থাকলে পরম আনন্দ অনুভব করতেন, আমার আনন্দও সম্পূর্ণ হ'ত। তাঁর অভাবে আজ সমস্তই শূন্য ও নিরানন্দ মনে হচ্ছে। কিন্তু জীবনে পরম দুর্যোগের মুহূর্ত্তেও যিনি হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে কখনো প্রশ্রয় দেন নি, সেই মহান্ জীবনশিল্পীকে হারিয়েও যেন আজ আমরা তাঁর কাছ থেকে "নাত্মানমবসাদয়েৎ"— এই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে অপরাজিত হৃদয়ে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

আজ যাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন, দেশের সেই সব লেখক ও পাঠককে ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই সুযোগে আমার অন্তরের প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করছি।

—

সরকারী আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

গত ২০শে ভাদ্র কল্‌কাতার সরকারী আর্ট স্কুলে, অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর সম্বর্ধনা হয়। অবনীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে এই ইস্কুলে 'মাস্টারি'তে প্রবৃত্ত হন, তা তাঁর জবানি লেখা গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীমতী রাণী চন্দর প্রবন্ধটিতে পাঠকরা পড়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের বহু ছাত্র, আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মহিলাবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

আর্ট স্কুলের নীচের হলঘরে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে হলঘরটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথের বসিবার জন্য পত্র পুষ্প সহযোগে একটি উচ্চাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথ উপবেশন করিলে সমবেত কণ্ঠে "ওহে সুন্দর মরি মরি..." গানটি গীত হয়। আর্ট স্কুলের একজন ছাত্রী অবনীন্দ্রনাথকে মালা, চন্দন ও অর্ঘ্য প্রদান করে। শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা গরদের ধুতিচাদর দিয়া অবনীন্দ্রনাথকে গুরুবরণ করেন।

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মুকুল দে চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও কর্ম্মীবৃন্দের পক্ষ হইয়া অবনীন্দ্র-প্রশস্তি পাঠ করেন। মুগার কাপড়ের উপর লিখিত প্রশস্তিপত্রখানি শ্রীযুত দে অবনীন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করেন। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হইতে অবনীন্দ্রনাথকে রৌপ্যনির্ম্মিত রঙের বাক্স ও সোনার তুলি প্রদত্ত হয়।

তাঁর উদ্দেশে রচিত ও পঠিত প্রশস্তিপত্র থেকে অল্প অংশ উদ্ধৃত করছি।

ভারতীয় চিত্রকলা যখন অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত, তখন সাধারণে ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তখন আপনিই নিজে আবার নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজারীর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক ইহার বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়াছিলেন। জানি আমরা সেই ঝঞ্ঝার দিন। কী প্রতিকূল ভাবের মধ্য দিয়া সেই সময়ে আপনাকে পথ করিয়া লইতে হইয়াছিল। ভারতীয় চিত্রকলা-মন্দিরকে আপনি সংহত ও সুদৃঢ় শিলা-ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন—যাহা একদিন অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত ছিল তাহা আজ বিশ্বসভায় অমর স্থান পাইয়াছে, ইহার মূলে রহিয়াছে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, অক্লান্ত প্রবর, একাসনে অবিশ্রাম সাধনা ও কঠোর তপস্যা।

আজ ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই—আপনার শিষ্য প্রশিষ্যগণ ভারতীয় চিত্রকলার কর্ণধার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা আপনারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

ভারতের নবজাগরণের সঙ্গে আপনার স্মৃতি চিরকাল জড়িত থাকিবে। আপনার সৃষ্টি সর্ব্বদা সকলকে অনুপ্রাণিত করিবে।

এই সমস্ত কথাই খুব সত্য।

ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্ত্তন যখন অবনীন্দ্রনাথ করেন, তখন তা অনাদৃত ও অবজ্ঞাত থাকলেও আমরা যে তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রসমূহের আদর ক'রে উপহাসের পাত্র ও বিদ্রূপভাজন হ'য়েছিলাম, এতে এখন কিছু আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি।

সম্বর্ধনার পর অবনীন্দ্রনাথ তাঁর উচ্চ আসন থেকে নেমে এসে মাটিতে বসেন এবং একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটির পছন্দসই প্রতিবেদন না পেলেও কাগজে যা পড়লাম, তার থেকে বোঝা যায় যে সেটি হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল, কেন না তিনি তাতে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। বক্তৃতার প্রতিবেদনটি সন্তোষজনক না-হলেও তার অল্প অংশ নীচে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

একেবারে বরাসনে বসিয়ে দিয়েছ তোমরা, এতবড় সিংহাসন পাবার উপযুক্ত আমি নই। আমরা আর্টিষ্ট মাত্র, আমাদের আবার জন্মদিন! আমাদের আবার সিংহাসন কিসের? একথা আমি বিনয় করে বলছি না, ভূতলে ভূমিষ্ঠ হয়েছি আমরা, ভূতলের আসনই আমাদের ভাল। একথা আমি একবার বলেছিলাম আমার ছাত্র রূপকিষণকে। যখন গভর্ণমেণ্ট আর্ট সোসাইটিতে অনেক টাকা দিয়ে রাজপ্রাসাদ তৈরী করে দিলে—আমি নিজে ডিজাইন করে রাজসিংহাসন, আরাম-চৌকী, টেবিল পাখা সবই ব্যবস্থা করেছিলাম। পয়সায় যা হয় সব কিছুই তখন করা হয়েছিল। যখন আমাদের দরবার সাজানো হ'ল, প্রদর্শনী হ'ল সেই সময় রূপকিষণ আমাকে একদিন বললে বেশ হয়েছে। আমি বললাম আজ এই রাজপ্রাসাদ কাল যদি না থাকে তখন কোথায় যাবে? সে ত অবাক্। রাজপ্রাসাদ যে একদিন ভেঙ্গে যেতে পারে তা সে ধারণাও করতে পারে না। ফুটপাত দেখিয়ে আমি তাকে বললাম—শিল্পী আমরা ঐ আমাদের স্থান, তীর্থের রাস্তা ঐ ফুটপাত। নন্দলাল যখন বড় আর্টিষ্ট হ'ল আমি একদিন তাকে বললাম —যা' ত কালীঘাটে গিয়ে আমার জন্য কিছু রোজগার করে আন। এই সর্ত্ত থাকবে যে, কালীঘাটে পটওয়ালারা যেখানে ব'সে ছবি আঁকে সেখানে ব'সে ছবি আঁকতে হবে, এক পয়সা করে সেই ছবি বিক্রী করবে ও সেই পয়সা আমাকে এনে গুরুদক্ষিণা দেবে। তার পর কিছুদিন আর নন্দলালের দেখা নাই। এক দিন সে এল কতকগুলি কালীঘাটের পট নিয়ে, আর ৫ টাকা নিয়ে।

তাইত তোমাদের বলছি—পথের ধারে আসন ছেড়ে আজ ৭০ বৎসর বয়সে আমি কি সিংহাসনে বসতে যাব! যে মাকে আমি হাত ধরে মন্দিরে তুলেছিলাম সেও এই পথের ধারে বসেছিল। সে হচ্ছে আমার অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, ভিখারিণী অনাথ ভারতশিল্প। সে দেখতে সুন্দর ছিল না, অন্ততঃ কেউ তখন তাঁকে সুন্দরী বলতো না। তোমাদের এই স্কুলের যখন আমি প্রিন্সিপাল, সেই সময় গাড়ী করে স্কুলে আসতাম। একদিন দেখি একটা ছেলে ছেঁড়া, ময়লা, নোংরা কাপড় পরা তার বুড়ী মাকে মাথায় নিয়ে যাদুঘরের কাছে পথের ধারে বসে ভিক্ষে করছে। আমি তাকে বললাম—'কোথায় যাচ্ছ?' সে বললে—'আমি মাকে কালীঘাট দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি'। সেই কথাই তো তোমাদের বলছি যে, আমিও আমার ভিখারিণী মাকে ঘাড়ে করে এখানে এসেছিলাম। কে আশ্রয় দিয়েছিল তখন? দেশের লোক? না, দেশের লোক আমার ভিখারিণী মাকে আশ্রয় দেয় নি। তারা বলেছে—'কি করছে এ লোকটা, এ কি পাগল ক্ষেপেছে? বংশের বদনাম করলে আর্ট স্কুলে গিয়ে।' সে এসেছিল আমার হাত ধরে—আমার গুরুও তাকে ধরে আনতে পারে নি আমার হাত দিয়ে সে এসেছিল। তোমাদের দিয়েছি তাকে; তাকে তোমরা ভুলো না। তাকে অযত্ন করলে কিছুই থাকবে না। তাকে যত্ন কর, সে আমাদের মাতা সনাতনী শিল্পমাতা। তীর্থ করাও তাকে। এই ভাব নিয়েই আমি আমার ছাত্রদের তৈরী করেছিলাম; আমার এ ভিখারিণীকে এরা মাথায় করে নিয়ে যাবে তীর্থে তীর্থে। বারে বারে তোমাদের মনে রাখতে বলি—এই হচ্ছে সত্য জিনিস।

"আমরা পূজোর ছুটিতে কি করব"

কয়েক দিন আগে কলেজের কয়েকটি ছাত্র আমাকে তাঁদের একটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। তাঁরা অন্যান্য কথার মধ্যে আমাকে বললেন, "আমরা পূজোর ছুটিতে কি করব, সে বিষয়ে আমাদিগকে কিছু বলবেন।"

ছাত্রেরা পূজার ছুটিতে ও গ্রীষ্মের ছুটিতে কি করতে পারে; সে বিষয়ে আমরা ঐ দুটি ছুটির ঠিক আগের কোন কোন সংখ্যায় দীর্ঘকাল ধ'রে—বোধ হয় ৩০।৪০ বৎসর ধ'রে—কিছু লিখেছি। কখন কখন হয়ত ফাঁক গেছে—লিখে বিশেষ কোন ফল হয় না দেখে বোধ হয় মধ্যে মধ্যে লেখায় বিতৃষ্ণা হয়ে থাকবে।

আমরা যা লিখতাম, তার প্রধান কথা দুটি। যে-সব ছাত্রের বাড়ী মফস্বলে—বিশেষ ক'রে যাঁদের বাড়ী গ্রামে —তাঁরা উপকৃত হবেন যদি তাঁরা গ্রামের ভিতর গিয়ে গ্রামের 'সাধারণ' লোকদের সঙ্গে তাঁদেরই একজন হয়ে মিশে দেশকে ভাল ক'রে জান্‌তে চিন্‌তে পারেন। দ্বিতীয় কথা আমরা এই লিখতাম যে, দেশের অল্পবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক যারা লিখতে পড়তে পারে না, তাদের সকলকে লিখতে পড়তে শিখিয়ে দিতে হবে, শিখিয়ে দেবার পর অবশ্য তাদের হাতে সোজা ভাষায় লেখা জ্ঞানগর্ভ বই দিতে হবে। তার দ্বারা দুটি কাজ হবে;—তাদের জ্ঞান বাড়বে, এবং ইংরেজিনবীস ও নিরক্ষর লোকদের মধ্যে—এমন কি ইংরেজিনবীস এবং বাংলানবীস ও সংস্কৃতজ্ঞ লোকদের মধ্যে, যে নূতন জাতিভেদ উৎপন্ন হয়েছে, তার প্রকোপ কতকটা কম্‌বে; কালক্রমে সে জাতিভেদ লোপও পেতে পারে।

অনেক বৎসর ধ'রে আমরা এই রকম লিখে আসায় কোনো ফল হয়েছিল কিনা, জানি না;—অল্প কিছু ফল যদি হয়ে থাকে তা আমাদের গোচর হয় নি।

আজকাল কেও কোন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেই অনেকের কাছ থেকে মেসেজ্ চান, 'বাণী' চান। এই মেসেজ জোগাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে কত শ্রম করতে ও ডাকমাশুল খরচ করতে হয়েছে, তাঁর সেক্রেটরিরা বোধ হয় তার কোন হিসাব রাখেন নি। কিন্তু তাঁর এই শ্রম ও ব্যয় সার্থক হ'ত যদি মেসেজপ্রার্থী লোকেরা মেসেজ পেয়ে তার অনুসরণ করতেন। কত ক্ষেত্রে তাঁরা তা করেছিলেন জানি না। আমাদের মনে হয়, এই 'বাণী' চাওয়া একটা ফ্যাশন ও হুজুক। ঐ রকম আর একটা ফ্যাশন স্বাক্ষর-পুস্তকে স্বাক্ষর নিয়ে তার উপরে কিছু 'বাণী' লিখিয়ে নেওয়া। এইরূপ খুব চমৎকার 'বাণী' লেখা অনেক স্বাক্ষর-পুস্তক দেখেছি, কিন্তু সেগুলির মালিকরা বা মালিকানীরা বাণীবাহুল্যবশতঃ বাণীযুক্ত-স্বাক্ষর-পুস্তক-বিহীন ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে কি পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন তা জান্‌তে পারি নি; জানতে পারলে খুব খুশি হব।

মনে হ'তে পারে, আমরা তো দেশেরই মানুষ, আমাদের আবার দেশকে জা'তকে জানা চেনার কি দরকার? আমরা যে দেশকে জানি চিনি, এটা তো স্বতঃসিদ্ধ।

বাস্তবিক কিন্তু তা নয়।

যে শেষ পীড়ায় রবীন্দ্রনাথ দেহ ত্যাগ করলেন, তার আগের বার তাঁর যে গুরুতর পীড়া হ'য়েছিল, সেই সময় জোড়াসাঁকোতে তাঁকে একদিন দেখতে গেলে তিনি সুধালেন, ছুটিতে কোন পাহাড়ে যাচ্ছেন না কি? আমি বললাম, না। তার পর তিনি এই মর্মের কথা বললেন, "অনেকে বাংলা দেশ বাংলা দেশ ব'লেই দেখেন না। আমি ভাল করে দেখেছি। পদ্মায় চর পড়েছে, স্রোত ব'য়ে চলেছে;—তার কাছে বাস ক'রে যে আনন্দ ও স্বাস্থ্য পাওয়া যায়, তার তুলনা নেই।" আর একবার এই মর্মের কথা বলেছিলেন, "আমাকে লোকে সহুরে কবি ব'লে মনে করে আমি গ্রামের কি জানি? কিন্তু আমি যেমন ক'রে গ্রাম দেখেছি, তার চেয়ে ভাল ক'রে আর কোন লেখক দেখেন নি।" তিনি 'সাধারণ' লোকদিগকে, গ্রামের লোকদিগকে, প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলেন। অথচ এই মহাপ্রাণ কবি ও কর্মী তাঁর "ঐকতান" শীর্ষক শ্রেষ্ঠ কবিতায় নম্রতার সহিত লিখেছেন :—

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশেকালে.
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে-শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
* * *
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

এই কবিতাটি থেকে আমরা যেন অনুপ্রাণনা লাভ করতে পারি।

"মহাজাতি-সদনের বিতর্কের জের"

২৪শে ভাদ্রের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছেন :—

শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'মহাজাতি সদনে'র ব্যাপার লইয়া বিতর্কের জের 'প্রবাসী'তেও টানিয়াছেন দেখিতেছি। আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে এই সম্পর্কে তিনি যে সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে উহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই যে, আমরা শরৎবাবুর ইংরাজী বিবৃতির বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং 'মডার্ণ রিভিউ'য়ে প্রকাশিত মন্তব্যের উপর সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। রামানন্দবাবু আমাদের প্রবন্ধের কোন উত্তর দেন নাই বা দিতে পারেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে সামান্য অনুবাদের বা ছাপার ভুল ধরিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। রামানন্দবাবু প্রবীণ সম্পাদক, প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সাময়িক পত্র ও ছাপাখানার সঙ্গে তিনি সংসৃষ্ট। এরূপ অনুবাদের ভুল বা ছাপার ভুল (যথা 'নাম ভাঙান'এর স্থলে 'নাম ভাঁড়ান') হওয়া যে বিচিত্র নয়, ইহা তিনি অবশ্যই জানেন। ঐরূপ ভুল সত্ত্বেও আমাদের অনুবাদ হইতে এই বক্তব্য বিষয় বুঝিবার পক্ষে তাঁহার কোন বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি এই সামান্য ভুলের সুযোগ লইয়া রামানন্দবাবু যে-ভাবে আসল প্রশ্ন এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে শোভন হয় নাই। অন্য কেহ এরূপ করিলে আমরা তাঁহাকে 'জ্ঞানপাপী' বলিতাম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতে আমরা সত্যই ক্লেশ বোধ করি এবং সেজন্য তাঁহারই উপর এ বিষয়ে বিচারের ভার ছাড়িয়া দিলাম।

আলোচ্য বিষয়ে 'প্রবাসী'তে কেন কিছু লিখেছিলাম, বলছি। একটা রীতি প্রচলিত আছে, যে, কোন কাগজে প্রকাশিত কোন লেখার প্রতিবাদ করতে হলে প্রতিবাদটি সেই কাগজে পাঠান হয়; সেই কাগজ সেটি না ছাপলে

প্রতিবাদটি অন্যত্র প্রেরিত হয়। আলোচ্য বিষয়ে আমার লেখাটা বেরিয়েছিল মডার্ন রিভিয়ুতে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যদি তাঁর প্রতিবাদটি মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশের জন্যে আমাকে পাঠাতেন, তা হলে সেটি ঐ ইংরেজী মাসিকেই ছাপা হ'ত; আমার মন্তব্যও তাতেই বেরুত। কিন্তু শরৎবাবু সে রীতি অনুসরণ করেন নি; আমি তা নিয়ে কোন মন্তব্যও ইতিপূর্বে করি নি। এখন আমাকে জবাবদিহি করায় কথাটা ব'লতে হ'ল। যা হোক, আমি তাঁর প্রতিবাদ বা বিবৃতি দেখলাম ইংরেজিতে হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে এবং বাংলায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। আমার ইংরেজি মাসিকটা বেরবার তখন দেরি ছিল, এই জন্যে বাংলা লেখাটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমার বাংলা মাসিকে দিয়েছি। ইংরেজী কাগজের ব্যাপারের জের বাংলা কাগজে ইচ্ছা ক'রে আমি টানি নি।

'আনন্দবাজার' লিখেছেন, "রামানন্দ বাবু আমাদের প্রবন্ধের কোন উত্তর দেন নাই বা দিতে পারেন নাই।" 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রবন্ধের কোন উত্তর 'প্রবাসী'তে কেন বেরয় নি, সে বিষয়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মশায় যেরূপ ইচ্ছা অনুমান করতে পারেন; তাতে আমার আপত্তির কারণ নাই। উত্তর দিবার সামর্থ্য আমার নাই ভেবে যদি তিনি সুখী হন, তাতে আমি দুঃখিত হব না। আমার বক্তব্য কেবল এই যে, মূল প্রতিবাদ যিনি ক'রেছেন তাঁর প্রতিবাদ সম্বন্ধেই আমি কিছু বলা আবশ্যক মনে করেছি ও করি; অন্যেরা এ বিষয়ে যিনি যা বলবেন তার আলোচনা করবার মত অবসর আমার নাই, মাসিক কাগজে সকলের কথা আলোচনা করবার স্থান সংকুলান হওয়াও কঠিন।

'আনন্দবাজার' পত্রিকা' যে "অনুবাদের ভুল বা ছাপার ভুল"কে সামান্য বলছেন, আমার বিবেচনায় তা সামান্য নয়, গুরুতর।

"অনুবাদের ভুল বা ছাপার ভুল" যেদিন হয়েছিল তা যদি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তার পরদিন বা শীঘ্র সংশোধিত হ'ত, তা হ'লে তাঁদের ভুলের জন্য জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত পাপের অপবাদ আমাকে সহ্য করতে হ'ত না এবং তাঁদিগকেও "দুঃখিত" হ'তে হ'ত না। এটা আমি মানি যে ১৭ই ভাদ্রের কাগজের ভুল ১৮ই ভাদ্রের কাগজে সংশোধন খুব সুসাধ্য না হ'তে পারে, কিন্তু অসাধ্যও নয়। ১৭ই ভাদ্রের ভুলকে স্পষ্ট ভাষায় ভুল বলে স্বীকার করা হয়েছে ২৪শে ভাদ্র, আশ্বিনের প্রবাসী বেরুবার ৪।৫ দিন পরে—যে আশ্বিনের প্রবাসীতে এই বিষয়টার উপর মন্তব্য করা হ'য়েছে। আমি যে ইচ্ছা ক'রে কিম্বা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁদের ছাপার ভুলটিকে ভুল ব'লে বুঝতে পারি নি এবং তাঁদের প্রকৃত বক্তব্য বুঝতে পারি নি, কিম্বা না-বুঝবার ভান ক'রে 'শ্লেষ ও বিদ্রূপ' করেছি, এটা আমার অপরাধ হ'তে পারে; কিন্তু ভুল করাটাও তো এমন একটা অবদান নয়, যার জন্যে বিন্দুমাত্রও দুঃখ প্রকাশ না ক'রে প্রতিকূল মন্তব্যের সব বোঝাটা অন্যের ঘাড়েই চাপান চলে। "অনুবাদের ভুল বা ছাপার ভুল" করলেন 'আনন্দবাজার';—আর সম্পূর্ণ ও একমাত্র দোষী হলাম আমি!

"নাম ভাঁড়ান" ও "নাম ভাঙান" উভয়ই দোষ, কিন্তু সমান দোষ নয়। ইংরেজী exploit এর মানে কোন স্থলেই "নাম ভাঁড়ান" হয় না। "নাম ভাঙান" অনুবাদটাও আমার নয়।

"আসল প্রশ্ন এড়াইতে চেষ্টা" **আমি** করি নি। আমি আগে বলেছি এবং এখনও বলছি যে, যে-সম্পত্তি এখন ক্রোকবদ্ধ ও বিচারাধীন, সেই সম্পত্তি যত দিন পর্য্যন্ত বিচারান্তে ক্রোকমুক্ত হয়ে বেসরকারী কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির দখলে না আসছে, তত দিন পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি কারো স্মারক করবার প্রস্তাব করা premature। তার পর মহাজাতি-সদনের জন্যে টাকা তোলার কথা। সে বিষয়ে আশ্বিনের "প্রবাসী"র ৭৭৪ পৃষ্ঠা থেকে নীচের কথাগুলি উদ্ধৃত করছি।

> মহাজাতি-সদন সম্পূর্ণ করবার জন্যে "এই প্রস্তাবের সুযোগ লইয়া" জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে না, হয় নি, বা হবে না, এই মর্মের উক্তি অনুসারে কাজ হ'য়ে থাকলে ও হ'লে তা খুবই সুখের বিষয়।"

—

"মহাজাতি-সদন সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে রামানন্দবাবুর উক্তি"

এই বিষয়ে ২৩শে ভাদ্রের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর একটি "বিবৃতি'' প্রকাশিত হয়েছে। আমি আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে "রবীন্দ্রনাথ ও মহাজাতি-সদন" সম্বন্ধে যা লিখেছি, শরৎবাবুর বিবৃতিটি সেই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য। তাঁর বক্তব্য ছয়টি দফায় বিভক্ত। উহার তৃতীয় দফার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "তাঁহার (রামানন্দবাবুর) নিজের প্রশ্নগুলি মূল ইংরেজীতে 'প্রবাসী'তে উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু আমার উত্তরগুলি উদ্ধৃত করেন নাই।" আমিও অভিযোগ করতে পারতাম কিন্তু করছি না, যে শরৎবাবু আমার আশ্বিনের প্রবাসীর 'প্রত্যুত্তর' তাঁর এই বিবৃতিতে উদ্ধৃত করেন নি, যদিও তাঁর

বিবৃতিটি তারই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য। সুতরাং তাঁর সব কথা উদ্ধৃত না-করা বিষয়ে আমি ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হ'তেও পারি।

তৃতীয় দফায় শরৎবাবু বলছেন,

"প্রবাসীতে রামানন্দ বাবু লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁর দলের দুটি দৈনিকে দীর্ঘ ইংরেজী ও বাংলা বিবৃতি দিয়েছেন।" এই উক্তি ভুল। আমি কোন পত্রবিশেষকে আমার বিবৃতি দিই নাই, দিয়াছি ইউনাইটেড প্রেস ও এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ। 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড,' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'বসুমতী' পত্রিকায় এই বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যত্রও প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে।"

শরৎ বাবু যে তাঁর বিবৃতি য়ুনাইটেড্ প্রেস ও এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ পাঠিয়েছিলেন, তা আমি জানতাম না, আমার জানবার কথা নয়। তাঁর দলের কাগজ দুটিতে বিবৃতির উপরে বা নীচে এ. পি. বা ইউ. পি.র নাম নেই। সব দৈনিক আমার কাগজগুলির বিনিময়ে আমার বাসায় আসে না—'দৈনিক বসুমতী' আমার বাসায় বিনিময়ে আসে না। সুতরাং তাতে বিবৃতি বেরিয়েছিল কিনা এবং বেরিয়ে থাকলে তার নীচে এ. পি. বা ইউ. পি. আছে কিনা; আমি জানি না। যে-যে কাগজ ঐ বিবৃতি পেয়েও ছাপেন নি, তাঁরা প্রতিবাদ-প্রকাশ সম্বন্ধে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করেছেন। এতে দলের কোন প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। বলা বাহুল্য, আমার কোন দল নাই, আমার হাত-ধরা কোন দৈনিকও নাই। আমি যে-সব কাগজের মত উদ্ধার বা উল্লেখ করেছি, তারা আমার প্রতিধ্বনি নয়।

আমি 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের উল্লেখ মাত্রও করি নাই, শরৎ বাবু এই অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উভয়েরই আলোচনা বা উল্লেখ করা আমি আবশ্যক মনে করি না।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৭ই ভাদ্র যে বিবৃতিটি বেরিয়েছিল, সেটি যে শরৎ বাবুর লেখা নয়, তাঁর ইংরেজী লেখার অশুদ্ধ অনুবাদ, তা আমার জানবার কথা নয়; সেটির কোথাও অনুবাদ বলে লেখা নাই। 'বসুমতী'তে যে অন্য রকম অনুবাদ বেরিয়েছে তাও আমি দেখি নি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র "অশুদ্ধ বাঙ্গলা প্রয়োগ, অশুদ্ধ অনুবাদ সম্বন্ধে" শরৎবাবুর যে কোন দায়িত্ব নাই এবং তিনি যে "নাম ভাঁড়ান" ও "নাম ভাঙানো" সমার্থক নহে জানেন, ইহা সন্তোষের বিষয়।

শরৎবাবু লিখেছেন,

"রামানন্দ বাবু ভুলিয়া যাইতেছেন, তিনি আমাদের সম্বন্ধে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন, যে, আমরা দলগত উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙাইবার চেষ্টা করিতেছি। উহার উত্তরে আমার বক্তব্য এইমাত্র ছিল যে, যাঁহার সম্পাদিত পত্র দুইটি রবীন্দ্রনাথের সহিত সম্পর্ক হইতে ব্যবসার দিক হইতে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে তাঁহার মুখে অন্ততঃ এই অভিযোগ শোভন নয়।"

আমি ভুলি নাই, ভুলিয়া যাই নাই। প্রথম বিবৃতিটিতে শরৎবাবু লিখিয়াছিলেন :—

"'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রের শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঁড়াইয়া দলগত স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ তেমন ভাল শোনায় না। রবীন্দ্রনাথের নামে 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' যে ব্যবসাগত সুবিধা পাইয়াছে, তাহা উক্ত মাসিকপত্রদ্বয়ের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই প্রমাণ হয়।"

এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে ছেপেছি। শরৎবাবুর দ্বিতীয় বিবৃতিতে তিনি exploitএর বাংলা 'নাম ভাঁড়ান' নয়, "নাম ভাঙ্গানো"ই ঠিক অনুবাদ এইরূপ কথা বলেছেন, এবং তাঁর ইঙ্গিত এই যে, যেহেতু আমি আমার কাগজ দুটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙিয়ে লাভবান হয়েছি অতএব আমার মুখে অন্যের বিরুদ্ধে নাম ভাঙানোর অভিযোগ শোভা পায় না।

আমার মূল নোটটি ইংরেজীতে লেখা। তাতে আমি exploit শব্দ ব্যবহার করেছি। তার ঠিক বাংলা অনুবাদ করবার চেষ্টা আমি করব না। শরৎবাবু কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙিয়ে যথেষ্ট লাভবান হয়েছি। এই ইঙ্গিত সম্পূর্ণ অমূলক। আমার বক্তব্য বলছি।

আমি চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল ধ'রে রবীন্দ্রনাথের নানা রকম রচনা প্রকাশ ক'রেছি, পরে আরও ক'রব। তাঁরই রচিত জিনিস প্রকাশ করেছি এবং সেগুলি যে তাঁর তাও মুদ্রিত করেছি। এর মানে নাম ভাঙানো নয়। আমি যদি তাঁর নামে এমন কোন বাজে জিনিস চালাতাম বা চালাবার চেষ্টা করতাম যা তাঁর নয়, তা হ'লে তাকে "নাম ভাঙানো" বলা যেতে পারত। আমি তা কোনো কালে করি নি। অতএব, আমার নামে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙানোর ইঙ্গিত সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বাঙালী যে-যে সম্পাদক পেরেছেন, তাঁরাই তাঁর লেখা পেয়ে ধন্য হয়েছেন এবং লাভবান হয়েছেন ও হবেন। এঁদের কারো নামে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙানোর অপবাদ কোন সুস্থপ্রকৃতির মানুষের কল্পনায় আসতে পারে না।

পৃথিবীর সর্বত্র সম্পাদকেরা বিখ্যাত লেখকদের লেখা সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। যাঁদের চেষ্টা

সফল হয়, তাঁরা তার দ্বারা জগতের উপকার করেন এবং নিজেরাও লাভবান্ হন। এই সব সম্পাদককে কোনো ভদ্র ব্যক্তি কখনো ঐ সকল বিখ্যাত লেখকদের নাম ভাঙানোর অপবাদ দেয় না।

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও শরৎবাবু আমার ব্যবসার কথা তুলেছিলেন। আমি সেই জন্যেই বলেছিলাম যে, আমি তো তাঁর ব্যবসার কথা তুলি নি, তিনি কেন আমার ব্যবসার কথা তুললেন? নতুবা তাঁর ব্যবসার উল্লেখ মাত্রও আমি করতাম না। আমি তাঁর ব্যবসা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, জানতে চাই-ও না।

আমার মূল নোটটি ইংরেজীতে লেখা। তাতে ইংরেজী 'পার্টি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল রাজনৈতিক দল অর্থে। ঐ শব্দ ধর্মসম্প্রদায়, ধর্মসমাজ, ধর্মমণ্ডলীর প্রতি প্রযুক্ত হয় না। শরৎবাবু অকারণ বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির নাম এই তর্কবিতর্কে আমদানী করেছেন। তিনি যতগুলি ধর্মোপদেষ্টার নাম এই প্রসঙ্গে করেছেন, আমি বাহুল্য-ভয়ে সকলের নামের পুনরাবৃত্তি করি নি। শরৎবাবুর নিকট "ধর্মগত ও রাজনীতিগত দলাদলির কোন প্রভেদ" না থাকতে পারে। কিন্তু আমি তো ধর্মগত দলাদলির কোন উল্লেখ করি নি। এ বিষয়ে আর যে-সব কথা শরৎবাবু বলেছেন এবং আমার সম্বন্ধে অনুমান করেছেন, তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং তাতে কেবল issues confuse করা হয়; সুতরাং সেগুলার আলোচনা ক'রে সময় ও 'প্রবাসী'র জায়গা নষ্ট করতে চাই না।

শরৎবাবু তাঁর দ্বিতীয় বিবৃতির ১ম দফায় ও ২য় দফার প্রথম দুটি বাক্যে যা বলেছেন, সেইরূপ কথা তাঁর প্রথম বিবৃতিতেও ছিল। সে-সম্বন্ধে আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে আমি লিখেছিলাম :—

"শরৎবাবু তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন :—

"আমার বক্তব্য এই যে আমার প্রস্তাবে জনসাধারণকে শোষণ করা ত দূরে থাকুক, যে সম্পত্তির বর্তমান মূল্য নিতান্ত নগণ্য নহে, তদ্দারা কলিকাতার রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার কথাই বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাম অনুসরণে মহাজাতিসদন অথবা তাহার কোন অংশের নামকরণ করা হইবে, এই প্রস্তাবের সুযোগ লইয়া গৃহটির নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করার জন্য জনসাধারণকে চাঁদা দিতে প্ররোচিত করা হইতেছে, একথা মোটেই সত্য নহে।"

"মহাজাতি-সদন সম্পূর্ণ করবার জন্যে 'এই প্রস্তাবের সুযোগ লইয়া' জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে না, হয় নি, বা হবে না, এই মর্মের উক্তি অনুসারে কাজ হ'য়ে থাকলে ও হ'লে তা খুবই সুখের বিষয়।

"আমার ধারণা এই যে, মহাজাতি-সদন নামক সম্পত্তিটিতে এখন বেসরকারী কারো হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা নেই। শরৎবাবুও ব'লছেন, "উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে ক্রোকবদ্ধ", "বিষয়টি এক্ষণে বিচারাধীন।" আমার বক্তব্য, সম্পত্তিটি বিচারান্তে ক্রোকমুক্ত হ'য়ে জনসাধারণের প্রতিনিধি ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসমষ্টি-বিশেষের হাতে আসবার পর তবে রবীন্দ্রনাথের নাম তার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব সঙ্গত ভাবে উঠতে পারত। এখন সে প্রস্তাব অ-যথা-সাময়িক (premature)।

"ট্রষ্টী নিয়োগ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, জমীটি ম্যুনিসিপালিটির কাছ থেকে পাবার পরই ট্রষ্টি নিয়োগ ক'রলে সম্ভবতঃ সম্পত্তিটি ক্রোক হ'ত না। আমি আইনজ্ঞ নই, সুতরাং আমার ভুল হ'তে পারে।"

যে-সম্পত্তিটি এখন "ক্রোকবদ্ধ" এবং যার বিষয়টি "এক্ষণে বিচারাধীন", সেইটিকে কোনও মহৎ ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করা "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" প্রবাদবাক্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলোচ্য বিবৃতিটিতে শরৎ বাবু লিখেছেন, "রামানন্দ বাবুর উচিত ছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ও সুভাষ-চন্দ্রের উপস্থিতির সময়ে এই সংস্পর্শ (অর্থাৎ মহাজাতি-সদনের সহিত সংস্পর্শ) হইতে রবীন্দ্রনাথকে নির্লিপ্ত থাকিতে উপদেশ দেওয়া।"

রবীন্দ্রনাথকে "উপদেশ" দেবার ধৃষ্টতা আমার কোন কালে ছিল বা থাকতে পারে, এরূপ অদ্ভুত কল্পনা কেউ করতে পারে, তা আমি কখনো ভাবি নি। তিনি শুধু বয়সে নয়, সকল বিষয়ে ও সকল দিকেই আমার চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁকে উপদেশ দেওয়া দূরে থাক্, তাঁকে পরামর্শও আমি উপযাচক হ'য়ে কখনো দি নাই।

মহাজাতি-সদন যখন স্থাপিত হয়, তখন আমাদের এবং অন্য অনেকেরই ধারণা ছিল যে, উহা সাধারণের সম্পত্তি হবে এবং ওর ট্রষ্টি নিযুক্ত হবে। ট্রষ্টি নিয়োগ করবার জন্যে কাগজে লেখালেখিও "সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতির সময়ে"ই হয়েছিল; কিন্তু তার কোন ফল হয় নি। মহাজাতি-সদন প্রতিষ্ঠার সময়ের এবং এখনকার সময়ের ভারতীয় ও বঙ্গীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির পার্থক্য মনে রাখা দরকার।

—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিবৃতি সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন

আমি আগেই লিখেছি, যে কোন কাগজের কোন

লেখার প্রতিবাদ ক'রতে হ'লে প্রতিবাদ সেই কাগজেই প্রথমে পাঠাবার রীতি আছে, এবং সেই কাগজ তা না ছাপলে তবে তা অন্যত্র প্রেরিত হ'য়ে থাকে। এই নিয়মের এই ব্যতিক্রমও আছে, যে, কোন একটা কাগজে আলোচ্য বা প্রতিবাদযোগ্য কিছু বেরলে অন্য কোন কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার আলোচনা বা প্রতিবাদ হ'তে পারে এবং তা অনেক সময় হয়ও। কিন্তু যিনি কোন কাগজের সম্পাদক নন, তিনি কোন কাগজের কোন লেখার প্রতিবাদ করতে চাইলে, প্রতিবাদটা সাধারণতঃ প্রথমে শেষোক্ত কাগজেই পাঠিয়ে থাকেন।

শরৎবাবু আমার মডার্ন রিভিয়ুর নোটটির যে প্রতিবাদ করেছিলেন, সেই প্রতিবাদ আমাকে না পাঠিয়ে য়ুনাইটেড প্রেস ও এসোসিয়েটেড্ প্রেসকে পাঠিয়েছিলেন কেন ও কি উদ্দেশ্যে তা তিনিই জানেন।

আরো লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শুধু যে তিনিই আমাকে প্রতিবাদটা পাঠান নি তা নয়, য়ুনাইটেড্ প্রেস এবং এসোসিয়েটেড্ প্রেসও আমাকে প্রতিবাদটার একটা কাপি পাঠান নাই। এর মানে এই যে, যে-ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকে অভিযোগটা দৈনিক কাগজ থেকে জানতে হবে। কিন্তু সেটা তার চোখে পড়তে পারে নাও পারে।

—

এসোসিয়েটেড প্রেস ও য়ুনাইটেড প্রেসকে প্রশ্ন

এসোসিয়েটেড্ প্রেস ও য়ুনাইটেড্ প্রেস্ নিজেদিগকে প্রশ্ন ক'রলে ভাল হয় যে, (১) কোন কাগজের লেখার প্রতিবাদ একাধিক তাঁদের কাছে কেউ পাঠালে সেই প্রতিবাদ তাঁদের গ্রাহক সব কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া তাঁদের কর্তব্য, রীতি ও শিষ্টাচার কি না ; (২) কোন কাগজের কোন লেখার প্রতিবাদ তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা সেই কাগজকে জিজ্ঞাসা করেন কি না যে, সেই কাগজে প্রতিবাদটা আগে গিয়েছিল কি না এবং তার সম্পাদক তা ছাপতে অস্বীকার করেছিলেন কি না ; (৩) বর্তমান ক্ষেত্রে আমি যদি শরৎবাবুর ইংরেজী বিবৃতির জবাব তাঁদের কাছে পাঠাতাম, তা হ'লে তাঁরা আমার জবাব তাঁদের গ্রাহক সব কাগজে পাঠাতেন কি না ; আমার উত্তরের প্রত্যুত্তর এবং আমার তার উত্তর ইত্যাদি পাঠাবার দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারতেন কি না।

—

ইণ্ডিয়ান জর্ন্যালিষ্টস্ এসোসিয়েশনকে প্রশ্ন

ইণ্ডিয়ান জার্ন্যালিস্টস্ এসোসিয়েশ্যন নিজেকে প্রশ্ন করলে ভাল হয়, তাঁর সভ্য সংবাদপত্রগুলি এই শিষ্টাচার-সম্মত রীতি মানতে রাজী আছেন কি না যে, কোন এক কাগজের কোন লেখার প্রতিবাদ সেই কাগজে না পাঠিয়ে সোজা তাঁদের কাছে পাঠালে তা ছাপা হবে না।

—

চন্দননগরে প্রস্তাবিত রবীন্দ্র-স্মৃতিচিহ্ন

যাঁরা আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মশায়ের প্রবন্ধ পড়েছেন, তাঁরা জানেন চন্দননগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা কি ভাবে জড়িত এবং তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশের ইতিহাসে চন্দননগর কোন্ স্থান অধিকার করে। সুতরাং চন্দননগরে তাঁর যে স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হবে, তার যথাযোগ্যতা ও বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক।

এ বিষয়ে হরিহরবাবু আমাকে জানিয়েছেন—

"মোরান সাহেবের বাড়ি আর নাই যে স্মৃতি রক্ষা হিসাবে তাহা আমরা রক্ষা করিব। এখানকার রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতি স্থির করিয়াছেন (১) রবীন্দ্রনাথের চন্দননগরে যে মোরান সাহেবের বাগানবাটীতে কবি-জীবনের প্রথম স্চনা বা উদ্বোধন হইয়াছিল, সেই বাটীর প্রতিকৃতি মর্ম্মর-ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া, কবি-গুরুর প্রতিকৃতি সহ একটি স্তম্ভ নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করা। (২) মোরান সাহেবের বাড়ি গোন্দলপাড়ায় যে রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল তাহা কবির নামানুসারে নাম পরিবর্ত্তন করিবার জন্য মিউনিসি-প্যালিটিকে অনুরোধ করা। (৩) নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি রক্ষা করা।"

চন্দননগরের রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতির প্রস্তাব তিনটি উত্তম ও যথাযোগ্য।

আশ্বিনে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হরিহর বাবুর প্রবন্ধ থেকে আমরা জেনেছি যে, চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সূচনা হয়।

—

"রাশিয়ার চিঠি"র ইংরেজী অনুবাদ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য

"রাশিয়ার চিঠি"র ইংরেজী অনুবাদ নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সেই নিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত, এই মর্ম্মের আন্দোলন হচ্ছে। এই বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সকলের জানা নাই। নীচে সংক্ষেপে লিখছি।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিগুলি বাংলায় লেখা ; প্রথমে ক্রমে ক্রমে 'প্রবাসী'তে সবগুলি বেরিয়েছিল। তার জন্যে সরকারী কোন বিভাগ থেকে আমাদিগকে সতর্ক করা বা শাসান হয় নি। তার পর চিঠিগুলি বিশ্বভারতী ছবি দিয়ে অলঙ্কৃত করে পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত তার দুটি সংস্করণ হয়েছে। এই বাংলা বই নিষিদ্ধ নয়। "বিশাল ভারত" নামে আমাদের যে হিন্দী মাসিকপত্র আছে তার পক্ষ থেকে চিঠিগুলির হিন্দী অনুবাদ হয়েছে এবং সেই অনুবাদগুলি পুস্তকের আকারে বাজারে বিক্রী হয়ে থাকে। এই হিন্দী পুস্তক নিষিদ্ধ নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডন-প্রবাসী বাঙালী পুস্তকব্যবসায়ী ডক্টর শশধর সিংহ "রাশিয়ার চিঠি"র একটি চিঠি ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে মডার্ন রিভিয়ুতে ছাপবার জন্যে আমাদের নিকট পাঠান। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে সেটি মডার্ন রিভিয়ুতে ছাপি। তখন বাংলা-গবন্মেণ্ট আমাদিগকে শাসিয়ে সাবধান ক'রে দেন এবং এই হুকুম করেন যে, আমরা যেন বইখানির আর কোন চিঠির অনুবাদ প্রকাশ না করি।

এর পর আমরা মডার্ন রিভিয়ুর একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক মেজর ডি. গ্রেহাম পোল মশায়কে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন পার্লেমেণ্টে কোনো সদস্যের দ্বারা এই বিষয়ে প্রশ্ন করান। তিনি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধীয় ব্রিটিশ কমীটির সেক্রেটারী, শ্রমিকদলের সভ্য এবং আগে স্বয়ং পার্লেমেণ্টের সভ্য ছিলেন। তিনি পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন করান। প্রশ্নের ভারি কৌতুকজনক ও অপ্রকৃত উত্তর তাৎকালিক সহকারী ভারতসচিব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলা "রাশিয়ার চিঠি" বইখানি নিষিদ্ধ নয় বটে, কিন্তু তার বিষয় কম লোকই জানে এবং সেটি পড়েও কম লোক ; কিন্তু ইংরেজী মডার্ন রিভিয়ুতে বেরলে বেশী লোকে পড়বে এবং তার ফলে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের প্রতি অসন্তোষ ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হবে ; এই জন্যে ওর ইংরেজী অনুবাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আসল কথাটা কিন্তু সহকারী ভারতসচিব জানতেন না বা জেনেও গোপন করেছিলেন। "রাশিয়ার চিঠি" যখন "প্রবাসী"তে বেরত, তখন খুব বেশী লোকে সেগুলি পড়ত ও পড়েছিল। মডার্ন রিভিয়ুও বিস্তর লোকে পড়ে বটে—বিশেষতঃ বাংলা দেশের বাইরে। কিন্তু এর কাট্‌তি কখনও প্রবাসীর চেয়ে বেশী ছিল না, এখনও নয়। প্রবাসীতে চিঠিগুলি পড়বার পর আরও অনেক লোক পুস্তকের আকারে সেগুলি কিনে পড়েছে এবং এখনও পড়ে ও পড়বে ; তা ছাড়া হিন্দী পাঠকেরা হিন্দী অনুবাদ পড়ে আসছে ও পরে পড়বে। কিন্তু বাংলায় ও হিন্দীতে চিঠিগুলি হাজার হাজার লোক পড়ার ফলে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ হয় নি।

একটি চিঠির ইংরেজী অনুবাদ বেরবার আগে চিঠিগুলিতে কি আছে ইংরেজরা জানতে পারে নি। একটির অনুবাদ যখন বেরল, তখন তার থেকে তারা জানল যে, এতে এমন সব তথ্য আছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে সোভিয়েট রাষ্ট্র নিরক্ষর গরীব লোকদের জন্যে যা করেছে, তার তুলনায় ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে সেই রকম লোকদের জন্যে অতি সামান্যই করেছেন। এ রকম লেখায় কোন্ ইংরেজ খুশি হয়, বলুন।

"রাশিয়ার চিঠি" সমগ্র বইটির ইংরেজী অনুবাদ হ'য়েছিল এবং সেটি গবন্মেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ বই ব'লে ঘোষিত হ'য়েছিল, এ রকম ধারণা যাতে কারো না হয় বা না থাকে, তার জন্যে উপরের কথাগুলি লিখলাম।

—

রুশীয় রাষ্ট্রদূতের রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগ ও ন্যাশন্যাল কৌন্সিল অব্ সিবিল লিবার্টির সম্মিলিত উদ্যোগে একটি রবীন্দ্র-স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মেসিয়ে মেইস্কি ও তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদিগকে স্বাগতসম্ভাষণ করা হয়। রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :—

"এখন মানব জাতির উপর আঁধার রাত্রি নেমেছে। উচ্চতম স্বাধীনতা ও মানবীয় উচ্চতম আদর্শসমূহ যাঁতে রূপ পরিগ্রহ ক'রেছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীপ্যমান মূর্তি এই অন্ধকারে আমাদিগকে আবার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে যে, যে হত্যাসঙ্কুল জঙ্গল এখন বিদ্যমান এক দিন তার বিনাশ হবে।

"আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, এখনকার চেয়ে ভাল দিন আসবে। সেই সুদিনের আগমন ঘটাবার জন্যে আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে, বহু লক্ষ নয়, অনেক নিযুত লোক হিটলারের যন্ত্রসজ্জাসজ্জিত বর্ব্বরদলের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও শৌর্য্যপূর্ণ সংগ্রামে আপনাদের রক্ত পাত করছে। কিন্তু এই যে রক্তস্রোত বয়েছে, এই যে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, এ বৃথা হবে না। শেষ জয় আমাদের হবে এবং পরিণামে শ্রেষ্ঠতর জগৎ নির্ম্মিত হবে।" (অনুবাদ।)

—

ব্যবসার নামের আগে "বিশ্বভারতী" যোগ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহান্ প্রতিষ্ঠানটির নাম বিশ্বভারতী রাখবার আগে বিশ্ব শব্দটি ছিল, ভারতী শব্দটিও ছিল; কিন্তু যৌগিক শব্দ বিশ্বভারতী ছিল না। দুটি শব্দ যোগ ক'রে এই যৌগিক শব্দের রচনা তিনি করেছেন।

কোন নাম বিখ্যাত হ'লে তার সাহায্যে বা তার সদৃশ কোন নামের সাহায্যে লাভ করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা কোন কোন মানুষের দুর্বলতা। এই জন্যে আমরা কোন কোন ব্যবসার বা দোকানের নামের আগে "বিশ্বভারত" ও "বিশ্বভাণ্ডার" দেখেছি। একেবারে হুবহু "বিশ্বভারতী" নামও দুটা ব্যবসার নামের আগে দেখেছি। এই রকম নাম সংযোগের মধ্যে মানুষকে ধোঁকায় ফেলবার একটা ইচ্ছা উহ্য থাকে যেটা গর্হিত ও নিন্দনীয়। সেই কারণে এই রূপ নাম ব্যবহার করা অনুচিত।

কিন্তু যাঁরা সুনীতি দুর্নীতির বিচার করেন না, তাঁদিগকে জানিয়ে দিচ্ছি, বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন নাম দুটি আইন অনুসারে রেজিস্টরি করা হয়েছে; এই নাম দুটির অবৈধ ব্যবহার আইন অনুসারে দণ্ডনীয়।

—

নারীশিক্ষা-সমিতির আচার্য রায় সম্বর্দ্ধনা

গত ভাদ্র মাসে আচার্য রায় নানা স্থানে নানা সমিতি ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছেন। নারীশিক্ষা-সমিতি বিদ্যাসাগর বাণীভবনে তাঁর অশীতিপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রবাসী-সম্পাদকের সভাপতিত্বে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করেন। আচার্য রায়কে নারীশিক্ষা-সমিতি মানপত্র দান ও অভিনন্দন করবার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করেন। তিনি পরিহাস ক'রে বলেন, তাঁর সহিত আচার্য রায়ের রাসায়নিক সম্পর্ক আছে। এ কথা বলবার কারণ এই যে, তাঁর পিতা ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আধুনিক কালে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিলাতী ডি. এস্‌সি. এবং তিনি রাসায়নিক গবেষণাও ক'রেছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাংলায় বক্তৃতা না করে ইংরেজীতে বক্তৃতা করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেন, "এর জন্যে আমি দায়ী নই, দায়ী আমার জন্মস্থান (হায়দরাবাদ)।" তাঁর পিতা বিজ্ঞানাচার্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় হায়দরাবাদের নিজামের কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং কাজ থেকে অবসর নেবার পরও হায়দরাবাদেই বাস করতেন।

বিদ্যাসাগর বাণীভবনে হিন্দু বালবিধবাগণকে লেখা-পড়া ও কোন কোন কুটীরশিল্প শিখিয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ ও অন্যান্য কাজ ক'রে সমাজসেবা ও জীবিকা উপার্জন করতে সমর্থ করা হয়। শ্রীমতী নাইডু বলেন, এ দেশে বহুসংখ্যক সমাজসেবিকার খুব প্রয়োজন আছে, এবং সমাজের সেবা অতি মহৎ কাজ। বালবিধবাদের নানা দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তাঁদের ঘরসংসারের ঝঞ্ঝাট না থাকায় তাঁরা লোক-হিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। এই জন্যে, শ্রীমতী নাইডু বলেন, "কথাটা খুব নিষ্ঠুর শোনালেও জনগণসেবার তাঁদের এই সুযোগের জন্যে তাঁদিগকে অভিনন্দিত করছি।" শিক্ষাকার্যে ও দেশহিতব্রতে আত্ম-নিয়োগের জন্য শ্রীমতী নাইডু আচার্য রায়ের যথাযোগ্য প্রশংসা করেন। নারীশিক্ষাসমিতি ও বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা লেডী অবলা বসুর আদর্শ পাতিব্রত্যের ও নারীহিতৈষণার প্রশংসাও তিনি করেন।

সভাপতি প্রবাসীর সম্পাদক বলেন, আচার্য রায় কোন ছাত্রীকে শিক্ষা দেন নি বটে, কিন্তু দেশের সব ছাত্রছাত্রী ও অপর পুরুষ নারী ইচ্ছা করলেই তাঁর জীবন থেকে নানা শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

—

পণ্যশিল্পীদের আচার্য রায় সম্বর্দ্ধনা

গত ২৪শে ভাদ্র কলকাতা টাউন হলে ইণ্ডিজেনাস্ ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স এসোসিয়েশন (ভারতীয় পণ্যদ্রব্য কারখানাসমূহের দেশী মালিকদের সভা) আচার্য রায়কে অশীতিপূর্তি উপলক্ষ্যে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। আচার্য্য রায়কে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া সভাপতি মহাশয় বলেন যে প্রফুল্লচন্দ্রের মত মনীষী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের সৌভাগ্য এবং তিনি আশা করেন যে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে দেশবাসী আচার্য্যদেবের বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করিবে।

দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘের পক্ষে মেজর ডি. এন. ভট্টাচার্য্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা প্রদানের বিষয় ঘোষণা করেন। শিল্প-গবেষণার জন্য এই টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই একই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ আরও ৫ হাজার টাকা উক্ত ভাণ্ডারে দান করেন।

অভিনন্দনপত্র পঠিত হবার পর আচার্য রায়ের এই উত্তর পঠিত হয়:—

আজিকার এই সন্ধ্যায় যে ভাষায় তোমরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছ আমি তার কতটা যোগ্য জানি না। কিন্তু আমার প্রতি যে শুভেচ্ছা তোমরা জ্ঞাপন করেছ তার জন্য আমি তোমাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আজ আমি জীবনসন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি, বার্দ্ধক্য ও জরার আক্রমণে দিন দিন দেহ অপটু হয়ে পড়ছে, কর্ম্মশক্তি স্বাভাবিকভাবেই কমে আসছে। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে যে আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলাম আজ তা দেশের বুকে কত দূর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দেখে যাবার ইচ্ছা হয়।

শিক্ষাব্রতী হিসাবে আমার জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম থেকেই নানা ভাবে দেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে। বাংলা ও বাংলার বাহিরে বিরাট ছাত্রসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ আমি দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা করে চলেছি। নানা ভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমি ঘরমুখী করার চেষ্টা করেছি, কারণ আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, অন্নহীনের সকল দীনতা শিক্ষাভিমান দিয়ে ঢেকে রাখা চলে না। আজ যদি আমাদের দেশ নানাবিধ শিল্পসম্ভারে সমুন্নত হ'য়ে উঠত তবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা আমাদের দেশে আরও অনেক বেশী হ'ত, এই আমার বিশ্বাস। তোমরা দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদল, তোমরা হয়ত সবাই স্পষ্ট বুঝতে পারছ যে জীবনসংগ্রামে আজ আমাদের স্থান কোথায়। আমরা কোথায় এসে আজ দাঁড়িয়েছি। জীবনের অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্রে তোমরা অগ্রদূত। তোমাদের সমস্তাবহুল কর্ম্মক্ষেত্রে তোমরা সাফল্য অর্জ্জন করো আমি আজ শুধু ইহাই কামনা করি।

বন্ধুগণ, জীবনের বিবিধ সমস্যাকে কখনও পৃথক্ করিয়া দেখিও না। একক সাফল্যে একজনেরই উপকার হইতে পারে, সমগ্র দেশের তাহাতে সত্যকারের মঙ্গল হয় না। বাংলার ছাত্রসমাজ আজও ছন্নছাড়ার মত অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে এবং দেশের এই যুবশক্তিকে সংহত করিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে না পারিলে দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের স্থায়ী উপকার হইতে পারে না। তোমাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসাক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জ্জন করিতেছ—কিন্তু একথা যেন ভুলিয়া না যাও বন্ধুগণ যে, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম যুগেও বাঙ্গালীরাই ছিল দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের নেতা। বাহিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভিতরে যোগ্য অনুবর্ত্তীর একান্ত অভাব—ইহার ফলেই বাঙ্গালীর ব্যবসায়-প্রাধান্য আজ লোপ পাইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে বাড়িয়াই চলিবে সুতরাং তাহার জন্য তোমরা প্রস্তুত হইয়াই আছ এ আমি ধরিয়াই লইতেছি। কিন্তু যোগ্য অনুবর্ত্তীর সন্ধান তোমরা করিতেছ কিনা বুঝিতেছি না। সামাজিক আত্মীয়তার মধ্য হইতে সব সময় যোগ্য অনুবর্ত্তী পাওয়া সম্ভব হয় না। এই হতভাগ্য দেশে তাহার অসংখ্য উদাহরণ মেলে এবং সেই গণ্ডীর মধ্যে অনুবর্ত্তীর সন্ধান করা হয় না বলিয়াই দুই শতাব্দীরও অধিক পুরাতন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আজ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়। যদি জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশীয় শিল্পের গঠন করিতে হয় তবে প্রয়োজন হইলে আত্মীয়তার গণ্ডী পার হইয়া অনুবর্ত্তীর সন্ধান করিতে হইবে। যোগ্যতার আদর করিতে হইবে। তাহাতে ব্যক্তির ও দেশের উভয়ের উপকার হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমাদের ছাত্রসমাজ এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় ভীড় জমাইয়া ফিরিতেছে, তাই যোগ্য অনুবর্ত্তী ও কর্ম্মী খুঁজিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যদি এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়, তবে যে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়মের সহযোগিতায় তোমাদের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ইহা শুভ লক্ষণ এবং ইহার ফলে তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি অনেক আশাই পোষণ করি। তোমরা পরীক্ষিত কর্ম্মীদল, সাফল্যলাভের উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরেও তোমরা দৃষ্টি দিও, ইহাই শুধু আমার এই কয়টি কথা বলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য।

অনেক কারখানা ও ব্যবসা-সমিতি আচার্য রায়কে মালা উপহার দেন ও সেগুলি রাশীকৃত ক'রে টেবিলের উপর রাখা হয়। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খেতান, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

গুণ্ডাকে ধরতে গিয়ে মৃত্যু

কলকাতার পুলিস কমিশনার কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, একজন বহিষ্কৃত গুণ্ডাকে ধরতে গিয়ে নিহত বীরভূম জেলার নামুর থানার অধীন কীর্ণাহার গ্রাম নিবাসী বাবু হরিপদ সেন গুপ্তের বিধবা পত্নীকে গবর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। ঘটনাটি হয় এই যে, গত ১৯৪০ সালের ৩০শে নবেম্বর সন্ধ্যা সাতটার সময় ক্ষীরোদমোহন প্রামাণিক নামক একজন বাঙ্গালী যুবক কলেজ ষ্ট্রীট জংসনের সন্নিকটে হ্যারিসন রোডের উত্তরের ফুটপাথ ধ'রে যাচ্ছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ দুই ব্যক্তি তাকে ধাক্কা মারে এবং তাদের একজন তার মানিব্যাগ কেড়ে নেয়। ক্ষীরোদমোহন তাকে ধ'রে ফেলায় সে মানিব্যাগটি দ্বিতীয় লোকটির নিকট চালান দেয় এবং দ্বিতীয় লোকটি সরে পড়ে। ধস্তাধস্তির সময় প্রথম লোকটি তার কোটের তলা থেকে একখান লম্বা ছোরা বের ক'রে ক্ষীরোদের বুক লক্ষ্য ক'রে আঘাত করে; খুব দ্রুত তার কব্জি ধ'রে ফেলায় ক্ষীরোদ মাত্র সামান্য আঘাত পায়। আততায়ী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড় দেয়। আততায়ী হাতের ছোরা ঘুরাতে ঘুরাতে শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলে হরিপদ সেনগুপ্ত তাকে থামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু এর পূর্ব্বেই আততায়ী হরিপদর উরুতে ছোরা বসিয়ে দেয়, ফলে দুজনেই পড়ে যায়। তখন লোকের ভিড় ক্রমে বায় এবং তারা আততায়ীর নিকট থেকে রক্তাক্ত ছোরা কেড়ে নেয়, ছোরা সমেত তাকে পুলিসের হাতে দেয়। হরিপদ সেনকে এম্বুলেন্সে করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; আঘাতের ফলে সেখানে ১২ দিন পরে তার মৃত্যু হয়।

বিদ্যালয়ে ধর্মমত শেখান

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে বাংলা দেশের আইন-সভার নীচু হৌসে (লোআর হৌসে) যে তর্কবিতর্ক চলছে, তার মধ্যে বিদ্যালয়ে 'ধর্ম্ম' শেখানোর কথা উঠেছিল।

বাংলা ভাষায় যাকে সচরাচর ধর্ম আর ইংরেজীতে রিলিজ্যন বলা হয়, তার মানে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রকম বোঝেন।

বিদ্যালয়ে ধর্ম শেখান উচিত কি না, এ বিষয়ে আমাদের মত এই যে, সকল সম্প্রদায়ের বা একাধিক সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা যে-সব বিদ্যালয়ে পড়ে ও পড়তে পারে, সেগুলিতে বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের মত এবং ক্রিয়া-কলাপ ও অনুষ্ঠান শেখান উচিত নয়। কারণ, কোন এক সম্প্রদায়ের মত অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ শেখাতে গেলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁদেরও মত আদি শেখাবার দাবী উঠবে। সব শেখান খুব ব্যয়সাধ্য, এবং সব শেখাতে

গেলেই বিদ্যালয়গুলি ধর্মবিষয়ক তর্কবিতর্ক ও ঝগড়ার আড্ডা হয়ে উঠবে। আর এক কুফল এই হবে, যে, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে একতা, সদ্ভাব ও মৈত্রী না শিখে পার্থক্য, অনৈক্য, অবজ্ঞা, ঘৃণা ইত্যাদি শিখবে।

এই জন্যে আমরা সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্যে অভিপ্রেত ও সকলের অধিগম্য এবং গবর্ন্মেণ্টের, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বা ম্যুনিসিপালিটির সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে ধর্মমত এবং ধর্মের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ শেখানর সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু যদি কোন ধর্মসম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিজেদের ব্যয়ে তাঁদের বিদ্যালয় চালান এবং তাতে তাঁদের মত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান শেখান, তাতে আপত্তি করবার অধিকার বাইরের কোন লোকের নাই।

সব ধর্মেরই একটি প্রধান অংশ ও অঙ্গ সুনীতি। সুনীতির উপদেশগুলি সব ধর্মে এক। সত্য কথা বলা, গরিব দুঃখী আর্ত্তের প্রতি করুণা ও তাদের সাহায্য করা, ন্যায়পরায়ণ হওয়া, ইত্যাদি সব ধর্মেই উপদিষ্ট হয়েছে। সুনীতি সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যালয়ে একসঙ্গে শেখান যেতে পারে।

ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মত, ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান শিখবে না, এ রকম কিছু বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তাদের বাপ মা বা অন্য অভিভাবক সে রকম শিক্ষা দিতে চান, তো, নিজের নিজের বাড়ীতে দেবেন, কিম্বা খ্রীষ্টীয়ানরা যেমন রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে শেখান তেমনি তাঁদের কোন বিদ্যালয় সপ্তাহের কোন এক বা একাধিক দিন শেখাবেন।

'ধর্ম' না শিখিয়ে সুনীতি (morals) শেখান যায় কি না, সে বিষয়ে তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হব না। কাযতঃ দেখা গেছে, বিশেষ কোনো ধর্মমত না শিখিয়েও মানুষকে সচ্চরিত্র হ'তে ও থাকতে চেষ্টিত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা যায়। বস্তুতঃ, শুধু বই পড়িয়ে বা বাচনিক বক্তৃতা শুনিয়ে মানুষকে সুনীতিপরায়ণ করা যায় না; সাধু জীবনের দৃষ্টান্ত থেকেই মানুষ প্রধানতঃ ভাল হ'তে শেখে। শিক্ষকদের, বাড়ীর গুরুজনদের ও অন্যদের এবং পাড়ার সঙ্গীদের জীবন ও চরিত্র যেমনই হউক, ছাত্রছাত্রীরা কতকগুলি সুনীতি-পুস্তক পড়লেই ভাল হবে ও থাকবে, এ রকম আশা দুরাশা।

—

জাপানে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা-দান নিষিদ্ধ

যে-দেশে বিদ্যালয়ে ধর্ম শুধু শেখান হয় না তা নয়, যেখানে বিদ্যালয়ে ধর্ম শেখান নিষিদ্ধ, এমন দেশও পৃথিবীতে আছে। জাপান এই রকম একটি দেশ। আমরা চীনদেশের প্রতি জাপানের আধুনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাই মনে করি না কেন, শিল্প-বাণিজ্যে স্বাস্থ্যে শিক্ষায় শক্তিতে আমরা জাপানের মত হ'তে চাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সেই জাপানে বিদ্যালয়ে ধর্ম শেখান নিষিদ্ধ। জাপান বর্ষপুস্তকে (Japan Year-bookএ) আছে :—

"Religion is, on principle, excluded from the educational agenda of schools. In all schools established by the Government and local public bodies, and in private schools whose curricula are regulated by laws and ordinances, it is forbidden to give religious instruction or to hold religious ceremonies either in or out of the regular curricula."

তাৎপর্য। বিদ্যালয়সমূহের কার্যসূচী হইতে ধর্ম বাদ দেওয়া হয়েছে। যে-সব বিদ্যালয় গবর্মেণ্ট বা স্থানীয় ম্যুনিসিপালিটি প্রভৃতির দ্বারা স্থাপিত এবং বেসরকারী যে-সব বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয়তালিকা আইনকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই সমুদয়ে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া কিম্বা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয়বিষয়ের অন্তর্গত ক'রে বা তার বাইরে ধর্মানুযায়ী কোন ক্রিয়া-কলাপ করা নিষিদ্ধ।"

তবে কি জাপানী ছেলেমেয়েরা ধর্ম শেখে না? শেখে। শেখে তাদের মন্দিরে, বিহারে, গির্জায়, শেখে তাদের গৃহে গৃহে।

তবে কি জাপানী ছেলেমেয়েরা সুনীতি শেখে না। বিদ্যালয়েই শেখে—এবং অবশ্য বিদ্যালয়ে ও বাড়ীতে গুরুজনদের আচরণ দেখে শেখে। সুনীতিশিক্ষাদান জাপানী বিদ্যালয়গুলির কার্যসূচীর অন্তর্গত।

জাপানের চেয়ে ভারতবর্ষে ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক বেশী। এই জন্যে এদেশে জাতীয় ঐক্য বাড়াতে ও রাখতে হ'লে 'বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা' নিষেধ করা জাপানের চেয়ে এদেশে অনেক বেশী আবশ্যক।

জাপান যদি কোন সাম্রাজ্যাসক্ত বিদেশী জা'তের অধীন হ'ত, তা হ'লে সেই প্রভু জা'ত জাপানের বিদ্যালয়গুলিতে "ধর্মশিক্ষা" দানে খুব উৎসাহ দিত। কারণ, তার দ্বারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জন্মান ও বাড়ান যায়, এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি কমান যায়—এমন কি বিনাশও করা যেতে পারে।

সাম্রাজ্যাসক্ত সব জা'তের কূটনীতি ও কূট চা'ল সম্বন্ধে সমুদয় পরাধীন দেশের লোকদের খুব সাবধান থাকা আবশ্যক।

—

কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের সচিত্র বক্তৃতা

এক সময়ে ইয়োরোপেও কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এখন কিন্তু ঐ মহাদেশে ঐ রোগ নাই। যে-যে উপায়

অবলম্বন করায় এই শুভফল উৎপন্ন হ'য়েছে, সেই সকল উপায় অবলম্বন করলে ভারতবর্ষেও কুষ্ঠরোগ লুপ্ত হ'তে পারে। সেই সকল উপায় কি, এবং এখন কি কি কারণে ও অবস্থায় কুষ্ঠরোগের বিস্তার হয়, সেই বিষয়ে গত ২৫শে ভাদ্র কল্‌কাতার ওভারটুন হলে ডাঃ পার্বতীচরণ সেন স্লাইডের সাহায্যে ছবি দেখিয়ে একটি বক্তৃতা করেন। প্রবাসীর সম্পাদক সভাপতির কাজ করেন। তাঁর বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। বাংলা দেশের সব জেলার চেয়ে ঐ জেলাতেই শতকরা কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশী। ডাঃ সেনের বক্তৃতার আগে তাঁরই অনুরোধে সভাপতি নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে কুষ্ঠরোগীদের সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে তা বলেন। তার পর ডাঃ সেনের বক্তৃতা হয়। বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তিনি আগে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত গবেষক ছিলেন। এখন গবর্মেণ্ট তাঁকে সারা বাংলায় প্রচারকার্যের নিমিত্ত কলকাতায় এনেছেন।

নানা রকমের কুষ্ঠরোগ ও তার প্রারম্ভিক অবস্থা তিনি চিত্রসহযোগে বুঝিয়ে দেন। কুষ্ঠরোগীরা অবাধে নিজ নিজ পরিবারের লোকদের সঙ্গে ও অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করায় রোগের বিস্তার হয়, বুঝিয়ে দেন। কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে মেলামেশা শিশুদের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক বলেন। তাঁর সমগ্র বক্তৃতাটি দৈনিক কাগজে বেরলে উপকার হ'ত। আমরা সংক্ষেপেও তাঁর সব কথা বলতে পারব না।

ইয়োরোপে প্রধানতঃ যে-যে উপায়ে কুষ্ঠরোগের বিলোপ হয়েছে তা তিনি শেষে বলেন। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু তাদের সংস্পর্শ ও সংক্রামকতা থেকে সুস্থ লোকদিগকে রক্ষা করবার জন্যে তাদিগকে আলাদা ক'রে (isolate ক'রে) আলাদা জায়গায় রাখা উচিত। অন্য সব রোগের, খুব কঠিন কঠিন রোগেরও, যেমন চিকিৎসা হয়, কুষ্ঠরোগেরও সেই রূপ চিকিৎসা হওয়া উচিত এবং চিকিৎসা হ'লে তাতে ফলও পাওয়া যায়। সমগ্র দেশে সমগ্র সমাজে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা'র অনুকূল অভ্যাস যাতে জন্মায়, তার চেষ্টা হওয়া উচিত।

বাংলা দেশের সব জেলায়, বিশেষতঃ বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায়, ডাঃ পার্বতীচরণ সেনের বক্তৃতার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও প্রধান মিউনিসিপালিটিগুলির এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

—

ব্রিটিশ-আমেরিকান্ ঘোষণাপত্রের চার্চিলি ব্যাখ্যা

আশ্বিনে 'প্রবাসী'র বিবিধ-প্রসঙ্গে ৭৭০-৭৭২ পৃষ্ঠায় যুদ্ধোদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ-আমেরিকান্ ঘোষণাপত্রের আটটি দফা বিশ্লেষণ ক'রে আমরা দেখিয়েছিলাম, যে, তার থেকে ভারতবর্ষ কিছু আশা করতে পারে না। আমরা যা লিখেছিলাম, তার সবটা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। কেবল তৃতীয় দফা সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম, সেইটুকু উদ্ধৃত করছি।

(৩) মিত্রদ্বয় (অর্থাৎ আমেরিকা ও ব্রিটেন) সব দেশের লোকদের নিজ নিজ শাসনপ্রণালী নির্বাচনের অধিকার মানেন এবং যারা নিজের দেশের প্রভুত্ব ও স্বায়ত্তশাসন হারিয়েছে তা তাদিগকে ফিরিয়ে দিতে চান।"

এই দফাটা সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন ক'রেছিলাম এবং উত্তরও দিয়েছিলাম, "এই সাধু ইচ্ছাটা ভারতের বেলায় খাটবে কি ? লক্ষণ ত সে-রকম নয়।"

আমরা তখন শুধু লক্ষণ দেখে দফাটার ভিত্তির উপর কোন আশা-সৌধ নির্মাণ করি নি। তার পর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল, পাছে আমরা কিছু আশা ক'রে বসি সেই ভয়ে (?) পরিষ্কার করে যা ব'লেছেন তার থেকে ব্রিটেনের মুখ চেয়ে থাকায় অভ্যস্ত চরম আশাবাদীরাও বুঝতে পেরেছেন ও পারবেন যে, ঘোষণাপত্রটা ভারতবর্ষের জন্যে নয়। গত ৯ই সেপ্টেম্বর মিঃ চার্চিল যুদ্ধের অবস্থার আলোচনা ক'রে যে বিবৃতি দেন তার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা বলেন, তা নিম্নমুদ্রিত রয়টারের তারে লেখা আছে।

LONDON, Sept. 9.

Mr. Churchill, referring to the Atlantic declaration in the course of his war review in the House of Commons on Tuesday said, "The joint declaration does not qualify in any way the various statements on policy which have been made from time to time about the development of Constitutional Government in India, Burma or other parts of the British Empire.

"We have pledged by the declaration of August, 1940, to help India to obtain free and equal partnership in the British Commonwealth of Races, subject, of course to the fulfilment of the obligations arising from our long connection with India and our responsibilities to its many creeds, races and interests.

"Burma, also is covered by our considered policy of establishing Burma's Self-Government and by measures already in progress."

তাৎপর্য। মিঃ চার্চিল বলেন, "ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর ক্রমবিকাশ বিষয়ে নীতি সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে যে সব বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, ব্রিটেন ও আমেরিকার সম্মিলিত ঘোষণাপত্র তার কোন পরিবর্তন কোন প্রকারে করছে না। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের আমাদের

ঘোষণা দ্বারা আমরা ভারতবর্ষকে জাতিসমূহের ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রে স্বাধীন সমান অংশিতা পেতে সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি;—তাতে কেবল এই সর্তটা আছে যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্ক হেতু আমাদের যেসব বাধ্যবাধকতা জন্মেছে এবং ভারতবর্ষের নানা ধর্মসম্প্রদায়ের, জাতের ও স্বার্থের সম্পর্কে যে দায়িত্ব আছে, সেইগুলি পালন করতে হবে। ব্রহ্মদেশে স্বশাসন স্থাপন করবার আমাদের যে বিবেচিত পলিসি আছে তার দ্বারা এবং সেখানে যে সব বিধান ক্রমশঃ করা হচ্ছে তার দ্বারা সেই দেশ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হয়েছে।"

ব্রিটিশ-আমেরিকান ঘোষণাপত্রে একথা স্পষ্ট ক'রে বলা হয় নি—এমন কি তার আভাস পর্যন্তও তাতে নাই—যে সমস্ত ঘোষণাপত্রটা বা তার কোন দফা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রযোজ্য নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদে পৃথিবীর অন্যত্র প্রযোজ্য। ব্যাখ্যাটা মিঃ চাচিলের না রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টেরও তাতে সায় আছে?

ভারতবর্ষের লোকরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাক—এমন কি ডোমীনিয়নের মর্য্যাদা পাক্—মিঃ চার্চিলের এরূপ ইচ্ছা ত কোন কালেই ছিল না; যখন ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাতে ভারতীয়দিগকে—বিশেষতঃ প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টে—অল্প যা অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তাতেও তাঁর সম্মতি ছিল না, আপত্তিই ছিল। এ হেন মিঃ চাচিল যে ব্রিটিশ-আমেরিকান্ সম্মিলিত ঘোষণাপত্রের সব দফা—বিশেষতঃ তৃতীয় দফা—মেনে নেবেন ও মেনে চলবেন, এ নিতান্তই অভাবনীয় ব্যাপার।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভারতসচিব ও ভারতবর্ষের বড়লাট এবং অন্য অনেক ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বার বার মুখ খুলেছিলেন; মিঃ চার্চিল চুপ ক'রে ছিলেন। এই বার মুখ খুলেছেন।

কিন্তু সাধ্য কি তাঁর যুগধর্মের সফল বিরোধিতা করবার? ভারতবর্ষে মানুষের অধিকার স্থাপন করবার যে প্রচেষ্টা গত শতাব্দীতে রামমোহন রায়ের সময় থেকে আরম্ভ হয়ে চলে আসছে, তাতে বাধা দেবার, তাকে বিনষ্ট করবার সকল রকম প্রযত্ন ব্রিটিশ জাতি ক'রে আসছে। তাতে ভারতের প্রচেষ্টা কি পেছিয়ে গেছে? ভারতীয়েরা কি তাদের দাবী কমিয়েছে? কখনই না। প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে, দাবী বেড়েই চলেছে। প্রথম প্রথম যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত, তখন বড় বড় চাকরি ভারতীয়দের পাওয়া একটা বড় আবেদন ছিল। কংগ্রেসীরা চাকরিগুলোকে এখন তো গ্রাহ্যই করেন না—মন্ত্রিত্ব প্রধান মন্ত্রিত্ব পেয়েও তার মাইনে কমিয়ে ৫০০৲ টাকা ক'রে নিয়েছেন এবং পরে সেগুলো ছেড়েও দিয়েছেন। আগে কাম্য ছিল, প্রার্থনা ছিল, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন; এখন দাবী হয়েছে, লক্ষ্য হয়েছে, জীবন-মরণ পণ হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা।

মিঃ চার্চিল কতকগুলা বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্বের কথা বলেছেন। আমরা বুঝি, তাঁরা মনে করেন ভারতবর্ষকে তাঁদের অধীন রাখতে তাঁরা বাধ্য এবং এদেশের নানা ধর্মসম্প্রদায়, জাতি ও স্বার্থের সম্বন্ধে তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে সর্বদা সজাগ থাকা যাতে তাদের মধ্যে কোন ঐক্য, কোন সামঞ্জস্য, কোন বোঝাপড়া না-হয়ে যায়।

মিঃ চার্চিল এখন মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত, ভারতবর্ষের কথা দরদের সঙ্গে ভাববার অভ্যাস ও অবসর তাঁর নাই। অহিংস সংগ্রামকে হয়ত তিনি গ্রাহ্যই করেন না। আমরা বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনের জয়ই চাচ্ছি। কিন্তু এই যুদ্ধের অবসানের পর ভারতবর্ষের যে অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিশ্চয়ই আরম্ভ হবে, তাতে আমরা ভারতবর্ষের জয় চাই। সে জয় হবেই হবে। ভারতসন্তানরা সবাই মনের ময়লা দূর করে সেই সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকুন।

যুদ্ধের মধ্যে পার্লেমেণ্টে ভারত সম্বন্ধে আইন

পার্লেমেণ্টে ভারতশাসন আইন ব'দ্‌লে কিংবা নূতন কোনো আইন ক'রে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবার কথা তুললেই ভারতবর্ষ সম্পৃক্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষরা বলেন, এখন তাঁরা যুদ্ধ নিয়ে এত ব্যস্ত যে, পার্লেমেণ্টে ও-রকম কিছু করবার অবসর তাদের নেই—ও-রকম কাজ সময়ে' বুঝে' ক'রতে হবে। তাঁরা জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত বটে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের দরকার মত আইন পার্লেমেণ্টে করছেন; এবং নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার ও ভারতবাসীদের ক্ষমতা কমাবার জন্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় আইনও এই যুদ্ধের মধ্যেই ক'রছেন। আগে কয়েক বার শেষোক্ত কাজ ক'রেছেন, সম্প্রতি আবার ক'রেছেন।

১৯৩৫ সালের যে ভারতশাসন আইন এখন বলবৎ, তার ৬১ ধারা অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদ (Legislative Assembly) তার প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে পাঁচ বৎসর চলবে (যদি তার আগেই তা ভেঙে দেওয়া না-হ'য়ে থাকে) এবং এই পাঁচ বৎসর পরে সাধারণ নির্বাচন দ্বারা নূতন পরিষদ গড়তে হবে, এই নিয়ম আছে। পার্লেমেণ্টে যে বিল সম্প্রতি পাস হ'ল, তার দ্বারা এই ধারাটি সংশোধন করা হ'য়েছে। তার দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের গবর্নরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রদেশের

বর্ত্তমান ব্যবস্থা-পরিষদ যুদ্ধ যত দিন চলবে তত দিন এবং তার পরও এক বৎসর জীইয়ে রাখতে পারবেন। বিলাতী পার্লেমেণ্টের কোন হৌস অব্ কমন্স পাঁচ বৎসরের বেশী টিকতে পারে না—পাঁচ বৎসর পরে নূতন নির্বাচন দ্বারা নূতন হৌস অব্ কমন্স গঠিত হয়, কারণ, যখন পার্লেমেণ্ট-সদস্যরা নির্বাচিত হন, তখন যে-যে বিষয়ে লোকমত যে-রকম ছিল, কালক্রমে সে-মত বদলে যায় এবং আগে নির্বাচিত সদস্যেরা পরিবর্তিত লোকমতের মুখপাত্র না-হ'তে পারেন ; এবং এমন নূতন নূতন সমস্যা ও প্রশ্ন উঠতে পারে যেগুলি সম্বন্ধে পূর্বনির্বাচিত সদস্যদের মত জানা নাই। এই কারণে সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক সভায়ই নির্দিষ্ট কাল পরে পরে নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে এবং ভারত-শাসন আইনেও তা ছিল। কিন্তু পার্লেমেণ্ট তা বদলে দিলেন।

এই বিলটার সপক্ষে ভারতসচিব যে-সব যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন, তার কোনটাই বিচারসহ নয়। যুদ্ধটা থাকতে থাকতে নির্বাচন অসুবিধাজনক বা বিপজ্জনক বা দুঃসাধ্য হবে, এই মর্মের কথা তিনি বলেন। কেন? যুদ্ধ থাকতে থাকতে নির্বাচন হ'লে কি হিটলার জিতে যাবে? যুদ্ধ থাকতে থাকতেই তো আমেরিকায় নির্বাচন হ'য়ে গেল। তার দরুন হিটলারের কী সুবিধা হ'য়েছে? আর ব্রিটেনই কি তার দরুন আমেরিকা থেকে সাহায্য কম পাচ্ছে? যুদ্ধের মধ্যেই ত অষ্ট্রেলিয়ার নির্বাচন হ'য়েছে। তার দরুন অষ্ট্রেলিয়া কি ব্রিটেনকে মুদ্রা ও মানুষ দিয়ে সাহায্য কম করছে? তার দরুন কি হিটলারের জিতবার সম্ভাবনা বেড়েছে?

ভারতসচিব ব'লেছেন, বর্ত্তমান বিলাতী হৌস অব্ কমন্সের জীবিতকাল পাঁচ বৎসরের চেয়ে বেশী ক'রে দেওয়া হয়েছে, সেটা একটা নজীর। চমৎকার যুক্তি! ব্রিটেন স্বাধীন দেশ। সেখানকার লোকদের প্রতিনিধি পার্লেমেণ্ট-সদস্যরা তাদের দেশের জন্যে পরিবর্তিত ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বিলাতী পার্লেমেণ্ট-সদস্যরা ত আমাদের দেশের প্রতিনিধি নয়, আমাদের কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্যরা যদি কোন ব্যবস্থায় সম্মতি দেন, তবেই আমাদিগকে কেও বলতে পারেন, "তোমাদের প্রতিনিধিরা এতে মত দিয়েছেন, অতএব এটা তোমাদের মানা উচিত।"

তারপর আর একটা যুক্তি, এখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হানাহানি চলছে, এখন নির্বাচন করলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাড়বে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার ১২ মাস পরেও যে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপিত হবে, তার কী প্রমাণ আছে? সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপন করতে হ'লে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটার উচ্ছেদ করতে হবে, কোনো সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র কোনো সম্প্রদায় নয় যাতে এরূপ বুঝায় এ রকম সব ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। যাতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষ্যাদ্বেষ বাড়ে সরকারী এ রকম সব ব্যবস্থা রদ না ক'রলে, যুদ্ধাবসানের ১২ মাস পরে কেন, ১২ বৎসর পরেও সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপিত হবে না।

ভারতসচিব যদি বলতেন, যে, যত দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপিত না হচ্ছে, তত দিন নূতন নির্বাচন হবে না, তা হ'লে সেটাও একটা ফন্দী হ'লেও বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানিকে নির্বাচন পেছিয়ে দেবার একটা যৌক্তিক কারণ বলা বাহ্যতঃ সঙ্গত মনে করা যেতে পারত।

এই বিলটার আসল কারণ মিঃ এমারি শেষ পর্যন্ত বলে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন :

> ". . . . It would be little less than farcical, ... if elections were held merely in order to afford an opportunity of ventilating Mr. Gandhi's policy of negation without any prospect of returning a constitutional government after the elections."

তাৎপর্য। যদি নির্বাচন করতে দেওয়ার দ্বারা গান্ধীজীকে তাঁর নেতিবাচক পলিসি প্রচারেরই একটা সুযোগ দেওয়া হয় এবং যদি নির্বাচনের শেষে নিয়মতান্ত্রিক কোন গবন্মেণ্ট স্থাপনের কোন আশা না-থাকে, তা হলে ব্যাপারটা একটা প্রহসনের অভিনয়ের চেয়ে বড় কম হাস্যকর হবে না।

অর্থাৎ কি না, ভারত-সচিবের ভয় আছে—এবং সে ভয়টা অমূলকও নয় যে, নূতন নির্বাচন হলেই অধিকাংশ প্রদেশে গান্ধীপন্থী কংগ্রেসীরা ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ আসন দখল করবে, তাদের কেও মন্ত্রী হ'তে চাইবে না, তারা অসহযোগ করবে, এবং ফলে জগতের লোক জানবে যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সমর্থক নয়, গান্ধীজীরই সমর্থক। সেটা যুদ্ধরত ব্রিটেনের পক্ষে এখন সুবিধাজনক নয়। কারণ, এখন ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট জগতে নানা উপায়ে প্রচার করছেন যে কতকগুলা দুষ্ট ও পাগল লোক (গান্ধীজী ও তাঁর দল) ছাড়া সারা ভারত উক্ত গবর্মেণ্টের পুরা সমর্থক।

—

"শেষ লেখা" নামক পুস্তকে কয়েকটি ভুল পাঠ সংশোধন

শ্রীযুক্ত ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী আমাদিগকে জানিয়েছেন—

"শেষ লেখা" নামক রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা-সংগ্রহে কয়েকটি প্রচলিত ভুল পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কবির মূল রচনাকে এত দিনে অবিকৃত ভাবে পাওয়া গেল।

১। "সমুখে শান্তি-পারাবার।" "শান্তির পারাবার" নয়।

২। ঐ গানের আরেকটি পদ, "জ্যোতি ধ্রুবতারকার।" "জ্যোতির ধ্রুবতারকা" নয়। পাঠ ভুল থাকায় মিলের এবং অর্থগ্রহণের বাধা ঘটেছিল।

৩। অস্ত্রোপচারের পূর্ব দিনে রচিত কবিতায় "ভান" কথাটি "ভাল" হয়ে ছাপা হয়। যথার্থ পাঠ এত দিনে উদ্ধার হয়েচে।

৪। ঐ কবিতার নাম কবি দেন নি, একথাও আমাদের জানা আবশ্যক।

—

বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা-সংসদ

বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা-সংসদ বয়স্ক নরনারীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের উপায় অবলম্বন ক'রেছেন। সেই উপায়ের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করলে উপকৃত হবেন যাঁদের কোন বিদ্যালয়ে বা কলেজে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করবার সুবিধা নাই। লোকশিক্ষা-সংসদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন বসু নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রেছেন।

দেশের যে সকল বয়স্ক নরনারী নানা কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত, তাহাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বভারতী-লোকশিক্ষা-সংসদ স্থাপিত হইয়াছে। সংসদ বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

গত বৎসর এগারটি কেন্দ্রে সংসদের প্রবেশিকা, আন্ত, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

গত ফাল্গুন মাসে গৃহীত পরীক্ষার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষায় শতকরা ৭৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরবর্ত্তী পরীক্ষা আগামী ফাল্গুন মাসে গৃহীত হইবে।

সম্প্রতি আরও অনেকগুলি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু স্থান হইতে কেন্দ্র গঠনের জন্য আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রচেষ্টার অন্যতম অঙ্গ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার কয়েকখানি পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। যাহাতে প্রতি তিন মাস অন্তর এই গ্রন্থমালার একখানি করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পুস্তকটি ব্যতীত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার আরও কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। সবগুলিরই পরিচয় যথাকালে 'প্রবাসী'তে দেওয়া হ'য়েছে।

—

রবীন্দ্রনাথ কোন দলের ছিলেন না

আমরা গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'র ৬৪০ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলাম যে, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের ছিলেন না। ২৫শে ভাদ্রের 'ভারত' দৈনিকে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন, তার থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দল ভুক্ত হওয়ার বিরোধী ছিলেন। এই চিঠিটির শেষে তিনি লিখেছেন :—

"এ কথা তোমাকে বলাই বাহুল্য আমি বাংলা দেশের কোনও পলিটীক্যাল দলের পক্ষ কোন আকারেই অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি নে, কিন্তু যদি ভ্রমক্রমে বন্যার কাজ উপলক্ষ্যে স্পর্শদোষ ঘটে থাকে, ভবিষ্যতে সাবধান হব।"

—

রবীন্দ্র-স্মৃতি পূজার্থ মহিলাদের সভা

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদানার্থ কলিকাতার সেনেট হাউসে ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা মহারাণী সুচারু দেবীর সভানেত্রীত্বে যে সভার অধিবেশন হয়, তার বক্তৃতা আদি বিশেষ আন্তরিকতাপূর্ণ হয়েছিল। শোক-প্রস্তাবটিও সুরচিত হয়েছিল। মহিলারা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে অর্থ সংগ্রহ করবেন, কলিকাতার শেরিফ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী তার কোষাধ্যক্ষ হ'য়েছেন। নির্বাচন খুব সুফলপ্রদ হবে আশা করি। ইনি বালিকা বয়সে কবির যে স্নেহ পেয়েছিলেন—যার অতুলনীয় প্রকাশ "ভানুসিংহের পত্রাবলী"কে স্নিগ্ধ ক'রে রেখেছে—কবির সে রকম স্নেহ কম বালিকাই পেয়েছেন।

—

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের দ্বিবিধ আলোচনা

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্বন্ধে মন্ত্রীদের দলের এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে একটা রফা হবার কথা কিছু দিন থেকে চ'লে আসছে ;—কখনো শুনি রফার চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে, আবার কখনো শুনি রফার চেষ্টা পুনরায় হচ্ছে। যদি কোনো রফা হ'য়ে যেত বা হয় এবং তা সরকারী ভাবে উভয় পক্ষ দ্বারা গৃহীত হ'ত বা হয়, তবে তার মূল্যের বিচার করা চলত। নতুবা রফার শুধু চেষ্টার কোনো মূল্য নাই।

অন্য দিকে ব্যবস্থা পরিষদে এই বিলটা নিয়ে দস্তুরমত তর্কবিতর্ক চলেছে। রফার চেষ্টা হচ্ছে ব'লে সে কাজটা বন্ধ নেই। বিরোধী দলের সংশোধন প্রস্তাব একটি

একটি ক'রে ভোটের জোরে নামঞ্জুর হ'য়ে যাচ্ছে। মন্ত্রীদের দলের কাজ যথারীতি চলছে, তাঁরা জিতে চ'লছেন।

এ বড় রঙ্গ!

রফা হবার আশায় বিরোধীরা তর্কবিতর্কে, সংশোধক প্রস্তাব আনয়নে, আল্‌গা দিচ্ছেন কি না জানি না; কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, মন্ত্রীদের দল একটুও আলগা দেন নি; তাঁরা বিরোধীদিগকে হারিয়ে চলেছেন।

যদি রফা হ'ত, তা হ'লেও তার কোন স্থায়ী ফল হ'ত না। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিলে তাতে খুবই অনিষ্ট হবে। প্রশ্রয় দিলে আপাততঃ একটু সোআস্তি হ'তে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে সে সোআস্তি শাস্তিরই নামান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে লক্ষৌ চুক্তিটা স্থায়ী সোআস্তি এনেছিল, না, অশান্তি এনেছে? (২৮শে ভাদ্র, ১৩৪৮।)

বিলটার বিরুদ্ধে আন্দোলন চল্‌ছে। ভবানীপুরে হাজরা পার্কের সভায় হিন্দুদিগকে এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হ'তে এবং হিন্দুমন্ত্রীদিগকে এর বিরোধিতা করতে বলা হয়েছে।

—

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হকের দ্বিবিধ ইস্তফা

'জাতীয়' 'দেশরক্ষা'-কৌন্সিলের গবর্মেণ্টপ্রদত্ত সভ্যত্ব হক সাহেব নিয়েছিলেন। তাতে জিন্না সাহেব অর্থাৎ মুসলিম লীগ তাঁকে সাজা দেবেন ভয় দেখান। তার পর যা যা হয়েছে, খবরের কাগজ পড়িয়েরা তা জানেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি আপাততঃ দুই কুল রক্ষা করেছেন,—উক্ত কৌন্সিলটার সভ্যত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, আবার মুস্লিম লীগের ওআর্কিং কমীটির ও তার কৌন্সিলের সভ্যত্বও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সাধারণ সভ্যত্ব তিনি ছাড়েন নি, বরং 'জাতীয় দেশরক্ষা' কৌন্সিলের সভ্যত্ব ছেড়ে দিয়ে লীগের মান ও মন রক্ষা ক'রেছেন; অর্থাৎ লীগ সম্বন্ধে নরম গরম উভয় ব্যবস্থাই করেছেন। ঐ কৌন্সিলটার সভ্যত্ব ছেড়ে দিয়ে বঙ্গের আইন-সভার মুসলিম লীগ সদস্যদিগকে হাতে রেখেছেন। জিন্না সাহেবকে যে চিঠিখানা লিখেছেন, সেটা গরম পর্য্যায়ে পড়ে। তার সম্বন্ধে জিন্না সাহেব ব'লেছেন, হক সাহেব যে দেশরক্ষা কৌন্সিল ত্যাগ করেছেন, ভালই করেছেন। চিঠিখানাতে জিন্না সাহেবের ডিক্টেটরি চা'ল ও কাজের যে কড়া নিন্দা আছে, তার সম্বন্ধে জিন্না সাহেব সমুচিত ব্যবস্থা যথাসময়ে করবেন ব'লে শাসিয়েছেন।

হক সাহেব প্রধান মন্ত্রিত্বটি ছেড়ে না দিয়ে খুব সুবুদ্ধির কাজ করেছেন। দেশরক্ষা কৌন্সিলের সভ্য হ'লে তাতে ক্ষমতা বাড়ে না, রোজগারও বাড়ে না;—সেটা ছেড়ে দেওয়ায় ক্ষতি নাই। প্রধান মন্ত্রীর বেশ মোটা মাইনে আছে, ক্ষমতাও আছে, তার দ্বারা গবর্মেণ্টকে খুশিও রাখা যায়। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। হক সাহেবের কাজে কল্‌কাতার অবাঙালী মুসলমানদিগকে ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙালী মুসলমানরা অনেকে তাঁর দিকে, কেও কেও নয়। তাঁর বিপক্ষে কল্‌কাতার অবাঙালী মুসলমানদের সভা হয়েছে, আবার তাঁর সপক্ষে বাঙালী মুসলমানদের তার চেয়ে বড় সভা হয়েছে।

—

বাংলার রাষ্ট্র-কৌন্সিলে ফাঁকতালে পাকিস্তানি কাজ উদ্ধার

একদিন বাংলার কৌন্সিল অব স্টেটের অধিবেশন থেকে যখন তার সভাপতি অনুপস্থিত ছিলেন ও এক মুসলমান মহিলা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এবং সদস্যদেরও অনেকেই যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন একটি প্রস্তাবের সংশোধন দ্বারা এই মর্মের প্রস্তাব ধার্য হয়ে গেছে যে, লাহোর মুসলিম লীগের গত অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে যেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি গঠিত হয়। লাহোরের সেই প্রস্তাবটা হচ্ছে পাকিস্তানি প্রস্তাব।

এইরূপ ফাঁকতালে পাকিস্তানের সমর্থক প্রস্তাব পাস করানর নিন্দা অমুসলমান দেশী কাগজগুলি তো করেইছেন, কৃষকপ্রজা দলের মুখপত্র মুসলমান-সম্পাদিত দৈনিক "কৃষক"ও এ রকম চা'লের নিন্দা করেছেন।

—

শান্তিনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন কীর্ত্তিতেই বেঁচে থাকেন, তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করলেই তাঁর প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা হয়—এই সত্য উপলব্ধি ক'রে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের আশ্রমবাসিগণ দিনের পর দিন আশ্রমের প্রাত্যহিক কাজ করে যাচ্ছেন। গত ২৬শে ভাদ্র প্রত্যুষে হলকর্ষণ উৎসবটি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা সহকারে আশ্রমবাসিগণ কর্তৃক উদ্‌যাপিত হয়।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন আচার্য্যের কাজ করেন এবং শান্তি-নিকেতন-সচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হবার পর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন। গত ১৯৩৯ সালের ২৪শে আগষ্ট হলকর্ষণ উৎসবে প্রদত্ত কবির অভিভাষণটি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ করেন। [এটি যথাসময়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হ'য়েছিল।] সমাগত জনতার মধ্যে মুদ্রিত

অভিভাষণ বিলি করা হয়। ১৯৩৯ সালের ২৪শে আগষ্ট কবি যে অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন তার মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হ'ল :—

"প্রারম্ভে সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কবি বলেন কিরূপে ভ্রাম্যমাণ শিকারী মানব সভ্যতার প্রথম আলোকে শান্তিকামী চাষী রূপে দেখা দিল এবং মাটি-মায়ের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করল। চাষ-বাসের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে পরিচিত হ'য়েছে। কৃষি সমাজ-জীবনেরও সৃষ্টি করল। বস্তুত মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন কৃষিকর্ম্মেই হ'য়েছিল এবং অদ্যাপি কৃষি মানবজাতির প্রধানতম জীবিকার সংস্থান।

"তার পর এল যন্ত্র। অবস্থাবিশেষে উহা দেবতার মত দানশীল, আবার দৈত্যের মত বিনাশকারী হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রে বিপত্তি বড় কম বাড়ে নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। উত্তরোত্তর উহা বাড়তির পথেই চ'লেছে—তাই অস্ত্রসম্ভারের প্রয়োজন হ'লো মানুষকে বাধা দিবার জন্য। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষাগ্নি অতীতেও কম ক্ষতি করে নাই; কিন্তু তখন অস্ত্রশস্ত্র তত মারাত্মক ছিল না; আজকার তুলনায় তখন দুর্ঘটনাও কম হ'ত। যন্ত্রের কল্যাণে বর্ত্তমানে মানব-হননের এমন যন্ত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে যে, হাজার হাজার মানুষ বর্ত্তমানে যে কোন যুদ্ধে নিহত হচ্ছে। আত্মহত্যার তাড়নে যেন মানুষ স্বেচ্ছায় মরণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিচ্ছে। আদিম মানব বর্ব্বর ছিল, তার একটি মাত্র মূল প্রেরণা ছিল লোভ। মানবসভ্যতার পরিচ্ছেদগুলি আলোচনা করলে মনে হয় আমরা যেন অতীতের সেই বর্ব্বরতার যুগেই ফিরে চলেছি। পৃথিবী যেন এক বিরাট চিতায় পরিণত হ'য়েছে। সেই আগুনে মানুষ মানুষের বিচারবুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, জ্ঞানবিজ্ঞান, কৃষ্টিকলা সকলই ভস্মীভূত হ'তে চলেছে।

"এই দুর্দ্দিনে আমাদের মনে রাখতে হবে, অতীতে মাটি-মা মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ আপন হাতেই স্বেচ্ছায় দিতেন—উদ্বৃত্তের মোহে তখন এত হানাহানি কাড়াকাড়ি ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড ভূমি চাষ করা হয়। দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন সঙ্গীত গীত হবার পর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মাটির প্রশংসা ক'রে একটি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন। আশ্রমের শোভাযাত্রিগণ প্রত্যেকে কোন না কোন কৃষির যন্ত্র বহন করেন।

এক জোড়া বলদকে সজ্জিত করা হয়। ভূমি কর্ষণের পর কবির বিখ্যাত সঙ্গীত 'জনগণ-মন' গীত হবার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

—এ, পি ও ইউ, পি

—

রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ড

যুদ্ধের বাজারে কাগজের দাম বেড়েছে, কাগজ—বিশেষত ভাল কাগজ—দুষ্প্রাপ্য হ'য়েছে। তা সত্ত্বেও, সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করবার যে পরিকল্পনা হয়েছিল, তার কোনো পরিবর্ত্তন ঘটতে দেওয়া হয় নি; খণ্ডগুলি নিয়ম মত বেরচ্ছে। একটি বড় অসুবিধা এই হ'য়েছে, যে, রচনাবলীর ক্রেতা এত বেড়েছে যে, প্রত্যেক খণ্ডের প্রথম মুদ্রণেই বিশ্বভারতী দ্বিগুণসংখ্যক ছেপে রাখলে পুনর্মুদ্রণের অতিরিক্ত ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হ'ত না; কিন্তু কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা প্রযুক্ত তা তাঁরা করতে পারছেন না।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হ'য়েছে। ছাপা কাগজ আগেকার খণ্ডগুলির মত উৎকৃষ্টই আছে।

এই অষ্টম খণ্ডের গোড়ায় বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের একটি করুণ 'নিবেদন' ছাপা হয়েছে। তার দুটি বাক্য উদ্ধৃত করছি।

"যাঁহার রচনা এই প্রয়াসের উপজীব্য, যাঁহার স্নেহদৃষ্টি ও পরিচালনা ইহার উদ্যোগকর্ত্তাদের সহায় ছিল, তিনি আর আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া রহিলেন না। রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে উপহার দিবার যে একান্ত বাসনা ছিল, তাহা আর পূর্ণ হইল না।"

এই খণ্ডে রচনাবলীর 'কবিতা ও গান' বিভাগে আছে "নৈবেদ্য" ও "স্মরণ", 'নাটক ও প্রহসন' বিভাগে আছে "মুকুট", 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে আছে "ঘরে-বাইরে", 'প্রবন্ধ' বিভাগে আছে "সাহিত্য", এবং শেষে গ্রন্থ-পরিচয় ও বর্ণানুক্রমিক সূচী আছে।

এই খণ্ডে চিত্র আছে—শান্তিনিকেতনে সপ্তপর্ণ তরুতলে রবীন্দ্রনাথ, "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য" কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বিচিত্রিত প্রতিলিপি, রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্মিণী, "ঘরে-বাইরে"র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা, ১৩১৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ।

আজকাল আমরা অনেকেই সাহিত্য বস্তুটি কী, সাহিত্য কি প্রকার হওয়া উচিত, ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা ক'রে থাকি। এমন সময়ে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন, তা নূতন ক'রে পড়লে আমরা সবাই উপকৃত হব। "সাহিত্য" গ্রন্থটিতে কি কি জিনিষ আছে দেখবার জন্য পাতা উল্টোতে উল্টোতে দেখলাম আছে—সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কবিজীবনী।

আমাদের দেশের কবিশিরোমণি এখন বিদেহী হ'য়েছেন। এখন অনেকেই তাঁর জীবনী লিখছেন, লিখবেন। লিখবার আগে তাঁর 'কবিজীবনী' প্রবন্ধটি প'ড়ে নিলে তাঁদের কাজ উৎকৃষ্টতর হবার সম্ভাবনা।

অবিলম্বে আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বরে আমরা অনেক জায়গায় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা করব। রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছেন

"মাতৃসদনে"র ভিত্তি স্থাপনে রবীন্দ্রনাথ

তা এই উপলক্ষে পড়া উচিত। "সাহিত্য" গ্রন্থের মধ্যে তাঁর গল্পের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে (রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৮ম খণ্ডের ৪১৮-৪২০ পৃষ্ঠা)।

এই অষ্টম খণ্ডের "গ্রন্থপরিচয়ে" 'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, তা পাঠকেরা নিশ্চয়ই পড়বেন। "গ্রন্থ-পরিচয়ে" সন্নিবিষ্ট অন্যান্য সামগ্রীও গুরুত্বপূর্ণ।

—

বাঁকুড়া মাতৃসদনের স্থায়ী রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার

নারীকুলের কল্যাণের নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথের হৃদয় সর্বদাই আগ্রহান্বিত ছিল। তিনি যখন বৎসরাধিক পূর্বে বাঁকুড়ায় শুভ পদার্পণ করেন, তখন সেখানকার নারী-সমিতির নেত্রী শ্রীমতী ঊষা হালদার সমিতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাতৃসদনের (Maternity Clinique-এর) ভিত্তিস্থাপন করতে তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি তখন খুব দুর্বল ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মাতৃসদনটির ভিত্তিস্থাপন করেন। একটি মোটর গাড়ী ক'রে তাঁকে তার কাছে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় যাতে তাঁকে গাড়ী থেকে নেমে এক পা-ও যেতে না হয়।

এই মাতৃসদনটি, ভিত্তিস্থাপনের তিন মাসের মধ্যেই, সম্পূর্ণ নির্মিত হয়ে যায়, এবং এর কল্যাণে অনেক প্রসূতি ও শিশু উপকৃত হচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত এই মাতৃসদনটির যোগের স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত এর একটি স্থায়ী রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়পদ রায় মহাশয়ের মাতা শ্রীযুক্তা আনন্দময়ী দেবী সেই ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দান করেছেন।

—

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে প্রবাসী কার্য্যালয় ৯ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ২২শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

—

রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৬ খৃঃ মার্টিন হর্‌লিমান গৃহীত আলোকচিত্র

জয়সিংহ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৮ খৃঃ
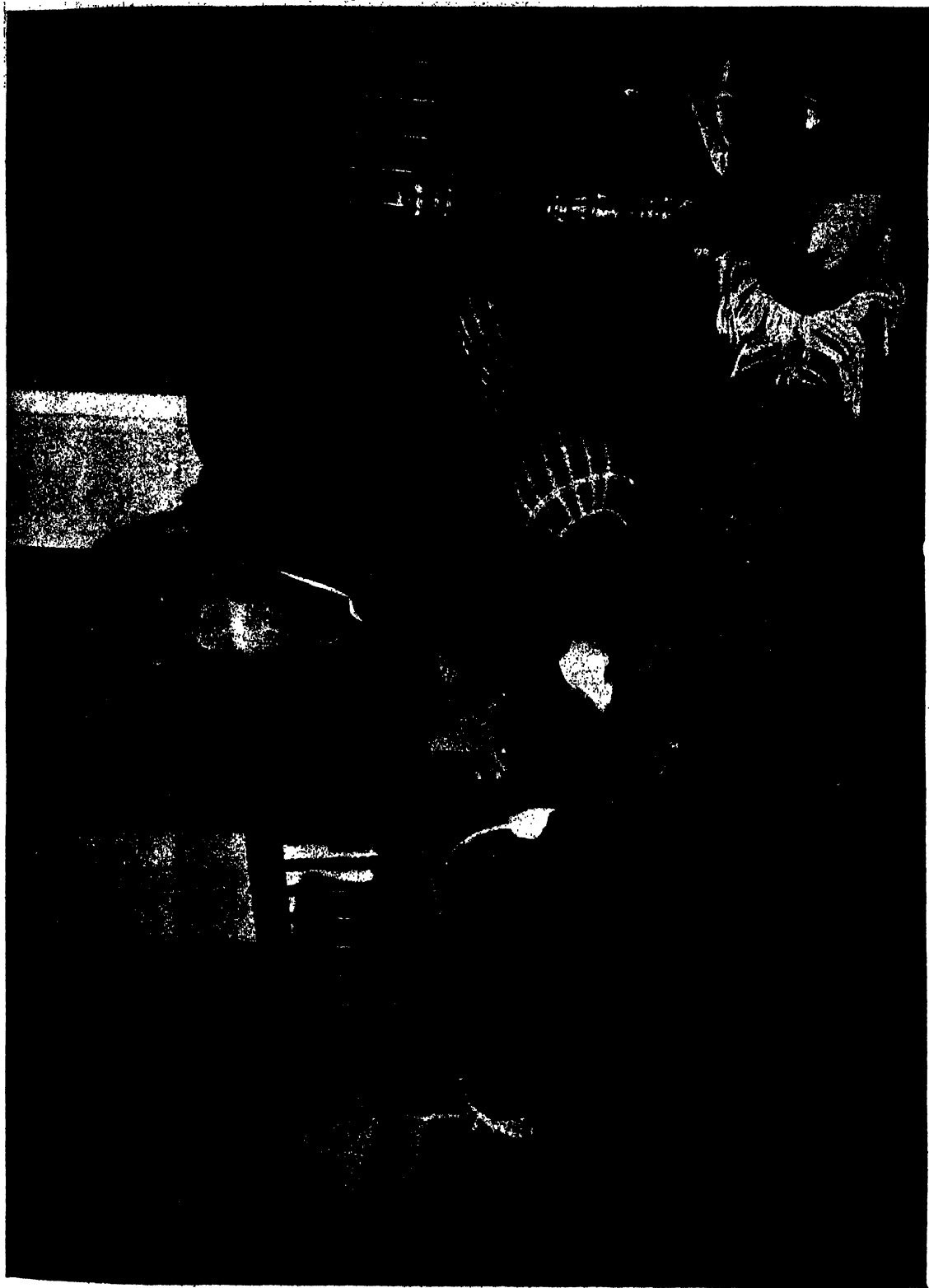
ফাল্গুনীতে রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৬ খৃঃ
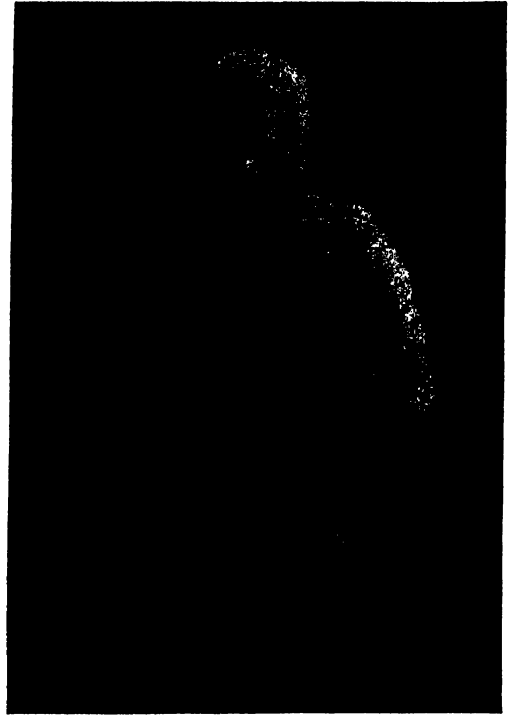
"অন্ধ বাউল" রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৬ খৃঃ

সিংহলে "শাপমোচন"। ১২ মে, ১৯৩৪
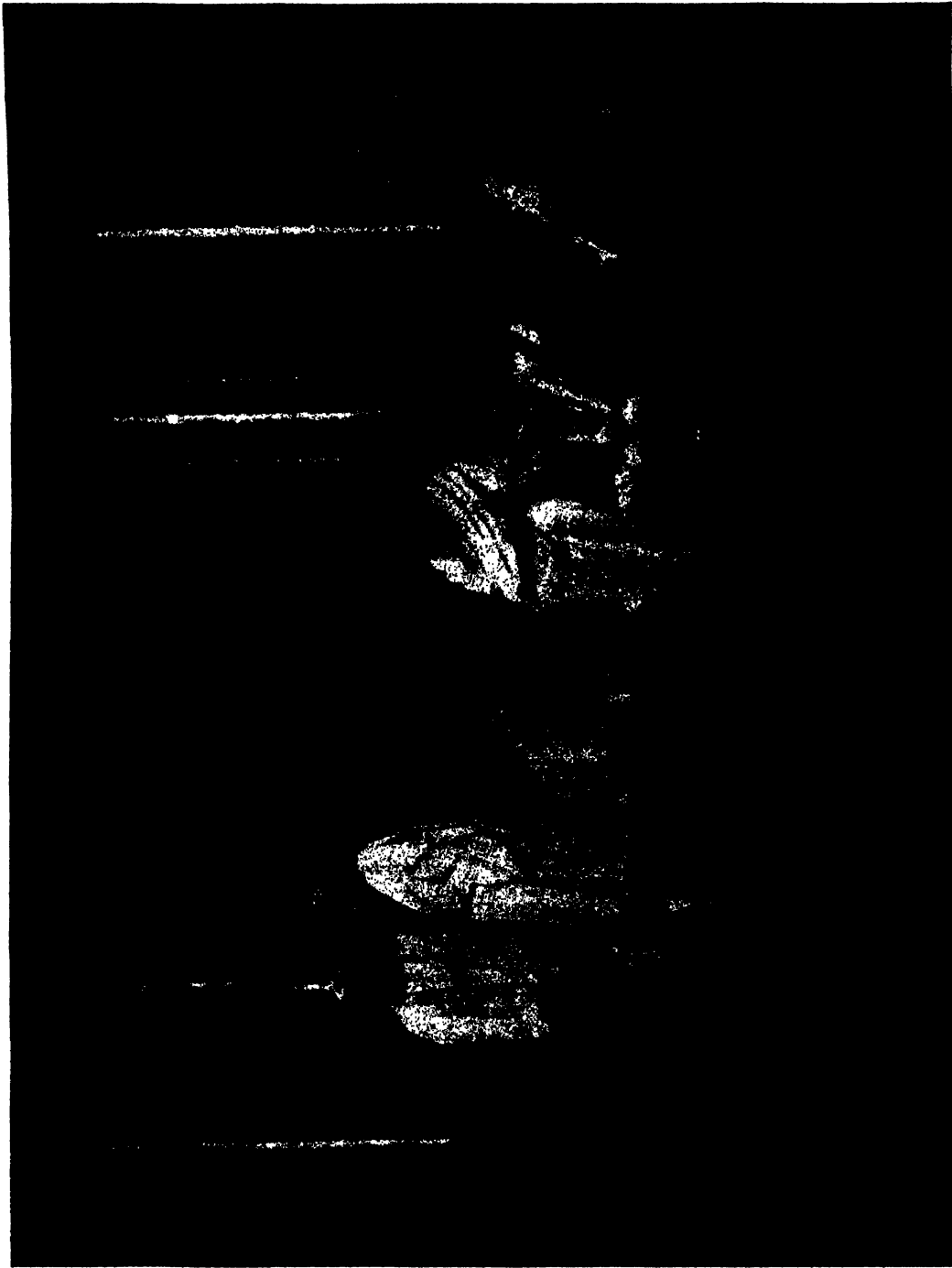
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায়;—
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে দাদামশায়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা নন্দিনীর বিবাহসভায় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত আলোকচিত্র (১৪ই পৌষ, ১৩৪৬)

বিরহিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিন বছরের বিরহিণী জান্‌লাখানি ধ'রে
কোন অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন ক'রে ?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি
ভাবী কালের প্রদোষ আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ঐ কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন সাগরের তীর দেখেছো জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন সুদূর অশ্রু ঢেউ।
সেখানে কোন্ রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি' সাজ্‌তে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপ-কথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তুমি জানো না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছো চোখের নীরব ভাষায়।
হয়তো সে কোন্ সকাল-বেলা শিশির-ঝলা পথে
জাগরণের কেতন তুলে' আসবে সোনার রথে,
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায় ;—
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে দাদামশায়।

(পূরবী)

বুয়োনোস্ এয়ারিস্,
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪।

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণভাজন
নন্দিনী ও অজিত,

তোমরা দুজনে একমনা
করিবে রচনা
তোমাদের নূতন সংসার।
সেথা নিত্য মুক্ত রবে দ্বার
বিশ্বের আতিথ্য নিবেদনে
তোমাদের অকৃপণ মনে।
পুণ্য দীপ রবে জ্বালা ;
দেবতার নৈবেদ্যের ডালা
পূজার কুসুমে পূর্ণ হবে ;
চতুর্দিকে বাজিবে নীরবে
গম্ভীর মধুর
পরিপূর্ণ আনন্দের সুর,
বাজিবে কল্যাণ শঙ্খধ্বনি
দিবস রজনী॥

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দাদামশায়

১৪ই পৌষ
১৩৪৬

ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিশ্বভারতী ;—ভাদ্র ১৩৪৮, মূল্য এক টাকা)

"ছেলেভুলানো ছড়া"কে যখন কবি সাহিত্যে উত্তীর্ণ করলেন তখন দেখা গেল কাঁচা গাঁথুনির রচনায় জনচিত্তের পরিচয় শাশ্বত হয়ে রয়েছে। কালের আঘাতে বড়ো ইমারৎ ভাঙে, মাটির ঘর দেশের হৃদয়ে রক্ষা পায় সেই কথা তিনি বলেছিলেন। অত্যন্ত শিক্ষিতের সামনে ১৩০১ সালে তিনি "মেয়েলি ছড়া" প্রবন্ধটি পাঠ করেন; পূর্ব্বোক্ত রচনাও ঐ বৎসরে লিখিত। শুনেছি গ্রাম্য ভাষার কাহিনী যখন কবির কণ্ঠে প্রকাশিত হ'ল অনেক উচ্চ-ভুরু তার্কিকও সভাস্থলে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন নি। সেই অপূর্ব্ব সংগ্রহ কবির বাণীতে মণ্ডিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের মর্ম্মে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে নানা দেশীয় লোকসাহিত্যের যাচাই হয়েছে। কিন্তু কবি যে-কথাটি সেই যুগে বলেছিলেন তা ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ নৃতত্ত্ব মনস্তত্ত্বে যা দেখাচ্ছে অন্তর্দৃষ্টির বলে পূর্ব্ব হতেই তিনি ব্যক্ত করেন। ছড়া যেন সমস্ত জাতির মনোনীহারিকার সৃষ্টি; বহু জীবনের অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষায় রঞ্জিত স্বপ্নময় ইতিহাস। তার মধ্যে আছে "লোকস্মৃতি"।

রবীন্দ্রনাথের "ছড়া"-গ্রন্থের কবিতায় তেমনি দেখি শুধু জাগ্রত কবি-চিত্তকে নয়, তাঁর মহামানসিক সৃষ্টি-রাজ্যকে যেখানে নানা মহলের মনন বেদনময় অনুভূতি আলোড়িত হচ্ছে, সংজ্ঞায় পৌঁছয় নি। তাঁর বৃহৎ সত্তার যেন আরেকটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় তাঁর নিজের কাছেই নূতন; বড়ো সৃষ্টির অবসরে আপন অগোচরলোক হতে চিন্তা ভাবনার ভগ্নখণ্ডগুলি তুলে দেখছেন, ছন্দের বাহনে আমাদেরও কাছে হাসির ছটায় ব্যক্ত হ'ল। হঠাৎ-লব্ধ আকস্মিকতাই এর প্রধান সুর, কথাগুলি স্বপ্নের ন্যায়সূত্রে বাঁধা। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেকদিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন রহিয়াছে।" সহজ সংলগ্নতার এই লক্ষণ ছড়ার ভাষায় ধরা পড়ে। এই গ্রন্থের ছড়া-ঘেঁষা শৈথিল্যেও অবশ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিপুণ প্রভুত্ব আছেই যেমন রয়েছে চিন্তার আঙ্গিক কিন্তু ছাঁদ সেই লোকসাহিত্যের, এবং ভাবনাকে জড়িয়ে আছে বর্ণবিলাস।

ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন যার পরিচয় এই বইয়ে পাই। অবচেতনের প্রসঙ্গ তখনো নূতন বিজ্ঞানে দেখা দেয় নি। ছড়ার রাজ্য অনেকাংশে অবচেতনের রাজ্য। মগ্নমনো-লোক হতে কী ভাবে রচনার সামগ্রী উদ্ধার হয় একটি উপমার সাহায্যে কবি বুঝিয়েছিলেন। "ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকুই গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই এড়াইয়া যায়"। শিল্পকুশলতাকে যা এড়িয়ে যায় তা হঠাৎ-লগ্নে ভেসে ওঠে ছড়ার রাজ্যে। বস্তুত সকল সৃষ্টিকাজেই অজ্ঞাতসারে ছিন্ন ঘটনার গতি প্রকাশের গভীরে মিলতে থাকে, ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়, কিন্তু ছড়ায় তির্য্যক্ প্রক্রিয়ার প্রাবল্য। লোকসাহিত্যে অবচেতনার এই স্বতঃস্ফূরণ সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন "আপনি জন্মিয়াছে এ-কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।" কেননা "হয়" এবং "এই রকম হয়" এইটে সব চেয়ে বড়ো আশ্চর্য্য; সজ্ঞান মনের অভ্যাস অনেক রকম হওয়াকে বাধা দেয়, ছড়ায় যেন অব্যাহত আবির্ভাব। একই সঙ্গে বিচিত্র-বৈষয়িক আবির্ভাব যা অন্য শিল্পে সম্ভব নয়।

"অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্ম্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে-মুহূর্ত্তে থামে
এলোমেলো ছিন্ন চেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক।"

দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিশালী কবি মনে অনাসৃষ্টির লীলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, যা ঘটত লোকসাহিত্যের স্বাভাবিক আত্ম-বিলীনতার মধ্য দিয়ে কবির রচনায় তার চেয়ে বেশি ঘটল, বিস্মরণের লীলাকে তিনি চারুশিল্পের অধিকারে আনলেন। এখানে অবচেতনার বেগের সঙ্গে মিলেছে সজ্ঞান মনের আত্মসমর্পণ এবং তারই সঙ্গে কবি-ধীবরের এমন সূক্ষ্ম জাল-তৈরি যাতে রঙীন ঝিনুক শামুকের টুকরো পর্য্যন্ত উঠে আসে। কী উঠেছে দেখতে সকল বয়সের চির-শিশুর

ভিড় জমে। নূতন এই "ছড়া" বইখানি পড়তে তেমনি ভিড় হবে।

ঔৎসুক্যের প্রধান একটি কারণ মানুষের মনে চিরস্থায়ী "কী-জানি" এই ভাব। সৃষ্টির রহস্যে বাস ক'রে কেবলি চারিদিক থেকে দেখতে চাই, বুঝতে পারি জ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিতত্ত্বের সবখানি নেই। স্বপ্নের মধ্যে শুধু স্বপ্নের সন্ধান নয়—সেও তো বাস্তব, যেহেতু আছে—জাগ্রত বিশ্বেরও দিগন্ত বিস্তীর্ণ হয়। "ছড়া"র ভূমিকায় কবি বলছেন,—

"পষ্ট আলোর সৃষ্টিপানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি।
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়মঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।"

সহজ সংলগ্নতার কথা কবি বলেছিলেন; তার প্রকাশ হয় অসংলগ্নতায়। অথচ মন বলে এই যদৃচ্ছরচনা-ভঙ্গীতে কোথাও একটি নিগূঢ় ঐক্যের সন্ধান আছে যার উপর বিশ্ববৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠা। ছড়ার মধ্যে স্বপ্নের টেক্‌নীক আছে, অথবা অবচেতনার, সেটাও টেক্‌নীক যদিও আগাগোড়া এলোমেলো। "ছড়া"র ষষ্ঠ কবিতায় পুকুরের মাছ থেকে গল্প কোন্ ডাঙায় ভেসে এল; মধ্যে শুনলাম রেডিয়ো, দেখলাম অদৃশ্য ব্যাক্‌টিরিয়া, সাঁতরা-গাছির ড্রাইভার, নাচনমণির নাচ, খাঁচার মধ্যে শ্যামা পাখী কত কী। মন বলছে ক্ষীণ ভাবের সূত্র আছে কিন্তু সেটা এতই লক্ষ্যের বাহিরে যে উপলক্ষ্য বলতে দোষ নেই। আসল সূত্র সহজাত এই বিশ্বে প্রতিবেশীর ভাব।

ছড়ার রাজ্যে আছে অস্তিত্বের মধ্যে একটা অসঙ্গতির ছবি, যার নিহিতার্থ-সঙ্গতিকে মানুষ খোঁজে। একেই য়েট্‌স বলেছেন আধুনিক কবিতার দৃষ্টিতে অসঙ্গতির দার্শনিকতা। বাহিরে এবং মনে ঘটনার পারম্পর্য্য নয়, প্রতিবেশিত্বও রয়েছে। "যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প,—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল—সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ ("ছেলেভুলানো ছড়া")।" সংসারে শত বস্তুর সমাবেশ একটা অদ্ভুত রহস্য। "ছড়া"র ৭ নম্বর কবিতায় জুটেছে গলদা চিংড়ি, ফটকে ছোঁড়া, পুলিস সার্জন, নাগা সন্ন্যাসী, মুর্গিহাটার মিঞা···কত নাম করব। কেবল বলতে হয় তারা সবাই আছে। অস্তিত্বের নিগূঢ়তম অসঙ্গতি দেখি ছড়ার রাজ্যে কিন্তু ছড়া সেখানে আয়না, যা সর্বত্র হচ্ছে তারি চলচ্ছবি। দেখতেই মজা, কিন্তু প্রশ্নও থামে না—কেন? চাবিটা কি হারিয়ে গেছে স্বপ্নে? গানে আছে,

"কেউ কখনো পায় কি খুঁজে
স্বপ্নলোকের চাবি?"

ছড়ার অসংলগ্নতা সংলগ্ন হয়ে আছে আরেক সূত্রে। সেটা হচ্ছে মিলের মিল, ছন্দঝঙ্কারের বন্ধন। "ছড়া" বইয়ের কবিতায় মিল এবং অনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব চকমকি জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোন্ পথে চলেছি খেয়াল হয় না, ছন্দে পা ফেলে অনুসরণ করি। মিলের অভিনবত্ব কোন্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার দৃষ্টান্ত কী ক'রে দেব, "ছড়া"র প্রতিপদেই এই মিরাকল্ ঘটছে। সব চেয়ে যা অভাব্য সেইটে এল অভাবনীয় মিলের স্কন্ধে চড়ে, একেবারে অনিবার্য। "বস্তা বস্তা কাদমা যে" পড়ল "ব্রহ্মপুত্র নদ মাঝে","হাংলু ফিড়াং পর্বতের" ধারা "সর্বতের" স্রোতে পরিণত হ'লে আশ্চর্য কী? মিলেই খুসি, মিলেই ভাবের ঝলকানি, মিলেই বর্ণ এবং ব্যঞ্জনা, মিলেই অনির্বচনীয়তা। আবার মিলেই প্রচ্ছন্ন পরিহাস, তীব্র সমালোচনা, আধুনিক কালের প্রসঙ্গ, রূপকথায় আভাস। ছড়া বইখানিকে মিলের প্রসাধন বলা যায়, এমন বৈচিত্র্য কোথাও নেই। "ছড়া ও ছবিতে"ও নয়।

মিল যেমন অসঙ্গতিকে যোজনা করেছে তেমনি ছড়ার রাজ্যে গরমিল ঘটিয়েছে এই মিল। মিলের টানে যা হবার নয় তা হয়েছে। "চুল ছাঁটে চাঁদনির দর্জি"। এই লাইনটা এবং পরের অনেকগুলি লাইন কবি এক দিন পেয়েছিলেন ঘুমের মধ্যে। জেগে উঠেও মিল থাম্‌তে চায় না, অগত্যা লিখে ফেল্‌তে হ'ল এবং মিল বেড়েই চলল। দর্জি আনে মর্জি, সেই লাইনটা গেল আগে (লেখ্‌বার সময়), জুল্‌ফি থেকে এল full fee। ভাব্‌তেই সময় পাই না যে দর্জির প্রধান কাজ চুল-ছাঁটা নয়। অনুপ্রাসেও এই হুড়োহুড়ি—চাঁদনি থেকে রাঁধ্‌নি, শিরান থেকে ইরান। মিলান্ত পদের মধ্যবর্তী রাশি রাশি মিলের খেলা। স্বপ্নের দুর্লভায় যেমন "আরো-সত্য"কে মেনে নিই, কথার ভেল্‌কিতেও তেমনি সম্ভবকে ডিঙিয়ে যাই।

"লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া
নাসা হতে পাখা দাও গুঁজিয়া।"

না দিয়ে উপায় কী। মিলের উপ্‌চে পড়ছে রস।

"তার পরে হোলো মজা ভরপুর
যখন সে গেল মজাফরপুর।"

দেখা যাচ্ছে ছড়ার দীপ জাল্‌লে রক্ষা নেই।

"একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চারদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।"

তা ছাড়া আছে ছবি। আলাদা ক'রে দেখ্‌লে নিখুঁৎ, সম্পূর্ণ; সব মিলে, স্বপ্ন। কোনো কোনো ছড়ায় একটি স্পষ্টছবির পরিমণ্ডলে বহু স্বতন্ত্র ছবি রয়েছে। সুরের ঐক্য এখানে অনেকটা চেতনা-গ্রাহ্য। একই আলোয় দেখা পটে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা; কিন্তু দেখার রহস্যটুকু সম্পূর্ণ ভেদ করা যাবে না।

"ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউল-চূড়ার ত্রিশূলে"

সেই মেঘের আলো পড়ল গ্রামের অনেকখানি জীবনের উপর। সেখানে দেউলের সঙ্গে আছে কামারের কাঁসারীর ব্যবসায়, ধানের ক্ষেত, বর্ষাজলের মাঠ। অথচ অদ্ভুতের হাওয়া বইছে। গীতিকবিতার হৃদয়াবেগ থেকেও নেই; ছবিগুলি যেমন খুসি এসে পড়েছে। এতেও "জোনাবালি মির্জার" ছড়াটির মতো অহেতুকতা, যদিও সেখানে উনপঞ্চাশী পবন জোরে বইছে। সব ছড়াতেই লৌকিক এবং ঘোর অলীক ঘটনার ছড়াছড়ি। সেতুর কাজ করছে স্বপ্নসম্ভাব্য বাক্যের ইন্দ্রধনু।

হাস্যের পিছনে যেখানে ঝলছে পরিহাস তার ব্যাখ্যা করলে রসভঙ্গ হবে। দলাদলির সমরাঙ্গনে জাতীয় বীর্য রক্ষা হচ্ছে, স্থানটা বোধ হয় গলির মোড়। উন্মার মাত্রাটা দেখতে হবে, পরে অন্য বিচার।

"এর পরে দুই দলে মিলে' ইঁটপাটকেল ছোঁড়া,
চক্ষে দেখায় শর্ষের ফুল, কেউ বা হোলো খোঁড়া।

পরিণামটা শোনাচ্ছে কম, কিন্তু,

"পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ-পারেতে এ'কেই বলে লড়াই।"

মেবার পতন ও উদ্ধারের আধুনিক এই রকম অভিনয় যে সভায়, খেলার মাঠে, প্রবল হাততালির যোগে সম্পন্ন হয় এ খবর ছড়ায় ধরা পড়েছে। কবিতাটা আরম্ভ হয়েছিল আজগুবি যুদ্ধে, হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠল দ্রুত কটাক্ষ। এম্‌নি ক'রে নানা জায়গায় দৃষ্টিবাণ ছড়ানো, মর্ম্মে পৌছনর। দ্বিতীয় ছড়ায় "নোন্‌তা এবং মিষ্টির" তত্ত্ব আছে যা আধুনিক সাহিত্যের বোঝা দরকার। অতি সূক্ষ্ম ব'লেই নিগূঢ় তাৎপর্য্য মনে ব্যাপ্ত হতে থাকে, যদিও সূক্ষ্মতার চতুর্দ্দিকে ম্যাজিকের কাণ্ড ঘটছে। কাগজী সম্প্রদায়ের পক্ষে উপভোগ্য হওয়া উচিত তিন নম্বরের ছড়া। "রিপোর্টারে"র কীর্ত্তি এই কবিতায় অক্ষুণ্ণ র'য়েছে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; পুঁথি খুলে দেখুন। "এডিটর"ও বাদ যান নি। শেষ অবধি সমাধান হ'ল বাক্যে এবং আরো বাক্যে।

"পায়রা জমায় সভা বকবকবকমে"

অর্থাৎ অর্থ নেই শব্দ। বাক্যব্যাপারীর উপযুক্ত। আইনী এবং বিচারজ্ঞের জগৎ পড়বেন চতুর্থ ছড়া। কিছু অর্থোদ্গম হবেই।

নিজেকে নিয়ে খেলা। এর মধ্যে লোকসাহিত্যের রস মিলেছে সচেতনার ঐশ্বর্য্যে। যে-সময়ে কবি নিজেকে হাসিয়েছেন তাঁর সেই সময়ের ব্যক্তিগত ইতিহাস জান্‌লে হাসির সম্পদকে আরো অমূল্য মনে হয়—কিন্তু আনন্দলোকে কোনো ছায়া নেই। ছায়াহীন মাধুরীকে এই ছড়ার জগতে দেখব। শৈশবের একটি নূতন ভুবন তৈরি হ'ল সাহিত্যে; দূর কাল পর্য্যন্ত তাতে আলো পড়বে।

লোকসাহিত্য সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন,

"এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।…এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।"

আরেক জায়গায় বলছেন,

"সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে; অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।"

"ছড়া" বইখানি পড়বার কালে চিরনবীনতার এই তত্ত্ব মনে পড়েছিল।

কবি যাওয়ার পর ছাপা হয়েছে এই তাঁর প্রথম বই।

অমিয় চক্রবর্ত্তী

শেষ লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিশ্বভারতী ; ভাদ্র ১৩৪৮, মূল্য বারো আনা)

"শেষ লেখা"য় রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশেষ তেরোটি কবিতা ও দুটি গান বের হয়েছে। এর স্থান তাঁর শিখরসূর্য্যে। বইখানি একটু পড়লেই তা বোঝা যায়। আজকের অন্ধকার আমাদের চক্ষে যতই ঘন হয়ে থাকুক, কবিতা পাঠের সময় চিরমধ্যাহ্নলোকে প্রবেশ করি। প্রাণধরুণী সেখানে প্রকাশিত।

কোনো সাহিত্যে এই স্তরের কবিতা নেই। এর সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর মনে করি না।

মূল একটি কথার উল্লেখ করব। প্রাণের বিশেষ দৃষ্টি কবিতাগুলিতে ছড়ানো রয়েছে ; নূতন ভাবে বোঝাবার ইঙ্গিতও আছে। প্রাণ পরম, প্রাণ অক্ষয়, প্রাণ আনন্দ, দুঃখে এবং সুখাগ্নিতে অনাদ্যন্ত। তার স্পর্শে পৃথিবী সত্য, স্বপ্ন হতে নূতন জন্মগ্রহণ। "শেষ লেখা"র কাব্য জীবন পার হ'ল, মৃত্যু পার হ'ল। যেখান থেকে আরম্ভ হ'ল সেইখানে প্রাণ নূতন রহস্যময়। তার স্বরূপ কী ?

> রূপ-নারানের কূলে
> জেগে উঠিলাম,
> জানিলাম এ-জগৎ
> স্বপ্ন নয়।

তেরোই মে শেষ রাত্রে উঠে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা লিখেছিলেন। এ কোন্ জাগা ? যিনি সমস্ত চৈতন্য নিয়ে চলে এসেছেন, চরম কোন্ বেদনার অভাবে সত্তার শেষ পরিচয় তাঁর কাছে অনুদ্‌ঘাটিত ছিল ? মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ হ'ল দেহের অন্তিম দুঃখে।

> রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
> আপনার রূপ,
> চিনিলাম আপনারে
> আঘাতে আঘাতে
> বেদনায় বেদনায়।

বলেছেন "আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন।" কিন্তু তপস্যা পূর্ণ হয়ে এলে দুঃখজয়ী প্রাণ কোন্ পাওয়াকে ব্যক্ত করে।

> কষ্টের বিকৃত ভান,*ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত
> অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

দুঃখে জয়ী হতে হবে। জীবনের মুখোস খ'সে যায়। কিন্তু জয় শেষ হ'লেও শুধুমাত্র আরম্ভ।

"এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক।" কুহকের বাহিরে যা তার কথা আলাদা ক'রে বলা হ'ল না। কিন্তু কুহকের বাহিরে গিয়ে যে-দৃষ্টি তার পরিচয় রইল। সেখানে ছবি, অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত দ্রষ্টার প্রাণ-দৃষ্টি। তিনি দেখ্‌ছেন,

> "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।"

মৃত্যু এবং জীবনের নানা শিল্পে প্রাণের যবনিকা কারুখচিত। দুঃখের বিচিত্র ভঙ্গী সেখানে মিশেছে, সেই একই আশ্চর্য্য আঙ্গিকে। "অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার," তাকে প্রাণ চেয়ে দেখছে। ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি বহিরঙ্গনে ছলনার অঙ্গ।

ছলনার কথা শেষ কবিতায় বলা হয়েছে। "সৃষ্টি" অর্থে জীবন-সংক্রান্ত আমাদের জানার যা-কিছু। সেইখানে ছলনা। তারই সঙ্গে আরেক জগৎ, যা হওয়ার, যেখানে যেতে হয় অন্তরের পথ দিয়ে। দুয়ের মধ্যে আমাদের বাস পৃথিবীতে। সমস্তকে নিয়ে প্রাণ। সৃষ্টির জগৎ সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনার জালে আকীর্ণ, সেখানে জন্মীমাত্রকেই ছলনায় চিহ্নিত হতে হবে। সরল জীবনেও ছলনার ছায়া এসে পড়ে ; মহত্ত্বকেও দাগী করে, তারও গোপন রাত্রি নেই সম্পূর্ণ পালাবার। সৃষ্টির জগতে তাই অপরিসীম দুঃখ। কিন্তু যে এই দুঃখের কুহক সহ্য করতে পারল তার চলবার পথের কথাও বলা হয়েছে।

> তোমার জ্যোতিষ্ক তা'রে
> যে-পথ দেখায়
> সে যে চিরস্বচ্ছ,
> সহজ বিশ্বাসে সে যে
> করে তা'রে চিরসমুজ্জ্বল।

* এখন জানা গিয়েছে "ভাল" নয়। (এই কবিতাটির নাম কবি দেন নি।)

বাহিরের পথ যত কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু। এই পথে বহন ক'রে নেওয়া যায় শেষ পুরস্কার।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে কবি তাঁর জীবনের শেষ রচিত তিনটি পদ বললেন।*

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

২

প্রাণের রহস্য কথায় ব্যক্ত হয় না। অক্ষয় অধিকারের মধ্যে দিয়ে যার পরিচয় জীবনের ভাষায় তা প্রকাশ করলে প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

* আশ্বিনের প্রবাসীতে "শ্রীসেবিকা"র রচনা দ্রষ্টব্য।

এই একটি সম্পূর্ণ কবিতা। পৃথিবীর সাহিত্যে এর তুলনা সম্বন্ধে কিছু বলা বৃথা।

২৭ জুলাই প্রভাতে রচনাকালে কবি বলেন—

"সকাল বেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে—কয়েক লাইন—লিখে রাখ—নয়ত হারিয়ে ফেলব।"*

৩

এই কবিতার বইয়ে একটি কবিতা আছে যা মৃত্যু-শোকের প্রতীক। চৌকি শূন্য।

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দু-পহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনা-লেশ নাহি…

সেদিক দিয়ে কোনোই সান্ত্বনা নেই।

"শ্রীসেবিকা"র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর"

সান্ত্বনা আছে প্রাণে। তা ছাড়া নেই। তারই বলে জীবনের মধ্য দিয়েই "জীবনের স্বর্গীয় অমৃত"কে লাভ করার কথা কবিতায় আছে। সেখানে মৃত্যুর হরণ নেই। দ্বিতীয় কবিতায় আনন্দের প্রত্যুচ্চারণ,

"এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি"

ঘুরে ঘুরে এসেছে গানের সমের মতো। মৃত্যুশোক অতিক্রম করবার সাধনা "শেষ লেখা"র কবিতায় প্রকাশিত। ক্রমশঃ

অমিয় চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্র-প্রয়াণ

শ্রীপূর্ণিমা ব্রহ্মচারী

বিশ্বের বরণ্যে রবি অস্তাচল পারে,
তাই সারা বিশ্ব আজ আঁধারে নিলীন।
আপনারে বঞ্চি তুমি দিয়ে গেলে যাহা,
স্মৃতি তার কোন দিন হবে না বিলীন।
বাঙ্গালা মায়ের বুকে এসেছিলে, কবি,
ভালে লয়ে বিধাতার দীপ্ত জয়টীকা;
ভারতীর বরপুত্র, তুলিলে জাগায়ে
ছন্দে, গানে, কাব্যে, প্রেমে পূত হোমশিখা।
বাঙ্গালা মায়ের অশ্রু মুছাবার তরে
রিক্ত করি' আপনারে করে গেছ দান,

তোমার আশার বাণী শুনেছে সকলে,
নিজেরে চিনেছে তাই বাঙালীর প্রাণ।
ব্যথার দরদী তুমি, বন্ধু সবাকার,
সকল জাতির ছিলে কত যে আপন,
তোমার স্নেহের ডোরে বেঁধেছ সবারে
তোমারে হারায়ে বিশ্ব বিষাদে মগন।
বহুদিন সহে' গেছ বিরহ-বেদনা,
আজ তুমি গেলে তাই প্রিয়ার সকাশে,
ঝুলন-পূর্ণিমা দিনে বাঁধিবারে রাখী—
অবিচ্ছেদ যে মিলনে রবে প্রিয়াপাশে।

মেছো-পাখী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীতে যে কত বিভিন্ন জাতীয় রকমারি পাখী দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় পাখীর সংখ্যা প্রায় দশ হাজার; আবার কাহারও কাহারও মতে এই সংখ্যা তের হাজারেরও বেশী। সে যাহাই হউক,

বক জাতীয় মেছো-পাখী

আজ পর্য্যন্ত ইহাদের যতগুলির সহিত মানুষের পরিচয় ঘটিয়াছে, অঙ্গসংস্থান ও শরীর গঠনের উপর ভিত্তি করিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু আচার-ব্যবহার ও আহার-বিহারের বিষয় বিবেচনা করিলেও ইহাদিগকে মোটামুটি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আহার-বিহারের দিক্ হইতে কতকগুলি পাখী সম্পূর্ণ আমিষাশী, কতকগুলি নিরামিষাশী এবং কতকগুলি আবার আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্য গ্রহণেই অভ্যস্ত। আমিষাশী পাখীগুলিকেও আবার বিভিন্ন পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। আমিষাশী অনেক পাখী কেবল কীটপতঙ্গ উদরসাৎ করিয়াই জীবনধারণ করে, কেহ কেহ জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণেই অভ্যস্ত। আবার কতকগুলি পাখী নিছক মৎস্যাশী। এই মৎস্যাশী পাখীদিগকেই আমরা মেছো-পাখী নামে অভিহিত করিয়াছি। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও শিকার-কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে মেছো-পাখীদের মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

মাছরাঙা পাখী সকলেই দেখিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতীয় মাছরাঙা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সচরাচর তিন-চার জাতীয় মাছ-রাঙা নজরে পড়ে। ইহাদের মধ্যে চড়ুই ও টুনটুনি পাখীর মত দুই জাতীয় ছোট, ও ময়না বা শালিক পাখীর মত এক জাতীয় বড় মাছরাঙাই দেখিতে সুশ্রী। ইহাদের ঠোঁট লম্বা ও সুঁচালো। ঠোঁটের রং গাঢ় লাল। শরীর নীল ও লালচে খয়েরী রঙের পালকে আবৃত। সাদা-কালোয় বিচিত্রিত আর এক জাতীয় মাছরাঙাকে খাল, বিল, ডোবা, পুকুরের উপর প্রায়ই উড়িয়া বেড়াইতে দেখা

টার্ণ নামক মেছো-পাখী

মেছো-পাখী—মাছরাঙা

যায়। রঙীন মাছরাঙা অপেক্ষা ইহাদেরই সংখ্যা অধিক বলিয়া বোধ হয়। জলের ধারে অনাবৃত ডালপালার উপর রঙীন মাছরাঙাগুলিকে প্রায়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। বসিয়া বসিয়া ইহারা ছোট ছোট মাছের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং সুবিধা বুঝিলেই ঝুপ করিয়া জলে পড়ে। ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ। সরু-মুখ চিমটার মত লম্বা ও ধারালো ঠোঁটের সাহায্যে মাছটিকে ধরিয়া পুনরায় ডালের উপর গিয়া বসে এবং মাছের মুখের দিক্‌টাকে বারংবার গাছের ডালে আঘাত করিতে থাকে। আঘাতের ফলে মাছটা অসাড় হইয়া পড়িলে আস্ত গিলিয়া ফেলে।

সাদা-কালোয় বিচিত্রিত মাছরাঙার মৎস্য-শিকার-কৌশল অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। জলাশয়ের পঁচিশ-ত্রিশ হাত উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে ইহারা ভাসমান মৎস্যের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। কোন মাছকে কিছুকাল এক স্থানে ভাসিয়া থাকিতে দেখিলেই অদ্ভুত উপায়ে অতি দ্রুত গতিতে ডানা নাড়িয়া এক স্থানে প্রায় তিন-চার মিনিটকাল স্থির ভাবে উড়িতে উড়িতে ইহারা ভারী জিনিসের মত হঠাৎ ঝুপ করিয়া জলে পড়িয়া যায় এবং পরক্ষণেই শিকার ঠোঁটে করিয়া উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে বসে। ঠোঁটের চাপে মাছটা ভয়ানক ভাবে ছটফট করিতে থাকে। পাখীটা তখন তাহাকে গাছের ডালে বারংবার আছাড় মারিয়া অসাড় করিয়া ফেলে এবং একবারেই আস্ত মাছটাকে উদরস্থ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অত উঁচু হইতে একটা ভারী পদার্থের মত পতনবেগে পাখীটা প্রায় এক ফুট দেড় ফুট জলের নীচে চলিয়া গেলেও তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে পুনরায় জল হইতে উড়িয়া যাইতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করে না।

কোড়াল বা মেছেল নামে পরিচিত আমাদের দেশে বৃহদাকৃতির এক প্রকার মেছো-পাখী দেখা যায়। ইহারা খুব উঁচু গাছে বাসা বাঁধে। এক এক এলাকায় এক জোড়ার বেশী মেছেল দেখা যায় না। ইহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রহরে প্রহরে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া থাকে। বহু দূর হইতে ইহাদের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা কোড়ালের ডাক শুনিয়া রাত্রিতে প্রায় সঠিক ভাবে সময় নিরূপণ করিতে পারে। ইহারা শিকারী পাখী এবং প্রধানতঃ মৎস্য শিকার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর যে, উঁচু গাছের ডালে বসিয়াই জলাশয়ে ভাসমান মৎস্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকে। মাছ দেখিতে পাইলে অত উঁচু হইতেই ভারী প্রস্তরখণ্ডের মত তাহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মাঝারিগোছের মাছের তো কথাই নাই। রুই, কাত্‌লার মত বড় মাছকেও ইহারা নখে বিঁধিয়া লইয়া উড়িয়া যায়। অবশেষে উঁচু ডালে বসিয়া ধারালো ঠোঁটের সাহায্যে শিকারকে টুকরা টুকরা করিয়া উদরস্থ করে। জলের উপর মাঝারিগোছের কচ্ছপ ভাসিতে দেখিলেও ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া উদরস্থ করে। কেবলমাত্র শক্ত খোলাটাকে নীচে ফেলিয়া দেয়। অনেক সময়ে হিসাবে ভুল করিয়া

পেঙ্গুইন জলের নীচে মাছের পিছনে ছুটিতেছে

মৎস্যভুক্ রক্তগ্রীব ডুবুরী পাখী

নিজের শরীরের তুলনায় অনেক বড় মাছের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে নখে গাঁথিয়া ফেলে; কিন্তু শিকার লইয়া জল হইতে উড়িয়া যাইতে পারে না। তখন জল তোলপাড় করিয়া উভয়ের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা চলিতে থাকে। শিকারী কিন্তু নাছোড়বান্দা—আয়ত্তাধীন শিকারকে কিছুতেই সে পরিত্যাগ করিবে না। শারীরিক শক্তির আধিক্যবশতঃ মাছ অবশেষে ক্ষতবিক্ষত দেহে তাঁহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিলেও পরিণামে সেই ক্ষতই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় ডুবুরী পাখী পানকৌড়ির মৎস্য শিকারের দক্ষতা অসাধারণ। সূর্য্যোদয়ের পর জলে পড়িয়া মৎস্যের সন্ধানে সারাদিন জলে ডুবাইয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাদের দেহের গঠন জলের নীচে দ্রুতগতিতে চলিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। শরীরটা চওড়ার তুলনায় অসম্ভব লম্বা। পালকের রং মিশমিশে কালো। শরীরের সহিত সমসূত্রে লম্বা গলা প্রসারিত করিয়া ইহারা যখন জলের নীচে মাছের পিছনে ছুটিতে থাকে তখন মনে হয় যেন একখণ্ড লৌহদণ্ড তীব্রবেগে প্রধাবিত হইতেছে। পা ও ডানার সাহায্যে জল কাটিয়া অগ্রসর হইলেও জলের মধ্যে কোন আলোড়ন উপস্থিত হয় না; কাজেই মাছেরা অনেক সময় অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শিকার মুখে করিয়া পানকৌড়ি জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং তাহাকে উপরের দিকে ছুড়িয়া দিয়াই পুনরায় লুফিয়া লইয়া গিলিয়া ফেলে। পানকৌড়ি একটানা অনেকক্ষণ জলের নীচে ডুবিয়া থাকিতে পারে। সময় সময় গলাটি এমন কি শুধু ঠোঁটটি মাত্র জলের উপরে রাখিয়া আধুনিক ডুবো-জাহাজের মত অনায়াসে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়।

এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে আরও অনেক রকমের মেছো-পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের মৎস্যশিকার প্রণালী ছোঁ-মারা পাখীদের মত। এ দেশীয় গাং চিল, শঙ্খ-চিল ছোঁ-মারা শিকারী। গাং চিলের দেহবর্ণ ঈষৎ কাল্‌চে সাদা। এই হাল্কা, লিক-লিকে গঠনের পাখীদের উড্ডয়ন-ক্ষমতা অসাধারণ। কখনও ইহাদিগকে বসিয়া বিশ্রাম করিতে দেখা যায় না। সর্ব্বক্ষণই জলের অনেক উপরে ক্ষিপ্রগতিতে উড়িয়া বেড়ায়। উড়িতে উড়িতে কোন মাছ নজরে পড়িলেই তীর বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। গাং চিল উড়িতে উড়িতেই শিকার উদরস্থ করিয়া থাকে। সহজে কায়দা করিতে না পারিলে শিকারটাকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু নীচে পড়িবার পূর্ব্বেই অপূর্ব্ব কৌশলে পুনরায় লুফিয়া লয়। বারংবার এরূপ করিবার ফলে শিকার নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তখন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সুবিধা মত গিলিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। শঙ্খ-চিলেরাও দূর হইতে ছোঁ মারিয়া শিকার ধরে এবং গাছের ডালে বসিয়া একটু একটু করিয়া তাহার দেহ উদরসাৎ করে।

বক জাতীয় কয়েক রকমের পাখী প্রধানতঃ মাছ খাইয়াই জীবন ধারণ করে। শিকার ধরিবার সময় ইহাদের অসাধারণ ধৈর্য্য ও মৃদু পদবিক্ষেপে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর

পানকৌড়ি জলের নীচে মাছের পিছনে ছুটিতেছে

হইবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাছ ধরিবার আশায় ইহারা জলের ধারে অথবা জলজ ঘাসপাতার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। মাছ দেখিতে পাইলেই এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সুঁচালো লম্বা ঠোঁটের সাহায্যে অবলীলাক্রমে তাহাকে ধরিয়া গলাধঃকরণ করে।

বিদেশীয় মৎস্যাশী পাখীদের মধ্যে করমোরাণ্টের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জলে ডুবিয়া মাছ ধরিবার দক্ষতা ইহাদের অসাধারণ। করমোরাণ্ট প্রায় তিন ফুট লম্বা হইয়া থাকে। পালকের রং কালো কিন্তু ঈষৎ সবুজাভ। যৌন-মিলনের পূর্ব্বে পুরুষ পাখীগুলির মাথায় সুদৃশ্য সাদা পালক গজাইয়া থাকে। পর্ব্বতসঙ্কুল সমুদ্রোপকূলে বা নদী-সন্নিহিত স্থানেই ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। করমোরাণ্ট প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ মাছ উদরস্থ করিয়া থাকে। অন্যান্য মাছ অপেক্ষা বড় বড় বাণ মাছ উদরস্থ করিতেই ইহাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বাণ মাছ ধরিয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেই সেটা সাপের মত মোচড়াইয়া পেটের ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে থাকে। সর্ব্বশেষে অবশ্য পরাজয় স্বীকার করিয়া করমোরাণ্টের উদরে স্থান লাভ করিতে বাধ্য হয়। হাঁসের পায়ের মত ইহাদের পায়ের নখগুলি পাতলা চামড়ায় জোড়া হইলেও ইহারা সাধারণ পাখীর মত গাছের ডালে বসিয়া থাকিতে কোনই অসুবিধা বোধ করে না। বড়, ছোট বিভিন্ন আকৃতির কয়েক জাতীয় করমোরাণ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কাহারও পালকের রং গাঢ় সবুজ, কাহারও গাঢ় নীল, আবার কাহারও বা মিশমিশে কালো। গাঢ় রঙের জন্য দূর হইতে সবগুলিকেই কালো বলিয়া মনে হয়।

করমোরাণ্ট খুব সহজেই মানুষের পোষ মানিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ইহাদিগকে পোষ মানাইয়া মাছ ধরিবার কাজে লাগাইত। চীনারা আজও ব্যাপকভাবে করমোরাণ্ট পাখীর সাহায্যে মাছ ধরিয়া ব্যবসা চালাইয়া থাকে। পোষা করমোরাণ্টগুলিকে গলায় আংটি পরাইয়া তাহারা জলে ছাড়িয়া দেয়। আংটি পরানো থাকায় তাহারা মাছ ধরিয়া গিলিয়া ফেলিতে পারে না। মাছ ধরিয়াই তাহা মনিবের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া পুনরায় নূতন শিকার অন্বেষণে যাত্রা করে। কোন করমোরাণ্ট হঠাৎ কোন বড় মাছ ধরিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে অপর পাখীরা তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় এবং দুই-তিনটি পাখী সমবেত চেষ্টায় শিকারকে বশীভূত করিয়া মনিবের নৌকায় লইয়া আসে। জাপানী জেলেরাও করমোরাণ্টের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে নৌকাযোগে করমোরাণ্টগুলিকে লইয়া মৎস্যবহুল স্থানে উপস্থিত হয় এবং নৌকার পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত একটি লৌহপাত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। অগ্নির আলোকে আকৃষ্ট হইয়া মাছগুলি নিকটে আসিলেই জেলেরা দড়ি বাঁধা করমোরাণ্টগুলিকে জলে ছাড়িয়া দেয়। মাছ ধরিবামাত্রই পাখীগুলিকে দড়ির সাহায্যে টানিয়া আনিয়া তাহাদের ঠোঁট হইতে শিকার কাড়িয়া লওয়া হয়।

পেঙ্গুইন এক প্রকার অদ্ভুত পাখী। ইহাদের পা দুটি শরীরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। কাজেই স্থলভূমিতে বিচরণ করিবার সময় মানুষের মত দেহটাকে খাড়া করিয়া চলা-ফেরা করে। দুই পাশের অপরিণত ডানা দুটিকেও কতকটা মানুষের হাতের মতই প্রতীয়মান হয়। পেঙ্গুইনেরা উড়িতে পারে না। ডানা দুইটি বিশেষ শক্তিশালী হইলেও মোটেই উড়িবার সহায়ক নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা ডুবুরী পাখী। ডানা ও পায়ের সাহায্যেই ইহারা জলের নীচে তীরবেগে ছুটিতে পারে। পেঙ্গুইনরা সাধারণতঃ দুই পায়ে ভর দিয়া চলাফেরা করে, কিন্তু যখন ঢালু জমির উপর দিয়া উঁচু স্থানে অগ্রসর হয় অথবা দলবদ্ধভাবে নীচে নামিতে চেষ্টা করে তখন ডানা ও পায়ের সাহায্যে ঠিক যেন চতুষ্পদের মত চলিতে থাকে। স্থলভাগে অবস্থান কালে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা সটান মাটির উপর শুইয়া পড়ে এবং জলে সাঁতার কাটিবার ভঙ্গীতে ডানা ও পায়ের সাহায্যে প্রাণপণে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। কোনক্রমে জলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। সেখান হইতে লম্ফ দিয়া জলে পড়িয়াই চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। জলের নীচে ডুবিয়া মাছের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সময়ে সময়ে শ্বাসগ্রহণ করিবার জন্য জল হইতে লাফাইয়া উঠে; কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। গতি এতই ক্ষিপ্র যে, সে সময়ে নজরে পড়িলে সেটা মাছ কি পাখী বুঝিবার উপায় থাকে না। মাছ যতই চটপটে বা দ্রুতগতিসম্পন্ন হউক না কেন, পেঙ্গুইনের নজরে পড়িলে আর রক্ষা নাই। জলের নীচে পেঙ্গুইনেরা হাতের মত ডানার সাহায্যে জল কাটিয়া যে কোন মাছ অপেক্ষা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। পেঙ্গুইনরা মাটিতে সামান্য গর্ত্ত খুঁড়িয়া একবারে মাত্র দুইটি করিয়া ডিম

পাড়ে। স্ত্রী-পাখীরাই ডিমে তা' দিয়া থাকে। পুরুষ-পাখী সে সময়ে প্রায়ই তাহার নিকটে অবস্থান করে কিন্তু প্রয়োজন মত মাছ ধরিয়া আনিয়া স্ত্রী-পাখীটিকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে কসুর করে না। এই সময়ে সারাদিন মাছের পিছনে ছুটাছুটি করিবার ফুরসুৎ কম এবং উভয়ের আহার সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়াই পুরুষকে মরিয়া হইয়া শিকার সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। এই সময়ে অকুতোভয়ে বড় বড় মাছকেও পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করিতে ইতস্ততঃ করে না।

করমোরাণ্ট মাছ ধরিয়া জলের উপরে আসিতেছে

দক্ষিণ-ইয়োরোপ ও উত্তর-আফ্রিকার পেলিকান পাখীরাও মৎস্য-শিকারী ডুবুরী পাখীর পর্য্যায়ভুক্ত। শরীর অপেক্ষা ইহাদের বিরাট্ ঠোঁটের প্রতিই সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিরাট্ ঠোঁটের মাথাটি বড়শীর মত বাঁকানো। ঠোঁটের নীচের দিকে ছাকুনি-জালের মত পাতলা চামড়ার লম্বা একটি থলি আছে। এই থলির মধ্যে অনেকগুলি মাছ একসঙ্গে সঞ্চিত রাখিতে পারে। পেলিকানের শরীরের অধিকাংশ পালকই সাদা; কিন্তু বড় পালকগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা ভয়ানক পেটুক। হ্রদ, জলাভূমি বা স্রোতস্বতী নদীর মধ্যে প্রায়ই ইহাদিগকে মৎস্য শিকারে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। পেলিকান পাখী সুষ্ঠুভাবে হাঁটিতে না পারিলেও উড়িবার দক্ষতা ইহাদের অসাধারণ। উড়িবার সময় মাথাটাকে কাঁধের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া পা দুটাকে লেজের নীচ দিয়া যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া দেয়। ইহারা সুদক্ষ ডুবুরী হইলেও মাছ ধরিবার সময় ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কতকগুলি পাখী সারবন্দীভাবে একত্রিত হইয়া মাছগুলিকে অগভীর জলে তাড়াইয়া লইয়া যায়। তথায় অতি সহজেই সেগুলিকে টপাটপ ধরিয়া ফেলিয়া ঠোঁটের থলিতে পুরিয়া রাখে এবং অবসরমত উদরস্থ করে। ঠোঁটের থলিতে পুরিয়া অজস্র মাছ বাচ্চাদের জন্য বাসায় লইয়া যায়। বাচ্চাগুলি মায়ের ঠোঁটের মধ্যে গলা প্রবেশ করাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়।

ইয়োরোপের অনেক স্থানে গ্যানেট নামে হংসজাতীয় এক প্রকার মেছো-পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ছোট পাহাড়ের গায়ে অথবা নীচু গাছে ঘাস-পাতার সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মাথা ও ঘাড়ের কাছে ঈষৎ ধূসর বর্ণের পালক ছাড়া ইহাদের শরীরের অন্যান্য পালকগুলি সম্পূর্ণ সাদা। ডানার প্রান্ত ভাগের বড় পালকগুলি অবশ্য কৃষ্ণবর্ণ। গ্যানেট পাখীরা বিভিন্ন জাতীয় মাছ উদরস্থ করিলেও হেরিং মাছের প্রতিই লোভটা বেশী। মাছ দেখিতে পাইলেই অনেক উঁচু হইতে তাহার উপর তীর বেগে ঝাঁপাইয়া পড়ে। পাখীগুলি তিন ফুটেরও বেশী লম্বা হইয়া থাকে। এরূপ একটি বিরাট্ আকারের পাখী উঁচু হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িলে, একমাত্র পতন বেগেই কতখানি শক্তি অর্জ্জিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া সুতীক্ষ্ণ ঠোঁটের আঘাতেও শিকার সহজেই কাবু হইয়া পড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা মাংসের লোভে অতি অদ্ভুত কৌশলে এই পাখীগুলিকে শিকার করিয়া থাকে। খুব শক্ত এবং মোটা কাষ্ঠখণ্ডের সহিত একটি জীবন্ত হেরিং মাছ আটকাইয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। শিকার দেখিতে পাইলেই গ্যানেট উঁচু হইতে ভীমবেগে তাহার উপর পতিত হয় এবং তাহার ফলে শক্ত কাঠে ধাক্কা লাগিয়া মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। অনেক সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, উঁচু হইতে পতনের ফলে পাঁচ-ছয় ফুট জলের নীচে নিমজ্জিত কাষ্ঠখণ্ডে গ্যানেটের ঠোঁট দৃঢ়ভাবে বিঁধিয়া রহিয়াছে এবং গলার হাড় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে ইহারা নাকি মানুষকে আক্রমণ করিয়া ভীষণ ভাবে আহত করিয়া থাকে।

মেরু সন্নিহিত প্রদেশে টার্ণ নামে গাং-চিলের মত এক জাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মাছ খাইয়াই জীবনধারণ করে। আমাদের দেশের মাছরাঙা ও মেছেল পাখীর ন্যায় ইহারাও উপর হইতে প্রস্তরখণ্ডের মত ভাসমান মাছের উপর পড়িয়া তাহাকে ঠোঁটে করিয়া লইয়া যায়। ইহারা বালির মধ্যে সাধারণ ভাবে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ডিম পাড়ে। এই সময়ে কোন লোক বাসার নিকটে উপস্থিত হইলে অনেকগুলি পাখী একত্রিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে না। 'স্কিমার' নামে টার্ণ জাতীয় কয়েক প্রকার মেছো-পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ঠোঁট দেখিতে অনেকটা কাঁচির মত। নীচের ঠোঁটটি জলের নীচে ডুবাইয়া ও উপরের ঠোঁট জলের উপর রাখিয়া জলের উপর দিয়া দ্রুতবেগে উড়িয়া যায়। ব্যাপারটা কতকটা যেন জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার মত। এই উপায়ে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত ভাসমান মাছের ঝাঁক হইতে ইহারা প্রচুর পরিমাণ শিকার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের রক্তগ্রীব ও কৃষ্ণগ্রীব পাখীরা আমাদের দেশের পানকৌড়ির মত উৎকৃষ্ট ডুবুরী। ইহারা সারা দিন জলে ডুবিয়া মাছ ধরিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাদের পালকগুলি শরীরের সঙ্গে যেন দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত ও মসৃণ। ইহারা জলের নীচে বহু দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারে। অন্যান্য ডুবুরী পাখীদের এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় না। বাচ্চাগুলি পর্য্যন্ত ডিম হইতে বাহির হইবার ঘণ্টাখানেক বাদেই জলের নীচে ডুবিয়া সাঁতার কাটিয়া থাকে।

স্কুয়া নামক মেছো-পাখীরা মৎস্য ধরিবার জন্য কোন পরিশ্রমই করে না। অন্যান্য মেছো-পাখীদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক শিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাতেই উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত হেরিং-গাল, কিটিওয়েক, পাফিন, গিলেমট, গ্রীব প্রভৃতি অপরাপর বহুবিধ মেছো-পাখীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহারা জলে ডুবিয়া কি উপর হইতে শিকারের ঘাড়ে পড়িয়া অথবা ছোঁ মারিয়া মৎস্য শিকার করিয়া থাকে।

শুভদৃষ্টি

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

চুপ ক'রে চেয়ে দেখ মুখখানি অপরূপ ;
গুণ্ঠনে ঢাকা ওই—চাঁদ কি ?
জ্যোৎস্না ও সুধা দিয়ে গড়িল কে সোনামুখ,
অথবা এ মোহিনীর ফাঁদ কি ?
কলরব করিও না, মর্ম্মের খোল দ্বার,
খুলে দাও হৃদয়ের ঢাক্‌না ,
প্রণয়ের দর্পণে চিনে লও প্রাণ তার,
কণ্ঠের ভাষা মূক থাক্ না !

কাব্যের খাতা খুলে বসে আছি চুপচাপ,
কালিমুখে উৎসুক লেখনী ;
আশেপাশে শুনিতেছি শব্দের দুপদাপ,
ছন্দ নামিবে বুঝি এখনি !
ভারতীরে কহিলাম,—সত্বর ধরা দাও,
সার্থক করি নব সৃষ্টি।
শুনিনু আকাশবাণী,—মুখরতা ভুলে যাও,
চোখে চোখে হোক্ শুভদৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর সাধনা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে গুজরাত-সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী গুরুদেব অর্থাৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখনও নন-কোঅপরেশন আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই কিন্তু সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বকালীন আকাশের মত সমস্ত গুজরাতের চিত্তাকাশ এই আন্দোলনের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় ভরপুর। কেহ কেহ মনে করিলেন, এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ সায় দেন কি না তাহা জানাও মহাত্মাজীর অভিপ্রেত ছিল। সে-সব কথা আমরা জানি না কিন্তু আমরা গিয়া দেখিলাম সাহিত্যের নামে ডাক আসিলেও গুজরাতের সমস্ত চিত্ত তখন রাজনীতির উত্তেজনাতেই উদ্দীপ্ত।

গুরুদেবের সঙ্গে পরলোকগত এণ্ড্রুজ সাহেব, সন্তোষকুমার মজুমদার এবং আমি এই তিন জন গুজরাত রওয়ানা হইলাম। পথে পথে অনেক সম্বর্দ্ধনার সমারোহ পার হইয়া বোম্বাই পৌছিলাম। বোম্বাই যাইবার রাস্তায় যে-সব কঠিন অনুর্ব্বর প্রদেশ, সেখানে গাছপালা নাই, কোনো রং নাই। সেখানে মেয়েদের ঘাগড়ায় ওড়নায় রঙের অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের এই রংটুকু দেখিয়া বলিলেন, "তবু এদের এতটুকু দরদ আছে যে, একটু রং দিয়া আমাদের নয়নকে তৃপ্ত করিতেছে। বাংলা দেশে প্রকৃতির মধ্যে রঙের অন্ত নাই, কিন্তু সেখানে মেয়েদের বসনভূষণে একেবারে রঙের অভাব।"

ঘাটপর্বতে পৌছিতেই প্রকৃতির গম্ভীর সৌন্দর্য্যের সাগরে কবিগুরু ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু কল্যাণ ষ্টেশনে আসিতেই ভোলানাথ সারাভাই প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত লোক অভ্যর্থনা করিবার জন্য বোম্বাই হইতে আসিয়া ট্রেনে উঠিলেন। বোম্বাই স্টেশনে বিপুল একটি অভ্যর্থনা পার হইয়া, বোম্বাইয়ে দিনটুকু মাত্র কাটাইয়া, রাত্রির গাড়ীতেই আমেদাবাদ রওয়ানা হওয়া গেল। বড়োদার স্টেশনে যখন পৌছিলাম তখন রীতিমত রাত্রি আছে। কিন্তু এণ্ড্রুজ সাহেব দেখি তখনই শয্যা ত্যাগ করিয়া স্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। পরে দেখিলাম চায়ের জন্য তাঁর এই অকাল-বোধন।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট হইল। সাহিত্য-সম্মেলনেও তাঁহার অভিভাষণ অতিশয় আদরের সহিত গৃহীত হইল। নানা রাজনীতিগত আলাপ-আলোচনা লইয়াও লোকের পর লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ আমার সেই সব কথা আলোচ্য নহে। গুজরাতে ও বোম্বাইতে নারীদের কাছে নারীজীবনের আদর্শ ও সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যাহা যাহা বলেন আজ তাহারই একটু আলোচনা করিব।

সাহিত্য-সম্মেলনের কাজটুকু চুকিলেই আমেদাবাদের মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানকার বনিতা-বিশ্রাম মেয়েদের একটি বড় প্রতিষ্ঠান। সেখানে যাইয়া মেয়েদের আদর্শ ও সাধনার বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য কবির কাছে তাগিদ আসিল। তিনিও রাজি হইলেন। তখন সারা গুজরাতের চিত্ত রাজনীতির উত্তেজনায় ভরপুর। সেখানকার মেয়েরাও সেই উত্তেজনার স্রোতে ডুবিয়া আছেন। এমন সময় তাঁহার কথা কি ভাবে মেয়েরা গ্রহণ করিবেন তাহাও ভাবিবার বিষয়। তাহার পর আর একটা সমস্যা হইল ভাষা। তখন সেখানে অধিকাংশ মেয়েই ইংরেজী জানিতেন না। তবে প্রধান উদ্যোগী শ্রীমতী বিদ্যা গৌরী ও শ্রীমতী সারদা গৌরী এই দুই জনই ছিলেন গ্রাজুয়েট। যাহা হউক, কথা হইল গুরুদেব বলিবেন বাংলায়, আমি তাহা দিব অনুবাদ করিয়া।

রবীন্দ্রনাথকে যখন কিছু উপদেশ দিতে বলা হইল তখন তিনি মেয়েদের কাছে স্নেহের সহিত বলিলেন, "দেখ, আজ একটি কথা আমার বার বার মনে আসিতেছে। স্বর্গরাজ্য যখন দৈত্যেরা অধিকার করিল, যখন অধিকারচ্যুত দেবতাগণ যুদ্ধে ও রাজনীতির কূট পদ্ধতিতে কিছুতেই দৈত্যদের সঙ্গে আর আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, যখন বৎসরের পর বৎসর তাঁহারা অশেষ চেষ্টাতেও স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা দেখিলেন শিব আছেন ব্রহ্মসমাধিমগ্ন হইয়া। সমাধিবিলীন শিবকে জাগাইবার উপায় কি? অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া তাঁহারা দেখিলেন সমাধিস্থ শিবকে জাগাইবার সাধ্য তাঁহাদের নাই। তখন শিবকে জাগাইতে পারেন একমাত্র গৌরী। নারীর সেই ঐকান্তিকী তপস্যাতে যদি শিব জাগ্রত হয়েন তবেই দেবতাদের কিছু আশা, নইলে যুদ্ধনীতি রাজনীতি সব নীতিই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তখন গৌরী তাঁহার নির্মল চিন্ময় তপস্যাতে শিবকে জাগাইলেন। স্বর্গরাজ্য মুক্ত হইল।

আজ ভারতবর্ষ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত। পুরুষের দল আছেন সব নানাবিধ কূট রাজনীতি লইয়া। ইহাতে কিছু হইবে না। যদি তোমরাও পুরুষেরই অনুকরণ করিয়া রাজনীতির উত্তেজনাতে নিজেদের ভাসাইয়া দেও তবে আর কোনো ভরসা নাই। পুরুষের অক্ষম দুর্বল অনুকরণ না করিয়া তোমরা যদি তোমাদের অন্তরাত্মার সত্যকে আবিষ্কার করিয়া, উপলব্ধি করিয়া, আপনার সত্য সাধনায় ব্রতী হও তবেই আশার কথা। তোমরাও যদি আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া পুরুষের ক্ষীণ অনুকরণে নিজেদের খোয়াইয়া ফেল তবে আর কোথাও আশা নাই।

তোমরা ভুলিও না যে তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই আদি তপস্বিনী গৌরী সুপ্ত আছেন। তাঁহাকে জাগাও। পরমকল্যাণময়ের সহিত যোগযুক্ত হইবার তপস্যার মধ্যে আপনাদের দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা অন্তরের মোহের দ্বারা বিচলিত হইয়া তপস্যার অচল আসন হইতে তোমরা বিচ্যুত হইও না।"

এই বক্তৃতার প্রায় ১২ বৎসর পরে এই কথাই কবিগুরু তাঁহার "বীথিকা" গ্রন্থে "দুর্ভাগিনীর তপস্যা"র মধ্যে একটুখানি আর এক ভাবে বলিয়াছেন। এই বক্তৃতার ১৫ বৎসর পরে "শেষ সপ্তকে" বিশ্বলক্ষ্মী নামক কবিতায় কবিগুরু লিখিলেন,

> দিনে দিনে দুঃখকে দগ্ধ করলে
> দুঃখেরি দহনে,
> শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলে
> পূজার পুণ্য ধূপে।
> কালোকে আলো করলে,
> তেজ দিলে নিস্তেজকে,
> ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হোলো
> ত্যাগের হোমাগ্নিতে। পৃ. ১২৪

আমেদাবাদের কর্তব্য শেষ হইলেই কাঠিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত ভাবনগর রাজ্য হইতে আসিল নিমন্ত্রণ। একটি স্পেশাল গাড়ীতে আমরা রওয়ানা হইলাম। এপ্রিল মাস, দিনে ঐ সব দিকে দারুণ গরম। অথচ পথে পথে সকলের আগ্রহ মিটাইতে দিনের বেলাই গুরুদেব চলিয়াছেন। পথে পথে এক এক ষ্টেশনে দলে দলে নারীরা ধূপদীপ, নারিকেল, গন্ধপুষ্প, মাল্য লইয়া গুরুদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা গুরুদেবকে প্রণতি জানাইলে তিনি তাঁহাদের এই আশীর্বাদই সর্বত্র করিলেন, "দেশময় দুর্গতি, জগতে বড় দুর্দিন আগত, কঠিন তপস্যার প্রয়োজন। সত্য তপস্যায় আপনাকে দীক্ষিত কর। সমস্ত মিথ্যা মোহ ও কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত হও।"

আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ভাবনগর হইতে অনেকে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদের সঙ্গেই চলিয়াছেন। আমেদাবাদ হইতে করুণাশঙ্কর ভট্টজী আমাদের সঙ্গী হইয়াছেন। ভাবনগরের বৃদ্ধ মণিশঙ্কর মেহতাজী সর্বদা আমাদের যত্ন করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগকে বিস্মিত করিলেন ভক্তবৃদ্ধ প্রাণজীবন উদ্ধবদাস ঠাকুর। তিনি বড়ঘরের মানুষ, বৃদ্ধ অভিজাত। কিন্তু বৈষ্ণব ভাবে ভরপুর হইয়া তিনি যে ভাবে আমাদের সেবায় প্রবৃত্ত, তাহাতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। তিনি কানে কম শোনেন, কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন মুখখানিতে একটি স্বর্গীয় ভাব দীপ্যমান।

প্রধান মন্ত্রী স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টানীর ব্যবস্থায় ভাবনগরে খুব জাঁকাইয়া অভ্যর্থনা ও বক্তৃতাদি হইয়া গেল। তার পর কবি বলিলেন, "এখানে দেখিবার মত কি আছে?" আমি জানাইলাম, "এখানকার ভক্তদের মন্দিরা বাজাইয়া যে ভজন, তাহা দেখিবার মত।" বলবন্ত রায় ঠাকুরের বাড়ী ভজনগানের ব্যবস্থা হইল। সেখানে ভক্তনারীদের মন্দিরায় অপূর্ব ছন্দে ভজন এবং তাহার সঙ্গে সর্বদেহের ছন্দে ছন্দে প্রণিপাত দেখিয়া কবিগুরু একেবারে মুগ্ধ হইলেন। ভক্তেরা মীরার কয়েকটি গান করিলেন আর গাহিলেন ভাণ-ভগত, রবি সাহেব, জীবন সাহেব প্রভৃতির সব ভজন।

আমি সেখানে একটি বৃদ্ধা তাপসমাতার সহিত গুরুদেবের পরিচয় করাইলাম। তিনি খুব অভিজাত বংশের নারী। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যখন এই দুঃখের পথে নামিলেন তখন আত্মীয়জনেরা বাধা দেন নাই?" তিনি বলিলেন, "বাধা তো দিবেনই। স্নেহ যাঁরা করেন তাঁহারা বাধা কি না দিয়া পারেন? তাঁহারা সবাই বলিলেন, নারী তো কখনও এমন তপস্যা করে নাই। তবে দাদু-দুহিতা তপস্বিনী নানী-মাতার মত আমিও বলিয়াছিলাম—'কেন মনে করিতেছ দুষ্কর তপস্যা নারীর অসাধ্য? নারীর কাছে কি এত বড় দাবী পূর্বে কখনও

করা হইয়াছে? যত বড় দাবী আমরা করি, সাড়াও মেলে ঠিক সেই মতই।'

নার নে নহি হোয় কছু?
কহাঁ হৈ অস দাবা? (নানী-মাতা)

'নারী কোমল এই জন্য যদি বল মুক্তির তপস্যায় সে অযোগ্য তবে বলিব, অঙ্কুরও তো কোমল, তবু পাষাণবৎ কঠিন সব বাধা সে মুক্ত করিতে পারে। জীবন চির দিনই কোমল ও সুকুমার অথচ তাহার মত দুর্জয় শক্তি আছে কোথায়?'

এই তপস্বিনীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া গুরুদেব অতিশয় তৃপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আজ একটি যথার্থ নারীর দেখা পাইলাম, নারীর সাচ্চা উক্তি শুনিলাম, নারীদের মুখে পুরুষদের কথারই পচা পুনরুক্তি শুনিতে শুনিতে কান একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে।"

ভাবনগরের পালা সাঙ্গ করিয়া আমেদাবাদ ফিরিলাম। আমি ১৬ই এপ্রেল আসিয়া আমার বন্ধু পরলোকগত ডাহ্যাভাই পুরোহিতের গৃহে উঠিলাম। তিনি ছিলেন এখানে বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী। তাঁহার স্ত্রীর গুজরাত জুড়িয়া আতিথ্যের খ্যাতি। পরদিন ১৭ই গুরুদেব বড়োদায় আসিয়া রাজ-অতিথি হইয়া রাজকীয় "গেষ্ট হাউসে" (Guest House) উঠিলেন। সেখানে সব চাকরবাকর পাচকের দল সোনালী রূপালী তকমায় ভূষিত। আমাকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই গেষ্ট হাউসে উঠেন নাই কেন?" আমি আমার বন্ধু পুরোহিত মহাশয়ের পত্নীকে দেখাইয়া বলিলাম, "আমি ইঁহার আতিথ্য লইয়াছি।" তখন গুরুদেব বলিলেন, "আপনি বেশ ভাগ্যবান, যথার্থ অন্নপূর্ণার সেবা-যত্নই আপনি লাভ করিয়াছেন, আমার ভাগ্যে জুটিয়াছেন সব দাড়ীওয়ালা অন্নপূর্ণা।" এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্তা রেবা বেন (শ্রীমতী পুরোহিত) গুরুদেবের. সেবায় ও অনেক কাজে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বড়োদাতে ১৯শে এপ্রেল তারিখে প্রভাতে গুরুদেবকে নৃসিংহাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নারীরা সহচরী সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন। বৈকালে সেখানকার হাইকোর্ট ভবনে অর্থাৎ "ন্যায় মন্দিরে" মহিলা সমাজেও গুরুদেব নিমন্ত্রিত হইলেন। বড়োদায় তিনি নারীর দুইটি স্বরূপের কথা বলেন। একটি হইল কলা ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, আর একটি স্বরূপ হইল তপস্বিনীর। কবিগুরু তাঁহার বলাকায় এই দুইটি স্বরূপের কথাই চমৎকার ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

কোন ক্ষণে সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
এক জনা উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রাণী স্বর্গের অপ্সরী।
অন্য জনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী, বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এক জন তপোভঙ্গ করি ..
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি'
বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে...
আর জন ফিরাইয়া আনে, অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিত হাস্য সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে জীবন মৃত্যুর পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে। (বলাকা, দুই নারী)

সুধু সৃষ্টির মধ্যে কেন আমাদের ঘরে ঘরে সংসারেও নারীর মধ্যে যে এই দুইটি স্বরূপ দেখা যায় তাহা তাঁহার "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতায় তিনি দেখাইয়াছেন। তাহা ১৮৯৬ সালে লেখা। তখন তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়স।

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি, তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী
প্রাতে কখন দেবীর বেশে তুমি সমুখে উদিলে হেসে
আমি সম্ভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজ নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে।

১৯শে এপ্রেল মধ্যাহ্নে প্রসিদ্ধ আব্বাস তায়েবজী মহাশয়ের বাড়ীর মেয়েরা কবির সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলাপ করেন। গুজরাতে মেয়েদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। তায়েবজী মহাশয়ের গৃহেও অবরোধপ্রথা দেখিলাম না।

মিস (Miss) তায়েবজী বেশ শিক্ষাদীক্ষায় সংস্কৃতি-প্রাপ্তা কন্যা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"নারী-চরিত্রের কোন্ বিশেষত্ব আপনার সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে হয়?" কবি বলিলেন, "আদর্শ অর্থাৎ idealismএর কাছে তাহার আত্মোৎসর্গ। আমার 'খেয়া' গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে বিনা কারণেও তাহার আদর্শের তাহার প্রিয়ের পথের উপরে নারী তাহার বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া পারে নাই।"

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে?
(শুভক্ষণ)

মিস তায়েবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আদর্শের জন্য কি নারীর কপালে দুঃখের পর দুঃখ বিধাতা লেখেন নাই?"

কবি বলিলেন, "নিশ্চয়ই, বিধাতার কাছে নারী চাহিল কোমল ফুলের মালা, বিধাতা দিলেন তাহাকে কঠোর কঠিন তপস্যার বরদান। এই যে দুঃসহ ব্রতের ভার তিনি দিলেন ইহাতেই নারীত্বের যথার্থ সম্মান। নারী নিজে আপন মূল্য জানে না তাই সে চাহিল বিলাস-কোমল উপহার। বিধাতা নারীত্বের মহিমা জানেন বলিয়াই তাহার সেই অযোগ্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন দুঃসহ কঠোর সাধনার দান।"

খেয়ার "দান" কবিতায় দেখি নারী মনে মনে চাহিল তাঁহার মালাখানি। তিনি তাহার জন্য রাখিয়া গেলেন তরবারী। তাহা—

জ্বলে উঠে আগুন হেন
বজ্র হেন ভারী।
... ...
... ...
তাইতো আমি ভাবি বসে
এ কি তোমার দান?
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান?
... ...
... ...
শক্তিহীনা মরি লাজে এ ভূষণ কি আমায় সাজে
তবু আমি বইব বুকে এই বেদনার মান
নিয়ে তোমারি এই দান।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরাণময়। (দান)

মেয়েরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরুষের সমাজে নারীর সেই সম্মান আজও কেন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই?" কবি বলিলেন, "পুরুষ নারীকে তাহার মহত্তম স্বরূপে উপলব্ধি করে নাই। নারীকে যদি মাত্র ভোগ্যা বলিয়া জানা হয় তবে তাহাতে তো নারীত্বের সব চেয়ে অপমান। অথচ নারীরা নিজেদের সেই দাবীর কথা ভাবিয়াই গর্বে ভরপুর। এই হীন পরিচয়ের দায় মিটাইবার জন্যই চাই নারীর দিবারাত্রি সচেষ্ট সাধনা। নারীর যথার্থ স্বরূপের কথা আমি বলিয়াছি আমার চিত্রাঙ্গদা নাটকে। আজ রাত্রিতে তাহারই ইংরেজী চিত্র তোমরা অভিনয় করিতেছ।" তখন কবি তাঁহার বাংলা চিত্রাঙ্গদা লইয়া একটু পড়িয়া শুনাইলেন। অর্জুনকে যে চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন,

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে পরিচয়।"

এই সব কথায় তাঁহারা অবাক্ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া রহিলেন। বিলাতের সংস্কৃতিতে পূর্ণ একটি মেয়ে বলিলেন, "আমি এমনতর পরিপূর্ণ নারীত্বের আদর্শের কথা আপনার কাছে আশা করি নাই। কারণ শুনিয়াছিলাম আপনি ঈশ্বরে ভক্তি করেন (অর্থাৎ সেকেলে)।" এইরূপ 'সেকেলে' ভগবৎপরায়ণ লোকের কাছে এমন যুগযুগান্ত-দীপ্ত-করা নারীত্বের মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ১৯২৪ সালে চীন দেশেও ছেলে-মেয়েরা মনে করিয়াছিলেন কবি ঈশ্বরবিশ্বাসী, অতএব তিনি সমস্ত অগ্রগতির বিরুদ্ধবাদী, সেকেলে। পরে তাঁহাদেরও সে ভ্রম ভাল করিয়াই ভাঙ্গিয়াছিল।

সেই রাত্রে অর্থাৎ ১৯শে এপ্রেল রাত্রে বড়োদার দেওয়ান স্যার মনুভাইর বাড়ী চিত্রার অভিনয় হইল। সারদা দেবীর কন্যা সাজিলেন চিত্রা, একটি ইয়ুরেশিয়ন মহিলা সাজিলেন অর্জ্জুন। মিস্ তায়েবজী হইলেন মদন, মনুভাইর কন্যা হইলেন বসন্ত।

বড়োদা ছাড়িয়া সুরাত নগরে আসিলাম। হয়তো বড়োদার পুরুষদের দ্বারা সম্পাদিত আতিথ্যের কথা সুরাতের লোকেরা শুনিয়াছিলেন। সেখানে নগরের বাহিরে নগিন দাসের বাগানে গুরুদেবের থাকার ব্যবস্থা হইল এবং ডাক্তার রায়জী ডাক্তার হোরা প্রভৃতির বাড়ীর মেয়েরাই সব আতিথ্যের ভার নিলেন। সেখানকার আতিথ্যটি ছিল যেমন সহজ তেমনি সরল ও মনোরম।

২২শে এপ্রেল সুরাতের বনিতা বিশ্রামে সুরাতের মেয়েদের সম্বোধন করিয়া কবি বলিলেন, "এত দিন তোমাদের দেশে প্রচুর আদর ও অভ্যর্থনা পাইয়াছি। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পুরুষের। তাহাতে আমি তোমাদের গৃহের বাহিরে পূজিত হইয়াছি সত্য কিন্তু গৃহের ভিতরে গৃহীত হই নাই। আজ গুর্জর-জননী আমাকে তাঁহার অন্তঃপুরে ডাক দিয়া বসাইলেন। এত দিন আমি ছিলাম সম্মানিত অতিথি, চলিয়া গেলে রাখিয়া যাইতাম কতকগুলি পরিত্যক্ত অর্ঘ্যপুষ্পের শুষ্ক অবশেষরাশি

এবং নির্বাপিত মাটির প্রদীপের নিষ্প্রভ সঞ্চয়। এখন যখন আমাকে তোমরা আত্মীয় করিয়া লইলে এখন আশা করি আমিও তোমাদের অন্তরে একটু স্থান রচনা করিয়া একটু শূন্যতা রাখিয়া যাইতে পারিব। তোমাদের অন্তরেও আমার একটু স্নেহের বিদায়-চিহ্ন রহিয়া যাইবে। জগতে আসিয়া এই চিহ্নটুকু যে রাখিয়া যাইতে পারিল না তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কে আছে?"

এখানে একটি কন্যা আসিয়া বলিলেন, "আমি বিবাহ-বিরোধিনী। বিবাহ করিতে চাই না।" হয়তো তিনি শুনিয়াছিলেন কবি নারীর তাপস-জীবনের কথাই বার বার বলিয়াছেন। যাহা হউক, কবি তাঁহাকে বলিলেন, "মানব প্রেম তুচ্ছ বস্তু নয়। তবে সেই প্রেম যেন সকলের কল্যাণব্রতে নিয়ন্ত্রিত wedded love অর্থাৎ উদ্বাহ-কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত প্রেম হয়। এই প্রেমের জয়গানই কালিদাস তাঁহার সব কাব্যে করিয়া গিয়াছেন।"

কবি আরও বলিলেন, "প্রেম ছাড়া আমরা পরস্পরের যথার্থ পরিচয়ই পাই না।" চৈতালীতে এই কথা তিনি তাঁর ধ্যান কবিতায় বুঝাইয়া গিয়াছেন,

যত ভালবাসি, যত হেরি বড় করে'
তত প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে তত অল্প জানি।
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।

সুধু পত্নীত্বের মধ্যে নয় মাতৃত্বের মধ্যেও নারীর একটি অপূর্ব্ব তপস্যা নিহিত। "বীথিকা"য় আমরা মাতৃত্বের সেই মাহাত্ম্যটি ধ্বনিত দেখি।

প্রাণের রহস্য সুগভীর
অন্তর গুহায় ছিল স্থির
সে আজি বাহির হোলো দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে
অন্ধকার হ'তে।
সুদীর্ঘ কালের পথে, চলিল সুদূর ভবিষ্যতে।
যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে,
গৃহের কোণের তাহা নহে।
আমার হৃদয় আজি পান্থশালা
প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা।
অনাদি কালের পান্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম;
এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্য গানে—
আমরা শিশুর মুখে কল-কোলাহলে
সে যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে।
অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ
আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ।

২২শে এপ্রেল সন্ধ্যার পর সুরাত হইতে একটু দূরে সমুদ্রতীরে ডুমাসে যাওয়া হইল। সেখানে একটি কন্যা প্রশ্ন করিলেন, "নারী তাহার সৌন্দর্য্যের দ্বারা কি দেশের বীরত্বের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে না?" কবি বলেন, "নারী বরং তাহার বীরত্ব-বরণের দ্বারা দেশের সুপ্ত বীরত্ব ও মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তোলে। রাজপুতানা, গ্রীস, জাপান প্রভৃতি সমস্ত দেশের বীরত্বের ইতিহাসের তলে রহিয়াছে নারীর হস্তে বীরত্বের প্রতি অর্ঘ্য দান। তবে নারী যদি অযোগ্যকে কোনো কারণে পূজা করে তবে তাহাতে দুর্গতির আর অন্ত নাই।"

জীর্ণ মজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তাতে দুষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে ধরণীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান। (মহুয়া)

মহুয়ার এই কবিতা কবি অনেক পরে লিখিয়াছেন। কিন্তু অনেক দিন পরে লেখা হইলেও তাহার মধ্যে কবির সেই মনোভাবটিই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই কথাতে আর একটি কন্যা তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তবে কি নারীর নিজের কোন বীরত্ব-সাধনা নাই? তাহার উত্তরও কবি চমৎকার ভাবে দেন। গুরুদেব বলিলেন, "দৈবের জন্য প্রতীক্ষা করা হইল তামসিকতা। সাধনার দ্বারা অগ্রসর হওয়াই হইল রাজসিকতা, সেই সাধনা যদি নিষ্কাম হয় তবে তাহাই সাত্ত্বিক। এই সাত্ত্বিকতার দাবী পুরুষেরও যেমন, নারীরও তেমনি। এই মানব জীবন পাইয়া এই মহত্তম দাবী যে না করিতে পারিল তাহার মত দুর্ভাগ্য আর নাই।"

এইখানে ও অনেক পরে লিখিত মহুয়ার "সবলা" নামে কবিতাটি মনে পড়ে।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিলে অধিকার
হে বিধাতা?
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে?
কেন শূন্যে চেয়ে রবো? কেন নিজে নাহি লবো চিনে
সার্থকের পথ?
... ...
হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা!
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হ'তে নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্ব্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত মাঝে
...পায় মোর প্রিয়।...

গুজরাত হইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিলে বাঙ্গালী দুই-একটি মেয়ে কবির সঙ্গে দেখা করিতে যান। তাঁহাদের

মধ্যে এক জন ঐ দেশের অবরোধ-প্রথার অভাবটাকে একটু অশুচি বলিয়া আক্রমণ করিলে কবি জোর করিয়া বলেন, "মুক্তি ও মুক্ত প্রকাশ কখনও অশুচি নহে, অশুচি হইল অপ্রকাশের গোপনতা।" সে দিন কথোপকথনে যাহা কবি বলিয়াছিলেন তিনি ১৯৩২ সালে আগষ্ট মাসে তাঁহার বিখ্যাত "অপ্রকাশ" কবিতায় তাহাকেই অপরূপ রূপ দান করেন।

"মুক্ত হও হে সুন্দরী। ছিন্ন করো রঙীন কুয়াশা,
...অপ্রকাশে হয়েছ অশুচি।
দেখিতে পেলে না আজো আপনারে উদার আলোকে
বিশ্বেরে দেখো নি, ভীরু, কোনো দিন বাধাহীন চোখে
উচ্চ শির করি। স্বরচিত সঙ্কোচে কাটাও দিন
আত্ম অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণ্য হীন।
বিকশিত স্থলপদ্ম পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি,
পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি'
ছায়াচ্ছন্ন যে লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি
সত্তার ঘোষণা বাণী শুব্ধ করে জেনো সে অশুচি
উদ্ধশাখা বনস্পতি যে-ছায়ারে দিয়াছে আশ্রয়
তার সাথে আলোর মিত্রতা, সমুন্নত সে বিনয়।
মাটিতে লুটায় গুল্ম সর্ব অঙ্গ ছায়া-পুঞ্জ করি,
তলে গুপ্ত গহ্বরেতে কীটের নিবাস।
হে সুন্দরী,
মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ আবরণ,
হে বন্দিনী বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ।"
... ...
.. ...

বোম্বাই প্রদেশ ছাড়িবার পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যায় সেই দেশের ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার কাছে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ চাও? আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ কি সহ্য করিতে পারিবে? যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ যাহা মহান, তাহা যে রুদ্রের দান। সেই ভীষণ দুঃসহ আশীর্ব্বাদে কি তোমরা ভয় পাইবে না? আমার দৃষ্টিতে আমি যে অমৃতকে দেখিয়াছি তাহা আরামের সুখসুপ্তি নহে, তাহা দুরূহ-ব্রত-পথে নিরন্তর দুঃসহ অগ্রযাত্রা, তাহাই অমৃতের অধিকার।"

অমৃতের অধিকার
সে ত নহে সুখ ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

(বলাকা) *

* এই সব কথোপকথন পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না, তাই এখানে উদ্ধৃত তাঁহার কথাগুলির সমর্থকরূপে তাঁহার রচিত কবিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হইল। সেই সব রচনার যেগুলি পূর্বেকার, যোগ্য স্থানে তাহা তিনি স্বয়ং উল্লেখ করেন। কোনো কোনোটা বা পরে লেখা, তাহা প্রয়োজনবোধে সমর্থক বাণী রূপে আমরা উল্লেখ করিলাম।—লেখক

রবীন্দ্র-স্মৃতিপূজা

শ্রীহেমবালা সেন

যে মহাপুরুষের স্মৃতিপূজা করিতে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি তাঁহার কথা বলিয়া তাঁহাকে বুঝানো সম্ভব নয়। তিনি নিজেই তাঁর জীবনের সর্ব্বোত্তম চিন্তা ও প্রাপ্তি তাঁর অমর লেখনী দ্বারা চেতনার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলাইয়া গিয়াছেন। শত শত বৎসর মানব এই অমৃতময়ী বাণী পান করিয়া ধন্য হইবে। আমরা যাঁহারা এই রবিরই জগতে প্রথম চোখ মেলিয়াছিলাম, এত দিন এই রবিরই আলোকে জগতকে দেখিতে ও শ্যামলা ধরণীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম—তাহাদের কি যে সৌভাগ্য তাহা তিনি ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ঠিকমত ধারণা করিতে পারি নাই। অপরূপ তাঁর দর্শন, অমৃতময়ী তাঁর বাণী, অপূর্ব্ব তাঁর প্রকাশক্ষমতা। জগতে কোন কবিই এতখানি দর্শন, অনুভূতি ও এমন প্রকাশক্ষমতা লইয়া কখনো কোন দেশে আবির্ভূত হন নাই। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিলেন। ধন্য আমরা—আমরা বাঙালী আমাদেরই ভাষায় তিনি তাঁহার অমৃত ঢালিয়া

দিলেন। বাংলা ভাষা চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে অমর হইয়া রহিল।

তাঁহার প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ও ঋতু-কবিতার তুলনা নাই। প্রতি বৎসর প্রতি ঋতুতে অজস্রধারে কবিতা ও গান তাঁহার কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়িত। যাহারা তাঁহার নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা তাঁহার কত সহজ ছিল ও প্রকৃতির পূজার আনন্দে কেমন করিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে গান ও কবিতা উচ্ছলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িত। বিশ্বলীলাতে বিশ্বকর্ত্তার আনন্দ দেখিয়া তিনি আনন্দিত ছিলেন। শিশু যেমন মায়ের সঙ্গে কথা বলে তেমনি সহজ আনন্দে গান ও কবিতা তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্ছলিয়া উঠিত। কোন চেষ্টা ছিল না তার ভিতর।

তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতে আমি এখানে আসি নাই। কত সুযোগ্য ব্যক্তি সে সম্বন্ধে কত লিখিয়াছেন ও কত লিখিবেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে কবির কবিতায় শিশুকাল হইতে চিত্তে আনন্দের ধারা বহিয়াছে, সুর-লোকের দেবতার চেয়েও যাঁর দর্শন, শ্রবণ দুর্লভ মনে হইত তাঁরই নিকট-সংস্পর্শে আসিবার ও তাঁরই আশ্রমের সেবা করিবার সৌভাগ্য আমি প্রায় বারো বৎসর লাভ করিয়াছি। কত কাছে তাঁকে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি কবিপ্রকৃতি শিশুপ্রকৃতি। শিশুর মত সহজ আনন্দ ও সরল বিশ্বাস ছিল তাঁর। চরিত্রশিল্পে তাঁর নিপুণতা পাঠকমাত্রই জানেন। মানুষকে তিনি জ্ঞান দ্বারা না চিনিতেন এমন নয়, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে অতি ক্ষুদ্র অতি হীন মানুষকেও তিনি কখনো অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক সময় কার্য্যক্ষেত্রে হয়ত অনেক ভুলও করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তাঁরা জানেন মানুষ মাত্রেরই প্রতি সরল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই তার একমাত্র কারণ। সর্ব্বদাই তাঁর চিত্ত মহত্ত্বের ও উদারতার উচ্চতম ভূমিতে বিচরণ করিত। মানুষের প্রতি তাঁর করুণার অন্ত ছিল না। দেশের দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যের নিদারুণ দুঃখ দূর করিবার কি চিন্তা তাঁর ভিতর দেখিয়াছি! দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া নয়, দরিদ্রকে সক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল করাই তাঁর ব্রত ছিল। শ্রীনিকেতনের কর্ম্ম তারই সাক্ষী।

মেয়েদের শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁর কি প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়াছি। তাঁর শ্রীভবনের ভার লইয়াই আমি সেখানে বারো বৎসর কাটাইয়াছি। গতানুগতিক শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ করা তো তিনি চাহিতেন না। তিনি চাহিতেন প্রাণের যত্ন ও ভালবাসা দিয়া নারী গৃহ ও বাহিরকে পূর্ণ ও সুন্দর করিয়া তুলিবেন। এমন শিক্ষা নারীকে দিতে হইবে যাহাতে দেশের ও গৃহের সমস্ত কর্ম্ম নারী শ্রী ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করিবেন। একবার বিদেশে যাইবার পথ হইতে আমাকে লিখিলেন, "নিশ্চয় জেনো, আশ্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভার মেয়েদের পরেই। পুরুষরা শুষ্ক নিয়মকে বড় ব'লে জানে—স্বভাবতই প্রাণের নিয়মকেই মেয়েরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে থাকে। এই জন্যেই আশ্রমে মেয়েদের স্থানটিকে আমি এত বিশেষ যত্নে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তোমরা আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে আমি বিদায় নিলুম।" আর একখানা চিঠি আমেরিকা হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন সেটা পড়লেই মেয়েদের জন্য কি আকুলতা তাঁর ছিল তার প্রমাণ আপনারা পাবেন। এই চিঠিখানা উপহার দিয়েই আজ আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

হেমবালা, শরীর খারাপ হয়েচে খবর পেয়েচ! বিশেষ ক্ষতি হয় নি—আরামে আছি শয্যাতলে—ঘোরাঘুরি বকাবকি ডাক্তারের ইঙ্গিতে একেবারে থেমে গেছে। ভিক্ষার কাজ সমানই চলচে কিন্তু রাজার মত শুয়ে শুয়ে। যাদের কাছ থেকে ভিক্ষা পাবার প্রত্যাশা করি তারাই আসে আমার *শয়নালয়ের খাস দরবারে।*

তবু ভিক্ষের কাজ আমার পছন্দসই নয়—এর চেয়ে ডাকাতি ভালো, তাতে পৌরুষ আছে। অতলান্তিক পাড়ি দেবার আগে অনেক দ্বিধা করেছিলুম—শরীরও বিমুখ হয়েছিল মন ততোধিক। ভিতরে ভিতরে কেবল একটিমাত্র তাগিদ ছিল যার তাড়নায় আমাকে মরিয়া করেছিল। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে :এই সঙ্কল্প আমাকে রাস্তায় বের করেছে। যদি কিছুমাত্র সিদ্ধিলাভ করি তাহলে দেহের দুঃখ এবং মনের গ্লানি ভুলতে পারব। অনেক দিন

অনেকের দ্বারে ঘুরেচি, অনেক অযোগ্য লোকের কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েচে, বারে বারেই অকৃতার্থ হয়েচি আরো একবার যদি সেই দুগ্র্হ ঘটে তবে এই বার ভিক্ষের ঝুলিতে আগুন লাগিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে জীবনের শেষ খেয়ার জন্যে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করব। দেশে আমার স্থান সঙ্কীর্ণ তার প্রমাণ ভারি হয়ে উঠেচে তবুও

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম
জননী বঙ্গভূমি

কিছুই যদি সংগ্রহ করতে না পারি তবে ক্লান্ত হাড় ক'খানা মিলিয়ে দিয়ে যাব সেই নিষ্ঠুর জননীর পায়ের ধুলোর সঙ্গে।

থাক্, নালিষ থাক্; এবার একটুখানি আশার কথা বলা যাক্। কিন্তু খুব ক্ষীণ গলায়। কেন না নলোপাখ্যানে পড়েচি কলির চক্রান্তে পোড়া মাছ জলে ঝাঁপিয়ে পড়েচে। আমার দময়ন্তী হলেন বিশ্বভারতী আমার লজ্জা রক্ষার জন্যে অর্দ্ধেক আঁচলও বাকি রাখবেন কিনা সন্দেহ করি। এবারে মনে হচ্ছে যেন একটা মাছ প্রায় ডাঙার কাছে তুলেচি—কিন্তু জলচর আবার জলের তলায় ফিরবে কিনা সে কথা কাকে জিজ্ঞাসা করব? কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কি যে ঝুলি কিছু পরিমাণে ভর্ত্তি হবে, কেন না, এ তো "আমার জন্মভূমি" নয়—এখানে এরা আমাকে কিছু খাতির করে, আমার বিদেশ ভাগ্যটা ভালোই। কিন্তু ঝুলির কতখানি ভরবে জানিনে। যদি যথেষ্ট দক্ষিণা জোটে তবে আমার দেশের মেয়েদের হাতে আমার শেষ দান দিয়ে যাব বিদ্যাদান। দেশের মেয়েদের আমি বরাবর ভাল বেসেচি, বোধ হয় তাদের কল্যাণেই সরস্বতী আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েচেন—সরস্বতীর সেই প্রসাদের অংশই যদি আমি কোন অভঙ্গুর পাত্রে মেয়েদের জন্যে রেখে যেতে পারি তবে আমার ভাগ্যদেবতার জয়ধ্বনি করে বিদায় নেব।

নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত এদেশে আমার শয়ান অবস্থায় কাটবে। তার পরে সমুদ্র পার হতে হতে পৌষ পার হবে না এই আশা করে আছি। কিন্তু দেশের দুঃখে আমার এই জীর্ণ হৃৎপিণ্ড ক'দিন টিক্‌বে তাই ভাবি। তবু এ কথাও ভাবতে হয়, বড়ো দাম না দিয়ে বড়ো ফল পাওয়া যায় না—বড়ো দুঃখের ভিতর দিয়েই সকল দেশ সার্থকতায় পৌঁচেছে। আমাদেরও শেষ কড়া পর্য্যন্ত গুণে দিতে হবে। বুকের পাঁজর বিছিয়ে দেব ভাগ্যের জয়রথ তার উপর দিয়ে চল্‌বে। সেই অতি দুর্গম পথের চেহারা দেখে এসেচি রাশিয়ায়। তাই মনে হচ্চে এখনো যথেষ্ট হয় নি—যে চিকিৎসক মুমূর্ষু দশা থেকে আমাদের দেশকে বাঁচিয়ে তুলবেন তিনি হচ্চেন সহস্রমারী চিকিৎসক। অনেক মেরে মেরে তবে তিনি বাঁচান। সেই জন্যে মার খেয়ে যখন দুঃখ প্রকাশ করি তখন তাতে লজ্জা বোধ হয়। বার বার বল্‌তে হবে, না—কিচ্ছু লাগে নি। এমনি করেই মারকে লজ্জা দিতে হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে দেখো। ইতি ২৮ অক্টোবর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

[আমরা লিখেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই ইচ্ছার উল্লেখ এই চিঠিটিতে রয়েছে—প্রবাসীর সম্পাদক।]

* রবীন্দ্রপ্রয়াণে ঢাকা মহিলা সভায় পঠিত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র ও অপ্রকাশিত রচনা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির পরিচয় তাঁর কাব্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কেবল কাব্যে নয়, তাঁর সকল রচনার মধ্যে এত বেশি কাব্যসম্পদ বর্ত্তমান যে সে সকলের মধ্যেও কবির অন্তরের পরিচয় ও মাধুর্য্যটুকু প্রচ্ছন্ন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে তাঁর কাব্যানুশীলন যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাঁর অন্যান্য রচনা অনুশীলনেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন তখন তাঁর রচনায় দেখেছি—The light that never was on sea or land. আবার যখন সাহিত্যসৃষ্টি বা কাব্যরস পরিবেশন তাঁর উদ্দেশ্য নয় সে রচনাও স্পর্শমণির করস্পর্শে স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে। সে শ্রেণীর রচনাও সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে—তারও স্থানে স্থানে কাব্যরস উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর কথা বলছি। কবির পত্রাবলীর মধ্য দিয়েই তাঁর কবিমানস সময়ে সময়ে উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—সেগুলি তাঁর ব্যক্তিগত ভাবানুরঞ্জিত। ঐ সকল পত্র হতে কবির মনস্তত্ত্ব ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব পত্রে এমন অনেক তত্ত্ব ও তথ্য আছে যা রবীন্দ্রসাহিত্যের বহু রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে পারে। এই সব কারণে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর সংগ্রহ ও প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে আমার পিতা স্বর্গগত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে সকল পত্র দিয়েছিলেন তার কিছু প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'তে। কিছু 'রবিরশ্মি'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু অনেক চিঠি এখনও অপ্রকাশিত আছে, যা প্রকাশিত হলে কবিজীবনের কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হবে। সেই সকল পত্রের কয়েকটি আমি উদ্ধৃত করতে যাচ্ছি।

ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে 'চয়নিকা' তখন সবেমাত্র সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবির কবিতার সংকলন গ্রন্থ ঐ প্রথম এবং আমার পিতাই ঐ সংকলনকার্য্য করেছিলেন। কবি 'চয়নিকা' পেয়ে লিখেছিলেন

পোষ্টমার্ক (বড়বাজার)
২৮শে সেপ্টেম্বর, ০৯ কলি

প্রিয়বরেষু,

চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব।

কিন্তু ছবি ভাল হয় নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যেই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম। কারণ এগুলি আমার রচনা নয়।

নন্দলালের পটে যে রকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না। বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।

নিজের প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিজের কোন মত প্রকাশ করা শিষ্টাচার নয়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যে কেউ দেখবেন সকলেই অত্যন্ত রাগ করবেন। মূল ফটো খুব ভাল হয় নি, কিন্তু তার ছাপা মূলকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। সকলেই একবাক্যে বলছে এখনো যদি বাঁধা না হয়ে থাকে এই ছবি বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ আমাকে যে আরো ২খানা বই দেবে তাতে আমার ছবি দিয়ো না। কারণ যাঁদের বই দেবো তাঁরা সকলেই আমাকে স্বচক্ষে দেখেছেন—ছবি দেখে শেষে আমাকে ভুলে যাবেন।

দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখনি এক বক্তৃতা-অভিযানে চলেছি। অতএব ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিম্নোদ্ধৃত পত্রে কবির পদ্মাতটপ্রিয়তার কথা আছে—আর আছে নিজের ছবি ছাপায় কবির কুণ্ঠা। —

পোষ্টমার্ক—শিলাইদা
১২ অক্টোবর, ০৯

প্রিয়বরেষু,

আবার সেই পদ্মাতটে আশ্রয় নিয়েছি। এখন এর শারদ মুখশ্রী প্রসন্ন সুন্দর।

চয়নিকার ছবি নিয়ে আবার হাঙ্গামা কেন করছ? ওটা পরিত্যাগ করলেই আনন্দের বিষয় হ'ত। আমার প্রত্যেক বইয়েতেই ছবি দেখে দেখে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছি। এমনি হয়েছে যে আয়নাতে নিজের মুখ দেখা বন্ধ করতে ইচ্ছা হয়।

একটা সস্তা দামের চয়নিকা ছাপিয়ে যদি কেবল ১০০ খণ্ড বেশী দামের বই স্বতন্ত্র রাখতে তা হলে পাঠকদেরও উপকার হ'ত, ব্যবসায়ীরও লাভ হত। অনেকেরই ইচ্ছা কেনে, কিন্তু সাধ্যে কুলোচ্ছে না। আমি যদি পাঠক হতুম তবে চার টাকা দাম দিয়ে চয়নিকা কিনতুম না। ইতি ২৬শে আশ্বিন ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের জীবনে পদ্মা-নদী খুব গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর বহু কাব্য নাটক সেই প্রভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে—তাঁর চিঠিগুলিতেও এই প্রভাব অনুভূত হয়। জলস্রোতের উচ্ছল গতি, মেঘের ঘনঘটা, অসীম ও বৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পরিচয়—এ সকলই কবি প্রত্যক্ষ

করেছিলেন পদ্মাতটে বাস করবার সময়ে। "ভানুসিংহের পত্রাবলী"র এক স্থানে কবি বলেছেন—"আমি জীবনের কত কাল যে এই নদীর বাণী থেকেই বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলবো না।" নিম্নলিখিত পত্রেও পদ্মার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ কবিচিত্ত আত্ম-প্রকাশ করেছে। পত্রখানি শিলাইদা থেকে লেখা।

ওঁ

পোষ্টমার্ক—শিলাইদা

৬ নভেম্বর, ১১

প্রিয়বরেষু,

যেখানে ডাঙার প্রান্তে জলের প্রান্তে, আকাশের প্রান্তে পৃথিবীর প্রান্তে আসিয়া কোলাকুলি করিতেছে সেই নির্জ্জনে ফুলের মধ্যেকার ভ্রমরটির মত একেবারে চুপ করিয়া পড়িয়া আছি।

"নিবেদিতা" প্রবন্ধটা বোধ করি পাইয়াছ। তাহার প্রুফ চাই কিছু কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে কি তোমাদের অসুবিধা হইবে? এখান হইতে প্রুফ যাতায়াতে ঠিক চারিদিন লাগিবে। যদি নিতান্তই অসুবিধা হয় তবে যেমন আছে তেমনই থাক্।

জগদীশের* কাছ হইতে কাবুলিওয়ালার ইংরেজিটা সংগ্রহ করা হইয়াছে কি? তিনি সেটা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩১৮।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ নিজে লেখা ছাপ্‌তে পাঠিয়ে সম্পাদকের রুচি ও নির্বাচনকে কি রকম খাতির করতেন তার পরিচয় তাঁর অনেক পত্রেই পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত পত্রখানি তাঁরই উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলে উদ্ধৃত হলো।

প্রিয়বরেষু,

আজ রেজিষ্ট্রি ডাকে তোমাকে দুটো সংকলন পাঠানো গেল। যদি পছন্দ না হয় ফেলে রেখে দিয়ো না—আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ো। মনে কোরো না আমি রাগ করে বলছি—আমিও এক কালে সম্পাদকি করেছি—সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করতে দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিতে হয়। তোমার বিচার ও অভিরুচি অনুসারে কাজ করে যেয়ো—কিছুতেই আমি লেশমাত্র ক্ষুব্ধ হবো না। বিষয়টা হয়ত উপাদেয় নয়—তার উপরে লম্বা—লেখিকারাও কাঁচা—অতএব যদি এই রচনাগুলি বর্জন কর তবে আমরাগর্জন করবো না—আবার অন্য লেখাও পাঠাবো। ইতি ২১শে ভাদ্র

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* স্বর্গগত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

এই পত্রের পোষ্টমার্ক—এক্সপেরিমেণ্টাল—শান্তিনিকেতন, ৬ সেপ্টেম্বর, ১০।

১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা হইতে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রবাসীতে কবির 'জীবন-স্মৃতি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে প্রবাসীর তরফ থেকে পিতার যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তা যেমন কৌতুকপ্রদ তেমনি মূল্যবান্। পত্র কয়খানি উদ্ধৃত হলো।—কবির কাছ থেকে জীবনী চাওয়াতে তিনি লিখেছিলেন—

ওঁ

প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ,—

বাঃ তুমি ত বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও! এত দিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়ি করতে হবে? সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে অন্তর্হিত হয় তুমি তারই জাজ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠ্‌ছ।

যত দিন বেঁচে আছি তত দিন জীবনটা থাক্ তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই এবং বড়দাদার লেখাটাও পাঠানো যাচ্চে।......

* * *

একটা নূতন নাটক লেখ্‌বার চেষ্টায় আছি, দুই এক দিনের মধ্যে সুরু করব।

* * *

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

প্রিয়বরেষু,

আমার জীবনের প্রতি দাবী করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ "আপনার জীবনটা চাই।"—এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাকত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাক্‌ত না। তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধীনে থাকবে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্চে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচি নে বলে কিছু স্থির করতে পারচি নে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন, অতএব এ সম্বন্ধে

রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিক পত্রের Black and white-এ আমার জীবনটার এক গালে চুণ ও এক গালে কালি লেপন করতে পারব না।

পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও সাদা চুল ও শ্বেতশ্মশ্রুতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুলতে পারে না।

* * *

ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮। ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পোষ্টমার্ক—শিলাইদা
২৭শে মে ১১

প্রিয়বরেষু,

তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি। কিন্তু অজিতের প্রবন্ধ[১] শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ভ হলেই ভাল হয়। লোকের তখন জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য একটু বাড়তে পারে।

সত্যেন্দ্রকে* কবে এখানে পাঠাবার উদ্যোগ করলে আমাকে সত্বর জানিয়ো। এখানে তার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি যদি আসতে না পার মণিলাল† কি তাকে পথ দেখিয়ে আন্‌তে পারবে না?

* * *

ইতি ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮। তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার ব্যাকরণ এবং বড়দাদার গীতাপাঠ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। গীতাপাঠের প্রুফটা একবার কাপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার একটা প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে ও অন্যটা আমার কাছে পাঠিয়ো। জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্বেই সমপর্ণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধ হয় দেখেছ—জিনিসটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গল্প যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি—আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে, কিন্তু আপরিতোষাদ্‌ বিদুষাং ইত্যাদি।

ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে রাজি আছো? ওটা যে খুব রসালো জিনিস এমন কথা আমার শত্রুপক্ষেরাও বল্‌বে না—ওর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে যুবক পাঠকের চরিত্রবিকার ঘট্‌তে পারে। তির্য্যক্‌রূপের মধ্যে যে রূপ আছে তাতে মুনিগণের তপস্যার বিঘ্ন হবে না, অতএব এ রকম জিনিস কি মাসিকে চল্‌তে পারবে?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের এবারকার প্রবাসী মোটের উপর ভাল হয়েছে। বিশেষত এবারকার কষ্টিপাথর নামের উপযুক্ত হয়েছে। অনাবশ্যক লোককে আঘাত কোরো না—অনাবশ্যক এই জন্যে বল্‌ছি যাদের মরণদশা তারা মরবেই—মাঝের থেকে গোহত্যার পাপে লিপ্ত হও কেন? যারা সাহিত্যের গুণ্ডাগিরি ব্যবসায়ে পাকা হয়ে উঠেছে খুন জখমের খ্যাতিটা তাদেরি হোক্‌, তোমরা ভদ্রলোক, দয়ামায়া আছে বলেই যেন সকলে তোমাদের স্মরণ করে। যারা লিখ্‌তে অক্ষম তারা সহজেই হতভাগ্য—বিধাতাই তাদের দণ্ড দেন, তার উপরে তোমরা কেন তাদের দুঃখের বোঝা বাড়াও? যারা তোমাদের উপর দ্বেষ বহন করে তারা নিজের অন্তরতাপে নিজে দগ্ধ হয়, তার উপরে আর অগ্নিবাণ বর্ষণ কোরো না—শান্ত হয়ে সম্পাদকের আসন আলো করে থাক এই আমি আশীর্বাদ করি। ললাটে ভ্রূকুটির চিহ্ন দূর হয়ে যাক্‌।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে কবির কৌতূহল এবং জীবনস্মৃতি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের অভিমত কি তা জানবার আকাঙ্ক্ষা কবির নিম্নলিখিত পত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

ওঁ

পোষ্টমার্ক—শিলাইদা
৪ জুন ১১

প্রিয়বরেষু

বিলাতি গল্প বাংলায় আর বাকী নাই দেখিতেছি। Tourgeneveএর Triumphant Love নামক একটি সুবিখ্যাত গল্প আছে। সেটিও আমি দিনুকে দিয়া তর্জমা করাইয়াছিলাম। হয়ত বা তাহাও পূর্বে কোথাও বাহির হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু এত খবর রাখাও ত কম কথা নয়। যেখানে যত গল্প বাহির হইতেছে সূচকসহ তাহার কি একটা রেজিষ্টার তোমরা করিয়া রাখ? অনেক মৌলিক নামধারী গল্পও ত তর্জমা।

কবিকে আমার কবিজীবনীটা পড়িতে দিয়ো। সে ত

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী এই সময়ে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখ্‌ছিলেন। সেইগুলিই পরে তিনখানি বই হয়ে বেরিয়েছে—রবীন্দ্রনাথ, কাব্য-পরিক্রমা, বাতায়ন।

* স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

† বর্তমান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক শ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল, অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। সত্যেন্দ্রের শরীর ত ভাল আছে?

* * *

ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিলাইদহে বসে কবি তাঁর বহু রচনা করেছিলেন। 'রাজা' নাটক তার মধ্যে একটি। এই নাটকখানি রচনাকালে তিনি লিখছেন—

ওঁ

পোষ্টমার্ক—শিলাইদা
4 Nov. 10.

প্রিয়বরেষু,

আমি এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি বটে কিন্তু সেটার উপর তোমরা চোখ দিলে চলবে না। জিনিসটি ছোট নাটক—শারদোৎসবের স্বজাতীয়—আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের অনুরোধে পড়ে লিখতে বসেছি। তাকে করে তোমাদের কাগজে দিলে কারো ভাল লাগ্‌বে না। জিনিসটাও একটু অদ্ভুত রকমের হবে—কেউ বল্‌বে ভাল কেউ বা বল্‌বে মন্দ এবং অনেকে হয়ত ভেবেই পাবে না ভাল বল্‌বে কি মন্দ বল্‌বে।

মোটের উপর বারো আনা লোক বল্‌বে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্চে। আমি সে কথা অস্বীকার করি নে—শক্তির রূপান্তর ঘটে—সেই রূপান্তর ঘটবার সজীবতা ঈশ্বর যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে রক্ষা করেন তাহলেই শক্তির সার্থকতা ঘটে। যাই হোক্, হঠাৎ যে জিনিষটাকে ধরা যাবে না তাকে মাসিকে দিলে তার আর দুর্গতির সীমা থাকবে না। তুমি ত দেখেইছ শারদোৎসবটাতে পাঠকদের কি রকম পীড়া উৎপাদন করেছে।

* * *

ইতি বৃহস্পতিবার
তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদহে প্রকৃতির শ্যামসমারোহের মধ্যে বসে কবি 'অচলায়তন' নাটকখানিও রচনা করেছিলেন। একখানি পত্রে লিখছেন—

ওঁ

পোষ্টমার্ক—শিলাইদা
১৩ জুন

প্রিয়বরেষু,

নাটকখানা লিখ্‌তে সুরু করেছি। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘের ঘটা, চারিদিকে ঘন সবুজ ক্ষেত, আমার তিন তলার ঘরের জানালা দরজা সব খোলা কলম এগোতে পারচে না—একেবারে রাজকীয় আলস্যে ভরপুর হয়ে বসে আছি। তবু একটা অঙ্ক শেষ হয়েছে।

* * *

ইতি আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ
তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১২ সালে, নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বে, কবি একবার বিলেত যান। সেখান থেকে কবি একখানি চিঠিতে বিলাতে তাঁর সম্মান সম্বর্দ্ধনার কথা লেখেন।

ওঁ

পোষ্টমার্ক লণ্ডন ৭ আগষ্ট
১৯১২

প্রিয়বরেষু,

* * *

মনে আশা ছিল ভ্রমণের বিবরণ বিস্তারিত করে লিখ্‌তে পারব। কিন্তু সরস্বতীর বরাবর পদ্মবনে থাকার অভ্যাস তিনি ভিড়ের দিকে ভিড়বেন না। সময় নেই। এমন কি চিঠি লেখাই প্রায় অসম্ভব হয়েছে। তবে, তোমরা যদি এখানে থাক্‌তে খুশী হতে। তোমাদের কবি এখানকার কবিসভায় আসন পেয়েছে এবং সে আসনটি নিতান্ত ছোট নয়। আদর জিনিসটা উপাদেয় সে কথা স্বীকার করতেই হবে কিন্তু আমার সম্মানে আমার দেশের অগৌরব কিছু পরিমাণে দূর হবে এইটে আনন্দের বিষয়—এবং সব চেয়ে আনন্দ হয় এই কথা স্মরণ করে যে আমি যা রচনা করেছি এখানকার গুণীরা বল্‌ছেন এঁদের পক্ষে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এটা গর্বের কথা নয়, আনন্দের কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল সমস্ত বিরোধের মধ্যে দিয়ে যখন দেখ্‌তে পাই তখন মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরম প্রেমকে কিছু পরিমাণে সত্যরূপে অনুভব করবার সুযোগ পাওয়া যায়।

* * *

সত্যেন্দ্রকে আমার অন্তরের স্নেহ জানিয়ো। সে আজ এখানে থাক্‌লে কত আনন্দ হ'ত।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১৩ সালের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যখানির আলোচনা করেন আমার পিতা। কবির কাব্য আলোচনা করবার সঙ্কল্প কবিকে জানালে কবি লেখেন

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখ্‌লেই ভাল করবে প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্য হবে না। সে জন্যেও না—আসল কথা, অনেক দিন ধরে লিখে আসচি, বয়সও কম হয় নি আর অল্প কাল অপেক্ষা করলেই আমার রচনার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে—আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে আলো নিবিয়ে সরে যাব তখন সকল প্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে পড়ব—তখন আমাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আমার লেখাগুলোকে বিচার করতে পারবে। তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে—অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই কেন না আমার কবিতা ত রইয়েইচে—যদি ভাল হয় ত ভালই, যদি ভাল না হয় ত ও আবর্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগবে না—আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছা করি নে। তোমরা আমার লেখা ভাল বললে আমার ভাল লাগে না এমন কথা বললে মিথ্যা বলা হয়—প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে—সেই জন্যেই ঐ নেশাটাকে প্রশ্রয় দিতে কোনো মতে ইচ্ছা হয় না—কারণ ঐ জিনিসটার মধ্যে অনেকটা আছে যা মিথ্যা—অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছা নয় নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছা—সেই ইচ্ছা এ সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে, অত্যুক্তিকে ভালবাসে—নিজের নাম নামক জিনিস এমনি একটা বিশ্রী জিনিস যখন আমার নিজের নাম আর আমার নিজের কানে পৌঁছবে না তখন তোমরা সেটাকে বর্জ্জয়িসেই হোক্ আর ইংলিশ অক্ষরেই হোক্ ছাপিয়ো—এখন ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখ যথাসম্ভব ওটাকে ভুলতে দাও—ঐটেকে সর্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলো না।

কাল থেকে জ্বরে পড়েছি। ইতি ২৭শে ভাদ্র ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের চাহিদা মেটাবার জন্য কবি অজস্রধারায় গান গল্প কবিতা ইত্যাদি রচনা করতেন। প্রবাসীর জন্য গান চাওয়াতে তিনি লিখছেন—

প্রিয়বরেষু

তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি—কিন্তু এগুলো গান সে কথা মনে রেখো—সুর না থাকলে নেবানো প্রদীপের মত—এ ছাপতে দিতে ইচ্ছা করে না

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা
বুকের পরে দোলেরে তার পরাণ-পুতলা

ইত্যাদি

এর মধ্যে ত কোনো আইডিয়া নেই এর যে বাসন্তী চঞ্চলতা আছে সেটি গানের সুরেই ব্যক্ত হচ্চে—শাদা কথায় এর কোনো নেশা নেই—এর জন্যে কাগজে ছাপবার যোগ্য বলে মনে করি নে। বরঞ্চ আর একটা দিচ্চি, সেটা যদিচ গান তবু চলতেও পারে।

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী
বেলাশেষের তান

ইত্যাদি

*   *   *   *

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোষ্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
৮ এপ্রিল ১৭

কল্যাণীয়েষু,

চারু, ক্ষিতিমোহনবাবুকে মোক্তার করে আমার কাছ থেকে একটি গানের জন্য দরবার করেছ। আমার দরবারে মোক্তার প্রয়োজন নেই সে তুমি জান। কিন্তু আমার ভাণ্ডার যে শূন্য। গান আমার হাতে দু-চারটে আছে বটে কিন্তু তোমাদের কাগজের পক্ষে এমন গান চাই যা গাবার এবং পড়বার দুই ক্ষেত্রেই উভচরবৃত্তি করতে পারে—যা সুরের ঘরের পিসি এবং কাব্যের ঘরের মাসির মত। তেমন ত খুঁজে পাইনে। ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে একটা আদায় করেচে মণিলাল—আর একটা যেটা কিঞ্চিৎ চলনসই গোছের আছে পাঠালুম। পয়লা বৈশাখে কি দর্শন দিতে পারবে? রামানন্দবাবু এখানে এক সময়ে আসবার ঈষৎ আভাস দিয়েচেন—তিনি এলে খুসি হব, অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। আমেরিকায় Lynching-এর কয়েকটা সাক্ষ্য প্রমাণ কাল তাঁর কাছে ডাকে পাঠিয়েচি—পেয়েচেন বোধ হয়—তাঁর Notes-এর মশানে এই দুষ্কৃতির বিবরণগুলিকে শূলে চড়ানো চাই।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রের সঙ্গে কবি যে গানটি পাঠান তার শিরোনামা হচ্চে "চির আমি"—প্রথম লাইন হচ্চে—

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন
এই বাটে
বাইব না মোর খেয়া তরী
এই ঘাটে,

এই পত্রে আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। স্বদেশে বিদেশে যখনই কবি কোনও রকম অন্যায় অবিচার বা অত্যাচার দেখেছেন সেখানেই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যেখানে অন্যায় যেখানে অত্যাচার সেখানেই আমাদের কবি ছিলেন রুদ্র। আমেরিকার Lynching-এর প্রথার নির্মমতা কবিকে কতখানি বিচলিত করেছিল তা এই পত্রে প্রকাশিত।

কবি যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষাকার্যে বিশেষ জড়িত হয়ে ছিলেন সেই সময়ে প্রবাসীর তরফ থেকে লেখার অনুরোধ পেয়ে কবি একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি কৌতুকপূর্ণ।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গল্প লেখবার মত মেজাজও নেই সময়ও নেই। মনে হয় ওপাঠ উঠে গেছে—এখন ইচ্ছা করলেও আর লিখ্‌তে পারব না। তবে এক কাজ করতে পারি। আমার কথিকার ছোটগল্প—সে নিতান্তই গল্পস্বল্প—দু'চারটে দিতে পারি। কিন্তু যারা ক্ষুধার খাওয়া চায় তাদের পেট ভরবে না। ওতে বস্তু অংশ নেই—যারা কিঞ্চিৎ রস গ্রহণ করে খুসি থাক্‌তে চায় তাদের ওতে একটুখানি তৃপ্তি দিতে পারে। তুমি যদি নিজে গল্প লিখ্‌তে চাও আমি বরঞ্চ ভেবে চিন্তে প্লট দিতে পারি—কিন্তু আজকাল তাও আমার মাথায় সহজে আসে না। বোধ হচ্চে আমার মানসিক উন্নতি হচ্চে—আমি সাহিত্যে গল্পের ক্লাশ থেকে হয়ত বা লোকশিক্ষার ক্লাশে উত্তীর্ণ হব-হব করছি। তা হলে মরবার পূর্ব্বে আমার স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপনের জোগাড় করে যেতে পারব। কিন্তু তাতে মস্ত একটা ভয়ের কথা এই যে পুনর্জন্মে হয়ত বাংলা দেশে অধ্যাপক রূপে আমার পুনর্জন্ম ঘট্‌বে—সেইটে এড়াতে চাই—ইতি ২২ ফাল্গুন ১৩২৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাপার ভুলের জন্য কবির কত রচনা যে দুর্বোধ্য হয়ে আছে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে নীচের তিনখানি পত্র।

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু,

চারু, তুমি যে লাইনটা আমার তথাকথিত রচনাবলী থেকে উদ্ধার করে পাঠিয়েচ তার অর্থ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। একটু প্রণিধান করে দেখলেই বুঝবে রচনাটা আমার নয়, আমার যে কৌতুকপ্রিয় দুষ্ট গ্রহ মুদ্রাকরের কর পরিচালন করে থাকেন তাঁরই। তাঁর অনেক কীর্ত্তিই আমার গ্রন্থকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। অনেক পরাশ্রিত জীব অতিকায় তিমির কলেবরে সংসক্ত হয়ে তাকে শোষণ করে থাকে, তারা উক্ত তিমির বিধিদত্ত অঙ্গ নয় গ্রহ দত্ত আনুষঙ্গিক। যে মানুষ মস্ত বাড়ি পেয়েছে অথচ যার ঝাঁট দেবার ফরাস বেশি নেই লেখা সম্বন্ধে আমার সেই দশা—আস্‌বাবের চেয়ে আবর্জ্জনা বেশি হয়ে ওঠে। যাই হোক ঐ লাইনটার বিশুদ্ধ আদি পুরুষ সম্প্রতি কোন্ প্রেতলোকে বাস করেন তাও আমি জানিনে। যে-ছাত্রদের তুমি পড়াবে তাদের তুমি সন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত করাতে পারো। এই দুঃসাধ্য গবেষণার কাজ আমার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে না—আমি সামান্য কবি মাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎ নই। কাল যাচ্চি শিলঙ পর্ব্বতে Uplands নামক কুটীরে।

ইতি ২২ বৈশাখ
১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Uplands, Shillong.

কল্যাণীয়েষু,

"সমস্যা" লেখাটা সাম্‌নে নিয়ে আগাগোড়া মিলিয়ে অসঙ্গতির ফাটলের মধ্যে থেকে একটা কোনো অর্থ বের করবার চেষ্টা করব। ঝোঁকের মাথায় কোন্ অর্থে কোন্ শব্দটা ব্যবহার করেচি সব সময়ে পরে তা মনে থাকে না—হয়ত সেই রকমের একটা তাড়াহুড়ার উত্তেজনায় শব্দেতে ভাবেতে জটা পাকিয়ে গেছে, কোথাও যে গাঁঠ পড়েছে তখন তা জান্‌তেও পারি নি। ওটা যদি মুদ্রাকরের মুদ্রাদোষ বশত না হয়ে থাকে তাহলে অনবধানের অপরাধ স্বীকার করে শোধনের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। মুদ্রাকরে গ্রন্থকারে মিলে গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় প্রমাদ যা বিকীর্ণ করা গেছে তার পরিমাণ বড় কম হবে না।

* * *

এখানে আছি ভালো। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Shillong

কল্যাণীয়েষু,

এতদিন পরে 'সঙ্কলন' বইখানা হাতে এসে পৌঁছেচে। পড়ে দেখলুম—স্পষ্টই দেখা যাচ্চে—একটা কর্ত্তৃপদের স্খলন হয়ে বাক্যটা অর্থচ্যুত হয়েচে। সম্পূর্ণ বাক্যটা এই রকম হওয়া উচিত: "আত্মীয়তার সম্বন্ধ কেবলমাত্র

প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি।" কবে কোথায় এই প্রধান পদটি পড়ে গেছে আমি তা বল্‌তে পারি নে। আমার বিপুল রচনা-মণ্ডলের মধ্যে কোথায় যে কি রকম অপঘাত ঘটেচে তা আমার চোখেও পড়ে না। আমার সৃষ্টির কাজ করে দিয়ে আমি তো খালাস, তার পরে গ্রহ উপগ্রহরা তাদের মধ্যে কোথায় কোন্ ছিদ্র খনন করচে কিছুই জানিনে। ভাবীকালের পুরাতত্ত্ববিদের গবেষণা কাজের বিস্তর খোরাক দিয়ে যাবো বলে মনে হচ্চে।

বহুকাল পরে একটা উপন্যাস* লিখ্‌তে লেগেছি। আয়তনটা বোধ হয় ছোটো হবে না। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি তাঁর জীবিতকালে তাঁর স্বরচিত বহু গদ্য-পদ্যের সমালোচন ও ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি আমার পিতার কাছে 'বলাকা'র দুটি বিখ্যাত কবিতার ব্যাখ্যা করে পাঠান তা দীর্ঘ নয়, কিন্তু কবিতা দুটির অর্থ সুস্পষ্ট ভাবে তার দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমটি 'শঙ্খ' কবিতার, দ্বিতীয়টি 'শাজাহান' কবিতার ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা দুটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

শঙ্খ—বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বান-শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা কর্‌তে হয়—অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই উদাসীন ভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাক্‌তে দিতে নেই। দুঃখ স্বীকারের হুকুম বহন কর্‌তে হবে, প্রচার করতে হবে।

শাজাহান—শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়—পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলি সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়—তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেই রকম। সে সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েচে—তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম "আমি" ও "সে"†—যে চলে যায় সেই হচ্চে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই,—আর যে-অহং কাঁদ্‌চে সেই তো ভার বওয়া পদার্থ। এখানে আমি বল্‌তে কবি নয়—"আমি-আমার" ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ আমার স্মৃতি আমার তাজমহল যে মানুষটা বলে, তারই প্রতীক ঐ গোরস্থানে—আর মুক্ত হয়েচে যে, সে লোক-লোকান্তরের যাত্রী—তাকে কোনো একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না শাজাহান নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি অপ্রকাশিত রচনা উদ্ধৃত করে এই আলোচনা শেষ করবো। কবি কত সময়ে তাঁর কত গ্রন্থের যে পরিবর্ত্তন সাধন করেছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত এটি। কবির রচনাটুকু উদ্ধৃত করবার আগে এর ইতিহাসটুকু বলে নেওয়া আবশ্যক।

১৯২৫ সাল। ঢাকায় ঐ সময় কবিগুরুর 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় করেছিলাম আমরা। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমার পিতা, অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি। অভিনয়ের রিহার্সাল যখন পুরোদমে চলেছে তখন একদিন অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ বললেন, "চারুবাবু! আমরা বর্ষাকালে "ফাল্গুনী" অভিনয় করতে যাচ্ছি, অদ্ভুত নয় কি?" আমার পিতা বললেন, "কবির কাছ থেকে একটা কৈফিয়ৎ আনিয়ে নেওয়া যাক্ না। সব দোষ কেটে যাবে।" কবিকে চিঠি লেখা হলো। উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন তার মর্ম এই—বর্ষায় ফাল্গুনের আবাহন হবে তার জন্য কোনও কৈফিয়তের দরকার ছিল না। তবু পাঠাচ্ছি।—ঐ সঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত অংশটুকু নতুন রচনা করে ফাল্গুনীতে জুড়ে নেবার জন্য নির্দেশ দেন। ফাল্গুনী নাটকের রচনার একেবারে শেষ ভাগে রাজাকে যখন কবি তাঁদের বসন্তোৎসবে আনন্দে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন, রাজা তখন জিজ্ঞাসা করবেন—

রাজা—কবি, তুমি যে এই ভরা বাদলের মাঝখানে ফাল্‌গুনের তলব করে বস্‌লে, এ তোমার কি রকম ক্ষ্যাপামি?

কবি—শিখেছি সেই ক্ষ্যাপার কাছ থেকে যিনি জ্যৈষ্ঠের হোম হুতাশনের ভরা দাহনের মধ্যে সজলজলদ-স্নিগ্ধকান্ত আষাঢ়ের অভিষেক উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র জারি করে বসেন কদম্বের নবকিশলয়ে। যিনি পাতাঝরা উত্তরে হাওয়ার সুর এক মুহূর্ত্তে ফিরিয়ে দিয়ে বনসভায় দক্ষিণ হাওয়ার আসর জমিয়ে তোলেন। বর্ষার শিঙাখানা কেড়ে নিয়ে তাতেই যদি বসন্তের বাঁশি বাজিয়ে তুলতে না পারি তবে আমি কবি কিসের?

কবির এই রকমের কত রচনা যে বনকুসুমের মত অলক্ষিত হয়ে বিরাজ করছে তার ইয়ত্তা নেই। কবি যেন তাঁর জীবনভোর পথ চলতে চলতে পথের দুধারে মুঠো মুঠো কুসুম ছড়াতে ছড়াতে চলে গিয়েছেন। তার কিছু মাল্য রূপে গ্রথিত হয়েছে—কিছু বা অগ্রথিত। কিন্তু এ সকলের সৌন্দর্য্য বা সুরভিও কম নয়। বাঙালীর এবং বিশ্বভারতীর কাজ হোক্ সেই সকল অপ্রকাশিত রচনাবলীর অনুসন্ধান। তাহলে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি আরও বাড়বে।

---

* "তিন পুরুষ"—পরে যার নাম হয়েছে "যোগাযোগ"।

† তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।—শাজাহান

ব্যবসায়ে বাঙালী

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, বি. এ.

বাঙ্গালী ব্যবসায়ের প্রতীক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র গত ৪০ বৎসর যাবৎ চাকুরীসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছেন। ব্যবসাজগতে বাঙ্গালীর আদর্শ বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি যুবকদের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উদ্দীপনা না দেখিয়া বড়ই দুঃখে বলিয়াছিলেন—"Young men nowadays look like so many criminals as if going to be hanged tomorrow." যুবকদিগের প্রতি তাকাইলেই মনে হয় তাহারা যেন হত্যাকারী, কালই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে যাইতেছে। তিনি যুবকদিগকে ডাকিয়া বলেন, "আমাদের দুর্ব্বলচিত্ত, চাকরিপ্রিয় বিলাসী বাবু হওয়া সাজে না, যে-শিক্ষায় দুর্ব্বল, অসহায় শিশুর মত করিয়া সংসার-সংগ্রামে ছাড়িয়া দেয় সে-শিক্ষা ছাড়; কঠোর পরিশ্রমী ও দৃঢ়চিত্ত হও, ঝাঁপায়ে পড় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে—কারণ মরণোন্মুখ বাঙালী জাতিকে বাঁচাতে হ'লে আর বাঁচতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে করতে হবে অন্নসমস্যার সমাধান। তরুণদল, আমি তোমাদিগকেই এই কাজে আহ্বান করিতেছি।" বড়ই আশার কথা আচার্য্যদেবের অন্তরের পবিত্র আহ্বান একেবারে বৃথা হয় নাই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত মৃত্যুপথগামী বাঙ্গালীর প্রাণে আজ আশার জোয়ার আসিয়াছে। হেয় ঘৃণ্য চাকুরীতে আজ আর বাঙালীর মন উঠে না। জাগরণের প্রথম সাড়ায় দাসত্বের পঙ্কিল হইতে কমল-কলির আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে—গতানুগতিকের গণ্ডী চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া অনেক বাঙালী যুবক আজ কৃতী ব্যবসায়ী হইয়া উঠিতেছে। আচার্য্যদেবের উৎসাহ-উদ্দীপনাময়ী বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহারা ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ব্যবসা-মহলে সুপরিচিত মিঃ এস. চাটার্জ্জী।

মিঃ এস্. চাটার্জ্জী

শচীনবাবু তাঁহার ব্যবসায়ী-জীবনের আরম্ভে বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে এক পানের দোকান দেন। তখন শিক্ষিত বাঙালী দূরে থাকুক একান্ত অশিক্ষিত বাঙ্গালীকে পানের দোকান দিতে দেখা যাইত না। instead of wallowing in the rat—মহাপঙ্কে পতিত না হ'য়ে থেকে ভাবুক শচীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাবপ্রবণতা ভবিষ্যৎ কর্ম্মসৌধের ভিত্তি রূপে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ঐ পানের দোকানেই জীবন কাটাইতে হয় নাই—তিনি আজ এক জন কৃতী ব্যবসায়ী, সচ্ছল, শিক্ষাব্রতী ও স্বজন-স্বজাতিবৎসল শচীন্দ্রনাথ। তাঁহার অনাড়ম্বর, সাদাসিধে জীবনপ্রণালী, সরল অমায়িক ব্যবহার, উদার দৃষ্টিভঙ্গী সকলকেই বিস্মিত করিয়া থাকে। আমি যাহাকে তাঁহার বাল্যকাল হইতে জানি যৌবনের আরম্ভেই তাঁহার হিমালয়সদৃশ উন্নতি আমাকে উদ্বেলিত করিতেছে তাহার আদর্শ ও কর্ম্মকুশলতা আজ সাধারণের সম্মুখে বিবৃত করিতে—সুতরাং এই প্রবন্ধে এবার আমি শচীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেই আমার আলোচনা শেষ করিব।

শচীন্দ্রনাথের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে—বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ, ল্যাণ্ডট্রাষ্ট অব

ইণ্ডিয়া লিঃ; মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ; এরিয়ান প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ; সেণ্ট্রাল টিপারা টি কোং লিঃ; লহরভেলী টি কোং লিঃ (ত্রিপুরা); গিড্ডা পাহাড় টি কোং (কার্সিয়াং); এই সকল কোম্পানীর বার্ষিক দুই তিন কোটি টাকা আদান-প্রদান আজ শচীন্দ্রনাথের কর্ত্তৃত্বাধীনে হইয়া থাকে।

শচীন্দ্রনাথের সকল রকম ব্যবসায় এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহার বিশেষত্ব ও কর্ম্মকুশলতার বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান সঙ্কুলান এখানে সম্ভব নহে। আমি কেবল তাঁহার বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিব। এই কোম্পানীর মূলধন ২৫,০০,০০০৲ পঁচিশ লক্ষ টাকা। শেয়ারের কারবার বাংলা দেশে বাঙালীর মধ্যে এক রকম অজ্ঞাতই ছিল। যখন শচীনবাবু এই কোম্পানী রেজেষ্টারী করেন তখন আমরা বুঝিতেই পারি নাই এই কারবার এখানে চলিবে কি না—কিন্তু শচীনবাবুর দূরদর্শিতার ফল অল্পদিন মধ্যেই দৃষ্ট হইল। শচীনবাবু একদিন আমাকে আচার্য্যদেবের নিকট বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সম্বন্ধে তাঁহার একটু আশীর্ব্বাদ আনার জন্য পাঠাইলেন। আচার্য্যদেব এইরূপ ব্যবসা সম্বন্ধে আদৌ কিছু লিখিয়া দিতে পারেন এই ধারণা আমার ছিল না। আমি আচার্য্যদেবকে যখন আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলাম—দেখিলাম তিনি শচীনবাবু সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞাত নহেন। তিনি লিখিলেন:—

স্যার পি. সি. রায়, সায়েন্স কলেজ
২২শে জুলাই, ১৩৪০

ইংলণ্ড ও আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে
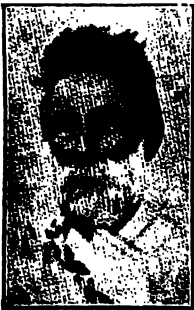
আচার্য্য স্যর্ পি. সি. রায়

এই প্রতিষ্ঠানের মত অনেক প্রতিষ্ঠানই আছে। দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারকল্পে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের খুবই আবশ্যকতা আছে। শুধু যে শেয়ারেরই কাজ এই কোম্পানী করিবে এরূপ নহে, অপরাপর বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানও ইহার অধীনে গঠিত হইবে। কাজেই অংশীদারগণ খুবই লাভবান হইবেন। তাহা ছাড়া বোর্ড যেরূপ ভাবে গঠিত, এবং মিঃ এস্. চাটার্জ্জীর মত অভিজ্ঞ ম্যানেজিং ডিরেক্টর যখন রহিয়াছেন তখন ইহার সাফল্য সুনিশ্চিত। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি ইহা সাফল্য লাভ করুক।

পি. সি. রায়

বড়লাটের বর্ত্তমান আইন-সচিব, পাটনার সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার স্যর্ সুলতান আমেদের সহিত এবং বিখ্যাত

স্যর্ সুলতান আমেদ

ব্যারিষ্টার মিঃ পি. আর. দাশ মহাশয়ের সহিত যখন শচীনবাবু দেখা করেন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। যুবক শচীনবাবুকে তাঁহারা যেরূপ সাদরে গ্রহণ করিলেন আমি উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। মিঃ পি. আর. দাশ কোম্পানীর ডিরেক্টর হইতে রাজী হইলেন এবং স্যর্ সুলতান আমেদ নিম্নলিখিত বাণী দিলেন:—

"কোম্পানী (বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ) দেশের একটা বড় অভাব পূরণ করিয়াছে। আমি ইহার সাফল্য কামনা করি এবং যাঁহারা নিরাপদে টাকা খাটাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে অনুরোধ করি।"

আচার্য্যদেব এবং অন্যান্য মনীষীদের আশীর্ব্বাদে বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই কোম্পানী ইহার শেয়ারহোল্ডারগণকে শতকরা ১০৲ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। সিণ্ডিকেটের নিজস্ব বাড়ী করিবার জন্য চৌরঙ্গী

চৌরঙ্গী স্কোয়ারে বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেডের পাঁচতলা বাড়ীর ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে আচার্য্য স্যর্ পি সি. রায় মহোদয় সহ গ্রুপ ফটো।

স্কোয়ারে ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকায় ৫ কাঠা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। বাড়ীর প্ল্যান ও অপরাপর আনুষঙ্গিক কার্য্য শেষ হইলে ডিরেক্টার বোর্ড ঠিক করিলেন ইহার 'ভিত্তিস্থাপন'-উৎসব এক জন মহৎ ব্যক্তির পৌরোহিত্যে সমাপন করা হইবে। সকলেই ঠিক করিলেন আচার্য্য স্যর্ পি. সি. রায় মহাশয়ই এই সম্পর্কে যোগ্যতম ব্যক্তি। আমাকেই এই প্রস্তাবের নিবেদন করিতে আচার্য্যদেবের নিকটে যাইতে হইল। শচীনবাবু চা-বাগিচায় ত্রিপুরার মহারাজা এবং অপরাপর রাজন্যবর্গকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন এইরূপ যে ফটোখানি ছিল উহা, ফাইন্যান্সিয়াল টাইম্‌সে "পর্ণকুটীর হইতে ক্লাইভ ষ্ট্রীট" শীর্ষক প্রবন্ধে শচীনবাবুর জীবনীর এক কপি এবং সিণ্ডিকেটের বড় বড় অংশীদারগণের নামবিশিষ্ট এক কপি মার্কেট রিপোর্ট আমি সঙ্গে লইয়াছিলাম। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আচার্য্যদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে আমাদের কথা নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন, "এখন কি আমার তেমন শক্তিসামর্থ্য আছে। আমায় টানাটানি করা Cruelty to animal." বাস্তবিকই তাঁহার যে স্বাস্থ্য এই অবস্থায় তাঁহাকে কোন উৎসবে পৌরোহিত্য করার কথা বলা নিছক স্বার্থপরতার পরিচায়ক। আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার স্নেহময় দৃষ্টিতে ইহা ধরা পড়িল। তিনি বলিলেন, "শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপের উপর আমার বিশেষ দৃষ্টি আছে। ঐ একটি লোক।" আমি বলিলাম শচীন্দ্রবাবু আপনার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। পরদিন শচীনবাবু আচার্য্যদেবের সহিত দেখা করিলেন। তিনি তখন সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। শচীনবাবু কথা উঠাইতেই তিনি বলিলেন, "ব্যাঙ্কট্যাঙ্ক ও শেয়ারে"র নামে আমার বড় ভয় হয়। আপনি শেয়ার সিণ্ডিকেট করেছেন শুনে খুবই সুখী হ'য়েছি।" এই বলিয়া শচীনবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন। শচীনবাবু তাঁহার স্নেহে বিশেষ আশান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "আপনাকে যেতেই হইবে।" তিনি আর 'না' বলিতে পারিলেন না। পরদিন ৮॥ হইতে ১০॥ পর্য্যন্ত সিণ্ডিকেটের পাঁচতলা বাড়ীর ভিত্তি স্থাপনের সময়। যথাসময়ে গাড়ী পাঠান হইল, আচার্য্যদেব চৌরঙ্গীস্কোয়ারে আসিবামাত্রই শচীনবাবু এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ আচার্য্যদেবকে

পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। তখন আচার্য্যদেব এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা প্রবেশপথে ছিলেন তাঁহাদের একটি ফটো গ্রহণ করা হইল। সিণ্ডিকেটের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত এম্, এল্, সি মহাশয়ও এই গ্রুপে ছিলেন। ফটো নেওয়া হইলে আচার্য্যদেব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "বয়স ৮০ আশী উত্তীর্ণ হয়েছে, জরাজীর্ণ দেহ—শুধু মনের বল এবং পরের জন্য দরদ আছে বলেই আচার্য্যদেবকে আজ আমরা আমাদের মধ্যে পাইয়াছি।" অতঃপর উৎসবের কার্য্যারম্ভ হইল। আমি সিণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র একটি অভিনন্দন পাঠ করিলাম। আচার্য্যদেব তদুত্তরে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করার জন্য সিণ্ডিকেটের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ আই. বি. ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুজ্ঞা করিলেন। সুন্দর ও সরল ভাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। তাঁহার শেষ কথা—"আমি আশা করি সিণ্ডিকেটের এই নবনির্ম্মিত ভবন বাঙালী জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ কিরূপে বাঙালী পরিচালিত বিশ্বাসযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নিয়োজিত হয় তাহার পথপ্রদর্শক হইবে। আমি সিণ্ডিকেটের পরিচালকদের উদ্দেশ্যের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য এবং তাঁহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত হউক আজিকার দিনে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।" আচার্য্যদেব অতঃপর ভিত্তি স্থাপনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হন। তিনি স্বর্ণখচিত রৌপ্যনির্ম্মিত একখানা কর্ণিক (Trowel)দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করেন। তাঁহাকে উক্ত কর্ণিক দেওয়া হইলে তিনি শচীনবাবুর হাতে উহা ফিরাইয়া দিয়া বলেন, "Preserve it as a memento in the office"—অফিসে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দিবেন।

এই ভিত্তি-স্থাপন-উৎসবে যে বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই উৎসবকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা শচীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ নিদর্শন।

শচীনবাবু সম্বন্ধে দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তি অনেক কথা লিখিয়া তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছেন ও তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। খ্যাতনামা সাংবাদিক, সুসাহিত্যিক, প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক নেতা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শচীনবাবুর

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জী

কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মাতার নামে প্রতিষ্ঠিত ঢাকুরিয়া বিনোদিনী গার্লস্ হাইস্কুলে, শচীনবাবুর নিজস্ব বাড়ীতে-ও বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেটের অফিসে গিয়াছিলেন। রামানন্দবাবুর আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ লাভ যুবক শচীন্দ্রনাথকে যে বিশেষ কর্ম্মপ্রেরণা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শচীনবাবুর আদর্শে শত শত বাঙালী যুবক উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে এই আশায়ই আমি এই প্রবন্ধ লিখিলাম। কর্ম্মী বাঙালীর জীবনকাহিনী প্রচার করা আমি গৌরবের বলিয়াই মনে করি।

চীন ও রুশরাষ্ট্র

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এশিয়া ভূখণ্ডের দুই প্রান্তে এখন যুদ্ধদেবতার তাণ্ডব চলিয়াছে। পূর্ব্ব সীমান্তে বর্ত্তমান জগতের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক চীন তাহার সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন সংস্কার, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে
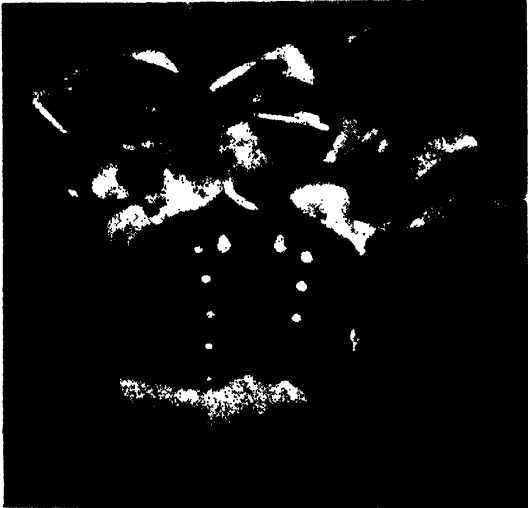
মার্শাল ভোরোশিলফ ও বিদেশী সেনানায়কগণ

বিসর্জ্জন দিয়া দৃঢ়চিত্তে নূতনের আরাধনা করিয়া এক এক বৎসরে এক এক যুগের ভুলভ্রান্তি ও অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিমে সংসারের অভিনবতম রাষ্ট্রগঠনপন্থার প্রবর্ত্তক সোভিয়েট রুশ এখন এরূপ বহু রীতি-নীতির পুনরবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে যাহা অল্পদিন পূর্ব্বেই সে পুরাতন ও মলিন বলিয়া ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছিল। এই পুরাতন ও নূতন পথের পথিক দুইটিরই পথ ও পন্থার পরিবর্ত্তনের কারণ এক। দু-জনেই ক্ষুধার্ত্ত, "সম্বিৎ নাই" ("হ্বাভনট") দলের পরাক্রান্ত শক্রর অসুর-নীতি-উদ্বুদ্ধ আক্রমণে পীড়িত।

চীন এত দিন ঘরোয়া বিবাদে দিন কাটাইয়াছে। তাহার সম্পত্তি, সঙ্গতি, লোকবল—তিনই ছিল অসীম। কিন্তু আদর্শবাদের জটিল প্রশ্নের সমাধানে বাস্তবকে একেবারে উপেক্ষা করায় (যেমন আমাদের দেশে এখন চলিয়াছে) সে সম্পত্তি ও সঙ্গতি বিদেশীর ভোগে লাগিতে-ছিল এবং সে লোকবলের প্রয়োগ যথাযথ তত্ত্বাবধানে না হওয়ায় তাহাতে রাষ্ট্রের গঠন অপেক্ষা পতনের কার্য্যই দ্রুত চলিতেছিল। দেশের অসংখ্য "নেতা" নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা মতবাদের কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষতি করার চেষ্টায়—আমাদের বাঙ্গালী "দেশনায়ক"দিগের মতই—দেশসুদ্ধ উচ্ছন্ন দিয়া বিদেশী শত্রুর উপকার করিতেছিলেন। নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রত্যেকেই সৈন্যদল গঠন করেন, তাহাদের মধ্যে না ছিল শৃঙ্খলা, না ছিল আধুনিক সমরোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র। যাহা ছিল তাহাতে অন্তর্বিরোধ ও রাষ্ট্রবিপ্লব দু-ই চলে, চলে না কেবল দেশের রক্ষণাবেক্ষণ। জাপানের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ, কর্ম্মতৎপর ও সমরকুশলী জাতি সাম্রাজ্য ও সঙ্গতি লাভের এরূপ স্বর্ণ সুযোগ ছাড়িল না। বিশেষতঃ জাপান "সম্বিৎ নাই" জাতি-সঙ্ঘের অক্ষদণ্ডে যুক্ত। ফলে চীনের "পরের
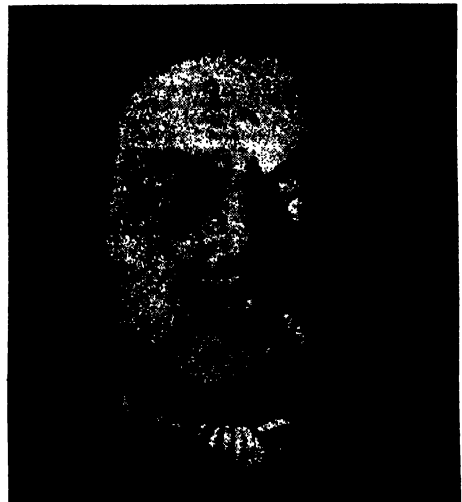
মহান পিটারের প্রতিকৃতি। ইহাতে তাঁহার নিজের কেশ ও শ্মশ্রু যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। লেনিনগ্রাড যাদুঘর

মস্কৌতে বক্তৃতাকালে লেনিন
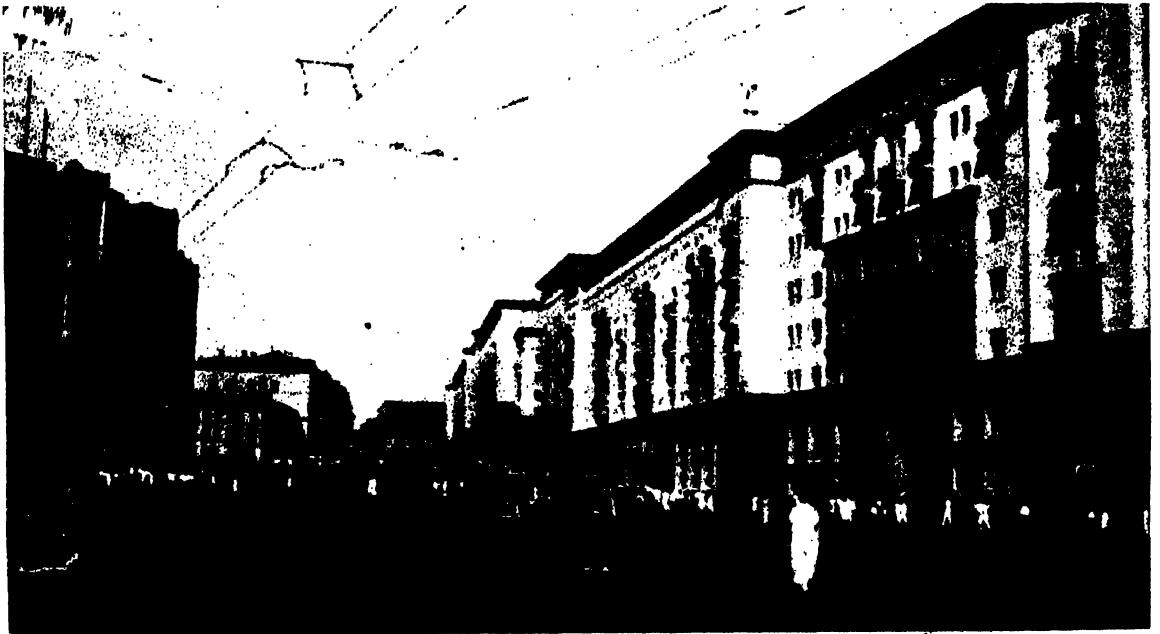
মস্কৌয়ের প্রধান রাজপথ ও বিপনিমালা

চীনের মৃত্যুঞ্জয়ী কৃষাণ-"গেরিলা"র একটি দল

চুংকিংএ বিমান আক্রমণ কালে বিমর্ষ ও চকিত দমকলচালকদিগের চিত্র
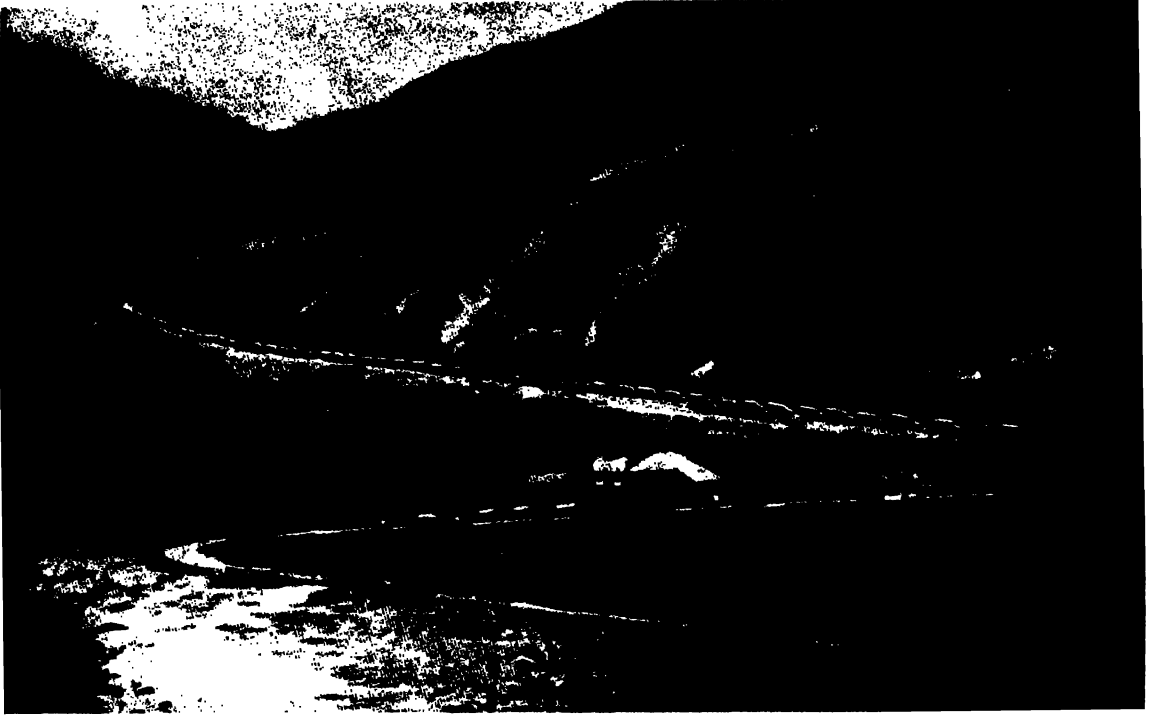
লাশিয়ো কুনমিং পথ

চীনকে সাহায্যকারণে উত্তর-বর্ম্মায় এক নূতন রাজপথ নির্ম্মিত হইতেছে

ড়পতির দুহিত   এক   চিব
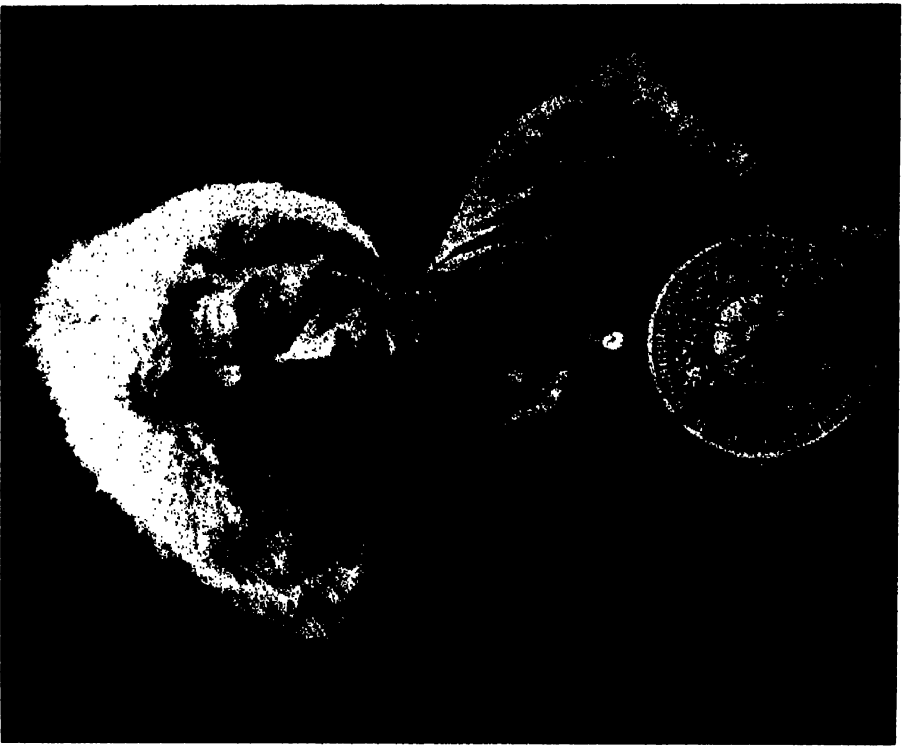
য়ুন্নান অঞ্চলের এক জমিদার ও গেরিলা

ঘর জালান আগুন" দেশব্যাপী সমর-অভিযানের দাবানলে পরিণত হইল।

রুশরাষ্ট্রের সঙ্গতি ও সম্পত্তি জগতে অতুলনীয়। লোকবলও প্রচুর, যদিও দেশের আয়তন হিসাবে তাহা মুষ্টিমেয় মাত্র। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর সোভিয়েট রুশ ঘরে ও বাহিরে এক অভিনব মতবাদের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা আরম্ভ করে। প্রথমে প্রায় দশ বৎসর গেল যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু প্রাচীন সব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে। তাহার পর আরম্ভ হইল নূতন করিয়া গড়িবার পালা। সমস্ত জাতির সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় গড়াও হইল আশ্চর্য্য। কিন্তু এই গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় অসংখ্য কৃতী এবং সুযোগ্য কর্ম্মযোজক—যাহারা দেশের বিপদ-আপদে বিশেষ শক্তির আধার হইতে পারিত—প্রাণ হারাইল। এই রাষ্ট্রীয় বিরেচনের ফলে সোভিয়েটের বিরাট সৈন্যবল, অসীম কৃষি, খনিজ ও যন্ত্রশিল্পজাত সম্পদ উপযুক্ত অধ্যক্ষ এবং কুশলী ও অভিজ্ঞ চালকের অভাবে শালপ্রাংশু কবাটবক্ষ, মস্তকহীন কবন্ধের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্টালিনের দলের প্রথম চোখ খুলিল যখন "মাঞ্চুরিয়া ঘটনা"র পর নগণ্য মুষ্টিমেয় জাপানী দল জেনারেল আরাকি ও ডোইহারার নেতৃত্বে বিরোধী রুশদিগকে পদাঘাতে মঙ্গোলিয়ার পূর্ব্বদেশ হইতে তাড়াইল। স্টালিন বুঝিলেন যে যাঁহারা "সোভিয়েটের জয় হউক", "লেনিনের জয় হউক", "স্টালিনের জয় হউক" ইত্যাদি গলাবাজি করিয়া এবং "তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক" গানের শব্দে গগন বিদারণ করিয়াই দেশের নেতা সাজিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক প্রাণ-সঞ্চালক কার্য্যপ্রকরণে পরগাছার মতই অকেজো এবং হানিকর। তখন আবার আরম্ভ হইল উপযুক্ত লোকের খোঁজ এবং আরম্ভ হইল জগতের পুরাতন পন্থাগুলির আংশিক ভাবে পুনঃগ্রহণ। ইতিমধ্যে কাটিয়া গেল ছয় বৎসর এবং এই ছয় বৎসরে হিটলারের চালনায় নাৎসী জার্ম্মানী আপাদমস্তক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইল জগতের সম্মুখে। যদি এই ছয় বৎসর ও তাহার পূর্ব্বের তিন বৎসর সোভিয়েটের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ বাহিরের দিকে তাকাইয়া ঘরের বৈরশুদ্ধির ছুতায় স্বদেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্ব্বনাশ করায় ক্ষান্ত দিতেন, তবে আজ এই যুদ্ধক্ষেত্র বার্লিনের দুয়ারে প্রসারিত হইত—লেনিনগ্রাডে নয়।

ইতিহাসের কল বড়ই সূক্ষ্মভাবে চলে। তাহার গতি ও তাহার হ্রাস কোনও আদর্শবাদ প্রচার বা কোনও ইষ্টমন্ত্র জপে ফিরিবার নয়। সময়, কার্য্য-কারণ এবং

লেনিনগ্রাডের প্রসিদ্ধ মহান পিটারের ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি

অতি নিগূঢ় আন্তর্জ্জাতিক আদান-প্রদানের প্রতিক্রিয়ায় যাহা ঘটে তাহাই ইতিহাসের ফলাফল। বর্ত্তমান মহা-সমর ঠিক সেই ভাবেই ইতিহাসের এক অধ্যায়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে এবং সে লেখনীর রেখাপাত ঠিক সেই ভাবেই হইবে যাহার নির্দ্দেশ জগতের বিগত দশ বৎসরের কার্য্যকলাপে দেখা গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে।

* * *

চীন-রাষ্ট্র এখন সর্ব্বস্বান্তপ্রায় হইয়া তাহার শেষ দুর্গ-মালায় আশ্রয় লইয়াছে। এত দিন জগতের কোন জাতির নিকট সে বিশেষ কোনও সাহায্য পায় নাই। অল্পদিন পূর্ব্বেই রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাই-শেক-পত্নী দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "চীন মরিলে জগতের সাধারণতন্ত্রবাদের এক সর্ব্বনাশ হইবে এবং যদি সে মরে তবে তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে তিনটি ফাঁসি :—প্রথম, জাপানের সাম্রাজ্য-বাদ ; দ্বিতীয়, আমেরিকার অর্থলোলুপতা ; তৃতীয়, ব্রিটেনের সুবিধাবাদ।" এত দিনে অনেকের চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে চীনকে সাহায্য করার জন্য, দেখা যাউক ফলে কি হয়। চীনে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দীপ এখনও জ্বলিতেছে,

সুতরাং তৈলপ্রদানে সুফল হওয়া সম্ভব—যদি তাহা উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া হয়।

পাপের মুক্তি প্রায়শ্চিত্তে। পাঁচ কোটি লোক গৃহহীন, লক্ষ লক্ষ সন্তান অনাথ, লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষিতা, দেশের ছয় লক্ষাধিক বর্গমাইল পরিমাণ ভূমি শত্রুহস্তগত, লুণ্ঠিত এবং সর্ব্বপ্রকারে বিধ্বস্ত, ইহাতেও কি শত শত বৎসরের সংস্কারে অবহেলার এবং গৃহবিবাদ ও বিগত ত্রিশ বৎসরের স্বজাতীয়দিগের ভিতরে হিংসা ও বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? মনে হয় এত দিনে চীনের কলঙ্কের বোঝা সরিয়াছে। এখন চীন অটল সংকল্পে, দৃঢ়চিত্তে জাপানের সহিত শেষ হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা করিতেছে। তাহার সৈন্যদল ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ ও নির্ম্মাণ দুই-ই এখন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। সেকথা প্রবন্ধান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

রুশের অগ্নিপরীক্ষার অনলে এখনও আহুতি নিক্ষেপ চলিয়াছে। দশ বৎসরের বিষম পরিশ্রমে অর্জ্জিত অনেক কিছুই যুদ্ধদেবতার রুদ্রতাণ্ডবের চরণাঘাতে ধুলায় মিশিয়াছে এবং মনে হয় আরও মিশিবে। উত্তরে লেনিন-গ্রাডের পথ ও প্রাসাদ, তাহার বিশাল কলকারখানা এবং ৪৫ লক্ষাধিক নাগরিক এখন জার্ম্মানীর যন্ত্রযুদ্ধের আবর্ত্তে পড়িয়াছে। দক্ষিণে ডিনিপারের পূর্ব্বাঞ্চলের স্বর্ণপ্রসবা শস্যক্ষেত্র ও খনি এখন শত্রুর যুদ্ধরথের চক্রের ধূলিজালে আচ্ছন্ন। ইহার মধ্যের সকল অংশেই মরণ-বাঁচন পণ করিয়া রুশ ও জার্ম্মান সৈন্যদল অবিশ্রাম লড়িয়া চলিয়াছে।

গণতন্ত্রবাদের মূল শিকড় অতি সুগভীর ভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের জীবনের সর্ব্বাংশে প্রবেশ করে লেনিনের তেজোময় প্রভাবে ও প্রচারে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের ও রুশজাতির জাতীয় ক্ষেত্রের জমিও দৃঢ় হয়। সুতরাং চীন যে-আঘাত সহ্য করিয়াছে ও করিতেছে, রুশ যে তাহা সহিতে পারিবে না একথা ভাবিবার কোনও কারণ নাই, যদি তাহার নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনও বিপ্লব না ঘটে। বাহির হইতে যথেষ্ট সাহায্য যদি নাও আসে, তবুও রুশজাতির অদম্য যুদ্ধশক্তি লোপ পাইবে না, কিছু ক্ষীণ হইতে পারে মাত্র এবং জার্ম্মান সেনা নিজ দেশের সীমান্ত ছাড়াইয়া যতই অগ্রসর হইবে ততই তাহার পক্ষেও আক্রমণে পূর্ণ শক্তি

প্রয়োগ কঠিনতর হইবে। তবে এখনও সেই আক্রমণের বেগ ও প্রকোপ পূর্ব্বেরই মত প্রচণ্ড রহিয়াছে সন্দেহ নাই। মার্শাল ব্যুডেনি ও মার্শাল ভোরোশিলফের সৈন্যদল যে সংগ্রামে শত্রুর বল পরীক্ষা করিতেছে তাহার কঠোরতার নির্দ্দেশ মাত্রও প্রায় অসম্ভব। এক দিকে শ্রেষ্ঠতর—এবং এখন বোধ হয় পরিমাণেও অধিক—যুদ্ধযন্ত্র ও অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং রণকুশল নেতা চালিত সুশিক্ষিত যুদ্ধপটু জার্ম্মান, অন্য দিকে শৌর্য্যে ও বীর্য্যে অতুলনীয়, সবল ও দৃঢ়চিত্ত সোভিয়েট গণতন্ত্রবাদী সেনাদল। এখনও মনে হয় রুশ-সেনা কেবলমাত্র অস্ত্রবলে পরাজিত হইতে পারে না এবং এখনও তাহাদের তিন জন প্রধান রণনায়কের মনে নৈরাশ্যের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।

শ্রীবিভাসকুমার দত্ত রচিত
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল খচিত।

"কলকাতায় বোমা পড়বে নিশ্চয়ই।" এ ধারণা শুধু আমার নয়, অনেকেরই মনের ঈশানকোণে আজকাল কালো মেঘের মত জমাট বেঁধে উঠেছে। ধারণাটা বদ্ধমূল হ'ল সেদিন মাণিকতলার মোড়ে—সরকারের সহৃদয় প্রচার বিভাগের সময়োচিত সতর্কীকরণে। "ভাঙ্গা-গড়ার বিপুলধারায়" এক নিমেষে কি যেন সব ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যায়—এই রকম একটা গানে প্রাণটা পূর্ব্বেই ভাঙ্গনের ভয়ে ভারী হয়ে উঠেছিল, তারপর যখন লাউডস্পীকার সহযোগে বক্তা শুরু করলেন, "...যুদ্ধ আপনার বাড়ীর কাছে এগিয়ে এসেছে, আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে নাৎসীবর্ব্বরতার কালিমায় কেবল যে য়ুরোপের নিষ্কলুষ সভ্যতা কলঙ্কিত হবে তা' নয় ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতও চিরতরে ম্লান হ'য়ে যাবে"......প্রভৃতি, তখন অপ্রিয় হ'লেও কথাগুলির সত্যতা অস্বীকার করবার যো রইল না। যাই হোক্ মান ত অনেকদিন গেছে! বিমান আক্রমণ হ'লে কি ভাবে অন্ততঃ পৈতৃক প্রাণটুকু রক্ষা করা যায়—সে সম্বন্ধে সরকারী উপদেশগুলি মনোযোগ সহকারে শুনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরলাম।

*   *   *   *   *

রাত্রি ঠিক কত হয়েছিল বল্‌তে পারি না, কারণ আমি তখন ছিলাম গভীর ঘুমে অচেতন! হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল প্রচণ্ড এক শব্দে। দাদু খাটের

উপর কাৎ হয়ে চীৎকার করছিলেন—"বোমা, বোমা, বাতি নেভাও, বাতি নেভাও, ব্ল্যাক্ আউট, ব্ল্যাক্ আউট।" বাতি নিভল কি জ্বল্‌লো বুঝতে পারলাম না, কারণ আমার চোখে তখন অন্ধকার! শুনলাম শুধু বাড়ীশুদ্ধ লোকের ছুটাছুটি, চীৎকার ও মোটা-সরু কণ্ঠের মিশ্রিত আর্ত্তনাদ। দাদু আরো জোরে চীৎকার করে উঠলেন—"লুঠ হচ্ছে, লুঠ হচ্ছে, এ আর পি, এ আর পি, ওয়ার্ডেন, ওয়ার্ডেন......" আমার যেন হঠাৎ শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো, প্রাণপণ চেষ্টায় রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম, "গ্যাস ছাড়চে, গ্যাস ছাড়চে—গ্যাসমাস্ক, গ্যাসমাস্ক।"

মুখোসের পরিবর্ত্তে মুখ খসে পড়বার যোগাড় হ'ল—বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড়ে। চেয়ে দেখি আলো জ্বল্‌ছে। আমার বিছানারই এক পাশে বড় মামী পড়ে গোঙ্গাচ্ছে। বোধহয় ছোটমামাই তাঁকে কোলপাঁজা করে এ ঘরে এনেছিলেন। ছোটমামা ডাক্তার। অল্পক্ষণের
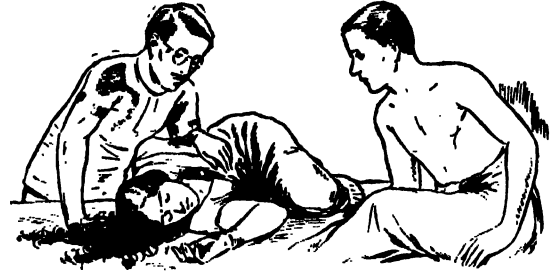
মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় কেবল যে বড়মামীর জ্ঞানসঞ্চার হ'ল তা' নয়, তাঁর শক্তিমান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আমরাও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম। যদিও তখনও বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে কাঁপছিল। তখন বোঝা গেল যে বিবাহের ছয় বৎসরের মধ্যে একাদিক্রমে মা-ষষ্ঠীর কৃপায় ষষ্ঠ সন্তানের মাতা হয়ে বড়মামীর পতন ঘটেছিল—নিদারুণ দুর্ব্বলতার জন্য। অবশ্য পড়ে গিয়ে প্রথমতঃ তাঁর কেবলমাত্র উত্থানশক্তি লোপ পেয়েছিল, তাঁর জ্ঞানলোপ পেয়েছিল আমাদের চীৎকারে। তাই ছোটমামা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, "কতবার বলেছি বাবা, সন্তান প্রসবের পর বৌদিকে "ল্যাড্‌কোভাইন" খাওয়াতে, তা'ত আপনারা শুনবেন না"......

দাদু লজ্জিতভাবে বল্‌লেন, "আমরা গরীব গেরস্থ লোক, পোর্টওয়াইন দেওয়া দামী টনিক খাওয়াবার পয়সা পাবো কোথায়?"

ছোট মামা বল্‌লেন, "সে কথা আগে বললেও ত পারতেন। ল্যাড্‌কো ত সেইজন্যই 'বলীয়ান' বলে আর একটা টনিক বাজারে দিয়েছে। তেজস্কর দেশী গাছগাছড়া থেকে উৎকৃষ্ট সুরাসার যোগে তৈরী বলে "বলীয়ানের" দামও কম অথচ তার উপকারিতা কোন অংশে কম নয়।

এমন সময়ে পাশের বাড়ীর সার্ব্বজনীন খুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন, কি ভায়া! কত বড় "বোমা" পড়ল। পূব দিকটা দেখ্‌ছি একেবারে পুকুর হয়ে গেছে!"

ছোটমামা চীৎকার করে বললেন, "খুড়ো, পুকুর করেছে চাঁদের আলো ও তোমার আফিমের নেশায় মিলে। বোমা পড়ে নি, পড়ছেন তোমাদের বৌমা। ভয় নেই, ঘুমোগে যাও খুড়ো, যে দেশে যুবশক্তির একটি নিদর্শন হচ্ছে আমার এই ভাগ্নেটি সে দেশে বোমা ফেলার অপব্যয় কোন বুদ্ধিমান জাতই করবে না।"

...নাঃ, সে অপমান সহ্য করতে পারিনি! সেদিন থেকে প্রত্যহ নিয়মমত "বলীয়ান" খাচ্ছি। ফলে বোমা যদি আজ সত্যিই পড়ে বোমার আঘাতে মরতে পারি কিন্তু বোমার ভয়ে মরবো না!

বঙ্কিম কণিকা—কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম্‌. এ, ম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান:—প্রকাশনী, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ য়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ পূর্বে "বঙ্কিম-প্রতিভা" নাম দিয়ে যে গুলি প্রকাশ ক'রেছিলেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের "Letters on induism" প্রকাশিত হওয়ায় সত্যান্বেষী লোকেরা তৃপ্ত ও উপকৃত য়েছিলেন।

আলোচ্য বইটিতে বঙ্কিমের একটি নাটক, একটি প্রবন্ধ, তাঁর পত্র, ং তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য আছে। বইটি আগ্রহের সহিত ঠত হবে আশা করি। পুস্তকটির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

কেরাণী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅমলচন্দ্র হোম প্রণীত। প্রকাশক রাধারমণ রায়চৌধুরী, বি এ, সম্পাদক, কলিকাতা কর্পোরেশন র্মচারিসঙ্ঘ, সেণ্ট্রাল ম্যুনিসিপ্যাল আফিস, কলিকাতা। দাম লেখা ই।

"প্রগতি"পন্থী লেখকবৃন্দ, "রবীন্দ্র-অতিক্রমী" কবয়ঃ এবং র্কসিদ্ধধ্বজী ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব প্রকৃত কথা লেখা ও আওড়ান হ'য়ে থাকে, এই বইটিতে তার সপ্রমাণ খোল জবাব আছে।

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহিরণ্ময় ঘাল। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচর কোং, ১০৫ কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা। য তিন টাকা। কাগজ ও ছাপা ভাল।

এই বইটির লেখক ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল ১২ বৎসর ইয়োরোপে লেন। যখন বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন তিনি পোল্যাণ্ডের ভারশৌ Varsaw) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। জার্মানদের দ্বারা ভারশৌ ক্রমণ, তার উপর অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণ, তার ধ্বংস ও তার পতন নি ভারশৌতে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহ ও বীভৎস তিনি দেখেছেন। তাঁর লিখনভঙ্গীতে তাঁর স্বকীয়ত্ব আছে। াং বইটি পড়তে পাঠকদের খুব ভাল লাগবে। কিন্তু এটি শুধু যুদ্ধ-বর্ণনা নয়। ইয়োরোপে কেন এই যুদ্ধ ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কেন এ রকম বা এর চেয়েও ভীষণ যুদ্ধ ঘটতে পারে, তা এই বইটি পড়লে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন;—কেবল চার পৃষ্ঠা ভূমিকাটুকু পড়লেও কতকটা আভাস পাবেন।

বইটিতে বিষয়সূচী ও বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকলে ভাল হ'ত। পরিচ্ছেদগুলি ভাগ করা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাম নেই। হয়ত নাম দেওয়া কঠিন, কিন্তু নাম থাকলে, বিষয়সূচী থাকলে ও বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকলে কম ব্যস্ত স্বল্পাবসর পাঠকদের সুবিধা হয়—অন্য পাঠকদেরও হয়।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—এই বৃহৎ অভিধানের ৭৭তম খণ্ড বেরিয়েছে। এর শেষ শব্দ 'যাত্রী', শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫১৭।

ভ.

জাগরণী—শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। "আনন্দধাম", ২সি, ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, পোষ্টাফিস হাটখোলা, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩১৬। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

"শ্রীগুরুসঙ্গে জগৎপুর আশ্রম" ও "গিরিনিকেতনে দুই দিন" এই দুইটি প্রবন্ধ ব্যতীত এই গ্রন্থনিবদ্ধ সমস্ত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশকের গুরুদেব "পাগল বাবা" কর্ত্তৃক লিখিত। উপরোক্ত প্রবন্ধ দুটির লেখক প্রকাশক স্বয়ং।

পরমহংস শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত জগৎপুর আশ্রম ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আশ্রমের বিবরণ ও স্বামীজির শিষ্য প্রশিষ্যদিগের জীবনী এই বইখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি ধর্ম্মসঙ্গীত। যাঁহারা চট্টগ্রামস্থ জগৎপুর আশ্রমের বিষয় জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

পরিচয়—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য বি. এ. কাব্যবিনোদ। প্রকাশক —শ্রীপঞ্চানন রায়, ভারত কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ।৵০।

গ্রন্থের মধ্যে তেতাল্লিশটি কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই প্রশংসাযোগ্য। অনেক কবিতায় লেখকের অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে। ছন্দ, ভাষা ও ভাবের আড়ষ্টতা নাই। 'সন্ধ্যা,' 'পদ্মা' ও 'স্নেহের চিতা' বিশেষভাবে তৃপ্তি দিয়াছে। 'মন্দিরে বৃদ্ধভক্ত' কবিতাটি উপভোগ্য। ইহা পাঠ করিয়া কাব্যামোদিগণ আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আকাশগঙ্গা—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, দেব-সাহিত্য-কুটীর, কলিকাতা। দাম বার আনা।

বইখানি ছেলেদের জন্য লেখা সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। যাতে ছেলেদের মনোমত হয় সেজন্য যত্ন নেওয়া হয়েছে। চিত্রবহুল বইখানি ছেলেদের আনন্দ দেবে আশা করা যায়।

কাগজ, ছাপা, ছবি, বাঁধাই বেশ ভাল। রঙ্গীন ছবি যে দুখানি আছে তাও ভাল, সকলের চেয়ে ভালো লাইন ড্রইংগুলি।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

বার্ষিক শিশুসাথী—ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

বঙ্গদেশের প্রখ্যাতনামা লেখকদের রচনাসম্ভারে ইহা পূর্ণ। শিশুমনের উপযোগী গল্প, প্রবন্ধ, নক্সা, প্রহসন, কবিতা প্রভৃতি ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। সুনিপুণ শিল্পীদের তুলিকায় গল্পের প্রাণবস্তু তরুণ পাঠক-পাঠিকার নিকট উজ্জ্বল হইয়া ধরা দিয়াছে। ইদানীং শিশু-সাহিত্যের কতকটা মোড় ফিরিয়াছে। আজগুবি গল্প, ভুয়ো-এ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতিতে কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের এখন আর তেমন মন বসিতেছে না। তাহাদের বিবিধ বিষয় জানিবার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য লেখকগোষ্ঠীও যে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছেন তাহা বড়ই আশার কথা। আলোচ্য বার্ষিকী-খানির প্রবন্ধের বৈচিত্র্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, শিল্পতত্ত্ব, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব, জীবনী, খাদ্যতত্ত্ব, পশুতত্ত্ব, ঐতিহাসিক কাহিনী, ইতিহাসের মূল কথা, উদ্ভিদতত্ত্ব, শারীর বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, ম্যাজিক প্রভৃতি বহু এবং বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ এই বার্ষিকীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নানা বিষয়ক বিস্তর চিত্র ইহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। প্রথমেই সংযোজিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের একখানি সুন্দর রঙীন চিত্র। বার্ষিকী খানির বহুল প্রচার হইবে নিঃসন্দেহ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাজে মেয়ে—ত্রয়াঙ্ক নাটক। শ্রীঅনাথগোপাল সেন। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

অস্কার ওয়াইল্ডের "এ উওম্যান্ অব নো ইম্পরটান্স" নাটকের সুন্দর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক নাটকের ঘটনাস্থল এবং পাত্রপাত্রীদের নাম বিদেশী না রাখিয়া বাংলা করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে রসের হানি হয় নাই। দার্জিলিংবিহারী ধনিসমাজে বিদেশী নরনারীরা বেমালুম এদেশী বনিয়া গিয়াছে। নাটকের আখ্যান বিস্তৃত নহে, কিন্তু অল্পের মধ্যেই শ্রমবিমুখ প্রচুর অবসর-ভোগী, কৃত্রিমতাসর্ব্বস্ব এক শ্রেণীর ধনীর জীবন-যাত্রা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের কথোপকথন অতি মনোরম, কৌতুকোজ্জ্বল, ব্যঞ্জনাময়, বুদ্ধিদীপ্ত। বর্ণিত ধনিসম্প্রদায়টির কেহ বা নীতির একমাত্র ধারক ও রক্ষক সাজিয়া পদে পদে নাসিকা কুঞ্চন করেন, কেহ বা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নীতি লঙ্ঘন করিতেই ভালবাসেন, আর কেহবা চটকদার কথা বলিয়া বাহবা লইতে ব্যস্ত। কত রকমের ছলনা যে এই প্রাণহীন সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, নাট্যকার তাহা সুনিপুণ ভাবে দেখাইয়াছেন।
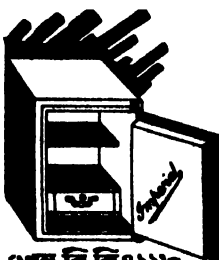
অনুবাদ বলিষ্ঠ ও সাবলীল। বিষয়বস্তু উপভোগ্য এবং অনুধাবন-যোগ্য।

ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সংহতি পাবলিশিং হাউস। ৭ মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

গ্রন্থখানি ৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত: সঙ্গীতানুরাগী শরৎচন্দ্র, চিত্রাঙ্কনানুরাগী শরৎচন্দ্র, রহস্যপ্রিয় শরৎচন্দ্র, দরদী শরৎচন্দ্র, অধ্যয়নানুরাগী শরৎচন্দ্র, সাহিত্যসাধক শরৎচন্দ্র, সমাজতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র এবং পরিশিষ্ট। সাহিত্যগুণে গ্রন্থখানি উচ্চাঙ্গের নহে, কিন্তু ইহা হইতে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসকালের কতকগুলি ঘটনা জানা যায় এবং তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

আকাশগঙ্গা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতী ভবন, ১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা ও দুই টাকা।

স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অমৃতপ্রবাহ বহিয়া আসিতেছে। সেই অমৃতধারায় অবগাহন করেন—যিনি প্রকৃত কবি। নির্ম্মলচন্দ্র প্রকৃত কবিপ্রতিভার অধিকারী। 'আকাশগঙ্গা' তাঁহার প্রথম কাব্য হইলেও রূপে, রসে পরিণত। তাঁহার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-চেতনার স্পর্শে 'সকলি অমিয় জল'। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "তোমার এই কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দ অনুভব করলুম। এর ভাষা এবং এর ভাব মনে করিয়ে দেয় আমাদের কালের সেই সত্যযুগকে যে যুগে কাব্যভারতীকে ব্যঙ্গ করবার মতন স্পর্দ্ধা কোথাও ছিল না, যেকালে আনন্দভোজের সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে দেওয়াই বাস্তবতার লক্ষণ বলে গণ্য হত নি।" সত্যই এমন সরস মধুর কবিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া আজিকার দিনে বিরলসৌভাগ্য। ছন্দঃ, শব্দগ্রন্থনের নৈপুণ্য এবং অনুভূতির গভীরতা একত্র মিলিয়া কবিতাগুলিকে অপরূপ সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

> "হের দূরে গাছ কঙ্কালসার আকার
> ক্ষুধাতুর ক্রুর কালো কালো তারি শাখার
> আঙুলের চাপে
> থেকে থেকে কাঁপে
> আকাশের রাঙা হিয়া
> হের, অঞ্জলি ভরি' দুঃসাহসী কে আগুন ধরেছে প্রিয়া"

বর্ণনাভঙ্গীর নূতনত্ব বিস্ময়কর। প্রাকৃতিক চিত্র অপেক্ষা সম্ভবতঃ মনোরহস্যের প্রতি কবির আকর্ষণ বেশী; অধিকাংশ কবিতাতেই জীবনের সুখদুঃখকে ঘিরিয়া আছে মায়াময়ী প্রকৃতি। কিন্তু চিত্রণ-নৈপুণ্য তাঁহার অসাধারণ। 'চৈত্রশ্রী' এবং 'অবসর' তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'প্রত্যূষ', 'রাগসন্ধ্যা', 'আগুনে পুড়ে লাল' এবং 'সকলি অমিয় জল' আমার বিশেষ করিয়া ভালো লাগিল। 'ভাড়াটিয়া গাড়ী'তে শহরের একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়াছে। অনুবাদ কবিতা তিনটি নিখুঁত। 'বৃষ্টির গান' মৌলিক রচনার মতই সাবলীল ও অনুভূতিময়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্র-পরিচয়

টোড়ী বা টৌড়ী রাগিণীবিশেষ। দিবসের প্রথম যামে ইহা গীত হয়। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার ধ্যান এইরূপ আছে,—

"তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ
কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে
বীণাধরা রাজতি টোড়িকেয়ং॥"
("সঙ্গীত দর্পণ", ২।৫৩)

"টোড়ী" চিত্রে এই ধ্যানমূর্তিকেই চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে রূপদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

—

চিত্র-স্বীকৃতি

গত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৬৬০ পৃষ্ঠার সম্মুখে 'রবীন্দ্রনাথ' (তাঁহার দণ্ডায়মান ভঙ্গীর শেষ চিত্র) এবং ৭০৯ পৃষ্ঠার সম্মুখে 'উত্তরায়ণ—শান্তিনিকেতন' ও 'উদ্যান—উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন' নামে যে তিনখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ফোটোগুলি ১৯৪১ সনের মার্চ মাসে ফোটো এটেলিয়ার কোম্পানীর পক্ষে শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্তৃক শান্তিনিকেতনে গৃহীত। উপেন্দ্রবাবু আলোক-চিত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

ঐ সংখ্যার ৭০৮ ও ৭০৯ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী "শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী শিক্ষকতায় ব্যাপৃত—কবি পার্শ্বে উপবিষ্ট" এবং ৭৪৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে "শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এই চিত্র দুইখানি শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ঐ সংখ্যার ৭০৮ ও ৭০৯ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহাকে ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক 'ভারতভাস্কর' উপাধি প্রদান সম্পৃক্ত চিত্র দুইখানি এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পার্শ্বে ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর' চিত্রখানি ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরের সৌজন্যে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসুর মারফত প্রাপ্ত।

ঐ সংখ্যার ৭৪৯ পৃষ্ঠার সম্মুখে "শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ" চিত্রখানি শান্তিনিকেতন কলাভবনের সংগ্রহ হইতে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—

বর্ত্তমান কার্ত্তিক সংখ্যার গোড়ায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র-নাথ অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের বহুবর্ণ চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অলোক ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কবির কৈশোর ও যৌবনের দশখানি আলোকচিত্র শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান সংখ্যায় কবির স্বহস্ত-লিখিত জীবন-বৃত্তান্ত-মূলক পত্রের যে প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত পদ্মিনীমোহন নিয়োগীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। পদ্মিনীবাবু তখন 'বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে ময়মন-সিংহের জমিদার শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর এষ্টেটের ম্যানেজার।

কবির প্রথমা কন্যার চিত্রটি শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে গৃহীত চিত্র এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর শান্তিনিকেতনে অভিনন্দন-উৎসবের চিত্র দুই খানি শ্রীযুক্তা সুপ্রভা রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কবির পঞ্চাশৎ বৎসরে অভিনন্দন-দানের সময়কার চিত্র, সুরুলে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত চিত্র, চীন দেশে কবির চিত্রাবলী, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন হুরলিমান গৃহীত চিত্র, কবির জয়সিংহ ভূমিকার এবং অন্ধ বাউল ও কবিশেখর ভূমিকার চিত্র শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কবির ১৯১৪ সালে সুরুলে গৃহীত চিত্র ও চীন যাত্রার চিত্রদ্বয় শ্রীযুক্তা অরুন্ধতী দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রপৌত্র সুপ্রিয়ের চিত্র শ্রীযুক্ত সুবীরকুমার ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কবির শান্তিনিকেতন হইতে শেষযাত্রার চিত্র শ্রীযুক্ত মাসোজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—

ভ্রম-সংশোধন :—গত আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পুস্তক-পরিচয় বিভাগে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা'র সমালোচনায় কয়েকটি ভুল আছে। ৭৮১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে দ্বিতীয় প্যারা হইবে—"বর্ত্তমান জগতে এমন কোনও জীবিত মানুষের কথা আমরা জানি না......"

৭৮২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে সংস্কৃত পংক্তিটি হইবে :—"অমুত্র সন্নিহ বেখেতঃ সন্তানি পশুসি" "রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।" এই পংক্তিতে 'কবি' কথাটির পর উদ্ধৃতি-চিহ্ন শেষ হইবে।

আশ্বিনে প্রকাশিত "ব্ল্যাকবোর্ড" পুস্তকের পরিচয়ে পড়িতে হইবে :—"বইখানিতে সাতাশটি কৌতুক-তরল কবিতা আছে।" "সাতাশ" ছাপার ভুলে "সাত" হইয়াছে।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মালয়-কুমারী

শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
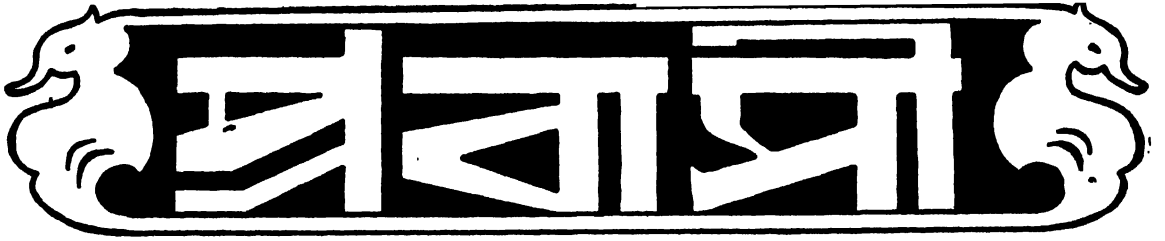
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

২য় সংখ্যা

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত

বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত

১

নায়িকা সঁ দুতি উক্তি

কণ্টক মাঁহ কুসুম পরগাসে।
বিকল ভমর নহিঁ পাবথ বাসে॥
ভমরা ভরমে রমে সভ ঠামেঁ।
তুঅ বিনু মালতি নহিঁ বিসরামে॥
ও মধুজীব তোঁহেঁ মধুরাসে।
সংচি ধরিএ মধু মনহিঁ লজা সে॥
আপন হুঁ মন দয় বুঝু অবগাহে।
ভমর মরত বধ লাগত কাহে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তোঁ পয় জীবে।
অধর সুধা রস জোঁ পয় পীবে

কণ্টক মাঝারে কুসুম পরকাশ।
বিকল ভ্রমর সেথা নাহি পায় বাস॥
ভরম ভরে ভ্রমর রমিছে নানা ঠাঁই।
তুহু বিনা হে মালতী বিশ্রাম নাই॥
ও যে মধুজীবী তোমার মধু চায়।
সঞ্চিত রেখেছ মধু মনের লজ্জায়॥
আপনার মন দিয়া বুঝ সুবিচারে।
ভমর বধের দায় লাগিবে তোমারে॥
বিদ্যাপতি ভণয়ে তখনি পাবে প্রাণ।
অধর পীযূষ রস যদি করে পান॥

২

সখী সঁ সখী উক্তি

অপ্পন কাজ কওন নহিঁ বন্ধ। * * * ॥ (১)
\+ + + +
আরতি অরতন আবয় পাস। অছইত বস্তু ন করিঅ নিরাস॥
\+ + + +
* * *। বড় অনুরোধ বড়া পয় রাখ॥

আপন কাজ কে না করে।
* * *॥
আরতি অর্থাৎ প্রেম আশ্রয়ের জন্য পাশে
যে আসে,
বস্তু থাকিতে তাহাকে নিরাশ করিও না।
* * *।
বড়র অনুরোধ বড়তেই রাখে॥

টীকা
(১) তারা-চিহ্নিত অংশের বঙ্গানুবাদ কবি করেন নাই

৩

নায়িকা সঁ সখী উক্তি

\+ + + +

* * *। বেকতয় হৃদয় লুকাবয় লাজ ॥

\+ + + +

* * *। এক সর মনমথ দুই জিব মার ॥

* * *।

হৃদয় ব্যক্ত করে লজ্জা লুকায় ॥

* * *।

মন্মথ এক শর দুহু প্রাণে মারে ॥

৪

নায়িকা সঁ নায়ক বচন

\+ + + +

কৈ বেরি কাটি বনাওল নব কয়, * * *।

\+ + + +

* * * ঈ সভ লছমি সমানে।

কত বার কাটিয়া নূতন করিয়া বানাইল, * * *।

* * * এ সকল (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) লক্ষ্মীর সমান।

৫

নায়ক সঁ দূতি বচন

\+ + +

তুঅ অভিসার কয়লি জত সুংদরি,

কামিনি করু কে আনে ॥

\+ + +

দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজংগ পতি,

জসু মন পরম তরাসে।

সে সুবদনি কর ঝপইতি ফণি মণি,

বিহুসি আইলি তুঅ পাসে ॥

\+ + +

কাম প্রেম দুহু এক মত ভয় রহ,

কখনে কী ন করাবে ॥

সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে,

এত আর কে করিয়াছে ?

ভবন'ভিত্তিতে লিখিত ভুজঙ্গপতি দেখিয়া,

যার মন পরম ত্রাসিত হয়।

সেই সুবদনী ফণিমণি করে ঢাকিয়া,

হাসিয়া তোমার কাছে আসিল ॥

(করে ফণিমণি ঢাকিবার তাৎপর্য্য বোধ করি এইরূপ হইবে যে, পাছে ফণিমণির আলোকে দেখা যায়, গোপন অভিসারে ব্যাঘাত করে।)১

কাম প্রেম উভয়ে যদি এক মত হইয়া থাকে,

তবে কখন কি না করাবে ॥

টীকা

(১) কবি এই স্থলে ইহার অনুরূপোক্তি গোবিন্দদাসের একটি পদের পঙ্‌ক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—"ভিতিক (ভিত্তির) চীত, পুতলি হেরি যো ধনি, চমকি চমকি ঘন কাঁপ। অব আঁধিয়ারে, আপন তনু ঝাঁপই, কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ। গোবিন্দদাসের পঙ্‌ক্তিদ্বয় এইরূপ ;—"ভীতক চিত্র, ভুজগ হেরি যো ধনী, চমকি চমকি ঘন কাঁপ ॥ অব...ঝাঁপ।

৬

নায়ক সঁ দূতি উক্তি

মাধব আব ন জীউতি রাহী।

জতবা জনিকর লেনেঁ ছলি সুন্দরি,

সে সভ সোপলক তাহী ॥

\+ + +

তোহর সিনেহ জীব দয় জাপথি,

রংলিহি ধনি এত লাগি ॥

মাধব রাধা আর বাঁচে না, যাহার কাছ হইতে যাহা সে ছলিয়া লইয়াছিল, তাহাকে তাহা সে সমর্পণ করিতেছে।

তোমার স্নেহ জপিয়া জীবন ধরিয়া আছে, ধনি ইহারই লাগি রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

টীকা

(১) 'বঙ্গীয়শব্দকোষে'র নিমিত্ত মৈথিল শব্দ-সকলনের সময়ে, আমি Grierson সাহেবের সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল উৎকৃষ্টপদাবলী-সংগ্রহ (Maithil Chrestomathy) ও পদাবলীতে ব্যবহৃত 'মৈথিল শব্দ-মালা' (Maithil Chrestomathy Vocabulary) পড়িয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙলায় গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সকল স্থলে সম্পূর্ণ পদের নাই—কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অনুবাদ আছে। মাননীয় 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় আশ্বিনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের রচনাদি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সাধারণের নিকটে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তদনুসারে কবির সেই গদ্য ও পদ্য অনুবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র

[ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত]

আলমোড়া

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

আলমোড়ায় আসিয়া আমার কন্যার শরীর কতকটা ভাল আছে। কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। এখনো প্রত্যহ জ্বর আসিতেছে।

এদিকে আমার বিদ্যালয়ের জন্য সর্ব্বদাই আমার চিত্ত উদ্বিগ্ন আছে। সেই জন্য কাল এখান হইতে কিছু কালের জন্য আমি রওনা হইতেছি। কলিকাতায় কিছু কাল কাটাইয়া বোলপুরে যাইব।

মহারাজকে এখান হইতে একজোড়া ভাল চমরীপুচ্ছ পাঠাইয়াছি পাইয়াছেন কিনা খবর পাই নাই। যতীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়ো। তাহাকে বলিয়ো সে যেন আমাকে কলিকাতায় পত্র লেখে।

ঈশ্বর নিয়ত তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। শুভৈষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু—

বোলপুর ঘুরিয়া তোমার পত্র আমার হাতে আজ আসিয়া পৌঁছিল—পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

তুমি যে বিষয়ে লিখিয়াছ যতীর মুখে আমি তাহা আভাসে মাত্র শুনিয়াছিলাম এবং শুনিয়াও আমি তোমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হই নাই। আজ তোমার পত্র পড়িয়া জানিলাম যে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে যথার্থ কর্ত্তব্য পালন হইয়াছে—এরূপ না হইলে অন্যায় অবিচার হইত এবং সমাজ তোমাকে নিন্দা না করিলেও তুমি ধর্ম্মে পতিত হইতে। সেই জন্যই তোমার চিঠিখানি পড়িয়া আমার হৃদয় বড়ই স্নিগ্ধ হইল—তুমি যখন ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আছ ঈশ্বর তোমাকে কখনও দুর্ব্বল করিবেন না—তিনি তোমার মঙ্গল করিবেনই—তিনি সুখেও তোমার মঙ্গল করিবেন, দুঃখেও তোমার মঙ্গল করিবেন। তোমার মঙ্গল তোমার জীবনে তোমার অন্তরে ঘটিবে। আমি আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তুমি সংসারের সমস্ত ভালয় মন্দয় সমস্ত লাভে ক্ষতিতে মনুষ্যত্বের পরম সার্থকতা লাভ কর—তোমার অন্তর্যামীর প্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে তুমি ধন্য হও।

আমি পদ্মার উপরেই সপরিজনে বাস করিতেছি। শরীর মন সুস্থই আছে। মনে করিয়াছি আগামী বৈশাখে এখান হইতে বোলপুরে যাইব। আজ মহিমের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে ঢোলপুরের সেই কন্যাটির সহিত শীঘ্রই তোমার বিবাহ হইবে। ঈশ্বর তোমাদের মিলনকে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণময় করুন এই আমি একান্তমনে প্রার্থনা করি। ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩১৪ শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরম কল্যাণীয়েষু—

তুমি ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ এই জন্য পণ করিয়াছিলাম যে কখনো সেখানকার কোনো কাজের জন্য কোনো কর্ম্মপ্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তোমার কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে বিঘ্ন আনয়ন করিব না। সে পণ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাঙিতে হইল। তোমাদের ওখানে একজন জজের পদ খালি হইয়াছে। সম্ভবতঃ তোমরা কোনো বৃদ্ধ পেন্‌সন্‌জীবী * * * জীবকে রাখিবে এবং তৎপরে চিরদিন অনুতাপ করিবে। যদি সেরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা না থাকে এবং যদি অল্পবয়স্ক, উদ্যমশীল, আইনজ্ঞ সজ্জনের স্থান থাকে তবে আমি পত্রবাহক * *কে তোমার অবগতিগোচর করাইতে চাই। ইনি বুদ্ধিমান এবং * দশ বৎসর ওকালতি করিয়াছেন কিন্তু যে সদ্‌গুণ থাকিলে ওকালতিতে প্রতিষ্ঠালাভ করা কঠিন, ইঁহার তাহা বহুল পরিমাণে আছে বলিয়াই ইনি অন্য ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতেছেন। বিচারকের কাজ ইঁহার দ্বারা যে ভালরূপ চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি তোমাকে যখন কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ করিব তখন একথা কোনো মতেই মনে করিয়ো না যে, যে-করিয়াই হউক অনুরোধ পালন করিতে হইবে। কর্ম্মের সুবিধা বুঝিয়া সকল দিক বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবে। তবে একথা নিশ্চয় জানিবে যাঁহার সততা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিগ্ধ না হইব তাঁহার সম্বন্ধে আমি কখনই তোমার নিকট অনুরোধ করিব না।

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিন। ঈশ্বর তোমার কর্ত্তব্যক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিয়াছেন, আমি আশীর্ব্বাদ করি তিনি তোমার শক্তিকে উদ্বোধিত করুন এবং তোমার সমস্ত শুভ ইচ্ছাকে তিনি সকল বাধার উপরে জয়ী করিয়া দিন। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩১৫

একান্ত শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহারাজকুমার বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী পদে থাকাকালে লিখিত।

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু—

তোমার এই পরম দুঃসময়ে তোমার ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসিত হৃদয়েনাপরাজিতা—

সুখই হউক দুঃখই হউক প্রিয় হউক অপ্রিয়ই হউক যখন তাহা উপস্থিত হইবে তখন অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে গ্রহণ করিবে, আমাদের শাস্ত্রের এই উপদেশ। তোমার মনে সেই শক্তি আছে—তুমি সকল অবস্থাতেই অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, ইহা নিশ্চয় জানি বলিয়া আমার মন তোমার সম্বন্ধে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন আছে।

এখন তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ যে, ত্রিপুরার রাজ্যভার যাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে কায়-মনোবাক্যে তাঁহার আনুকূল্যে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে—কারণ, তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ তোমাদের সকলের কল্যাণ। রাজ-সিংহাসনের চারিদিকে অনেক শত্রু আছে, এই সময়ে তোমাদের নূতন রাজাকে তাহাদের কপট বন্ধুতা হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এক্ষণে তুমিই তাঁহার সকলের

চেয়ে নিকটতম আত্মীয়—তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মঙ্গল সম্বন্ধ যেন কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন না হয়—তাহা হইলে বাহিরের শত্রুরা সুযোগ পাইয়া বসিবে। তাহারা তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাহাদের সেরূপ কুচক্রান্ত যেন কোনোদিন সফল না হয়—তোমার অবিচলিত হিতৈষিতার প্রতি রাজার মনে কেহ যেন কোনো দিন সন্দেহ না জন্মাইতে পারে—তোমার স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা সততার দ্বারা তুমি যেন সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের উপরে জয়ী হইয়া তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনে তোমার শক্তিকে নিযুক্ত করিতে পার।

তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে অত্যন্ত সহিষ্ণু হইতে হইবে। ঘটনাক্রমে অনেক অন্যায় অবিচারও তোমাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবে—তখন তোমার তেজস্বিতা যেন তোমাকে আত্মবিস্মৃত না করে। নীরবে অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইবে—নিজের দিকে না তাকাইয়া নিজের কর্ত্তব্যের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদের রাজাকে ও রাজ্যকে যাহাতে কোনো প্রকার দুর্ব্বলতা আক্রমণ করিতে না পারে—ক্রমে ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া যাহাতে সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে পার সে জন্য তোমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। হঠাৎ যাহাতে কোনো বিপ্লব বাধিয়া না উঠে, সে জন্যও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক হইবে। আমার একান্ত মনের কামনা এই যে, রাজার সঙ্গে তুমি অভিন্নহৃদয় হইয়া ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে লইয়া যাও। তুমি যদি তোমার সমস্ত শক্তি তাঁহার আনুকূল্যে নিযুক্ত করিবার সুযোগ পাও তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গল হইবে। তোমার পিতা ও পিতামহের নিকট অকৃত্রিম স্নেহের ঋণে আবদ্ধ হইয়া আছি সেই জন্যে তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ সম্বন্ধে কোনোদিন আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। দূরে থাকিয়াও আমি ত্রিপুরার মঙ্গল কামনায় বিরত থাকিব না। যখন দেখিব তোমরা দুই ভ্রাতায় দৃঢ় ভাবে মিলিত হইয়া তোমাদের সিংহাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছ—দেখিব তোমাদের রাজকোষ সচ্ছল, তোমাদের প্রজাগণ সুখী, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং সিংহাসনের চারিদিকে কোনো কলুষ নাই তখন আমার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হইবে। তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ, সুখে দুঃখে ঈশ্বর তোমাকে মঙ্গলে দৃঢ় রাখুন, কর্ত্তব্যে অটল করুন। ইতি ১০ই চৈত্র ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু—

তুমি যে সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছ তাহা সিদ্ধ হউক্ আমি একান্ত মনে এই কামনা করি। আশুকে* মধ্যবর্ত্তীরূপে লইয়াছ ইহাও ঠিক হইয়াছে। তোমাদের এই সঙ্কট কাটিয়া গেলেই তোমরা জোরের সহিত কাজ করিতে পারিবে—রাজ্যের সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে কোনো বাধা থাকিবে না। যেমন করিয়া হোক কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই কাজটা সারিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

* স্যর আশুতোষ চৌধুরী।

প্রাইভেট সেক্রেটরী পদ গ্রহণ করিবার পর মহারাজকুমার বাহাদুরের প্রাথমিক কার্য্য হইয়াছিল—আত্মীয় স্বজনবর্গকে একত্র করা। মহারাজকুমার এই সময়ে কলিকাতা গিয়াছিলেন "বড়ঠাকুর" মহারাজকুমার সমরেন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুরের সহিত প্রীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত। "বড়ঠাকুর" বাহাদুর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন যাবৎ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকেই পুনরায় পারিবারিক বন্ধনে আনয়ন করেন। 'বড়ঠাকুর' বাহাদুর একজন বিশিষ্ট শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

তোমার পত্র পড়িয়াই ইচ্ছা হইতেছিল একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। কিন্তু প্রথমত এখানে নানা কাজে আবদ্ধ আছি—দ্বিতীয়ত আমি এ সময়ে তোমার কাছে গেলেই লোকে কল্পনা করিবে তোমাদের রাজকার্য্যে আমি নিজেকে জড়িত করিতেছি এবং তাহাই লইয়া নানা কথার সৃষ্টি করিবে। এখনকার দিনে কাহারও মনে কোনো অমূলক সংশয় না জন্মানই শ্রেয়। আমিও আজকাল কাজের জালে জড়িত হইবার অবস্থায় নাই—আমার এই বিদ্যালয়টিই একমাত্র কাজ—ঈশ্বর করুন এই কাজের দ্বারাই তাঁহার কাজ সম্পন্ন করিতে পারি। কিন্তু একথা মনে নিশ্চয় জানিয়ো তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার মন সর্ব্বদাই উৎসুক হইয়া আছে। ঈশ্বর তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ করুন অনেক দিন হইতে এই কামনা আমার মনে জাগিয়া আছে—তোমার পিতা ও পিতামহের অহেতুক বন্ধুত্ব আমি কদাচ ভুলিব না—তাহার পরে যেদিন হইতে তোমাকে জানি তোমার প্রতি আমার স্নেহ ক্রমশই প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে। তোমার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের মধ্যে এই আশ্বাস দৃঢ় আছে সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই তোমার ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন—তোমার ভয় নাই তোমার পরাজয় নাই—তোমাকে কখনই অসত্য ও অন্যায় পরাভূত করিতে পারিবে না—অতএব ক্ষতি লাভ সম্পদ বিপদ সকল অবস্থায় সকল ঘটনাতেই তোমার আত্মাকে তুমি অপরাজিত রাখিবে। তোমরা দুই ভ্রাতায় অভেদাত্মা হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যকে কল্যাণে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত কর এই আমি একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করি।

তোমার দাদাকে উপদেশ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। পাইয়াছেন কি?

ঈশ্বর তোমাদের কুশলে রক্ষা করুন। ইতি ২৬শে চৈত্র ১৩১৫

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রয়োজন হইলে রমণীমোহনেরন্ন পরামর্শ গ্রহণ করিয়ো।

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

নববর্ষের পত্রখানি পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি আজকাল সংসার হইতে ক্রমশই দূরে সরিয়া পড়িতেছি। রথী বিষয়কর্ম্মের ভার লইয়াছেন, সেদিক হইতে ঈশ্বর আমাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন—এখন আমি তাঁহারই দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছি—কখন তাঁর দরবারে আমার ডাক পড়িবে। আর কিছুতেই আমি ভাল করিয়া মন দিতে পারি না।

এবারে ছাত্র ও অধ্যাপকদের লইয়া ১লা বৈশাখের প্রত্যূষে ঈশ্বরের নাম লইয়া আমরা যে বৎসর আরম্ভ করিয়াছি তাঁহার প্রসাদে তাহা সার্থক হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে বড় আশা করিতেছি। আমাদের সেই বর্ষারম্ভের আনন্দ ও মঙ্গল, সেই একান্ত আত্মনিবেদনের আবেগ তোমাকেও স্পর্শ করুক এই আমার কামনা। তোমাদের সঙ্গে আমার বাহিরের দেখাশুনা ও যাতায়াতের সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু তোমার প্রতি আমার অন্তরের স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে। চিরদিনই আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। ঈশ্বর তোমার প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল উপকরণ দিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তোমার জীবনে প্রতিদিন তাহা সার্থক হইতে থাক্—সমস্ত সুখ দুঃখ ও লাভ

† রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়—এক সময়ে এ রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন।

ক্ষতির উর্দ্ধে তোমার মনুষ্যত্ব পুণ্যের তেজে দীপ্যমান হইয়া উঠুক্—তোমার প্রতি যে কর্ম্মেরই ভার পড়ুক তাহারই মধ্য হইতে তুমি ধর্ম্মের জ্যোতিকে প্রকাশ করিতে থাক। রাজকার্য্যের বহুতর গ্লানি তোমার অন্তরকে যেন স্পর্শ না করে, সেখানে তুমি নিয়ত মুক্ত ও পবিত্র থাকিয়া আপনার জীবনকে প্রতিদিন উপরের দিকে বিকশিত করিতে থাক এই আমার একান্ত মনের কামনা।

স্বর্গীয় মহারাজ বর্ত্তমান থাকিতে প্রতি বৎসর পূজার ছুটির পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের বার্ষিক দান পাঠাইতেন। কেবলমাত্র গত বৎসরই তাহা পাওয়া যায় নাই। যদি এই টাকাটা দেওয়া সম্ভব হয় তবে বিশেষ উপকার হইবে। কারণ, ছাত্রদের জন্য নূতন গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে অনেক ব্যয় করিতে হইতেছে। ছাত্র এখন ১২০ জন—আর স্থান দিতে পারিতেছি না। তোমাদের স্বর্গীয় পিতার দানেই দুঃসময়ের সমস্ত আঘাত কাটাইয়া এই বিদ্যালয় আজ এত দূর উন্নতি করিতে পারিয়াছে—নহিলে ইহা কখনই এত দিন রক্ষা পাইত না। এই দানের সূত্রে তোমাদের সঙ্গে আমার শুভানুষ্ঠানের যোগ থাকে এই আমার ইচ্ছা। পূর্ব্বের ন্যায় এখন অভাব তেমন প্রবল নাই—সাহায্য হিসাবে টাকার এখন তত অধিক প্রয়োজন নাই—কিন্তু এ কথা মনে স্থির জানিয়ো তোমাদের স্বর্গীয় পিতার এই দানটি যদি রক্ষা কর তবে তাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল আছে।

ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। ইতি ৮ই বৈশাখ ১৩১৭

একান্ত শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পরম কল্যাণীয়েষু,

আমার শরীর মন কিছু দিন হইতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য নিজের পরিবেষ্টন হইতে কিছুকালের মত সুদূরে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে। তাই বিলাত হইয়া ক্রমে আমেরিকা ও জাপান ঘুরিয়া পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম তোমাকেও আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ডাকিব। সে আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় হইত। কিন্তু আমি জানি তোমার অসংখ্য বাধা; সেই জন্য প্রস্তাবটা উত্থাপন করিতেও নিরস্ত হইলাম। শীতকালটা ফ্রান্সের দক্ষিণে কোন সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকিয়া বসন্তের আরম্ভে ইংলণ্ডে যাইব। তাহার পরে যেমন ভাল লাগে সেই অনুসারে ভ্রমণের সংকল্প স্থির করিব। আমার সঙ্গে রথী ও বৌমাও যাইতেছেন। যদি ইচ্ছা হয় ও বিঘ্ন না থাকে তবে তুমি গেলে তোমার শরীর যে বেশ ভাল হইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, চিন্তা করিয়া দেখিয়ো।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে এবং বৌমাকেও জানাইবে। ইতি ২৩শে আশ্বিন ১৩১৮

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ বিদ্যালয়ের বার্ষিকের জন্য কি বিদ্যালয় হইতে মহারাজকে পত্র লেখা আবশ্যক? না, সে সম্বন্ধে কোনো বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গিয়াছে?

ওঁ

পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি বোধ হয় জান সাহিত্য-পরিষদ হইতে আমার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন কিছু দিন হইতে চলিতেছে। আমি তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া বিলাত পালাইবার উদ্যোগ করিতেছি শুনিয়া কাল তাঁহারা দলেবলে আমার পথরোধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কোনো মতেই আমাকে নবেম্বরের শেষে ছাড়া ছাড়িয়া দিতে চান না। কিন্তু ডিসেম্বরের আরম্ভে বিলাত যাত্রার চেষ্টা বাতুলতা - অতএব ফাল্গুনের পূর্ব্বে আমার যাত্রা সম্ভবপর হইবে না। এই খবরটা তোমাকে জানাইবার কারণ এই যে মনে বড় আশা রহিল যে সে সময়ে হয়তো কোনো উপায়ে তোমাকে ভ্রমণের সঙ্গীরূপে পাওয়া যাইতে পারে। এখন হইতে যদি মন স্থির কর ও পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হও তবে হয়ত সে সময়ে বাহির হইয়া পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইতেও পারে। একবার এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারিলে তোমার শরীর মনের যথেষ্ট উন্নতি হইবে ইহা আমি নিশ্চয় জানি—এই জন্য আমি এত আগ্রহ অনুভব করিতেছি।

বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়ো, আশা করি তাঁহার শরীর এখন সুস্থ হইয়াছে। ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১৮ স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

এ পর্য্যন্ত দেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। সমুদ্র প্রশান্ত ছিল এবং আমরা কোনো প্রকার কষ্ট পাই নাই। সোমেন্দ্রের* হঠাৎ পরশু জ্বর হইয়াছিল কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

সমুদ্রযাত্রা কাল আমাদের সমাধা হইবে। কাল প্রাতে মার্সেল্‌সে পৌঁছিব, কালই ট্রেনে করিয়া রওনা হইব এবং পরশু লণ্ডনে পৌঁছিতে পারিব।

আমার বার বার কেবল এই কথা মনে হয় যে তুমি যদি দুই এক বৎসরের মত একবার য়ুরোপে ভ্রমণ করিয়া যাইতে পার তবে তোমার বিস্তর উপকার হয়। ইহাকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিয়ো না—যেমন করিয়া পার একবার এদিকটা ঘুরিয়া যাইতে হইবে।

সোমেন্দ্র যাহাতে তোমাদের রাজ্যের কাজে লাগে এমন একটা শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তোমাদের রাজ্যে বিস্তর অরণ্য পড়িয়া রহিয়াছে। কাজে লাগাইতে পারিলে তাহা বিশেষ লাভবান সম্পত্তি হইয়া উঠিবে। এই জন্য সোমেন্দ্রকে Forestry শেখানো যাইতে পারে। শুনিয়াছি তোমাদের রাজ্যে ভাল Keoline মাটি বাহির হইয়াছে—সোমেন্দ্র যদি Ceramics শিখিয়া আসে তবে এই মাটি কাজে লাগিতে পারিবে। কিন্তু ইহার কলকারখানা বহুব্যয়সাধ্য। এ সম্বন্ধে যদি তুমি কিছু চিন্তা করিয়া থাক আমাকে জানাইবে।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইতি ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। হার্ভাডের এম্-এ। ত্রিপুরার কৃতী যুবক ছিলেন। তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে তুফান এক্স্‌প্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে লেখা।

ওঁ

C-o. Messrs. Thomas Cook & Son.
Ludgate Circus, London.
Butterton Vicarage, New Castle,
Staffordshire.

৬ আগষ্ট, ১৯১২

পরম কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সোমেন্দ্রের শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ সেইরূপই হইবে। উহাকে Ceramics শিক্ষাতেই প্রবৃত্ত করিয়া দিব। তোমাদের ওখানে যখন উৎকৃষ্ট মাটি আছে তখন সেটাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা এখন হইতেই করা উচিত হইবে। সোমেন্দ্র সেপ্টেম্বরের আরম্ভেই আমেরিকায় রওনা হইবে। তাহার পূর্ব্বে জাহাজে স্থান পাওয়া যাইবে না—কারণ, এই সময়েই আমেরিকায় যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

এখানকার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে আমি সমাদর লাভ করিয়াছি—সে সংবাদ হয়ত ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছ। এ সময়ে তুমি এখানে উপস্থিত থাকিলে আমাদের এই সম্মানে আনন্দ লাভ করিতে পারিতে। এখানকার গুণী ও জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার আন্তরিক কামনা। ইতি

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোমেন্দ্র দেববর্ম্মার শিক্ষা সম্পর্কে। সমস্ত ব্যয় মহারাজ বহন করেন।

[ক্রমশঃ

বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকণা

রজনী প্রভাত হ'ল পাখী ওঠ জাগি,
আলোকের পথে চল অমৃতের লাগি।

[শ্রীমতী স্নেহসুধা গুপ্তকে লিখিত চিঠি হইতে।

সুখেতে আসক্তি যার, আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।
কঠিন বীর্য্যের তারে বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা॥

[শ্রীমতী স্নেহলীলা গুপ্তের খাতাপুস্তক হইতে।

লুকায়ে আছেন যিনি জগতের মাঝে,
আমি তাঁরে প্রকাশিব সংসারের কাজে।

[শ্রীমতী স্নেহশোভনা গুপ্তকে লিখিত চিঠি হইতে।

প্রতি পলকের দেওয়া-নেওয়া ফিরে ফিরে
রঙ দিয়ে যায় জীবনের স্রোতোনীরে।
ছায়ার তুলিকা তরঙ্গতটতলে
লেখন লিখিয়া লেখন মুছিয়া চলে॥

১১. ১০. ১৯৩৭

[শ্রীমতী অনুভা বিশীর খাতা-সংগ্রহ হইতে।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনকে লিখিত পত্র।]

ওঁ

Dartington Hall
Totnes

কল্যাণীয়াসু,

কিরণ, আমার জন্মদিনে তোমরা যে চিঠি লিখেছিলে সেটা আজ পেলুম। এত দিনে আশ্রমের আকাশে আষাঢ়ের ঘনঘটা। দূরের থেকে যেন ধারাবর্ষণের শব্দ শুনতে পাচ্চি, আর কল্পনায় অনুভব করচি ভিজে বাতাসে মালতী ফুলের গন্ধ। যখন যাত্রা করে বেরিয়েছিলুম মনে ছিল ছুটির পরে ফিরব—কিন্তু প্রবাসের মেয়াদ বেড়ে চলেচে। যেহেতু এবারে বিশ্বভারতীর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েচি—বন্ধুরা বল্চেন অক্টোবরের পূর্ব্বে আমেরিকার ধনী গৃহস্থদের পাওয়া যাবে না। অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ অর্থাভাবে আমাদের সঙ্কল্প অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে বেড়ায়—কূল পায় না—তল পাওয়ার সম্ভাবনাই বেড়ে ওঠে। অর্থকৃচ্ছ্রের দীনতা সব চেয়ে স্থূল এবং হীন দীনতা—অন্নব্রহ্ম বিমুখ হলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই আত্মশ্রদ্ধা বিমুখ হয়ে যায়। তখন পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কলুষিত হতে থাকে। ভিক্ষার কাজ আমার নয় কিন্তু সকলের হয়ে ভিক্ষা আমি ছাড়া আর কে করবে? কত অপরিচিত ধনীর দ্বারে কত বাক্যজাল বিস্তার করতে হবে—তাদের দিক থেকে কত প্রশ্ন কত সংশয়, আমার দিক থেকে নতি স্বীকার। অর্থশালীরা স্বভাবতই অর্থের সার্থকতা হিসাব করে, নিজের ভাণ্ডারে তাদের যে টাকা সঞ্চিত সেটাকে বিবিধ উপায়ে সুরক্ষিত করে তবে তারা নিশ্চিন্ত হয়—পরের ভাণ্ডারেও যখন তাদের উদ্বৃত্তের একাংশ যায় তখনও সেটা সুরক্ষিত হোলো কিনা এ উদ্বেগ তাদের মনে থাকে। যদি বা আমার বর্ত্তমানকে তারা বিশ্বাস করে আমার অবর্ত্তমানকে তারা শূন্য বলেই জানে—তখন কী হবে এ প্রশ্ন তাদের মনে জাগে। একথা মনে করতে পারে না যা দিয়েছি তার পরে আর আসক্তি রাখা উচিত নয়। আমাকেই যারা ভালবেসে সম্পূর্ণ আগ্রহে দিতে পারে তাদের দান সম্বন্ধে আমার মনেও কোন সঙ্কোচের কারণ থাকে না। কিন্তু বিশ্বভারতীর নাম করে যখন বিশ্বের দ্বারে দাঁড়াই তখন দানকর্ত্তার যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সে উত্তর আমি নিজেই জানি নে। তারা থলির বন্ধন মোচন করবার পূর্ব্বেই নীরবে বা সরবে জিজ্ঞাসা করে বিশ্বভারতী দেশে ও কালে, ভাবে ও রূপে কতখানি সত্য। কেমন করে বলব? আমার ইচ্ছা ও আমার চেষ্টার মধ্যে যে সত্য আছে তাই আমি কিছু কিছু জানি—কিন্তু তার বাইরে কিছুই জানি নে। জানি বাধা বিস্তর আছে, আমার অবর্ত্তমানে সে বাধা ক্ষয় হবে কি বাড়বে তা কেমন করে বল্‌ব? আমাদের শুভ ইচ্ছাকে চিরস্থায়ী করতে চাই। সে আমাদের লোভ। শতসহস্র লোকের ইচ্ছার উপর তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। না, ঠিক বললুম না। অল্প লোকের সত্য ইচ্ছার পরেই তার

স্থায়িত্ব। অর্থাৎ পরিমাণের উপরে নয়, সত্যতার উপরে। কিন্তু সত্যই সবচেয়ে দুর্মূল্য—নানা প্রলোভন দিয়ে দল বাড়ানো যায় কিন্তু সত্য তাতে বাড়ে না। আমার বিপদ হয়েচে তাই—অর্থের প্রয়োজন আমি বুঝি। কিন্তু সে প্রয়োজন বাহ্য প্রয়োজন। যে পদার্থ আপনাতেই আপনি সার্থক সব ছেড়ে তারই জন্যে যদি একান্ত ভাবে তপস্যা করতুম তা হলে বাহ্য সফলতার দৈন্যের দিকে তাকিয়ে কোনো লজ্জা বা দুঃখের কারণ থাকত না। তার সাধনা ও তার সিদ্ধি আমার নিজের ভিতর থেকে। কিন্তু অন্য সমস্তর জন্যে যে প্রয়োজন আছে তাকে বাইরে থেকেই মেটাতে হয়। গোড়া থেকেই যদি তার জন্যে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করতুম তাহলে আজ এত বড় দুশ্ছেদ্য দৈন্যজালে আমাকে জড়িত হ'তে হ'ত না। যাই হোক, ভিক্ষা আমাকে করতেই হবে এবং ভিক্ষুককে অন্যের সময়েরই অপেক্ষা করতে হয়। এই মনে করে আমার মনে আক্ষেপ জন্মে যে আমার তো সময় বেশি নেই। এইটুকু সময়ও আমি সম্পূর্ণভাবে পাব না। কাজ করে অনেক সময় নষ্ট করেছি—বেলা শেষের বাকি সময়টুকু ভোগ করে সার্থক করতে ইচ্ছা করে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, আমার ভোগ সৃষ্টিতে—সে সৃষ্টিকে বুদ্ধিমান লোকে সৃষ্টিছাড়া বলেই জানে—বলে সময় নষ্ট করা। কিন্তু আমি বলি, তেমনি করেই সময় যদি নষ্ট না করি তাহলে সময় আমাকে নষ্ট করবে। বিধাতা অনাদি অনন্তকাল এমনি নষ্ট করেই আসচেন নিজেকে সার্থক করবার জন্যেই—তিনি নিরন্তর সৃষ্টি করে আসচেন কিন্তু সৃষ্টি ব্যতীত তার আর কোনো অর্থই নেই। ইতি ৬ জুন ১৯৩০

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীসীতা দেবী

২

অতিথির দল ত বাহির হইয়া পড়িলেন, যাইবার সময় খুব হুড়াহুড়ি করিয়াই তাঁহাদের যাইতে হইল, কারণ সময় হাতে অল্পই ছিল। আমরা সকলেই আশা করিতেছিলাম যে তাঁহারা ট্রেন ফেল করিবেন। যাত্রীরা বলদের বস্-এ উঠিলেন, তাঁহাদের মালপত্র চলিল গরুর গাড়ীতে। সে গাড়ীও আবার নানারকম উৎপাত সুরু করিল। কখনও রাস্তা ছাড়িয়া নালায় নামিয়া পড়ে, কখনও জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়। এক ভদ্রলোকের একটা বাক্স ভাজিয়া সব জিনিষপত্র রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িল। শেষে চতুষ্পদ বাহনগুলির আশা ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের ছেলের দলই গাড়ী ঠেলিতে আরম্ভ করিল, এবং তাঁহাদের ট্রেন ধরাইয়াও দিল।

বাকি দুপুরটা কিভাবে কাটানো যায়? নেপালবাবুকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠানো হইল; তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া "জীবনস্মৃতি"র বাকী অংশটুকু আমাদের শুনাইয়া যান। এইপ্রকার অনুরোধ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচও আমরা অনুভব করি নাই। কেমন করিয়া জানি না বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে, আমরা বয়সে ও বুদ্ধিতে ছোট বটে, কিন্তু তাঁহার চোখে ছোট নয়। ছোট বলিয়া সর্বদা

প্রশ্রয়ই পাইয়াছিলাম, অবজ্ঞা কখনও কোনওভাবে পাই নাই। যে অগাধ স্নেহ এই সদ্যপরিচিতা বালিকাগুলির উপর তিনি অজস্রধারে বর্ষণ করিতেন, তাহার তুলনা পাই না। এই অমূল্য দানের যোগ্য আমরা কেহই ছিলাম না, কিন্তু একমাত্র স্নেহই জগতে যোগ্যতার বিচার করে না।

কিন্তু দূত পাঠানোটা প্রথমবার বিফলই হইল। নেপালবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একদল ভদ্রলোক কবিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িতে একান্তই নারাজ। কিন্তু এত অল্পেই হাল ছাড়িবার মত মনোভাব আমাদের কাহারও ছিল না। অন্য অতিথিদের প্রতি অবিচার হইতেছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখাও প্রয়োজন বোধ করিলাম না। আবার দূত পাঠানো গেল, এবার সন্তোষবাবুকে। এবার রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন দেখিলাম, তবে সঙ্গে কয়েকজন ভদ্রলোকও আসিতেছেন। তাঁহারাই বা দখল ত্যাগ করিবেন কেন? তাঁহাদিগের ভিতর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

নেপালবাবু আমাদের শিশুকাল হইতেই জানেন, এলাহাবাদে আমরা বহুকাল একই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আদর করিয়া আমাকে "মা" বলিয়া ডাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। কবি আমাদের সামনে আসিয়া নেপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি, আপনার এখানে এসে মাতৃসম্মিলন হ'ল নাকি?" চারুচন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "উনি যে কেবল নেপালবাবুরই মা তা নয়, আমারও বটে।" সত্যই তিনি আমাকে স্নেহ করিয়া মা বলিয়া ডাকিতেন, এ স্নেহ তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তা'হলে আমিও একজন candidate হলাম।" বাবার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি যে ভারি ঘরে থেকেও দাবী ছেড়ে দিয়েছেন?" বাবা হাসিমুখে কি একটা উত্তর দিলেন। আমার মুখ দিয়া কোনও কথাই বাহির হইল না। কি যে বলা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া পাইলাম না।

"জীবনস্মৃতি" পাঠের আয়োজন হইতে লাগিল। বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, তবু ঘরে না ঢুকিয়া সকলে বারান্দায়ই বসিলাম। কয়েকজন বৃষ্টির ছাটে ভিজিতেছিলাম বলিয়া সস্নেহ তিরস্কার লাভ করিলাম, এবং সরিয়া আসিলাম। বৃষ্টি সমানে চলিল, পাঠও চলিল। "জীবনস্মৃতি"র সবটা সেদিনও শেষ হইল না। বর্ষার গান শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মনুষ্যোচিত দুর্ব্বলতা কখনও লক্ষ্য করিতাম না বলিয়া আমরাও ভাবিতে পারিতাম না যে তাঁহারও শ্রান্তিক্লান্তি কিছু থাকিতে পারে। গান শুনিবার আব্‌দার ধরিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। মধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু আসিয়া বলিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অতিথিরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা শান্তিনিকেতনকে শাস্তিনিকেতন বলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখানে আমার কোন অধিকার নেই, মেয়েরা যা বলবেন, তাই হবে।" আমরা অবশ্য অল্পবয়সের বিবেচনাহীনতায় তাঁহাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছুকই ছিলাম। কিন্তু তিনি অন্য অতিথিদের একেবারে বঞ্চিত করিলেন না। কয়েকটি বর্ষার গান গাহিয়া তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলেন। "বাদি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে" গানটি সেদিন প্রথম শুনিয়াছিলাম। শুনিলাম পুরুষদের আসরেও "জীবনস্মৃতি" রবীন্দ্রনাথ আর-একবার পড়িয়া শুনাইয়াছেন। দানে কখনও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। আকাশের সূর্য্যেরই মত তিনি অজস্রধারে কিরণ বর্ষণ করিতেন, উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিহীন কাহারও সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দেখিতাম না।

> "আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
> তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
> বাসিতে পারি যে ভালো।"

ইহা যেন তিনি নিজের সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন।

কবি চলিয়া যাইবার পর আমরা সকলেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেশীক্ষণ বাহিরে থাকি নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাড়ী এক রকম খালি, শুধু বাবা একলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সামনের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম রবীন্দ্রনাথ একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। অতিথিরা প্রায় সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন বোধ হয়। বাবার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি এই চাষাটির সঙ্গে আলাপ করুন, আমি ততক্ষণ নূতন আলাপ জমাবার চেষ্টা করি।" ঐ যুবকটি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, তিনি অল্পদিন হইল আমেরিকা হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। আগের দিনের অভিনয় সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিলেন, আমি উত্তরে কি যে বলিয়াছিলাম মনে নাই। বোধ হয় কিছুই বলি নাই। এমন সময় প্রশান্তচন্দ্রের একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের ভগিনীর হারাইয়া যাওয়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেলেন, যদিও তাঁহার নিজের যাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বালিকাটি অনতিবিলম্বে নিজেই ফিরিয়া আসিল, সে তাহার দাদা ও দিদির সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহাদের কিঞ্চিৎ বকুনি খাইতে হইল, এবং তখনই আবার কবিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইল। তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেশী দূর যান নাই, সুতরাং কিছু পরেই নীচু বাংলায় আবার ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সকলে বারান্দায় বসিলাম। গান শুনিবার আবেদন জানাইলাম, তাহা মঞ্জুরও হইল। "আসনতলে মাটির 'পরে লুটায়ে র'ব," গানটি সেইদিন তিনি গাহিয়াছিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া শান্তিনিকেতনের দিকে ফিরিয়া চলিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। সন্তোষবাবুরা তখন একটি ছোট পাকাবাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর ছাদের উপর গিয়া আর-একবার বসা হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথকে একটি বসিবার কার্পেট উপহার দিয়াছিল। সেইটি আনাইয়া তিনি আমাদের জন্য পাতিয়া দিতে বলিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে না বসিয়া ছাদের সিমেণ্টের উপরেই বসিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর একটি বালক আসিয়া খবর দিল যে নাট্যঘরে "কলির ভগীরথ" ও "বিনা পয়সার ভোজ" অভিনয় হইবে। সকলে দেখিতে গেলাম বটে, কিন্তু অভিনয় বিশেষ ভাল লাগিল না। সেই রাত্রেই অবশিষ্ট অতিথি যে ক'জন ছিলেন প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন, বিদ্যালয়ের ছেলেরাও পরদিন যাইবে বলিয়া শুনিলাম। আমরা ছাব্বিশে বৈশাখ, শেষরাত্রের ট্রেনে যাইব বলিয়া স্থির হইল।

মন অত্যন্ত মুষ্ড়াইয়া গেল। তিনদিনের পরিচয়েই যেন এখানকার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিলাম। এই বন্ধনে টান পড়িয়া অত্যন্ত একটা ক্লিষ্টতা মনকে অধিকার করিয়া বসিল। ইহা দুদিনের ক্ষণিক জিনিস ছিল না, তাহা ত এখন বুঝিতে পারি। মধ্যে মৃত্যু আসিয়াও এই বন্ধনের গ্রন্থি ত শিথিল করিতে পারিল না; পৃথিবীর মানুষ নশ্বর বটে, কিন্তু ভালবাসা অমর, এই বিশ্বাসই এখন আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়।

পরদিন সকালে ছেলেদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করিবেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। আমরাও সেখানে যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। ক্ষিতিমোহনবাবুকে তখন ছেলেরা "ঠাকুরদা" বলিয়া ডাকিত, প্রথম "রাজা" অভিনয়ে তিনি ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। শুনিলাম কাশীতেও তাঁহার "ঠাকুরদা" নাম চলিত ছিল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় শান্তিনিকেতনে আসিয়া এই নাম প্রচার করিয়া দেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর পত্নীরও ডাকনাম ছিল "ঠান্‌দি"। আমরা এখনও এই নামেই তাঁহাকে ডাকি। তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে যাইব স্থির করিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। ঠান্‌দি তখন নিজের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া মহাব্যস্ত। তাহারা সব ক'জন মিলিয়া দড়ির আল্‌না ছিঁড়িয়া, কলসীর জল উল্‌টাইয়া ফেলিয়া এবং নিজেরা জলের মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িয়া, জননীকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছিল। তাঁহার তখনও কিছু দেরি আছে দেখিয়া আমরা অন্যান্য অধ্যাপকদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া খোকাখুকীদের সঙ্গে ভাব করিয়া আসিলাম। শ্রীমান্ শান্তিদেব ঘোষকে তখন প্রথম দেখিয়াছিলাম বোধ হয়। কালো পাথরে খোদাই করা পুতুলের মত গোলগাল সুন্দর শিশুটিকে দেখিয়া সকলেই খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আগুন ধরিতে গিয়া তিনি তখন দুইটি কচি আঙুল পুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা আর পথপ্রদর্শিকার অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেরাই বাহির হইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া শান্তিনিকেতন ভবনের (বর্ত্তমান অতিথিশালার) সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ উপরেই আছেন। এই বাড়ীর নীচের তলায় তখন দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাস করিতেন। আমরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উপরেই উঠিয়া গেলাম। ইহার আগে সঙ্গে একজন কাহাকেও না লইয়া, সোজা কবিবরের দরবারে কখনও উপস্থিত হই নাই। কিন্তু তিন দিনের পরিচয়েই বুঝিয়াছিলাম আমরা গেলে তিনি বিরক্ত হইবেন না। উপরে উঠিয়া দেখিলাম তিনি গাড়ীবারান্দার ছাদে বসিয়া আছেন, পায়ের কাছে একটি বিড়াল। বুদ্ধিহীন পশুও যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির টানে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত, ইহা পরেও অনেকবার দেখিয়াছি।

আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। আমার একজন সঙ্গিনী একটি মালা নিজে গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথকে পরাইবার জন্ম। কিন্তু আঁচল হইতে বাহির করিতে গিয়া মালাটি জট পাকাইয়া গেল। পাছে মেয়েটি লজ্জা পায় এইজন্ম কবি হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া যেন বেড়াইবার উদ্দেশ্যেই ছাদের অন্ম দিকে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে মালার জট ছাড়িয়াছে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং মালাটি গ্রহণ করিলেন।

আমরা সকালের উপাসনায় উপস্থিত থাকিতে চাই শুনিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের নিয়ে একটু আলাদা উপাসনা করতে চাই, তোমাদের আমার কিছু বলবার ইচ্ছে আছে। আমি এখন আশ্রমের ছেলেদের বিদায় দিতে যাচ্ছি, তাদের নিয়ে উপাসনা শেষ হলেই তোমাদের ডাকব। আমি সন্তোষকে ব'লে যাচ্ছি, এইখানেই তোমাদের জলখাবার দিতে।"

তিনি চলিয়া গেলেন, কয়েক মিনিট পরে মন্দিরের ঘণ্টাটি গম্ভীর মন্দ্রে বাজিতে আরম্ভ করিল। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ঘণ্টা তিনি নিজেই বাজাইতেছেন। যতদিন দৈহিক সামর্থ্য অটুট ছিল, এই ঘণ্টা বাজানোর কাজটি তিনি নিজেই করিতেন।

আমরা সেই গাড়ী-বারান্দার ছাদে বসিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জলযোগাদি সেইখানেই সম্পন্ন হইল। খানিক পরে আমাদের ডাক পড়িল। বালিকাদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিলাম। উপাসনার পর আমরাও সজলচক্ষে নীচুবাংলায় ফিরিয়া আসিলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কবি আর-একবার অতিথিদের খবর লইতে আসিলেন। যে কয়দিন ছিলাম, কখনও একাজে তাঁহার অবহেলা দেখি নাই, সকলের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। তুচ্ছ বলিয়া কোন কিছুকে উপেক্ষা করিতেন না। এদিন আর গান বা পাঠ হইল না, বাবার সঙ্গে সাধারণ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। "গোরা" সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল।

রোদ পড়িলে পারুলবনে বেড়াইতে যাইবার একটা প্রস্তাব উঠিল। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই এ প্রস্তাবটা করিয়াছিলেন বোধ হয়। দিদি হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাকে গরুর গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ধরি, কিন্তু সকলে প্রস্তুত হইতে কিছু দেরি হইয়া গেল এবং শুনিলাম তিনি আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের সঙ্গেও অনেকে চলিলেন, তবে আমরা কয়েকজন কবিবরকে সঙ্গী পাইবার আশায় দ্রুতপদে হাঁটিয়া, সকলকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলাম। কিছুদূর গিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন মহিলা এবং বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। ছাত্রের দল আমাদের দেখিয়াই এক এক করিয়া পিছাইয়া গেলেন।

পথে চলিতে চলিতে নানা রকম হাস্য-পরিহাস হইতে লাগিল। সাধারণ কথাবার্ত্তার ভিতর রঙ ও রস ছড়াইবার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের যতখানি ছিল, এমন কখনও কাহারও মধ্যে দেখি নাই। একমাত্র ক্ষিতিমোহনবাবু এ-বিষয়ে তাঁহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ছোট ছোট কথা যেন আলোক-স্ফুলিঙ্গের মত ঠিকরাইয়া পড়িত। রবীন্দ্রনাথ নিজে গম্ভীর ভাবে বলিয়া যাইতেন, শ্রোতারা হাসিয়া আকুল হইত। তাঁহার সম্বন্ধে সকলের সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত অধিক থাকায় অন্যরা কেহ তাঁহার সামনে রসিকতা করার চেষ্টা বিশেষ করিত না কিন্তু দৈবাৎ কাহারও কথায় কোনও হাস্যরসের উপাদান পাইলে তিনি তাহা যথেষ্টই উপভোগ করিতেন, ইহাও দেখিতাম।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছেলেদের দেখাদেখি আমরাও এখানে খালি পায়ে বেড়াইতাম, তাহা আগেই বলিয়াছি। আশ্রমের গণ্ডীর ভিতর ইহা একরকম সহিয়া গিয়াছিল, পথঘাট পরিষ্কার ছিল, কাঁকর ভিন্ন অন্য কিছু পায়ে বড় একটা ফুটিত না। বাহিরের মেঠো পথে আসিয়া কিন্তু বিপদ্ হইল। কাঁটাভরা পথে চলিতে গিয়া নিজেরা অত্যন্ত জব্দ হইলাম, কবিবরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। একবার তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, "এইজন্যই ত গানে আছে, "সংসার-পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে।"

মেয়েদের পায়ে যাহাতে কাঁটা না ফোটে এজন্য তিনি অনেক সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিলেন, অনেককে টানিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথ হইতে ফিরাইয়াও আনিলেন।

অনেক দূর আসিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে আমরা অন্যান্য সকলকে পিছনে রাখিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছেলেদের কাহাকেও পিছনে বা আশেপাশে তাকাইয়া দেখা গেল না। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "একটাও ছেলে যে দেখছি আমাদের সঙ্গে আসে নি, কি হবে?"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন, আপনি কি মনে করেছেন যে আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব না? আপনি আমাকে এতই অজ্ঞ মনে করেন?" মুখে ওকথা বলিলেন বটে, তবে সচরাচর যে-পথে তাঁহারা পারুলবনে আসিতেন, সে-পথে না গিয়া নূতন একটা পথ দিয়া আমাদের বনের ভিতরে লইয়া আসিলেন। জায়গাটি অতি সুন্দর, শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বনের ভিতর বেড়ানো হইল না। কবি বলিলেন, "এখানে সাপটাপ মাঝে মাঝে বেরয়, এখানে থেকে দরকার নেই, চল বাইরের মাঠে গিয়ে বসা যাক, এখন বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে।"

আমরা বাহির হইয়া আসিয়া একটা খোলা জায়গায় বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "গান ধরা যাক, তাহলে অন্তরা বুঝতে পারবে আমরা কোথায় আছি।" তাঁহার সম্মুখে মেয়েরা কেহ গাহিতে রাজী না হওয়ায়, তিনি নিজেই একটি হিন্দী গান ধরিলেন। যাঁহারা সেকালে তাঁহার গান না শুনিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে তাঁহার কণ্ঠ কতখানি মধুর ও শক্তিশালী ছিল। সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ একলা তাঁহার কণ্ঠস্বরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কতকগুলি ছেলে হঠাৎ বন হইতে বাহির হইয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মনে করিলেন ইহারা বুঝি আশ্রমেরই ছেলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদিক্ দিয়ে তোরা কোথা থেকে এলি রে?" তাহারা বলিল, "আজ্ঞে, আমরা পারুলডাঙার।"

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "যা বাপু, তোদের কোন দরকার নেই।" কিন্তু তাঁহার দরকার না থাকিলেও ছেলেগুলির দরকার ছিল দেখা গেল। তাহারা চলিয়া না গিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই আরও কতকগুলি লোক মাঠের উপর দিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাঁহাদের একজনের বিরাট দেহ এবং কাঁধের উপর লম্বিত এস্রাজ দেখিয়া কাহারও মনে আর সন্দেহ রহিল না যে ইঁহারা সত্যই আশ্রমের দল। সকলেই দেখিতে দেখিতে আসিয়া জুটিলেন এবং মাঠের মধ্যে ছোটখাট একটি সভা বসিয়া গেল। আবার গান গাহিবার অনুরোধ চলিতে লাগিল। "পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে," গানটি কবিকে গাহিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "এ খানে ত খালি কাঁটা ফুটে।"

গান অনেকগুলিই পরে পরে হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকটি হিন্দী ও বাংলা গান গাহিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মিলিয়া আরও কয়েকটি গান করিলেন। গান আরও চলিত বোধ হয়, কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের এস্রাজের ছড়ি রজনবিহনে হঠাৎ অচল হইয়া উঠিল। মাটিতে ঘষা এবং কাপড় দিয়া মোছা প্রভৃতি নানারকম চিকিৎসার কল্যাণে অবস্থা আরও সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল, অগত্যা তাঁহাদের গানবাজনা বন্ধই করিতে হইল।

অতঃপর মেয়েদের গান করিতে বলা হইল। সকলেই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের সম্মুখে গান করিতে নারাজ। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর শ্রীমতী অরুন্ধতী সরকার (অধুনা চট্টোপাধ্যায়) একটি হিন্দী গান করিলেন। ত্রিশ বৎসর আগে কবে কি গান শুনিয়াছিলাম তাহা সাধারণতঃ মনে থাকিবার কথা নয়। এই গানটি কেন জানি না মনে আছে, তাহার প্রথম লাইন—

"দুখ দে গয়ো, সুখ লে গয়ো, পরদেশী সৈঁয়া।"

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনকে কবি গান গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার অতুলনীয় বাগ্বৈদগ্ধের সাহায্যে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, পাকা আম সামনে থাকিতে আমসী কেহ খায় না। রবীন্দ্রনাথ কোন একটা জায়গার নাম করিলেন, সেখানে পাকা ল্যাংড়া আম থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে আম্সী খাইতে দেখিয়াছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবুকে শেষ পর্য্যন্ত একটি হিন্দী গান গাহিতে হইল।

অতঃপর আমরা বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম। ফেরার পথেও সকলে একসঙ্গে আসিতে পারিলাম না, নানা দলে বিভক্ত হইয়া গেলাম। আমরা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ছাড়িলাম না। মাঠের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ "গুম্" করিয়া একটা শব্দ হইল। কিসের শব্দ জিজ্ঞাসা করায় কবি গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, "সাড়ে ন'টার তোপ পড়ল।" তিনিও যে ঠাট্টা করিতে পারেন ইহা বারবার দেখিয়াও আমাদের বিশ্বাস হয় নাই, তিনি যাহা বলিতেন প্রথম প্রথম সমস্তই বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতাম। একটি মেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোপ কোথায় পড়ল?" রবীন্দ্রনাথ আবার তেমনই গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ফোর্ট উইলিয়মে।" দুই-তিনজন মেয়ে সত্যই ঘড়ি মিলাইয়া লইল। পরে তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিল।

সারাপথ রবীন্দ্রনাথ গান করিতে করিতে আসিলেন, কখনও হিন্দী কখনও বা স্বরচিত বাংলা গান। "প্রেম-পথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও হে নাথ," গানটি অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলেন।

নীচুবাংলার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা এখন বাড়ী ফের, আমি খেয়ে দেয়ে আবার তোমাদের ওখানে যাব, বিদায় নিতে।"

আমরা ফিরিয়া আসিলাম। মন ভারাক্রান্ত ও বিষাদ-পূর্ণ। দুইদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু বোধ হইতে লাগিল যেন চিরজীবনের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতেছি। বিভিন্ন জন্মে ভগবান্ মানুষের বিভিন্ন ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কিন্তু অনন্ত আশ্রয়ও ত থাকে, তাহার সন্ধান এইখানে পাইয়াছিলাম, তাই চলিয়া আসিতে প্রাণ এত কাঁদিয়াছিল।

জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। যদিও ট্রেন রাত তিনটায়, তবু শুইতে বা ঘুমাইতে একেবারে ইচ্ছা করিল না। রাত্রি বারোটারও পরে দেখিলাম শান্তিনিকেতনের দিক্ হইতে একজন কেহ আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছেন, সঙ্গে আলো। জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ সামান্য কয়টি বালিকার নিকট বিদায় লইবার জন্য অত রাত্রে হাঁটিয়া আসিতেছেন, তখন ব্যাপারটাকে কি সাধারণই না ভাবিয়াছিলাম!

তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার মাথায় ও মুখে সাদরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমি বিদায় নিতে এসেছি বটে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা হবে।" কয়েকজন অতিথির তখনও খাওয়া হয় নাই, সেইখানে গিয়া অল্পক্ষণ দাঁড়াইলেন, দুই-চারিটা কথা বলিলেন, তাহার পর আবার হাঁটিয়াই ফিরিয়া চলিলেন।

গভীর রাত্রে শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া চলিলাম। অত রাত্রেও সন্তোষবাবু এবং তাঁহার সহকারী ছেলের দল উপস্থিত ছিলেন, যাহাতে অতিথিরা কোনরকম অসুবিধায় না পড়েন। চাহিয়া দেখিলাম, শান্তিনিকেতনের দিক্ হইতে তখনও একটি আলো দেখা যাইতেছে। অনেকেই হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। রাত তিনটায় ট্রেন ধরিয়া সকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম।

মনটা বড়ই অস্থির হইয়া রহিল। আগেকার জীবন হইতে কেমন করিয়া যেন অনেকখানি দূরে সরিয়া গেলাম। নূতন একটি দৃষ্টি খুলিয়া গেল, যেন উপনয়নের পর দ্বিজত্ব লাভ করিলাম। চোখে দেখা ও কানে শোনার জগতের উপর হইতে একটি-অদৃশ্য যবনিকা উঠিয়া গেল, অন্তরালে যে নিত্যসুন্দর আর-একটি জগৎ আছে তাহারই পরিচয় নানাভাবে নানাক্ষণে হৃদয়ের দুয়ারে আসিয়া পৌছিতে লাগিল।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার দেখা হইল জুলাই মাসে। তখন তিনি কলিকাতায় প্রায়ই আসিতেন। নূতন কোন লেখা হইয়াছে জানিলেই কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দ তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেন। সকলের ত ক্রমাগত শান্তিনিকেতনে গিয়া উৎপাত করিলে চলে না, সুতরাং সকলের আগ্রহাতিশয্যে তিনিই দুই-এক মাস পরে পরে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত-বৃন্দকে কৃতার্থ করিয়া যাইতেন। আমরা আশ্রমে গিয়া যে প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম, তাহা বহুকাল ধরিয়াই উপভোগ করিয়াছিলাম। সর্ব্বসাধারণের জন্য যে বক্তৃতাদির আয়োজন হইত, সেগুলিতে ত উপস্থিত থাকিতামই, তাহা ছাড়া শুধু আমাদের ছোট দলটি যাহাতে নিভৃতে তাঁহার কাছে গিয়া বসিতে পারে, তাহার আয়োজনও প্রায় প্রত্যেকবারই হইত। বন্ধুবর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস এই-গুলির ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন, ইহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য।

বাবার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা কবির প্রায়ই চলিত। সুতরাং তাঁহার খবর ও আশ্রমের খবর সারাক্ষণই পাইতাম। আবার উৎসব হইলেই আমরা শান্তিনিকেতনে যাইব এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাবা সে-কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে লিখিলেন, "উৎসব হলে তাঁরা আসবেন এ কোন কাজের কথা নয়, তাঁরা যখন আসবেন তখনই উৎসব।"

"অচলায়তন" নাটকটি এই সময় রচিত হয়। তাহা শুনিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জুলাই মাসের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। নানা স্থানে নিমন্ত্রণের আতিশয্যে আমরা প্রথম দু-এক দিন তাঁহার দেখা পাইলাম না। পরে শুনিলাম নাটকটি প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়ীতেই পড়িয়া শোনানো হইবে এবং কবি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

কি আকুল আগ্রহেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম তাহা ত এখনও ভুলি নাই। এই আগ্রহের অবসান কোন-দিনই হয় নাই, কিন্তু বিধাতা এই প্রতীক্ষার অবসান এ জন্মের মত ঘটাইয়া দিলেন। তবু বুদ্ধির অতীত কিছু দিয়া এখনও মনে হয় এ প্রতীক্ষারও শেষ হয় নাই, অন্য কোন লোকে তাঁহাকে প্রণাম করিবার, তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবার সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া পাইব।

সেদিন রবিবার ছিল। বিকাল হইতে-না-হইতে আমরা কয়জন বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম

কতক্ষণে তিনি আসিবেন। প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়ী ইঁহারই মধ্যে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঘণ্টাখানিক পরে রবীন্দ্রনাথ আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী। ইঁহারই ডাকনাম ছিল বেলা। বহুদিন হইল ইনি ধরার বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রাণীতুল্য রূপ এখনও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

কবি আসিয়া বাবাকে বলিলেন, "রামানন্দবাবু, আপনি মনে করবেন না যে আপনিই কেবল কন্যাদের নিয়ে বেড়াতে পারেন, আমিও পারি।"

রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র ছিলেন বটে, কিন্তু বড়মানুষী তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্রও ছিল না। সাধারণ ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে অনেক সময় চলিয়া আসিতেন, এমন কি দু-একবার জোড়াসাঁকো হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত হাঁটিয়া চলিয়া আসিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমাদের সমাজপাড়ার সেই বাড়ীটি অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ ছিল, কিন্তু কতবার তাঁহার চরণরেণু স্পর্শে তাহা ধন্য হইয়াছে। প্রবাসী অফিসের সাজসরঞ্জাম তখন এতই দীন ছিল যে তাহার বর্ণনা করিলে এখনকার দিনে মানরক্ষা হয় না। সেই স্বল্পালোক ছোট ঘরটিতে সাধারণ কাঠের টুলে বসিয়া কতদিন তাঁহাকে বাবার সঙ্গে ও চারুবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে দেখিয়াছি। চারুবাবুকে তিনি স্নেহ করিতেন, অনেক সময় তাঁহার কলিকাতা আগমনের সংবাদ চারুচন্দ্রই প্রথম পাইতেন। পোষ্টকার্ডে, "অয়মহং ভো," এই কথাটি মাত্র লিখিত থাকিত, কিন্তু হাতের লেখাই লেখককে ধরাইয়া দিত।

রবীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া আসিয়া অল্পক্ষণই বসিয়াছিলেন, কারণ নাটক-পাঠের তাড়া ছিল, শ্রোতার দল আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। আমার মায়ের সঙ্গে তাঁহার ইতিপূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। পরিচয় হওয়ার পর কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমরা ত আপনার মেয়ে-দুটিকে এক রকম দখল ক'রে নিয়েছি, তাই আমার একটিকে নিয়ে এলাম।" বেলা দেবীকে স্বল্পভাষিণী বোধ হইল, দুই-চারটি মাত্র কথা বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গেই চলিলাম। পাঠের ব্যবস্থা যে জায়গায় হইয়াছিল, লোক তাহার তুলনায় অতিরিক্তই হইয়া গিয়াছিল। ক্রমাগতই একজনের পর একজন নূতন শ্রোতা আসিতেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতেছেন। "অচলায়তনে" অনেক গান, সবগুলি তিনি একলাই গাহিয়া গেলেন, তবে গলা একটু ভার থাকায় নীচু গলায়ই গাহিলেন। লোকের ভীড়ে আর কথাবার্ত্তা বলিবার কোন সুবিধা হইল না। তাহার পরদিনই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে কবিতা পড়া বিশেষ অভ্যাস ছিল না। শান্তিনিকেতন হইতে ফিরিয়া চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আগাগোড়া সব পড়িয়া ফেলিলাম। সবই যে বুঝিলাম তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাতে রসগ্রহণের কোন বাধা জন্মিল না।

"অচলায়তন" প্রথমে প্রবাসীতে ছাপা হয়। পাণ্ডুলিপিখানি যখন বাবার কাছে আসিল, তখন দেখিলাম কবি দুইটি গান কাটিয়া দিয়াছেন। একটি গান, "কবে তুমি আসবে ব'লে, রইব না ব'সে, আমি চলব বাহিরে।" ইহা পরে অধুনালুপ্ত 'সুপ্রভাত' মাসিকপত্রে আবার দিবালোক দেখিয়াছিল এবং প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়টি আর কোথাও কোনদিন দেখি নাই। গানটি এই—

বাজে রে বাজে রে
ঐ রুদ্র তালে বজ্রভেরী,
দলে দলে চলে প্রলয়-রঙ্গে বীর সাজে রে।
দ্বিধা ত্রাস আলস-নিদ্রা ভাঙ্গ গো জোরে,
উড়ে দীপ্ত বিজয়কেতু শূন্য মাঝে রে।
আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাজে রে।

আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই মুলুকে এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার কথা হইতে লাগিল। বাবার সঙ্গে গিয়া সে একবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দেখিয়াও আসিল। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া সে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া কবিবরের হাসি বালকের মনোহরণ করিয়াছিল। তখনই তাহার অবশ্য যাওয়া হইল না, কয়েক বৎসর পরে সে গিয়াছিল। তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, এইজন্য অত অল্পবয়সে তাহাকে বোর্ডিংএ পাঠানো গেল না। ক্রমশঃ

হেথা নাহি স্থান

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

শীতল রুইদাস জাতিতে মুচি। তাহার পিতা ও সে বছর-কুড়ি আগে চামড়ার ব্যবসা করিয়া বেশ কিছু টাকা জমাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু চামড়ার ব্যবসা আজকাল এ অঞ্চলের মুচিরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। চামড়ার ব্যবসা নীচ জাতির ব্যবসা—অত্যন্ত নোংরা কাজ, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা ইহা ছাড়িয়াছে। তার পর মহাপুরুষ জগৎবন্ধুর শিষ্যেরা ইহাদের ঘরে ঘরে 'নাম-কীর্ত্তন' বিলাইয়া, ইহাদিগকে অত্যন্ত সদাচারী করিয়া তুলিয়াছেন। আজকাল এ অঞ্চলের মুচিদের বাড়ীঘর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে কোন উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র-লোকের বাড়ী বলিয়া মনে হয়।

সেদিন সকালবেলা নারায়ণপুরের পাঠশালার পণ্ডিত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখে শীতল মুচি তার ছোট ছেলেকে লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

—আঃ কি বিপদ,—মুচি বেটার আক্কেল দেখ, সকাল বেলাই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিচরণ মুখ খিঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে শেতল, কি চাস তোরা?"

"আজ্ঞে, আপনার চরণে একটা নালিশ জানাতে এলাম।" বলিয়া বিশেষ দূরত্ব বজায় রাখিয়া শীতল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। পরে ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "পেন্নাম কর্ বেরন্দ।"

ছেলেটি হরিচরণের পায়ের কাছে একটি টাকা রাখিয়া বাপের মত প্রণাম করিল।

হরিচরণের চোখ দুইটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল, "টাকা—টাকা কেন রে?"

শীতল বলিল, "ওটা পেন্নামী দেব্‌তা। একটা বাসনা হ'ল তাই ছেলেটাকে সাথে ক'রে পরভুর কাছে নিয়ে এলাম।"

হরিচরণ টাকাটি তুলিয়া লইয়া কাপড়ের খুঁটে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "কি বাসনা রে?"

শীতল ছেলেটিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ছাওয়ালের মার বড় ইচ্ছে দেব্‌তা, ও আপনার পাঠশালায় নেকাপড়া করে। আমি দেব্‌তা, মাগীকে কত ধমকেছি—তুই বলিস কি বড়নোকের ছেলেদের সাথে তোর মুচির ছেলে নেকাপড়া করবে? তা কি মাগী শোনে? অবশেষে ভাবলাম, যাই একবার দেব্‌তার কাছে—কূল-কিনারা একটা হবেই।"

হরিচরণ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "তুই বলিস কি শেতল—বামুন-কায়েতের ছেলের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে ব'সে মুচির ছেলে লেখাপড়া করবে? জাতজন্ম কি আর থাকবে তা হ'লে? বামুন হয়ে এত বড় অধর্ম্মের কাজ করব আমি?"

শীতল বলিল, "বেংচিতে বস্‌তে যাবে কেন দেব্‌তা? মুচির ছেলে বামুন কায়েতের সাথে এক বেংচিতে বস্‌বে সেটা কি একটা কথা হ'ল? আমি বাড়ী হ'তে একখানা টুল এনে রেখে যাব—তাতে বসেই ও পড়বে। আর মাইনে তো মাসে চার গণ্ডা ক'রে পয়সা দা-ঠাকুর—তা বাদে ফি মাসে একবার ক'রে এসে ও আপনাকে একটা ক'রে টাকা দিয়ে পেন্নাম করে যাবে।"

এতক্ষণে কথাটা হরিচরণের মনে ধরিল, কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল থেকে ছেলেকে তোর পাঠশালায় পাঠাস্। বড় শক্ত কাজ, গাঁয়ের বামুন-কায়েত, আরও সব বড় বড় জাত, এরা সব কি বলবে বল্ তো?"

শীতল জোড়হাত করিয়া বলিল, "সে আপুনি এক রকম ঠিক ক'রে নেবেন।"

—"আচ্ছা হবে এক রকম। হাঁ দেখ, পেন্নামীর কথা যেন কাউকে বলিস নে শেতল।"

শীতল হাসিয়া বলিল, "হেঁ হেঁ, বলেন কি দা'ঠাকুর, সে কথা কি কাউকে বলা যায়?"

—ছেলের তোর নাম কি রেখেছিস শেতল?

—আজ্ঞে নাম? সে-ও একটা জবর নাম রেখেছি দা'ঠাকুর—এও ঐ ওর মারই জেদ—বলে, ভদ্দর নোকের মত ভাল নাম রাখবো ছেলের।

—জবর নামটা কি শুনি?

—আজ্ঞে বেরন্দ।

—বেরন্দ? সে কি রে?

—আজ্ঞে ও গাঁয়ের জমিদারবাবুর বড় ছেলের নাম—বেরন্দ!

হরিচরণ শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ও বীরেন্দ্র! বলে ভাত খেতে জোটে না—তার পোলোয়ার সাধ। নাম রাখলেই ভদ্দর লোক হওয়া যায় বুঝি রে?"

শীতল বলিল, "মুচি কি আর ভদ্দর নোক হয় দেব্‌তা? তবে বউটার সাধ—রাখুক নাম যা ইচ্ছে। এখন আসি দা' ঠাকুর।" বলিয়া পুনরায় মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া শীতল ও তার ছেলে বাহির হইয়া গেল।

বীরেন্দ্র ওরফে বেরন্দ সেই হইতে রীতিমত পাঠশালায় আসিতেছে। বাড়ীতে শীতল, শীতলের স্ত্রী দুই জনের একেবারে কড়া নজর ছেলেকে তাহাদের পড়াইয়া শুনাইয়া 'লায়েক' করা চাই। শীতল স্ত্রীকে চুপি চুপি বলে—তুই দেখে নিস্‌ বউ, বেরন্দ আমার নেকাপড়া শিখে একেবারে ভদ্দর নোক হবে। ওগাঁ থেকে শুনে এলাম 'গবরমেণ্টোর' কাছে নাকি ও মুচি চামার বাছবিচার নাই—মুচি চামারের ছেলে যদি একবার নেকাপড়া শেখে তো ডেকে নিয়ে দু-কুড়ি তিন কুড়ি টাকার চাকরি করে দেয়। পাঠশালার নেকাপড়া শেষ হ'লে একবার বড় ইস্কুলে ঢোকাতে পারলেই হয়।

তাহার স্ত্রী মাথা নাড়িয়া বলে—ইস্‌, আবার বড় ইস্কুল! কবে যেন পাঠশালা থেকেই দেয় বের করে।

শীতল হাসিয়া বলে—সেটি আর হবার যো নাই রে। ওর কলকাঠি আমার হাতে—ফি মাসে একটা ক'রে টাকা পেরনামী। ও মুচি-টুচি যাই বলিস টাকা হলি সব চলে যায়। ঐ ঠাকুর মশায়রা ওদের আমি চিনে নিয়েছি রে—টাকা হলি সব করান যায়।

তাহার স্ত্রী হাসিয়া বলে—"বেরন্দকে কিন্তুক আমি চাকুরী করতি দেব না—তা বলে রাখছি। কেন টাকার তোমার অভাব নাকি?" পরে খাটের তলার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলে, "ওখানে দুটি কলসীতে যা আছে—"

কথাটি শেষ করিতে দেয় না, শীতল চোখ পাকাইয়া বলে—চুপ!

তাহার স্ত্রী হাসিয়া বলে—ভুলে গিয়েছিলাম—আর বলবো না।

—বলিস নে খবরদার—কে কোথা থেকে শুনতে পাবে। হাঁ, চাক্‌রির কথা বলছিলি না—চাকরি বুঝি টাকার জন্তে করে—চাক্‌রে বাবুদের মান কত জানিস তো? টাকার জন্যে কি আর বলি, বলি মানের জন্যে। টাকা দিলে যদি ভাল জাত হওয়া যেত—মান বাড়ত—আমার সব টাকা এক দিনে দিয়ে দিতাম।

বছর-খানেক পরে, একদিন ইনস্‌পেক্টর আসিলেন, হরিচরণ পণ্ডিতের পাঠশালা পরিদর্শন করিতে। ক্লাসে ঢুকিয়া ইনস্‌পেক্টরের নজর পড়িল—এক পাশে একটি ছোট্ট সুন্দর ছেলে পৃথক্‌ আসনে বসিয়া আছে। তিনি ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিলেন—"খোকা, এদিকে এস তো!"

বীরেন্দ্র আগাইয়া আসিলে, ইনস্‌পেক্টর তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি খোকা?"

বীরেন্দ্র জবাব দিল—"শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রুইদাস।"

ইনস্‌পেক্টর হরিচরণ পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ও, ওখানে ব'সে কেন?

পাঠশালার সেক্রেটারী তিনু গাঙ্গুলী জবাব করিলেন, "আজ্ঞে ও যে জেতে মুচি। বামুন কায়েত ভদ্দর লোক সব কি মুচির সঙ্গে এক আসনে বসতে পারে?"

ইনস্‌পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো দেখছি ওকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করাই উচিত হয় নি।" তিনু গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কি যেন একটা জবাব খুঁজিতে ছিলেন। ইনস্‌পেক্টর বলিলেন, "এখানে ইস্কুলে ওসব চলবে না, বুঝলেন—এখানে মুচি আর বামুনের এক দর। আজ থেকে ও আর-সব ছেলেদের সঙ্গে এক আসনেই বসবে। যদি কোন বামুন-কায়েতের জাত যায়, তাঁরা যেন ইস্কুলে ছেলে না পাঠান। সকলকে জানিয়ে দেবেন—নইলে কিন্তু সরকারী সাহায্য আর পাবেন না আপনারা—তা ব'লে রাখছি।"

সেক্রেটারী ও পণ্ডিত একযোগে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—তাহাই হইবে। পরে ইনস্‌পেক্টর সারা ক্লাসের ছাত্রদের পরীক্ষা করিলেন।

বীরেন্দ্রের উত্তর শুনিয়া তিনি এত সুখী হইলেন যে, নিজের পকেট হইতে একটি টাকা পুরস্কার দিয়া দিলেন। ক্লাস হইতে বাহির হইবার সময় হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ঐ মুচির ছেলেটাকে যদি ক্লাসে সকলের উপরে বসিয়ে দিয়ে যাই—আপনার আপত্তি আছে?"

হরিচরণ মুখ কাচুমাচু করিয়া জানাইল—আজ্ঞে না। ইনস্‌পেক্টর চলিয়া গেলে সেক্রেটারীর সকল বিক্রম ফিরিয়া আসিল। হরিচরণের উপরে মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "তখনই বলেছিলাম হরিচরণ, মুচির ছেলেটাকে ইস্কুলে ঢুকিও না। নাও এখন ঠেলা সামলাও—এক বেঞ্চিতে বসাও—বামুনের ছেলেরা দিনরাত মুচি চামার ছোঁয়া-

ছুঁত ক'রে জাতজন্ম সব খোয়াক !" কিন্তু তবু বীরেন্দ্র পরের দিন হইতে বেঞ্চে বসিবার অনুমতি পাইল না—তবে পাঠশালায় তাহার মর্য্যাদা কতকটা বাড়িয়া গেল। ইনস্পেক্টর আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া একটি টাকা পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন—ইহা কি কম কথা ?

সব কথা শুনিয়া শীতলের একেবারে গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "দেখেছিস বউ, কত সব তোর ভদ্দর নোকের ছেলে—কেউ তো ফুটো একটা আধলাও পেলে না—আর বেরন্দ একেবারে আস্ত একটি টাকা পেয়ে গেল। আমার কি যেমন তেমন ছেলে ?"

শীতলের স্ত্রী হাসিয়া বলিল, "নাও রাখ তোমার কথা—মোটে তো একটা টাকা ?"

শীতল রাগিয়া বলে—তুই ছোটলোক বুঝবি কি শুনি ? টাকা—টাকাই বুঝি সব, না ? মানটা কত বড় হ'ল বল দিকি ?"

শীতল পরের দিন সকালে হরিচরণ পণ্ডিতের কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া ছুটি টাকা তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, "এ ছুটো টাকা আমার পেরনামী দাদাঠাকুর—বেরন্দ মাসের পেরথমে এসে তার পেরনামী দিয়ে যাবে।"

হরিচরণ টাকা ছুটি তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, ছেলে তোর বটে শেতল—গর্ব্বে আমারই বুক দশ হাত ফুলে উঠল না ? ইনস্পেক্টর বাবু একটা টাকা পুরস্কার দিয়ে দিলেন।"

শীতল জোড়হাত করিয়া বলিল, "সে আপনার দয়া দা'ঠাকুর—"

"দয়া-টয়ার কথা বলিস নে শেতল—ছেলেটার উপরে আমার মায়া পড়ে গেছে। কই এত তো বামুন-কায়েতের ছেলে আছে—আর কেউ তো পেলে না ? লেখা-পড়া—ও-সব 'গুপ্ত বিছে' বুঝলি তো—যাকে ভাল করতে চাইব সে ভাল হবে—যাকে মন্দ করতে চাইব সে মন্দ হবে।"

শীতল জবাব দিল—"সে কি আর আমি জানি নে দা'ঠাকুর। আপনি একটু কেরপা রাখবেন। আমার বেরন্দ যদি ভাল ভাবে পাস করে—আপনার পেরনামী আমি ডবল করে দেব।"

সেবার বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া তিনু গাঙ্গুলী কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, "এ তুমি করেছ কি হরিচরণ, ক্লাসে এত সব বামুন কায়েতের ছেলে থাকতে শেষে একটা মুচির ছেলে হবে কিনা 'ফাষ্টো' ?"

হরিচরণ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে তাই হ'ল যে।"

—"হাঁ, হ'ল যে! হলেই হ'ল ? কেউ কোন দিন বিশ্বেস করবে এ কথা ? দেখি খাতা ? প্রত্যেক বিষয় থেকে পনর নম্বর ক'রে কেটে দাও—সব গোল চুকে যাক।"

সেক্রেটারীর হুকুমই বলবৎ রহিল—বীরেন্দ্র পাস করিল বটে, কিন্তু প্রথম হইতে পারিল না।

২

এমনি করিয়া পাঠশালা হইতে ইংরেজী ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়া বীরেন্দ্র ক্রমে ক্রমে বছর-কুড়ি বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, শীতলের স্ত্রীর বহু পূর্ব্বেই কাল হইয়াছিল কিন্তু শীতলেরও এ সুখ কপালে ঘটিল না। বীরেন্দ্র পরীক্ষা দিয়া গ্রামে ফিরিয়া দেখে পূর্ব্বের দিন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—আজিও তাহার সৎকার হয় নাই—ছেলের হাতের আগুনের আশায় মৃত শীতলকে উঠানে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। বীরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে সকলের সঙ্গে শ্মশানে গিয়া পিতার সৎকার করিয়া আসিল। সংসারে আর তাহার বড়-একটা আপনার বলিতে কেহ রহিল না। বাড়ীতে এক দূর-সম্পর্কের মাসি ছিল, সে-ই সংসারের কাজকর্ম্ম করিত। কয়েক দিন পরে শোকের বেগ কমিলে বীরেন্দ্র খাটের তলা খুঁড়িয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। পিতার কিছু মোটা টাকা আছে সে জানিত, কিন্তু সে টাকার পরিমাণ যে এত তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। বীরেন্দ্র গণিয়া দেখিল—মোট টাকার পরিমাণ দশ হাজারের কাছাকাছি। এত টাকা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া তাহার পিতা কেন যে এত অসম্মান বহিয়া এই গ্রামে পড়িয়া থাকিতেন—বীরেন্দ্র তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই গ্রামের ভদ্রলোক যাঁহারা, তাঁহারা যে কি চক্ষে তাহাদের দেখিয়া থাকেন—আজ জ্ঞানবুদ্ধি হইয়া বীরেন্দ্র তাহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারে।

শীতল মূর্খ, মুচি—তাহার বাপ পিতামহ চিরদিন ধরিয়া যে সামাজিক অধিকার পাইয়া আসিতেছিল সে তাহার বেশী বড়-একটা কল্পনাও করিতে পারিত না। বড়জোর সে ভাবিত বীরেন্দ্র লেখাপড়া শিখিয়া ভাল একটা চাকুরী পাইবে। কিন্তু বীরেন্দ্র সেরূপ ভাবিতে পারিত না। তাহার পিতার ছোট জাত বলিয়া সঙ্কোচ-ভীত ভাব তাহার মনে বিঁধিত। সে নিজে নানা জাতির

ছেলের সহিত লেখাপড়া করিত, কিন্তু কেহ আড়ালে কেহ বা মুখের উপরেই মুচি বলিয়া, ছোট জাত বলিয়া তাহাকে উপহাস করিতে ছাড়িত না। সারা গ্রামের মধ্যে একটি লোককে বীরেন্দ্র যথার্থই শ্রদ্ধা করিত—তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ রায়—চিরকুমার—বার তিন চার স্বদেশী আন্দোলনে জেল খাটিয়াছেন—সম্প্রতি কিছু দিন হইতে কলিকাতায় থাকেন। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল—বীরেন্দ্রনাথ দাস তাহার জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া পনর টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। পরীক্ষা দিবার আগে বীরেন্দ্র তাহার উপাধিটার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিল।

হঠাৎ এক দিন কাহাকেও কিছু না জনাইয়া, বীরেন্দ্র তাহার সমস্ত টাকা পয়সা লইয়া যতীন্দ্রনাথের বাসায় গিয়া উঠিল। যতীন্দ্রনাথ তাহার টাকাগুলা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিলেন—বীরেন্দ্রকে একটি ভাল কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া তাহাকে কলেজ হোস্টেলে রাখিয়া আসিলেন। আর সে যে জাতিতে মুচি, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়—সে বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

বীরেন্দ্রের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল এখান হইতে। কলিকাতার কলেজ হোস্টেলের জীবন—এ যেন বদ্ধ নালা হইতে একেবারে সাগরে আসিয়া পড়িল সে। এখানে না আছে কোন বাধা নিষেধ, এখানে না আছে কোন জাতের খবর—যে জন্য ঘৃণা। কলেজ তো নয়ই—হোস্টেলেও না। বীরেন্দ্র ঠিক করিয়াছে জীবনে সে আর কোন দিন নিজ গ্রামে যাইবে না। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অন্যান্য অভিজাত জাতি যাহারা, তাহাদের ত্রিসীমানায়ও সে কোন দিন ঘেঁষিতে পারিবে না—তা সে, বি-এ, এম-এ পাস করিয়া যত লেখাপড়াই শিখুক না কেন। হয়ত কেউ আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে—ওটা মুচির ছেলে বি-এ পাস করেছে—কলিতে সব হ'ল কি, বড়-ছোটর ভেদাভেদ রইল না?

দুই বৎসর পরে আই-এ পরীক্ষা দিয়া বীরেন্দ্র কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল এবং বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইল।

আত্মভোলা যতীন্দ্রনাথের বাসায় কতকগুলি কলেজের ছেলে নিয়মিত আড্ডা দিত। 'যতীনদা' ছিলেন তাহাদের 'মধ্যমণি'। সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক নিত্য নিত্য নানা আলোচনা হইত। যতীন্দ্রনাথ নিজে চিরজীবন রাজনীতি করিয়া কাটাইলেন, কাজেই তিনি এমনি করিয়া ছেলেদের সহিত মিশিয়া, তাহাদের ভিতরে স্বাদেশিকতা প্রচার করিতে চাহিতেন। ছেলেদের সহিত পাড়ার ইস্কুল কলেজে পড়ে এমন কয়েকটি মেয়ে আসিয়াও মাঝে মাঝে এই আড্ডায় যোগ দিত। যতীন্দ্রনাথ নিজে মেয়েদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সভ্য ছাড়া এই চক্রে বাহিরের কেহ যোগ দিতে পারিত না বলিয়া মেয়েদেরও এখানে আসিতে বা মেলামেশা করিতে বিশেষ সঙ্কোচ হইত না। বীরেন্দ্র প্রথম এই চক্রে যোগ দিয়াছিল। শচীদুলালের যতীন্দ্রনাথের পাড়ায় বাড়ী। সে প্রথম হইতেই বীরেন্দ্রের সহপাঠী এবং এই চক্রের সভ্য। ক্রমে ক্রমে শচীদুলালের সহিত বীরেন্দ্রের অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া গেল। শচীদুলালের বোনের নাম অলকা। সে মাঝে মাঝে তাহার দাদার সহিত এই চক্রে আসিয়া যোগ দিত। শচীদুলালের পিতা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক। এক কালে তিনি ব্রাহ্ম হইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে আর তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও কায়স্থের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। এখন বাতের বেদনায় অচল হইয়া ঘরে পড়িয়া আছেন, বয়সও হইয়াছে। ঘরে তাঁহার আর লোক নাই—এক মাত্র পুত্র শচীদুলাল ও মেয়ে অলকা। স্ত্রী বহুদিন গতায়ু হইয়াছেন। শচীদুলাল বীরেন্দ্রকে তাহাদের বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার পিতার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছে। শচীদুলালের পিতা প্রথমাবধিই বীরেন্দ্রকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন। শচীদুলালের জেদ ও তাহার পিতার আগ্রহ এড়াইতে না পারিয়া বীরেন্দ্র প্রায়ই তাহাদের বাসায় বেড়াইতে যাইত। এমনই করিয়া অলকার সহিতও তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতার মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। যদিও শচীদুলালের পিতা উদার প্রকৃতির, নিজে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও বীরেন্দ্র সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিত—তাহার সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা হিন্দু সমাজের নিকটে যে একেবারে আবর্জ্জনার স্তূপের সামিল! শচীদুলালেরা যত আধুনিকই হউক, এতটা দূর কি কখনও যাইতে পারিবে? হয়ত প্রথমেই ইহাদের নিকট তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলা উচিত ছিল; তখন তাহা যখন পারে নাই, আজ তাহার সে শক্তি কোথায়? কি বলিয়া এত দিন পরে আজ বলিবে সে মুচির ছেলে—একেবারে অন্ত্যজ।

শচীদুলালের পিতা হয়ত মনে মনে কি একটা অভিপ্রায় আঁটিতেছিলেন। বীরেন্দ্রের সন্দেহ হয়—অলকা ও তাহাকে লইয়া এমনি কি একটা আভাস সেদিন দিতেছিলেন। অলকা সুন্দরী, এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলেজে ঢুকিয়াছে। তাহার ব্যবহারে কথাবার্ত্তায়

বীরেন্দ্রকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু তাহাকে সর্ব্বক্ষণই একটা দূরত্বের সীমারেখা টানিয়া চলিতে হইয়াছে। নিজের অন্তরের ভিতরে সে বারে বারে শিহরিয়া উঠে—তাহার সকল স্বপ্ন হয়ত এক মুহূর্ত্তে তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িবে।

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল বীরেন্দ্র অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। শচীর ফলও অবশ্য মন্দ হয় নাই।

বি-এ পাসের সংবাদ পাইবার পর শচীদুলালের পিতা কয়দিন ধরিয়া বীরেন্দ্রকে খুঁজিতেছিলেন; কিন্তু কি কারণে কয়দিন আর বীরেন্দ্রের দেখা নাই—অবশেষে একদিন শচী তাহাকে পাকড়াও করিয়া পিতার নিকটে হাজির করিল। শচীর পিতা বীরেন্দ্রকে আদর করিয়া বসাইলেন। অলকার দিকে ফিরিয়া চা, জলখাবারের যোগাড় করিতে বলিলেন। নানা আলোচনার পর অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার তা হ'লে কি পড়বে ঠিক করলে বীরেন ?"

বীরেন্দ্র জানাইল, সে এখন পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই—সম্ভবতঃ যতীনদা যাহা বলিবেন তাহাই সে করিবে।

শচীর পিতা বলিলেন—শচীর ইচ্ছা, ও আইন পড়তে বিলেত যায়। কথাটা আমিও ভাবছিলাম—কিন্তু অত দূরদেশে একা একা পাঠাতেও মন চায় না, ভয় হয়। আমি তাই ভাবছিলাম, তুমি আর শচী দু-জনে মিলেই কেন বিলেত যাও না ?

বীরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল, "আপনি বলেন কি ? অত টাকা আমি পাব কোথায় ? ব্যাঙ্কের হিসাবে বোধ হয় সাত-আট হাজার টাকা আমার থাকতে পারে।"

শচীর পিতা হাসিয়া বলিলেন, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না বীরেন—তুমি মন স্থির কর। কথাটা যখন পেড়েছি তখন টাকার চিন্তাটাও করেছি নিশ্চয়ই। আমার ত মোটে ঐ দুটি সন্তান—তা অলকার জন্যে যদি কিছু টাকা খরচ হয়, সে তো কর্ত্তব্য কর্ম্মই করা হবে। কিন্তু আমরা সেকেলে মানুষ বাপু! তোমাদের বিয়ে ক'রে তবে বিলেত যেতে হবে—তা বলছি। শচীর বিয়ে তো ঠিক হ'য়েই আছে। আর অলকার মতও আমি জেনেছি—তার আগ্রহ না থাকলে কি আর আমি কথাটা পাড়ি। অলকাকে তোমার অপছন্দ হবে না বোধ হয় বীরেন। না না, লজ্জা কি ? এ সব ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনাই ভাল। কথা তোমাকে কিন্তু আজ দিতেই হবে।"

বীরেন্দ্রের চোখের সম্মুখে সমস্ত জগৎ ঘুরিতে লাগিল—ভবিষ্যতের আশঙ্কায় মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল—আমার অবস্থার কথা—জাতির কথা কিছুই তো জিজ্ঞাসা করেন নি—

শচীর পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, "শোন কথা,—আমি বিচার করি মানুষের—তার অন্তরের—জাতিভেদের বিচার তো আমি করি না—কোন দিন করি নি—তা কি তুমি জান না ? আর তুমি তো এমন কোন মুচি, চামারের ঘরের ছেলে নও যে আপত্তিই হবে ?"

বীরেন্দ্রের সমস্ত অন্তর একেবারে কাঁপিয়া উঠিল। সে নিজেকে যথাসাধ্য দমন করিয়া উত্তর করিল, "যদি তাই হই, সে খোঁজও তো নেন নি ?"

শচীর পিতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "শোন কথা।" পাশের ঘরে শচী ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনেছ শচী তোমার বন্ধুর কথা ? বলে—যদি আমি মুচি চামার হই সে খোঁজটাও তো নেওয়া উচিত ছিল" বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শচী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—আমি তো ঠিক করেছি বাবা অলকার বিয়ে তা হলে ঐ মুচি চামারটার সঙ্গেই দেব।

বীরেন্দ্র তাহাদের হাসিতে কোনক্রমেই যোগ দিতে পারিল না। মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছিল—কিন্তু তবুও সে ঘামিয়া একেবারে একাকার হইয়া উঠিল। অবশেষে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে দুটো দিন সময় দিন, তার পর জবাব দেব। এ আমার পরম সৌভাগ্য জানবেন, কিন্তু তবু আমায় ভাবতে হবে।" বলিয়া বীরেন্দ্র উঠিয়া পড়িল।

গেটের কাছে আসিতে একেবারে অলকার সম্মুখে পড়িল—অলকা তাহার দিকে তাকাইয়াই হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বীরেন্দ্র একটা কথাও বলিতে পারিল না—সোজা বাহির হইয়া গেল।

হোস্টেলে আসিয়া বীরেন্দ্র সমস্ত দিন বিছানায় পড়িয়া রহিল।

আজ তাহার ছোটবেলার সমস্ত কথা মনে উঠিতে লাগিল—তাহার পিতা মাতার তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার আগ্রহ—হরিচরণ পণ্ডিতের প্রণামীর টাকার কথা—তিনু গাঙ্গুলীর মুখ খিঁচুনি—ক্লাসের এক প্রান্তে একান্ত অশুচির মত বসিয়া থাকা—সহপাঠীদের নিকট

হইতে অশ্রদ্ধা—সব একে একে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

সেদিন কি কারণে যতীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রকে খুঁজিতে আসিয়া দেখেন—সে সেই শেষ বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া আছে—তাহার না হইয়াছে স্নান, না হইয়াছে আহার। তাহার দুই চোখ জবাফুলের মত লাল—হয়ত কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও সে কাঁদিতেছিল। যতীন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জোর করিয়া তাহাকে বিছানা হইতে তুলিয়া স্নানাহার করিতে পাঠাইলেন এবং বিকাল বেলা তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া বিদায় লইলেন।

৩

পরের দিন এক অভাবনীয় ব্যাপার গেল ঘটিয়া—হঠাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়া শচীদুলালের পিতা একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। শচী, অলকা, বীরেন দুই দিন দিন-রাত্রি ধরিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিল—শহরের বড় বড় চিকিৎসক ডাকা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; পূর্ণ দুইটি দিন অজ্ঞানতার পর তাঁহার মৃত্যু হইল। শচী ও অলকা পিতার শয্যার পাশে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বীরেন্দ্র কাহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। খবর পাইয়া যতীন্দ্রনাথ আসিলেন। ক্রমে শোকের বেগ কিছু কমিলে শচী ও যতীন্দ্র মিলিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-বন্ধুর দল মিলিয়া শচীর পিতার দেহ শ্মশানে লইয়া গেল। বীরেন্দ্র রহিল অলকার নিকটে।

পিতাকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া যাইবার সময় সেই যে অলকা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিল আর উঠে নাই। বীরেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া শান্ত করিয়া জোর করিয়া স্নানের ঘরে পাঠাইয়া দিল।

মিনিট কুড়ি পরে স্নান সারিয়া অলকা ঘরে ঢুকিল। বীরেন্দ্র বলিল, "তুমি এই বার একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর অলকা, রাত জেগে তোমার শরীর যা হয়েছে।" এই দুঃসময়ে আজ বীরেন্দ্রের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে, আজই প্রথম সে তাহাকে তুমি বলিল।

অলকা বলিল—আপনি কি চলে যাবেন নাকি?

—না না, সে কি কথা, তোমাকে একলা রেখে চলে যেতে কি পারি?

অলকা তাহার ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িল—বীরেন তাহার শিয়রের কাছে রহিল বসিয়া।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিবার পর অলকা পুনরায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

—ছিঃ ছেলেমানুষের মত কাঁদছ কেন অলকা—কেঁদে কি কোন লাভ আছে?

অলকা মুখ তুলিয়া বলিল—তা নাই জানি। কিন্তু আমার কি হবে বলুন তো? দাদা বিলেত যাবে—আপনি বিলেত যাবেন আমি কার কাছে থাকব এখানে?

—তোমার একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি আর শচী বিলেত যাবে?

—আর আপনি? আজ আমার সব বোঝা যে আপনাকেই বইতে হবে।

পুনরায় এক মুহূর্ত্তে বীরেন আনন্দে ও আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া গেল। কি বলিবে সে?

—তুমি কি সত্যি করেই মন স্থির করে ফেলেছ অলকা?

—মন স্থির? আজও কি আপনার এতে সন্দেহ আছে? এ যে বাবার শেষ ইচ্ছা—আমার কাছে এ যে আদেশ।

—কিন্তু আমার সব কথা তোমাকে তো জানান হয় নি অলকা—সব কথা শুনে তুমি রাজি হবে না।

—দেখুন, আজ দুঃসময়ে আমার সব লজ্জা—সব সঙ্কোচ কেটে গেছে—সব কিছু শোনবার সময় বুঝবার সময় কেটে গেছে।

—যাক ও কথা, এখন তুমি শান্ত হও অলকা—একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর। তুমি যা বলবে তাই হবে—আমি তাই পরম কৃতার্থের মত মাথা পেতে নেব।

৪

মাস-তিনেক আরও চলিয়া গেল। বীরেন্দ্র ইতিমধ্যে একেবারে মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে—হইলই বা সে মুচির ছেলে—সে লেখাপড়া শিখিয়াছে—আচার-ব্যবহারে কোন ভদ্র সন্তানের চেয়ে কম নয়—তবে কেন সেই মুচির পর্য্যায়েই পড়িয়া থাকিবে? শিক্ষিত হইয়া ভদ্র হইয়াও যদি বংশগত নিম্ন শ্রেণী বলিয়া চিরকাল সমাজের কাছে শুধু ঘৃণাই পাইবে, তবে আর সে শিক্ষা-দীক্ষার মূল্য কি? এ-সব মিথ্যা—এ-সব অত্যাচার—বীরেন্দ্র ইহা মানিবে না। অলকাকে তাহার চাই—তাহাকে ছাড়া তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না।

নিজের বংশ-পরিচয় তাহাকে দিবে না। বিবাহের

পর যদি সম্ভব হয়, অলকাকে লইয়া বিলাত চলিয়া যাইবে—না-হয় বাংলার বাহিরে পশ্চিমের দিকে যাইয়া কোথাও স্থায়ী হইয়া বসিবে। তাহার প্রকৃত পরিচয় এমনি করিয়া এক দিন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবিয়া যাইবে। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল—আর মাত্র দিন-পনর সময় ভিতরে আছে। যতীন্দ্রনাথ ইহার কিছুই জানেন না—ইদানীং অসুখে ভুগিয়া তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গিয়াছিল—তাই মাস দুই হইল পশ্চিমের কোন এক স্বাস্থ্য-কর স্থানে গিয়া আছেন। বীরেন্দ্র ঠিক করিয়াছে শীঘ্রই যতীন-দা আসিলে, এক মাত্র তাঁহাকেই বিবাহের কথা ভাঙিয়া বলিবে।

সেদিন বীরেন্দ্র ও শচী কি কাজের জন্য কালীঘাটের দিকে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় কালী-মন্দিরের নিকটে হঠাৎ একটি বৃদ্ধ বীরেন্দ্রের সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া, একেবারে ভাঁটার মত চোখ করিয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "কে রে বেরন্দ না ?"

বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইয়াই, বীরেন্দ্রের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল—সর্ব্বনাশ, এ যে তিনু গাঙ্গুলী।

শচী হাসিয়া বলিল, "আপনি ভুল করেছেন।"

"ভুল ?" তিনু গাঙ্গুলীর পিছনে আরও চার-পাঁচ জন মেয়েপুরুষ ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহাদেরই এক জনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কি রে পরান, ও শীতল মুচির ছেলে বেরন্দ না ?"

পরান জানাইল—বেরন্দই বটে।

শচী রাগিয়া উঠিল—"কি যা-তা বলছেন এক জন ভদ্রলোককে ? ওঁর নাম বীরেন্দ্রনাথ দাস।"

তিনু গাঙ্গুলী হাসিয়া বলিলেন, "তা বুঝলাম বাপু,—বেরন্দই সাজ-পোষাক পরালে বীরেন্দ্র হয়—আর রুইদাসের রুইটা গোপন করলে একেবারে ভদ্দর লোক—কায়স্থ পর্য্যন্ত হওয়া যায়। এত কথায় কাজ কি, কিন্তু ঐ ওকেই জিজ্ঞেস কর বাপু, ও শীতল মুচির ছেলে নয় ?"

শচী তাকাইয়া দেখে বীরেন্দ্র একটা কথাও বলিতেছে না—তাহার চোখমুখ এক মুহূর্ত্তে যেন উঠিয়াছে শুকাইয়া।

তিনু গাঙ্গুলী বলিয়া চলিয়াছিল—"এক গ্রামে বাড়ী, আর আমি চিনলাম না শেতল মুচির ছেলেকে ? বলি, ও লেখাপড়া শিখল কোথায়—আমার পাঠশালায়ই তো দয়া ক'রে ঢুকতে দিয়েছিলাম বলেই না আজ কলকাতায় এসে ভদ্রলোক হয়েছে।" পিছন হইতে একটি আধবয়সী স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন—"মুচিকুলে জন্মালে কি হবে ঠাকুর—কপাল গুণে সব—নইলে কে জানত বাপু, যে শেতল মুচির ছেলে এত লেখাপড়া শিখবে ?"

শচী জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের বাড়ী কি এঁদের গাঁয়ে ?

তিনু গাঙ্গুলী বলিল—নয়ত কি—অবিশ্বেস কর জিজ্ঞেস কর তোমার ঐ ভদ্রলোককে ?

তিনু গাঙ্গুলীরা চলিয়া গেলে বীরেন্দ্র ও শচী আসিয়া ট্রামে চাপিয়া বসিল—কেহ আর একটা কথাও কহিল না। কিছুক্ষণ পরে শচীর মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"বিশ্বাস-ঘাতক"—কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়া শচী বাড়ীর দিকে পা বাড়াইল—বীরেন্দ্র সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হোস্টেলের দিকে চলিতে লাগিল। তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যেন আটকাইয়া আটকাইয়া যাইতেছিল—মনের সমস্ত অনুভূতি বোধ করি হারাইয়া ফেলিয়াছিল—কোন কিছু ভাবিবার আর তাহার ক্ষমতা ছিল না।

আজ তিন দিন বীরেন হোস্টেল হইতে বাহির হয় নাই—নিয়মিত স্নান আহার করে নাই। তাহার তাসের ঘর এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। আজ তিন দিন শচীদের বাসায় না জানি কি কাণ্ড ঘটিতেছে। অলকাকে শচী নিশ্চয়ই সব বলিয়াছে—অলকা কি ভাবে সংবাদটি গ্রহণ করিয়াছে, কে বলিবে ? পাশের 'সিটে'র অতীন বলিল, "তোর কি হয়েছে বল তো বীরেন ? চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়েছে—এই কয়টা দিনে শরীর যেন একেবারে আধখানা হয়ে উঠেছে—ব্যাপার কি ?"

বীরেন বলিল, "শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না ভাই।" সন্ধ্যাবেলা যতীন্দ্রনাথের চক্রের আর একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি বীরেন—আজ শচী এসে যতীন-দাকে যা-তা ব'লে গালাগালি করে গেল। আমি দূর থেকে শুনলাম—ভাল বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝে তোর নাম করছিল—আমি নিকটে যেতেই চুপ ক'রে বেরিয়ে গেল। যতীন-দা শুধু বলছিলেন—কই আমি তো এর কিছুই জানি নে। যতীন-দার নিকটে জানতে চাইলাম কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না, শুধু বিষণ্ণ মুখে চুপ করে রইলেন।"

—যতীন-দা এসেছেন ?

—সে কি, তুই জানিস নে ? কাল সকালে এসেছেন যে।

বীরেন্দ্রের বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না—তাহাকে লইয়াই যতীন-দার এই লাঞ্ছনা। বীরেন আজ কি করিবে—কোথায় যাইবে ? দুই দিন পরে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সব
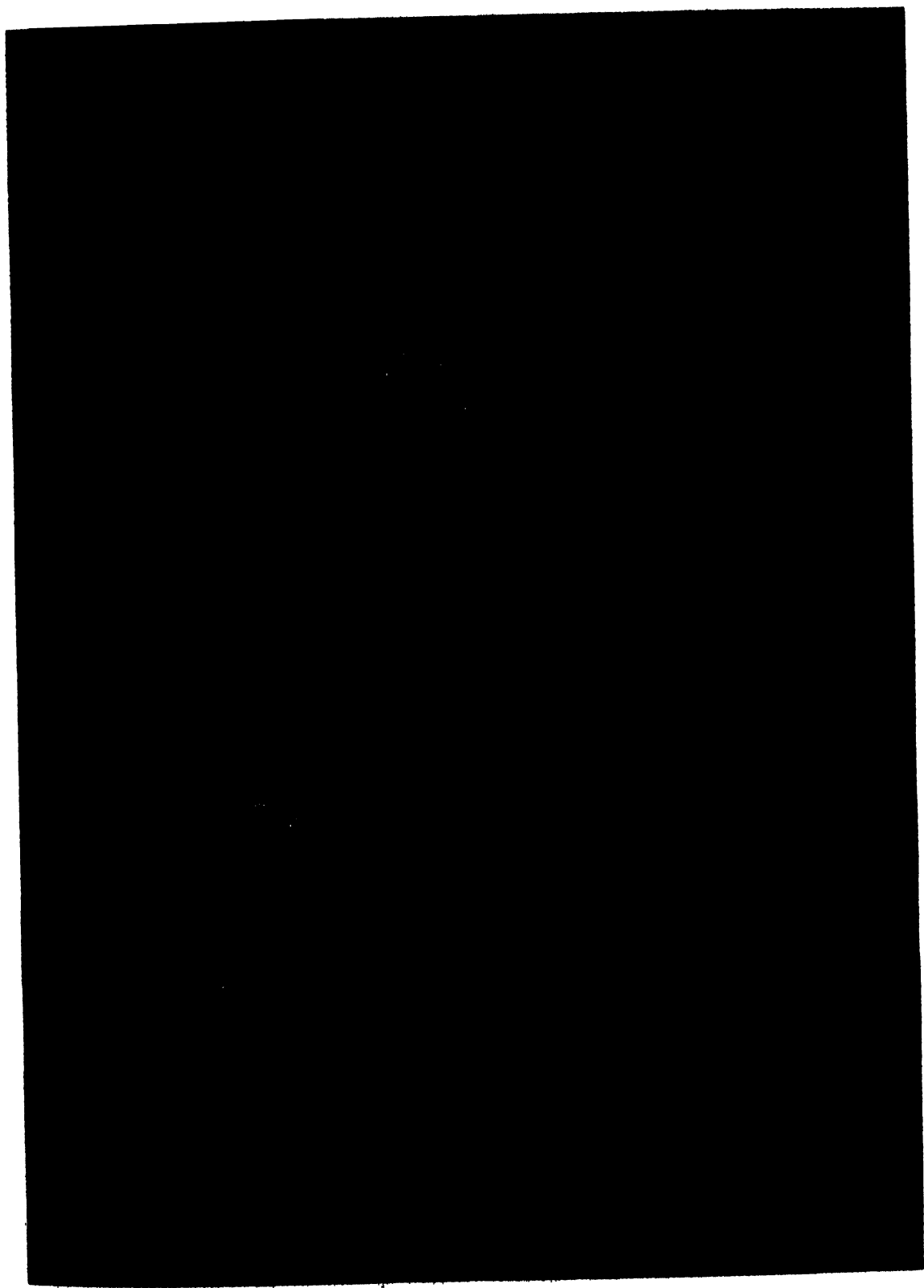
জানাজানি হইয়া গেলে আর লাঞ্ছনার কিছু বাকী থাকিবে না। অলকা—সে তো আকাশকুসুম। বীরেন্দ্র অনেক ভাবিয়া ঠিক করিল—সে পলাইবে। আর কলিকাতায় নয়—বাংলা দেশের বাহিরে কোন এক নিভৃত স্থানে গিয়া সারাটা জীবন কাটাইয়া দিবে।—সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরে, সমস্ত যশ-মানের উপরে দিবে সমাধি রচনা করিয়া। হঠাৎ শচীদুলাল একেবারে বীরেন্দ্রের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরেন্দ্র কি করিবে, কোথায় লুকাইবে, ভাবিয়া পাইল না। ঘরে আর কেহ ছিল না। শচী রুক্ষস্বরে বলিল, "তোমাকে এক বার বাইরে যেতে হবে বীরেন—অলকা রাস্তায় গাড়ীতে ব'সে আছে। তোমার মুখ থেকে সে তোমার প্রকৃত পরিচয় শুনতে চায়—আমার কথা বিশ্বাস করে নি—এস।"

যন্ত্রচালিতের মত শচীদুলালের পিছনে পিছনে বীরেন্দ্র রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। শচী নিজেই মোটর চালাইয়া আসিয়াছিল। অলকা ছিল গাড়ীর ভিতরে বসিয়া। শচী আগাইয়া আসিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা কর অলকা।" কিন্তু অলকা তখন দুই চোখের জলে ভাসিতেছিল। পরে শচী বীরেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "অলকা হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারবে না—কিন্তু বীরেন যত অপরাধই তুমি ক'রে থাক তবু আজও আমার বন্ধু। আজ আমার শেষ অনুরোধ—অলকার মঙ্গলের জন্য তুমি ওকে তোমার প্রকৃত পরিচয় খুলে বলবে।" কয়েক বার চেষ্টা করিয়াও বীরেন একটা কথাও বলিতে পারিল না—অবশেষে জোর করিয়া বলিল, "সত্য কথাই বলব শচী—আমি মুচি, আমি অস্পৃশ্য—অন্ত্যজ।" বীরেন হু হু করিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল। শচী এক মুহূর্ত্তে গাড়ীতে উঠিয়া 'স্টার্ট' দিল—গাড়ী ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বীরেন্দ্রের পায়ের তলার মাটি বাড়ী-ঘর সমস্ত যেন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল—তাহার মনে হইতেছিল, সে এখনই মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে। কতক্ষণ এমনি কাটিবার পর, পিছন হইতে একখানি মোটর একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিয়া পড়িল—আর একটু হইলেই চাপা পড়িয়াছিল আর কি।

পরের দিন সকালে উঠিয়া আর কেহ বীরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল না—সে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

৫

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা ছোট একতলা বাড়ী—আজ এক বৎসর হইল বীরেন্দ্র এখানে আস্তানা গাড়িয়াছে। আশেপাশে যেসব ছোট জাত বাঙালীর ছেলে, তাহাদের পড়িবার ভাল ইস্কুল নাই। তাহাদের লইয়া বীরেন্দ্র নিজের ঘরে পড়াইতে শুরু করিয়াছে। বেতন দিতে হয় না, কাজেই ছাত্রও জুটিয়াছে অনেক। তাহার থাকিবার ঘর সকালবেলা হইতেই রীতিমত একটি পাঠশালা হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে বীরেন্দ্র কোথায় উধাও হইয়া যায়—দশ দিন পনর দিন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে।

সেদিন বিকালে দশাশ্বমেধ ঘাটের এক পাশে বীরেন বসিয়া ছিল—এই স্থানটি অনেকটা নির্জ্জন। সে এই স্থানটি পছন্দ করিত—রোজ বিকালে এখানে আসিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। এখানে তাহার না আছে বন্ধুবান্ধব, না আছে একটা কথা বলিবার লোক। যাহাকে বলে একেবারে নির্ব্বাসন এমনই জীবনযাপন করিতেছে সে। হঠাৎ পিছন হইতে কে একজন তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—মুখের দিকে তাকাইয়া বীরেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল—এ যে শচীদুলাল।

শচী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "এ কি বীরেন, তুমি এখানে? ব্যাপার কি বলতো?" বলিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আর আত্মগোপন করিবার উপায় নাই—পূর্ব্বে জানিলে হয়ত বীরেন ভিড়ের মধ্যে নামিয়া নিজেকে লুকাইয়া ফেলিত।

শচী পুনরায় বলিল, "কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হয়েছে—কোন অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

বীরেন এবার জবাব দিল, "কই না, ভালই তো আছি। তার পর তোমাদের সব ভাল?"

শচী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর ভাল—এই তিন-চারটে মাস তো শুধু পথে পথেই ঘুরছি।" বীরেন জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার দিকে তাকাইল।

—তুমি তো উধাও হ'লে—তার পর অলকার যে সে কি হ'ল—কারু সঙ্গে কথা বলে না—ঘর থেকে বেরোয় না, আহারনিদ্রা বোধ করি গেল একেবারে ভুলে। কিছু দিন এমনি ক'রে কেটে গেল—অলকা দিন দিন শুকিয়ে উঠতে লাগল। পেটে কিছু সহ্য হ'ত না, মাঝে মাঝে জ্বর হ'ত। কল্‌কাতার যত ভাল ভাল ডাক্তার দেখালাম, কিছুতেই কিছু হ'ল না—অবশেষে আজ মাস দুই হ'ল বিন্ধ্যাচলে এসেছিলাম। উপকার বিশেষ কিছু হয় নি—আজ সপ্তাখানেক পুনরায় জ্বর বেড়ে গেল—ওদিকে

বিন্ধ্যাচলে ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় না—তাই আজ কয় দিন হ'ল কাশী চলে এসেছি। কিন্তু তুমি থাক কোথায়? তোমার আর সব খবর কি?"

বীরেন্দ্র শুষ্কমুখে জবাব দিল, "আমার আর খবর কি ভাই, সেই কল্‌কাতা থেকে এসে এই কাশীতেই আছি—দিন এক রকম কেটে যাচ্ছে।"

—তোমার বাসা কোথায়?

—এই তো নিকটেই এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।

—বেশ তবে চল যাই তোমার বাসায়। ওঠ—অমন মন-মরা হয়ে রয়েছ কেন বল তো?" বীরেন্দ্র ও শচী চলিতে লাগিল। বীরেনের ঘরে আসিয়া শচী একেবারে শিহরিয়া উঠিল, "এ কি, এই অন্ধকার আর স্যাঁৎসেঁতে ঘরে তুমি থাক কেমন ক'রে বীরেন—এমনি ঘরে মানুষ থাকতে পারে? আর এ কি, এত খাতাপত্র কিসের?"

—আমি একটা পাঠশালা করেছি ভাই—পাড়ার ছোট জেতের ছেলেরা এখানে পড়তে আসে।

শচী হাসিয়া বলিল, "ওঃ একেবারে রীতিমত সন্ন্যাস নিয়েছ দেখছি।" বীরেন জবাব না দিয়া বলিল, "এখানে আর কোথায় বসবে শচী, চল বাইরে সিঁড়ির উপরে গিয়ে বসি।"

কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর বীরেন ধরা গলায় বলিয়া উঠিল, "ভাই শচী, আমি তোমাদের কাছে ভয়ানক অপরাধ করেছি—কেন যে আমার এ দুর্মতি হয়েছিল আমি নিজেই ভেবে পাই নে। দুঃখ তোমাদের দিয়েছি সত্য, কিন্তু আমি নিজেও বড় কম পাই নি।"

শচী বাধা দিয়া বলিল, "ওসব কথা আর শুনতে চাই নে বীরেন। কিন্তু আমাদের বাসায় তোমায় একবার যেতে হবে ভাই—এমনি থাকলে তো অলকা বাঁচবে না। অসুখ তার কি তা তো তোমার অজানা নয়। সে আজও তোমাকে ছাড়া জানে না। আমি শুধু মাঝখান থেকে এত দিন বাধা দিয়েছি। কিন্তু বাধা না দিয়েও যে উপায় ছিল না ভাই—তাকে তোমার হাতে দিতে পারলে আমি নিজেই যে কত সুখী হতাম তা তোমাকে কি জানাব। আমরা যত উদারই হই—তবু একটা সমাজ আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের যে কিছুতেই বুঝাতে পারব না। কিন্তু তবু আমি আজ ঠিক করেছি—আর জোর করব না—অলকা তার মন বুঝুক—সে যা ভাল বোঝে করুক।" কথা বলিতে বলিতে শচী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

বীরেন্দ্র জবাব দিল, "কিন্তু ভাই, তুমি সম্মতি দিলে তোমার আত্মীয়বন্ধুরা তো তোমায় ক্ষমা করবে না—অলকাকে অসম্মান করবে—তার কি করবে?"

—সে আমি ঠিক করেছি বীরেন—বাবার কয়েক লাখ টাকা আছে তার অর্দ্ধেকটা আমি অলকাকে দেব—তোমরা বিয়ে ক'রে বিলেত চলে যাবে—সেখানে চামার মুচির ভেদাভেদ নাই—সেই তোমাদের নিরাপদ আশ্রয়। আমি পুরুষমানুষ—আমার কথা আমি ভাবি নে।

* * *

ঘরে আর কেহ নাই—বীরেন্দ্র অলকার বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া আছে—অলকা বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া মন স্থির করিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ অলকা, কাঁদতে নেই—অপরাধ আমি করেছি—শুধু তোমাকেই যে দুঃখ দিলাম তা নয়—নিজেকেও কম দুঃখ দিই নি। কিন্তু তখন আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না অলকা। আমি শুধু ভেবেছিলাম, ন্যায় ক'রে হোক, অন্যায় ক'রে হোক, তোমাকে আমার চাই। কিন্তু আজ তো তোমাকে আমায় ভুলতে হবে।"

অলকা মুখ তুলিয়া বলিল, "ও কথা আমায় ব'লো না—এই একটা বছর ধ'রে অনেক ভেবেছি—তোমাকে ভুলতে চেষ্টা করেছি—পারি নি। জাত যাক্, সমাজ যাক্—আমি সব সইতে পারব—কিন্তু তোমাকে হারাতে পারব না।" বলিয়া অলকা পুনরায় ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বীরেন তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "আর কেঁদ না অলকা—তুমি আগে ভাল হও—তার পর যা ভাল বোঝ, তাই হবে।"

কবি-প্রয়াণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এমন শ্রাবণ, স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল ভুবন,
এত অনুরাগে ভরা মানুষের মন,
রৌদ্রে তবু ঝরে কেন বৈরাগ্যের সুর ?
প্রকৃতি করুণাময়ী, নিয়তি নিষ্ঠুর।

নিস্পন্দ অতল সিন্ধু, নিস্তব্ধ বাতাস,
নিঃশব্দ আকাশ, শুধু মৃদু দীর্ঘশ্বাস
ধীরা ধরণীর—যেন অতি নিঃসহায়
মূর্চ্ছিত মুহূর্ত্ত সাথে মিলাইয়া যায়।
যেথা শান্ত জীবনের অশ্রান্ত মর্ম্মর,
অসীম সাগর আর অনন্ত অম্বর
রচিয়াছে লীয়মান দিগন্তের রেখা
পার হয়ে তাহা—আসে যেন, যায় দেখা,
অচেনা দেশের কোন্ সোনার তরণী।
বিমূঢ় চাহিয়া থাকে বিস্মিত ধরণী।
সমাপ্ত কি কাজ, কবি, সমাপ্ত কি গান ?
কে ডাকে ইঙ্গিতে দূরে ? কাহার আহ্বান ?

এ নহে শীতের রাত্রি ঘন-অন্ধকার
ঝিল্লী-মুখরিত। কত পথ হয়ে পার
কৃষ্ণবাসে অঙ্গ ঢাকি, কৃষ্ণ অশ্বে চড়ি,
অপূর্ব্ব রহস্যময় বধূবেশ ধরি
আসে নি সে দ্বারদেশে কৃষ্ণাবগুণ্ঠনা,
নীরবে অঙ্গুলি তুলি করে নি উন্মনা।
কে এল তরণী বেয়ে পারে ? গুরু গুরু
ডাকে মেঘ। এবার কি যাত্রা হ'ল সুরু
নিরুদ্দেশ পানে ? দূর দিগন্তের শেষে
মিলাইয়া যায় তরী সূর্য্যাস্তের দেশে।

এখনো মধ্যাহ্নবেলা, এখনো যে দিন,
পূরবীর ছন্দে শেষ আরতির বীণ
এখনি বাজালে কেন ? চেয়ো না বিদায়,
এখনো যে এ পৃথিবী রহে প্রতীক্ষায়—
শুনিতে তোমার বাণী। না ফুরাতে কথা
কোথা তারে নিয়ে যাও জীবন-দেবতা ?

স্তব্ধ বিশ্ব নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভরে।
কন্যারূপী বঙ্গবাণী কহিছে কাতরে,
"যেতে নাহি দিব।" বেদনায় বিধুর অন্তর
উঠিছে করুণ কণ্ঠে সমবেত স্বর,
"যেতে মোরা দিব না তোমায়।" শোন, শোন,
মনে মনে অভিমান রেখো নাকো কোন,
ওগো বন্ধু, ওগো কবি, ওগো অভিমানী।
অন্তর উজাড় করি তারা দিল আনি
প্রীতির সম্ভার, ভরা অসীম বিশ্বাসে
নির্ভরতা, তারা তোমারেই ভালবাসে।

মনোরাজ্যে তব অভিষেক, ওগো কবি,
প্রাণের সম্রাট তুমি। জীবনের ছবি
আঁকিয়াছ অপরূপ তব কাব্যে গানে,
জীবন ঐশ্বর্য্যশালী তোমারি যে দানে।
কোটিপতি শ্রেষ্ঠী নহ দুর্দ্ধর্ষ সেনানী,
নহ রাষ্ট্রনেতা, তব অগ্নিময়ী বাণী
জগতে জাগালো এক নূতন বিস্ময়।
গাহিলে 'সুন্দর ধরা', 'জীবনের জয়'।

অনুপম, সৌম্যকান্তি, সুন্দর-দর্শন,
চোখে প্রতিভার জ্যোতি, প্রশান্ত-বদন,
শুভ্রবেশ, শুভ্রকেশ, স্নিগ্ধ কণ্ঠে যার
কনক-নিক্বণ, হৃদয়ে মাধুর্য্য আর
বাণীতে সুষমা,—নির্ভীক নিঃশঙ্ক বীর,
সত্যদ্রষ্টা, সৌন্দর্য্যপূজারী, পৃথিবীর
নূতন উদ্গাতা, প্রাণময় স্পর্শে তব
জেগে ওঠে এ সংসারে সৃষ্টি নব নব।
হে ভাস্বর, সঞ্জীবনী তোমার কবিতা,
প্রাণলোকে আলো তুমি, সুন্দর সবিতা।

দুর্য্যোগের ঘনঘটা ঘনাইয়া আসে
ভাগ্যহত ভারতের আকাশে বাতাসে
অতি নিদারুণ, সহস্র নাগের মত
রুদ্ধ বায়ু ফুঁসি ওঠে শ্বসি বার বার।

অগ্নিরাঙা পশ্চিম আকাশ, আজি তার
ভেঙে পড়ে সভ্যতার বিরাট্ প্রাসাদ,
বিচূর্ণ শিক্ষা ও শিল্প, সাধনা ও সাধ,
ধূমাচ্ছন্ন নভস্তল। কে আলো দেখাবে?
কে করিবে পথপ্রদর্শন? কে শেখাবে
অগ্নিমন্ত্র? কার বাণী বল দেবে বুকে?
কার পানে চাহি আজ দুঃখে আর সুখে?

যার চেয়ে সত্য, শ্রেয়, প্রিয় কেহ নাই,
সে মানুষ। অমৃতের পুত্র সে যে তাই।
সে মানব-ধর্ম্ম তুমি করিলে প্রচার।
নৈরাশ্যের মাঝে করি আশার সঞ্চার
অন্তর ছাপিয়া আর জগৎ প্লাবিয়া
করুণার গান তুমি বেড়ালে গাহিয়া।
পূজামন্ত্রে তব—নরনারী মাঝে জাগে
নিদ্রিত সে নারায়ণ, নবারুণ-রাগে
দীপ্ত প্রাণ, জেগে ওঠে সত্য ও সুন্দর
জাগে শিব, পরিপূর্ণ—আনন্দে অন্তর।

মনে পড়ে সেদিনের অস্ফুট কৈশোরে
অর্দ্ধ-জাগরণে আর অর্দ্ধ-স্বপ্নঘোরে
তোমারে লভিয়া হইলাম আত্মহারা,
অন্তরে সহস্র তন্ত্রী সুরে দিল সাড়া।
প্রিয়জন্ হ'তে মোর হ'লে তুমি প্রিয়,
একান্ত আপন হ'লে আত্মার আত্মীয়।

তুমি এলে আকস্মিক বিস্ময়ের মত
আমাদের মাঝে। উড়ে গেল ইতস্তত
ঝরা পাতা। বহিল দক্ষিণা। ফুলে ফুলে
ভরে গেল কানন-কান্তার। কূলে কূলে
ভরা নদী ছুটে চলে সাগরের পানে
উল্লসিয়া হৃদিতট উচ্ছ্বসিত গানে।
আম্রমুকুলের গন্ধে, মল্লিকা-সৌরভে
পবন উন্মাদ। মুখরিত দেবতার স্তবে
তপোবন। মিলে যায় ভবিষ্য-অতীত।
গঙ্গার তরঙ্গে বাজে সূর্য্যের সঙ্গীত।

বঙ্গের অঙ্গনে হ'ল বিশ্ব উপস্থিত
সুরের সভায়। শ্রান্ত জীবনে সম্বিৎ
ফিরে এল। মিটে গেল সকল অভাব।
কোন্ নব-দেবতার হ'ল আবির্ভাব?

পূর্ণিমা ফুরায়ে যায়। বিষণ্ণ-অন্তর,
নতদৃষ্টি, নিষ্পলক, পাণ্ডুর-অধর
ক্লান্ত চাঁদ চেয়ে থাকে ধরণীর পানে—
বিলুণ্ঠিতা বাক্যহারা ধূলির শয়ানে।
সে ব্যথাতুরারে চাঁদের চোখের জল
জ্যোৎস্না হয়ে অভিষিক্ত করে অবিরল।
সভাভঙ্গ হয়ে গেছে। নিরুৎসব ধরা।
তপোহীন তপোবনে আসে না অপ্সরা।

জাগো রবি! নিবে গেল পূর্ণিমার শশী!
জাগো রবি, অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী
অস্তে গেছে—ফিরিবে না আর। জাগো রবি,
অন্ধকারে বিলুপ্ত পৃথিবী। জাগো রবি!
খোল আঁখি, কথা কও, হে আমার কবি।
মেল আঁখি, মানসে যে মুদিত কমল।
মেল আঁখি, চেয়ে দেখ কত যে দুর্ব্বল
মোরা, আজ কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়,
বিক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁদে দুঃসহ ব্যথায়।
জাগো, জাগো, জাগো রবি, জীবনের জয়
গাও পুনর্ব্বার। দাও বল, হে নির্ভয়,
জাগো—নব-প্রেরণায় জাগাও জাতিরে।
জাগো রবি! এস ফিরে এ শূন্য মন্দিরে॥

তোমারে হারাতে পারি? শুধু এ সান্ত্বনা,
রচয়িতা আছে সেথা যেথায় রচনা।
হৃদয়ের অফুরন্ত উৎসের ধারায়—
বাজে সুর চন্দ্রে সূর্য্যে তারায় তারায়,
তৃণে তৃণে পত্রে পুষ্পে কম-কিশলয়ে,
বিক্ষুব্ধ ঝটিকাবর্ত্তে, মধুর মলয়ে,
তটিনীর কলনাদে, সিন্ধুর ক্রন্দনে,
জনারণ্যে, অন্তরের নিভৃত নির্জ্জনে
বাজে ছন্দে অন্তহীন আনন্দের গান।
নেবে না নেবে না আলো, রবি অনির্ব্বাণ॥
হে অম্লান জ্যোতির্ম্ময়, হে চির-সুন্দর,
তোমার সৃষ্টির মাঝে তুমি যে অমর।
সৌন্দর্য্যের, আলোকের, আনন্দের কবি
মনের আকাশে দীপ্ত চিরন্তন রবি।

বাংলায় বৈদ্যবিদ্যা ও বৈদ্যশাস্ত্র

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ইংরেজীর অধ্যয়ন-অধ্যাপন ভারতের মধ্যে প্রথম আরম্ভ হইল বাংলা দেশে। বাংলা দেশই অন্য প্রদেশের অপেক্ষা প্রথমে ইংরেজী ভাবাপন্ন হয়। তবু আজ পর্য্যন্ত ভারতে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশেই আয়ুর্ব্বেদের প্রচার বেশি। উত্তর-ভারতে তো সকল স্থলে য়ুনানী হাকিমী চিকিৎসাতেই ভরিয়া গিয়াছিল। যদিও তাহার মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালী বহু পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে, তবু সেই সব প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন ছিল না। উত্তর-ভারতে আজ যে প্রদেশে প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুজ্জীবন হইতেছে তাহাতেও প্রায় সর্ব্বত্রই বাঙালী কবিরাজগণ অথবা তাঁহাদের ছাত্রগণই শিক্ষাগুরু।

গ্রন্থ, টীকা, টিপ্‌পনী প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যত কিছু অঙ্গ দেখা যায়, যাহা অধীত হয়, তাহা প্রায়ই বাংলা দেশে। তাহার একটু গূঢ় হেতুও আছে।

বেদের মধ্যে আমরা কয়েকটি ব্যাধি ও কয়েকটি গাছ-গাছড়ার ঔষধের নাম পাই। তার পর ভারতবর্ষে যে অপূর্ব্ব বিশাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ভব হইল তাহাতে হয়তো এদেশীয় আর্য্যপূর্ব্ব গাছগাছড়া ও অন্যান্য স্থাবর-জঙ্গমাদি বিষ ও নানা ধাতুর অভিজ্ঞতা মিশ্রিত। কাজেই এই শাস্ত্রে আর্য্য-অনার্য্য জ্ঞানের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হইয়াছে।

বাংলা দেশটিও ঠিক ঐরূপ একটি সন্ধিস্থান। আর্য্য-অনার্য্য সভ্যতারও একটি অপূর্ব্ব সম্মেলন এখানে হইয়াছে। হয়তো এই সব কারণেই এখানে এই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি ও সংরক্ষণ হয়। পরে অন্যান্য প্রদেশে যখন আয়ুর্ব্বেদের স্থান হেকিমী শাস্ত্র গ্রহণ করিল তখনও বাংলা দেশে কবিরাজরা নানা গ্রন্থের টীকায় টিপ্‌পনীর রচনাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে জীবন্ত রাখিলেন। অন্যান্য দেশে যখন হিন্দু রাজাদেরও মুসলমান হেকিম নিযুক্ত হইলেন তখন বাংলা দেশে মুসলমান রাজার চিকিৎসক ছিলেন বৈদ্য কবিরাজ। পাবনা মালঞ্চীবাসী শিবদাস সেন ছিলেন বার্ব্বেক সাহের সভা-বৈদ্য। বার্ব্বেক সাহ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন।

অন্যান্য প্রদেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া চিকিৎসকরা দুই-একখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি সিদ্ধযোগ ও ঔষধের তালিকা দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। বৈদ্যশাস্ত্রের কিছু পঠন-পাঠন কেরল মালাবারে ছিল আর সর্ব্বত্র বড়ই দুর্দ্দশা গিয়াছে।

রাজপুতানায় ও কাঠিয়াওয়াড় জৈন ভাণ্ডারে দেখিয়াছি বঙ্গাক্ষরে লেখা বৈদ্য-গ্রন্থ সংগৃহীত। কাঠিয়াওয়াড় সায়লাতে গ্রন্থভাণ্ডারে এইরূপ দুইখানি বাংলায় লেখা যোগ-ঔষধি গ্রন্থ আছে। বহুদিন ধরিয়া নানা প্রদেশ হইতে বাংলা দেশেই ছাত্রেরা বৈদ্যশাস্ত্র পড়িতে আসিতেন। গঙ্গাধর-দ্বারিকানাথের ছাত্র গুজরাটে রাজপুতানায় ও পঞ্চনদে দেখিয়াছি।

অতি প্রাচীন কবিরাজ বংশে আমার জন্ম। বাল্যকালে এই শাস্ত্র পড়িতেও হইয়াছে। তাই এই শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থের নাম ও পরিচয় আমাদের জানার কথা। বাংলা দেশের বৈদ্যশাস্ত্রের তালিকার কতক মালমশলাও আমার হাতে ছিল। তাহা লইয়া যখন একটি বিবরণী প্রকাশ করিতে যাইব তখন দেখি শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় এই বিষয়ে "The Vaidyaka Literature of Bengal, in the Early Medieval Period" নামে একটি ভাল প্রবন্ধ Indian Culture পত্রের ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধটিতে আমার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া গেল। আমাদের স্বভাবের মধ্যে বিপুল আলস্য আছে। তাই ভাবিলাম আমি যদি সামান্য দুই-একটি কথা লিখি তবেই হইবে। যাঁহারা আরও কিছু জানিতে চাহিবেন তাঁহাদের ঐ প্রবন্ধটি দেখিলেই হইবে।

বৌদ্ধ সাধুরা নানা দেশে বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারে যাইতেন। প্রচারের এক প্রধান অঙ্গ ছিল লোকসেবা। লোক-সেবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ চিকিৎসা। তাই বৌদ্ধ সাধুরা অনেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতেন। ভারতের বাহিরে যেখানে যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গিয়াছে সেইখানেই ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সুদূর সাইবেরিয়াতে পর্য্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। তাই এই দেশে চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

তান্ত্রিকরাও চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন করিতেন। রস চিকিৎসা ও বিষ চিকিৎসা প্রায় তাঁহাদেরই এক-চেটিয়া ছিল। অল্প দিন পূর্ব্বেও বাংলার বাহিরের চিকিৎসকরা রসাদি ধাতু নিজেরা পাক করিতেন না। বাঙ্গালী চিকিৎসকদের দিয়া পাক করাইয়া লইতেন।

বৌদ্ধসাধনা ও তন্ত্রের পীঠস্থান বলিয়া বাংলাদেশে আয়ুর্বেদের বিশেষতঃ রসাদি চিকিৎসার যথেষ্ট প্রচার আছে। বৈদ্যশাস্ত্রের চর্চা বাংলা দেশে এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে (২৩ শ শ্লোকে) দেখি তিনি ছিলেন—

…"আয়ুর্বেদাস্ত্রবেদপ্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়ঃ…"

উপাধ্যায় শূলপাণি তাঁহার যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ব্যাখ্যায় নানা স্থানে আপন গভীর আয়ুর্বেদ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

নিদান-রচয়িতা মাধব করের নাম বাংলায় জানেন না এমন বৈদ্য কেহ নাই। তাঁহার নিদান গ্রন্থের আরম্ভে শিব প্রণতিতে বুঝা যায় তিনি শৈব। অন্তভাগে তিনি পরিচয় দিয়াছেন—

"শ্রীমাধবেনেন্দুকরাত্মজেন"

(বিষয়ানুক্রমণিকার উপান্ত শ্লোক)

অর্থাৎ ইন্দু করের পুত্র শ্রীমাধবের সংগৃহীত এই গ্রন্থ। অমরকোষ টীকাকার ক্ষীরস্বামী (১১শ শতাব্দী) তাঁহার বিখ্যাত টীকায় ইন্দুকৃত নিঘণ্টুর উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের এক টীকাকার ইন্দুর সন্ধান মিলিয়াছে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের পুঁথিশালায় ইন্দুকৃত শশি-লেখা টীকা পাওয়া গিয়াছে। এই দুখানিই চিকিৎসা গ্রন্থ। ইন্দু তখন খুব চলিত নাম নহে। তাই মনে হয় সম্ভবত এই ইন্দুই মাধব করের পিতা।

মাধব-নিদান ছাড়া বাংলায় বৈদ্যদের এক মুহূর্ত্ত চলে না। মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য বিজয় রক্ষিত ব্যাখ্যামধুকোষ নামে তাহার টীকায় কতক অংশ রচনা করেন। নিদান গ্রন্থখানি পূর্ব্বে বিষনিদানের পরই (৮১ অধ্যায়) সমাপ্ত হইয়াছিল। বিজয় রক্ষিত তাহার মধ্যে ৩৫টি অধ্যায়ের অর্থাৎ উদর-নিদান পর্য্যন্ত টীকা করিয়া পরলোক গমন করেন। তার পর সেই টীকা সম্পূর্ণ করেন তাঁর শিষ্য বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত। তার পর একটি পরিশিষ্ট ভাগ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যামধুকোষ টীকা সমাপ্ত হইয়া গেলেও পরিশিষ্ট ভাগের টীকাও ঐ নামেই চলিত হইয়াছে। হর্ণেল সাহেব মনে করেন বিজয় রক্ষিতের সময় ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। বিজয় রক্ষিত ছিলেন আরোগ্যশালা অর্থাৎ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। তাই তাঁহার উপাধি দেখা যায় আরোগ্য-শালীয়।

শ্রীকণ্ঠ দত্ত ছাড়াও বিজয় রক্ষিতের আরও যোগ্য সব ছাত্র ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কবিরাজ নিশ্চল কর তাঁহার গুরু বিজয় রক্ষিতের স্বর্গ গমনের পর গুরুর উপদেশ অবলম্বনে চক্রদত্তের একটি টীকা রচনা করেন। কিন্তু পরে শিবদাস সেনের টীকা এমন উৎকৃষ্ট হইল যে নিশ্চল-কৃত টীকা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল।

কবিরাজ শ্রীকণ্ঠ দত্তও স্বতন্ত্র ভাবে বৃন্দ-কৃত সিদ্ধযোগের একটি টীকা লেখেন। এই টীকার নাম কুসুমাবলী।

বিজয় রক্ষিতের সময় যদি ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ হয় তবে নিশ্চল কর, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতির সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ সিদ্ধ হয়।

বিজয় রক্ষিত তাঁহার টীকায় প্রথম নমস্কার শ্লোকের পরেই কয়েক জন প্রাচীন মহাবৈদ্যের নাম করিয়াছেন।

ভট্টার জেজ্জড় গদাধর বাপ্যচন্দ্র
শ্রীচক্রপাণি বকুলেশ্বর সেন ভবৈঃ।
ঈশান-কার্ত্তিক-সুধীর-সুকীরবৈদ্য
মৈত্রেয়মাধবমুখৈর্লিখিতং বিচিন্ত্য।

কাশ্মীরে মাধব করের প্রভূত সম্মান। কাশ্মীরীয় আচার্য্য দৃঢ়বল তাঁহার চরক-সংহিতায় মাধব নিদানের অনেক সহায়তা লইয়াছেন। বগদাদের খলিফা মনসুর (৭৫৩-৭৭৪ খ্রীঃ) ও হারুণের (৭৮৬-৮০৮ খ্রীঃ) আজ্ঞায় এই গ্রন্থখানি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। কাজেই মাধবের সময় সপ্তম শতাব্দী হওয়াই সঙ্গত।

মাধবের "চিকিৎসা"ও বৈদ্যগণের আদরণীয় গ্রন্থ। তাঁহার "কূটমুদ্গর" হইল খাদ্য ও পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক। কিন্তু তাঁহার "দ্রব্যগুণ" ও "সুশ্রুত টীকা"র পরিচয় এখন নানা গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া গেলেও আর গ্রন্থাকারে পাওয়া যায় না। "পর্য্যায় রত্নমালা" গ্রন্থখানির রচয়িতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে। তাহাতে ভোজ্য-পানীয়-স্নান-বাস-দিনকৃত্যাদির বিচার আছে। ইহাতে লিখিত বস্তুর নামগুলি বাংলা দেশে প্রচলিত নাম। নিদানেও তাঁহার আমবাত প্রভৃতি অধ্যায়ধৃত নামগুলি বাংলা দেশের।

বাংলা দেশে তাঁহার বংশীয় কর-উপাধিধারী বৈদ্য অনেক আছেন।

সিদ্ধযোগ-প্রণেতা বৃন্দমাধবকে বৃথা কেহ কেহ মাধব করের সঙ্গে গোলমাল করেন। মাধবেরই নিদানের

প্রণালীতে তিনি তাঁহার সিদ্ধযোগ গ্রন্থ লেখেন। আবার ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে চক্রপাণি দত্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ চক্রদত্ত লেখেন। বৃন্দের টীকাকারও শ্রীকণ্ঠ দত্ত।

চক্রদত্ত তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্তিতে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা এই—

> গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারিপাত্র
> নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োন্তরঙ্গাৎ।
> ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
> শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী।

অর্থাৎ গৌড়াধিনাথ নরপালদেবের পাকশালার অধ্যক্ষ "অন্তরঙ্গ" নারায়ণের পুত্র ভানুর অনুজ সুনীতিজ্ঞ লোধ্রবলী কুলীন শ্রীচক্রপাণি এই গ্রন্থের কর্তা। কেহ কেহ "অন্তরঙ্গ" শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন মন্ত্রী। শিবদাস সেন অন্তরঙ্গ অর্থে বলিয়াছেন অভিজাত বংশের বিশ্বস্ত বৈদ্য।

চক্রদত্তের পিতা নারায়ণ কে? শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৫ খ্রীঃ) এক নারায়ণ কবিরাজের শ্লোক গৃহীত আছে। "রত্নমালাধ্যায়া" নামে বৈদ্যকনাম-মালাও নারায়ণ-রচিত, তিনিও "অন্তরঙ্গ"। তবেই কি তিনি এই নারায়ণই?

চক্রপাণির গুরুর নাম নরদত্ত। তিনি চরক-সংহিতার এক জন উত্তম ব্যাখ্যাতা। চক্রদত্তও সেই গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন।

চিকিৎসা-সার বা গূঢ়বাক্যবোধক গ্রন্থও চক্রপাণি-রচিত। বনৌষধির নামগুলিরও গুণাগুণের একটি নিঘণ্টু বা দ্রব্যগুণ সংগ্রহ তাঁহার রচিত। শিবদাস সেন তাহার একটি টীকা রচনা করিয়াছেন। কাষ্ঠাদি ও রসাদি (অর্থাৎ বনৌষধির ও ধাতু-ঔষধির) নামগুলির একটি "শব্দ-চন্দ্রিকা"ও তিনি রচনা করেন। ভানুমতী নামে সুশ্রুতের এবং আয়ুর্ব্বেদদীপিকা নামে চরকের ব্যাখ্যাও তাঁহারই রচনা। সর্ব্বসারসংগ্রহকার চক্রপাণি দত্ত তিনি কিনা সন্দেহ।

রত্নপ্রভা নামে একখানি প্রাচীন টীকা অবলম্বন করিয়া শিবদাস সেন চক্রদত্তের একটি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। টীকাখানির নাম তত্ত্বচন্দ্রিকা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শিবদাসের বাড়ী পাবনা মালঞ্চী। তিনি সুলতান বারবক সাহের সভা-বৈদ্য ছিলেন (১৬শ শতাব্দী)।

বাগ্‌ভটের সময় হইতে চিকিৎসা-প্রকরণে কাষ্ঠাদির অর্থাৎ বনৌষধির সঙ্গে রসাদির অর্থাৎ ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবহার আরম্ভ হয়। চক্রপাণির সময়ে দেখা যায় ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সভা-বৈদ্য ছিলেন দেবগণ। এই গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গেই কি রাজেন্দ্র চোলের যুদ্ধ হয়? দেবগণ নামে কেমন একটু জৈনভাব আছে। দেবগণের পৌত্র কবি-কদম্ব-চক্রবর্ত্তী গদাধর ছিলেন বঙ্গের রাজা রামপালের সভা-বৈদ্য। ভদ্রেশ্বরের পুত্র সুরেশ্বর বা সুরপাল ছিলেন পাদীশ্বর ভীমপালের অন্তরঙ্গ সভা-বৈদ্য। তিনি শব্দপ্রদীপ নামে একটি বনৌষধিকোষ রচনা করেন। লোহ-পদ্ধতি বা লোহ-সর্বস্ব নামে সুরেশ্বরের একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি নাগরাক্ষরে লেখা। সুশ্রুত, হারীত, ব্যাড়ি, নাগার্জ্জুন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে তিনি লোহের আময়িক প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকে মনে করেন তিনি বৃক্ষায়ুর্বেদেরও রচয়িতা এবং এই গ্রন্থখানি শার্ঙ্গধর পদ্ধতিকারের (১৩৬৩ খ্রীঃ) পরিচিত ছিল। লোহ-পদ্ধতিতে দেখা যায় সুরেশ্বরেরও উপাধি ছিল কবীশ্বর বা কবিরাজ।

চিকিৎসাসারসংগ্রহরচয়িতা বঙ্গ সেন ব্যাকরণেও মহা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত আখ্যাতবৃত্তি কলাপ-ব্যাকরণশিক্ষার্থীদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ। চিকিৎসাসার-সংগ্রহের দুইখানি পুঁথির কথা ভাণ্ডারকরের ডেকান কলেজের পুঁথির তালিকায় দেখা যায়। পুঁথি দুইখানি লেখার সময় ১৩১৯—২০ খ্রীঃ। তবেই বুঝা যায় তিনি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু অন্য প্রমাণে বুঝা যায় তিনি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বা কাছাকাছি জীবিত ছিলেন।

তাঁহার গৃহপতির নাম গদাধর। সুশ্রুতটীকায় এক গদাধরের নাম পাওয়া যায়। বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগটীকায় শ্রীকণ্ঠ দত্তও এক গদাধরের নাম করিয়াছেন। শ্রীধর দাস কৃত সদুক্তিকর্ণামৃতের (১২০৫) মধ্যে বৈদ্য গদাধরের রচনা দেখা যায়। বিজয় রক্ষিত ও তাঁহার মাধবীয় নিদান-টীকার প্রারম্ভে আচার্য্যগণের মধ্যে গদাধরের নাম করিয়াছেন। তবে কি বঙ্গ সেনের গৃহপতি গদাধরের নামই এই সব নানা স্থলে পাওয়া যায়?

যাদবরাজা রামচন্দ্রের সমকালীন হেমাদ্রি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকায় বহু স্থলে বঙ্গসেন হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাদব রামচন্দ্রের রাজত্ব কাল ১২৭১—১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ। হেমাদ্রি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কাজেই বঙ্গ সেন নিশ্চয়ই তাঁহার কিছুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী। বাংলা দেশ হইতে এতটা দূরে গ্রন্থ-খানির খ্যাতি পৌঁছিতেও কিছু কাল নিশ্চয় লাগিয়াছিল। কিন্তু তখনকার দিনেও প্রদেশে প্রদেশে বিদ্যালোচনার যে

এত ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল যে তাহা এখন চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সব প্রমাণের বলে শ্রীযুক্ত P. K. Gode মহাশয় বলেন বঙ্গ সেনের সময় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে।

বঙ্গ সেনের লেখাতে দেখা যায় তাঁহার নিবাস ছিল কাঞ্জিকা গ্রামে। ছান্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ-রচয়িতা নারায়ণের বাসস্থান ছিল রাঢ়ের কাঞ্জিবিল্লী গ্রামে, কাঞ্জিকা ও কাঞ্জিবিল্লী খুব সম্ভব একই গ্রামের নাম।

পরমেশ্বর রক্ষিতের গণাধ্যায়ও একখানা বৈদ্যক গ্রন্থ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সর্বাঙ্গসুন্দরাখ্যা টীকার রচয়িতা অরুণ দত্ত অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুশ্রুতেরও একটি টীকা তিনি রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম মৃগাঙ্ক দত্ত। নেত্রগঠন সম্বন্ধে তাঁহার মতকে বিজয় রক্ষিত খণ্ডন করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিতের সময় ১২৪০ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কাজেই অরুণ দত্তের সময় অন্ততঃ তাহার ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে হওয়া উচিত।

বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ কৃত টীকাসর্বস্ব নামে অমরকোষ টীকায় (১১৫৯ খ্রীঃ) ও বৃহস্পতি রায়মুকুটকৃত অমর টীকায় (১৪৩১ খ্রীঃ) শাব্দিক অরুণ দত্তের নাম পাওয়া যায়। বৈদ্য অরুণ দত্ত ও শাব্দিক অরুণ দত্ত একই ব্যক্তি কি না বলা কঠিন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় অন্যান্য শাস্ত্র রচনা ক্ষীণ হইয়া আসিল। কিন্তু সেই শতাব্দীতেই বিস্তর বৈদ্যক গ্রন্থ বাংলা দেশে রচিত হইয়াছিল।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড

মীরা—সৌদামিনী

১

লিণ্ডসে ক্রিসেণ্টে ফিরিয়াই একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম।

যখন বাসায় পৌঁছিলাম, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জামা জুতা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া একটা ডেক্-চেয়ারে গা এলাইয়া দিলাম। সাঁতরার এই কয়টি দিনের অভিজ্ঞতা এত ঘনীভূত, আর আমার বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এত বিভিন্ন যে মনে হইতেছে কত দূর আর কত দীর্ঘ এক প্রবাস হইতে ফিরিলাম যেন। কোন্‌টা যে প্রবাস তাহাও ঠিক বুঝিতেছি না। মনটা স্মৃতির ভারে বিষণ্ণ হইয়া আছে—সুখের স্মৃতি আবার সৌদামিনীর স্মৃতিও। বেশী মনে পড়িতেছে সৌদামিনীর কথাই,—আহা!...

নীচে লোক কেহ নাই, বাড়িটা থম্‌থম্ করিতেছে, এ সব বাড়ি করেই, আজ যেন বেশী। আমার মনের ঔদাসীন্যের জন্যই কি?

ইমাম্বুল আসিয়া উপস্থিত হইল; সেই রকম বিরহ-ক্লিষ্ট, হাতে একটি ফুলের তোড়া। সেলাম করিয়া, দন্ত বাহির করিয়া একটু হাসিল, প্রশ্ন করিল, "ভাল থাক-ছিলেন মাষ্টারবাবু?"

বলিলাম, "ছিলাম এক রকম। তোমার খবর কি ইমাম্বুল? বাড়িতে কাউকে দেখি না যে?"

ইমাম্বুল বলিল, "আপনাকে আসতে দেখে ভাবলাম একটা তোড়া দিয়ে আসি। দাঁড়ান, রেখে আসি এটা অন্দরে।"

তোড়াটা ফুলদানিতে বসাইয়া ইমাম্বুল আমার সামনে থামে ঠেস দিয়া বসিল, বলিল, "দিদিমণিরা বাইরে গেছেন। ... মদন ক্লীনার একটা কথা বললে মাষ্টার বাবু, বলে পাদরিকে লিখে কিছু হবে না, বলে তাকেই সোজা লেখ, সে ত সাবালিকা হয়েছে..."

একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "লিখেছ না কি?"

ইমাম্বুল লজ্জিত ভাবে একবার আমার পানে চাহিয়া ঘাড়টা নীচু করিল। উত্তরটা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "না, বলছিলাম—নিয়েছ লিখিয়ে কাউকে দিয়ে?"

ইমাহুল লজ্জিত ভাবে বলিল, "ইংরিজীতে লিখতে হবে…"

বলিলাম, "ও! তাও ত বটে, তা দোব লিখে।"

সামান্ত একটু থামিয়া ইমাহুল বলিল, "মদন ক্লীনার একটা পত্ত দিয়েছে মাষ্টারবাবু, সেটাও ইংরিজীতে তর্জমা…"

ইমাহুল বোধ হয় পত্তটা বাহির করিবার জন্তই ফতুয়ার পকেটে হাতটা সঁাদ করাইয়াছে, এমন সময় গেটে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। ইমাহুল অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেট খুলিতে ছুটিল।

গাড়ি-বারান্দায় মোটর আসিয়া দাঁড়াইলে মীরা আর তরু নামিল। আমাকে দেখিয়াই মীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "এসে গেছেন তাহ'লে আপনি? ভাবছিলাম আপনাকে গাড়ি পাঠাব।… মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

মীরার দৃষ্টি খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, তবুও উৎকণ্ঠিতভাবে আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি উত্তর করিলাম, "না, আমি এই আসছি, করি নি ত দেখা এখনও।… কেন?"

"বলে নি কেউ? ভুটানী মারা যাওয়ার পর থেকে মা বড্ড বেশী…"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "মারা গেছে ভুটানী?"

মীরা বলিল, "ইমাহুল ব'সে ছিল না আপনার কাছে? —বলে নি? উজবুক একটা; আসতেই বুঝি নিজের পোষ্টকার্ড এনে হাজির করেছে? ··আসুন ভেতরে। তরু তুমি জামা কাপড় ছেড়ে মার কাছে গিয়ে ব'সো, আমি আসছি।"

ভিতরে গিয়া ফ্যানটা খুলিয়া দিয়া মীরা একটা সোফায় বসিল। আমি সামনে একটা চেয়ারে বসিলাম। মীরা বলিতে লাগিল, "ভুটানী এক রকম হঠাৎই ·কাল বিকেলে মারা গেল, যদিও ও যে আর বেশী দিন নয় এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছিল। মারা যেতে মা একেবারে আশ্চর্য্য-রকম উতলা হয়ে উঠলেন, শৈলেনবাবু। ঠিক যে শোকের ভাব তা নয়; অদ্ভুত রকম একটা নার্ভাসনেস্। বাড়িতে বাবা নেই—এখনও আসেন নি তিনি, পূর্ণিয়ার কেসটা নিয়ে আটকা প'ড়ে গেছেন— আমি যে কী অবস্থায় প'ড়ে গেলাম বলতে পারি না। আপনি থাকলেও একটা পরামর্শ করবার লোক পেতাম···কোন্ ক'রে সরমাদি আর শ্রীশবাবুকে ডেকে আনলাম। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ডাক্তার রায়কে ফোন করা হ'ল। তিনি সব শুনে বললেন তাঁর আসাটাই ভুল হবে, কেন না মার ত হয় নি কিছু, শুধু একটা ভয়ানক নার্ভাস শক্ পেয়েছেন, বরং এ অবস্থায় ডাক্তারকে দেখলে উল্‌টই ফল হওয়ার সম্ভাবনা। বললেন বরং যদি কাঁদবার ঝোঁক থাকে ত কাঁদতেই দেওয়া ভাল। কিন্তু কাঁদবার ঝোঁক নয় ত, একটা যেন ভয়ঙ্কর ভয়ের ভাব। বেশীর ভাগই চুপ ক'রে থাকেন, মাঝে মাঝে শুধু বলেন—তাহলে আমার কি হবে? ···সে যে কী অবস্থায় কেটেছে আমাদের বলতে পারি না শৈলেনবাবু। বাবাকে আজ সকালেই টেলিগ্রাম করেছিলাম, এখনও উত্তর পাই নি। তিনিও যে কেমন আছেন…"

মীরা তাহার বাবার সম্বন্ধে সভয় উল্লেখ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ একবার একটু ছল ছল করিয়া উঠিয়াই দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নামিল। মীরা সোফার হাতলে মুখ গুঁজিয়া কচি মেয়ের মত কাঁদিয়া উঠিল।

ওর চব্বিশঘণ্টাব্যাপী নিঃসহায় ভাব, ক্লান্তি, উদ্বেগ, আর বাবার উত্তর না পাওয়ায় এই আশঙ্কা ও অভিমান—সব একসঙ্গে ওকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কারণটা নিশ্চয় এই যে, এমন একজনকে কাছে পাইয়াছে যাহার উপর ওর একটা আন্তরিক নির্ভর আছে। সমবেদনায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কী করি আমি?

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল মীরা। আমি নিরুপায়ভাবে খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর নিজের চিন্তাধারা খানিকটা গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, আপনি শান্ত হ'ন। বিপদের সময় অতটা ব্যাকুল হ'লে চলে কি? মিষ্টার রায়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই; তিনি নিশ্চয় কাজ নিয়ে ওখান থেকে আবার অন্ত কোথাও গেছেন, কাল সকাল পর্য্যন্ত খবর পাওয়া যাবে। কিংবা এও হ'তে পারে আপনার টেলিগ্রাম পৌছবার আগেই উনি বেরিয়ে পড়েছেন। আপনি স্থির হ'ন। আর মার সম্বন্ধে আপনি একটু বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। ওঁর শরীরটা দুর্বল নিশ্চয়, কিন্তু ওঁর মাথা বেশ পরিষ্কার আছে, এই আঘাতে অন্য কোন রকম ভয়ের সম্ভাবনা নেই। ওঁর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা খুব দরকারী—জানি না সেটা করা হ'য়েছে কি না—আপনি যে রকম বিচলিত হয়ে পড়েছেন।"

মীরা অনেকটা সংযত করিয়া লইয়াছে নিজেকে। আমি থামিতে মুখটা একটু তুলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। বলিলাম, "ওঁকে ও ঘরটা বদলে অন্য

ঘরে আনা দরকার কয়েক দিনের জন্যে। অষ্টপ্রহর ভুটানীর সঙ্গে যে রকম ছিলেন ওখানে তাতে···"

ব্যাপারটা সামান্যই কিন্তু মীরা যেন একটা আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মিনতির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি বলুন ওঁকে। সত্যিই বড় ভাল হয় তাহ'লে।"

বলিলাম, "আমি বলছি গিয়ে, রাজিও করব। আপনি আসবেন কি?"

মীরা চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিল। বলিল, "আপনি একলাই যান। যে নিজে অভিভূত হ'য়ে পড়ে নি এমন লোকই থাকা দরকার ওঁর কাছে। আমার মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া আছে, মা আমায় দেখে আরও যেন আকুল হয়ে ওঠেন শৈলেনবাবু। আমি বুঝছি, অথচ···"

নিরুপায় করুণ দৃষ্টিতে মীরা আমার পানে চাহিল। চক্ষু আবার ভবভব করিয়া উঠিতেছে। দেখিলে কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় নিজের হাতে মুছাইয়া দিই অশ্রুবিন্দু দুইটি।

সেই মীরা আজ আমার কাছে এত দুর্বল হইয়া পড়িল? গভীর দুঃখই কি আসল সম্বন্ধের কষ্টিপাথর?

বলিলাম, "তাহ'লে আমি একাই যাচ্ছি, সেই ভাল হবে বরং। আপনি আর ভাববেন না।"

যে ছোট, আর স্বীয় অন্তরের খুব নিকট তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সময় যেমন একটা মৃদু তিরস্কারের মিশ্রণ থাকে সেই ভাবে বলিলাম, "অত উতলা হয় কখন মানুষে? দেখুন তো!—ছিঃ।"

২

অপর্ণা দেবীর ঘরের সামনে গিয়া ডাকিলাম, "তরু আছ?"

উত্তর করিলেন অপর্ণা দেবী, "কে, শৈলেন? এস।"

পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে গিয়াছি, তরু আসিয়া আমার হাতটা ধরিল। ও বেচারি যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে, বুঝিতেছি আমায় পাইয়া অনেকটা ভরসা হইয়াছে। অপর্ণা দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া তরুকে লইয়া একটা সোফায় বসিলাম। অপর্ণা দেবী একটা হেলান-চেয়ারে বসিয়া আমি আসিবার পূর্বে বোধ হয় একটা বই পড়িতেছিলেন। পায়ের কাছে বিলাস ঝি বসিয়া তরুর সঙ্গে বোধ হয় তরুর প্রাইজ-বইয়ের ছবি দেখিতেছিল। দেখিলাম কতকগুলা বই ছড়ান রহিয়াছে।

চরণ স্পর্শ করিতে অপর্ণা দেবী বলিলেন, "এসে গেছ তুমি? ভালই হ'ল; এরা দুই বোনে বড্ড ভয় পেয়ে গেছে।"

তরুর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তরু ভেবেছে ওর মা এবার ম'রে যাবে, মীরা ভেবেছে পাগল হয়ে যাবে।"

আমি আর মীরা তরুর দোষ ধরিব কি, ওঁর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। বিলাস মুখ তুলিয়া বলিল, "বড় মিছে ভাবে নি, কাল তোমার ভাবগতিক ঐ রকমই দাঁড়িয়েছিল, বরং আজ সকাল পর্য্যন্ত বলতে পারি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বুড়ীটা ছিল এত দিন কাছে কাছে, হঠাৎ মারা গেল, কষ্ট হয়েছিল যে এ-কথা অস্বীকার করব না; কিন্তু সত্যিই কি আমি এতই অধীর হয়ে পড়েছিলাম?"

বিলাস ঝি বলিল, "অধীর হওয়া বরং ভাল, তুমি একেবারে গুম্ হয়ে ব'সে থেকে যে আরও ভাবিয়ে তুললে।"

অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "ঐ শোন শৈলেন। শুধু শোকে কেন, যে কোন অবস্থাতেই মানুষ দুটি উপায়ে কাটাতে পারে—হয় চঞ্চল হয়ে, না-হয় শান্ত হয়ে। যদি একটু অধৈর্য্য হতাম, এরা বলত শোকে উন্মাদ হয়ে গেল; শান্ত হয়ে ছিলাম, এখন বলছে—সে আরও ভাবনার কথা।···তোরা বুঝি ভেবেছিলি বিলাস, আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেছে, আর বেশীক্ষণ নয়?"

অপর্ণা দেবী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বিলাস রাগিয়া উঠিয়া নথ নাড়িয়া বলিল, "তা ব'লে তুমি বাপু যেখান সেখান থেকে ঐ সব নেপালী-ভুটানী টেনে আর বাড়িতে তুলতে পারবে না, এই আমি ব'লে দিলাম। যত সব অনৈরণ তোমার। জানা নেই, শোনা নেই···"

এমন সময় পর্দার বাহির হইতে রাজু বেয়ারার গলা শোনা গেল, "বিলাস, বড়দিদিমণি ডাকছেন তোমায় একবার।"

বিলাস উঠিয়া গেল। বোধ হয় আমার কথাবার্তার সুবিধার জন্যই মীরা তাহাকে সরাইয়া লইল। বাকি সুবিধাটুকু অন্য প্রকারে হইয়া পড়িল। অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "মীরার এই অবস্থা,—ক্রমাগতই বিলাসকে ডেকে পাঠিয়ে খবর নিচ্ছে, মা আছে কি গেল। এদিকে তরু একেবারে আগলে আছে ওর মাকে—পাছে ভুটানী-বুড়ী ডেকে নেয়।"

তরু অভিমানের সুরে বলিল, "যাও, ভারি দুষ্টু তুমি মা।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "দুষ্টু মা যাওয়াই তো ভাল। বেশ একটা ভাল মা আসবে···"

দেখিলাম অপর্ণা দেবী ভুল করিতেছেন। তরুর মুখটা জলভরা মেঘের মত থম্ থম্ করিয়া উঠিয়াছে, এ ধরণের কথা আর একটু চালাইলেই ও আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিবে না। বলিলাম, "হ্যাঁ, তরু তুমি বরং যাও, বইটইগুলো ঠিক ক'রে রাখ গিয়ে। ভয় নেই, পড়তে হবে না, এসে একবার দেখে নিচ্ছি, এ ক'টা দিনে কোন্ পড়া কত দূর এগুল। যাও তুমি।"

তরু চলিয়া গেলে অপর্ণা দেবী অনেকক্ষণ দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন। হঠাৎ এই চুপচাপের ভাবটা ক্রমেই বড় অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। আরও একটা ব্যাপার—দু-একবার চোখ তুলিয়া দেখিলাম অপর্ণা দেবীর আনমিত মুখের ভাবটা ক্রমেই পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে—কেমন একটা গম্ভীর, চিন্তিত ভাব, প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা বিভীষিকার অতলে তলাইয়া যাইতেছেন।

সহসা মুখ তুলিয়া এমন ভাবে চাহিলেন, বেশ টের পাওয়া গেল আমার উপস্থিতির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইলেন। চেয়ারে মাথাটা হেলাইয়া দিয়া সুপ্তোত্থিতের মত দুই হাতে নিজের মুখটা একবার মুছিয়া লইলেন, তাহার পর আবার সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "শৈলেন, তুমি এসেছ ভাল হয়েছে।"

ঐটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। একটু পরে অপর্ণা দেবী আবার বলিতে লাগিলেন, "ভুটানীর মৃত্যুটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে শৈলেন; অবশ্য তুমি আর কি করবে, তবুও যেন একজন কাউকে না বললে মনটা হাল্কা হচ্ছে না। তোমার মনে থাকতে পারে এক দিন তুমি জিজ্ঞেস করতে ভুটানীর সম্বন্ধে আমার আশঙ্কার কথা তোমায় বলেছিলাম আমি। তোমায় বলেছিলাম—মনের গতি বড় দুর্জ্ঞেয়, যখন ভাবা যায় বাইরের কোন একটা জিনিসকে আশ্রয় করে উঠছে, তখন হয়ত সে ভেতরে ভেতরে আরও নিজের চিন্তা নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা বড় সাংঘাতিক, আর ভুটানীর ব্যাপারে ঠিক এই কাণ্ডটাই হ'ল। ওকে নিয়ে আমার একটা পরীক্ষা চলছিল জানই। শেষের দিকে এই পরীক্ষাটা আশ্চর্য্য রকম সফল হয়ে আসছিল। বুড়ী এদিকে একেবারে বুদ্ধ-গতপ্রাণ হয়ে উঠল। ওর পুজোটা ব'সে ব'সে খালি বুদ্ধের জপ থেকে বুদ্ধের সেবায় গিয়ে দাঁড়াল—বৈষ্ণবেরা সেবার মধ্যে দিয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে—ধোওয়ান, মোছান, সাজান। অল্প উত্তেজনাতেই সে 'বেটা-বেটা' ক'রে উঠত, সে ভাবটাও কমে এল আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য পরিবর্তন এই হ'ল যে ওর মনটা যে নিঝুম মেরে থাকত, সেটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল হয়ে উঠল। আমি ঝোঁকের মাথায় বৌদ্ধধর্মের কিছু বই আনিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম, ইচ্ছা ছিল ধর্মের স্থূল কথাগুলো বুড়ীর মনে আস্তে আস্তে সাঁদ করাব। ওদিকে আলোচনার মধ্যে একেবারেই আসতে চাইত না, কিন্তু এদানী নিজেই এসে বুদ্ধ সম্বন্ধে আর তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করত, বললে মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করত, বেশ বোঝা যেত সে যেন নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। তার পর আবার হঠাৎ বদলে গেল বুড়ী। তরশু দিন বিকেলে আমি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়াতে গেলেই বুড়ী সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেদিন জানিয়ে দিলে বুকটা একটু কেমন করছে, যাবে না। ফিরে এসে দেখি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের মূর্তিটাকে বুকে চেপে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আর ওর নিজের ভাষায় বিড় বিড় ক'রে কি বলছে। পেছন ফিরে ছিল ব'লে আমায় দেখতে পায় নি, যখন টের পেলে আমি এসেছি, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে আমার কাছে এসে ব'সে নিজে থেকেই বুদ্ধের কথা পাড়লে।···সন্ধ্যে থেকে ওর জ্বর এল, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে এক-শ পাঁচ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ঠেলে উঠে বিকার আরম্ভ হ'ল—শুধু ছেলের কথা। সে যে কী কষ্টকর ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস হয় না শৈলেন। ওর নিজের ভাষা বুঝি না, কিন্তু যেন মনে হচ্ছে ও ওর ছেলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন যেন দেখা পেয়েছে, বাড়ি যাবার জন্যে সাধছে। ছেলের বৌকে দেবে বলে বুড়ী ফুলকাটা ইটালিয়ান র‍্যাপার আর চব্বিশ ফলার ছুরিটা সর্বদাই বুকের কাছে রাখত—বিকারের ঝোঁকে এক-একবার ঝোলার মধ্যে হাত দিয়ে সেগুলো বের ক'রে আনবার চেষ্টা করছে, এক-একবার শূন্যদৃষ্টিতে কাতর ভাবে শুধু—'মেম সাহেব, বেটা দেও, বেটা দেও।'···ওর ছেলের সন্ধান নিতে যেমন কসুর করি নি, ডাক্তারের বেলাও সেই রকম আমার যথাসাধ্য করলাম, কিন্তু রোগের কিছুই উপায় হ'ল না। ডাক্তারেরা বললে ওর ব্রেণ অ্যাফেক্ট করেছে, রক্তেরও জোর নেই, কোন আশাই নেই। সমস্ত

রাত এক ভাবে গিয়ে সকালের দিকে বুড়ী একটু নিঝুম হয়ে পড়ল। বেলা যখন আটটা, সাড়ে আটটা, মনে হ'ল বুড়ীর যেন একটু একটু জ্ঞান ফিরে এসেছে। সেটা প্রদীপ নেভার আগে জলে ওঠা আর কি। তার পরই—ঘড়িতে ঠিক যখন ন'টা পনর হয়েছে, বিকারের শেষ ঝোঁকটা উঠে বুড়ী মারা গেল।"

অপর্ণা দেবী চুপ করিলেন। খুব সহজভাবে ব্যাপারটা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলেও বোঝা গেল তাঁহার মনের ওপর বেশ খানিকটা ঝোঁক পড়িয়াছে। শেষ করিবার পর তাহার প্রতিক্রিয়াটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। যেন যে-ব্যাপারটুকু এইমাত্র বর্ণনা করিয়া গেলেন, সেটা এবার সত্যের স্পষ্টতায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিস্তব্ধতার মাঝে একবার চোখ তুলিয়া দেখিলাম অপর্ণা দেবীর মুখের চেহারাটা বদলাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধমূর্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া আছেন, মুখে একটা চাপা আতঙ্কের ভাব, আর সেটা যেন বাড়িয়াই যাইতেছে। আমার ভয় হইল। বেশ বুঝিতে পারিলাম এই জিনিসটি দেখিয়াই মীরাপ্রমুখ সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, আর চেষ্টা করিয়া অপর্ণা দেবী আমার কাছে এই ভাবটাই গোপন করিয়া আসিয়াছেন এতক্ষণ। আমি যে কি বলিব কিছুই যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না, তাহার পর মনে হইল ঘরটা কয়েক দিনের জন্য বদলাইয়া ফেলিবার কথা বলি। পাড়িতে যাইব কথাটা, অপর্ণা দেবী আমার পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া কতকটা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "বুড়ী গেছে খুবই ভাল হয়েছে শৈলেন, ওর জীবন যে কী দুর্বহ হয়ে উঠেছিল তা আমি বুঝতাম, কিন্তু ওর মৃত্যুটা হ'ল বড় ভীষণ।—শেষ পর্য্যন্ত জগতে আর ওর ধর্ম রইল না, কিছু রইল না, রইল শুধু ওর ছেলে, কিম্বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে—ওর ছেলের স্মৃতি। আমি অস্বীকার করব না শৈলেন, আমি ভয় পেয়ে গেছি,—আমার পরিণামও কি শেষ পর্য্যন্ত এই হবে? আমার দৃষ্টির সামনে থেকেও ঐ রকম ক'রে ইহকাল পরকাল সব মুছে গিয়ে শুধু জেগে থাকবে এক অপদার্থ ছেলের মূর্তি? কী ভয়ঙ্কর অবস্থা বল তো শৈলেন, ভাবতে পার? আমি তোমায় মিথ্যা বলছি না; আমি প্রাণপণে আমার দুরদৃষ্ট থেকে সরে যেতে চেষ্টা করছি। আমি ধর্মে বিশ্বাসী—আমাদের যা ধর্ম যাতে বলে ভগবান সহস্রমূর্তিতে আমাদের ঘিরে রয়েছেন—সেই ধর্ম আমি জীবনে সত্য ক'রে নিয়েছি। আমার আলমারিতে যা বই দেখছ, আমার ঘরে যা ছবি দেখছ, সে-সব আমার ঘর সাজাবার শৌখীন উপকরণ নয় শৈলেন; কিন্তু আমার আর সন্দেহ নেই যে কোন এক সময় ভুটানীর মত আমার ছেলে-স্মৃতি যখন কাল হয়ে আমার জীবনে দেখা দেবে, তখন অন্য কিছুই তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কি পাপে এই পরিণাম আমার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে শৈলেন? কি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়?—কেন এমনটা হ'ল?"

কখন এ রকম ভাবান্তর দেখি নাই অপর্ণা দেবীর মধ্যে, অথবা বোধ হয় আর একদিন দেখিয়াছিলাম—যেদিন ভুটানী প্রথম আসে সেও কিন্তু বিস্ময়কর হ'লেও এতটা ভয়াবহ ছিল না। আমি নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলাম, একটু বিরতির সুযোগ পাইয়া শান্ত, সহজ কণ্ঠে বলিলাম, "আপনি মিছেমিছি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, একটা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মনের ওপর একটা ঘটনার প্রভাব যেভাবে পড়েছে ঠিক সেই ভাবে যে আপনার ওপরও পড়বে এটা আগে থাকতে ধরে নিয়ে আপনি উতলা হয়ে উঠছেন; কিন্তু সেটা কি সম্ভব?"

অপর্ণা দেবী খুব অন্যমনস্ক হইয়া আমার কথাগুলা শুনিতেছিলেন, একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সব মায়ের মন এক শৈলেন,—শিক্ষার সেখানে প্রবেশ নেই। আমাকে যদি শিক্ষিতা ব'লে মনেই কর তো অমন ছেলের চিন্তাই বা আমি করতে যাই কেন? না, ওতে রক্ষা করতে পারবে না। বরং অশিক্ষিতাদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব বেশী, আমার সেই আশা ছিল ব'লেই আমি ভুটানীকে এই পথে চালিত করবার চেষ্টা করেছিলাম,—কিন্তু অসম্ভব! কি রকম সর্বনেশে ব্যাপার দেখ,—বুদ্ধদেব ওর ছেলেকে নিজের মধ্যে টানতে পারলেন না, শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ওর ছেলের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। আমি যে সেদিন বেড়িয়ে এসে দেখলাম বুড়ী পেতলের বুদ্ধমূর্তিকে বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে—তার ভেতরকার ব্যাপারটা বুঝেছ তো?—পেতলের মধ্যে বুদ্ধদেব গেছেন নির্বাণ হ'য়ে, তাঁর জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ওর ছেলে। অনেক দিন থেকেই এই ব্যাপারটা চলছিল—ধোওয়ান, মোছান, সাজানর মধ্যে যে বুড়ী তার ছেলেকেই দেখে যাচ্ছে, এতটা সন্দেহ না ক'রেই আমি আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে খুশী হয়ে উঠেছিলাম। টের পেলাম, যখন আর একেবারেই উপায় নেই।... শৈলেন, আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি। মীরা—ওরা আমার দেখে যে আকুল হয়ে উঠেছে তাতে কিছুই আশ্চর্য্য হবার নেই; কেন না চেষ্টা ক'রেও আমি ভয়টা চাপতে পারি নি

সব সময়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার কি হ'য়েছে জান?—যখন থেকে অসুখে পড়েছিল, হাজার চেষ্টা করেও আমি ওকে একবারও বুদ্ধদেবের নাম মুখে আনাতে পারি নি। বিকারের সময় তো কথাই নেই—অসুখ যখন সুরু হয়, আর শেষকালে যখন ওর জ্ঞান হয় খানিকক্ষণ, তখনও হাজার চেষ্টা করেও ওর মনটা বুদ্ধদেবের দিকে ফেরাতে পারি নি। যত বলি—বোলো—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—অন্তত একবার নামও করুক বুদ্ধদেবের—শুধু বুকে হাত দিয়ে—বেটা—বেটা—বেটা…মেমসাহেব বেটা দেও…"

অপর্ণা দেবী চুপ করিলেন। আমিও আর কিছু বলিলাম না—নূতন করিয়া আবার কোন্ দুর্বল স্থানে স্পর্শ দিব এই ভয়ে। ওঁর দৃষ্টি ক্রমে মুক্ত জানালার বাহিরে গিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে দৃষ্টি শান্ত এবং মুখের ভাব সহজ হইয়া আসিতেছে। বুঝিলাম একজনকে কথাগুলো বলিতে পারিয়া মনটা হাল্কা হইয়াছে। ধীমতী নারী,—মনের ব্যাধিও চেনেন, ঔষধ সম্বন্ধেও ধারণা আছে, সেই জন্য গোড়াতে বলিয়াছিলেন—"তুমি কি করবে? কিন্তু তবুও একজনকে বলা দরকার।"

আরও অনেকক্ষণ গেল। একবার বাহির হইতে দৃষ্টি গুটাইয়া লইয়া খুব স্নেহদ্রব কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "খোকাকে 'অপদার্থ' বললাম, না শৈলেন?—ক'বার বললাম বল তো?"

চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আরও কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ অপর্ণা দেবী আবার বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "শৈলেন, কিছু একটা হওয়া দরকার; এ ভাবে, এ অবস্থায় আমি থাকতে পারছি না, কি রকম যেন অসহ্য হয়ে উঠছে।…উনি কবে আসবেন টের পেয়েছ?"

টের পাই নাই সেটা আর বলিলাম না। বলিলাম, "কাল আসবেন। আমার একটা ছোট্ট কথা মনে নিচ্ছে, অনুমতি দেন তো বলি।"

অপর্ণা দেবী আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বল।"

বলিলাম, "আপনার আপাতত এ-ঘরটা একটু বদলান দরকার।"

অপর্ণা দেবী ঘরের চারি দিকটা, বিশেষ করিয়া ভুটানী যেখানটায় থাকিত—বুদ্ধের মূর্তি, ভুটানীর চেয়ার—একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন—"হাঁ, দরকার একটু বটে। তরু ওপরে যে ঘরটায় পড়ত, সেইটে আমার জন্যে ঠিক ক'রে দিতে বলবে।"

ক্রমশঃ

জন্মান্তর

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

আমার ভাবনা সে যে চিরজন্ম অসীমকালের;
শুধু দুদিনের দেখা, এরে ল'য়ে ভরিল না মন।
পেয়েছি কি পাই নাই সে-বিচার আজ সকালের
যুগরজনীর বুকে আঁকা পড়ে, হেরিয়া কেমন
আজি মোর হাসি পায়। শুধু কি গো অতল আঁধার
আছে চির-রাত্রি ধরি'? হ'ত যদি তাও ছিল ভালো,
মরণের সাথে যদি শোধ হ'ত জীবনের ধার,
শূন্যতা-সাগরে ডুবে তুলিতাম, কি ধন কুড়ালো
এই জীবনের তটে খেলাছলে আমার হৃদয়,
কি ধন হারালো। যদি কোনও জীবনে নবতর
নয়ন মেলিতে হয়, হেরি' নব অরুণ-উদয়,
শ্যামল পৃথিবী, নদী-গিরি-বন-কান্তার-প্রান্তর,
আবার হৃদয়ে প্রেম জাগে, যদি ফিরি পথে পথে
তোমারে চাহিয়া আর নাহি পাই, কিম্বা পাই দেখা
নবতর কোনো রূপে, আজিকার এ মুরতি হতে
একরতি এদিক্-ওদিক্;—ঐ ক্ষীণ ভুরুরেখা
যেথা সুরু যেথা শেষ, নয়ন-প্রদীপ-ধূম-শিখা;
ছায়াটি আঁখির কোলে কি গোপন বেদনার সম;
অধর-কুঞ্চনে কোন্ ঐশ্বর্য্যের বার্ত্তা হয় লিখা
সুগভীর অন্তরের; কমনীয় ঐ মনোরম
সুস্নিগ্ধ কান্তির দেখা নাহি পাই; সব নিয়ে হায়
যেইরূপে দিলে ধরা এ-ধরার নন্দিনী সুন্দরী,
যদি কোনো-কিছু তার মৃত্যুর পরশে ক্ষয় পায়,
অনন্ত-জীবনে আমি সে-ক্ষতি স'ব না প্রাণ ধরি'।
যত ভাবি, কাটে দিন, দে'খেও দেখি না থরে থরে
নয়ন-সমুখে তব কান্তির কুসুম-দল ঝরে।

শেষ অধ্যায়

শ্রীসাধনা কর ও শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

১

রোগ-শয্যার নিবিড় নীরব পরিবেশ। সময়ে অসময়ে রোগীর মুখের হাসিপরিহাসে তরঙ্গ খেলে যায় প্রফুল্লতার। সরস সজীব চারিদিক, মুহূর্ত্ত পরেই বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য ঘনিয়ে আসে। কাছে কাছে যে দু-চারজন শুশ্রূষারত আত্মীয়-পরিজন থাকেন, সতর্ক সাবধানতায় করেন কাজকর্ম্ম, চলাফেরা। নিয়ম-নিষেধের গণ্ডী টেনে চলেন দুরু দুরু প্রাণে। কখন্ যে যবনিকা পড়ে যাবে বিশ্বকবির জীবন-নাট্যে—রবির লীলাখেলার হবে সমাপ্তি। পারের খেয়া ঘাটে প্রস্তুত। অপেক্ষামাত্র সন্ধ্যালোকের গাঢ় ছায়ার আগমন।

আশী বছরের বৃদ্ধ কবি মৃত্যুর দ্বারে পা দিয়েও বাঙালীর চির রুগ্নতাকে, তাদের অত্যন্ত স্বল্পায়ুকে বিদ্রোহ ক'রে জানাতে চেয়েছেন,—তিনি অসুস্থ নন্। কত আগ্রহ তাঁর ছিল আশ্রমিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, কত দেশ-বিদেশের বড় বড় নামজাদা এবং অনামী মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ অবতারণায় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা করেছেন অতিবাহিত। একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়াতে উঠে যেতে পারলেন না বাইরে। রোগশালাতে চীনের মাননীয় প্রতিনিধি তাই-চি-তাওকে আহ্বান করে এনে আলাপ করলেন। মৃত্যুর কিছু দিন আগে মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির উত্তরে যে জলন্ত বিবৃতি লিখে দিলেন সেই-ই তাঁর শেষ বিবৃতি, এবং হয়ে রইল তা' ভারতের আর্ত্ত অবস্থার মূর্ত্ত প্রতীক। যেখানে নিশ্চিত জানতেন যে, এ-কাজ তাঁরই, কোনো কিছুতেই সে ক্ষেত্রে দ'মে থাকতেন না। বিশ্রামের জন্য কত অনুরোধ-উপরোধ, এমন অসুস্থতার নিদারুণ নির্যাতন,—তিনি ঠিক নিজ কাজ সুসম্পন্ন ক'রে তবে থামতেন। দুর্বল শরীরে এসেছে ক্লান্তি, অসোয়াস্তি অনুভব করেছেন, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তা স্বীকারে যেন অপরিসীম সংকোচ। সত্যিকার গুরুত্ব দিয়ে (seriously) কোনদিনও নিজের মুখে সে-কথা জানাতে চাইতেন না। শুধু শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে নববর্ষে এসে প্রসঙ্গতঃ যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছুটিতে কবি আবহাওয়া পরিবর্তনে যেতে ইচ্ছুক কী না!—উত্তরে বোঝা গিয়েছিল যে, অশক্ত শরীর আর তো বেশী নাড়াচাড়া সইবে না, যে-ক'টা দিন আছেন শান্তিনিকেতনেই কেটে যাক্।* লোকের কাছে কথা প্রসঙ্গে অবশ্য মাঝে মাঝে বলতেন, নিজ দৈহিক অক্ষমতার কথা কিন্তু সে কথার কথা মাত্র, কার্যত সে অক্ষমতাকে কখনো মেনে নিতে দেখা যায় নি। গত ৭ই পৌষের মন্দিরে অনুপস্থিতির জন্য কাতর মনে স্বীকার করেছিলেন এই অসুস্থতাকে ৭ই পৌষের লিখিত ভাষণে—'আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবের আসন গ্রহণ করতে পারি নি এ-রকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটল। আমার বার্ধক্য এবং আমার রোগের দুর্বলতা আমাকে সমস্ত বহির্বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।' অনেক আগে থেকে যদিও তিনি তাঁর লেখার মধ্যে সবার কাছে ছুটি চেয়ে এসেছেন, পেড়েছেন নিজ বার্ধক্যের দোহাই, বাস্তবে কিন্তু এক দিনও সে ইচ্ছা তাঁর পূরণ হয় নি এবং তিনিও মুখে "আর পারি নে" ব'লেও সম্পূর্ণ ইচ্ছায় এবং আনন্দের সহিতই মিটিয়ে এসেছেন অন্য সবার দাবীদাওয়া। এইখানেই তাঁর তথাকথিত "অক্ষমতার" রস। পূর্বেও যখন নিতান্ত দরকারী অসংখ্য লেখা বা কাজ নিয়ে থাকতেন, কোনো লোক দেখা করতে গেলে নিজেই ব্যথা পেতেন ব্যর্থ ভাবে তাকে ফিরিয়ে দিতে। যত গভীর ভাবনা চিন্তাই হোক্ না, সে সময়টিতে যেখানে এসেছেন সেখানেই থেমে যেতেন। চল্‌তো কত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা। যেই আবার পেতেন ফুরসৎ, ঠিক থেমে-যাওয়া জায়গা থেকেই সুরু করতেন লেখা বা কাজ। যেন ভাবনা বা পরিকল্পনাটা থরে থরে মনে সাজানোই আছে, দেরী শুধু বাইরে রূপ দেবার। অনেক বেশী লোকের ভীড় হলে সময়ে সময়ে বিরক্ত হয়ে বলতেন—নিষেধ করে দাও, দেখা হবে না। কিন্তু যেই চোখে পড়লো দেখা করতে এসে

---

* বলেছিলেন, "না মশায়, আমি এই Concentration camp-এই থাকব।" প্রবাসীর সম্পাদক।

ফিরে যাচ্ছে কেউ, অমনি বলে উঠতেন—ফিরে যাচ্ছে যে! স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোত তাঁর নিষেধাজ্ঞা, মহা ব্যস্তে অস্থির হয়ে উঠতেন—"ডাকো, চুকিয়ে ফেলি। দেখা কেন পাবে না, আমি কি দেবতা?" রোগ-শয্যায়ও বিরক্ত হন্ না লোকের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অসুস্থতা আশঙ্কায় আর-সবাইকে হোতে হয় সাবধান। এমনি বিপুল যে-শক্তি, মৃত্যুও বুঝি তার কাছে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কিন্তু একদিন খুঁজে খুঁজে কোন্ ফাঁকে মৃত্যুকীট বাঁধলে বাসা—বৃহৎ ঐ বনস্পতির অদৃশ্য দেহকোণে। পলে পলে ক্ষয় হয়ে এলো প্রকাণ্ড মহীরুহ। আপন অবাধ্য অক্ষমতায় মেনে নিতে হয় তাকে ছোট বড়ো সবার শাসন :—

চারদিকে মোর ঠেসে ঠুসে
খাটো করলে দিনকে
যেন তোমার মুঠোর মধ্যে
এক করেছ তিনকে।

* * *

ঘড়ি-ধরা নিদ্রা আমার
নিয়ম ঘেরা জাগা
একটুকু তার সীমার পারেই
আছে তোমার রাগা।
কী কব আর রবিঠাকুর
ভয়ে তরস্ত
এত বড়ো মানুষ ছোট্ট
হাতের করস্থ।

নাতনীর উদ্দেশে রচিত, রোগশয্যার এই ছড়াটির মধ্যে কবি নিজেই সে-কথা অমর করে রেখে গেলেন।

রোগশয্যার বদ্ধ অন্ধকার শীতল আবেষ্টনীর মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অসীম বিশ্ব হয়েছে সীমাবদ্ধ। হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায় তার দেয়াল। সবারই শুধু আশঙ্কা—কখন কী যে হবে! এমনও হয়েছে,—রাতে গভীর ঘুমে নিশ্চেতন কবি। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলেছে অত্যন্ত মৃদু হয়ে। এত মৃদু, এমন এলানো দেহ—চমকে উঠেছেন শুশ্রূষাকারিগণ। মিথ্যে সন্দেহটাকে ঘোচাতে অনেকক্ষণ লক্ষ্য ক'রে দেখতে হয়েছে কবিকে। এমনি উদ্বিগ্ন অবস্থা। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে দেহযন্ত্রে। আশঙ্কায় রুদ্ধ কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ কথা বলাবলি চলে, ক্রমাগত সংবাদ হয় লেন্-দেন্। একটু শুয়ে একটু ব'সে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব মেনে অস্ত-রবি পারে-এসে-ঠেকা দিনগুলিকে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছেন।

বেশীর ভাগ সময়ই কাটে সোফার 'পরে। বসে আছেন তো বসেই আছেন—আচ্ছন্নের মতো। মনে হচ্ছে স্তব্ধতার অতলে তলিয়ে গিয়ে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন পরপারের অচেনা তীর। কী আছে তাঁর নিতান্ত চেনা-পরিচিত এই পৃথিবীর ওপারে! যেন শাশ্বত প্রশ্ন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন! কতখানি সময় গেল পেরিয়ে অমনিই। হঠাৎ এক সময়ে চমকে সজাগ হয়ে উঠলেন তিনি। উদ্বেলিত বক্ষ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস,—সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতে। দ্বিতীয় লোকের সামনে এ ধরণের দুর্বলতা দেখাবার প্রবৃত্তি তাঁর কোনো দিনও ছিল না। কিন্তু ভুগে ভুগে শেষের দিকে তাঁর মন হয়ে পড়েছিল বড় ব্যথাকাতর। কবিদের মন সাধারণতঃ প্রবল অনুভূতিশীল। সে-অনুভূতিই জোগায় তাদের লেখার উৎস—মর্মস্পর্শ করে সমস্ত লোকের। অনন্ত-সাধারণ রবীন্দ্রনাথের সে তীক্ষ্ণ অনুভূতিই শেষে একেবারে এত মন-প্রাণ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, উদ্বৃত্ত তার উপচে পড়তো কাতরতায়। একটু আবেগের একটু উত্তেজনার কথাতেই একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। প্রতিদিন আশেপাশের এবং বহিঃপৃথিবীর খোঁজখবর নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব। এমন কি নিজে তিনি যখন ভুগছেন রোগ-যন্ত্রণার অস্বস্তিতে, তখনো রাত বারোটায় তন্দ্রা-জড়িমা ভেঙে গেলে জিজ্ঞাসা করেছেন—"দরোয়ানের যেন পেটে ব্যথা হয়েছিল। কেমন আছে সে!" শেষ জীবনে তাঁকে দেখে যেতে হল কী নিষ্ঠুর হানাহানি, কত অন্যায় অবিচার দেশ-বিদেশে। যৌবনে দেশের চাষী, গরিব প্রজাদের সঙ্গে মিশে তাদের যে একান্ত দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন, আজও তার কোন প্রতিকার হল না—জীবন-সায়াহ্নে সে-কথা আলোচনা করে কত দিন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত।

মনটা তাঁর শিশুর মতো কোমল হয়ে উঠেছিল। অকরুণ নির্মম নির্দয়তায় হাঁপিয়ে উঠেছিল প্রাণ। মানুষের কাছে দাবী করতেন শুধু একটু ভালবাসা। লোকের কাছে এবং তাঁর শেষ-লেখায়ও কত আন্তরিকভাবে তিনি এই প্রীতি-ভালবাসা চেয়ে ব'লে গেছেন :—

"আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে

নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্ব্বাদ।"

—শেষ লেখা।

জীবনব্যাপী আদর্শ ছিল তাঁর মানব-প্রীতি প্রচার করা, জীবনের প্রথমে বলেছিলেন,—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

মধ্য জীবনে নৈবেদ্যে বলেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

শেষ জীবনে সেই মানবিকপ্রীতি, তাঁর দৈনন্দিন জীবনে আরো বেশী সংহত হয়ে ফুটে উঠেছিল জলজলে ভাবে।

অন্তর থেকে একটা গভীর স্নেহ-রস উপচে পড়তো। শুশ্রূষা করতে যাঁরা যেতেন, তাঁদের কষ্ট হতে পারে, এই ছিল তাঁর ভাবনার বিষয়। নিজের রোগ-যন্ত্রণা ভুলে হাসি-ঠাট্টায় তিনি সৃষ্টি করতেন এমন রস যে, যে-কেউ কাছে থাকতো, আনন্দে সজীবতায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতো। সুযোগ পেলেই ছড়া কেটে কেটে তিনি হাসি তামাশা সুরু করে দিতেন। প্রথমে ছড়াগুলি রোগশয্যার পরিবেশের জনকয়েকে মিলেই উপভোগ করে যেতো।—লেখা হলেও, তেমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা হচ্ছিল না। রবীন্দ্রনাথও ভাবতেন, ছেলেমানুষি হচ্ছে। ৪।১২।৪০ তারিখে সকালে তাঁর সেবারতা আদরের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে উদ্দেশ করে বলে গেলেন এমনি একটি ছড়া :—

"ডাবও ভালো, ঘোলও ভালো
ভালো সজনে ডাঁটা,
বৌমা বলেন ভালো নহে
শুধু সিঙ্গিমাছের কাঁটা।"

মশা এসে কামড়াচ্ছে, হুলের জ্বালায় জ্বলে ব'লে গেলেন অমনি আর-একটি :—

"মশা রক্ত খেতে চায় খাক্ ভুয়ো ভুয়ো
কিন্তু খেয়ে দেয়ে কেন দিয়ে যায় হুয়ো।"

এমনি ছড়া কাটা চল্‌ছিল। এদিকে "প্রবাসী" থেকে সেদিন তাগিদ এসেছে—কবিতা চাই। সে কথা বলতে গিয়ে কোনো লেখা সদ্যনূতন তৈরী আছে কি না জানতে চাওয়া হ'ল। তিনি হেসে বললেন—হয়েছে কতকগুলি ছড়া। তোমরা তো আমার যা পাও, ঠেসে ভরো প্রবাসীতে। দাও নিয়ে এগুলোও!

"কোন্‌গুলি, দেখি!" যিনি চাইতে গিয়েছিলেন, ছড়া পড়ে সেই রচনা-রক্ষক একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। দেখলেন মজার রসে পরিপুষ্ট বিশেষ ধরণে লেখা নতুন ছড়াগুলি।—রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন—"আরে, ঠাট্টা করে বল্লুম তোমাকে, আর তুমি কিনা সেই লাফিয়েই উঠলে? না না, সে হবে না। ওগুলি নিছক ছেলেমানুষি করেছি। যাও তুমি, বের করা হতে পারে না এ সব।" যতই তাঁকে বলা যায় এ-ছড়া সবাই নেবে আদরে, কে শোনে! ভাবছেন এ ছড়া দেখে লোকে ভাববে বুড়ো বয়সের পাগলামি। অনেক ক'রে বলাতে অনুমতি তো দিলেন প্রকাশের, তবু কি মন প্রসন্ন হয়! বললেন—কী উপলক্ষে, কোন্ প্রসঙ্গে কখন লেখা, সে বিবরণ একটু না দিলে, লোকের রস গ্রহণে অসুবিধা হবে; যদি প্রকাশই করতে হয় তবে ছড়া-গুলির সঙ্গে একটু নোট দেওয়াও দরকার হবে।

তারপরেই কৌতুক ভরে তিনি বলে উঠলেন—

"তুলো ধুন্‌তে গেলে পরে, কতকটা সেই তুলো
লেপের মধ্যে প্রবেশ করে—কতক ঢাকে ধুলো।"

প্রসঙ্গটাতে হ'ল মধুর যবনিকাপাত। এই হ'ল তাঁর মুখে মুখে রচিত টুকরো ছড়াগুলির পত্রিকাতে প্রকাশের ইতিহাস। এই ছড়া রচনার ধারা শেষ হ'ল একদিন এসে এই কবিতাটিতে :—

আকাশ নিঠুর
বাতাস নীরস
কৃপণ মাটির 'পরে
শিকড় হা হা করে।
চারদিকেতে ফেটে গিয়ে চৌচির সে মাঠটা,
ফুলের খবর নিতে এলে শোনায় যেন ঠাট্টা।
দখিন হাওয়া শুধায় যদি
কেমন আছ ব'লে
শুকনো পাতার খস্‌খসানি
শুধু জাগিয়ে তোলে॥

উদয়ন
৫ জুন, ১৯৪১
সকাল

এমনি ছিল তাঁর রোগ-শয্যার আবহাওয়া। শুশ্রূষা-কারীগণকে তিনি সজীব রাখতে চাইতেন, যেন উল্টে তিনিই করতেন তাদের শুশ্রূষা। তারা বুঝতে পারত না কোনো-একটা নীরস কাজের

গুরুভার চাপানো আছে তাদের উপরে। নিজে অনেক সময় কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করে দিতেন তাদের বিশ্রামের সুযোগ। এমনি করে সবার প্রতি দরদ তাঁর গিয়েছিল বেড়ে। খাবার দিয়ে কুকুরটাকে আদর করতেন, কৌতূহলে দেখতেন চড়ুইটাকে। তাদের বিষয়ে কাছের লোককে করতেন কত প্রশ্ন। এই মনোভাব দেখে' এক দিন হাসির ছলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বুড়ো বয়সে লোকে ভাবে পরকালের বিষয়। সব সময় জপে ঠাকুর-দেবতা বা নিজ আরাধ্যের নাম। আর আপনি আছেন পশুপাখী, লোকজন হাসি-গল্প নিয়ে? লোকে বলবে কী আপনাকে! ভারী মজা পেলেন তিনি। হেসে বল্লেন—"সত্যিই তো, বলবে কী!" এমনি নিবিড় ছিল তাঁর মানবিক প্রীতি,—পরকালের চিন্তার সঙ্গে মিশে যা এক হয়ে গিয়েছিল।
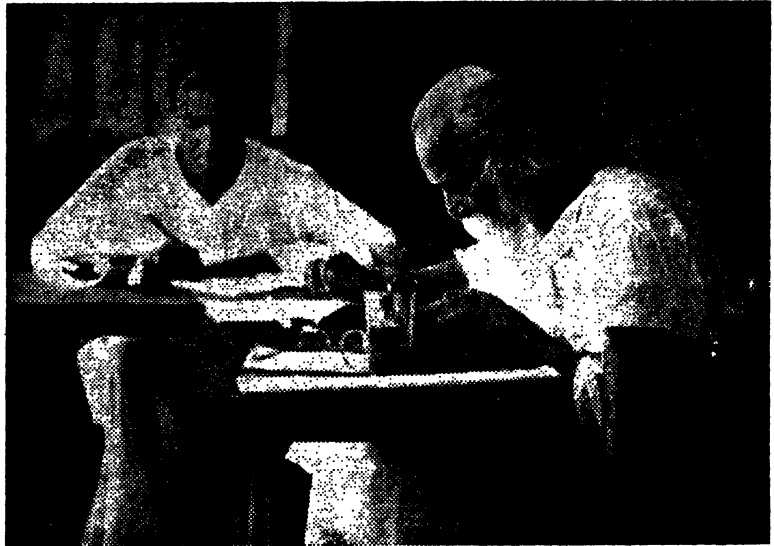
"রবিবার"-গল্প রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথ

["তিন সঙ্গী"-গ্রন্থের অন্তর্গত "রবিবার" গল্পটি রচনাকালে কবি সর্বপ্রথম মুখে মুখে ব'লে লেখানো আরম্ভ করেন। শান্তিনিকেতনে "পুনশ্চ" নামক গৃহে কবি খসড়া অবলম্বনে গল্পটিকে সংশোধিত আকার দিয়ে তাঁর লেখার ভাণ্ডারী ও লিপিকার শ্রীসুধীরচন্দ্র করকে ব'লে যাচ্ছেন।]

যা বলছিলুম,—আচ্ছন্নভাবের থেকে মনকে ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা তাঁর তীক্ষ্ণভাবে সম্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় কি, তাঁর চিরদিনের অভ্যস্ত কাজ? অন্তরের কোন্ দুর্গম প্রান্ত থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকে গেল বুঝি আজীবন যে-লীলা-সঙ্গিনী তাঁকে ডেকে গেছে বারেবারে। ফুল-ফল, লতা-পাতা, পাখী-পাখালি আলো-অন্ধকার আর প্রতি মুহূর্ত্ত জীবনপ্রবাহে উচ্ছলিত বিস্ময়কর এই ধরা, যারা নিত্য নতুন আঘাত দিয়ে নিয়ে গেছে তাঁকে অকল্পিতের দ্বারে, বিরাটের মোহনায় আজ কোথায় সে-সবের অব্যবহিত সংস্পর্শ। চারদিকে দেখেন ঘন অন্ধকারে অবরুদ্ধ ঘর, গণ্ডীটানা তার সীমা পরিধি, প্রবাহ তার ক্ষীণ, আরোগ্যশালার সরঞ্জাম ঘিরে আছে তাঁর চারিদিকে। যিনি ঘোর গর্জনে ধিক্কার দিয়েছেন আধমরা অশক্তদের, তাঁকেই হয়ে থাকতে হবে অসমর্থ! জীবনের সেই গ্লানি কী ক'রে তিনি সইবেন। সমস্ত মনের দুঃসহ বেদনা কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ে—"এমনি করে আর কতদিন!"

অসুস্থ মনের রোগ-যন্ত্রণার কাতরোক্তি এ নয়, এ-ক্ষেদোক্তি অদম্য সৃজনশক্তির বাহ্যিক প্রকাশের অক্ষমতায়। যদি থাকত সে সামর্থ্য, রোগের জন্যে ক্ষুণ্ণ হতেন না তিনি। রোগ-শয্যা হয়ে উঠত সৃষ্টি-আগার। সে অসম্ভবও সম্ভব করে গেছেন সাধারণের কাছে, কিন্তু হয় নি তাঁর নিজের সন্তুষ্টি। তাঁর রোগ-শয্যার লেখা 'রোগ-শয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' প্রভৃতি যে নতুন ধরণ ও নতুন ভাষা বহন করে এনেছে পৃথিবীতে তা অনন্যসাধারণ। যেন অস্ত-রবির বিদায়চাওয়া প্রচণ্ড রশ্মি বর্ণ-সমারোহে বিকশিত হয়ে উঠেছে এই শেষের বইগুলিতে। তবু মন তাঁর খুসী হয় না। তাঁর ইচ্ছে নিজ হাতে একবার যদি দেখতে পারতেন কলমটা চালিয়ে। আশেপাশে যাঁরা আছেন, বলেন কিছু বাইরের খবর, চলে কিছু কথাবার্ত্তা। শুনতে শুনতে, এবং চারপাশের ছায়াছবি দেখতে দেখতে আবেগে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে তাঁর নিভে-আসা প্রতিভানল, তাঁর ছাই-চাপা সৃজন-উদ্যম। তাড়াতাড়ি সাগ্রহে তুলে নেন ফাউন্টেন্ পেন্‌টা। টেনে নেন খাতাটা। লিখতে সুরু করেন। কলম যায় কেঁপে, হাতের পেশীর

পরে আর খাটে না ইচ্ছার জোর। মস্তিষ্কের সেই আশ্চর্য্য ধারণা-শক্তির স্ফুরণ, কল্পনার সহজবেগ স্বতঃই হয় ব্যাহত। যেন আলো আছে, নেই তার তীব্র তেজ। শিল্পসৃষ্টি বন্ধ হয় নি কিন্তু চোখেতে জড়িয়ে আসে আলস্যের তন্দ্রিমা। মনে ঘনিয়ে আসে অবসাদের কালো ছায়া। দুলাইন লিখেই হয়তো থেমে যান। মুখে ফুটে ওঠে অসামর্থ্যের কাতরতার ছাপ। শেষে কি বশ্যতা স্বীকার করবেন কালের কাছে! নিভতে গিয়েও দপ্ করে জলে ওঠে প্রদীপশিখা। আশেপাশে যারা পার্শ্বচর, মনের ভীড়-করা বক্তব্য মুখে মুখে বলে যান তাদের কাছে। প্রীতি-মধুর হাস্যরসে অভিসিঞ্চিত এবং গুরুগম্ভীর মহান ভাবে উদ্দীপনাময় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে খাতার পরে খাতা যায় ভ'রে। তবু অফুরন্ত তার উৎস। নতুন বেগে জীর্ণদেহ বৃদ্ধ ছুটে চলেন এ-কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। পেরিয়ে যান বর্ত্তমান ভবিষ্যত। চিরকালের জন্য দিয়ে যান নূতন-বাণী, নিত্য কালের মানব-মনের পিয়াসা-শান্তি। রোগ-শয্যায় প'ড়েও ফল্গুধারার মতো বয়ে চলে লেখার স্রোত। লোকে অনুরোধ করে বিশ্রাম নিতে, নাত্নি এসে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত। তাঁকে তখন এপাশ ওপাশ ওঠা-নামা করতে হয় পরের সাহায্যে, পা-টুকু অবধি পারেন না উঁচু করে রাখতে। ধপ্ করে শিথিল-পেশী পা নীচে যায় প'ড়ে। অনেক পীড়াপীড়িতে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকেন। রোগযন্ত্রণার জন্য ঘুমাতে পারেন না ভালো ক'রে। তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকেন। ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে সৃষ্টির ডাইনামো। রাত্রিটা কোনো রকমে তন্দ্রায় জাগরণে কাটিয়ে ছট্‌ফটিয়ে উঠে বসেন রাত তিনটেয়। অভ্যাস তাঁর চিরদিনের। উঠে বসে চান্ কথা বলতে, ইচ্ছে শুধু লেখাবার। এক-এক দিন লেখাতেনও। অন্য সবাই বলে,—এখনো উঠবার সময় হয় নি।—ঠিক ধরতে পারতেন তিনি। বলে ওঠেন—আমার তো সন্দেহ হচ্ছে রাত তিনটে। দেখ্ তো ঘড়ি। নিশ্চয়ই আমাকে ফাঁকি দিচ্ছিস্ তোরা। ভুলিয়ে-ভালিয়ে আবার তাঁকে ঘুম পাড়ানো হয়। চোখ বুজে তিনি উৎসুক আশায় ব্যগ্র হয়ে থাকেন, কতক্ষণে এসে চড়ুই পাখীটা ঘুরে বেড়াবে তাঁর ঐ বন্ধ দরজায়। আনবে প্রথম আলোর বাণী। পেতে পারবেন তিনি পৃথিবীর স্পন্দন। ডাকে আসবে কত নতুন খবর, লোকজন আনাগোনা করবে, আর, সবার উপরে তিনি উজাড় করে দিতে পারবেন রুদ্ধ মনের ভাবধারা। আশা কিন্তু সম্পূর্ণ পূর্ণ হয় না। দুর্ব্বল-হয়ে-আসা মস্তিষ্ক বেশী খাটতে নারাজ। দিনের বেলা ভাবতে ভাবতে, বলতে বলতে ছিন্ন হয়ে যায় চিন্তাস্রোত। ছিন্ন সূত্রগুলি তার গুছিয়ে আনা প্রায় দুঃসাধ্য। তিনি আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়েন। নয়তো নিঝুমভাবে এলিয়ে দেন গা সোফার 'পরে। বাইরে বিশেষ বোঝা যায় না ভিতরের রোগযন্ত্রণা, প্রাণের মর্ম্মান্তিক বেদনা, নিগূঢ় দ্বন্দ্ব। কপালের শিরায় শিরায় ফুটে ওঠে একটুখানি শ্রান্তি, একটু শীর্ণতা। তিনি বুঝতে পারেন এত দিনে ঘনিয়ে আসছে রাত্রি। ঢেকে দেবে সে দিনের রবির প্রখরতা। গান শুনাতে যায় দু-তিনটি মেয়ে পালা ক'রে। কানে তখন তিনি ভালো শুনতে পান না। দেখতে পান না স্পষ্ট। মেয়েরা কানের খুব কাছে গিয়ে গান গেয়ে শুনায়। উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিনি। ফরমাশ ক'রে ক'রে গান শোনেন, নিজের মনের মতো গানগুলি। শুনতে শুনতে বলে ওঠেন কখনো—"ওরে গা, ভালো করে গানটা গা তো। সিন্ধুপারে চাঁদ তো বুঝি আমার জন্যে আর উঠবে না!" রুগ্ন কবির প্রাণের গহনতল থেকে বেজে ওঠে ভীষণ করুণ সুর। এত ভালবাসার এই পৃথিবী—দেশ-বিদেশের গণ্ডী নেই যার তাঁর কাছে, যে-মৃত্তিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি ব্যাপ্ত হয়ে থাকতে যায় তাঁর সাধ উঠে' জীবনের রসে সরস হয়ে, সেই পৃথিবীকে ভোগ করতে এত বাসনা—ছেড়ে যেতে হবে তাকে!—

'সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

—এ তো আজ আর শুধু লেখাই নয়! এ যে দারুণ সত্য, দুঃসহতম বিচ্ছেদের অনুভূতি। শেষ দিকের লেখায়, কবিতায়, ঠাট্টায় এই সুরটাই লেগে যেত। শান্তি-নিকেতন ছেড়ে যাবার মুখে ভুবনডাঙায় রাস্তার ধারে প্রতিষ্ঠিত নূতন পাওয়ার-হাউস দেখে নাতনি নন্দিতা দেবীকে ঠাট্টার ছলে বললেন—

"পুরোনো আলো চলল, আসবে বুঝি এবার তোদের নতুন আলো!"

* * *

উৎকণ্ঠিত সবাই একদিন ভয়ে বিস্ময়ে শুনলে গুরুদেব কলকাতা চললেন, অপারেশন হবে। এই বৃদ্ধ বয়সে

অপারেশন ঠিক মতো করা যাবে কিনা এবং তিনি তা সহ্য করতে পারবেন তো—এই শুধু সবার আশঙ্কা। একটু যেন ম্রিয়মাণ দেখালো গুরুদেবকেও। তবু যে-ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকবেন তাঁর মতে সম্পূর্ণ একমত হয়েই তিনি চলে এসেছেন আজীবন। ব্যত্যয় হল না শেষ সময়েও। দারুণ সঙ্কটেও ভয় পাবার লোক নন্ তিনি। চোখের উপরে দেখেছেন পিতা তাঁর অপারেশন করিয়েই ইহলোক ত্যাগ করেছেন তবু ভাঙলেন না তাঁর নিয়ম। হার মানবেন না —এই তাঁর জীবনের প্রধান কথা। দেখা করতে গেল আশ্রমবাসীগণ। তিনি উদয়নের দু'তলার সেই ঘরটাতে বসে আছেন। কাউকে তার কাজ কর্মের দায়িত্ব এবং আশ্রম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। যাবার দিন দোতলা থেকে নেমে আসবার কিছু আগে দেখা করতে গেলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন। তাঁকে বললেন—একটু দাঁড়ান, যাবেন না। তারপর তাঁকে হেসে বললেন, "মশায় দেখছেন তো—চলে যাবার কী রকম আয়োজন হচ্ছে!" অথচ নিগূঢ় আশাও থাকে নিভৃত মনের কোণে। যাবার মুহূর্তেও বলে যান তাঁর "বাঙালকে"—"এক মাস পরে ফিরবো। দেখো ছড়ার বইটা যেন ছাপানো শেষ হয়ে থাকে।"

তার পরে এক দিন বেরিয়ে এলেন শেষবারের মতো সেই ঘর থেকে। ষ্ট্রেচারে করে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন স্তব্ধ ভাবে সামনে তাকিয়ে—এই আধ্-তৈরী মতো উত্তরায়ণ, ঐ দূরে কেয়াবন আর তালীবনের পাহারা-দেওয়া কত দিনের দেখা ঐ খোয়াই। নীচে সেই নানা-রঙা ফুলবাগান—যে-বাগান এক দিন তাঁর লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। নেমে এলেন আরো নীচে—অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে ঘেরা লাল বারান্দায়। দেখলেন তাঁর অতি প্রিয় আশ্রম, আশ্রমবাসী। শ্যামল মাটির কোলে তাঁর শ্যামলা রঙের বাসগৃহ 'শ্যামলী', রাঙা রাস্তা আর দূরে পোষ্টাফিস্, হাঁসপাতাল। মৃদু গুঞ্জরিত গানের সঙ্গে পরিষ্কার ফুটে রয়েছে শান্তিনিকেতনের ছবি। নিঃশব্দে দু-চোখ মেলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। অতি দূর প্রশান্ত সমুদ্র,—স্থির নেত্রে তাকিয়ে আছে যেন তার অতি স্নেহের পৃথিবীর পানে।

* * *

এলেন কলকাতায়, নিজ বাটী জোড়াসাঁকোতে। অপারেশনের আয়োজনের মধ্যেও রচনা করলেন তিনটি কবিতা। কিন্তু যেদিন থেকে বন্ধ হ'ল রবীন্দ্রনাথের শীর সৃষ্টি, সেদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ নেই। চেতনাহীন হয়ে তিনি পৃথিবীতে ছিলেন তিন-চার দিন কিন্তু পৃথিবীকেও যেমন তিনি পান নি পৃথিবীর মানুষও তেমনি পায় নি তাঁকে। শুধু ছিল তাঁর জড় দেহ, আর, ধানের শীষে জলবিন্দুর মত কোথায় ছিল আত্মা। তার পর পৃথিবীর বুকে এসে গেল চির অনভিপ্রেত বারোটা তেরো মিনিট,—রইল চিরস্মরণীয় সে মানুষের ইতিহাসে।

* * *

আরও পরে! বৃদ্ধ পুরোনো চাকর বনমালীর এত দিনে ছুটি হ'ল। আর তাকে ছুটতে হবে না তার বড়-বাবুর পেছনে। যত্নে গুছাতে হবে না খুঁটিনাটি কাজ, জিনিষপত্তর। তবু যাবার মুখে বিষম বেদনায় বৃদ্ধ, "বৌমা"র সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে রেখে গেল রবীন্দ্রনাথের "শ্যামলী"—ফুলে চন্দনে ধুপধুনায়। তার পরে "বৌমা" প্রতিদিন আশ্রম পুরস্ত্রী ও কন্যকাদের নিয়ে সুন্দরভাবে পেতে রাখলেন রোগশয্যার সোফাটি, মালা গড়ে পরিয়ে দিলেন তাকে ভূষণ। তার পর থেকে কত লোক গিয়ে তাই দেখে দেখে স্মরণ করে আসে তাঁকে, জানিয়ে আসে প্রণতি। অদৃশ্য লোকের নিকটতম স্পর্শ পায় অন্তরে—তাঁর নতুন বাণীর মতই। প্রত্যেক দিন পৃথিবীর লোকে তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু পাবার বা শুনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও আশা ছাড়ে নি যে, শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে তিনি পৃথিবীর লোককে শুনিয়ে যাবেন কোনো অশ্রুতপূর্ব বাণী। সকলেরই প্রায় একটা দুঃখ ও ধারণা, শেষ তিন-চার দিন অচৈতন্য হয়ে থাকাতে রবীন্দ্রনাথ কোনো শেষ বাণী দিয়ে যেতে পারেন নি। ধারণাটা কি সত্য? শেষের ক'মাস আগে থেকেই তাঁর গোপন ভাবনাধারা যে-পথ বেয়ে চলেছিল, অচৈতন্য হবার আগে শেষ দিনের শেষ কবিতায় হয়েছে তার সমাপ্তি। গান মিশল এসে সমে।

কোনো দিনও তিনি মৃত্যু-পথের বীভৎসতাকে কিংবা তার অনিশ্চয় ভয়কে মনে আমল দেন নি। উপরন্তু জীবনের প্রথম থেকেই দেখি মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ ধারায় নানা বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে।

জীবন-মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে পেরিয়ে মানুষ এক দিন সেই মহাজীবনের সঙ্গে মিলিত হবেই। এই বিশ্বাস এই অনুভূতি ছিল রবীন্দ্রনাথের, এবং মিথ্যা মৃত্যু যখন

তাঁর এবারকার সত্তাকে, তাঁর 'আমি'র অস্তিত্বকে বাস্তবতঃই নষ্ট করতে দিতে চলেছে, তখনো সমস্ত দেহ-মনের একান্ত উপলব্ধি সমস্ত অনুভূতি একত্রীভূত হয়ে উৎসারিত হয়ে উঠল তাঁর একটি বাণীতে :—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তা'রে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার ॥

মৃত্যুকে, মৃত্যুর ছলনাকে স্বীকার করলেন না। শেষ মুহূর্ত্তেও ক'রে গেলেন জীবনের সত্যোপলব্ধির জয় গান। এবং সেই আত্মোপলব্ধিকে চির সত্য জেনে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে মৃত্যুর গহনে তাঁর জীবন-তরণী দিলেন ভাসিয়ে।

বাস্তবে ফুরিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। এখন থেকে বাস্তবের তাঁকে নিয়ে যে-গল্পের হবে সুরু, শেষ হল সে-গল্পের এই শেষ অধ্যায়।

২

তার পর!—
তারো পরে দিন এল, এল দিন আলোক-সুন্দর।
গোরু চরে মাঠে মাঠে, লোক চলে হাটে ;
চণ্ডী-মণ্ডপে লোক ভিড়ে বিভ্রাটে,—
সাদা প্রজাপতি ওড়ে সবুজ ঘাসের 'পর দিয়ে,
কাক ডাকে ডালে ব'সে, ও-বাড়িতে বিয়ে,—
ভিখারীরা মাগে ভিখ, ছেলে কাঁদে পিছে,—
ঘর ঝাঁট দিয়ে বধূ জঞ্জাল ফেলে দেয় নিচে ;
ঘড়া নিয়ে কাঁখে
কথা বলে পাড়াপড়শি পথের ও-বাঁকে ;
নিয়মিত দেহযাত্রা তেমনি চলেছে ঘরে-ঘর ;
—দিন এল আলোক-সুন্দর।
দোপাটি ফুলের গাছে পাতা-আড়ে ফুটে আছে ফুল
টুকটুকে রাঙা-পাপড়ি ; বাড়ির মেয়েটি বোনে উল ;
ঘণ্টা বাজে দূরে ইস্কুলের ;
খেঁকাখেঁকি কুকুর-কুলের ;
আকাশের গাঢ় নীলে নীলে
পৃথিবীর গায়ে কে যে
স্নেহের প্রলেপ মেখে দিলে।
জীবনের জয় গান চক্রপিষ্ট ঘর্ঘরিত পথে ;
"মৃত্যু নাই" স্বর্ণাক্ষরে লিখে যায় দিনের আলোতে।

নিরন্ত উচ্ছ্রিত এই জীবনের উৎসধারা-মুখে।
সৃষ্টির আবর্তবেগে চোখের সমুখে
ভেসে উঠে শতদল একদিন ঘাটে এসে লেগে
ভেসে গেলে অকূলেই পুন স্রোতোবেগে ;
শোভা-গন্ধ-রেশখানি কূলে কূলে প'ড়ে শুধু আছে,
মত্ত মধুপ মন ফিরে আজ তারি কাছে কাছে।
তোমারে পাওয়ার দিন সে-ই জানে কী ঔৎসুক্যে ভরা
—যে পেয়েছে ; চুকে গেছে আর-কিছু তার মনে-ধরা !
যেন দিন অবসানে রাত্রি লাগায় চোখে আঁধি,—
এ-রাত্রি হবে না ভোর,—মনে আসে শুধু এ বিষাদই !
সে-আনন্দ, সে-বিষাদ,—সবি যার তুলনাবিহীন
কী দিনই সে এনেছিলে,—আর,—কাল— !
—কী না গেল দিন !

কিন্তু, তার পর!—
কী আশ্চর্য, এল দিন, দিন এল আলোক-সুন্দর!

যতই যা ভাবি
ঠেকাতে পারিনে আজ এ দিনেরো দাবি !
চোখ মেলে আজ তারে দেখি না-ই দেখি,—
সত্য তার কম সত্য সে কি ?
দিকে দিকে প্রাণধারা রূপ ধ'রে চলে,
হোলো না, হয়ে যা গেল,—
তারো স্মৃতি ব্যথা হয়ে জলে।
কত অভাবিত স্বপ্ন রূপ নিতে পারে এর তীরে
তুমি সে প্রত্যাশা-মূল্যে অমূল্যতা দিলে পৃথিবীরে।
তোমারি দেওয়া সে মূল্যে তোমারে ছাড়ায়ে তাই আজ
এ পৃথিবী দেখা দিল প'রে তার রূপময় সাজ।
আজ এই রূপে রূপে দৃষ্টি মেলে করি অনুভব,—
সকলি প্রকাশ পায়, জীবনের চলে উৎসব।
মনে হয়, অন্য আর কাজ নাই কিছু—
সারাটি জীবন ভ'রে আপনারে প্রকাশের পিছু
কেবল প্রয়াসে চলা,—তাতে যেই উৎসাহের রস
বিশ্বের সকল কিছু জেনে বা না-জেনে তারি বশ।
অন্তরে অন্তরে আজ সেই রস-যোগে
সকলের সাথে যেন মিলে' আছি সব উদ্যোগে।
শোকের আঁধারে কাল ঢেকেছিল প্রকাশের
এ-রহস্য-ধারা,
—রাত্রিপারে রবি-আলো এ-প্রভাতে দেখায়ে যা
করে আত্মহারা।

একটি সংগীত আসে মন ভ'রে ;—
ব'সে ব'সে গাই—
*"আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই···

* রবীন্দ্রনাথের "আরোগ্য"-কাব্যগ্রন্থের বত্রিশ সংখ্যক কবিতার প্রথম পংক্তি।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শাশুড়ী উঠানের পাটঝাঁট সারিবার কালে আপন মনেই বহুক্ষণ গজ গজ করিতে লাগিলেন। কখনও পাড়াপ্রতিবেশীদের উদ্দেশে, কখনও বা পিসিমা ও যোগমায়াকে উপলক্ষ্য করিয়া যে-সব বাক্য-বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল—তাহাতে যোগমায়ার বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার উৎসাহ লোপ পাইল। তাহার মনেও পড়িল না যে, আজ একাদশী—বিধবা মানুষ উপবাস করিয়া আছেন। আজ তাঁহার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া যোগমায়ারই উঠান ঝাঁট দেওয়ার কথা, গোবর-জলের হাঁড়িটা লইয়া তাহারই রান্নাঘর নিকানো উচিত। অল্প আয়াসের কাজগুলি তিনি সুসম্পন্ন করুন, কেন না, এমন কতকগুলি আচার-নিয়মের কাজ আছে যাহা অন্যের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। যে সে কাজে হাত দিলে কাজের মর্য্যাদা বা পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই কথাগুলি শাশুড়ীর মুখে শুনিয়া যোগমায়ার মনেও বদ্ধমূল হইতেছে। বাপের বাড়িতে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে কোথায় স্খলন বা ত্রুটি—সেটুকু কোন্ দুলালীই বা বুঝিতে পারে! বিধি-নিষেধের কঠিন বৃত্ত রচনা করিয়া মেয়ে যখন বধূজীবনে রূপান্তরিত হয়—তখনই ঔচিত্য বোধে সে গৃহিণী পদবীতে আরূঢ় হইতে থাকে। শাশুড়ীর মনে যে ক্রোধের সঞ্চার যথেষ্টই হইয়াছে তাহা ছপাৎ করিয়া রোয়াকের কোণে ঝাঁটা আছড়াইবার শব্দে, ঠন্ করিয়া বালতির মধ্যে পিতলের ঘটি ডুবাইবার সময়ে ও দুম করিয়া সেই জলপূর্ণ ঘটি শানের মেঝেয় বসাইবার কালে টের পাওয়া যাইতেছে। যোগমায়ার অলঙ্কারের শোককে ছাপাইয়া ভয়টাই এখন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। না জানি আজ আবার কি কাণ্ডই ঘটিবে!

ও-ঘরে পিসিমাও উঠিয়াছেন। নিজের ঘরটি তিনি প্রায় নিঃশব্দেই ঝাঁট দিলেন, ঠুনঠান শব্দে অতি ধীরে ঘর ও রোয়াক ধোয়া-মোছা শেষ করিলেন। পিসিমা চির-দিনই ধীর স্বভাবের মেয়ে; হাসেন নিঃশব্দে, কথা বলেন মৃদুস্বরে—সে কথাগুলি সংক্ষিপ্তও বটে, আবার কাজ করিয়া যান তেমনই নিঃশব্দে। কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ

অনুযোগ তিনি করেন না কখনও। অন্ততঃ যোগমায়া তো শোনে নাই।

উঠি কি উঠিব না ভাবিবার সময় যোগমায়া শুনিল, শাশুড়ী বলিতেছেন, বেলা তিনপোর অবধি ঘুম! আজ কালকার মেয়েদের অন্ত পাওয়াই ভার। কাজ করিস না করিস—উঠতেও কি গতরে—

বকিতে বকিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। যোগমায়া তখন দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শাশুড়ী গামছা ও মটকার কাপড়খানি ডান-হাতের উপর ফেলিয়া বাঁ-হাতে ছোট একটি পিতলের কমণ্ডলু লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার মনে পড়িল, আজ যে একাদশী। তাহার উদ্দেশে এই মাত্র যে সমস্ত তীব্র মন্তব্য তিনি করিয়া গেলেন—তাহা তো অকারণ নহে। সকালের কাজগুলি তাহারই সারা উচিত ছিল আজ।

পিসিমা বলিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, মা? মুখ-হাত ধোও। যোগমায়া পিসিমার কাছে আসিলে তিনি বলিলেন, আহা, মুখখানি বাছার শুকিয়ে গেছে। সারারাত উপোস করে রইলে!

এই কথায় যোগমায়ার চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, সম্বরণ করিবার চেষ্টাও করিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিসিমা স্নেহসিক্ত স্বরে কহিলেন, চুপ কর মা, চুপ কর। পিসিমা উঠিয়া তাহার নিকটে আসিলেন। সহানুভূতি পাইলে কান্না থামিবার কথা নহে, যোগমায়াও থামিল না। পিসিমার বুকে মুখ গুঁজিয়া সে কান্নার মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল। আজ এই মুহূর্তে পিসিমা আর শাশুড়ীপদবাচ্য নহেন—সহানুভূতির নদীধারাতে মিশিয়া তিনি মা হইয়াছেন।

হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পিসিমা বলিলেন, আহা, আমরাও এমন আবাগী যে, কাল একবার মনেও পড়লো না—কচি বউটা সারারাত উপোস করে রইল!

যোগমায়া বলিল, আপনারাও তো উপোস করে ছিলেন।

আমরা আর তুমি! বিধবা মানুষের অমন উপোস মাসে চার-পাঁচটা তো আছেই। এই আজ তো একাদশী, জল তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও এক বিন্দু জল খাবার উপায় নেই।

কষ্ট হয় না আপনার?

কষ্ট! পিসিমা হাসিলেন, দূর পাগল মেয়ে! কষ্টের কথা কি বলতে আছে? প্রথম প্রথম হত বটে, আজকাল শরীর এমন হাল্কা হাল্কা বোধ হয়। বেশ লাগে।

যদি ধরুন, এই জ্যৈষ্ঠি মাসের দুপুর বেলায় জল তেষ্টা পায়?

না মা, তা পায় না। যা ধম্ম কম্ম তাতে ওসব ইচ্ছেই হয় না। নইলে আর দেবতার মাহিত্তির কি।

যোগমায়া মুখ ধুইতেই পিসিমা বলিলেন, শোন তো, মা এক বার এদিকে এস। ওই কোণে কেটের কাপড় আছে—এড়া কাপড়খানা ছেড়ে ঐখানা পর। পরেছ? এই বার ওই কুলুঙ্গি থেকে পেতলের মাঝারি ফেরোটা পেড়ে ওর মধ্যে চারটি মুড়কি আছে—নাও দেখি।

যোগমায়া সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, না, পিসিমা—এত সকালে?

পিসিমা হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, না-ও-ই না। আজ তো আমরা খাব না, তোমার খেতে দোষ নেই। আমি বলছি কোন অকল্যাণ হবে না। আরও দু-মুঠো নাও। বসো ওইখানে, সবগুলি খেয়ে ফেল। গামছা পরে এক ঘটি জল তুলে আনি।

মুড়কি খাইতে বসিয়া যোগমায়া ক্ষুধার তীব্রতা অনুভব করিল। সারারাত্রি যাহা শোকে ও ভয়ে অভিভূত ছিল, পিসিমার স্নেহস্পর্শে তাহা লোলুপ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিল। ঢক্ ঢক্ করিয়া ঘটি দুই জল খাইয়া যোগমায়া তৃপ্তি বোধ করিল। এতক্ষণে মনে হইল, সকাল বেলাটি ভারি মিষ্ট।

কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য। গঙ্গাস্নান সারিয়া শাশুড়ী বাড়ীর উঠানে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের সেই রমণীয়ত্ব চলিয়া গেল। নিজে তিনি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আসিলেন, ইহাদের জন্য আনিলেন সারাদিনকার আত্মগ্লানি।

উঠানে পা দিয়াই বলিলেন, হরি ঠাকুরঝির পেটে পা দিয়ে এলাম না! সারা ঘাটের লোক ছি-ছিক্কার করতে লাগলো। টাকা ধার কে না করে? কে না গহনা বাঁধা দেয়? বিষয় কিনেছি—উড়িয়ে তো দিই নি। হারামজাদী!

যোগমায়া ও বাড়িতে চলিয়া গেল। আবার একটা ভয়ের ছায়া ধীরে ধীরে তাহার তরুণ মনকে গ্রাস করিতে লাগিল।

প্রত্যহের জলসিঞ্চনে রাঙানটেগুলি সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, জমি আর দেখা যায় না—লাল কম্বল কে যেন বিছাইয়া দিয়াছে সেখানে। মিষ্ট ডাঁটার লাল গাছগুলিও

ওধারে ঝাঁকড়া হইয়াছে। প্রাচীরের কোণে সেদিন যে ট্যাঁরসের বীজ ফেলা হইয়াছিল তাহাতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে ঠাসাঠাসি। আর একটু বড় হইলে বা দুই এক ছাট বৃষ্টি হইলে ওগুলি তুলিয়া একটু ফাঁক ফাঁক করিয়া পুঁতিতে হইবে। সেদিনকার জল পাইয়া এখানে-ওখানে ওলের ডাঁটা জমি ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ওগুলিকে কেহ পুঁতিয়া দেয় না, অথচ বছর বছর জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি একটু বৃষ্টির জল পাইলেই আপনি আপনি মাটি ফুঁড়িয়া উঠে। ঝিঙ্গার লতাটি লতাইয়া লতাইয়া কাঁঠাল গাছ আশ্রয় করিতেছে—এখনও ফুল ফোটে নাই। কিন্তু প্রাচীরের মাথা অজস্র কুমড়া ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। যোগমায়া কয়েকটি কুমড়ার ফুল তুলিল। বেশম দিয়া এই ফুলের বড়া শাশুড়ী প্রায়ই ভাজিয়া থাকেন। তুলিবার সঙ্গেই মনে হইল, আজ একাদশী। নাকের কাছে একবার ফুলটি সে তুলিয়া ধরিল। বেশ একটা রসনা-উদ্রেককারী গন্ধ বাহির হইতেছে। এইমাত্র ফুল ফুটিয়াছে—অথচ ছোট ছোট গোল ধরণের পোকাও কয়েকটি ফুলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আশ্‌মানী রঙের উপর কালোর ঘন ফুট দেওয়া ঈষৎ শক্ত পাখা তাহাদের—হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষ বিস্তার করিয়া পোকাগুলি উড়িয়া গেল। পুষ্প-পরাগমাখা হাতখানি যোগমায়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল।

সজিনা ডালে একটা হাঁড়িচাঁচা পাখী আসিয়া বসিল। খানিক কর্কশ স্বরে কুক্‌ কুক্‌ শব্দ করিয়া আবার সে উড়িয়া চলিয়া গেল। ফুল ফেলিয়া দিয়া যোগমায়া উড়ন্ত পাখীটার পানে চাহিয়া রহিল।

কি সুন্দর জীবন উহাদের! যখন তখন যেখানে সেখানে উড়িয়া যায়। এইমাত্র এখানে আছে—পরমুহূর্তে এক ক্রোশ দূরে চলিয়া গেল। মানুষের যদি পাখা থাকিত! মানুষ যদি আকাশে অমনই ইচ্ছা-সুখে বিচরণ করিতে পারিত! এক ক্রোশ দূরের হরিপুর গ্রামখানি যোগমায়ার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সেই কদম তলায় কলমি ডোবা, বৈঁচি ঝোপ, বাড়ির সামনে ঝাঁকড়া বকুল গাছ—ডান দিকের ঝোপে কল্‌কে ফুলের গাছে হলুদ রঙের অজস্র ফুল, সেই গাছে উঠিয়া ফুলের বোঁটা ভাঙিয়া মধুলেহন, উঠানের জাঁতি গাছ—বক ফুলের গাছ ও শুইয়া-পড়া লেবু গাছ, মায়ের সদা-প্রসন্ন মুখ, বাপের অসময়ে স্নান আহারের অনিয়ম, দাওয়া উঁচু আটচালা ঘরের আধ-অন্ধকার কোণে দেড়কোর উপর মাটির প্রদীপটি মিটি মিটি জ্বলিতেছে, জোড়া কুলুঙ্গির নীচেয় সিঁদুর, হলুদ ও ঘৃত বিচিত্রিত বসুধারার দাগ···

দুপুর বেলায় ঘরে বসিয়া যোগমায়া মাকে চিঠি লিখিল:

শতকোটি প্রণাম জানিবে। মা, তোমার জন্য আমার বড় মন কেমন করে। কবে আমাকে লইয়া যাইবে? এখানকার সংবাদ সকলে ভাল আছেন। তোমরা কেমন আছ জানাইবে। বাবাকে আমার প্রণাম জানাইবে।

এক পৃষ্ঠা কাগজের সবটুকুই শেষ হইয়া গেল। আর বেশিই বা কি লিখিবে।

ওইটুকু লিখিতেই তো দুপুর বাজিল। শাশুড়ী ও-ঘর হইতে ডাকিলেন, বউমা, খাবে এস।

চিঠির কাগজখানি আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া যোগমায়া ও-ঘরে চলিল।

শাশুড়ী ভাল যে না বাসেন তাহা নহে। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন মাছ আনিতে। অন্য দিন না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু একাদশীর দিন সধবা মানুষের মাছ না খাওয়াটা অকল্যাণ-জনক। মাছের ঝোল আর ভাত। যোগমায়ার মনে তখন পিতৃগৃহের বিচ্ছেদধারাটি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া চিঠিখানি সেখানে পাঠাইবে সেই চিন্তায় সে তন্ময়। বাটিতে কিছু ঝোল পড়িয়া রহিল, পাতে অনেক-গুলি ভাতও।

শাশুড়ী মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, ও ক'টি খেয়ে নাও, নইলে ফেলা যাবে।

যোগমায়া মৃদুস্বরে বলিল, আর পারব না, মা।

শাশুড়ী তেমনই ভাবে বলিলেন, গেরস্থর জিনিস অপচো ভাল নয়। গরুও এখনও বিয়োয় নি যে তার নাদায় দেব।

অতি কষ্টে যোগমায়া আর চারটি ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িল। রোয়াকে আঁচাইবার সময় সে শুনিল, শাশুড়ী আপন মনে গজ গজ করিতেছেন, আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে। বুড়ো মাগী হয়ে মরতে চললাম—এ সব ঢের বুঝি। গহনার শোক! এই দুর্জয় একাদশী করে ওবেলা আবার রাঁধব নাকি? থাক ঐ ভাত জল দেওয়া। ছুঁড়ির বয়েস তের বছর হ'ল তবু যদি একটু হুঁস থাকে!

ঘটির জলের সঙ্গে চোখের জল মিশাইয়া যোগমায়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। অঞ্চলগ্রন্থি হইতে চিঠিখানি

বাহির করিয়া তাহার উন্টা পিঠে লিখিল, মাগো, আমার বড্ড মন কেমন করিতেছে। যদি না লইয়া যাও তো আমার মাথা খাইবে।

শাশুড়ী ঘুমাইলে চুপি চুপি সে পিসিমার ঘরে উঠিয়া গেল। নিত্য অভ্যাস মত তিনি চরকা কাটিতেছিলেন। এক পাশে পাঁজ করা তুলা রহিয়াছে, তাহার পাশে ছোট একটি পিতলের ঘটিতে সামান্য একটু জল। ঘটির জলে মাঝে মাঝে আঙুল ডুবাইয়া না লইলে তুলা কাটার সুবিধা হয় না।

যোগমায়াকে দেখিয়া পিসিমা বলিলেন, এস, মা, বোস।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া যোগমায়া মৃদুস্বরে ডাকিল, পিসিমা?

কি, মা? চরকা হইতে মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন, কিছু বলবে?

অঞ্চলগ্রন্থি হইতে চিঠিখানা খুলিতে খুলিতে যোগমায়া সলজ্জ কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, এই চিঠিখানা যদি পাঠিয়ে দেন, মাকে।

পিসিমা চিঠিখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এই কথা! আচ্ছা, দেব'খ . ওদের কালীকে ডেকে—একখানা খাম কিনিয়ে—

খামের পয়সা তো আমার নেই, পিসিমা?

আচ্ছা, আচ্ছা, খাম যদি কেনা হয়—পয়সার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

দিন দুই পরে যোগমায়ার পিতা রামজীবনবাবু একটা হাঁড়িতে কিছু মিষ্টি ও ঝুড়িতে কিছু আনাজপাতি লইয়া এ বাড়িতে দেখা দিলেন

এই যে বেয়াই এসেছেন। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গো, বেয়াইয়ের সাক্ষাৎ পেলাম। বসুন। আধঘোমটা টানিয়া শাশুড়ী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

রামজীবনবাবু হাসিয়া বলিলেন, অনেক দিন আসি নি, ভাবলাম, বেয়ানের শ্রীচরণ দর্শন করে আসি।

আর বেয়াই, কোন রকমে প্রাণগতিকে বেঁচে আছি। বেয়ান ভাল আছেন? ছেলেরা ভাল আছে?

আপনার আশীর্ব্বাদে আর ভগবানের কৃপায় সবাই ভাল আছে। রাম এখন কোথায়, বেয়ান?

চিঠি আনছি। পোড়া দেশের নামও মনে থাকে না ছাই।

এর মধ্যে বুঝি আর বাড়ি আসে নি?

পোড়া কপাল কাজের! ছুটি কোথায়? সেই পূজোয় যা এসেছিল। বউমা কোথায় গেলে গো? এ-ঘরে এসো। তোমার বাবা এসেছেন, আদর-যত্ন কর। আমাদের যত্ন-আত্তিতে কি হয়, বাপু?

মেয়ের যত্ন তো সবাই পায়, বেয়ান। আপনাদের যত্ন পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা।

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, শোন কথা! আচ্ছা, আচ্ছা, যত্ন না হোক্—একটু কষ্ট করে এ-বেলাটা এখানে খেয়ে যেতে হবে। না বললে শুনবো না। আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। ঠাকুরঝি, বেয়াই রইলেন, হাত-মুখ ধুইয়ে জলটল খাইও। বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন।

রামজীবন বলিলেন, তাই ত বেয়ান, বড়ই মুশ্‌কিলে ফেললেন দেখছি! সারা দুপুর বেলাটা কাটাব কি ক'রে?

মেয়ে রয়েছে, গল্প করবেন বসে বসে। বলিয়া তিনি কক্ষত্যাগ করিলেন।

যোগমায়া আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল এবং হাসিমুখখানি তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছ, বাবা?

বাঃ রে, তুইও যে তোর শাশুড়ীর মত জিজ্ঞাসাবাদ করতে শিখেছিস? রাঁধতে শিখেছিস তো?

যাও। উল্লাসমিশ্রিত কৃত্রিম ক্রোধে যোগমায়া মুখ ফিরাইল।

আহা, চটিস কেন! না হয় বুড়ো বাপকে এক দিন রেঁধেই খাওয়ালি।

যিনি খাওয়াবার তিনি খাওয়াবেন। সহসা মুখ ফিরাইয়া অভিমান-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিল, তোমাদের তো ভারি দরদ! আমি যাই চিঠি লিখে পাঠালাম—তাই দেখতে এসেছ।

রামজীবনবাবু হাসিয়া বলিলেন, যখন তখন দেখতে এলেই বুঝি খুব দরদ—

যাও, যাও, তোমায় আর কথা কইতে হবে না।

আহা, রাগ করিস কেন, বুড়ি—শোন না। সাধ্য-সাধনায় যোগমায়া কাছে আসিলে তিনি তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিলেন, তোর শাশুড়ী বুঝি তোকে বলেছিল চিঠি লিখতে?

হাঁ, দায় পড়েছে ওঁর! তোমাদের তো আর মন কেমন করে না। আবার কণ্ঠস্বর অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল।

রামজীবন তাহার পিঠের উপর একখানি হাত রাখিয়া

বলিলেন, করে বইকি, মা, করে। করলেই বা উপায় কি। তোমার ঘর তো তোমায় চিনতে হবে।

যোগমায়া কথা কহিল না। এ কথা সে ছেলেবেলা হইতে শুনিতেছে—বহু লোকের মুখে। এই ঘর চিনিবার মধ্যে এমন কি সান্ত্বনা বা শান্তি আছে—তাহা তো যোগমায়া আজ পর্য্যন্ত বুঝিল না।

রামজীবন মাথা চুলকাইয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কি বলে কথাটা পাড়ি বল দেখি?

বাঃ রে, তার আমি কি জানি।

এই বোশেখে এলি—আর জ্যষ্টিতে যদি নিয়ে যাবার কথা তুলি—উনি কি মনে করবেন?

জানি না।

কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি সস্নেহে বলিলেন, দুঃখু করিস নে, মা। অনেক সহ্য করতে না পারলে—

তাঁহার কথা শেষ হইতে-না-হইতে যোগমায়া ত্বরিতে নিজের মুখখানি তাঁহার বুকে গুঁজিয়া দিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামজীবন নিঃশব্দে তাহার মাথাটি বুকের উপর আর একটু চাপিয়া ধরিয়া গাঢ় স্পর্শের ভিতরে তাহাকে নীরব-সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। খুট্ খুট্ করিয়া ও ঘরের শিকল নড়িয়া উঠিল। রামজীবন সচকিত হইয়া বলিলেন, তোমার পিস্‌শাশুড়ী বোধ হয় ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া যোগমায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেকখানি অশ্রু বাহির করিয়া তাহার দেহ মন লঘু হইয়া গিয়াছে।

নূতন হইয়া যোগমায়া ফিরিয়া আসিল। হাত মুখ ধুয়ে নাও, বাবা, পিসিমা বলছেন।

আর একটু গল্প করি না।

না, আগে হাত মুখ ধুয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক করে—

ওরে, ভোর বেলায় সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে তবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা, হাত মুখ ধুয়ে নিচ্ছি। কুটুম বাড়ি এসেছি, জল খেতে হবে বইকি!

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, কুটুম বাড়িই তো।

জলখাবার খাওয়া হইলে রামজীবন বলিলেন, হাঁ রে বুড়ি, তোদের এখানে ভাল দাবা খেলিয়ে আছে?

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, হাঁ—সন্ধান বলে দিই, আর সারাদিন সেইখানে গিয়ে থাক!

নারে, তোদের তাড়ায় এখানে সেটি হবার জো কি। জান না, এ যে কুটুমবাড়ি।

তুই ভারি দুষ্টু হয়েছিস, বুড়ি। দুই জনেই হাসিতে লাগিলেন।

হাসি থামিলে বলিলেন, আচ্ছা চল, কি কি গাছ আজ্জেছিস দেখিগে।

যোগমায়া পিতাকে ও-বাড়িতে লইয়া গেল। রামজীবন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, বাঃ, অনেকখানি জায়গা তো এ বাড়িতে। একখানা দোতলা কোঠা ঘরও রয়েছে। কাদের বাড়ি রে, বুড়ি?

বল দিকি কাদের? কৌতুকে যোগমায়ার চক্ষু নাচিয়া উঠিল।

বলব? বলব? একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,—দুর ছাই—ওঁর নামটা যে মনে পড়ছে না। তোর বিয়ের সময় যিনি বরকর্ত্তা হয়ে গিয়েছিলেন।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, তিনি তো আমার জেঠ্‌শ্বশুর হন। তাঁদেরই বাড়ি। আমরা যে কিনে নিয়েছি।

কিনে নিয়েছিস তোরা? বাঃ, খাসা বাড়ি, অনেকখানি জায়গা। তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে যোগমায়ার পানে চাহিলেন। যেন এই বাড়ি ক্রয় করিবার সবটুকু গৌরবের সে-ই একমাত্র অধিকারিণী।

যোগমায়ার সারা অন্তর পিতার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের কিরণে পুলকিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, এই দেখ না, শাশুড়ী বন পরিষ্কার করে জমি কুদলে দিয়েছেন; আমি রাঙানটে, ঢ্যাঁরস, মিষ্টি ডাঁটা আজ্জেছি।

খাসা নটে শাক হয়েছে তো, বুড়ি। আজ তেল শাক করিস দিকি।

করব। ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া এই বাড়ির জমি তৈয়ারীর অনেক তথ্য বলিয়া গেল। ভবিষ্যতে কোথায় ভাল আমের কলম বা কাঁঠালের চারা পুঁতিবে তাহার কথাও বলিতে লাগিল।

রামজীবন বলিলেন, তোদের গরু নেই? আছে? মাত্তর একটা। আর একটা গাই পুষিস। পালা ক'রে দুটোয় বারো মাস দুধ দেবে। ঐ কোণটায় ছোটখাটো খড়ের চালের গোয়ালটা বাড়িয়ে নিস।

যোগমায়া বলিল, মাকে বলব।

বলিস। ভাল গরু যদি নাই পাস, আমাদের রাঙীর নই বাছুর হলে একটা পাঠিয়ে দেব।

তাহ'লে বেশ হবে, বাবা। তাই তুমি পাঠিয়ে দিও। ছোট বাছুর মানুষ করতে আমার ভারি ভাল লাগে।

লাগবে বৈকি, মা। রামজীবন মুগ্ধ দৃষ্টিতে কন্যার

পানে চাহিলেন। ত্রয়োদশী কিশোরীর মুখে যে হাসিটি ফুটিয়াছে তেমন মিষ্ট হাসি মাতৃজাতির মুখেই ফুটিতে পারে, এবং তাহাদের মুখে সে হাসি মানায়ও চমৎকার।

পিতাকে লইয়া সারাটি দিন যোগমায়ার বড় আনন্দেই কাটিল। নূতন নূতন জিনিস দেখিয়া রামজীবনের যত বিস্ময় বাড়ে, যোগমায়া আনন্দ ও গৌরবে ততই ফুলিয়া উঠিতে থাকে। বিদায়কালে ম্লান মুখে সে পিতাকে বলিল, এ-বেলাটা থেকে যাও না। চারটি ভাত তো খেলে না।

রামজীবন হাসিলেন, দূর পাগলী! ভাত খাবার দিন আগে আসুক—তখন পেট ভরে তোর হাতের সুক্তো ডালনা খেয়ে যাব।

আবার কবে আসবে, বাবা?

আসব—আসব—শীগ্‌গির। এ-পাড়া ও-পাড়া বৈ ত না?

কই, আস না তো!

আচ্ছা, রথের দিন আসব।

ঠিক?

ঠিক আসব। সেদিন এসে কিন্তু তোর শাক ভাজা দিয়ে লুচি খাব না, নতুন ইলিস মাছ ভাজা দিবি তাতে। বুঝলি?

আচ্ছা।

পিতা চলিয়া গেলে যোগমায়ার আনন্দও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। চিঠি লিখিয়া পিতাকে আনাইয়া যে-কথাটি সে বলিতে চাহিয়াছিল, তাহা বলা হইল কৈ? তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব অশোভন হইলেও, তাহার দুঃখগুলি সে পিতার কাছে প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গেল কেন। তিনি হাসিমুখে বিদায় লইবার সময় নিঃসংশয়ে জানিয়া গেলেন, কন্যা পরম সুখেই শ্বশুরঘর করিতেছে। একবারও কন্যার খালি গা বা হাতের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৈ জিজ্ঞাসা করিলেন না তো, হাঁ রে, বুড়ি, তোর গায়ের গহনাগুলো কি হ'ল? আশ্চর্য্য! দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদের পরে পিতাপুত্রীর মিলনে যে কথা উঠা উচিত ছিল তাহার বাতাস মাত্র উঠিয়াই এ বাড়ির তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য ও রচনার মধ্যে সেই অভিযোগগুলি কোথায় যে নিশ্চিহ্ন হইয়া তলাইয়া গেল।

৪

জ্যৈষ্ঠেরই শেষাশেষি এক দিন শাশুড়ী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পিসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন, শুনেছ, ঠাকুরঝি, হরি বাঁড়ুজ্জের মেয়ের পরশু বিয়ে হবে।

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, তিনি শুনেন নাই একথা।

শাশুড়ী বলিলেন, গঙ্গার ঘাটে বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী বলছিলেন। তাড়াতাড়ি ডুব দিয়েই তিনি উঠে পড়লেন, জপটাও সারতে পারলেন না। কাল গোয়াড়ী থেকে চাটুজ্জেরা এসেছিল মেয়ে দেখতে। দেখেই পছন্দ। একেবারে দৈবজ্ঞি ডাকিয়ে গণ পণ মিলিয়ে আশীর্ব্বাদ সেরে গেছে।

পিসিমা বলিলেন, মেয়ের বরাত ভাল। গোয়াড়ীর চাটুজ্জেরা রাজালোক।

শাশুড়ী বলিলেন, বাঁড়ুজ্জেরাই আমাদের গ্রামে কম কি! জমিদারী না থাক, সবাই বড় চাকরো।

পিসিমা বলিলেন, তা ভগমান মিলিয়েও দেন তেমনি। যে যার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছে।

শাশুড়ী বলিলেন, তা তো হ'ল। শুনেছি গাঁ শুদ্ধু নেমন্তন্ন হবে। প্রথম মেয়ে—সাধ-আহ্লাদ তো কিছু বাকী রাখবে না। আমাকে দু'টি হাতে ধরে বললে, নিরিমিষ রান্নার ভার নিতেই হবে।

পিসিমা বলিলেন, তোমার রান্নার সুখ্যাতি এ-অঞ্চলে আছে কিনা।

আর একটা বিপদ কি হয়েছে জান? গলার স্বর নামাইয়া শাশুড়ী বলিলেন, আমরা বিধবা মানুষ, কারু বাড়িতে যেন খেলাম না, শোভা পেয়ে গেল, কিন্তু বউমাকে ওরা ছাড়বে কেন?

পিসিমা বলিলেন, তা কি ছাড়ে। বউমাও যাবেন না-হয়—

শাশুড়ীর চাপাগলায় বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল, তুমি যেন দিন দিন কি হচ্ছ, ঠাকুরঝি! ওই বড়মানুষের বাড়ি—কত দেশ থেকে কত কুটুমসাক্ষেৎ আসবে, পাড়ার বউ-ঝিরা সেজে-গুজে খেতে যাবে—আর খালি হাতে ট্যাং ট্যাঙিয়ে বউমা কি ক'রে সেখানে যাবে শুনি? আমাদের মুখখানা তাতে পুড়ে যাবে না?

পিসিমা কথা কহিলেন না।

শাশুড়ী বলিতে লাগিলেন, আমি ভাবছিলাম কি, বউমাকে না-হয় দিন কতকের জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই—বেয়ানের অসুখ বলে। কি বল?

সেই ভাল। কথা না কহিলে পাছে তিনি বিরক্ত হন এই ভয়ে পিসিমাকে মত দিতে হইল।

শাশুড়ী আপন মনেই বলিলেন, এই সেদিন বেয়াই এলেন, তখন যদি খবরটা পেতাম! এখন উব্‌জে

মেয়ে পাঠাই-বা কি করে? ওঁরাই বা কি মনে করবেন?

পিসিমা কি উত্তর দিবেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শাশুড়ীর প্রশ্নটি স্বগত, কাজেই উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া তিনিই বলিতে লাগিলেন, পরশু বিয়ে, ভেবে দেখি। চেয়ে চিন্তে এক দিনের জন্যেও যদি ওরা গহনা কখানা দেয়! দেবে না?

তা দিতে পারে। এমন তো অনেকে নেয়—আবার ফিরিয়েও দেয়।

তাই বলব। একখানা লাল পেড়ে শাড়ী আর কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিতে হবে আইবুড়ো ভাত ব'লে। হাতে আবার টাকার টানাটানি! কি করে যে সংসার ধর্ম্ম করি তা ভগমানই জানেন।

ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া যোগমায়া যুক্ত করে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল, হে হরি, গহনা যেন ওরা ফিরিয়ে না দেয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় আমি পাঁচ পয়সার হরির্লুট দেব।

প্রথমটা মনে হইল, যোগমায়ার ক্ষুদ্র প্রলোভনে হরি ঠাকুর হয়ত বা বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। গহনা পাওয়া গেল না। মিত্র-গৃহিণী বলিয়াছেন, এই রকম দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বার দুই এমন ঠকিয়াছেন যে, ঠাকুর ঘরে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে কঠিন শপথ করিতে হইয়াছে। শপথ করিয়াছেন দেবতার সম্মুখে, পাছে নিকট আত্মীয়-স্বজন অথবা অতিবিশ্বাসী কোন প্রতিবেশী তাঁহাকে উক্তরূপ অনুরোধ করিয়া শপথ ভাঙিয়া দেন! বিশ্বাস তিনি রামের মাকে যথেষ্টই করেন, এত বিশ্বাস করেন যে নিজের মাকেও ইত্যাদি, কিন্তু দেবতার সম্মুখে শপথ—

শাশুড়ী গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাড়ি আসিলেন, না দেবার ছুতো! এমন পিচেশ, ঠাকুরঝি। ওদের যদি নরকেও জায়গা হয়। কাল সকালেই গাড়ি ডাকিয়ে বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব, নইলে মানসম্ভ্রম যাবে।

লঘুপক্ষ বিহঙ্গিনীর মত যোগমায়া উড়িয়া ও-বাড়িতে চলিয়া গেল। মিষ্ট ডাঁটার গাছে গাল ঘষিয়া, নটে শাকের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া ও কুমড়া ফুলের রেণু নাকের ডগায় ঘষিয়া আপন মনেই সে হাসিয়া উঠিল। চারি তো পাঁচটা পয়সা, মায়ের কাছে চাহিয়া যদু ময়রার দোকান হইতে নিজেই সে পাটালি বাতাসা কিনিয়া আনিয়া 'হরির্লুট' দিবে।

ঠাকুর কিন্তু সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। হয়ত বা আর কোথাও মোটা রকমের ঘুষের প্রলোভনে তিনি যোগমায়ার প্রার্থনাটি ভুলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার মুখে একখানি গরুর গাড়ি এ বাড়ির বহির্দ্বারে আসিয়া থামিল এবং গাড়ির ভিতর হইতে চঞ্চলা কুরঙ্গীর মত কমলা বাহির হইয়া আসিল। শুধু যোগমায়া কেন, এ বাড়ির সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত আগমন!

শাশুড়ীর মনে আনন্দ ও আশঙ্কা দুই জাগিয়া উঠিল। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে, হঠাৎ এলি যে?

কেন, আসতে নেই? প্রতিপ্রশ্ন করিয়া কমলা হাসিল।

শাশুড়ী বলিলেন, জামাই ভাল আছে তো? বেয়ান—বেয়াই?

সবাই—সব্বাই ভাল আছেন। তোমার কোন চিন্তা নেই। চিঠি ওঁরা দিয়েছিলেন, আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, ডাক বাক্সে ফেলতে দিই নি। ভাবলাম, হঠাৎ গিয়ে তোমাদের তাক্ লাগিয়ে দেব।

তোর চিরটা কাল এক ভাবেই গেল কমলি। মাগো, হঠাৎ বুকের গোড়াটা এমন ছাঁৎ করে উঠেছে!

বউ কোথায়? বউ আছে তো এখানে?

আছে রে—আছে। কাল যে সে বাপের বাড়ি যাবে।

ইস্—যেতে দিলে তো! আমি বলে সওয়া পাঁচ আনার 'হরির্লুট' মানত করে আসছি, হে হরি, বউকে গিয়ে যেন দেখতে পাই—বউকে গিয়ে যেন দেখতে পাই! কৈ লো, বউ, কোথায় তুই? এক লম্ফে রোয়াকে উঠিয়া কমলা ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শাশুড়ী বলিলেন, ওরে কমলি, এ ছেলেটি কে? তোর দেওর বুঝি?

ঘরের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, হাঁ, আমার খুড়তুত দেওর। ভাগ্যিস ওর ইস্কুলের ছুটি ছিল—তাই ত আসতে পারলাম! ও তো আর আমার কুটুম নয়, তোমার কুটুম তুমিই ওকে যত্ন-আত্তি কর না?

কথা শোন মেয়ের! বস বাবা, বস।

কিশোর বালকটিকে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া তিনি বসাইলেন ও বলিলেন, এইখানে দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে, একটু জিরোও। গাড়োয়ান জিনিসগুলো এই রোয়াকেই রাখ, গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে তুলতে হবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কমলা বলিল, কৈলো বউ, নাকি বাপের বাড়ি পালাচ্ছিস কাল?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিল।

হঠাৎ কেন লো? বুড়ি হলি, তবু মা বাবার জন্যে হেদোনো কেন লো? ওসব হবে টবে না। আমি বলে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি!

এখন থাকবে তো, ঠাকুরঝি?

বাঃ, তোর মুখে ঠাকুরঝি ডাক ভারি মিষ্টি লাগলো বউ। মুগ্ধ চোখে কমলা যোগমায়ার পানে চাহিল।

যোগমায়া লজ্জায় মুখ নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝি হও বলেই তো—

হাঁ লো, হাঁ—তোর আর অত ব্যাখ্যানাতে দরকার নেই। ঠাকুরঝি বলেই তো ডাকবি। তুই কিন্তু অনেক বদলে গেছিস?

কি রকম? দেখতে খুব খারাপ হয়েছি বুঝি?

খারাপ! খানিকক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ থাকিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, হাঁরে, বউ, দাদা কতদিন হলো বাড়ি আসে নি?

আমি তো তাঁকে এবার এসে দেখি নি।

বলিস কি? বোশেখের প্রথমে এসেছিস—আষাঢ় পড়লো। দাদা কি মানুষ?

সে তোমরাই জান ভাই। ফিক্ করিয়া যোগমায়া হাসিল।

ইস্, কুটুস কামড় বেশ যে দিলি! পিঁপুল পাকছে কি না। এবার বাড়ি এলে আচ্ছা করে শাসন করে দিস, বুঝলি? এ রকম বেয়াড়াপনা—বলিতে বলিতে যোগমায়ার অলঙ্কার বিহীন দেহের পানে চাহিয়া সে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, ওকি দশা তোর। রাধার মত বিরহিণী সেজে বসে আছিস? না একখানা গহনা গায়ে, চুলে খড়ি উড়ছে, পরনে একখানা চিমসে দুর্গন্ধওলা কালো কাপড়!

গহনা অন্তর্দ্ধানের ইতিহাস শুনিয়া কমলা চঞ্চলা হরিণীর মত বাহিরে চলিয়া গেল ও রোয়াকে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরপো, আমার গহনার হাতবাক্সটা কোথায় রাখলে?

সে বেচারী বাড়ির নির্দ্দেশমত ছোট হাত বাক্সটি চাদর ঢাকা দিয়া সর্ব্বক্ষণ সন্তর্পণে আগলাইতেছিল। কমলার কথায় বাক্সটি বাহির করিয়া মাদুরের এক প্রান্তে রাখিয়া দিল। বাক্স ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কমলা ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। তারপর বাক্স খুলিয়া সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। তাহার মধ্য হইতে চিক, রতনচুর, পাঁয়জোর, মৌরি ও নারিকেল ফুল, জশম ইত্যাদি বাহির করিয়া একে একে যোগমায়াকে পরাইতে লাগিল। যোগমায়া প্রথমটা বেশ আপত্তিই তুলিয়াছিল। কমলা তাহার গালে ছোট্ট একটি চড় মারিয়া সব আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিল, থাম্, সেদিনের এক ফোঁটা মেয়ে কথার ওপর কথা কোস কোন্ সাহসে! যা বলবো—চুপটি করে শুনবি। জানিস, এ শশুর বাড়ি। কালসাপিনী ননদিনী—

গহনা পরানো শেষ হইলে খপ্ করিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল, তুই সম্পর্কে বড়, গালে চড় মেরেছি, পাপ হ'ল তো—তাই। কিছু মনে করিস নে ভাই বউ। এগুলো আমি যত দিন এখানে থাকব তোর গায়ে থাকবে। খবরদার খুলেছিস কি—এমন ঝগড়া করব। বাক্সের মধ্যে পচিয়ে রেখে লাভ কি ভাই, তবু এমন গায়ে উঠলে সার্থক হবে! যোগমায়ার গাল টিপিয়া দিয়া কমলা তাহাকে আদর করিল।

যোগমায়ার মনে এতটুকু ক্লেশ আর রহিল না। সমব্যথী না হোক—সমবয়সী মেয়ের কাছে মন খুলিতে না পারিলে বধূ-জীবনের নিঃসঙ্গতা সত্যই অসহ্য লাগে। শুধু গাছপালা লইয়া, বাড়িঘর দেখিয়া ও সকালের পাটঝাঁট ও সন্ধ্যার প্রদীপ দেখানোর ব্যস্ততায় মনের কতটুকু ভরিতে পারে! নিজের মন যেখানে মেশে না, বাহিরের কতকগুলি উপলক্ষ্য লইয়া মন ভরাইতে যাওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কি আছে! প্রথম সুরটি যাঁহারা বাঁধিয়া দিবেন, তাঁহাদের সুরকে রাগিণীবহুল করিতে এই সব পরিবেশের প্রয়োজন। এই বাড়িঘর, ' গাছপালা, কর্ম্ম, আলস্য ও গৃহিণীপনা। কিন্তু সুরস্রষ্টার অনুপস্থিতিতে সারা পরিবেশটাই নিষ্প্রাণ বলিয়া বোধ হয়।

রাত্রিতে দুই জনে এক বিছানায় শুইল এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া পরম আরামেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

আসামের আদিম জাতি

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

"Assam is a gold mine for the anthropologist"—নৃতাত্ত্বিকের কাছে আসাম বা বৃহত্তর আসামের দেশগুলি স্বর্ণখনির মত। কত রকমের কত ভাষার অসভ্য আদিম বর্বর মনুষ্য সমাজ এখানে বসতি করে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অসভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অধিষ্ঠিত কত প্রকার বিভিন্ন আদিম জাতি এই অঞ্চলে তাহাদের নিজ নিজ আচার, ব্যবহার, ধর্ম, ভাষা, অদ্ভুত অদ্ভুত রীতি নীতি, কৃষ্টি, পোষাক, পরিচ্ছদ, সমাজ শাসনবিধি প্রভৃতি বহন করে কালাতিপাত করছে। নৃবিদ্যা সাধনার এমন লোভনীয় দেশ ভারতবর্ষে কম। শ্বাপদ-সঙ্কুল পর্বতময় গহন জঙ্গলের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র, নাতিক্ষুদ্র বা বর্ধিষ্ণু পল্লীগ্রাম সৃষ্টি করে কখনও বা লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সমস্ত আদিম অসভ্য জাতি বর্বরোচিত কুসংস্কার সব বজায় রেখে এখনও বাস করছে। সে সমস্ত কুসংস্কার শুধু বর্বরোচিত নহে, অত্যন্ত ভয়াবহ, যেমনতর নাগা জাতির নরমুণ্ড-সংগ্রহ-প্রথা (head-hunting)—সভ্যতার আড়ালে বাস করে কি ভাবে যে এই পৈশাচিক প্রথা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা তারাই বলতে পারে। এই নৃশংস অভ্যাস শুধু যে আসাম অঞ্চলেই আছে, তাহা নহে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ইন্দোনেসিয়া পলিনেসিয়াতেও এক সময় আদিম জাতিগুলির মধ্যে এই প্রথা বর্তমান ছিল। মানুষের মাথা সংগ্রহ করে সেই নরের প্রাণবন্ত ধরণীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে যাতে ভাল ধান হয় এইটাই হল এদের যুক্তি। এটা আমরা যে এত নিষ্ঠুর ভাবি কিন্তু ওরা তা ভাবে না। শত্রুকে বধ করে তার soul-force বা আত্মা-শক্তি ধরিত্রীর মধ্যে উন্মুক্ত করে দেয় যাতে ভাল ফসল হয়।

শুধু আসাম বলিলে ভুল হবে কারণ আসাম প্রদেশের উত্তরে এবং পূর্বেও বহু আদিম জাতি বাস করে, যাদের জাতি গোষ্ঠী প্রদেশান্তর্গত বনাকীর্ণ গিরিশিখরে গাত্রে, বা উপত্যকায় বাস করছে। বৃটিশ ভারতের আসাম প্রদেশটি দুটি বৃহদাকার বিস্তৃত উপত্যকায় বিভক্ত। উত্তর-আসামে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং নিম্ন আসামে সুরমা উপত্যকা, প্রদেশের মধ্যস্থিত সুবিস্তৃত পার্বত্য-ভূমিকে এদিকের গোয়ালপাড়া কামরূপ সমতলভূমি এবং ওদিকে শ্রীহট্টের সমতলভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

কেলিও কেজিউ নাগা পুরুষ

সুরমা উপত্যকায়, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দ্বিতীয় বিভাগের গিরিমালাবেষ্টিত পার্বত্য জেলাগুলিতে আছে—গারো পাহাড়ে গারোরা, খাসি, ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ে খাসিয়া ও সীন্টেং জাতি, নাগা পাহাড়ে নাগারা এবং লুসাই পাহাড়ে কুকি, থাডো, লাখের, মিকির হিলসে মিকিররা এবং কাছাড়ে কাছাড়ীরা। এদের মধ্যে অল্পবিস্তর সভ্যতার আলো যা পৌঁছেছে তার ফলে গারোরা হয়েছে বাঙালী হিন্দুভাবাপন্ন আর খাসিয়ারা হয়েছে অল্প খৃষ্টান

কাছাড়ী বালিকা

ভাবাপন্ন কারণ শিলঙে পাদরী মহাশয়দের কল্যাণে খাসিয়ারা সব চেয়ে বেশী যীশুর ধর্ম নিয়েছে। নাগা, কুকি এরা বিশেষ বদলায় নি, তবে এ দুটি জাতির মধ্যেও বহুসংখ্যক প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। মিকিরদের অপেক্ষা কাছাড়ীরা বেশী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এরা কাছাড় থেকে আসামের অন্যান্য বহু জেলাতে ছড়িয়ে পড়ছে কামরূপ, দারাং প্রভৃতির দিকে।

উত্তর-আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নওগাঁ, দারাং, শিবসাগর, লখিমপুর প্রভৃতি জেলায় বা জেলার বাহিরে আসামের উত্তরে সীমান্তরালে আকা, দাফ্‌লা, মিরি, মিশমী, আবর প্রভৃতি কতকগুলি অতি আদিম বর্বর জাতির বাস—তাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এক প্রকার হয় নি বললেই চলে। তার প্রধান কারণ যাতায়াত সুবিধাজনক নহে তার ওপর আমাদের যাওয়াটা ওই সমস্ত আদিম সমাজ আদৌ সুচক্ষে দেখে না। একে ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাদের নাম-ধাম, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে গেলে, সন্দেহের চক্ষে দেখে—বুঝি বা পুলিসের লোক—সরকারী দোভাষী (interpreter) সঙ্গে থাক্‌লে বা দু-একটা পাইক পেয়াদা থাক্‌লে, ভয়ে কিছু কিছু বলে—যার অনেকখানি বাজে—সত্য একেবারে প্রকাশ করে না। গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ জেলায় আদিম জাতিদের কারও মূল বাসস্থান নাই তবে কামরূপ জেলায় উপনিবেশ করেছে অনেক কাছাড়ী (কাছাড়ের আদিম), রাভা, গারো এবং মিকির প্রভৃতি। এদের কারুর মধ্যেই গারোদের ভিন্ন খুব বিশেষ নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে বলে মনে হয় না।* গৌহাটী হ'ল বাণিজ্যকেন্দ্র এবং জেলার হেড্ কোয়ার্টার—তেজপুর ছাড়িয়ে উত্তর দিকে বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বতের দিকটাই এদের আদি বাস। বারপেতা মহকুমার দিকে গারো বেশী। গত আদমসুমারীতে দেখা যায় কাছাড়ীদের সংখ্যা ৯২ হাজার, রাভা ১৬ হাজার, মিকির সাড়ে দশ হাজার।

দারাং জেলায় রাভার সংখ্যা বেশী কিন্তু বালীপাড়ার উত্তরাঞ্চলে সীমানা পেরিয়ে আকা এবং দাফ্‌লা দুটি অসভ্য আদিম জাতির বাস। এদিকটা হিমালয় মহাপর্বতের সানুদেশ—গিরিশৃঙ্খলে আবদ্ধ বনভূমিতে আকা এবং দাফ্‌লারা সভ্যতার অতি পশ্চাতে আজও বাস করেছে। আকা জাতি অল্প একতাবদ্ধ কিন্তু দাফ্‌লা পাহাড়গুলিতে দাফ্‌লা জাতির খণ্ড খণ্ড দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী নির্মাণ ক'রে বাস করছে। তিব্বত-বর্মী জাতি অন্তর্ভুক্ত ব'লে দাফ্‌লা মুখের আদল খাঁটী মঙ্গোল টাইপের—নাক চ্যাপ্টা, চোয়াল উঁচু, চোখে অল্প ভাঁজ, খাটো গড়ন, পরিশ্রমী দেহ। খুব শক্তিশালী পার্বত্য জাতি এই দাফ্‌লারা—আহোম রাজাদের রাজত্বে প্রায়ই পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসে সমতলভূমির শান্ত প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। আকাদের সংখ্যা কম—হ্রাসও পাচ্ছে—এরা একটু বেশী অসভ্য এবং আদিম।

দারাঙের পূর্বে শিবসাগর জেলায় মিকির এবং মিরি জাতির বাস—মিকিরের সংখ্যা ২৩ হাজার এবং মিরি ১৭ হাজারের উপর। মিকির হিল্‌স্ নওগাঁ এবং শিবসাগরের মাঝামাঝি—এই পাহাড়গুলির শিখরে, বক্ষোপরি বা সানুদেশে মিকির আদিম জাতিদের আদি গ্রাম†—সমতলভূমিতে এরা এখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে

* অনেক দিন পূর্বে ড্যাল্টন তাঁহার Ethnology of Bengalএ অল্প অল্প এই সমস্ত জাতিগুলির সচিত্র পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে Col. Shakespeare তাঁহার History of Upper Assam etc.তে তাহার পুনরুক্তি করেছেন। গবেষণা বলতে ১৯১১ সালে তেজপুরের এক পাদরী এঁণ্ডলে (Endle) কাছাড়ীদের সম্বন্ধে কিছু করেছিলেন তাও কামরূপ দারাং-এ উপনিবিষ্ট কাছাড়ীদের মধ্যে—কাছাড়ে নহে।

† The Mikir—Stack and Lyall.

এবং বহুসংখ্যক মিকির হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। মার্কিনের মিশনরী দল কয়েকটি এই আদিম জাতিদের মধ্যে এখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার করেছে। নওগাঁ জেলাতেও এই মিকির জাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। শিবসাগরের উত্তর দিকটাতেই মিরিদের দেখতে পাওয়া যায় যেহেতু দাফলাদের আড্ডা ছাড়িয়ে প্রায় ডিব্রুগড়ের কাছাকাছি আসামের উত্তর সীমান্তে, মিরি হিল্‌স্‌ এই জাতির আবাসভূমি—এইখান হইতেই অন্নসংস্থানের জন্য ১৭।১৮ হাজার মিরি উপনিবেশ করেছে বৃটিশ আসামের শিবসাগর জেলায়। ১৯৩১ সালের আদমস্থমারিতে মিরিদের সংখ্যা দেওয়া রয়েছে ৮৫০৩৮ পঁচাশী হাজার আটত্রিশ আর মিকির জাতির মোট জনসংখ্যা দিয়েছে ১২৯,৭৯৭ এক কোটী উনত্রিশ হাজার সাত শত সাতানব্বই। মিকির হিল্‌সের মিকিরদের সম্বন্ধে ১৯০৮ সালে ষ্ট্যাক কিছু লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা ছাড়া ড্যাল্টন এবং সেন্সাসে যেটুকু ওদের বিষয় জানতে পারি তাতে বুঝি ওরা নিজেদের আরলেং ব'লে ওদের ভাষায় অভিহিত করে। ওদের ভাষা লিখিত নহে। পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকটা খাসিয়াদের মত যদিও আজকাল আসামীদের বেশভূষা গ্রহণ করেছে। দেখতে নাগা ও কুকিদের মাঝামাঝি।

এমনি ধারা বহুসংখ্যক মিরি চলে গেছে ওদিকে লখিমপুর জেলায়—যেখানে চতুর্দিক থেকে চা বাগান এবং ডিগবয় তৈলখনির শ্রমিক-সংখ্যা বাড়াতে এসেছে অল্পসংখ্যক আবর, মিশ্‌মি, খামটী কাছাড়ী প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী আদিম বর্বর জাতি। সাদিয়া ফ্রন্টিয়ারে অর্থাৎ আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই সমস্ত আদিম সমাজ, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে তাদের নিজ মৌলিক কৃষ্টি বৈশিষ্ট্য কতটা বজায় রেখেছে তা নৃতাত্ত্বিকেরা বলতে পারেন। একমাত্র আবর জাতির মধ্যে ডানবার (Dunbar) সাহেব কাজ করে দুইখানি বই লিখেছেন।* আবর আদিম জাতি নাগাদের মত অবস্থাপন্ন, গর্বিত এবং প্রতাপান্বিত কিন্তু মিশমীরা ততটা ক্ষমতাবান নহে। আবরদের সাদিয়ার ওদিকে ছাড়া বালিপারা ফ্রন্টিয়ারে দেখতে পাওয়া যায়—এখানে দু-রকম আবর আছে সিলাং আবর এবং তাসেন আবর। সাদিয়াতে আবররা সভ্য হ'য়েছে। পাহাড়ী আবররা তেমনই আছে। মিশমীদের মধ্যে চীন-তিব্বতী প্রভাব দেহাবয়বে, কৃষ্টির পর্যায়ে যথেষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। লখিমপুরের উত্তর বিভাগে এবং উত্তর সীমানায় যে সকল আবর ও

আবর নারী (সাদীয়া)

মিশমীদের বাস সেই দিকটা অত্যন্ত শীতপ্রধান কারণ সেটা হ'ল তিব্বতের অংশ। ঠাণ্ডার জন্য মিশমী মেয়েরা যারা আরও উত্তর দিকে বসতি ক'রে আছে তারা পুরুষদের মত খুব ধূমপান করে। মিশমীদের সম্বন্ধে কোন বই নাই তবে ছিন্নভাবে ১৯২১ সালের সেন্সাস, ও ড্যাল্টন সাহেবের গ্রন্থে বিবরণী পাওয়া যায়।*

লখিমপুর জেলার পূর্বদিকে আর এক আদিম জাতি বাস করে তাদের খামটি বলা হয়—এরা যে পাহাড় পর্বত শ্রেণীতে নিবদ্ধ আছে সেই গিরিশৃঙ্গকে খামটি হিল্‌স্‌ পরিচয় করা হয়েছে। ওদিকের গভীর জঙ্গল ও ঘন পর্বতরাজির দুর্ভেদ্য কন্দরে প্রবেশ করে খামটী (Khamti) আদিম জাতির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করা বিশেষ সুবিধাজনক নহে আর ওদিকটা সার্ভেও বিশেষ হয় নি। ফ্রন্টিয়ার ট্রাক্ট্‌ পর্যন্ত বেশ যাওয়া যায় কিন্তু সান ষ্টেটের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া দুষ্কর।

লখিমপুর ছাড়িয়ে শিবসাগরের পূর্বদিকটাতে এলে আসামের দুর্দ্ধর্ষ নাগাজাতির মূর্তি চক্ষে পড়ে। এরা আসামের সীমানা পেরিয়ে পূর্বদিকে বহুদূর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মণিপুরের বর্মার সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ওদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে নওগাঁও পর্যন্ত নাগা জাতির

* Other men's Lives Abor Country—Dunbar.

* O'Callaghan—The Mishmis.—সেন্সাসে পাওয়া যায়।
History of Upper Assam and Upper Burma—Shakespeare.

আবর পুরুষ। এরা পাহাড়ে থাকে

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নিবাস। নওগাঁর পূর্বদিকে গোলাঘাটের মাঝামাঝি পথে সভ্যতার বহু নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিত রেংমা নাগাদের নিবাস—এরা উলঙ্গ বললেই চলে—যা আজকাল একটু আবরণ দিতে শিখেছে। রেংমাদের কতকগুলি গ্রাম কোহিমা থেকে পূর্বদিকে যেতে সীমানার অল্প আগে পাওয়া যায়। নাগা হিল্‌স্ ডিষ্ট্রিক্টের বড় শহর কোহিমা (ভারী সুন্দর পার্বত্য শহর—কারসিয়ঙের মত, পাঁচ ছয় হাজার ফুট উচ্চ প্রায়)। অঙ্গমী নাগাদের আড্ডা। এই জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে—আওনাগা, লোহটা নাগা এবং সেমা নাগাদের বাসভূমি—বহু ক্ষুদ্রবৃহৎ পল্লী এই অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাহাড়ের গায়ে—শিখরে বা মালভূমিতে গড়ে উঠেছে। অঙ্গমী নাগাদের বিষয়ে প্রথম বই বার করেন সিভিলিয়ান হাটন সাহেব। তিনি নাগা হিল্‌স্-এর ছিলেন ডেপুটি কমিশনার—কোহিমাতে বাস করার সময় সাধারণ ভাবে নাগা জাতি সম্বন্ধেই তিনি বহু গবেষণা এবং নৃতাত্ত্বিক কাজ করেন। কাচা নাগা, চ্যাং নাগা, কোনিয়াক নাগা, সাংটাম নাগা, ফোম্ নাগা এবং মণিপুরের তাংখুল নাগা এরা সব আও বা অঙ্গমী নাগা জাতি অন্তর্ভুক্ত যদিও ভাষা অনেক জায়গায় বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিক অবস্থা বা কালচারের মিল খুব।

নাগা পাহাড় সুবিস্তৃত এবং সুউচ্চ পর্বতমালায় ঘন বনভূমিতে বিরাজমান যার গিরিশ্রেণী চলে গেছে আসামের সীমানা ছাড়িয়ে—প্রদেশের সীমানা হ'ল পটকাই হিল্‌স্—এই দুর্ভেদ্য পাহাড় অতিক্রম করে একটি জার্মান ছোক্‌রা ব্যারণ ক্রিস্তফ্,* চ্যাং, কোনিয়াক এবং কেলিও কেঙ্গিউ (Kalyo Kengu) নাগাদের মধ্যে কাজ করে গেছে বৎসর কয়েক হ'ল। কোনিয়াক নাগারা অতি আদিম—সভ্যতার কোন আলোই পৌঁছায় নি তাদের মধ্যে—মিশনরী ত নহেই—সাহেবরাও (ব্রিটিশ কর্মচারী) আগে আগে ওদিকে গেলে বড় একটা ফিরত না, কারণ ওদের মস্তক বা নরমুণ্ড শীকার (head-hunting) প্রথা বর্তমান ছিল। চ্যাংদের দু-তিনটি গ্রাম ব্রিটিশ এলাকায় পড়ে, বাকী কয়টি বর্মা সীমানা পেরিয়ে। সেদিকে ওরা ভয়ানক যুদ্ধপ্রিয় নৃশংস প্রকৃতির আদিম অসভ্য; কেলিও কেঙ্গিউ নাগারা সারামতি গিরিশৃঙ্গের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মাঝে মাঝে গোপন ভাবে নিভৃত পল্লীর সৃষ্টি ক'রে বাস করে এবং নিরীহ শত্রুর মস্তক আহরণ ক'রে বেড়ায়। এদের ভয়েই চ্যাং নাগারা পশ্চিম দিকে নাগা হিল্‌স্ জেলার মোকোচোং (Mokochong) মহকুমার মধ্যে আও নাগাদের ঠেলা দিয়ে একটু একটু ক'রে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

আও নাগাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা আবরদের মত ভল্লুকের দাঁতের বেড়ী মত করে গলায় পরে থাকে, আর মাথার উত্তরীয়তে ব্যবহার করে পক্ষীর পালক। আও নাগাদের বিষয় বই লিখেছেন দুখানি মিল ও স্মিথ সাহেব। আওদের বাসভূমির দক্ষিণদিকে লোহটা, সেমা এবং উলঙ্গ রেংমা প্রভৃতি নাগা জাতিদের আবাস। লোহটা নাগাদের বিষয় কাজ করেছেন নাগা হিল্‌সের অন্যতম ডেপুটী কমিশনার জে, পি, মিল্ সাহেব। তিনি বলেন লোহটারা সেমা এবং আও নাগাদের মত মাথার দুই পাশে কানের উপর সব চুল কামিয়ে রাখে—একেবারে ঘাড় বরাবর। এদের এই একটা বৈশিষ্ট্য—চুল মাথায় সরার মত—সম্ভবতঃ মাথায় অনেক রকমের টুপী পরে বলে। তিনি বলেন মেয়েরা ছেলেবেলায় চুল রাখে না—ন্যাড়া মাথা। ঠাণ্ডা দেশ বলেই বোধ হয় আও পুরুষগুলি মাথা আবৃত ক'রে রাখে। আওদের কুটীরগুলি অনেক সময়

* Baron Christof Von Furer Haimendorf.

খাসিয়া পুরুষ

্টির উপর (Pile dwelling) নির্মিত দেখা যায়। ডিমাপুর মণিপুর রোড) রেলওয়ে স্টেশন থেকে মণিপুর স্টেট্ পর্যন্ত ৩৩ মাইল বিবাট্ নাগা হিল্স্ অতিক্রম কালে কোহিমার নকটবর্তী পথে লেখকের লোহটা এবং আও ও অঙ্গমী াগাদের দেখার সৌভাগ্য ঘটেছিল—তাহাতে মূল াগাদের ভয়াবহ মূর্তি দেখতে হয় নাই। মিশনরীদের ল্যাণে এবং ব্রিটিশ রাজত্বের কড়া শাসনে ওরা অনেকটা া্ণ্ডা হয়ে গেছে। কোহিমার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেমা নাগা দখতে পাওয়া যায়। সেমা নাগারা বড়ই আদিম—তাঁতে াপড় পর্যন্ত বুনতে জানে না—আও, অঙ্গমী, লোহটারা । পারে। মাঝ পথে 'মাও' গ্রামে মস্ত এক অঙ্গমী াগাদের গ্রাম আছে। সেমাদের সম্বন্ধেও হাটন সাহেব ব ভাল বই লিখেছেন। তিনি মোকাচোং, কোহিমা, াও প্রভৃতি জায়গায় মিশনরীদের কাজেতে—নাগাদের ৌলিক কাল্চারের অপমৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ায় দু-লক্ষ নাগার মধ্যে শতকরা বারো-তেরো জন ষ্টধর্ম অবলম্বন করেছে। সর্বাপেক্ষা অসভ্য বর্বর হচ্ছে, ংমা নাগারা, নাগা জেলার পূর্বে এবং পশ্চিমে রেংমাদের তকগুলি গ্রাম চোখে পড়ে। এরা সংখ্যায় অন্যান্য াগাদের চেয়ে কম। মিল্ সাহেব ১৯৩৭ সালে এদের যয় বই ছাপিয়েছেন "নেকেড্ রেংমা" (Naked engma) বা উলঙ্গ রেংমা।

মণিপুর রাজ্যে তাংখুল, মারিং, কাবুই প্রভৃতি কয়েকটি াগা জাতির অনেকগুলি গ্রাম আছে। তাহাদের সংখ্যাও ম নহে। তাংখুলদের মাথাও যেন চুলের সরা বসানো, কেবারে জংলী। মারিংদের মাথায় মস্ত মালার জট ার কাবুইদের অনেকটা মণিপুরী কুকিদের মত পাগড়ী ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই সমস্ত নাগা জাতিগুলির সম্বন্ধে কোন আলাদা আলাদা বই নাই। হডসন সাহেব *Nagas of Manipur* বা মণিপুরের নাগাদের সম্বন্ধে একটা বই লেখেন। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। এদের সকলেরই ভাষা আলাদা। মণিপুরের প্রথম অভিযানে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের) আমি ছাত্রহিসাবে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করি এবং মণিপুর নাগাদের বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা করি—দু-একখানি সেই সময়কার তোলা ছবি এখানে দেওয়া গেল।

মণিপুরের অধিবাসীদের বলে মিতাই*—ইহারা গোঁড়া বৈষ্ণব কিন্তু ইহাদের চতুর্দিকে আদিমবাসীদের নিবাস—নাগা ছাড়া কুকিও যথেষ্ট আছে। থাডো ও লুসাই কুকি সম্বন্ধে নৃবিদ্যাবিদ্গণের কাজ হয়েছে।† লুসাই পর্বতমালার পশ্চিম দিকে মণিপুরের সমতলভূমিতে বা মালভূমিতে চিরু, আইমল, কোম প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ভিন্ন ভাষী কুকিদের পল্লীগ্রাম আমাদের চোখে পড়েছিল। কুকি জাতিও নাগা জাতির মত এককালে খুব দুর্ধর্ষ এবং ভয়ানক গোছের আদিম জাতি ছিল, এখন তাদের মধ্যে নরমুণ্ড আহরণ-প্রথা সেরূপ দেখতে পাওয়া যায় না। কুকিদের শুধু মণিপুর এবং আসামের লুসাই হিল্স্ জেলায় দেখা যায় না ওদিকে ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের

চিরুকুকি

পাহাড়ে জঙ্গলে খণ্ড খণ্ড পল্লী বেঁধে বাস করছে দেখা যাচ্ছে। লুসাই হিল্সের হেডকোয়ার্টার আইজলে এদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বড় রকমের মিশনরী

* Meithis—Hodson.
† Lushai Kukis—Shakespeare, Thado Kukis—Shaw.

কুকি বালিকাদ্বয়

ঘাঁটি রয়েছে।* ওয়েলস্ মিশন সবচেয়ে বেশী প্রচার কার্যে সফল হয়েছে। লুসাই কুকিরা মণিপুরে কুকিদের মত দোহারা আকারের নহে, বরঞ্চ খাটো—মঙ্গোলিয়ান টাইপের শক্তিশালী আঁটশাট পাহাড়ী জা'ত—গুর্খাদের মত খেপে যায় মাঝে মাঝে—কুকি-বিদ্রোহে তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। নাগাদের মত এরা সেরকম সংঘবদ্ধ নহে, বড় বেশী ছড়িয়ে আছে ব'লে হীনবল হয়ে পড়েছে। পাহাড়ের গায়ে জুমিং করে, চাষবাস করে আর বৈশিষ্ট্য হ'ল, ওদের বড় বড় 'মিথান' পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশু হিসাবে রাখে—কিন্তু তার দুধ বিশেষ দোহন করে বলে মনে হয় না।

লুসাই হিলস্ জেলায় আর এক রকম আদিম জাতিদের নিবাস। তারা হল, 'লাখের'†—এ ছাড়া ছোট ছোট কয়েকটা জাতি আছে। হাটন সাহেব লাখেরদের কুকি জাতির অন্তর্ভুক্ত বলেছেন কারণ তারা দেখতেও কুকিদের মত এবং থাকেও কুকিদের মত। এই জেলার উত্তরে কাছাড়ে যে আদিম জাতিরা আছে অর্থাৎ কাছাড়ীরা লুসাইতে বহু উপনিবেশ করেছে। পূর্বে বলেছি এরা সমগ্র আসামেই প্রায় ছড়িয়ে পড়েছে—কাছাড়ে এদের সংখ্যা তের-চৌদ্দ হাজার মাত্র। এ ছাড়া লুসাই হিলস্ জেলাতে নাগা, মিকির ও কুকিদেরও বহু গ্রাম আছে। কুকি প্রায় হাজার দশেক এবং নাগা হাজার আষ্টেক। কাছাড়ের হেড্ কোয়ার্টার শিলচরে বাঙালী, হিন্দুস্থানী এবং মণিপুরী বহু আছে। শিলচর থেকে মণিপুর যাবার লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়ে চমৎকার একটি পথ আছে—পূর্বে এই পথ খুব ব্যবহৃত হত। এই পথ দিয়ে বহু মণিপুরী নাগা এবং কুকি কাছাড়ে এসে উপনিবেশ করেছে।

কাছাড়ের উত্তরে এবং পশ্চিমে—খাসি, জয়ন্তীয়া হিল্স্ এবং শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টে আদিম জাতিদের আদিবাস নাই—কিন্তু খাসিয়া জয়ন্তীয়া হিল্স্এ খাসিয়া এবং সীন্টেং জাতিদের বাসভূমি। পাহাড়ের মাঝে বনের মাঝেই ওরা থাকতে ভালবাসে। সেই জন্য জংলী জাতিদের গিরিকন্দরে পর্বতশিখরে এবং ঘন অরণ্যের মাঝেই পল্লী বেঁধে বাস করতে দেখা যায়।‡ খাসিয়া জাতি

কোনিয়াক নাগা নারী

একটু আলোক প্রাপ্ত হওয়াতে আমি এদের সম্বন্ধে কিছু না বলাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। শিলঙে খাসিয়া জাতিকে যে-ভাবে দেখেছি তাতে ওদের অসভ্য আদিম বলতে আমি কুণ্ঠিত, যদিও ওরা আসামের

* C. J. Helme, I.C.S.—The first missionaries arrived in Lushai Hills in Jan. 1894 and the spread of Christianity has been extraordinarily rapid. I estimate the number of proposed Christians at about half of the population of the district.

† The Lakhers—N. E. Parry, I.C.S.

‡ The Khasis—Major Gurdon.

আসামের মানচিত্র

অন্যতম আদিম জাতি। খাঁটি পুরাতনপন্থী খাসিয়া মোফ্‌লাং পর্যন্ত গিয়ে শ্রীহট্টের সমতলভূমির দিকে এগোলেও পাওয়া যায় না—যায় জয়ন্তীয়া পাহাড়ের মধ্যে এবং খাসি হিল্‌সের খুব ভিতরের দিকে। সীন্টেংরা প্রায় খাসিয়াদেরই মত, ভাষা আলাদা এবং কিছু কিছু আচার-বিচার আলাদা। খাসিয়া সম্বন্ধে শিলঙের বহু বিদ্বান ব্যক্তি গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক তারক রায় চৌধুরী, শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ, U. Jeebon Roy প্রভৃতি বহু কাজ করেছেন। এদের সমাজে মাতার স্থান, অধিকার ও ক্ষমতা বেশ উচ্চ। কনিষ্ঠা কন্যা গৃহের মালিক হয়ে থাকে। বাপের চেয়ে মাতুল হ'ল গার্জেন।

এবার গারো হিল্‌সের গারো জাতি সম্বন্ধে বলি। গারোদের মধ্যে এখন দুটি শ্রেণী হয়েছে—পাহাড়ী গারো এবং সমতলভূমির গারো। আমার সুহৃৎপ্রবর অধ্যাপক শ্রীযুত জ্যোৎস্না বসু সমতলভূমির গারোদের মাঝে কিছু কাজ করেছেন—ছোটখাট প্রবন্ধও এ-সম্বন্ধে মাসিক পত্রে লিখেছেন; তা ছাড়া অনেক দিন আগে প্লেফেয়ার সাহেব এদের সম্বন্ধে গবেষণা করে একখানি পুস্তক লিখেছিলেন।

গারো জাতির প্রধান পেশা তুলা উৎপাদন করে সুতা কাটা, কাপড় বুনা এবং প্রচুর পরিমাণে বাজারে বিক্রয় করা। আসামে মোট তুলা যা উৎপন্ন হয় তার অর্ধেক গারোরা উৎপাদন করে। গারোদের পল্লীগুলি সাধারণতঃ নদীর ধারে গজিয়ে উঠেছে—সম্ভবতঃ জলের জন্য—ওদের বাড়ীঘর অনেক সময় খুঁটির উপর (piles) নির্মিত। মাছ ধরাতেও ওরা ওস্তাদ—পাহাড়ের গায়ে জুমিং ক'রে অর্থাৎ আগাছা জঙ্গল পুড়িয়ে সাফ ক'রে তার উপর চাষ ক'রে শস্য উৎপাদন করে। শুধু গারো কেন—নাগা, কুকি, আবর এরা বা বেশীর ভাগ আসামের আদিম জাতিরা জুমিং ক'রে থাকে।

গারোদের সমাজ খাসিয়া জাতির মত মাতৃক (matrilineal)। মায়ের ওয়ারিশ হিসাবে সম্পত্তি পায় মেয়ে। গারোদের মধ্যে মামাত পিসতুত ভাইবোনে বিবাহ হয়, যে-প্রথা খাসিয়াদের মধ্যে কমে গেছে। সংসারে ভাগিনেয়ের প্রতিপত্তি ছেলের চেয়ে বেশী—তাকে ওরা বলে নোক্‌রোম (Nokrom)। মাতুলকন্যা এবং মাতুলালয়ের সম্পত্তি (স্ত্রীর অধিকারে অবশ্য) ত ভোগে আসেই, উপরন্তু সময় সময় মাতুলানীটিকেও নোক্‌রোমের প্রাপ্তি ঘটে।

আসামের আদিম জাতিগুলির মধ্যে সাধারণ ভাবে একটি জিনিস আমরা দেখেছি—সে সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ ক'রে প্রবন্ধ শেষ করব।

শিলং বাজারে খাসিয়া নারী (ইহারা খ্রীষ্টান নহে ,

সেটি হ'ল অবিবাহিত ছেলেদের ডমির্টরী ব্যাচিলার হাউস (Bachelor house), নাগারা যাকে বলে মোরাং (Morung) গ্রামের এক সীমানায় বা কোণে একটি বড়গোছের কুটির থাকে—অবিবাহিত ছেলেদের বাস করবার জন্য। ক্লাব হাউস বা আখড়া ঘরের মত কিন্তু রাত্রিতে সেখানে ছেলেদের শুতে হয় এবং অধিক সময় সেইখানে কাটাতে হয়। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক শুধু খাওয়া-দাওয়া।

মোরাং কাদের কাদের আছে বলি—আমরা মণিপুরে চিরু কুকিদের আর আইমল কুকিদের মাঝে দেখেছি। অঙ্গমী নাগাদের মধ্যে নেই, লোহটাদের আছে, সেমা নাগাদের মধ্যে আছে কিছু, আবর এবং গালোং জাতিদের গ্রামে গ্রামেও মোরাং চোখে পড়ে, শুধু পুরুষদের নয়—মেয়েদেরও আলাদা করে Spinster's Dormitory। দাফলা ও মিশমীদের মধ্যে এই রেওয়াজ নেই। যুদ্ধপ্রিয় কোনিয়াক নাগাদের মাঝে আছে—ব্যারণ ক্রিস্তফ হাইমেনডর্ফ (Rockfeller Research Scholar) তাদের মোরাঙে নাচের লীলা দেখে এসেছে। কেজিও কেজিউ নাগাদেরও মোরাং আছে। এদিকে মিকিরদের মাঝে বা খাসিয়াদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা আছে। অবিবাহিতা মেয়েদের আলাদা সংঘ ঘর খুব কমই, ছেলেদেরই বেশী দেখা যায়। ছেলেরা সেখানে গানবাজনা করে, নেশা করে, নাচ কসরৎ করে—নরমুণ্ড শীকারের ষড়যন্ত্র করে এবং আড্ডা দিতে দিতে

নাগা-নারীর কেশ প্রসাধন

ঘুমিয়ে পড়ে। আলাদা আলাদা শোবার ব্যবস্থাও দেখেছি

রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যু

শ্রীশান্তা দেবী

১৭ই আগষ্ট ১৯৪১

বিশ্বশিল্পী বিধাতা বিশ্বের সৌন্দর্য্য তিল তিল করিয়া চয়ন করিয়া মহাকবির যে দেবোপম মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন, মহাস্রষ্টার শক্তির উৎস হইতে অঞ্জলি ভরিয়া কবির যে অলোকসামান্য প্রতিভার আধার সাজাইয়াছিলেন সেই দেবোপম মূর্ত্তি সে জ্যোতির্ম্ময় প্রতিভার আধার আজ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মনে হয় বিস্ময়ে যেন মুহূর্ত্তের মত গ্রহতারকার গতি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই মহা পরিনির্ব্বাণ এও কি সম্ভব? কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় একি

"আপন সৃষ্টির পরে বিধাতার নির্ম্মম অন্যায়?"

(নবজাতক)

কবি বলিয়াছেন,

"বহু যুগযুগান্তের কোন এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আরবার
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার,
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন।
কিন্তু কেন।" (নবজাতক)

কেন? কেন? এই প্রশ্ন আজ মানুষের অন্তরে অন্তরে জাগিতেছে। কে দিবে ইহার উত্তর?

"জানি না বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পী কবি।"

বিধাতা এই ধরণীর ধূলি দিয়া আবার কবে এ ছবি কোথায় আঁকিবেন জানি না, তবে জানি যে এ মহাপুরুষের ছবি এ যুগের মানুষের স্মৃতি-পটে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে। তাহাও মুছিয়া যাইবে সেদিন যেদিন এ যুগের এই মানুষগুলির দিনেরও অবসান হইবে। আজ তাঁহার নীরব কণ্ঠ শত গৃহে ধ্বনিয়া উঠিতেছে তাঁহার লিখনের ভিতর দিয়া যেন আরও জলদনির্ঘোষে। সেই অভয় কণ্ঠস্বরে তিনি বলিতেছেন, আমরা যেন শুনিতে পাইতেছি,

"মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধু মাত্র প্রাণ
সর্ব্ব বিত্ত রিক্ত করি' যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহার-নিদ্রার শেষ ঋণ।"

* * *

আমি যে রূপের পদ্মে ক'রেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্ব্বনাশ।"

আমাদের এ শোনার এ জানারও শেষ আছে। আমাদের অন্তরে এই যে তিনি জীবিত রহিয়াছেন ইহার কি শেষ হইবে আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে? তিনি বলিতেছেন,

"যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে,
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্ম্মে মর্ম্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য-গ্রহতারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।"২৮

রোগশয্যায় ১৯৪০

আমাদের অন্তরলোকের এই চৈতন্যজ্যোতি আলেয়ার

আলোর মত অকস্মাৎ জলিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ নিভিয়া যায় না। ইহার আদিতে শূন্য অন্তেও শূন্য হইলে ইহার কোন অর্থ থাকে না। জীবনপ্রবাহ চৈতন্যপ্রবাহ কালপ্রবাহের মত অন্তহীন চলা চলিয়াছে। তাই কবি ছবি কবিতায় তাঁহার জীবনসঙ্গিনীকে বলিতেছেন,

"একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিঃশ্বাসে;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব

*　　*　　*

এক সাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি'।

*　　*　　*

তুমি পথ হ'তে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি!

*　　*　　*

নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তা'র সোনার লিখন।"

কবি বলিতেছেন এই আনন্দ, এই চৈতন্যজ্যোতি থামিয়া যায় নাই। তিনি ত শূন্যতার উপহাস মাত্র নহেন, তিনি 'বিধির বৃহৎ পরিহাস' নহেন। তাঁহার চৈতন্যজ্যোতি আকাশে আকাশে বিরাজিত। কিন্তু মহাপুরুষের মনেও সংশয় বারে বারে আসে। মাতার বিচারকেও সন্তান সব সময়ই সুবিচার ভাবিতে পারে না।

তাই আবার তিনিই অভিমানভরে বলিয়াছেন,

"অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি'
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি
এত মধু অঙ্কনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র—
বেদনা না যদি তার লাগে কিছু মাত্র,
আমারি কি লোকসান যদি হই শূন্য
শেষ ক্ষয় হোলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ।
এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য
জাগ্রত রবে চিরদিবসের জন্যে
এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে।"

তিনি পৃথিবীর বন্ধন কাটাইয়া গেলেন, তিনি যে আমাদের এত বড় সম্পদ, এত বড় বিত্ত ছিলেন, তাঁহাকে আমরা হারাইলাম, সেই মহৎ ঐশ্বর্য্যচ্যুত এ যুগের মানুষ আমরা আজ শোকে মুহ্যমান। সে শোকের রেখা হৃদয়ে বহন করিয়া আমরাও চলিয়া যাইব এই আমাদের সান্ত্বনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের শোকের শেষ রশ্মি নিভিয়া যাইবে। তাহার পর যে-যুগ আসিবে সে-যুগের মানুষ পাইবে তাঁহার বাণী মাত্র, তাঁহার ছায়ামাত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। তার পর কত যুগ পরে আমাদের এই ভাষা রূপান্তরিত হইয়া যাইবে, আরও কত যুগ পরে এ মনুষ্যজাতি হয়ত ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন মহাস্রষ্টা কি মনে করিবেন যে এই মনুষ্য-জাতিকে এক দিন এমন অলঙ্কার তিনি দিয়াছিলেন? সে মহাকাল-স্রোতের শেষে বুদ্ধ, খৃষ্ট সকলেই জলবুদ্বুদের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন। এই বিরাট সৃষ্টি ও প্রলয়ের খেলাকে মনে করিয়াই কবি লিখিয়াছেন,

"বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।
প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,
ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখদুঃখ নাট্য সজ্জাগুলি।
দেখিলাম যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি'

শত শত নির্ব্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী
(আরোগ্য ৯, ১৯৪১)

নটরাজের এই যে সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়ের নৃত্যলীলা শেষ জীবনে ইহা তাঁহাকে বারম্বার নাড়া দিয়াছে। তাঁহার মহাপ্রস্থানের দিনে যে ভাবে আজ আমরা অন্তরে তাহার সাড়া পাইতেছি, অল্প দিন পূর্ব্বেও তাহা পাই নাই।

কত অনন্তকাল ধরিয়া জীবসৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়াছে। তেমনি অনন্তকাল ধরিয়া মৃত্যুপ্রবাহও চলিয়াছে। মৃত্যু পথযাত্রী তার প্রাণের শিখাটি, তার কীর্ত্তি অকীর্ত্তির বোঝাটি নবীন আগন্তুকের হাতে সঁপিয়া দিয়া বিদায় লয়। এই কি তার শেষ বিদায় না এই তার অনন্ত প্রাণের পরিচয়?

কবি বলিয়াছেন,

"চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে
মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি,
তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি.
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া;
অস্তিত্বের মহৈশ্বর্য শতছিদ্র ঘটতলে ভরা,
অফুরান লাভ তার অফুরান ক্ষতি পথে ঝরা,
অবিশ্রাম অপচয়ে সঞ্চয়ের আলস্য ঘুচায়,
শক্তি তাহে পায়।
চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তাঁরে অস্তিত্ব প্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।
(রোগশয্যায় ২, ১৯৪০ ?)

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের যবনিকা আমাদের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া আছে। এ যবনিকা না উঠিলে আমরা কিছুই জানিতে পারিব না। কিন্তু বিধাতা যাঁহাদের চক্ষে দিব্য দৃষ্টি অঞ্জন পরাইয়াছেন তাঁহারা যেন এই রহস্য যবনিকার অন্তরালও কোন এক ক্ষীণ আলোকরশ্মির সাহায্যে কতকটা ভেদ করিতে পারেন। কবি বলেন,

"যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর—তীর্থপথে।" (রোগশয্যায় ২০।১৯৪০)

আর যতটুকু আবরণ এ জীবনে উঠিবার নয় তাহাকেও মৃত্যুঞ্জয় কবি ভয় করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,

"দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জ্জয় নির্দ্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বি তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।

ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরু দুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত—
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে—
শুধালেম আরো কিছু আছে নাকি,
আছে বাকি—
শেষ বজ্রপাত?
নামিল আঘাত।
এই মাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ—
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি ত মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব' আমি চলে।" (মৃত্যুঞ্জয় ১৩৩৯)

সহপাঠী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহর।

অধিবাসিগণের সাধারণ আলোচ্য বিষয় যুদ্ধের সংবাদ এবং প্রতিবেশীর গুণাগুণ। অবসর-সময়ে দোকানে, নদীর চরে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে গুরুতর এবং অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎবাণী করিতে কেহই কুণ্ঠিত হয় না, এবং প্রতিবেশী ও তাহার পরিবার সম্বন্ধেও মুখরোচক মতবাদের এই কুণ্ঠাহীনতা অপ্রতিহত গতিতেই চলে।

এহেন শহরের একমাত্র উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের সদ্যনিযুক্তা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যে আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী এবং অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক রকমের গুজবও শোনা যায়, ফলে তিনি চিররহস্যময়ী রহিয়া গিয়াছেন।

মাস্টারি, টিউশনী, বাজার-হাট করা, ডাক্তারের বাড়ী যাওয়ার ফাঁকে এইরূপ অবসর বিনোদন ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং আমরা শহরের নগণ্য জনসাধারণ মাত্র।

স্কুল হইতে ফিরিতেই গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া অভিযোগ করিলেন। মর্ম্মার্থ এই যে আমি একটি অপদার্থ, যেহেতু পাড়ার সকল লোকই নদীর ঘাট হইতে নিত্য জীয়ন্ত ইলিশ মৎস্য অতি স্বল্পমূল্যে কিনিয়া থাকে কিন্তু আমি অভাগ্য; বাজার হইতে পচা মাছ উচ্চ মূল্যে কিনিয়া ক্রমাগতই ঠকিয়া যাইতেছি; বুদ্ধির অভাবহেতু না হইলেও আলস্যের জন্যে ত বটেই।

পৌরুষের কিছু কিছু অবশিষ্ট হয়ত আছে তাই অপমানিত বোধ করিয়া, চা-টুকুও না-খাইয়া নদীতীরে রওনা হইলাম। অকারণ দেরি করিয়া, বহু কষ্টে বহু বাক্‌বিতণ্ডার পরে উচ্চ মূল্যে একটি বৃহৎ ইলিশ মাছ কিনিয়া হন্ হন্ করিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম—বিপরীত দিক্ হইতে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত কয়েকটি তরুণী আসিতেছিলেন। মানুষ হিসাবে তাঁহাদিগের দিকে চাওয়া হয়ত স্বাভাবিক কিন্তু মাস্টার হিসাবে ঘোর অন্যায়, অতএব মাথা গুঁজিয়াই চলিয়াছি।

অকস্মাৎ তাঁহাদিগের মাঝেই এক জন আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফেলিলেন—চাহিয়া দেখি আমারই সহপাঠিনী মিস্ রমলা মিত্র। মাছসুদ্ধ হাত তুলিয়াই নমস্কার করিলাম। মিস্ মিত্র হাসিয়া বলিলেন—আপনি এখানে?

—আমি ত চিরদিনই এখানে?

—ও, তা বেশ বৃহদাকার মাছ কিনেছেন দেখছি।

—হ্যাঁ, রাগের মাথায় একটা কুকর্ম্ম ক'রে ফেলেছি।

অবান্তর আরও কিছু আলাপের পরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনার বাসা কোথায়?

আমি অদূরে বাসাটা দেখাইয়া বলিলাম—এই ত, যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে—

মিস্ মিত্র বলিলেন—চলুন, মিসেসের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। এখানে এসে হাঁপিয়ে উঠেছি সঙ্গীর অভাবে।

—আপনি যে হেডমিস্ট্রেস্ হ'য়ে এখানে আসতে পারেন তা স্বপ্নেও ভাবি নি। আসুন—

তাঁহার সঙ্গিনীদিগের প্রতি চাহিয়া লজ্জিত হইয়াছিলাম। তিনিই বলিলেন—কিছু মনে করবেন না—আমি একটু ওঁর ওখানে যাচ্ছি।

সঙ্গিনীগণ বিদায় লইলেন।

আমরা উভয়েই কোন সময়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম—সহপাঠী হিসাবে যে পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা অতি সাধারণ অপেক্ষা কিছু ঘনিষ্ঠ বলা যায়। আজ পাঁচ-ছয় বৎসর পরে অকস্মাৎ এমনি করিয়া দেখা হইয়া যাইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল।

বলা বাহুল্য বাসা ক্ষুদ্র। একখানি শয়নঘর এবং তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র একটু রান্নার চালা। শয়নকক্ষের চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া বলিলাম—বসুন। গরীবের গৃহে এর চেয়ে বেশী অভ্যর্থনা নিশ্চয়ই আশা করবেন না।

জ্যেষ্ঠপুত্র লণ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া, একখানি চক-সহযোগে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মেঝের উপর হিজিবিজি লিখিয়া

যাইতেছে। কনিষ্ঠ পুত্র সবে উপুড় হইতে শিখিয়াছে, সে উপুড় হইয়া অবাধ্য হাত দিয়া একবার রবার-রুথ, আর একবার বালিশ প্রভৃতির স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত।

পুত্রকে বলিলাম—যা তোর মা'কে ডেকে নিয়ে আয়।

অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে খোকা মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল—দাঁড়াও।

তাহার ব্যস্ততা ও গভীর মনোযোগ দেখিয়া উভয়েই হাসিয়া ফেলিলাম। খোকা নূতন অতিথিকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়াই প্রস্থান করিল।

মিস্ মিত্র কনিষ্ঠ পুত্রকে কোলে করিয়া বলিলেন—বাঃ কি সুন্দর ছেলেটি! ওর মা নিশ্চয়ই সুন্দরী—না?

—সম্ভবতঃ। কিন্তু ওকে কোলে করাটা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

মিস্ মিত্র ক্রীড়াভঙ্গি করিয়া জবাব দিলেন—আহা, কচি ছেলে কোলে করতে যেন জানি না—না?

আমার কথার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বুঝিয়া একখানা কাঁথা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম—অনৈসর্গিক দুর্য্যোগ ঘটে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

মিস্ মিত্র হাসিয়া বলিলেন—ও এই দুর্য্যোগ? আমি একেবারে অনভ্যস্ত ভাববেন না।

তিনি সযত্নে কাঁথার সঙ্গে তাহাকে কোলে করিয়াছেন এমনি সময়ে গৃহিণী প্রবেশ করিলেন। আমি বলিলাম—অনু, এই ইনি আমার সহপাঠিনী মিস্ রমলা মিত্র, আর ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী তা বলাই বাহুল্য আর এই তাঁর গৃহস্থালীর সওদা অর্থাৎ ভৎর্সনা-লব্ধ ইলিশ মাছ।

অনু ক্ষুদ্র একটু নমস্কার করিয়া বলিল—বসুন। একটু চা খাবেন ত? মৌলিক ভদ্রতা রক্ষা করিলেও অনুর মুখে যে বিশেষ প্রসন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিল না তাহা আমি বুঝিলাম। মিস্ রমলা বলিলেন—থাক থাক, আবার এখন চা—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—গরীব হ'লেও চা একটু আমরা খেয়ে থাকি।

মিস্ মিত্র বলিলেন—অন্যকে খোঁচা দিয়ে কথা বলার লোভ আজও ত্যাগ ক'রতে পারেন নি দেখছি।

প্রসঙ্গান্তরে বলিলাম—ইনি এখানকার মেয়েদের স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস হয়ে এসেছেন অর্থাৎ খোকা মেয়ে হ'লে ওঁর স্কুলেই পড়তে হ'ত।

অনু বলিল—আচ্ছা আমি চা নিয়ে আসি, কেমন?

অনু চা আনিতে গেল। রমলা খোকাকে আদর করিতে করিতে বলিল—এ কি সুন্দর হাসে দেখছেন! আগেই ত বলেছিলাম ওর মা নিশ্চয়ই সুন্দরী।

আমি প্রতিবাদ করিলাম—আমার চোখ দিয়ে দেখলে দেখতেন সৌন্দর্য্য সেখানে একেবারেই নেই বরং পুত্রের সৌন্দর্য্য পিতার নিকট থেকে প্রাপ্য একথা অনুমান করলে অন্ততঃ আনন্দিত হবার কারণ ছিল।

—বেশ, নিজেকে আপনি বুঝি খুব সুপুরুষ মনে করেন?

—আজ্ঞে, বাজারে যত দিন আয়না বিক্রি হবে তত দিন সজ্ঞানে এবং প্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কে ও অহঙ্কার করা চলবে না।

তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—যা হোক!

ছোট খোকা ঝণ্টু এতক্ষণ ইতস্ততঃ কোন উজ্জ্বল বস্তু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছিল, অকস্মাৎ রমলার কয়েকটি চুল ও কানের দুল ধরিয়া মুখে পুরিবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিল। রমলা নীচু হইয়া চুল ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল—বাপের দুষ্টুমিটুকু ও কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছে।

—পরোক্ষ ভাবে আরোপ না করলেও আমি দুঃখিত হতাম না।

মিস্ রমলা ব্যঙ্গ করিলেন—সত্য কথা শুনে দুঃখিত আপনি হন না তা জানি।

খোকা ঘরের কোণে বিস্মিত দৃষ্টিতে রমলার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—রমলা তাহাকে বলিল—খোকা শোন।

খোকার জীবনে এমনি করিয়া কোন মহিলা কোনদিন ডাকেন নাই। সে লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; আমি বলিলাম—এদিকে আয় ইনি ডাকছেন—

খোকা অপরাধীর মত আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া কাছে আকর্ষণ করিয়া রমলা বলিল—আমি কে বল ত?

আমি সভয়ে বলিলাম—খোকার অঙ্গে বহুবিধ দ্রব্য থাকতে পারে, আপনার শাড়ীটা ময়লা হয়ে যাবে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রমলা বলিল—যাক্—

খোকা রমলার প্রশ্নের জবাব দেয় নাই। রমলা পুনরায় প্রশ্ন করিলে খোকা বলিল—সহপাঠিনী।

উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। রমলা বলিল—সহপাঠিনী কি?

খোকা গম্ভীরভাবে ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বলিল—আপনার নাম।

রমলা বলিল—কি ইন্‌টেলিজেন্ট দেখেছেন, এত বড় একটা কথা একবার শুনে মুখস্থ রেখেছে। তোমার নাম কি খোকা?

—খোকা।

—ভাল নাম নেই ?

—ঐ ত ভাল নাম।

রমলা আমাকে বলিল—এত দিনে একটা ভাল নামও রাখতে পারেন নি ?

—সাম্‌নের রবিবারে অভিধান দেখে একটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে—

—ছিঃ নিজের ছেলে সম্বন্ধে এমনই ঔদাসীন্য প্রশংসার নয়।

—আমাদের ঘরে ওরা এসেছে অবাঞ্ছিত অতিথিরূপে, কাজেই অভ্যর্থনাটা এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক !

রমলা সম্ভবতঃ কটূক্তি করিতে যাইতেছিল, অনু চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া থামিয়া গেল। অনুর ভদ্রতাজ্ঞান এখনও কিছু আছে তাহা জানিতাম না, আজ চা'র সঙ্গে কিছু খাবার দেখিয়া আশ্চর্য্যই হইলাম। রমলা চা'র পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল—আপনার সঙ্গে আলাপ করব ব'লেই ত এলাম, বসুন—

অনু বলিল—আমার সঙ্গে ? আপনার বন্ধুর সঙ্গে বলুন—

রমলা আমাকে বলিল—যে'দিন আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় সেদিন ওঁকে দেখবার কি দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলই হয়েছিল —যিনি আপনার কাব্যের খোরাক জুগিয়ে এসেছেন—

অনু প্রতিবাদ করিল—আপনি ভুল শুনেছেন, আমার জন্যেই ওঁর কাব্যরস সব নাকি শুকিয়ে গেছে।

আমি বলিলাম—উভয়েই সত্য, মিথ্যাটা আমার কাব্য।

অনু পুত্রকে লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল—ওকে দিন, চাটুকু খেয়ে নিন্, শেষে একবারে সবসুদ্ধ ফেলে দেবে—

রমলা বলিল—না না থাক্, কোন অসুবিধে হবে না। ও ত খুব শান্ত—

অনু প্রশ্ন করিল—এত লোক থাকতে আমাকে দেখবার কৌতূহল হ'ল কেন ?

রমলা জবাব দিল—ওঁর কবিতা আমার খুব ভাল লাগতো, বোধ হয় সেই কবিতার উৎসটা দেখবার কৌতূহল হ'য়ে থাকবে—

অনু সম্ভবতঃ অর্থব্যঞ্জক প্রশ্ন করিল—এত দিন পরে হঠাৎ দেখা হওয়ায় আপনাদের নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হয়েছে। আপনারা গল্প করুন—

—আপনি—

—জানেনই ত এ সময় আমাদের যত কাজের হিড়িক পড়ে যায়।

—আচ্ছা আসুন—দেখবেন আমি খোকাকে কেমন সুন্দর ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাব—

অনু কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল। রমলা শিশুপুত্রকে আদর করিতে করিতে হঠাৎ বলিল—আপনার এই সুন্দর গৃহস্থালী দেখলে হিংসে হয়।

—সুন্দর ?

—সুন্দর না ত কি ? যেমন দু'টি ছেলে, তেমনই স্ত্রী, আর কি চাই !

—মাসখরচের খাতা দেখলে বুঝতে পারবেন আর কি কি চাই।

—সেইটাই বড় হ'ল এদের চেয়ে !

—ছোট হয়েই তারা ছিল কিন্তু, সেটা এখন শ্বাসরুদ্ধ করবার উপক্রম করেছে।

রমলা বলিল—আপনাদের মুখে ওই এক কথা, স্ত্রী-পুত্রে খেয়েই আপনাদের ফকির করলে, না ?

কলেজের নানা তুচ্ছ পরিচয় ও স্মৃতি নিয়ে গল্প হইতেছিল। রমলা প্রসঙ্গক্রমে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—আপনি যেদিন হঠাৎ আমাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লেন সেদিন কি আশ্চর্য্যই হয়েছিলাম আমি ! বিশ্বাসই করি নি যে এক বার মাত্র আমন্ত্রণে আপনি যাবেন—

—কেন ?

—আপনি তখন যে ব্যস্ত ! আপনার কি আমাদের মত লোকের বাড়ীতে যাওয়ার সময় হ'তে পারে ! আর কারণও ত তেমন কিছু ছিল না।

আমি একটু চিন্তা করিয়াই জবাব দিলাম,—আজ স্বীকার ক'রতে আপত্তি নেই, যে-কারণটা ছিল তা অজুহাত মাত্র, আর আসল ইচ্ছাটা ছিল বালিগঞ্জের আপনাদের মত শিক্ষিতা মেয়েদের স্বরূপ জানা—আমন্ত্রণ না হ'লেও হয়ত যেতাম।

বার বার মনে হইতেছিল—এ রমলা আমার সহপাঠিনী রমলার ভগ্নাবশেষ মাত্র। যৌবনের স্পর্দ্ধায়, শিক্ষার দাম্ভিকতায়, ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে সে ছিল তখন অভিজাত আজ সে সাধারণ, সহজবোধ্য। আজ সে বিগত-যৌবন, বালিগঞ্জে পিতার আশ্রয় ছাড়িয়া সে চাকুরীজীবী।

—কি দেখে এলেন ?

—দেখবার অবসর পাই নি, যা বুঝতে চেয়েছিলাম আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পরে তা আরও দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে

গেল। আরও চিন্তা ক'রে দেখলাম আপনার সঙ্গে বেশী পরিচয় হয়ত উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর নাও হ'তে পারে!

রমলা ব্যঙ্গ করিল,—যা হোক, আমার কল্যাণের জন্যই আমাকে দূরে রাখ্‌তে চেষ্টা করেছিলেন—

—একথা বললে অত্যন্ত অহঙ্কারের পরিচয় দেওয়া হয় নাকি?

—হ'লই বা, আপনাদের সেইটেই গৌরবের।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবেই একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলেন, পরক্ষণেই সবল হ'য়ে ইলিশ মাঁছ কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

আমি হাসিয়া উঠিলাম। প্রশ্ন করিলাম—কেন আপনিও কি কোন দুর্ব্বলতা বোধ করেন নি?

রমলা ঘুমন্ত শিশুকে তুলিয়া বলিল—সেটা স্বীকার করা ত খুব গৌরবের নয়—আলোটা ধরুন শুইয়ে দি—

আরও কিছুক্ষণ পরে বলিলাম—আজ আপনাকে এমনি ভাবে দেখে সুখী হ'তে পারি নি সত্যি, যদি কোন হাকিম-পত্নী হয়ে আসতেন তবেই সুখী হতাম।...আচ্ছা আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

রমলা মুচকি হাসিয়া বলিল—আজ অন্ততঃ এ বয়সে বলতে বাধা নেই, বিয়ে করি নি নয়, বিয়ে হয় নি। বিবাহ যাকে করতে পারি এমন লোক খুঁজে বের করবার পূর্ব্বেই হঠাৎ এক দিন দেখলাম বিয়ের বয়েস চলে গেছে, আর এখন বিয়ে করাটা হাস্যকর—

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বলিল—যাক্‌গে ও-সব বাজে কথা, সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, আমাকে পৌছে দিয়ে আসবেন ত?

—অবশ্যই।

খোকা ভাঙা টাইম-পিসের চাকা লইয়া ঘুরাইতেছিল। রমলা বলিল—খোকা তোমার ঘুড়ি আছে?

—না।

—কেন?

—বাবা যে দেয় না।

—ঘুড়ি-নেবে, না কি নেবে?

খোকা চিন্তা করিয়া বলিল,—লাট্টু, দেবেন?

—নিশ্চয়ই দেব, কাল, কেমন?

খোকা সন্দেহের সঙ্গে প্রশ্ন করিল—ঠিক ত?

রমলা খোকাকে আদর করিয়া বলিল—নিশ্চয়ই। আমাকে বলিল—চলুন নিমন্ত্রণ আমিই করছি, আপনি ত করলেন না। খোকার নিমন্ত্রণেই আসতে হবে—

—নিমন্ত্রণ করবার সাহস খোকার থাকা সম্ভব, আমার কি ক'রে থাক্‌তে পারে—

রমলাকে নীরবেই পথ দেখাইয়া চলিয়াছিলাম। রমলা অকস্মাৎ বলিল—এখানে এসে বড়ই একা একা মনে হচ্ছিল, তবুও একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। দিবা-রাত্রি ইস্কুলের কপট অবস্থার মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—

—আপনার উপস্থিতি আমার পক্ষে গৌরবের সন্দেহ নেই।

স্কুলের দরজায় দাঁড়াইয়া সে বলিল—অমন সুন্দর আপনার ছেলে দু'টি, ওদের অযত্ন ক'রবেন না—আর ও অবহেলা ওরা ত বোঝে না।

নমস্কার জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার বাসা ও আমার বাসার মধ্যে সামান্য একটি মাত্র বাড়ীর ব্যবধান। মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—খোকার প্রতি এ অবহেলা ত আমার ইচ্ছাকৃত নয়, দরিদ্র-গৃহে যাহা সম্ভব তাহা সে পাইয়াছে।

রমলার কথা মনে পড়ে—কলেজে সেদিন সবচেয়ে আধুনিক রুচিসম্পন্না এবং প্রগতিবাদিনী। তাহার স্মার্টনেস অনেক সময়েই ছাত্রমহলের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিত—তাহার স্পষ্টবাদিতা অনেকের পক্ষেই ভীতিপ্রদ, কিন্তু আজ, যেমন করিয়াই হউক, তাহার মনে দৈন্যের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা না হইলে আমার মত দরিদ্র শিক্ষকের ঘরে আসিয়া, অযত্ন-প্রতিপালিত শিশুকে আদর করিতে তাহার সম্মান ক্ষুণ্ণ হইত।

কয়েক দিনের মধ্যেই খোকার সঙ্গে রমলার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হইয়া উঠিল। তাহাদের মাঝে আমার উপস্থিতি ও আমি উভয়েই অবান্তর।

কয়েক দিন পরে কি কারণে স্কুল হইতে আসিতে দেরি হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের পর্দ্দাটা ঠেলিয়া ঢুকিতেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—কনিষ্ঠ পুত্রকে কোলের উপর দাঁড় করাইয়া রমলা খোকার সঙ্গে কি কথা বলিতেছে। ঝণ্টু তাঁহার সযত্নরচিত চুল টানিয়া টানিয়া মুখে পুরিতে চেষ্টা করিতেছে। খোকা বহু পুরাতন একটি মেটে ভাঙা ঘোড়াকে দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতেছে—এর নাম কি জান? চৈতক!

রমলা হাসিয়া বলিল,—তার পর।

—যুদ্ধ ক'রে পা ভেঙে গেছে।

—নামটা কে দিয়েছে?

—বাবা। ভেঙে গেলে আমি কেঁদেছিলাম, তাই বাবা বললে—যুদ্ধ করতে গিয়ে পা ত ভাঙবেই—

আমি বলিলাম—মিথ্যা বলি নি, চৈতক সম্বন্ধে এরূপ ইতিহাস আছে—

রমলা অভিমানের সঙ্গে বলিল—তার মানে আর একটা কিনে দেন নি ত!

—অনাবশ্যক, খেলনার পরিণতি ওই—

রমলা ঝণ্টুর হাত হইতে নিজের কুঞ্চিত অবিন্যস্ত চুলের গোছাটিকে মুক্ত করিয়া লইয়া, তাহাকে কোলের মাঝে করিয়া বলিল—দুষ্টু, যা পায় তাই মুখে দিতে হয়!

ঝণ্টু তাহার দন্তহীন মুখ বিস্তৃত করিয়া অকারণেই হাসিল। রমলা দু'টি চুমায় তাহাকে আদর করিয়া বলিল—আবার হাসে—ও···

ঝণ্টু তাহার অবাধ্য হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তবুও হাসে—বৃহৎ চোখ দুইটি মেলিয়া বোকার মত তাকায়।

খোকা বলিল—দেখবে বাবা? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে তাহার স্খলিত ইজের টানিতে টানিতে ভাঙা বাক্সটা লইয়া আসিয়া বলিল—এই দেখ লাট্টু, এই দেখ বেলুন বাঁশী, এই দেখ হাতী—

আমি রমলাকে বলিলাম—এ সব ত আপনিই দিয়েছেন? অর্থের এ অপচয় করাটা আমি খুব প্রশংসনীয় মনে করতে পারছি নে।

—ওদের বঞ্চিত ক'রে অর্থ সঞ্চয় করাটাই বোধ হয় প্রসশংসার—

—তা ত নয়, তবে ওরা যখন দরিদ্রের ঘরে জন্মেছে তখন দুঃখ কষ্ট অতৃপ্তি ওদের জীবনে আসবেই, এখন থেকেই প্রস্তুত থাকা ভাল।

—গরীব ওরা ত নাও থাকতে পারে।

দরিদ্র পিতার অন্তরের খবর জানবার মত অভিজ্ঞতা রমলার না থাকাই সম্ভব, তাই বৃথা তর্ক না করিয়াই বলিলাম—অর্থের অপচয় ত বটে!

—যা পাই, তা আমার পক্ষে যথেষ্ট, সঞ্চয় করবার যথেষ্ট হেতু নেই, অতএব অপচয়, যদি তাই হয়, করাটা আমি অন্যায় মনে করতে পারি নে।

নীরবে রমলার যুক্তিই মানিয়া লইলাম—সে যদি খোকার জন্য অপচয় করিয়া পরিতৃপ্তি পায় তবে আমি তাহার অন্তরায় হইতে চাহি না।

গৃহিণী চা লইয়া প্রবেশ করিলেন। ভাববাচ্যে বলিলেন—আসা হয়েছে।

আমিও জবাব দিলাম—আগমন এতক্ষণে হ'ল।

রমলা হাসিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম—সারাদিন পরিশ্রমের পর অভ্যর্থনাটা বেশ উপাদেয় মনে হ'ল—

অনু অভিযোগ করিল—ইস্কুল কি এখন ছুটি হ'ল?

রমলা চা খাইতে খাইতে বলিল—আপনাদের দাম্পত্য কলহটা বেশ উপভোগ করছি।

—কলহ? সর্ব্বনাশ সে সাহস আমার নেই।

অনু হাসিয়া বলিল—না, আমার নিন্দে না ক'রে তুমি জলস্পর্শ কর না তার—

আমারও চা আসিল। খোকা এতক্ষণে ফাঁক পাইয়া বলিল—বাবা দেখ কেমন বাজে। সে তাহার বেলুন বাঁশীটা কানের কাছে তীব্রবেগে বাজাইয়া দিল। বলিলাম—বাপ্, রক্ষে করো, তোমার মা'কে শোনাও—

খোকা বলিল—মা ত শুনেছে। লাট্টু ঘোরাব দেখ্‌বে?

রমলা বলিল—লাট্টু ঘোরাতে শিখেছ?

খোকা সগর্ব্বে বলিল—হুঁ। বাবা ত কিছুই জানে না—

রমলা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি ক'রে জান্‌বে?

—জান্‌লে ত বাবা এত লাট্টু কিন্‌তো—

আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। অনু খুশী হইয়া বলিল—ঠিক্ বলেছিস্।

রমলা খোকাকে লইয়া আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইত। ঝণ্টুকে কোলে করিয়া, আদর করিয়া হয়ত পরিতৃপ্তি পাইত—তাহার অসহায় চাহনি, ও অবোধ্য কথা হয়ত তাহার নারী-অন্তরে স্বপ্নের মদিরতা সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। জনসাধারণে আমাদের নৈকট্যের কি ব্যাখ্যা করিত জানি না। রমলাকেও বাধা দিই নাই, জানি বাধা দিলে তাহার জেদ বাড়িয়াই যাইবে। সাধারণের মতকে শ্রদ্ধা করিয়া নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখাটা সে ভীরুতা বলিয়াই মনে করে।

ঝণ্টুর কয়েক দিন যাবৎ অসুখ।

রমলা আসিয়া দেখিয়া যায়, অকারণ ব্যস্ততাও প্রকাশ করে। সেদিন সন্ধ্যায় আসিয়া সে প্রশ্ন করিল—কেমন আছে?

আমার জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। ঝণ্টু চোখ না মেলিয়াই একটু দুধ তুলিয়া ফেলিল। রমলা তাহার মূল্যবান সিল্কের শাড়ীর আঁচল দিয়া সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল—ডাক্তার কি বল্‌ছে?

—সেরে যাবে।

—কবে? দু-দিন ত হ'য়ে গেল—ভাল ডাক্তার দেখান?

আমি হাসিলাম—হাসিবার অর্থ রমলা সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিল। আমাদের মত যাহারা তাহারা ইচ্ছা করিলেই ভাল ডাক্তার দেখাইতে পারে না, তাই দৈব ও অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস বেশী। রমলা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—একটা কথা বলি, কিছু যদি মনে না করেন।

—বলুন, কি মনে করতে পারি?

রমলা ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বলিল—কথাটা বলতে ভীতই হচ্ছি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রমলার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলাম—কথা বলতে ভয় পাওয়া—অন্ততঃ আপনার কাছে এ দৈন্য প্রত্যাশা করি নি।

রমলা আমার মুখের উপর তাহার প্রশান্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিল—যদি কিছু মনে না করেন—আমার··· মানে—একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আমাদের বন্ধুত্ব বা সেই পাঠ্যজীবনের ঘনিষ্ঠতাকে যদি কোন মূল্য দিয়ে থাকেন অন্তরে তবে—

রমলা হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। ঝণ্টুর চুলের মাঝে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আমার অর্থের আজ কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই, কিন্তু আপনি যদি এই শিশুর জন্য তার সহায় করতেন তবে আমি অন্ততঃ মনে মনে উপকৃত বোধ করতে পারতাম। এই ত আমার পরিচয়, আমার বন্ধুত্বকে মর্য্যাদা দেওয়া হবে—

এই অযাচিত করুণা যতই বিনীত হউক না কেন, তাহা আমার দুর্ব্বলতম স্থানে আঘাত করিয়াছিল। আমার এ দারিদ্র্য আমার অক্ষমতাকে এমনি করিয়া কোন দিন হাতে হাতে ধরাইয়া দেয় নাই। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—এ রকম হয়, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। শীগ্‌গিরই সেরে যাবে—

রমলা সবই বুঝিয়াছিল, সযত্নে ঝণ্টুকে শোয়াইয়া রাখিয়া সে নীরবে আমার মুখের পানে একবার চাহিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার মনকে চিরদিন আপনি অবিশ্বাসই করেছেন, কোন মূল্যই দেন নি তা আমি জানি, কিন্তু আজ যাকে নিয়ে সমস্যা সে আপনিও নয় আমিও নই।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রমলা চলিয়া গেল। দুঃখিত হইয়া বসিয়া ছিলাম গৃহিণী ব্যঙ্গ করিলেন—বেড়াতে যাও না, ওর জন্যে ঘরে ব'সে থাকার দরকার নেই—

কিছুদিন পরের কথা—

ঝণ্টু আর একটু বড় হইয়াছে—খোকা এখন মাঝের বাড়ীটা অতিক্রম করিয়া কারণে অকারণে রমলার ওখানে যাইয়া তাহাকে বিরক্ত করে এবং মাঝে মাঝে মূল্যবান্ খেলনা বিজয়গর্ব্বে আনিয়া হাজির করে। রমলা আসে কিন্তু আমার সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয় না। অনু বলে ঝণ্টুকে কোলে করতেই সে আসে না, তার উদ্দেশ্য অন্যরূপ।

সেদিন রবিবার—

একটু ঘুমাইতেছিলাম, অকস্মাৎ একটা গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া গেল। মাতা ও পুত্রে বচসা হইতেছে—খোকা পলাইয়া কোথায় যাইতেছিল, অনু বলিল—কোথায় যাচ্ছিস হতভাগা?

খোকা বলিল—মাসিমার ওখানে।

অনু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—সাতপুরুষের মাসিমা, কেন পিসিও ত হ'তে পারত—শুয়ে থাক্—

খোকা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল—আজ রেলগাড়ী দেবে বলেছে যে!

—রেলগাড়ী তোর বেটে খাওয়াব পাজি কোথাকার!

আমি বলিলাম—যাক না।

এত দিনের সঞ্চিত ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ উদ্গীরণ করিয়া অনু বলিল—কেন যাবে, সে কে?

আমি হাসিয়া বলিলাম—তুমি মেয়েমানুষ, তুমি ত বোঝ—ওদের নেড়েচেড়ে সে একটু তৃপ্তি পায়, আর তোমার কাছে সেটুকু উদারতা আশা ক'রেই সে এখানে আসে—

অনু তিক্তকণ্ঠে বলিল—ওহো, তার তৃপ্তি দেওয়ার জন্যে তুমিই ত আছ, আবার তার মাঝে খোকা কেন?

উঠিয়া বসিয়া বলিলাম—তার মানে?

—তার মানে পাড়ায় গিয়ে শোনো—

—তুমি বলতে চাও আমাদের পরিচয়ের মধ্যে রহস্য আছে?

—রহস্য না থাক, তৃপ্তি ত আছে!

—তোমার কাছে এর চেয়ে বেশী উদারতা আশা করেছিলাম।

—তোমার বেলায় সে উদারতা দেখাতে ত্রুটি করি নি, খোকার বেলায় না হয় নাই দেখালাম। তোমায় বেড়াতে যেতে ত বাধা দিই নি—

উত্তেজিত হইয়াছিলাম। খোকা দরজার পর্দ্দা ধরিয়া বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া ছিল। দরজার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলাম—মেয়েরাই মেয়েদের বড় শত্রু, নইলে—

অমুও তেমনি কণ্ঠে বলিল—পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলা ত তেমনি কঠিন নয়—

উত্তেজনায় ও বিরক্তিতে পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে যাইতে-ছিলাম; হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইলাম।

অত্যন্ত অপরাধীর মত মোটরগাড়ী-হাতে রমলা আমারই দরজার সামনে নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সমস্ত কথাই হয়ত তাহার কানে গিয়াছে এবং সেই জন্যই তাহার প্রশান্ত আয়ত দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া টলটল করিতেছে—

কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে নত হইয়া খোকার হাতে মোটর গাড়ীখানা দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। হয়ত চোখ দুইটিকে পরিষ্কার করিতে একটু থামিল, তাহার পর দ্রুত সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিয়া নীচে নামিতে লাগিল—

কি বলিব ভাবিয়া পাইবার আগেই রমলা সদর রাস্তায় পৌছাইয়া গিয়াছে— এখন আর কি বলিয়া তাহাকে ফিরান যায়?

অমরতা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

আজি এই দিনটিরে জানি জানি, ফুরাতে দেবে না,
যে-কৃপণ মমতায় চিরযুগ ধ'রে রাখো ঘিরে
ধরার প্রতিটি ধূলি, প্রতি অণু-পরমাণুটিরে,
তেমনি মমতা এরে টেনে ল'বে অদেখা অচেনা
অক্ষয় কোনও স্বর্গে। আজিকে যে কুসুমের দল
খরতাপে ম্লান হ'ল, সেইখানে তব স্নেহরস
দেবে তারে সঞ্জীবিয়া বুলাইয়া অমৃত-পরশ।
প্রতিটি মুহূর্ত্ত আজি, প্রতি পল, প্রতি অণুপল
পাখা মেলে উড়ে যায় গোধূলি-আকাশ সন্তরিয়া,
তোমার বুকের কাছে বাধাহীন বাঁধে সবে নীড়
নির্ভয় নির্ভরে। ধীরে ঘিরে আসে যুগ-রজনীর
অনন্ত তমিস্রা মোরে, তবু ভাবি ভয়হীন-হিয়া,
ভুলিব সে চির-রাত্রি, যদি জানি কোথা কোনোরূপে
আজি এই দিনখানি বাঁচিতেছে অমরতা-বরে
তোমার বুকের কাছে বেঁধে নীড় নির্ভয়-নির্ভরে,
প্রিয়ার স্মৃতিটি তা'র সাথে যদি বাঁচে চুপে চুপে।
একটু খুসির হাসি, পাশাপাশি চলা পায়ে পায়ে,
একটু চকিত চাওয়া, প্রেয়সীর প্রসাদ-রতন
হাতের পরশ এতটুকু, এরে আমারই মতন
সমাদরে রাখো যদি, তবে তব অন্তর ছাপায়ে
উপচি' পড়িবে সুধা;—অভাগা এ ক্ষুধিতেরে তব
মনে পড়িবে না কি গো তখনও, আনিবে না ডাকি'
তব স্বর-সভাতলে, যেথা থাকি কিম্বা নাহি থাকি,
বলিবে না, এই লও? আমি শুধু সেইটুকু ল'ব
তব অসীমতা্ যারে বহিবে না, দেব পায়ে ধরি'
অনন্ত-জীবন মোর প্রতিদানে সুধা দিয়ে ভরি'!

নবজীবন সৃষ্টিতে 'ক্রোমোসোম' রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জীব হইতে অনুরূপ জীবের উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া? পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে এক সময়ে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 'ক্রোমোসোম' (Chromosome) নামক অদ্ভুত পদার্থ আবিষ্কারের ফলে বংশানুক্রমিক জন্মরহস্যের যেসব সন্ধান মিলিয়াছে তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। 'ক্রোমোসোম' পদার্থটা কি, জানিতে হইলে দেহগঠনের প্রধান উপকরণ সেল (cell) বা জৈব-কোষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

জীবনটা যে কি তাহা অনুমান করিতে না পারিলেও, জন্ম ও মৃত্যু যে ইহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এ সম্বন্ধে কোনই তর্ক নাই। জীবন তাহার অনুরূপ জীবনের সৃষ্টি করে এবং একক ভাবে দেখিলে প্রত্যেকটি জীবনেরই মৃত্যু অপরিহার্য্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমষ্টিগত ভাবে জীবন মৃত্যুকে এড়াইয়াই চলিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ অহরহ তাহাকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সৃষ্টির আদি কাল হইতেই জীব এক হইতে ক্রমশঃ বহু রূপ ধারণ করিয়া, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া পৃথিবীর বুকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাহার এই জয়যাত্রা আজিও অব্যাহত গতিতেই চলিয়াছে; ভবিষ্যতেও চলিবে। ব্যষ্টিগত বা সাময়িক ভাবে ইহাতে ঊর্দ্ধাধঃ গতি লক্ষিত হইলেও সমষ্টিগত ভাবে এই জয়যাত্রার বিরাম নাই। প্রজ্জলিত ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা হইতে যেমন অনন্ত কোটি বর্ত্তিকা প্রজ্জলিত করা যাইতে পারে, এই জীবন-প্রবাহও তেমনই সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আদি জীব হইতে বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন রূপে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া চলিয়াছে।

মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া জীবন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে জীবন ধারণ সম্ভব নয়। তাহাকে সক্রিয় হইতেই হইবে। এই সক্রিয়তার ফলে দেহ-যন্ত্রের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। চূড়ান্ত ক্ষয়ের অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (অবশ্য স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই বলা হইতেছে।) এই ক্ষয় নিবারণ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। কাজেই দেহ-যন্ত্রের ক্ষয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য জীব তাহার
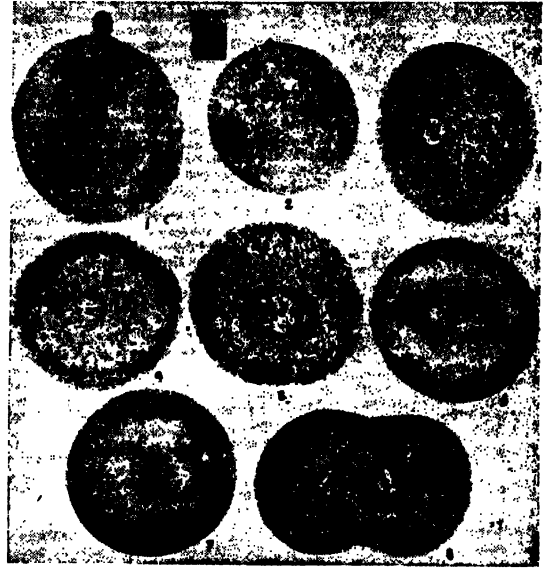
নিষিক্ত হইবার পর সি-আর্চিনের ডিমের নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ ক্রোমোসোম কি ভাবে বিভক্ত হইতেছে তাহার মাইক্রো-ফোটোগ্রাফ।

নিজের অনুরূপ এক বা একাধিক নবজীবনের সৃষ্টি করিয়া যায়; বংশানুক্রমিক ভাবে জীব-জগতের এইরূপ নব-জন্মলাভ অতীব রহস্যজনক ব্যাপার।

চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এক সময়ে মনে করিতেন যে, পূর্ণাবয়ব জীবের সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্য লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাবস্থায় সন্তান ভ্রূণরূপে প্রথমে মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয় এবং কালক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া সুপরিস্ফুট হয় মাত্র। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পূর্ব্বোক্ত ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জন্মতত্ত্বের যে সকল অদ্ভুত ঘটনা যন্ত্রসহযোগে চাক্ষুষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতীব বিস্ময়কর।
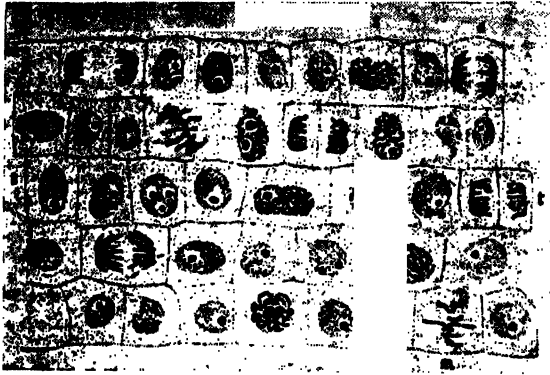
ক্যামেরা-লুসিডা কর্তৃক গৃহীত ক্রোমোসোম বিভক্ত হইবার বিভিন্ন অবস্থার চিত্র

ইট যেমন গৃহ নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ, 'সেল' বা কোষও সেইরূপ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ গঠনের অপরিহার্য্য উপাদান। এ স্থলে বলিয়া রাখা দরকার যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষে কতকগুলি পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের দেহই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। একক কোষকে আশ্রয় করিয়াই আদি জীবন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই কোষের আশ্রয়েই জীবন বহুরূপে প্রকটিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট হুক (Robert Hooke) পাতলা এক টুকরা সোলার পর্দ্দা মাইক্রস্কোপের নীচে রাখিয়া দেখিতে পাইলেন—তাহাতে মধুচক্রের মত পরস্পর গাত্রসংলগ্ন ভাবে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত রহিয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার পর অন্যান্য বহুবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ পরীক্ষা করিয়া তিনি একই রকম কুঠরির মত গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। এই কুঠরিগুলির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'সেল' বা কোষ। প্রত্যেকটি কোষ শ্লেষ্মার মত এক প্রকার পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহার নাম 'প্রোটোপ্লাজম্' বা জৈব-পঙ্ক। সাধারণতঃ কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে, ২৫০০ কোষ পাশাপাশি সাজাইলে এক ইঞ্চির সমান হইতে পারে। অবশ্য কলা, কচু ও অন্যান্য কতকগুলি উদ্ভিদের কোষ অসম্ভবরূপে বড় হইয়া থাকে। বৃদ্ধি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ছোট বড় প্রত্যেক ডিমকেই এক-একটি একক কোষ বলা যাইতে পারে। আমাদের উদরদেশের অভ্যন্তরস্থ এক টুকরা পাতলা পর্দ্দা মাইক্রস্কোপের নীচে রাখিলে দেখা যাইবে—সজীব পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি চেপ্টা পতর পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে। কেবল ঢেউখেলানো সূক্ষ্ম একটি বেষ্টনী রেখা দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। এই রেখা-বেষ্টিত চেপ্টা পদার্থগুলিও এক-একটি 'সেল' বা কোষ। আমাদের দেহে বিভিন্ন আকৃতির কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। মাংসপেশী, হাড়, যকৃৎ অথবা স্নায়ু-সমূহের কোষের আকৃতি বিভিন্ন। কেহ দেখিতে গোল, কেহ চেপ্টা, কেহ চৌকা, কেহ সূতার মত, কেহ বা তারকা চিহ্নের মত। আকৃতি যেমনই হউক—প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অগণিত কোষের সমবায়ে গঠিত। অধুনা জীব-বিজ্ঞানের উন্নততর গবেষণার ফলে এমন সব অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহার ফলে প্রত্যেকটি আণুবীক্ষণিক কোষকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু কাল বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব। বিচ্ছিন্ন কোষ, তদনুরূপ নূতন নূতন কোষ উৎপাদন করিয়া সংখ্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ইহাদের আনুপূর্ব্বিক কার্য্যপ্রণালী পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবন্ধান্তরে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। প্রত্যেকটি কোষের অভ্যন্তরে কি কি পদার্থ রহিয়াছে তাহাই এখন দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেকটি কোষই শ্লেষ্মার মত এক প্রকার স্বচ্ছ, তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। ইহাই জীব-পঙ্ক। এই তরল পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির অন্যান্য বহুবিধ পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। মাইক্রস্কোপের শক্তি একটু বাড়াইয়া দিলেই দেখা যাইবে—শ্লেষ্মার মত জীব-পঙ্কের মধ্যে গোলাকার একটি পদার্থ ভাসিতেছে। এই গোলাকার পদার্থটির নাম—'নিউক্লিয়াস্' বা 'কেন্দ্রিণ'। 'কেন্দ্রিণে'র চতুর্দ্দিকের ঘণীভূত স্বচ্ছ পদার্থের নাম 'সাইটোপ্লাজম্'। মাইক্রস্কোপের নীচের দিকের আলো নিষ্প্রভ করিয়া দিলে, কেন্দ্রিণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় উজ্জ্বল বর্ত্তুলের মত আরও কতকগুলি পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহারা কতকগুলি তৈল-বিন্দু মাত্র; 'সাইটোপ্লাজমে'র স্রোতের সহিত দলবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা অপেক্ষাও অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় কণিকা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এই সকল বিভিন্ন কণিকা ছাড়াও কতকগুলি সূত্রবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূত্রবৎ পদার্থ-গুলি বেজায় সূক্ষ্ম এবং ইহাদের সবগুলির দৈর্ঘ্য সমান নহে। ইহারা সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া কোষের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। মাইক্রস্কোপের মধ্য দিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা যায়—কোন কোন সূত্র দুই খণ্ডে ভাজিয়া যাইতেছে; আবার কখন কখন দুইটি সূত্র পরস্পরের প্রান্তভাগে সংযুক্ত হইয়া একটি অখণ্ড সূত্রে পরিণত হইতেছে। ইহারা 'সাইটোপ্লাজমে'র স্রোতের সহিত পরিচালিত হয় না। ইহাদের গতিবিধি স্বতঃ-

প্রণোদিত বলিয়াই মনে হয়। ইহা 'মাইটোকনড্রিয়া' নামে পরিচিত। 'নিউক্লিয়াস' বা কেন্দ্রিণের এক প্রান্তে টুপির মত একটা স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 'সেণ্ট্রোস্ফিয়ার' নামে পরিচিত। সূত্রবৎ পদার্থগুলি খুব সম্ভব ঐ স্থান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতেই কিলবিল করিয়া বাহিরে আসিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মাইক্রস্কোপের বর্দ্ধিত-শক্তিতে 'নিউক্লিয়াসের' অভ্যন্তরে এক বা একাধিক অস্বচ্ছ বিন্দুবৎ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা 'নিউক্লিওলাই' নামে পরিচিত। ইহারা অনবরত তাহাদের আকৃতি, আয়তন ও অবস্থান স্থলের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

এখন আমরা কোষের অভ্যন্তরস্থ গভীরতম স্তরের বিষয় আলোচনা করিব। এই সূক্ষ্মতম স্তরের বিবরণ পূর্ব্ববর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া সন্তানে পরিচালিত হয়—সেই গুপ্ত রহস্যের মূল ঘটনাগুলির বিষয়ই আলোচনা করিতেছি। জীবন-প্রবাহ ও তাহার বিচিত্র অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমান জীব-বিজ্ঞানের পরিণতি বুঝিতে হইলে এই মূলরহস্যগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন হইতেই পরবর্ত্তী নবীন জীবনের উৎপত্তি সম্ভব। কোন কিছুই নাই—তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ একটা জীবকোষের উৎপত্তি সম্ভব নহে। যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ একটি মাত্র জীব-কোষ হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই একক জীব-কোষ একটি ভাঙ্গিয়া দুইটি হইয়াছে, দুইটি ভাঙ্গিয়া চারটি হইয়াছে, চারটি ভাঙ্গিয়া আটটি হইয়াছে এবং এইরূপে উৎপাদিত অগণিত কোটি কোটি কোষের সমবায়ে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে। কোন একটি কোষ হইতে নূতন একটি কোষ উৎপন্ন হইবার সময় কিরূপ ব্যাপার ঘটে? মাইক্রস্কোপের নীচে একটি জীবন্ত কোষ রাখিলে দেখা যাইবে—'নিউক্লিয়াসটি' এক বা একাধিক ভ্রাম্যমাণ 'নিউক্লিওলাই' সহ উজ্জ্বল একটি গোলাকার পদার্থের মত প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু উক্ত কোষ হইতে আর একটি নূতন কোষ জন্মিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই 'নিউক্লিওলাই'-গুলি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে থাকে। ইহার কিছুক্ষণ পরেই সেই স্থানটি ধূসরবর্ণের এক ঝাঁক অস্পষ্ট কণিকায় ভর্ত্তি হইয়া যায়। এই কণিকাগুলি পুনরায় একত্রিত হইতে হইতে পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইয়া কতকগুলি সূক্ষ্ম সূত্রের আকৃতি ধারণ করে। সূত্রগুলির কোনটা বড় কোনটা ছোট। ছোট একটা জলপূর্ণ পাত্রে অনেকগুলি বাণ মাছ
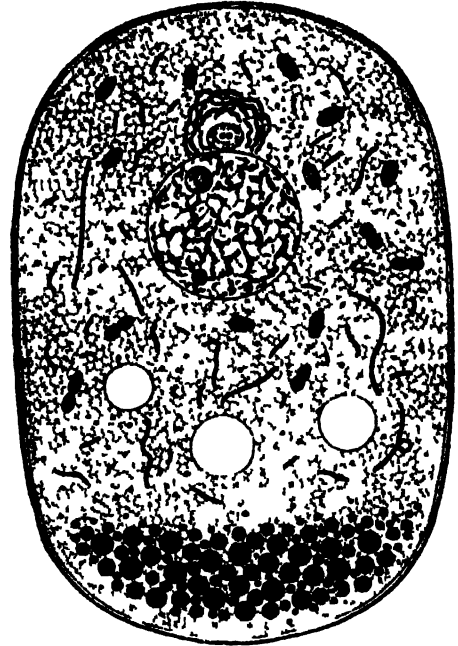
বৃক্ক কোষের বর্দ্ধিত চিত্র
উপরের দিকের বড় গোলাকার বস্তুটা—নিউক্লিয়াস।
সূত্রবৎ পদার্থগুলি—মাইটোকনড্রিয়া

ছাড়িয়া দিলে যেমন করিয়া কিলবিল করে, এই সূত্র-গুলিও পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া অথবা একক ভাবে সেইরূপ কিলবিল করিতে থাকে। কিছুক্ষণ কিলবিল করিবার পর গতিবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় এবং সূত্রগুলি ধীরে ধীরে স্থূলকায় হইতে হইতে সরল দণ্ডের আকৃতি ধারণ করে। এই পদার্থগুলির নামই 'ক্রোমোসোম'। অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক পদার্থ হইলেও ইহারা জীব-দেহের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। সঞ্চরণকারী 'ক্রোমোসোম' সূত্রগুলি স্থূল দণ্ডে পরিণত হইবার সময়েই 'নিউক্লিয়াসে'র চতুর্দ্দিকের আবরণটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থসমূহ 'সাইটোপ্লাজমে'র সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই কোষটির দুই প্রান্তে দুইটি সক্রিয় কেন্দ্র আবির্ভূত হয়। ধীরে ধীরে এই দুইটি প্রান্ত বিন্দুকে সংযুক্ত করিয়া দুইটি চুম্বকের মধ্যস্থিত শক্তিরেখার (Lines of force) ন্যায়, মধ্যস্থল স্ফীত, কতকগুলি ধূসরবর্ণের অস্পষ্ট রেখা আত্মপ্রকাশ করে। 'ক্রোমোসোম'গুলি তখন ধীরে ধীরে এই স্ফীত স্থলে একত্রিত হইতে থাকে। 'নিউক্লিয়াসে'র মধ্যে কণিকার আবির্ভাব হইতে 'ক্রোমোসোম'গুলির
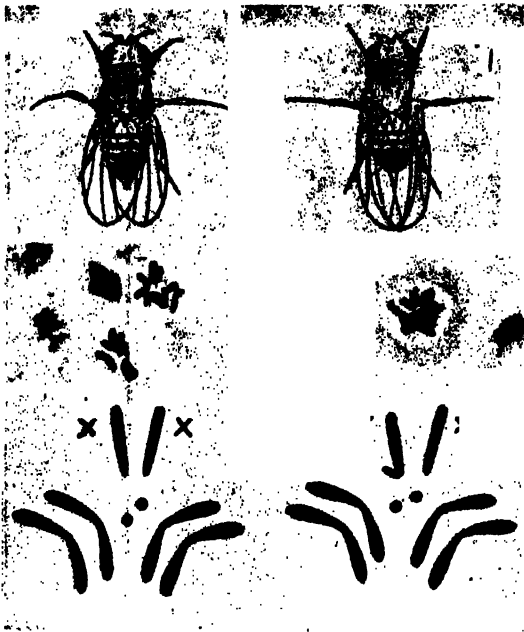
উপরে—ফল-মক্ষিকার ছবি।
মধ্যে—তাহাদের ক্রোমোসোমের মাইক্রো-ফোটো।
নীচে—বামদিকে, স্ত্রী-মক্ষিকার ও ডান দিকে, পুরুষ-মক্ষিকার ক্রোমোসোম চিত্র

মধ্যস্থলে সম্মিলিত হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় আট মিনিট সময় লাগিয়া থাকে। কোষটি দ্বিধা বিভক্ত হইবার ইহাই প্রাথমিক প্রক্রিয়া। 'ক্রোমোসোম'গুলি মধ্যস্থলে উপনীত হইবার পর প্রকৃত প্রস্তাবে কোষ বিভক্ত হইবার কাজ আরম্ভ হয়। তখন দেখা যায়, প্রত্যেকটি কোষ লম্বালম্বি ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং দ্বিধা-বিভক্ত অংশগুলি কোষের উভয় প্রান্তস্থিত কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। প্রায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই 'ক্রোমোসোমে'র অর্দ্ধাংশগুলি দুই দলে বিভক্ত হইয়া কোষের দুই প্রান্তে জমায়েৎ হয়। ইতিমধ্যে কোষটাও ক্রমশঃ লম্বাটে হইতে থাকে। এই সময়ে কোষটির চতুর্দ্দিকে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। কোষের বহিরাবরণের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট কতকগুলি বুদ্বুদ ঠেলিয়া বাহির হইতে থাকে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভিতরে ঢুকিয়া যায়। যেন অনেকটা গরম পিচের বুদ্বুদ ওঠার মত। প্রায় মিনিট ছয়েক পর্য্যন্ত এ ব্যাপার চলিতে থাকে। তার পর হঠাৎ কোষটার মধ্য ভাগে একটা খাঁজ পড়িয়া ক্রমশঃ তাহা গভীর হইতে হইতে দুইটি অংশ পৃথক্ হইয়া পড়ে। পৃথক্ হইয়া সংযোগ-সূত্রটি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিতে থাকে। অবশ্য বিচ্ছিন্ন কোষেই ইহা ঘটিতে পারে; কিন্তু অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ কোষের মধ্যে পাত্‌লা পর্দ্দার আবরণ গঠন করিয়া পৃথক্ হইলেও পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হইয়াই অবস্থান করিতে হয়। যাহা হউক, ইতিমধ্যে 'ক্রোমোসোম'গুলির চতুর্দ্দিকে পুনরায় সূক্ষ্ম একটি পর্দ্দার আবরণী গঠিত হইয়া নূতন 'নিউক্লিয়াস' গড়িয়া ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'নিউক্লিয়াসে'র আবরণ গঠিত হইবার পর 'ক্রোমোসোম'-গুলি ক্রমশঃ আবার অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। 'ক্রোমোসোম'-গুলি ক্রমশঃ স্ফীত হইতে হইতে অবশেষে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া যায়। মোটের উপর কোষগুলি বিভক্ত হইবার সময় ছাড়া অর্থাৎ বৃদ্ধির সময় ব্যতীত 'ক্রোমোসোম' দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নহে। কোষের দ্বিধা বিভক্ত হইবার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'মাইটোসিস্' (mitosis)। এই প্রক্রিয়া শেষ হইতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে এবং পুনরায় 'নিউক্লিয়াস'টি গঠিত হইতে প্রায় এক ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিতে দেখা যায়। প্রত্যেক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য উৎপাদক কোন অজ্ঞাত, অদৃশ্য পদার্থ হয় তো 'ক্রোমোসোম' সূত্রে পর পর গ্রথিত অবস্থায় থাকে। যদি তাহাই হয় তবে 'ক্রোমোসোম'গুলি দ্বিধা বিভক্ত হইবার ফলে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানে বর্ত্তাইবে—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আমাদের শরীর বৃদ্ধির কারণ হইতেছে—নূতন নূতন অসংখ্য সূক্ষ্ম কোষের উৎপত্তি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই 'মাইটোসিস্' প্রক্রিয়ায় 'ক্রোমোসোম'গুলি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নূতন নূতন কোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে, 'মাইটোসিস্' প্রক্রিয়ায় না হয়, কোষের অনুরূপ কোষ সৃষ্টি হইল; কিন্তু ভ্রূণের উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া? এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলনেরই বা কি প্রয়োজন? পূর্ব্বে যে 'ক্রোমোসোমে'র কথা বলিয়াছি—বিভিন্ন জীব-শরীরে প্রত্যেকটি কোষে তাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন প্রত্যেক মানুষের দেহ-কোষে ২৪ জোড়া অর্থাৎ ৪৮টি, প্রত্যেক ইঁদুরের দেহ-কোষে ২০ জোড়া অর্থাৎ ৪০টি এবং প্রত্যেক ফল-মাছির (Drosophila) দেহ-কোষে ৪ জোড়া অর্থাৎ ৮টি করিয়া 'ক্রোমোসোম' থাকে। ইহার মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন প্রাণীর দেহ-কোষে যত জোড়া করিয়াই 'ক্রোমোসোম' থাকুক না কেন—কেবল পুরুষ প্রাণীদের বেলায় এক জোড়া বাদে অন্যান্য জোড়া-

গুলি অনেকাংশেই একরূপ। স্ত্রী-ফল-মাছির 'ক্রোমোসোম' চিত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে—চার জোড়া 'ক্রোমোসোম' চার রকমের হইলেও প্রত্যেক জোড়ার একটি অপরটির অনুরূপ। কিন্তু পুরুষের বেলায় এক জোড়ার একটি 'ক্রোমোসোমে'র মুখ বঁড়শীর মত বাঁকানো। এই জোড়াটিকে পুরুষত্বজ্ঞাপক 'ক্রোমোসোম' বলা হয়। সাঙ্কেতিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে—X Y 'ক্রোমোসোম'। স্ত্রী-মাছির খর্ব্বাকৃতি দণ্ড দুইটিকে স্ত্রীত্বজ্ঞাপক X X 'ক্রোমোসোম' বলে। অবশ্য পাখী, প্রজাপতি প্রভৃতি দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র ইহার বিপরীত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের স্ত্রীদের 'ক্রোমোসোম' X Y; কিন্তু পুরুষদের 'ক্রেমোসোম' X X.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণ কোষসমূহ দ্বিধাবিভক্ত হইবার সময় 'নিউক্লিয়াসে'র মধ্যে সূত্রবৎ কতকগুলি পদার্থ আবির্ভূত হয় এবং 'নিউক্লিয়াসে'র বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া তাহারা কোষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সূত্রগুলি ক্রমশঃ কোষের মধ্যস্থলে টাকুর মত স্ফীত স্থানটায় আসিয়া সজ্জিত হয়। তার পর প্রত্যেকটি 'ক্রোমোসোম' লম্বালম্বি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং অর্দ্ধাংশগুলি কোষের দুই প্রান্তে জমায়েৎ হয়। কিছুক্ষণ পরে ঐ দুই প্রান্তের মধ্যস্থলে একটি পাতলা পর্দ্দার আবির্ভাবে দুইটি কোষ আত্মপ্রকাশ করে। এই ভাবে বিভক্ত হইবার ফলে দুইটি কোষের মধ্যে একই রকমের 'ক্রোমোসোম' বিদ্যমান থাকে। কাজেই, যত নূতন কোষই সৃষ্টি হউক না কেন, তাহাদের 'ক্রোমোসোমে'র সংখ্যা অথবা গুণাগুণের কোনই তারতম্য ঘটে না। এই ভাবে বাড়িতে বাড়িতে দেহযন্ত্র যখন পরিণতাবস্থায় উপনীত হয় তখন পুংদেহে শুক্র-কোষ ও স্ত্রী-দেহে ডিম্বকোষ নামে দুই প্রকার অভিনব কোষের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। কিন্তু এই অভিনব কোষগুলি উৎপন্ন হইবার সময় 'ক্রোমোসোম' বিভক্ত হইবার পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এই ক্ষেত্রে 'ক্রোমোসোম'-গুলি 'নিউক্লিয়াস' হইতে বাহির হইয়া কোষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাইন-মাছের মত কিলবিল করিতে করিতে একসঙ্গে মধ্যস্থলে সমবেত হইবার পরিবর্ত্তে, প্রায় একই রকম আকৃতিবিশিষ্ট দুই দুইটি করিয়া 'ক্রোমোসোম' জোড়া বাঁধিতে থাকে, জোড়া বাঁধিবার পর তাহারা কোষের মধ্যস্থলে, এক জোড়ার নীচে আর এক জোড়া, এরূপ ভাবে পর পর সজ্জিত হয়। এখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রত্যেকটি 'ক্রোমোসোমে'র দ্বিধা-বিভক্ত হইবার কথা। কিন্তু তাহা না হইয়া, প্রতেকটি
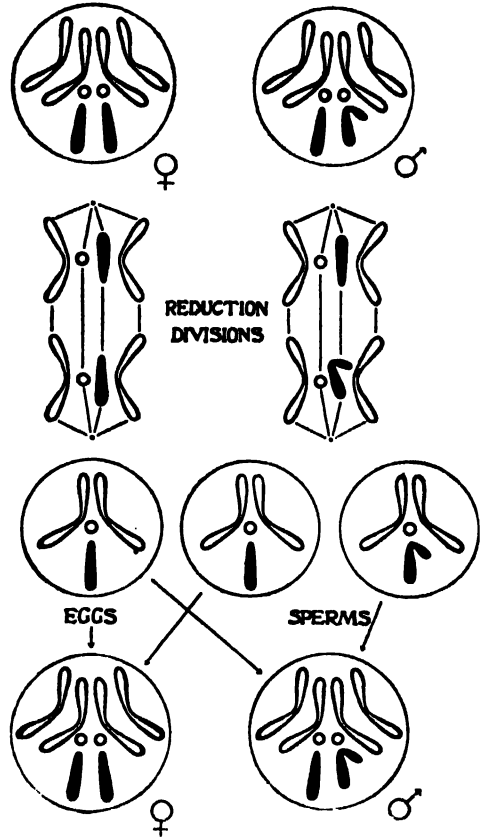
ফল-মক্ষিকা ড্রসোফিলার স্ত্রী ও পুরুষের ক্রোমোসোম বিভক্ত হইবার প্রণালী

জোড়া ভাঙ্গিয়া পুনরায় তাহারা কোষের উভয় প্রান্তে সমবেত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোষের উভয় প্রান্তের মধ্যস্থলে খাঁজ পড়িয়া ক্রমশঃ তাহা গভীরতর হইতে থাকে। অবশেষে এই নবনির্ম্মিত কোষ প্রধান কোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 'ক্রোমোসোম' বিভাজনের এই রীতিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়—*Reduction division* বা 'মাইওসিস' (meiosis)। এই *Reduction division*-এর পর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুনরায় 'মাইটোসিস' হইয়া কোষগুলি দুই ধাপে সংখ্যায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ 'মাইওসিসের' ফলে নবনির্ম্মিত প্রত্যেকটি কোষে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মাত্র অর্দ্ধেক 'ক্রোমোসোম' থাকে। যেমন, মানুষের দেহ-কোষে ৪৮টি 'ক্রোমোসোম' আছে; কিন্তু বীজ-কোষে (ডিম্বকোষ ও শুক্র-কোষ) থাকে ২৪টি। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই দেহ-কোষকে বলা হয় 'জাইগট' (Zygot) এবং বীজ-কোষকে বলা হয়—'গ্যামিট'

মানুষ ও ইঁদুরের ক্রোমোসোমের চিত্র। উপরে ২৪ জোড়া মানুষের ও নীচে ২০ জোড়া ইঁদুরের ক্রোমোসোম

(Gamete) এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অর্দ্ধেক 'ক্রোমোসোম' সমন্বিত 'গ্যামিট'কে 'হ্যাপ্লয়েড' (Haploid) ও তাহার দ্বিগুণিত অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যক 'ক্রোমোসোম' সমন্বিত 'জাইগট'কে ডিপ্লয়েড' (Diploid) বলা হইয়া থাকে। মোটের উপর সাধারণ ভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 'ডিপ্লয়েড'; কিন্তু পুরুষের শুক্র-কোষ (sperm) ও স্ত্রীদের ডিম্বকোষ (ovum) উভয়েই 'হ্যাপ্লয়েড'।

এখন দেখা যাউক, শুক্র-কোষ ও ডিম্বকোষ মিলিত হইবার পর কিরূপ ব্যাপার ঘটে? 'সি-আর্চিন' নামক এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। কারণ ইহাদের মধ্যে আগাগোড়া এই ব্যাপারটা মাইক্রস্কোপের সাহায্যে অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় হইলে কতকগুলি 'সি-আর্চিনে'র খোলা ভাঙিয়া স্ত্রী ও পুরুষগুলিকে আলাদা করিয়া হাতের কাছে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। স্ত্রী-প্রাণীটার পেটের ভিতর হইতে কতকগুলি ডিম বাহির করিয়া চেপ্টা একটি কাচপাত্রে রাখিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত সেগুলি পাত্রের তলদেশে একস্তরে অবস্থান করিবে। পুরুষ প্রাণীটার পুং-কোষ হইতে দুধের মত সাদা এক ফোঁটা রস টেষ্ট-টিউবে লইয়া তাহাতে খানিকটা সমুদ্রজল মিশাইয়া কয়েকবার ঝাঁকিয়া লওয়া দরকার। ঝাঁকুনির ফলে শুক্র-কোষগুলি জলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে, তার পর ঐ জলের পাঁচ ছয় ফোঁটা, পাত্রস্থিত ডিমগুলির উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। ঐ পাঁচ-ছয় ফোঁটা জলের মধ্যেই এত শুক্র-কীট থাকিবে যে তাহাতে প্রত্যেকটি ডিম নিষিক্ত হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা। এখন ডিমসমেত পাত্রটিকে মাইক্রস্কোপের নীচে রাখিলে অতি অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইবে। মাইক্রস্কোপের নীচে এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমগুলিকে দেখাইবে যেন ধূসর বর্ণের কতকগুলি বড় বড় গোলক। বেঙাচির মত লেজওয়ালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শুক্র-কীট গোলকগুলির চতুর্দ্দিকে কিলবিল করিতেছে। ডিম্ব-কোষের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই যেন কীটগুলি তাহাদের গায়ে ঢুঁ মারিবার জন্ত ছুটিতেছে। কোন একটি শুক্র-কীট ডিমের কোন স্থান স্পর্শ করিবামাত্রই সেই স্থান হইতে একটি বুদ্বুদ উঠিয়া কীটটিকে ভিতরে শোষণ করিয়া লইবে। কীটের মস্তকটি ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই ডিমের চতুর্দ্দিকে একটি অতি সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ পর্দ্দার আবরণ আত্মপ্রকাশ করে। এই পর্দ্দার আবরণ ভেদ করিয়া অন্ত কোন কীট আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ডিমটির যাহা প্রয়োজন সে তাহা পাইয়াছে। এখন অন্ত কীটগুলিকে ঠেকাইয়া রাখা প্রয়োজন। তাহাদিগকে ঠেকাইবার জন্তই এই পর্দ্দার উৎপত্তি। কীটের মস্তকটিই মাত্র ডিমের ভিতরে প্রবেশ করে। লেজটি আঁকাবাঁকা ভাবে বেষ্টনীর বাহিরে থাকিয়া কিছুক্ষণ বাদেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মস্তকটিকে ডিম্ব-কোষের নিকট চালাইয়া লইয়া যাওয়াই লেজের কাজ। কাজেই এখন আর লেজের কোনই প্রয়োজন নাই।

কীটের মস্তকটি ডিমের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। জাপানী ফুলের খেলনা সকলেই দেখিয়াছেন। সামান্ত এক টুকরা শুষ্ক পদার্থ এক গ্লাস জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলে তাহা ক্রমশঃ ফুলিতে ফুলিতে সুদৃশ্য লতা পাতা, ফুলফলের আকার ধারণ করে। শুক্র-কীটের মস্তকটিও সেইরূপ ডিমের ভিতরে প্রবেশ করিবার পর ধীরে ধীরে ফুলিতে আরম্ভ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে শুক্র-কীটের মস্তকটি একটি 'নিউক্লিয়াস' মাত্র। গতায়াতের সুবিধার জন্তই ইহা অতি সঙ্কুচিত অবস্থায় ছিল। ডিমটিরও একটি নিজস্ব 'নিউক্লিয়াস' রহিয়াছে। আগন্তুক শুক্র-কীটের মস্তক অর্থাৎ 'নিউক্লিয়াস'টি পরিপূর্ণরূপে বাড়িয়া ডিমের নিজস্ব 'নিউক্লিয়াস'টির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং মধ্যস্থলে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। কাজে কাজেই মিলিত হইবার পর 'নিউক্লিয়াসে'র অভ্যন্তরস্থ অর্দ্ধসংখ্যক 'ক্রোমোসোম'গুলি দ্বিগুণিত হইয়া পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত হয়। অর্থাৎ মিলনের ফলে বীজ-কোষ পুনরায় দেহ-কোষে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই মিশ্র 'নিউক্লিয়াসে'র অর্দ্ধেক 'ক্রোমোসোম' পিতার এবং বাকী অর্দ্ধেক মাতার। 'হ্যাপ্লয়েড' ডিম্ব-কোষটি নিষিক্ত হইবার পরক্ষণেই 'ডিপ্লয়েডে' পরিণত হয় এবং 'ডিপ্লয়েড' ভাবেই ভ্রূণ হইতে পরিণতাবস্থা পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুরুষের দেহ-কোষে পুরুষত্ব জ্ঞাপক X Y নামক একজোড়া 'ক্রোমোসোম' থাকে এবং স্ত্রী-দেহ-কোষে থাকে স্ত্রীত্বজ্ঞাপক এক জোড়া X X 'ক্রোমোসোম'।

কাজেই 'মাইওসিসে'র পর পুরুষের শুক্রকোষের কতকগুলিতে থাকে X এবং কতকগুলিতে থাকে Y এবং স্ত্রী-ডিম্বকোষের প্রত্যেকটিতেই থাকে এক-একটি X অতএব X শুক্রকোষ X ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হইলে নবসৃষ্ট ভ্রূণ হইবে X X, অর্থাৎ স্ত্রী এবং Y-শুক্রকোষ X-ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হইলে ভ্রূণ হইবে X Y অর্থাৎ পুরুষ। নবজীবন সৃষ্টিতে মোটামুটি ইহাই হইল 'ক্রোমোসোমে'র কার্য্যপ্রণালী। অবশ্য বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কিত জটিলতাও ইহাতে যথেষ্ট রহিয়াছে। বিশেষতঃ বংশানুক্রম ও কোষ হইতে সুশৃঙ্খলিত ও সুনির্দ্দিষ্ট ভ্রূণ-দেহের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে জটিলতা আরও বেশী। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

পুরাতন বাড়ী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

এক বৎসর পরেই হইবে, দেশের বাড়ীতে হঠাৎ দর্শন দিলাম। হঠাৎ দর্শন দিবার কারণ, এবার বর্ষাটা নামিয়াছে বিশ্রীভাবে। সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রান্তভাবে জলধারা পড়িতেছে; মেঘে মেঘে আকাশের বর্ণ-শ্রী বিলুপ্তপ্রায়; সূর্য্যদেব ছুটি লইয়াছেন। যাহাদের প্রাসাদ আছে, শহরের পিচবাঁধা রাস্তায় যাহাদের মোটরের মসৃণ গতি পথচারীর সম্ভ্রম ও ঈর্ষা উদ্রেক করে—বাদল-বিলাস তাহাদেরই সাজে। আর কবি-মনের আনন্দ সে যোগাইতে পারে। নেহাৎ অকবি ও অধনীরা দেবতাকে শাপান্তই করিতে থাকে। বাতাস একটু জোরে বহিলে করোগেটেড আচ্ছাদনী বা খড়ে-ছাওয়া চালাঘরের পানে করুণ নয়নে বার বার তাকাইতেই হইবে। জীর্ণপ্রায় কোঠা ঘরের পতন-আশঙ্কাও প্রবল। ফাটা ছাদের মধ্য দিয়া জল ঝরিলে এক দিকের জিনিসপত্র অন্যদিকে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে হয়; আধকাটা প্রাচীর অবিশ্রান্ত জলধারার মধ্যেই দেহরক্ষা করে; ভিজিয়া ভিজিয়া এঘর-ওঘর করিয়া সর্দ্দি ও জ্বরে অনেকে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। বিশ্রী বর্ষাকাল—টানাটানির সংসারে অভাব বৃদ্ধির সহায়তাই করে, মধ্যবিত্ত মনের বিকাশ কোন দিক্ দিয়াই সে করিতে পারে না।

শহরে যে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকি সেটি নূতন এবং মজবুত। বর্ষাকে আরও বহু বৎসর ভ্রূকুটি দেখাইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিন্তু দেশের জীর্ণ বাড়ীটির কথা সহসা মনে হইল। মায়ের মৃত্যুর পর একটি বৎসর কোনক্রমে সেখানে কাটাইয়া সস্ত্রীক শহরবাসী হইয়াছি। ভিটায় প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একটি লোককেও সেখানে রাখিয়া আসি নাই অর্থাৎ সেরূপ লোক পাওয়া যায় নাই। পেটের তাগিদের কাছে ভিটায় প্রদীপ দেওয়ার তাগিদ ক্রমশঃই ম্লান হইয়া আসিতেছে। নিজে বাঁচিলে ত ধর্ম্মকর্ম্ম! চারিদিকের ক্রমক্ষয়িষ্ণু প্রাচীরের পরিধিতে দুখানি মাত্র জীর্ণপ্রায় কোঠাঘর, উঠানটি একটু প্রশস্ত—কয়েকটি আম কাঁঠাল গাছে সেটি ছায়াময়। জন্মভিটার সম্পদের মধ্যে ঐটুকুই আছে। চুরির ভয়ে ভাঙ্গা ফুটা তৈজসপত্র প্রতিবেশীর গৃহজাত করিয়া ও পালিত গাভী দুইটিকে বিতরণ করিয়া দেশ ছাড়িয়াছি। আগলাইবার বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু অতিবর্ষণের ফলে ঐ জীর্ণ কোঠাঘর দুখানি যদিই দেহরক্ষা করে—ভবিষ্যতে মাথা গুঁজিব কোথায় সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াই এক বৎসর পরে জন্মপল্লীতে পা দিলাম।

শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে এই পল্লীর উপর বর্ষার আকাশ-চন্দ্রাতপখানিও বুঝি ছেঁদা হইয়া গিয়াছে, এখানেও অতিবর্ষণের ঘটা চলিয়াছে। অপরাহ্ণে গ্রামে পৌঁছিলাম, কিন্তু অপরাহ্ণের রূপ দেখিতে পাইলাম না। রুগ্ন ও ঘ্যানঘেনে ছেলের অপ্রীতিকর কণ্ঠস্বরের মত পীড়িতা প্রকৃতি

আসিয়া চোখের ভিতর দিয়া মনের দুয়ারে ঘা দিলেন। এই অপরাহ্ণেই চারিদিকে শঙ্খধ্বনি উঠিয়াছে। আঁচলের আড়ালে প্রদীপ ঢাকিয়া কোন দুঃসাহসিকা বধূ উঠানের তুলসীতলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই, শয়নগৃহের দুয়ার হইতে বাতাস-বাঁচানো প্রদীপটিকে সলজ্জ নববধূর মত ঈষৎ অবগুণ্ঠন তুলিয়াই বাহির দেখাইবার নিয়মটুকু রক্ষা করিয়া দেওয়ালের আড়ালে লইয়া যাইতেছেন। দুয়ারে জলধারা দেওয়ার কাজটুকু দেবতাই সারিয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের ভিজিবার সুবিধা যথেষ্ট তাঁহারা দুই বেলা রন্ধনের কাজ এক বেলাতেই সারিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা তাহা রাখেন নাই তাঁহারাও সন্ধ্যা-বন্দনার কাজ সারিয়া যত শীঘ্র সম্ভব সেইটুকু সারিয়া লইতেছেন।

জলে মাথা ভিজাইবার লোক পাড়াগাঁয়ে কম, জীর্ণ ছাতার অবস্থাও তাহাদের কাজ চালাইবার উপযোগী নহে, কাজেই অপরাহ্ণ বেলাতেই পথঘাট জনশূন্য। বৎসরবাদে গ্রামে ঢুকিয়া পুরাতন পরিচয়কে নূতন করিবার সুযোগ পাইলাম না। যাহা হউক, রাত্রির আহারের ভাবনা ব্যাগজাত করিয়া তবে শহর ছাড়িয়াছি অর্থাৎ পাউরুটি, মাখন ও চিনি ব্যাগের মধ্যে আছে। আছে টর্চ্চলাইট, মোমবাতি ও দেশলাই। একটা রাত জল না খাইয়া খুব থাকিতে পারিব, যদি বৃষ্টিদেবতা মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকুর উপর নির্ম্মমতা প্রকাশ করিয়া না থাকেন।

বাহিরের দরজায় যে মরিচাধরা তালা লাগানো ছিল চাবির সংযোগে তাহা খুলিল না, হাতের টানেই খসিয়া আসিল। কিন্তু খোলা দুয়ারের সম্মুখে একগলা জঙ্গল। উলু ঘাস ও কত রকমের আগাছার জঙ্গল। হাত দশেক ঠেলিতে পারিলে তবে না ঘরের রোয়াকে পৌঁছিতে পারিব। একবার মনে হইল, কাজ নাই এই দুশ্চেষ্টায়, কোন প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় লওয়া যাক্। আবার ভাবিলাম, এখনও ত সন্ধ্যার অন্ধকার নামে নাই—মেঘের অন্ধকার আছে বটে। আর নিকট প্রতিবেশীই বা কোথায়? যাহারা আছে তাহাদের ঘরের স্বল্পতার কথা ও ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কথাও তো কিছু কিছু জানি। তাহার উপর যা বর্ষার প্রকোপ! কেন তাহাদের অসুবিধা ঘটাইব। সুতরাং সাবধানে জঙ্গল ঠেলিয়া রোয়াকে আসিয়া উঠিলাম।

বাড়ী দেখিয়া প্রিয়-বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তির কথা মনে পড়িল। অশৌচকালে চুল দাড়ির প্রাচুর্য্যে ও দেহের অযত্নে মানুষ তো এমনই বিশ্রী হইয়া যায়! ঘরের শিকলে দামী তালাটাই লাগানো ছিল, খুলিবার জন্য বিশেষ কুস্তি-কসরতের প্রয়োজন হইল না। কিন্তু বন্ধ ঘরের ভাপ্‌সা গন্ধ নাসারন্ধ্রকে তীব্রভাবেই আক্রমণ করিল। ইঁদুর আরসুলার সর্ সর্ খড়্ খড়্ শব্দ ও চামচিকার ডানা মেলিবার প্রয়াস আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। একটা জানালা আধ-খোলা অবস্থায় ছিল; উই ও ইঁদুরে সেটির অর্দ্ধেক পাল্লা প্রায় উদরসাৎ করিয়া চামচিকা-বন্ধুর যাওয়া-আসার রাস্তাটি সুগম করিয়া দিয়াছে। কি জানি, চামচিকার সঙ্গে আরও কোন প্রাণঘাতী প্রাণী যদি গৃহমধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে! সভয়ে টর্চ্চটা জ্বালিলাম, একটা দেশলাই বাহির করিয়া মোমবাতিটাও জ্বালিলাম। অতঃপর টর্চ্চটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অনভ্যর্থিত আগন্তুকের অবস্থিতি অনুভব করিতে লাগিলাম। খোলা জানালা দিয়া চামচিকারা বাহির হইয়া গেল, ইঁদুররা কোথায় আত্মগোপন করিল, কয়েকটা আরসুলা আলো দেখিয়া ফাটা দেওয়ালের গা বাহিয়া কড়িকাঠের পানে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সাদা রঙের পরিপুষ্ট দুইটি টিকটিকির উজ্জ্বল চোখে লোভের প্রকাশ দেখিলাম। মোটের উপর বুঝিলাম, আমার এই অতর্কিত অনধিকারপ্রবেশে এখানকার বাসিন্দাগুলি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। টর্চ্চের আলো দেওয়ালে পড়ায় দেখিলাম দু-তিন হাত অন্তর গাঢ় কালো দাগ কড়িকাঠ হইতে মেঝে পর্য্যন্ত কে যেন টানিয়া দিয়াছে। বুঝিলাম ফাটা ছাদ পাইয়া বরুণ-দেবতা এই আলিপনা আঁকিয়াছেন। দেবতার অপটু হাতে রঙের খেলাটি জমিয়াছে ভাল! সুতরাং জীর্ণ তক্তাপোষটিকে ঘরের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিয়া তাঁহার ক্রীড়ানৈপুণ্যের বৃত্ত হইতে কিঞ্চিৎ নিরাপদ ব্যবধান সৃষ্টি করিলাম। গামছা দিয়া তক্তাপোষটিকে ঝাড়িয়া পরিশ্রান্ত দেহ ও সুটকেসটিকে তদুপরি রক্ষা করিলাম।

এইবার বাহিরের দিকে চাহিবার অবসর মিলিল। ঘরের মোমবাতি বাহিরের অন্ধকারকে সহসা গাঢ়তর করিয়া তুলিল। সেই অন্ধকারে উঠানের আম গাছ ও কাঁঠাল গাছ শাখাবাহু মেলিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াছে একটু গাঢ়ভাবেই। একটি বৎসরের পরমায়ুর আশ্রয়ে তাহাদিগকে অভিভাবকহীন দুরন্ত ছেলের মতই বোধ হইতেছে। উঠানে যা একটু আলো-বাতাস আসিত উহাদের ঘন পত্রগুচ্ছ সে-আলোককে আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। যদি বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতেই হয়—ওগুলির দুরন্তপনাকে কিছু শাসন করিতেই হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে বুক ঠেলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ও-গুলিকে যিনি পুঁতিয়াছিলেন তিনি আজ কোথায়? এই মরজগতের সকল সম্বন্ধ তিনি ছিন্ন করিয়াছেন, তথাপি এই বাড়ীর প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ চিহ্নে বহু সম্বন্ধই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। আজ একটি বৎসর হইল তিনি নাই। প্রকৃতির পরিবেশটি স্মৃতি-রোমন্থনের উপযুক্ত বটে। স্নিগ্ধ মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির রিমিঝিমি শব্দ, ঝড়ের দোলায় গাছের পাতা নড়িবার শব্দ, জনহীন পুরীতে সম্মুখে অত্যাসন্ন অন্ধকার রাত্রির প্রতীক্ষায় আমি একা। বাল্য হইতে যৌবনের এই প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত—সুখ, দুঃখ, আদর, লাঞ্ছনা, হাসিকান্না ও স্নেহসোহাগে সহসাই যে টলমল করিয়া উঠিতেছে। কোন্‌টাকে পিছনে ফেলিয়া কোন্‌টাকে তুলিয়া ধরিব!

মা আমার নাই—এ তো অতি নিষ্ঠুর সত্য। তবু কোন দুরন্ত ছেলেকে প্রহারের শব্দ কানে গেলেই মনটা কিসের প্রত্যাশায় মাতিয়া উঠে। সেই নিষ্ঠুর প্রহারের অন্তরালে মঙ্গল কামনার তীব্র ইচ্ছা, না, আর কিছু? যে-খাবারটি আমার স্ত্রীকে ভালবাসিয়া আনিয়া দিয়াছি, সামান্য মাত্র আস্বাদ লইয়া বেশীটুকু সে তৎক্ষণাৎ আমার ছেলের হাতে তুলিয়া দিয়াছে; স্ত্রীর স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া মুখে করিয়াছি ভর্ৎসনা, অন্তরে পাইয়াছি তৃপ্তি—মাকেই যেন নূতন করিয়া মনে পড়িয়াছে। কেন এমন হয়? সংসারের প্রত্যেক কাজে পুনরাবৃত্তি যেন অত্যন্ত বেশী। অথচ সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যে এতটুকু একঘেয়েমি তো মনকে পীড়া দেয় না।

উঠান অন্ধকার করিয়া আম গাছ কাঁঠাল গাছ পুঁতিবার মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্বের সুদূর তথ্য সেই স্নেহমুগ্ধার অন্তরকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে নাই। অভাবগ্রস্ত সংসারের কথাই তিনি ভাবিয়াছেন। গাছের দুটা ফলপাকুড় হইলে পাড়ার পাঁচজনকে বিলাইয়া নিজেদের অভাব ঘুচিবে এইটাই তিনি দেখিয়াছিলেন। তাই ভাল আমটি খাইয়া তাহার আঁঠিগুলি তাচ্ছিল্যভরে ছুড়িয়া ফেলিতেন না, ভাল কাঁঠালের বীজও অজস্র পুঁতিয়া গিয়াছেন। আমাদের দুরন্তপনায় কত আমগাছ যে জন্মমাত্রই ভেঁপুতে পরিণত হইয়া বৃক্ষলীলা সম্বরণ করিয়াছে, নহিলে আগাছার মত আম-কাঁঠালের জঙ্গলেও উঠান ভরিয়া উঠিত।

খোলা দুয়ারের গোড়ায় দুইটি জলজ্বলে চোখ দেখিয়া সহসা চমকাইয়া উঠিলাম। পড়ো ভিটায় স্নেহ জানাইতে এ-পর্য্যন্ত কেহ আসে নাই, তাই শৃগাল-বধূ বুঝি নব আগন্তুককে সলজ্জ উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে সরিয়া গেল। স্মৃতির যবনিকাখানি আপাততঃ ফেলিয়া দিয়া দুয়ার বন্ধ করিলাম। অতঃপর পাঁউরুটি মাখন সহযোগে আহার সারিলাম ও সুজনীখানা বিছাইয়া শয়ন করিলাম।

দৃষ্টি পড়িল, যেখানটায় কুলুঙ্গি ছিল তাহার নীচের। এই ঘরখানাতেই আমাদের বংশাবলীর যা-কিছু মাঙ্গলিক কর্ম্ম আজ শতবর্ষাধিক ধরিয়া চলিতেছে। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, নান্দীমুখ ইত্যাদির বসুধারা আঁকা দেওয়াল—হলুদ, সিঁদুর এবং ঘিয়ের দাগে চিত্রিত। ও-চিত্র আমার কাছে অমূল্য। ওই সপ্তধারার মধ্যে সাতপুরুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বংশের ধারাটিকে কত যুগ ধরিয়া ঐ সপ্তধারা যে বহন করিয়া ফিরিতেছে! কিন্তু বৃষ্টির অত্যাচারে ওটুকু বুঝি আর থাকে না। ঘর মেরামত করিতে হইবে—পুরাতন সমস্ত কিছুর বিলোপ ঘটিবে। ঐ পাতলা ইট থাকিবে না, আলকাতরা-মাখা ফোঁপরা কড়ি-বরগা থাকিবে না, কড়ির পিঠে ঐ যে খড়ি দিয়া লেখা কতকগুলি সন তারিখ রহিয়াছে ওগুলিও তো থাকিবে না। ঐ সব স্মৃতির শেষ সাক্ষ্য—শুধু আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব—ভারাক্রান্ত অন্তরে ধরিয়া রাখিব। নূতন ঘরে নূতন ছেলেরা নূতন জিনিষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবে। উঠানের গাছগুলিতে আমি যে মমতাময়ীকে প্রত্যক্ষ করিতেছি ভাবীবংশধরেরা ওগুলি দেখিয়া স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় হয়ত বা শিহরিয়া উঠিবে। একটি গৃহের স্মৃতি তখন মানুষের স্মৃতিসমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে।

তন্দ্রার ঘোর হঠাৎ কাটিয়া গেল। রাত্রি নিশ্চয় গভীর হইয়াছে। বাহিরের অন্ধকার ঘরের অন্ধকারকে গ্রাস করিয়াছে, মোমবাতিটা পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বাহিরে গাছের পাতায় বৃষ্টিধারা পতনের ধ্বনি অবিরাম চলিতেছে, ঘরের মধ্যে সর্ সর্ খড়্ খড়্ শব্দেরও বিরাম নাই। রোয়াকে কাহার সন্তর্পিত পদশব্দ শোনা যায়। চারিদিকে ফিস্‌ফাস্ কানাকানি—মধ্যরাত্রির প্রকৃতি যেন গম গম করিতেছে। সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। শিয়রে টর্চটা রাখিয়াছিলাম, আড়ষ্ট হাত উঠাইয়া জ্বালিতে পারিলাম কই? অন্ধকারে চক্ষুও চাহিতে পারিলাম না। এক মুহূর্ত্তে জীবন-রাজ্যের বিপরীত দিকে চলিয়া গেলাম।

এই ঘরের মেঝের উপর অবরুদ্ধ শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বৎসর পূর্ব্বে কায়মনোবাক্যে নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম। মাতৃবিয়োগ-বেদনা সেদিন অতি তীব্র হইয়া বাজিয়াছিল। সেদিনও এমনই বৃষ্টি পড়িতেছিল, এমনই রাত্রি গভীর হইয়াছিল, এক প্রদীপ তৈল থাকিতেও

দমকা বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া গিয়া দুর্লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কই, মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়াও সেদিন তো ভয়ে সারাদেহে রোমাঞ্চ জাগে নাই! তীব্র একটা অনুভূতির প্লাবনে আর সব বৃত্তিই বুঝি ডুবিয়া গিয়াছিল। আজ সেই বহুদিনবিস্মৃত মৃত্যুকে নূতন পরিচয়ের সঙ্গে স্বাগতঃ জানাইতেছি কেন? এক হাতে তাহাকে দূরে ঠেলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, অন্য হাতে নিজেরই অলক্ষ্যে তাহাকে বুকের কাছে টানিতেছি। মাকে আর স্নেহময়ী ভাবিতে পারিতেছি না। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে বৃষ্টি ও অন্ধকারের সুযোগ লইয়া অত্যন্ত নিরিবিলিতে তিনি কি সন্তানকে স্নেহ জানাইতে আসিতেছেন? প্রেতলোকেও কি নরলোকের মায়ামমতার বিস্মৃতপ্রায় ধ্বনি—কোন একটি অনির্ব্বচনীয় মুহূর্ত্তে বাজিয়া উঠে? জীবন ও মৃত্যু দুটি পারে বিচ্ছেদের দুস্তর সমুদ্র; তাহার উপর সেতু-বন্ধন কি সম্ভব? কোনকালে পারলৌকিক তত্ত্বে অস্তিত্ববান ছিলাম না। দিনের আলোয় অথবা বন্ধুপরিজন-পরিবৃত অবস্থায় যাহা অগ্রাহ্য করিবার বল মনে যথেষ্ট ছিল, রাত্রির প্রহরে তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ভয়? ভয়ই তো এই সব অলীক বিশ্বাসের ভিত্তিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া তুলে। এই অন্ধকার আর ঘণ্টা কয়েক পরে থাকিবে না, বৃষ্টি থামিয়া যাইবে, বদ্ধমূল ধারণাও সঙ্গে সঙ্গে অমূলক প্রমাণিত হইবে। বাহিরের ফিস্‌ফিসানি ও রাত্রির একটি অকথিত বাণী; মহাশূন্যে ধ্বনির তরঙ্গাঘাতে ওই থমথমে আওয়াজ উঠিতেছে—বৃষ্টির বেগে ইথর-তরঙ্গ বুঝি প্রতিহত হইতেছে; মেঘের ঘর্ষণে বিদ্যুতের শব্দহীন বিকাশেও ও-ধ্বনি উঠা বিচিত্র নহে। নিস্তব্ধ রাত্রিতে দূরে একটি পাতা পড়িলে সে-শব্দও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। ইঁদুরের খড়্‌খড়্ শব্দে অনেক সাহসীই তো ভূত-ভয়গ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে—শোনা যায়!

এমনই বাদল-রাত্রিতে—এই ঘরের পর্য্যঙ্কে আর একটি সুখ-স্মৃতির কল্পনা তো করিতে পারি। অপ্রচুর শয্যার মধ্যে যাহার হাতে প্রথম হাত রাখিয়া সর্ব্বপ্রথম পরিচয়ের একটি মধুরতম বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। সেদিনও তো নির্ব্বাপিত দীপ কক্ষে—গভীর রাত্রিতে—চারি দিকের খড়্‌খড়্ ধ্বনির তালে তাল রাখিয়া এই মৃত্যুতুল্য প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের নব জীবনের উদ্বোধন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলাম। সে-দিন—আর এই দিন! শস্তা গন্ধ তৈলের গন্ধে সেদিনকার কক্ষ ছিল ভারাক্রান্ত। মনের ভার বুঝি তাহাতেই মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সেদিনের পর আরও বহু বাদলরাত্রি আসিয়াছে, বহুদিন রোমাঞ্চিত দেহে প্রিয়া সান্নিধ্য উপভোগ করিয়াছি; বহুদিনই আলোর চেয়ে অন্ধকারকে মনে হইয়াছে প্রিয়তর। চিত্তের দৌর্ব্বল্যকে প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র অন্ধকার যেমন নিপুণ ভাবে ও সুন্দর ভাবে রচনা করিতে পারে, যেমন সহজ বার্ত্তাটি দিয়া এক নিমিষে অপরিচয়ের গণ্ডী উত্তীর্ণ করিয়া দেয়—রসঘন সেই মুহূর্ত্ত-গুলি গড়িতে আলোকের সে দক্ষতা কোথায়?

কিন্তু আবার খড়্‌খড়্ শব্দ ও চাপা ফিসফিসানিতে মধুর চিন্তার জাল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। জীবনের স্মৃতি দিয়া মরণের কাহিনীকে তো জয় করিতে পারিতেছি না। মা যেন আসিয়াছেন। শিয়রে দাঁড়াইয়া অপলক অতন্দ্র স্নেহস্নিগ্ধ দুটি আঁখি মেলিয়াছেন। সন্তানের ক্লিষ্টতায় ও আশঙ্কায় ব্যথা পাইয়া মুখে তাঁহার চিন্তার কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনে যাহা প্রিয়তর ছিল, মৃত্যুর পর-পারে পৌঁছিয়াই তাহা ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে—সেই জন্য বুঝি বেদনাবোধ! যেন বলিতেছেন: তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুকে ভয় করিবে কেন? যুগ যুগ ধরিয়া দুর্গম পথ-যাত্রায়ই তো তোমাদের সার্থকতা। পঞ্চভূতের সমষ্টি এই দেহ—পঞ্চভূতেই মিশিয়া যাইবে। যে-সমুদ্রে তরঙ্গ জন্মায় সেই সমুদ্রেই তাহা গ্রাস করিয়া লয়! সৃষ্টি ও লয় পাশাপাশি চলিতেছে; একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না। জন্মের পিছনে যদি মৃত্যুর পটভূমি না থাকিত তো জীবনের অর্থ খুঁজিয়া এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার করিতে যাইবে কেন? মৃত্যুর মত এমন গতিবান্ ও প্রাণ-ধর্ম্মী আর একটি প্রশ্নও আজ অবধি কোন মানবই করিতে পারিল না।

একটা দমকা বাতাস বাহিরে উঠিল, বৃষ্টি একটু জোরে চাপিয়া আসিল। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে অসাড়তা ও শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল তাহাও যেন এই দমকা বাতাসে খানিকটা কাটিয়া গেল। নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকার রাজ্য হইতে চৈতন্যের প্রথম সোপানে যেন পা দিলাম।

মাকে মনে পড়িতে লাগিল। এই ভয়ঙ্করী রাত্রির মধ্যযামে কায়াহীনা সন্তানস্নেহমুগ্ধা শঙ্কাপ্রদায়িনী রূপে নহে; মরজগতের বৎসর-বিস্মৃত সেই মূর্ত্তিকেই ধ্যানের সামগ্রী করিলাম। পঞ্চভূতে গড়া সেই দেহ, প্রতি অঙ্গের আজন্ম পরিচিত ছবি। হায় রে, সুসম্পূর্ণ সেই মূর্ত্তি নিখুঁত আলোক-চিত্রের মত তো ফুটিয়া উঠিতেছে না। তাঁর গাত্রবর্ণের কল্পনা করিতেছি, কল্পনা করিতেছি সেই উন্নত সরল নাসিকা, প্রসন্নতা ভরা দুটি চোখ, পাতলা ঠোঁটের স্ফুরণ, চিবুকের আঁচিল, কপালের কাটা দাগ, মাথার ঘনকৃষ্ণ চুল, সবল

সুঠাম ঋজু দেহ, স্বাস্থ্যভরা হাত-পা। কল্পনায় একের পর একটি ভাসিয়া আসিতেছে, সমস্তগুলি মিলাইতে গিয়াই খেই হারাইয়া যাইতেছে। ঠিক তিনি যেমন ছিলেন—তেমনটি তাঁহাকে চিন্তার রাজ্যে পাইতেছি না কেন? তাঁহার কথাগুলি মনে আছে, ধ্বনি নাই। সান্ত্বনা তিনি বহু বার দিয়াছেন, আজ সে সান্ত্বনার কথা মনে পড়িয়া সেখানে তুফানই তুলিতেছে। প্রিয়জনের কায়া এক বার চিতার আগুনে ভস্মীভূত হইলে আর বুঝি বাহিরের চোখের সাধ্য নাই সেটিকে নিখুঁত ভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার। তখন অন্তরের নয়ন মেলিয়া হারানো প্রিয়জনকে দেখিতে হয়। কিন্তু অন্তরের চক্ষু শুধু তো বাহিরের রূপটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, সেখানে মনের তারে তারে অহরহ বার্ত্তা চয়ন চলিতেছে। সেখানে পঞ্চভূতে গড়া দেহের সাড়া মিলানো কঠিন। তাই মা'র চোখের চেয়ে সেখানকার প্রসন্নতাকেই বেশী করিয়া দেখিতেছি; ওষ্ঠের কম্পনে মমতার প্রকাশ অনুভব করিতেছি; গাত্রবর্ণের গৌরত্বে, চিবুকের আঁচিলে ও কপালের কাটা দাগে কত না স্নেহমাখা কাহিনীর প্রকাশ! তাঁর অস্পষ্ট মূর্ত্তির সঙ্গে সুস্পষ্ট জাগতিক সম্বন্ধগুলির সংযোগ ঘটিয়া বর্ণে ও স্নেহে, সৌন্দর্য্যে ও ভালবাসায়, জরা-হীনতায় ও উদ্বেগে—সম্পূর্ণ এক মায়ের সান্নিধ্যই উপভোগ করিতেছি। জীবনের জগতে কোন মূর্ত্তিই তো সম্পূর্ণ নহে। আলো প্রখর হইলে আলোকচিত্রের অস্পষ্টতা নাকি আসেই।

গাছের ডালে পাখীর ডানা ঝট্‌পট্‌ শুনিলাম, চৈতন্যের দ্বিতীয় সোপানে পৌঁছিয়াই মনে হইল, রাত্রি বুঝি শেষ হইয়া আসিল। এখনই সকাল হইয়া যাইবে। মিথ্যা ভৌতিক ভয়ে অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় রাত্রি কাটাইলাম। একটু ঘুমাইয়া লই। সকালে উঠিয়া অনেক কাজ করিতে হইবে, আলস্য সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে না। মা যদি আসিয়া থাকেন, উষার অস্ফুট আলোয় স্নেহময়ী মায়ের মতই আসুন। রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত সন্তানের চোখে ঘুম দিবার জন্য অলক্ষিত দুই করের মৃদু চাপড় দিয়া তরল তন্দ্রাকে গাঢ়তর করিয়াই তুলুন। আলো আসিতেছে—ভয় কি?

ভাঙা জানালা দিয়া অনেকখানি চড়া রোদ বিছানায় আসিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল। বাহিরের আকাশ মেঘমুক্ত, বৃষ্টিস্নাত আম-কাঁঠালের পাতায় রোদ চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। প্রকৃতি নবজীবন পাইয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছেন। কি বিশ্রী ঘরের দেওয়াল! ফাটা এবং ভিজা স্যাঁতসেঁতে। মাথার উপরে একখানি বরগা আধখোলা অবস্থায় ছাদের কয়েকখানি পতনোন্মুখ ইঁটকে কোনক্রমে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। খোয়া-ওঠা মেঝে আরসুলা ও ইঁদুরের নাদিতে ভর্ত্তি; চারিদিকে একটা দুর্গন্ধ। আশ্চর্য্য, কাল নির্ব্বিচারে প্রাণসংশয় জানিয়াও এই পতনোন্মুখ ঘরে কি করিয়া রাত্রিযাপন করিলাম!

স্থির করিলাম, এই দণ্ডে মিস্ত্রি ডাকাইয়া গৃহসংস্কারের ব্যবস্থা করিব। হইতে পারে পুরাতন স্মৃতি মানুষের বহু-মূল্য সম্পত্তি, কিন্তু মানুষের আয়ুর মূল্যও তাহার চেয়ে অনেক বেশী। প্রদীপের শিখা নিবিয়া গেলে—শুধু তেল, সলিতা ও মৃৎভাণ্ড লইয়া কাহার প্রয়োজন কতটুকু মিটিতে পারে!

আলোচনা

গত কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"তে স্বর্গগতা শ্রীমতী নলিনী নাগের খাতা-সংগ্রহ পুস্তক থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের যে দুটি কবিতা উদ্ধৃত ক'রেছিলাম, তার প্রথমটি কবির "কণিকা" পুস্তকে আছে এবং দ্বিতীয়টি "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত হ'য়েছিল, অবগত হয়েছি।—"প্রবাসী"র সম্পাদক।

শেষ লেখা

(পূর্বানুবৃত্তি)

"শেষ লেখা"য় সংসারকে কাছে দূরে মিলিয়ে দেখানো হয়েছে। মাটির আঙনে রূপনাট্য চলেছে জীবনমৃত্যুকে নিয়ে। চন্দ্র সূর্য জ্বলছে উপরে। মানুষের অন্তরেও নানা বহ্নির আলোক, দুঃখে সুখে প্রকাশমান; চতুর্দিকে বৃক্ষলতার শ্যামল সংসার। কোথায় একটি অখণ্ড আনন্দের যোগ রয়েছে তারি সৌরজ্যোতির্ময় ছন্দে চৈতন্য জেগে ওঠে। সপ্তম কবিতাটিতে এই সর্বলোকসমন্বিত সনাতন নাট্যের বর্ণনা আছে। কবি বলছেন, অজ্ঞেয় রহস্যের পথ দিয়ে এল জীবন; অভিনয় জমে উঠল।

প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তারে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি' আলোকের অভিষেক-ধারা।

সঙ্গে সঙ্গে জাগছে প্রত্যুত্তর;

সে-জীবন বাণী দিল দিবস রাত্রিরে
রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,
আরতির দীপ দিল জ্বালি
নিঃশব্দ প্রহরে।
চিত্ত তা'রে নিবেদিল
জন্মের প্রথম ভালোবাসা।

এই প্রথম ভালোবাসার শেষ নেই। দেওয়া-নেওয়ার পালায় মৃত্যু পট মুছে দিচ্ছে, নূতনকে আনবার ভূমিকায়। কোথাও বা কবি মৃত্যুকে বলছেন "উদাসীন চিত্রকর", বর্ণরেখার উপর হঠাৎ কালো কালির প্রলেপ দিয়ে সে খুসি। কিন্তু ছবির সবটা কি সে লুপ্ত করে? "কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি।" সোনার অক্ষরে আঁকা থাকে:

প্রিয়ারে বেসেছি ভালো
বেসেছি ফুলের মঞ্জরীকে।

পরবর্তী কবিতাটিতে প্রেমের পূর্ণতার কথা আছে। পুষ্পিত চিত্তের কেন্দ্রে নবীন মাধুরী ধীরে ধীরে ফলদাক্ষিণ্যে পরিণত হয়; যা ছিল একান্ত দুজনের তারই নূতন রূপ দেখা দেয় বিশ্বজনীন মানবকে আতিথ্য দানের আনন্দে। হৃদয়মাঙ্গলিক তখন কেবলমাত্র দুটি প্রেমিকের আত্মগত নয়, তাকে স্পর্শ করে প্রকাশের "সুবর্ণ-বিভা"; স্তরে স্তরে দেবার ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। "সংবৃত সুমন্দ গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে"; "সংযত শোভায়", সে, "পথিকের নয়ন লোভায়।" বাহিরে ঘরে হৃদয়ের মুক্ত সম্বন্ধ স্থাপনাতেই প্রেমের ঐশ্বর্য।

শেষ লেখার অতৃপ্ত চোখে প্রাণের সকল দৃশ্যকে কবি বিশেষ একটি সচেতন বর্ণ দিয়েছেন। মৃত্যুর জানলা দিয়ে জীবনকে জানবার কবিতা লিখেছিলেন কত দিন, কৈশোর কাল হতেই অস্তিমোজ্জ্বল প্রাণের স্বরূপকে বরেণ্য মন্ত্র শুনিয়েছেন। কিন্তু প্রভেদ আছে। এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র মাধুর্যলিপিগুলিতে অবসানের বিশেষ প্রসঙ্গ অনুভব করা যায়, কোথাও বা দেহান্তের আসন্নতা স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে। "ভোরের আলোর মিতা" পাখিকে, কবি গান শোনাতে বলছেন; তাঁর হয়ে যেন অরুণ দিগন্তে সুর মেলায়। তাঁর আপন কণ্ঠে তখন দুর্বলতা, "দুঃখরাতের স্বপনতলে" যা জমে উঠেছে তা জানাবার শক্তি নেই। অথচ অন্তরে এসেছে সূর্যোদয়।

জাগরণের লক্ষ্মী যে ওই
আমার শিয়রেতে
আছে আঁচল পেতে,
জানিস নে তুই কি তা।

প্রত্যহ ভোরে যে-পাখি "নবীন প্রাণের গীতা" শুনিয়েছিল, তাঁর জীবনের কোন্ গহনে সে নীরব হয়ে রইল। এ রকমের রূপক স্বচ্ছ হয়ে পাঠকের চিত্তে প্রকাশ পায়।

গানের সুরে রচনা ক'রে লেখাটিকে পরে পৃথক ছন্দের এই কবিতার আকার দেন।

পূর্বে বলেছি "শেষ লেখার" অন্তে দেখা দিয়েছে একটি নির্ব্যক্তিক লক্ষণ। অর্থাৎ নিরীক্ষণ করছেন যিনি তাঁর

কথা প্রায় নেই। আপন জীবনের ইঙ্গিতে সমুজ্জ্বল যে-দু-চারটি কবিতা এখানে আছে তাতে সেই মূল সুরের ভূমিকা প্রস্তুত হয়েছে। তার পরে ধীরে ধীরে সর্বশেষ রচনায় ব্যক্তিলেশহীন বিরলতা পূর্ণ হয়ে উঠল, দেহ-দুঃখের তপস্যা প্রাণচ্ছবির প্রাসঙ্গিকতায় পরিণত হল। "শেষ লেখা"র সমাপন সেইখানে। কিন্তু পঞ্চম এবং দশম কবিতা দুটি কবির আত্মকথাশ্রয়ী। সুখস্মৃতির মুহূর্তে বিদেশে-পাওয়া সামান্য একটি উপহারের চিরবাসন্তী সৌরভ নিয়ে এল। জীবনে যা-কিছু হারিয়েছে তাকে ফিরে পাবার লগ্ন এসেছে মহানিঃশব্দতার বুকে। অন্য কবিতাটি বিদায়ের। আত্মীয় বন্ধুর কাছে স্মরণলোকের পাথেয় ভ'রে নিতে চান "মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে।" জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রসাদ হবে মানুষেরই দান। বলছেন, ঝুলি আমার শূন্য, যা-কিছু দেবার ছিল উজাড় ক'রে দিয়েছি। এখন,

প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে॥

(২)

পরিশেষে "বাণীর মূরতি গড়ি" রচনার উল্লেখ করতে চাই। "তাজমহল"-এর শেষ অংশের মতো এই কবিতার নিহিতার্থ দুরূহ সুগভীর। মহাকালের মধ্যে মানুষের সৃজনীয়মান সত্তার পরিচয় তার কীর্তির চেয়ে সত্য। মানুষের দুই সৃষ্টি-ধারার মিল কোথায়, দুয়ের যোগ কী ভাবে বৃহত্তর ভূমিকায় দেখা দেয় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিগত বিচার নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। শিল্পী যা রেখে যান তাতে নিত্যের দাবী নেই এই কথা দুটি কবিতায় এক। কিন্তু ঐটুকু মিল। বৈরাগ্যের শান্ত হাওয়া পৃথিবীকে ঘিরে বহমান; ধূলি ওঠে মর্ত্য-সৃষ্টির বিলয়লীলায়; তারি কাহিনী এই কবিতার অন্তর্গত। নব নব পূর্বাচলের আলোকে মৃত্যুহীন মানুষের যাত্রার সঙ্গীত বেজেছে "বলাকা"র কবিতাটিতে।

মাটিতে গড়া "বাণীর মূরতি" কালের আপেক্ষিকতায় মৃৎপিণ্ডের চেয়ে অনশ্বর, কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টিও ধূলিতেই পরিণাম লাভ করে। আপন রচনা সম্বন্ধে কারিগরের মোহকে কবি দুঃসহ সত্যে বিদীর্ণ করলেন। কিন্তু তাতে তাঁ'র শিল্পীর চেতনা আহত হয় না। "বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে" কীর্তির ধ্বংসকে মেনে নেবার শক্তি চাই। স্থায়িত্বের অভিমানে যদি সে মূর্তি রচনা করে বা সংসার তার রচনাকে চিরস্থায়ী ভ্রম ক'রে মূল্য দিতে চায় তবেই অসত্য, সেইখানে অশান্তি। রূপকারের সৃষ্টি প্রাকৃতিক বস্তুর চেয়ে ব্যাপকতর কাল জুড়ে থাকে-না-থাকে তার উপরে মূল্যের নির্ভরতা নেই। বরঞ্চ ভুল-অমরত্বের দাবীই লজ্জাকর। পৃথিবীতে কোনো বিশেষ কারুসৃষ্টি চিরদিন সমাদর পাবে না। সভ্যতার পরিবর্তধারায় মনের আকাশ বদলায়; যা ছিল আদরণীয়, স'রে যায় অবহেলার প্রান্তে। তখন কে ভেবে দেখবে পূর্বযুগে রচিত মূর্তি শিল্পীর কোন্ ধ্যানকে রূপ দিতে চেয়েছিল। বিস্মৃত অধিকারকে প্রমাণিত করবার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। প্রকৃতির জগতে এমনতর ব্যর্থ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় না। গর্বিত মাটির মূর্তির চেয়ে মূর্তির নিয়ে বিক্ষিপ্ত অব্যবহৃত মাটির পিণ্ডের তাই গৌরব বেশি।

বাণীর মূরতি গড়ছেন কবি একমনে, নির্জন প্রাঙ্গণে বসে, কিন্তু মোহকে রাখতে চান নি। গড়বার শেষে একদিন তাঁর রূপরচনাগুলি বস্তুর পরিণামে মিশবে "আদিম আত্মীয় ... ধূলি"তে। এই ভালো। কেননা তাই হবার; এতে তাঁর ক্ষোভ নেই, শান্তি আছে। কালের চরণক্ষেপে, পদাঘাতে পদাঘাতে, মাটির ধন মাটি হোক্।

অনাসক্তির এমনতর পূর্ণস্বরূপতা রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতায় নেই। তাঁর "গানের গান" কয়েকটিতে সৃষ্টির আনন্দময় ঔদাসীন্যের ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু সেই গান-গুলিতে সুরের যোগে ব্যাপ্ত বেদনা উদ্ভাসিত হ'য়েছে; —এই কবিতাটিতে অভিমানের শেষ চিহ্নটুকু নেই। হৃদয়-বৃত্তির মণ্ডল হতে দূরে গিয়ে প্রজ্বালিত হয়েছে নির্মোহ বহ্নি। কিন্তু বৈরাগ্য এই কবিতার শেষ কথা নয়। বৈরাগ্যকে ধারণ করছে কোন্ শক্তি? আবির্ভাবকে এবং অবসানকে চিত্রবৎ দেখবার সমগ্রতা কোন্‌খানে? ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি শিল্পদৃষ্টের অঙ্গীভূত হয়েছে মহাপ্রাণের পটে। সেই প্রাণ যা স্থায়িত্ব অনস্তিত্বের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দিত নৃত্যপরা; আদি এবং অন্তের অনাদ্যন্ত। এ'কে বলা যায় সর্বময় দৃষ্টির রূপদর্শন। সর্বশেষ কবিতা দুটিতে সমস্ত সূত্র এক জায়গায় বাঁধা হয়েছে। সৃষ্টির ছলনা বাঁধবে না অন্তরপথযাত্রীকে; স্রষ্টার শেষ পুরস্কার সে নিয়ে যায় ধ্রুবনির্দেশ চলার পথে।

শ্রেষ্ঠ কাব্যে তত্ত্ব বা ভাব অন্য উপকরণের মধ্যে একটি উপকরণ। স্বতন্ত্র ক'রে কবিতার অর্থ আলোচনা করা

চলে যেমন তার ছন্দ, ঝঙ্কার, প্রসাধনের আলোচনা অসঙ্গত নয়। কিন্তু "শেষ লেখা"র সৃষ্টি ভাবকে এবং ছন্দকে অতিক্রম ক'রে যেখানে ব্যঞ্জনাময় তারই সন্ধান জানা চাই। দীর্ঘকাল ধরে জনচৈতন্যের বাসনায় এই কবিতাগুলি নূতন নূতন আবিষ্কৃত হবে। সাময়িকদের সকল আলোচনা কেবলমাত্র একটি কক্ষের আবর্তন তা জেনেই আজ আমরা এই জ্যোতিঃশিল্পকে অন্তরে গ্রহণ করব।

ত্রিপুরার রাজবংশ ও রবীন্দ্রনাথ

১

ত্রিপুরার রাজবংশের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের পরিচয় ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহুপূর্বে। কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখে গেছেন, ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজা বাহাদুরের প্রপিতামহ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পিতা মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কল্‌কাতায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যার্থী হন। দ্বারকানাথ তখনকার কল্‌কাতার সমাজের এবং রাজনৈতিক সব ব্যাপারের নেতা ছিলেন। তাঁর সহায়তায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর সে-যাত্রা সফলকাম হ'য়ে ত্রিপুরা প্রত্যাগমন করেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বোধ হয় এই প্রথম পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের সহিত এই রাজবংশের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরম্ভ হয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়ের আমলে। তার বৃত্তান্ত তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে এবং আগরতলার কিশোর সমাজে ১৩৩২ সালের তাঁর একটি বক্তৃতাতে আছে। এ বিষয়ে কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন :—

প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়-বিরহে শোকাকুল হইয়া পড়ে। তখন তিনি বিরহীর মর্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিতেছিলেন। এমনি সময়ে কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া "ভগ্ন হৃদয়" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত 'ভগ্ন হৃদয়ে'র কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচা লেখার মধ্যেও তাঁহার অনাগত বিশ্ববিমোহন কাব্যপ্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে প্রেরণ করেন, 'ভগ্ন হৃদয়' কাব্যগ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত মহারাজ বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবন-স্মৃতি"তে লিখিয়াছেন :—

"মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে, এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক এ ঘটনা রবিবাবুর পক্ষে অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়-উৎপাদক হইয়াছিল। বাংলার রাজা বাংলার এই কবিকে কিশোর বয়সেই এরূপ অযাচিত সম্মান দান করিলেন, ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা বলিতে হইবে। শাস্ত্র বলে ;—

গুণী গুণ বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।

মহারাজা বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন; তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতেন তার নিম্নমুদ্রিত বর্ণনা মহিমচন্দ্রের প্রবন্ধে আছে।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় যখনই যাইতেন, তখনই রবিবাবুকে ডাকাইয়া আনিতেন। বয়সে এই দুই কবির বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও বীরচন্দ্র বাৎসল্যভাবে কিশোর সৌম্যদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের নিকট কবিতা পাঠ বিশেষতঃ গান করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বীরচন্দ্রের স্বভাবসুলভ উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইত। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে রুগ্ন মহারাজ বীরচন্দ্রকে লইয়া কার্সিয়াংএ গমন করি, তখন মহারাজ, কবি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তখনকার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। রাত্র প্রায় ১০টা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন; বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন। আলোচনান্তে প্রতি রাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র অসুস্থ, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্যমুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন, এ কথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি এক দিন, মহারাজ অনর্থক কেন কষ্ট করিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগুয়াইয়া দেন এরূপ অনুযোগ করিলেন। তখন বীরচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "রবিবাবু, পাছে অলসতা আসিয়া কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সেই ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না।" পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের এরূপ ব্যবহার দর্শন এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া রবিবাবু বলিতেন, "আমি অভিজাত-বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।"
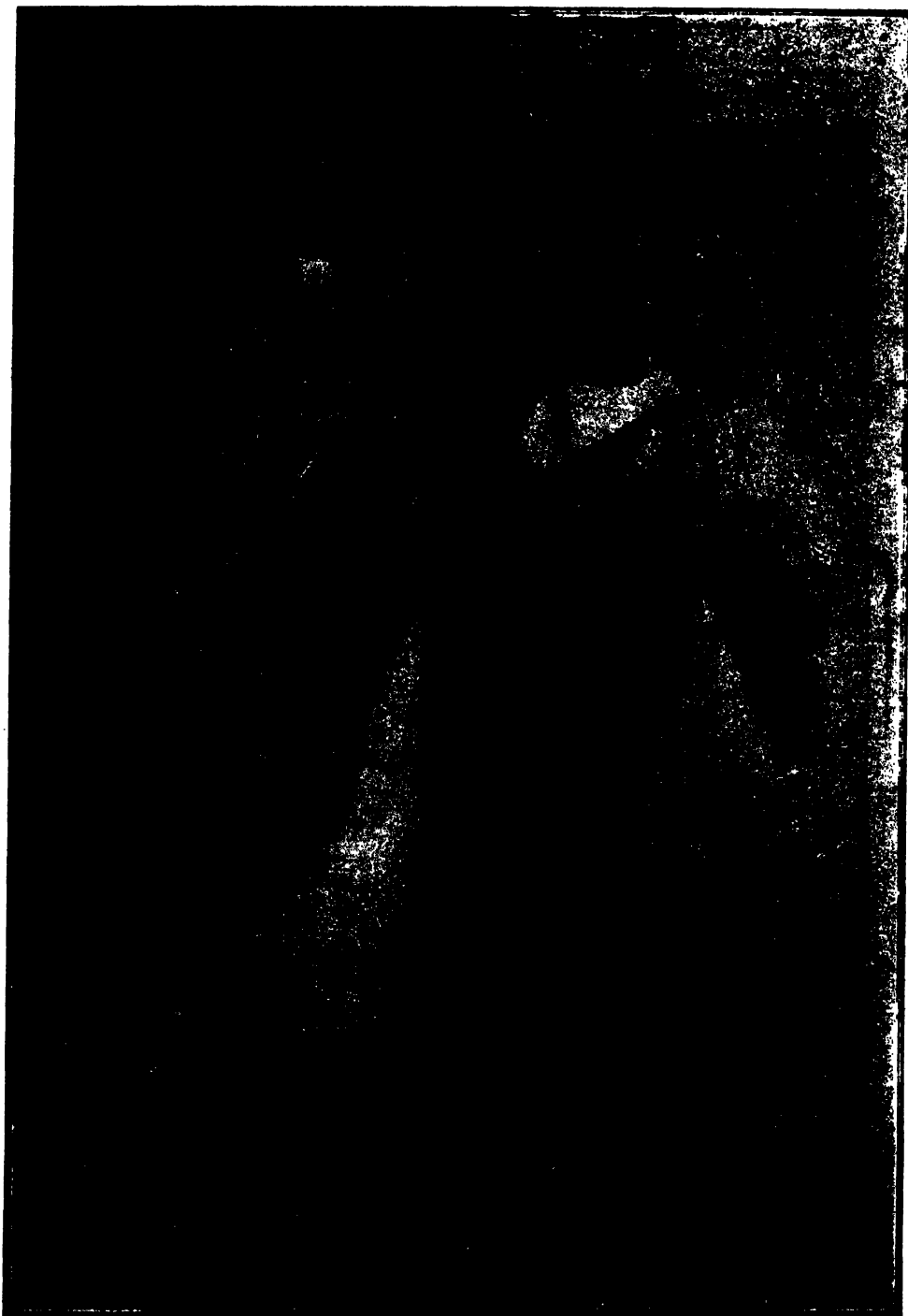
রবীন্দ্রনাথ ও মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্মা

Tehranএ জন্মদিন
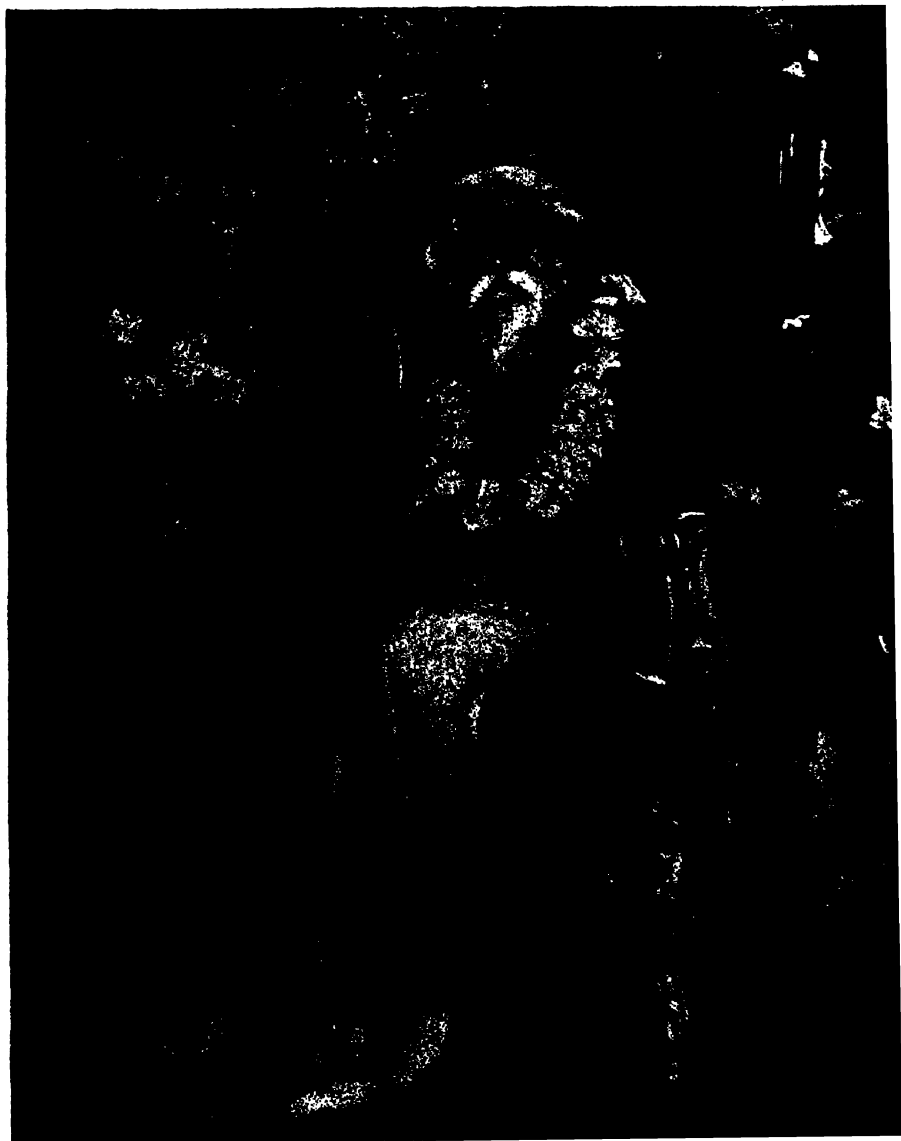
বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভার একটি রত্নের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া রবিবাবুকে বলিতে শুনিয়াছি; তিনি ছিলেন রাধারমণ ঘোষ। রবিবাবু রাধারমণবাবুকে লইয়া বৈষ্ণব দর্শন এবং পদাবলী আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন Photo তুলিয়া প্রায় ১টার সময় বাসায় আসিয়া দেখিলাম, রাধারমণবাবু ও রবিবাবু আলাপে তন্ময় হইয়া আছেন। তখন বৈষ্ণব দর্শন সহিত এমার্সনের (Emerson-এর) লেখার তুলনামূলক আলোচনা চলিতেছিল। আমি আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দিলাম; কারণ, আমার উদরে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবিবাবুকে সে আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল। ভাবে বুঝিলাম, এই শীর্ণকায় রাধারমণ ঘোষ তাঁহাকে বেশ পাইয়া বসিয়াছেন। রবিবাবু, রাধারমণের গভীর পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বৈষ্ণব দর্শন পাঠ করিতে হইবে এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বেড়াইতে বাহির হইলে রবিবাবু মহারাজ বীরচন্দ্র এবং তাঁহার সহচর রাধারমণের প্রসঙ্গ অনর্গল আলোচনা করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় রবিবাবুর গুণ গ্রহণ করিবার শক্তির প্রখরতা।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় দেহত্যাগ করিলেন।

১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় 'কিশোরসমাজে' সম্বর্ধিত হ'য়ে যে বক্তৃতা করেন, তাতে তাঁর ত্রিপুরা-রাজবংশের সহিত প্রথম পরিচয়ের ও পরবর্তী ঘনিষ্ঠতার কথা তিনি বলেছিলেন। আগরতলার অধুনালুপ্ত 'রবি' পত্রিকা থেকে সেই বক্তৃতাটি নিচে উদ্ধৃত হ'ল।

এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্প বয়সে। সদ্য England থেকে ফিরে এসেছি; তখন একখানি মাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। বাল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি থাকায়, পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই।

সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন—তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবি-রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এর পর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ করে "রাজর্ষি" লিখিবার সময়ে "রাজমালা" থেকে সংকৃত, বিবরণগুলি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দ মাণিক্যের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলুম।

তিনি কার্সিয়াংএ যা'বার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ, আদর আমার প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কত দূর সঙ্কোচের ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেবল মাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল।

তিনি যে আমার কাছে আবৃত্তি ও সঙ্গীত আলাপ শুনেই আমাকে স্নেহাই দিতেন তা নয়; তিনি তাঁর বিষয়কর্ম্মেও আমার শক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।
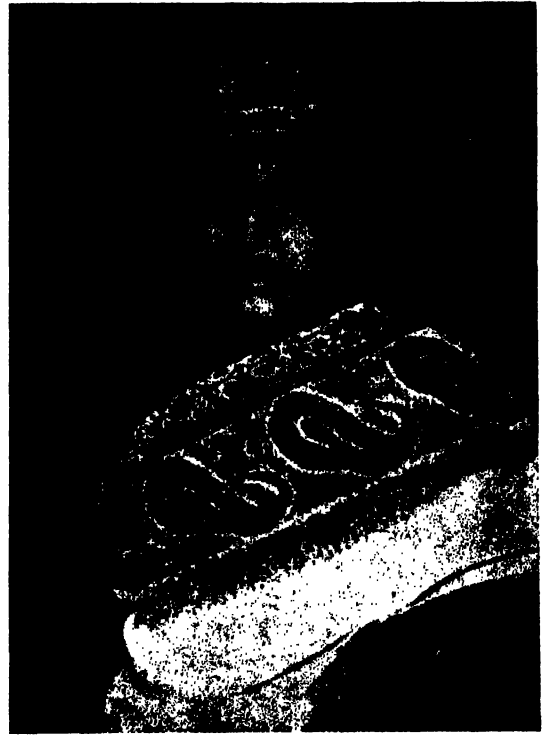
মহারাজ বীরচন্দ্র দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর, স্বাধীন ত্রিপুরা

(ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মণ-প্রণীত "দেশীয় রাজা," ১ম ভাগ হইতে)

জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন বা সহজে চোখে পড়ে না তা'কেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা রকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারে নি।

বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য আমার প্রতি তাঁর পিতৃদত্ত সমাদরের ধারাকে রক্ষা করেছিলেন। অকৃত্রিম স্নেহে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেদিন রাজার হাত থেকে যখন কবির তিলক পরেছিলাম, তখনও কবির যশ সংশয়িত ও সঙ্কীর্ণ ছিল। আমার সেদিনকার বহু নিন্দা-লাঞ্ছিত খ্যাতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি সমভাবে রক্ষা করেছিলেন। কেবলমাত্র কবি বলেই নয়, সুহৃদ ও ভ্রাতৃভাবে তিনি আমাকে আত্মীয় ক'রে নিয়েছিলেন। সে এমন আত্মীয়তা, যা মিথ্যাস্তুতির প্রত্যাশা করত না, যা বিরুদ্ধ বাক্যকেও স্বীকার ক'রে নিতে কুণ্ঠিত হত না। মনে আছে, তিনি একদিন আমাকে

বলেছিলেন—"রবিবাবু, আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ও প্রকৃতির প্রতিকূলেও রক্ষা করবেন।"

তাঁর সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আমি বারংবার এসেছি, তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহের টানে।

সে দিনও চলে গেছে। শুভ দৈববশতঃ অনেক সম্মান—এমন কি য়ুরোপীয় রাজহস্তেও* আমার ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু আমার এই ঘরের এবং স্বদেশের রাজার কাছ থেকে যে সম্মান লাভ করে এসেছি—ব্যক্তিগত জীবনে আমার কাছে তার মূল্য অনেক বেশী। এই জন্যই এই ত্রিপুরার সঙ্গে আমার ক্ষণিক অতিথির সম্বন্ধ নয়। এ সম্বন্ধ এখানকার রাজপিতা ও পিতামহের স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত।

আমি একান্ত মনে এই রাজ্যের কল্যাণ কামনা করি। এই রাজ্যের যে দুই জন রাজাকে বিশেষ ভাবে জান্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম, তাঁদের রাজোচিত গুণে ও রসজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ; এমন সৌজন্য, দাক্ষিণ্য ও সহৃদয়তা দেখা যায় না।

এই রাজ-পরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে, কোনো দিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুত না হন। এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ-সূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।

রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মত চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সংযত, তেমনি সুসংস্কৃত—তেমনি সরস। মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ। এই বৈদগ্ধ্যে, স্বদেশের সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যের এই রসজ্ঞতায় তাঁদের আভিজাত্যের গৌরব ঘোষণা করে। এই সঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক নম্রতা দেখেছি, সেই নম্রতা আমার কাছে তাঁদের চরিত্রের উচ্চতারই পরিচয় দিয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন বালক, যখন তিনি আমার নিকটে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবহারে ও আচরণে আমার নিকটতম আত্মীয়ের স্থান গ্রহণ করেচেন। বালককাল থেকেই তিনি আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতেন। ইহা যে ব্যর্থ হয় নাই, ইহাই আমার পরম আনন্দ। আমি ত্রিপুর রাজ্যের আর কোনো হিত যদি না করে থাকি, কেবলমাত্র যদি ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্ত্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তবে তাঁর দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করেছি বলে গৌরব করতে পারবো। এই উপলক্ষে আমি তাঁকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। আজকের দিনে এখানকার পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনে বিষাদের ছায়া ফেলেচে। আমার একমাত্র আনন্দ, এখানে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে দেখ্‌লাম। নিজের স্বাস্থ্য ও কাজ উপেক্ষা করেও তাঁর আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এঁর পিতার ও পিতামহের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, আজও তা এঁরই হাত দিয়ে ভোগ করতে পারচি। সেই জন্য আজ বসন্তে, ত্রিপুরার বন-শ্রী যখন দক্ষিণ বাতাসে দিকে দিকে পুষ্পোৎসবের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তখন আমি এঁরই কাছ থেকে এঁর পিতৃসখারূপে সেই মাল্য গ্রহণ করতে এসেচি, যা এঁর পিতা পিতামহ তাঁদের প্রীতিভাজন এই অতিথির জন্য সজ্জিত করে রেখে দিতেন।

আমি এঁর কল্যাণ কামনা করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কামনা করি যে, এঁর চরিত্র-মহিমায় ত্রিপুর রাজ্যের কল্যাণ বর্দ্ধিত হউক।

* যেমন বেলজিয়মে ও সুইডেনে। প্রবাসীর সম্পাদক।

এই উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজগণের প্রতি আমি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা করি। আজ বিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তন স্থাপন করেছি। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্যপীড়িত ও অধিকাংশের অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভ কর্ম্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র মাণিক্যও যে কেবল মাত্র এই দানকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিলেন তা নয়, সেকালকার হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করতে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং আরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করে গিয়েছিলেন। আমার কর্ম্মের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁদের এই শ্রদ্ধার স্মৃতি আমার পক্ষে একান্ত সমাদরের সামগ্রী।

অবশেষে কিশোর সাহিত্য-সমাজ ও ত্রিপুরার জনসাধারণকে অদ্যকার দিনে আমার জন্য তাঁদের এই সম্মান আয়োজনের প্রতিদান স্বরূপ আমার শুভ ইচ্ছাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে যে অভিবাদন করেছেন, তারই প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। তাঁদের কাছে আমার এই শেষ কথাটি জানিয়ে যাই যে, আমি যশোভাগ্যবান কবির মত এখানে মান নিতে আসি নি; আমি স্বর্গগত মহারাজদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি, আজ আমার শেষ বয়সেও সেই আত্মীয়তার শেষ রসটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি

সর্ব্বস্তরতু দুর্গানি সর্ব্বো ভদ্রানি পশ্যতু।

"রাজর্ষি" উপন্যাস ও "বিসর্জন" নাটক ত্রিপুরার রাজ-বংশের ইতিহাস অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থ দুটিতে ঐতিহাসিকতা যথাসম্ভব রক্ষা করবার ইচ্ছায় তিনি ১২৯৩ সালের ২৩শে বৈশাখ মহারাজ বীরচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন, তার প্রধান অংশটি নিচে উদ্ধৃত হ'ল।

"মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া "রাজর্ষি" নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করি। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্বাসনদশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।"

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন। তাতে কবির "মুকুট" নাটকেরও উল্লেখ ছিল। বীরচন্দ্র "রাজরত্নাকর" ও "রাজমালা" থেকে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংকলন ক'রে দিতে পারবেন লিখেছিলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কৌশলপূর্ণ মার্কিন-ব্রিটিশ প্রশ্নোত্তর

গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীর বিপক্ষ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যেমন বলেছিলেন যে, তাঁরা জগতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছেন, বর্তমান মহাযুদ্ধেও তেমনি ব্রিটেন বলছেন জগতে স্বাধীনতা ও শান্তি স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করছেন। যাকে আটলান্টিক সনন্দ বলা হচ্ছে, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এবং আমেরিকান রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাতেও ঐ রকম কথা বলেছেন;—বলেছেন, যে-সব জাতির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে যুদ্ধান্তে তাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, ইত্যাদি। এই সব কথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও খাটবে কি না প্রশ্ন ওঠায় চার্চিল সাহেব ব'লে দিয়েছেন, কথাগুলা ইয়োরোপের সেই সব দেশের জন্যে বলা হয়েছে যাদের স্বাধীনতা হিটলার কেড়ে নিয়েছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা হবে তা তো গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ভারতসচিব ও বড়লাট ব'লেই দিয়েছেন।

আটলান্টিক সনন্দ প্রচারের আগে হ'তেই আমেরিকার লোকেরা প্রশ্ন ক'রে আসছে, ইংরেজরা যে বলছে তারা জগতের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে, ভারতবর্ষকে তারা তো স্বাধীনতা দেয় নি, ঠিক্ কখন কি রকমে যে দিবে তাও বলে নি। এই রকম প্রশ্ন হ'তে থাকায়, ব্রিটেন মিথ্যা-প্রচারে এবং মিথ্যার চেয়েও অনিষ্টকর আংশিক সত্য প্রচারে নিপুণ লোক লাগিয়ে আমেরিকায় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসছে। তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে ভারতসচিব লণ্ডন থেকে রেডিওতে বক্তৃতা ক'রে আমেরিকার লোকদের গোটাপাঁচ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ব'লে গত ১লা অক্টোবর রয়টার তারে খবর দিয়েছেন।

লক্ষ্য করতে হবে অনেক প্রশ্নের মধ্যে ভারতসচিব কয়েকটি মাত্র বেছে নিয়ে তার জবাব দিয়েছেন। অন্য প্রশ্নগুলি যে কি ছিল, রয়টার তা বলেন নি। এটা ধ'রে নিলে অন্যায় হবে না যে, এমারি সাহেব সেই প্রশ্নগুলিই বেছে নিয়েছিলেন যেগুলির উত্তর দেওয়া খুব সোজা। তার পর তাঁর বেছে নেওয়া প্রশ্নগুলি এমন যে, তা'তে প্রশ্নকর্তা আমেরিকানদের অজ্ঞতা ও বোকামিই প্রকাশ পায়। প্রশ্নগুলা পড়লেই সন্দেহ হয়, কোন কোন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের হাতের পুতুল কোন কোন আমেরিকানের যোগ-সাজোশেই যেন সেগুলা রচিত হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, সহজে যাতে উত্তর দেওয়া যায় ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে জগতের লোকদের ভ্রম জন্মান যায়।

সব প্রশ্নের ও উত্তরের আলোচনা বা উল্লেখ আমরা করব না। প্রথম প্রশ্ন ছিল, "ভারতবর্ষ বিলাতের ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কি কি ট্যাক্স দেয়?" ইস্কুলের ছেলেরাও জানে ভারতবাসীরা ইংলণ্ডেশ্বরকে বা বিলাতী গবর্মেণ্টকে ট্যাক্স দেয় না, ট্যাক্স দেয় সেই গবর্মেণ্টকে যাকে বলা হয় ভারত-গবর্মেণ্ট কিন্তু যার প্রধান ব্যক্তিরা সব ইংরেজ, যার ভিত্তিগত সব আইন বিলাতে ইংরেজরা করেছে এবং যে ট্যাক্সের অধিকাংশ ভারতকে ইংরেজের অধীন রাখবার নিমিত্ত রক্ষিত সৈন্যদলের জন্য ও সরকারী ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও পেন্স্যন দিতে ব্যয়িত হয়। এ রকম প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব বেশ সহজে ও অম্লানবদনে পুরা সত্যবাদিতার সহিত বলতে পেরেছেন, ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে কোনই ট্যাক্স দেয় না।

কিন্তু প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল, ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষ থেকে কি কি উপায়ে ও প্রকারে ধন আহরণ করেছে ও করে, ভারতবর্ষের দৌলতে ব্রিটেন ঐশ্বর্যশালী হয়েছে ও হচ্ছে কিনা এবং তার ফলে ভারতবর্ষ দরিদ্র হয়েছে ও হচ্ছে কিনা। এ রকম প্রশ্ন কোনো আমেরিকান যদি করে থাকে, তা হ'লে ভারত-সচিব উত্তর দেবার জন্যে সেটি বেছে নেন নি। তাতে তাঁর চতুরতাই প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের আরম্ভের যুগ থেকেই এই দেশ থেকে প্রভূত অর্থ আহরণ নানা উপায়ে ইংরেজরা করে আসছে। আমরা লণ্ডনস্থিত গবর্মেণ্টকে কিম্বা মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে ট্যাক্স দিই না বটে, কিন্তু ভারতের মনিব সমস্ত ব্রিটিশ জাতিকে নানা রকমে পরোক্ষ ভাবে ট্যাক্স দিয়ে আসছি।

ব্রিটেন যে ঐশ্বর্যশালী হয়েছে তার প্রধান ও প্রথম কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সেখানে স্টীম এঞ্জিন দ্বারা চালিত নানা যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় ও অন্য রকম জিনিষ উৎপাদন ও সেগুলি ভারতবর্ষে বিক্রী করা। একেই ইংরেজীতে বলে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভল্যুশন (পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে বিপ্লব)। ইংলণ্ডের স্টীম এঞ্জিন ও অন্যান্য কল

অকেজো হয়ে পড়ে থাকত যদি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা দেশ থেকে অপর্যাপ্ত অর্থ বিলাতে গিয়ে না পৌছত। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যেরা বাংলা দেশ থেকে লুণ্ঠিত ও অন্য প্রকারে আহৃত শত শত কোটি টাকা বিলাতে পাঠিয়েছিল, তাই ব্রিটেনের ষ্টীম এঞ্জিন ও অন্য নানাবিধ কল চালু হ'তে পেরেছিল। এই তথ্যগুলি ব্রুক্স্ ম্যাড্যাম্‌সের *The Law of Civilization and Decay* নামক পুস্তকের ২৬৩-২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। যথা—

Very soon after Plassey, the Bengal plunder began to arrive in London, and the effect appears to have been instantaneous: for all the authorities agree that the "industrial revolution," the event which has divided the nineteenth century from all antecedent time, began with the year 1760. Prior to 1760, accordingly to Baines, the machinery used for spinning cotton in Lancashire was almost as simple as in India; while about 1750 the English iron industry was in full decline because of the destruction of the forests for fuel. . . . .

Plassey was fought in 1757 and probably nothing has ever equalled the rapidity of the change which followed. In 1760, the flying shuttle appeared, and coal began to replace wood in smelting. In 1764, Hargreaves invented the spinning jenny, in 1776 Crompton contrived the mule, in 1785 Cartwright patented the powerloom, and, chief of all, in 1768 Watt matured the steam-engine, the most perfect of all vents of centralizing energy. But, though these machines served as outlets for the accelerating movement of the time, they did not cause that acceleration. In themselves inventions are passive, many of the most important having lain dormant for centuries, waiting for a sufficient store of force to have accumulated to set them working. That store must always take the shape of money, and money not hoarded, but in motion. Before the influx of the Indian treasure, and the expansion of credit which followed, no force sufficient for this purpose existed; and had Watt lived fifty years earlier, he and his invention must hape perished together. **Possibly since the world began, no investment has ever yielded the profit reaped from Indian plunder,** because for nearly fifty years Great Britain stood without a competitor. From 1694 to Plassey (1757) the growth had been relatively slow. Between 1760 and 1815 the growth was very rapid and prodigious. Credit is the chosen vehicle of energy in centralized societies, and no sooner had treasure enough accumulated in London to offer a foundation, than it shot up with marvellous rapidity. The arrival of the Bengal silver and gold enabled the Bank of England, 'which had been unable to issue a small note than for £20, to easily issue £10 and £15 notes and private firms to pour forth a flood of paper.'

ব্রিটেন ভারতবর্ষ থেকে এই একবার টাকা নিয়েই যে ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়; নানা রকমে ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা বরাবর ব্রিটেনে গিয়ে পৌছচ্ছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, **ব্রিটিশ জাতির মোট বাৎসরিক আয়ের সিকি অংশ ভারতবর্ষ থেকে ঐ জাতির সিন্দুকে গিয়ে পৌছে!** কি কি উপায়ে ও প্রকারে পৌছে?

ভারতবর্ষের সামরিক উচ্চতম পদগুলির সমুদয় অধিকারী ইংরেজ। তাঁদের বেতনের ও ভাতার কতক অংশ এবং পেন্স্যনের সমস্তটা ব্রিটেনে যায়। ভারতে যত গোরা সৈন্য আছে, তাদের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। যুদ্ধের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য দ্রব্যসামগ্রী প্রধানতঃ বিলাতে ক্রীত হ'য়ে এদেশে আসে। বড়লাট থেকে আরম্ভ ক'রে অধিকাংশ প্রধান সরকারী চাকর্যে এবং সাধারণ সিবিলিয়ানদের অধিকাংশ ইংরেজ। তাঁরা মোটা মাইনে, ভাতা এবং অবসর গ্রহণের পর পেন্স্যন পান। নানা বাবতে ভারতবর্ষের সরকারী খাজনাখানা থেকে বৎসরে পাঁচ কোটি পাউণ্ড বিলাতে যায় ও সেখানে খরচ হয়।

এগুলা প্রতি বৎসরই ঘটে। কিন্তু এ ছাড়া ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে এককালীন দানও করে থাকে। যেমন গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ "স্বেচ্ছায়" ইংলণ্ডকে দেড় শত কোটি টাকা দিয়েছিল, বহু লক্ষ সৈন্য ও শ্রমিক দিয়েছিল, যুদ্ধসম্ভার অপর্যাপ্ত দিয়েছিল এবং ভারতের রাজা মহারাজারাও টাকায় মানুষে সামগ্রীতে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনের প্রধান আয় বাণিজ্যিক। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতবর্ষের নানাবিধ পণ্যশিল্প লুপ্ত বা প্রায় লুপ্ত হয়েছে বা হতে ব'সেছে। বিলাতী জিনিষ এসে ভারতের বাজার দখল ক'রে বসেছে। এই সব জিনিষ বিক্রীর লাভ ব্রিটেনে অবিরত পৌছচ্ছে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের যত কারখানা আছে, তার অধিকাংশও ইংরেজদের। তার লাভ প্রধানতঃ ইংরেজরা পায়। ভারতীয় সমুদ্রের উপকূলে জাহাজ চালিয়ে এবং ভারতবর্ষ থেকে অন্য দেশে জাহাজ চালিয়ে ইংরেজ জাহাজ-কোম্পানীরা খুব লাভ করে। ভারতীয় অনেক নদীতে জাহাজ চালিয়ে এবং রেলওয়ে থেকেও ইংরেজরা খুব লাভবান হয়।

এমারি সাহেব তাঁর নির্বাচিত প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ভারতবর্ষের সব রাজস্ব ভারতবর্ষের লোকদের হিতের জন্য ব্যয়িত হয়। এই উক্তি মিথ্যা। ভারতবর্ষে গোরা সৈন্য ও গোরা অফিসার রাখা হয়, ভারতবর্ষনামক ব্রিটেনের জমিদারী রক্ষা ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে। গোরা সৈন্য ছাড়া দেশী সৈন্যও ব্রিটেন ভারতবর্ষের বহু দূরে নিজের কাজে লাগান। ভারতবর্ষে অ-সামরিক সরকারী কাজে যত ইংরেজ নিযুক্ত আছে, তাদের প্রত্যেকটি পদের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে সুযোগ্য ভারতীয় পাওয়া যেতে পারে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বা অন্য টেক্‌নিক্যাল কাজের জন্য, যত দিন ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য আবশ্যক, সেই অল্পকাল অ-ভারতীয় লোক আবশ্যক বটে; কিন্তু

ইংরেজদের চেয়ে কম বেতনে অন্য বিদেশী যোগ্য লোক তত দিনের জন্য সেই সব পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট রেলওয়ের লোকোমোটিভ এঞ্জিন এবং অন্য নানা রকম জিনিষ এদেশে আনিয়ে থাকেন। সেই সবই এদেশে নির্মিত হয় বা হতে পারে বা হতে পারত।

এমারি সাহেব আর একটা মজাদার কথা তাঁর উত্তরে ব'লেছেন; বলেছেন, তাঁদের দেশের ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারত-রক্ষার নিমিত্ত ("for the defence of India") প্রতিবৎসর অনেক নিযুত ডলার দান ক'রে থাকেন। "ভারত-রক্ষা"র ব্যাখ্যা আমরা অনেক বার ক'রেছি। সংক্ষেপে এর মানে ব্রিটেনের ভারতবর্ষরূপ জমিদারী রক্ষা। এই কাজের জন্য আবশ্যক সমস্ত ব্যয়ই যদি ব্রিটেন করতেন, তাকে দান বলা যেতে পারত না। অল্প ব্যয় যা করেন, তাও অযথেষ্ট এবং সবে কয় বৎসর মাত্র করছেন, আগে করতেন না। ভারত-জমিদারী রক্ষা ছাড়া ভারতবর্ষের দেশী ও গোরা সৈন্যেরা দূরে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যিক যুদ্ধও করে।

—

আরো আমেরিকান প্রশ্নের ভারত-সচিবের উত্তর

মিঃ এমারির নির্বাচিত দ্বিতীয় আমেরিকান প্রশ্নটি ছিল, "ইহা কি সত্য যে ভারতবর্ষের ব্রাইসরয় (বড়লাট) ভারতবর্ষের লোকদের সম্মতি না নিয়েই জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন? ইহা কি গণতন্ত্র?" মিঃ এমারি অনায়াসেই উত্তর দিয়েছেন, "ব্রাইসরয় কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি এবং যুদ্ধ ঘোষণা তিনি করতে পারতেন না!" ঠিক কথা, কিন্তু এ রকম গণ্ডমূর্খের প্রশ্নের উত্তর দেবার কি প্রয়োজন ছিল? সবাই জানে, ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ এবং এর বড়লাট লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অধীন কর্মচারী মাত্র, তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করবার ক্ষমতাই নাই।

আসল কথা এই যে, ভারতবর্ষের লোকপ্রতিনিধিদের মত জিজ্ঞাসা না ক'রেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধনিরত দেশ করা হয়েছে এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তার জন্য দায়ী। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টকৃত ভারত-শাসন আইনটাই এরূপ যে, সে-আইন অনুসারে ভারতবর্ষের লোকপ্রতিনিধিদের যুদ্ধ সম্বন্ধে মত কি, বিদেশী ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের তা জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই; এবং যুদ্ধ শান্তি প্রভৃতি বৈদেশিক ব্যাপারে ("foreign affairs"এ) তাঁদের মত দেবার অধিকারও নাই। মিঃ এমারির নির্বাচিত এই দ্বিতীয় প্রশ্নটাই এরূপ ভাবে রচিত যে, তার উত্তরে ঐ সব সত্য তথ্য গোপন রাখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

যদিও ভারতবর্ষের লোকপ্রতিনিধিদের মত যুদ্ধ সম্বন্ধে নেওয়া হয় নি এবং ব্রিটেনকৃত আইন অনুসারে নেবার দরকারও নাই, তথাপি ভারতবর্ষের লোকদের ভারতবর্ষকে যুদ্ধনিরত করায় সম্মতি আছে বুঝাবার নিমিত্ত ভারতসচিব বলেছেন,

"An overwhelming body of public opinion in India was from the first and is today behind the British Government in its struggle against Nazi tyranny and aggression."

সত্য বটে নাৎসীদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যে যুদ্ধ করছে, ভারতের অগণিত লোক ইংলণ্ডের সে যুদ্ধ সমর্থন করে; যদিও ভারতের বৃহত্তম জনপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেস যুদ্ধ চায় না। কিন্তু ঐ সমর্থনের মানে এ নয় যে, ভারতবর্ষকেও সেই যুদ্ধে নিরত করায় তাদের মত আছে। আমেরিকার অধিকাংশ লোক জার্মেনীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধে গোড়া থেকেই ইংলণ্ডের সমর্থন করে আসছে, কিন্তু আমেরিকা এখনও (১১ই নবেম্বর) জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি। সেইরূপ ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হ'ত, তা হলে ভারতবর্ষের জনমত নাৎসী অত্যাচারের বিরোধী হ'লেও সম্ভবতঃ জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হ'ত না। আমেরিকার জাহাজ ডুবান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ শত্রুতার কাজ জার্মেনী করায় অতঃপর হয়ত আমেরিকা যুদ্ধে নামতে পারে, কিন্তু এখনও নামে নি। চীন নাৎসী অত্যাচারের বিরোধী, কিন্তু চীন জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি।

মিঃ এমারির নির্বাচিত আর একটা প্রশ্নে জবাহরলালকে জেলে পাঠান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ছিল। তিনি পরম ন্যায়বান সেজে পাণ্টা প্রশ্ন করলেন, "সাধারণ অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়া হবে, আর মিঃ নেহেরুর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা বেশী বলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে না, এ রকম ব্যবস্থা কি ঠিক হ'ত?" যেন কেও বলে বা বলেছিল যে মিঃ নেহরু মর্যাদাসম্পন্ন ব'লে তাঁর তথাকথিত অপরাধে দণ্ড হওয়া উচিত নয়! আসল কথাটা এই যে, যে-রকম বক্তৃতার জন্য তাঁর ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, অন্যদের সে রকম বক্তৃতার জন্য লঘুতর দণ্ড হয়েছে। তাঁর অতি কঠোর দণ্ড ভারতবর্ষে নরমপন্থীদের দ্বারাও নিন্দিত হয়েছে এবং বিলাতে মান্যগণ্য উদারনৈতিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে।

—

মসজিদের সামনে দিয়ে গীতবাদ্যসহ শোভাযাত্রা

ভারতবর্ষ খ্রীষ্টিয়ান ব্রিটিশ জাতির অধীন। খ্রীষ্টিয়ানরা গির্জাতে ভগবানের আরাধনা ও তাঁর কাছে প্রার্থনা

ক'রে থাকেন। খ্রীষ্টিয়ান ব্রিটিশ জাতি গির্জাগুলিকে পবিত্রও মনে করেন। ভারতে প্রভুত্বসম্পন্ন খ্রীষ্টিয়ান ব্রিটিশ জাতির ক্ষমতা নিশ্চয়ই তাঁদের অধীন মুসলমানদের চেয়ে বেশী। তাঁরা কখনও গির্জার সামনে দিয়ে গীতবাদ্যসহ শোভাযাত্রা গেলে আপত্তি করেন নি, তাতে গির্জা অপবিত্র হয়ে যায় বলেন নি। অথচ তাঁদেরই রাজত্বে তাঁদেরই তাঁবেদার মন্ত্রীরা ও তাঁদের অধীন অনেক হাকিম মসজিদের সামনে দিয়ে সগীতবাদ্য শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে হুকুম জারি করেন, এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ও লাটসাহেবেরা এ রকম অন্যায় ও বেআইনী হুকুম রদ করেন না—হয়ত বা কর্তারা এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াটা খুব উপভোগই করেন। বে-আইনী বলছি এই জন্যে যে, ব্রিটিশভারতীয় উচ্চতম আদালতের রায়ে অনেকবার উক্ত হয়েছে যে, সরকারী বা সদর রাস্তার উপর দিয়ে গীতবাদ্য সহিত শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার অধিকার জনগণের আছে, যদি সে রাস্তার ঠিক পাশে বা নিকটে মসজিদ থাকে তবুও সে অধিকার আছে, এবং যদি মসজিদে নমাজ চলতে থাকে তবুও তখনও সে অধিকার আছে। অন্যায় বলছি এই জন্যে যে, যে-দেশে অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করে, সে-দেশে কেবল একটি মাত্র সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের বিশ্বাস, খেয়াল বা কুসংস্কার বা জেদের অনুযায়ী ব্যবস্থা ক'রে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অসুবিধায় ফেলা বা তাদের ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মান কখনই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য নিয়ে বিবাদ নূতন নয়, অনেক দিন থেকে চলছে। সম্প্রতি বঙ্গের অনেক জায়গায় দুর্গাপূজার পর প্রতিমা বিসর্জনে বাধা জন্মায় বিবাদটার পুনরুত্থান হয়েছে।

হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা, প্রবীণ আইনজ্ঞ সুবিবেচক অসাম্প্রদায়িক-মনোভাববিশিষ্ট নেতা সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হককে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন, এ বিষয়ে বঙ্গের গবর্ণরের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সুযুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, এবং অন্যতম মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কোন ফল হয় নি। যত দিন পর্যন্ত ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ ও মনোমালিন্য ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার একটা উপায় মনে করবেন এবং যত দিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দান সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীরা স্বস্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকবার প্রধান উপায় মনে করবেন ও সেরূপ উপায় অবলম্বনে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কাছে বাধা না পেয়ে প্রশ্রয় পাবে, তত দিন এই ঝগড়া চলতে থাকবে।

এই বিষয়ে আমরা অনেক বার অনেক কথা লিখেছি। গত বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যা লিখেছিলাম, সেই কথাই আবার নূতন ক'রে বলি।

এদেশে সাম্প্রদায়িক ঝগড়া যত হয়, তার প্রায় সবগুলাতেই মুসলমানরা এক পক্ষে থাকেন। তাঁদের একটা ধারণা আছে যে তাঁদের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ—বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নিজের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবার অধিকার তাঁদের যেমন আছে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও সেইরূপ আছে। সুতরাং তাঁরা যেমন হিন্দুর নানা ধর্মানুষ্ঠানে কিম্বা বিশেষ বিশেষ সময়ে বা স্থানে সেইগুলির অনুষ্ঠানে আপত্তি করেন ও বাধা দেন, হিন্দুদেরও সেইরূপ তাঁদের ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে আপত্তি করবার ও বাধা দেবার অধিকার আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এরূপ করতে থাকলে দেশে শান্তি থাকতে পারে না সুতরাং দেশের উন্নতিও হতে পারে না। যে-দেশে নানা ধর্মমত ও সম্প্রদায় আছে, সেই সব ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতার সঙ্গে সে-দেশের রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নাই, রাষ্ট্র তার বিচারক নহেন। আদর্শ রাষ্ট্র এ-বিষয়ে সমদর্শী ও পক্ষপাতশূন্য। এরূপ রাষ্ট্র, হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই অপরের ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় প্রত্যেক আপত্তি গ্রাহ্য করবেন, নয় কারও আপত্তি গ্রাহ্য না-ক'রে সকলকেই, অপরের সঙ্গে বিরোধ না ক'রে নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে দেবেন। প্রথমোক্ত রীতি অনুসৃত হলে সব সম্প্রদায়ের সব ধর্মানুষ্ঠানই—অন্ততঃ অনেক ধর্মানুষ্ঠানই—বন্ধ করতে হবে, সুতরাং সে রীতি অনুসৃত হতে পারে না। শেষোক্ত নিয়ম অনুসারে কাজ করা যেতে পারে এবং রাষ্ট্রের তাই করা উচিত। কিন্তু তা করতে হলে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য ও খুব দৃঢ় হতে হবে।

দু-একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি হিন্দুদের পঞ্জিকা অনুসারে প্রতিমা বিসর্জনের নির্দিষ্ট সময় মুসলমানদের কোন নমাজের সময়ের সঙ্গে এক হয়, তা হলে প্রতিমা বিসর্জনের নিমিত্তে যেমন নমাজ স্থগিত হ'তে পারে না, সেই রকম নমাজের জন্যও প্রতিমা বিসর্জন স্থগিত হ'তে পারে না; রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে বিসর্জন ও নমাজ দুই-ই একই সময়ে করতে দেওয়া

এবং দুই-ই শান্তিতে নির্বাহিত হবার জন্য দরকার মত পুলিসের ব্যবস্থা করা। মহরমের মিছিলের পথের ধারে (নিকটে বা দূরে) হিন্দুদের মন্দির থাকলে বা খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির ধর্মালয় থাকলে যেমন মহরমের মিছিল বন্ধ করা হবে না (হয়ও না), সেই রকম হিন্দুদের কোন মিছিলের পথের ধারে (নিকটে বা দূরে) মসজিদ থাকলে নমাজের সময়েও হিন্দুর মিছিল বন্ধ বা স্থগিত করা হবে না বা তাকে অন্য পথে যেতে বলা হবে না। মুসলমানের আজান বা মুসলমানের মহরমের ঢাকের বাজনা যেমন বন্ধ করা হবে না (হয়ও না), তেমনি হিন্দুদের কোন স্তোত্র ভজন যাত্রা ঘণ্টাধ্বনি বা শঙ্খধ্বনিও বন্ধ করা হবে না। কিন্তু তা ব'লে কেও ইচ্ছা ক'রে অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারবে না। সকলের ও পরস্পরের সুবিধার নিমিত্ত সকলকে ও প্রত্যেককে কিছু অসুবিধা সহ্য করতে হবে; ঠিক্ সেই রকম সহ্য করতে হবে যেমন মুসলমানেরা, অন্য সব ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের মত, আপনাদের মসজিদের নিকটে বা উপরে মোটর গাড়ীর শব্দ, লরী ও বাসের শব্দ, ট্রামের শব্দ, মহরমের ঢাকের শব্দ, রেলের বাঁশী ও ঘড়ঘড়ানি, এরোপ্লেনের ভীষণ আওয়াজ, মেঘগর্জন এবং বজ্রধ্বনি সহ্য করেন।

সকলকে অপক্ষপাত দৃঢ়তার সহিত এই রকম ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা ও রীতি মানাবার মত শক্তিশালী ও ন্যায়বান গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে কখন প্রতিষ্ঠিত হবে, কেও বলতে পারে না; কিন্তু হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, না হ'লে মঙ্গল নাই।

—

সাধক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গদ্য রচনা তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার সাহিত্যিক ফল। এই-জাতীয় কবিতার গ্রন্থের মধ্যে "গীতাঞ্জলি" সুপ্রসিদ্ধ। এইরূপ কবিতা "গীতিমাল্য", "নৈবেদ্য", "খেয়া", "শিশু", "চৈতালী", "স্মরণ", "কল্পনা", "উৎসর্গ" ও "অচলায়তনে" আছে ব'লে এই গ্রন্থগুলির অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে নিবদ্ধ হ'য়েছে। "প্রান্তিক", "বলাকা", "আরোগ্য", "জন্মদিনে", "রোগশয্যায়" এবং "শেষলেখা"তেও এইরূপ কবিতা আছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক শত ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা-প্রসূত। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা-প্রসূত গদ্য রচনার কথা বলতে গেলে প্রথমেই তাঁর দুই খণ্ড "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের কথা মনে পড়ে। "ধর্ম"ও তাঁর এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ।

তাঁর অনেক শত ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতের মত "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থেও তাঁর জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ অনুভূতি স্থান পেয়েছে।

তাঁর কতকগুলি 'স্বদেশী' সঙ্গীত অন্য স্বদেশী সঙ্গীতের মত নয়। এগুলিও ভগবদ্ভক্তিপ্রসূত। যেমন, "জনগণ-মনঅধিনায়ক", "দেশ দেশ নন্দিত করি" ইত্যাদি।

তাঁর "রাজা প্রজা", "স্বদেশ", "রাশিয়ার চিঠি" "বিচিত্রা", "সঞ্চয়", "চারিত্রপূজা", "বিলাতযাত্রীর পত্র" প্রভৃতিতে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ অনেক বাণী আছে। "প্রবাসী" ও অন্য কোন কোন সাময়িক পত্রে তাঁর এই জাতীয় কিছু লেখা বেরিয়েছে যা এখনও সঙ্কলিত হ'য়ে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয় নি।

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ "তত্ত্বকৌমুদী"র রবীন্দ্র-বাণী সংখ্যায় কবির এই-জাতীয় পদ্য ও গদ্য বাণীসমূহের একটি উৎকৃষ্ট সংকলন প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচিত হ'তে পারে। আমরা যত দূর জানি এই কাজে এখনও কেও হাত দেন নি। ভবিষ্যতে কোন যোগ্য ব্যক্তি এই কাজটি করবেন, এরূপ সম্ভাবনা আছে।

তিনি যে সাধক তার কিঞ্চিৎ আভাস এবং তাঁর সাধনা কিরূপ ছিল তারও কিছু আভাস আমরা ভাদ্রের "প্রবাসী"তে "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়েছি; তার আগেও "শান্তিনিকেতন পত্রিকা"য় ও কোন কোন বক্তৃতায় দিয়েছিলাম।

কার্ত্তিক মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন 'আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেছেন, কবি যে সাধক ছিলেন তার মধ্যে তার আভাস ও প্রমাণ আছে। সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃত করি।

> বড় ঘরের চেয়ে ছোট ঘরেই বাস করিতে কবি পছন্দ করিতেন। একদিন তাই বলিলেন, "প্রকাণ্ড ঘর-বাড়ীর মধ্যে মানুষ যায় নগণ্য হইয়া, মানুষকে যদি তাহার ঘর বাড়ীই মহিমায় অতিক্রম করে তবে তাহা শোচনীয়।" ঘরে উপকরণের বাহুল্যও তাঁহার ছিল না। এই বিষয়ে জাপানীদের উপকরণহীন শুধু নির্মল মাদুরবিছানো ঘরগুলি দেখিয়া জাপানযাত্রার সময়ে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।
>
> কবিগুরু তাঁহার "নৈবেদ্য" গ্রন্থে বারবার উপকরণহীন এই সরলতার কথা ঘোষণা করিয়াছেন,
>
> কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে

সরল জীবনখানি করিতে বহন।

(নৈবেদ্য, নং ৯৩)

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত।

(ঐ নং ৯৫)

এইরূপ কথা নৈবেদ্যে ও অন্যত্র আরও বহু আছে।

শুনিয়াছিলাম তাঁহার জীবনযাত্রা অতিশয় বিলাসবহুল, কিন্তু এখানে আসিয়া দেখি ঠিক তার বিপরীত। তখন তাঁহার অর্থের খুব টানাটানি। কাপড় চোপড় খুব বেশি নাই। কিন্তু তাহাই নিজে ধুইয়া শুকাইয়া ব্যবহার করিতেন—তাঁর "ঠাকুর্দা" গল্পের ঠাকুরদার মত। মনে হইত তাঁহার যেন অনেক আছে।

অতি প্রত্যূষে কবি শয্যাত্যাগ করিতেন। কাশীর অভ্যাস মত বাল্যকাল হইতেই আমি চারিটার সময় ঘুম হইতে উঠিতাম। কিন্তু তখনও দেখিতাম তিনি মুখ হাত ধুইয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। ৩টায় উঠিয়াও দেখি তিনি ধ্যানে নিরত। ৩টার কাছাকাছি তিনি উঠিতেন। অথচ ঘুমাইবার পূর্ব্বেও তাঁহার ধ্যানের অভ্যাস ছিল। আসলে তাঁহার নিদ্রাই ছিল অল্প। তিনি বলিতেন, "অল্প নিদ্রাতেই আমার বেশ চলিয়া যায়, কোনো কষ্ট হয় না।"

প্রভাতের আলোক হইলেই সামান্য একটু দুধ বা ফল খাইয়া তিনি দিনের কাজ আরম্ভ করিতেন। চা খাইলে, ছাঁকনীর মধ্যে চা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া গরম জল ঢালিতেন। তাহার সামান্য কিছু চায়ের জল দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতেন। বলিতেন, "ইহাতে আমার দুধটা সহজে সহ্য হয়, চায়ের জন্য আমি চা খাই না।"

সেই যে ভোরবেলা দিনের আলো হইলেই কাজে বসিতেন তখন হইতে প্রায় প্রতিদিনই বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন।

প্রভাত হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া স্নানাহার সারিয়া কবি যে তৎক্ষণাৎ কাজে বসিতেন তাহার জের চলিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

প্রভাতের ধ্যানে তাঁহার দিনগুলি আরম্ভ হইত এবং সন্ধ্যার সামাজিক কাজের পরে আবার ধ্যানের সাগরে তিনি আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া গভীর রাত্রিতে শয্যায় যাইতেন। ধ্যানের দ্বারা আরব্ধ এবং ধ্যানের দ্বারা সমাপ্ত এক একটি দিন ছিল তাঁহার সাধনার মালার এক একটি গুটি। এই ভাবে তিনি কর্ম্মে, সেবায়, সাধনায়, ধ্যানে একটি একটি দিনকে একটি একটি প্রসাদের মত ভগবানের হাতে পাইতেন। এইরূপ প্রসাদী-কৃত দিনগুলির দ্বারা রচিত অনলস সাধনাময় পরমসুন্দর অশীতিবৎসর-ব্যাপী একটি তাপস জীবন যাপন করিয়া আপনার সাধনোন্দিষ্ট লোকে আজ তিনি প্রয়াণ করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় আমরাও আজ তাঁহাকে বলি—

তপসা যে অনাধৃষ্যা তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ।

তপোবলে যাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ, তপোবলে যাঁহারা স্বর্গলোকে প্রয়াত, মহতী তপস্যায় যাঁহারা সিদ্ধ, তুমিও তাঁহাদের মধ্যে গমন করো।

যে চেৎ পূর্ব ঋতসাপ ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ।

যে সকল পূর্বতাপসগণ সাধনাতেই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, সাধনার মধ্যে যাঁহারা নবজন্মপ্রাপ্ত, সাধনাকে যাঁহারা নিত্যই অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন, হে সংযত তাপস, তুমিও তাঁহাদের মধ্যে গমন করো।

সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্য্যম্।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ।

যে সকল অপার দৃষ্টিসম্পন্ন কবিগণের কাছে সূর্য্যের আলোকও পরিম্লান, সেই সব তপস্বী ঋষিগণের মধ্যে হে পরম তপস্বী, তুমিও গমন করো।

শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে অমূল্য চিঠিগুলি "দেশ" সাপ্তাহিক পত্রের গত পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকেও পাঠকেরা বুঝতে পারেন কবি কিরূপ সাধক ছিলেন। তাঁর এই দৃঢ় ও গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ধর্ম মানুষের কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমষ্টিগত জাতীয় জীবনেও একান্ত অবলম্বনীয় ও অনুসরণীয়। এই বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে "দেশ" থেকে উদ্ধৃত নিম্নমুদ্রিত চিঠিখানিতে। এটি তেত্রিশ বৎসর পূর্বে লেখা।

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের, বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। বিধাতার এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। দেশের যে দুর্গতি-দুঃখ আমরা আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন—কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারে না—সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে—এবং ধর্ম্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে। পাপের পথে পথ-সংক্ষেপ হয় বলিয়া আমরা ভ্রম করি সেই জন্যই অধৈর্য্য হইয়া আমরা সেই দিকে ধাবিত হই কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়াই সকলতাকে বিসর্জ্জন দিই। আজ আমাদের পথ পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল—এখন আবার আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক বাধা অনেক বিলম্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে—যত কষ্ট হউক, যত দূরপথ হউক, অবিচলিত চিত্তে যেন ধর্ম্মেরই অনুসরণ করি। সমস্ত দুর্ঘটনা সমস্ত চিত্তক্ষোভের মধ্যে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে সেই শুভবুদ্ধি দান করেন। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩১৫।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি এই চিঠিগুলিতে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন, তাতে তাঁর নিজেরও সাধনমার্গের সন্ধান মিলে। একটি উপদেশ এইরূপ—

মাতঃ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দিকে মনকে ফিরিয়ে রাখা, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং সমস্ত কর্ত্তব্যকে তাঁর কাজ মনে করে ধৈর্য্যের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করে যাওয়া এ ছাড়া সংসারে শান্তির আর কি উপায় আছে আমি তা জানি নে। কোনো কোনো লোক, ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন—রামমোহন রায় সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন—যখনি তাঁর মন কোন কারণে চঞ্চল হ'ত তখনি তিনি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ করতেন এবং ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত বন্ধন এড়িয়ে মুক্তিক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হতেন। আমিও উপনিষদের কোন কোন শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এই রকম এক একটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।

আহার-নিয়ন্ত্রণ যে তাঁর সাধনার একটি বাহ্য উপায় ছিল, তা আমরা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ থেকে ও অন্য সূত্রে জানি। আলোচ্য চিঠিগুলির একটি চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। যথা—

"আমার শরীরের জন্যে কিছু মাত্র চিন্তা করো না--যত দিন এখানে আমার কাজ আছে তত দিন ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমি অনেক দিন থেকেই অল্প আহার করে থাকি তাতে আমার শরীরের কোনো অনিষ্ট হয় না এবং আমার সমস্ত কাজকর্ম্মও সম্পূর্ণ বলের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারি।"

কবিকে 'গুরুদেব' বলা চলিত হ'য়েছে—গান্ধীজী, জবাহরলাল প্রভৃতি অনেকেই তাঁকে গুরুদেব বলেন, কিন্তু তিনি কারো গুরু হয়ে গুরুগিরি করতে চান নি। শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকারকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

"পথ অসংখ্য আছে—তোমার কাছে যে পথ সহজ সেই পথ দিয়াই একদিন তুমি সত্যে গিয়া উপনীত হইবে—আমার পথেরই যে অনুসরণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কেবল এই কথা মনে রাখিয়ো—ঈশ্বরই সত্য স্বরূপ—সেই পূর্ণ সত্যের অভিমুখেই চলিতে হইবে—অনেক ক্ষুদ্র জিনিষ আমাদিগকে পথের মধ্যে ভুলাইতে আসে—তাহারা বড় বড় নাম ধরিয়া আসিলেও তাহাদিগকে সেই সর্ব্বোত্তম সত্যের সিংহাসনে বসাইতে যাইয়ো না—যাহা ভূমা তাহার পরিবর্ত্তে আর কোনো বিড়ম্বনাকেই বড় এবং শ্রেয় মনে করিয়ো না। ধর্ম্ম নিজের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থের চেয়েও বড় য়ুরোপে এই কথা ভোলে বলিয়া যে তাহাদের নকল করিয়া আমাদিগকেও ভুলিতে হইবে এমন দুর্ভাগ্য যেন আমাদের না হয়। ইতি ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৫।"

আপনাকে ভুলে' ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অনুগত হ'তে হবে, এই চিঠিগুলিতে কবি বারবার বলেছেন।

"মা তুমি মনকে খুব নম্র করিয়া প্রতিদিন তাঁর শরণাপন্ন হও। নিজেকে না ভুলিতে পারিলে যথার্থভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। প্রতিদিনই তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অহঙ্কারের বন্ধন নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া আসিতে থাকিবে। হৃদয় যখন নিরহঙ্কার হয় তখনই ক্রোধ প্রভৃতি রিপু আশ্রয় না পাইয়া বিদায় লইতে থাকে। নিজেকে সংসারের সকলের চেয়ে নীচে রাখ সুখ পাইবে—সেই তোমার দীনতার আসনে ভগবান তোমাকে সঙ্গ দিবেন। এ সকল উপদেশ মুখে বলা সহজ—কাজে অত্যন্ত শক্ত। আমার মনে অহঙ্কার কত দিকে কত মোটা ও সূক্ষ্ম শিকড় বিস্তার করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—সেই জন্যই কথায় কথায় কত অসহিষ্ণু হই—ভিতরে ভিতরে কত রাগ করি। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন আমি এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি আমাকে এই সকল বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দিন। প্রার্থনায় ফললাভ হাতে হাতে হয় না—কিন্তু মনে আমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবে না। তুমিও হতাশ হইয়ো না—নিশ্চয় জানিয়ো যদি প্রত্যহই তুমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও ক্রমে তোমার মন নরম এবং তোমার বন্ধন আলগা হইবেই ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ঈশ্বরকে মন দিতে দিতে ঈশ্বর তোমার অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিবেন ইহা নিশ্চয় জানিবে।"

সংসারের নানা গোলমাল নানা খুঁটিনাটির মধ্যে মনকে কেমন করে শান্ত ও সুন্দর রাখা যায়, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়েছেন—

"মা, সংসারের নানা গোলমালের মাঝখানে মনকে শান্ত ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত শক্ত সে কি আমি জানি নে? বিশেষত মেয়েদের সর্ব্বদাই অত্যন্ত ছোটমনে খুঁটিনাটির মধ্যে দিন কাটাতে হয়—মনকে উদার ভাবের ক্ষেত্রে রাখবার উপায় ও অবকাশ মেয়েদের নেই। কিন্তু কি করবে মা? যা কঠিন তাই সাধন করতে হবে। এমন কোনো একটি মন্ত্রকে মনের মধ্যে অভ্যাস করে নেবে যেটি স্মরণ হবামাত্র মন এক মুহূর্ত্তে সেই সবচেয়ে বড় জায়গায় গিয়ে ঠেকবে। মনকে ঈশ্বরের মধ্যে স্থির করবার জন্য রোজ খানিকটা করে সময় দিতে হয়—তাঁকে মনের অত্যন্ত কাছে করে একবার অনুভব করে নিতে হয়।—তারপরে সমস্ত দিন সংসারের কাজকে তাঁর কাজ বলে জেনে তার সকল ঝঞ্চাট মাথায় করে নেবার জন্য নম্রভাবে প্রস্তুত হতে হয়। যখনি মন উত্যক্ত হয়ে উঠবে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে, আঘাত করতে ও আঘাত পেতে উদ্যত হবে, তখনি মনকে টেনে ধরে এই কথাটি তাকে শোনাতে হবে যে, তোমার এ সমস্তই মিথ্যা, মায়া, তুমি আনন্দময়ের উপলব্ধি থেকে দূরে পড়চ বলেই এই রকম শুকিয়ে তপ্ত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠচ। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—যিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে অন্তরে বাহিরে চিরদিন আছেন, তাঁকেই চরম সত্য বলে জানলে সংসারের সমস্ত ক্ষোভের কারণগুলো মুহূর্ত্তের মধ্যে অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়।"

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তাঁর "বঙ্গলক্ষ্মী"র কার্ত্তিক সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীন সাধনার ধারা" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার গোড়ায় কবির সাধনানিরত তন্ময় মূর্তি ফুটে উঠেছে।

পূজ্যপাদ কবি যে-সময় শান্তিনিকেতনের কুঠি ছেড়ে দেহলির দোতালায় বাস করতে লাগলেন, দোতালার ঘরের পূব দিকের সরু বারান্দায় লম্বা-গড়নের একটা শ্বেত পাথরের ধব্ধবে সাদা চৌকীতে বসে খুব ভোরে কবি উপাসনা করছেন—দেখা যেতো। আশ্রমের কেউ যদি ভোরে উঠে সে সময় দেহলির সামনের সরকারী রাস্তা ধরে প্রাতর্ভ্রমণে যেতো, তবে কবি বারান্দায় উঁচু প্রস্তরাসনটিতে বসে স্থির হয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, দেখতে পেতো।

সে অবস্থায় কবিকে অনেকেই দেখেছেন, আমরাও দেখেছি। দুপুরে আমরা তখন নিয়মিত পাঠ বলে নিতে যেতুম কবির কাছে। পূজ্যপাদ কবি আমাকে সূফীবাদের ইংরাজী গ্রন্থ পড়াতেন তখন। একবার পড়িয়ে দিয়ে পর দিন সেটা লিখে আনতে বলতেন। লেখাগুলি সংশোধন

করে দিতেন নিজ হাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে।...পড়াতে পড়াতে কবি আমাকে এক দিন হেসে বল্লেন,—"তুমি মুসলমান হবে নাকি? তোমার মন যে রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, দেখি, সুফীদের কথায়।" আমি বল্লুম—"সুফীরা মহাতাপস, তবে কোন কিছু হওয়া-হয়ী চলবে না রাজা রামমোহনের যুগে। কোন একটা কোঠায় ঢোকা যায় আর কি করে।" কবি বল্লেন—"কথা ঠিক। তোমার উপর রাজা রামমোহনের আশীর্ব্বাদ আছে দেখছি।"

ঐ সময় পড়তে গিয়ে এক এক দিন কবিকে দুপুরে একটু তন্ময় অবস্থায় দেখতুম। বইখাতা-হাতে পৌঁছে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলতুম—"আজ পড়া থাক—আপনি বিশ্রাম করুন; কাল আসবো ঠিক সময়।" কবি বলে উঠতেন, "না-না, পাঠ শেষ করতে হবে সর্বাগ্রে। কাজ ফেলে রেখে বিশ্রাম করা যায় না। এমনতর "মুড্" সময়ে সময়ে আমার আসে। এ একটা সহজ আবির্ভাবের অবস্থা। এর জন্য আমি প্রতি-দিন অপেক্ষা করে থাকি। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—জপ্‌তে জপ্‌তে এ অবস্থাটা এসে পড়ে, কিন্তু বড় দৈবাৎ—প্রায়ই ব্যর্থ হই। তবে যখন পাই, তখন আর আনন্দ ফুরাতে চায় না। "শান্তিনিকেতন" বইখানির রচনাগুলি লিখতে পারি এরই ফলে। এ একটি গুপ্তদ্বার যার ভিতর দিয়ে আনাগোনা চলে ভূমার সঙ্গে। এ কথা প্রকাশ করতে নেই কারো কাছে।"

—

বঙ্গ-নারীদের সাহিত্যিক কৃতিত্ব অযথেষ্ট কেন

বাংলা দেশের যে-সকল মহিলার প্রতিভা আছে, কবিত্বশক্তি আছে, তাঁদেরও সাহিত্যিক কৃতিত্ব তাঁদের প্রতিভা ও কল্পনার অনুরূপ কেন হয় না, শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তার একটি সত্য কারণ নির্দেশ ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন—

"আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্বশক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গণ্ডীটুকুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসারতা লাভ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া নানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরচনার সহিত পরিচয়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সে সুযোগও অতি অল্প। এই জন্য আমাদের লেখিকাদের কবিতা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দুর্ব্বল ভাবে বিচরণ করে—তাহার মধ্যে সরলতা ও কোমলতা থাকে কিন্তু যথেষ্ট শক্তি থাকে না। এই জন্য সাহিত্যে এইরূপ কবিতা কোন মতেই নিত্যস্থান লাভ করে না। তাহা জুঁইফুলের মত এক সন্ধ্যার মধ্যেই ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে। কবির কবিত্বশক্তির অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে—জগতের সঙ্গে মানব-জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ অতি সামান্য বলিয়াই তাঁহাদের কবিত্ব কিছু দূর পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইয়া আর বেশী বাড়িতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা শুধু মহিলা কবিদের সম্বন্ধে নয়, উপন্যাসলেখিকা ও গল্পলেখিকাদের সম্বন্ধেও সত্য।

—

বিশ্বভারতীকে সাহায্য করবার একটি উপায়

সমগ্রভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক ফণ্ড কমীটির আবেদন প্রচারিত হয়েছে। সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরে বলব। এখন বিশ্বভারতীর আয় বৃদ্ধির জন্য একটি উপায়ের কথা বলি।

আমরা অনেক দিন থেকে ব'লে আসছি—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় বলেছিলাম, যে, লেখাপড়া-জানা বাঙালীরা যদি নিজ নিজ সাধ্যমত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী কিম্বা অন্ততঃ এক একখানি বহিও কেনেন তা হলে বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল হ'তে পারে। সেই কথা আবার বলছি।

কিন্তু আমরা জানি আমাদের দেশের অনেক ধনীর ও অনেক সচ্ছল অবস্থার লোকেরও বই কেনার অভ্যাস নাই। তবে তাঁরাও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য যে-সব বই দরকার হয়, তা অগত্যা কিনে দেন। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অনেক পিতামাতাকেও সন্তানদের বিদ্যালয়পাঠ্য ও কলেজপাঠ্য বই কিনে দিতে হয়। এই সব বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বই যত বেশী থাকবে, বিশ্বভারতীর আয় তত বাড়বে।

পাঠশালার নিম্নতম শ্রেণী থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে পারে, রবীন্দ্রনাথ এ রকম অনেক বই রচনা ও সঙ্কলন ক'রে গেছেন। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক মনোনীত করবার ভার যাঁদের উপর আছে, তাঁরা যদি যথাসম্ভব রবীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি থেকে কতকগুলি বই নির্বাচন করেন, তা হলে ছাত্রীছাত্রেরা ভাল বই পড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হয় এবং বিশ্বভারতীরও সুবিধা হয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় তাঁর সত্যপ্রশংসাধ্বনি সমগ্র দেশ থেকে উত্থিত হয়েছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের সাহিত্যিক উৎকর্ষে বিশ্বাসী লোক দেশের সর্বত্র আছেন। তাঁরা রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর প্রচারবৃদ্ধির চেষ্টা করুন।

কলিকাতা, ঢাকা, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির অনেক গ্রন্থ পাঠ্য হয়েছে। আরো হওয়া উচিত।

বাংলা দেশের বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক নির্বাচক কমীটির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের কি কি পুস্তক আছে জানি না। যেগুলি তালিকাভুক্ত আছে, শিক্ষকগণ সেগুলি নিজ নিজ বিদ্যালয়ে সহজেই চালাতে পারেন। এরূপ বিস্তর বিদ্যালয় আছে, যাঁদের প্রধান শিক্ষকেরা উক্ত কমীটির তালিকার বাইরের বহিও পড়াতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হবার উপযোগী অনেকগুলি বই রচনা ও সংকলন ক'রে গেছেন। বিশ্বভারতীর কলিকাতার কার্যালয় থেকে সেগুলির তালিকা প্রধান

শিক্ষক মহাশয়দের নিকট শীঘ্রই প্রেরিত হবে। যেসব বই তাঁরা পাঠ্য করবেন কি-না বিবেচনা করতে চান, বিশ্বভারতী কার্যালয়ে সেগুলির তালিকা দিলে সেগুলি তাঁদের কাছে পাঠান হবে।

শুধু ক্লাসে পড়াবার বই হিসাবেই যে রবীন্দ্রনাথের বিস্তর বই বিদ্যালয়সমূহে চলতে পারে তা নয়; প্রত্যেক পাঠশালা, বাংলা বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আছে, বা থাকা উচিত। এই রকম প্রত্যেক গ্রন্থাগারের উপযোগী বই রবীন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে। এই সকল বই এই সব গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে রাখা উচিত।

দুঃখের বিষয় আমাদের পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয়-গুলির আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে, তাদের কোনটিরই খুব অল্পসংখ্যক পুস্তকও আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রত্যেকটিরই থাকা উচিত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আনন্দদায়ক উৎকৃষ্ট বহি রবীন্দ্রনাথ যত লিখে গেছেন, অন্য কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার তত লেখেন নি। যেখানে যেখানে পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয় আছে, তথাকার সম্ভ্রান্ত লোকেরা একা একা বা মিলিত ভাবে ছেলেমেয়েদের পাঠ্য রবীন্দ্রনাথের বইগুলি কিনে ঐসব প্রতিষ্ঠানে উপহার দিলে দেশের উপকার হবে। প্রত্যেক সচ্ছল অবস্থার গৃহস্থের পারিবারিক লাইব্রেরিতেও এই সকল পুস্তক থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কবির ইংরেজী অনেক বহিও পাঠ্য-পুস্তকরূপে এবং লাইব্রেরির পুস্তকরূপে মনোনীত হওয়া উচিত। যিনি ইংরেজী বই লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁর ইংরেজী কোন গ্রন্থই, যে-সব ইংরেজ গ্রন্থকারদের বই সচরাচর কলেজে পড়ান হয়, তাদের পুস্তকের সমকক্ষ নয় মনে করা 'নিকৃষ্টতা বোধের' (inferiority complex-এর) পরিচায়ক। তাঁর ইংরেজী ঠিক ইংরেজদের লেখা ইংরেজীর অনুকরণ বা অনুসরণ না হ'তে পারে! কিন্তু আমেরিকান গ্রন্থকারদের ইংরেজীও ত অনেক স্থলে ইংরেজদের ইংরেজী থেকে পৃথক্। কিন্তু তার ত কেও খুঁৎ ধরেন না। সংস্কৃতে যেমন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের 'আর্যপ্রয়োগ' আছে, ইংরেজীতেও সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের মত জগদ্বরেণ্য লেখক 'আর্যপ্রয়োগ' করবার অধিকারী।

—

তারিখ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কদাচিৎ অমনোযোগ

"প্রবাসী"র গত (কার্তিক) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা যে জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে, তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সন তারিখের কোন ধার ধারি না।" শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীও "রূপ ও রীতি" কাগজে লিখেছেন যে, কবি কখন কখন তাঁর চিঠিতে সন তারিখ দিতেন না। যে-জায়গা থেকে চিঠি লিখিত, তার নামও কখন কখন তাঁর চিঠিতে থাকত না। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি এসব খুঁটিনাটিতেও খুব সাবধানই থাকতেন। তা সত্ত্বেও কখন কখন তাঁর ভুল হ'ত। তার একটি দৃষ্টান্ত শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিয়েছেন। তিনি সেখান থেকে লিখেছেন, "প্রবাসীর কার্তিকের সংখ্যায় গুরুদেবের যে হাতের লেখা পত্র বাহির হইয়াছে তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, রথীন্দ্র-নাথের মায়ের মৃত্যু ১৩০৭ সালে হইয়াছে। ইহা ভুল—১৩০৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমি সেই বৎসর ভাদ্রের প্রথমে এখানে আসি—তখন তিনি যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পীড়িত ছিলেন—তাহার পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। রথীন্দ্র-নাথকে ও তাঁহার মাতুলকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সকলেরই এক মত। কবির "স্মরণ" কাব্যেও ১৩০৯ সাল ৭ই (?) অগ্রহায়ণ আছে।" হাতের লেখায় বাংলা ৭ এবং ইংরেজী 9 দেখতে এক রকম ব'লেও এ রকম ভুল হয়ে থাকতে পারে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ল গত আশ্বিনের প্রবাসীর ৬৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৩৩৪ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের চিঠিটিতে স্থানের উল্লেখ না থাকায় আমরা টীকায় লিখে-ছিলাম, এটি কোন্ শৈলনিবাস থেকে লেখা স্থির করতে পারলাম না। কিন্তু তার উপরেই ১৪ই জ্যৈষ্ঠ লেখা শিলং-এর চিঠিটি পড়লেই বুঝা যায়, দুটিই শিলং থেকে লেখা। টীকায় ওরকম লিখবার কারণ এই যে, আমাকে লিখিত কবির সব চিঠি এক জায়গায় ছিল না ও নাই; সম্প্রতিও কিছু চিঠি খুঁজে পেয়েছি। যখন ২২শে জ্যৈষ্ঠের চিঠিটি খুঁজে পেয়েছিলাম, তখন ১৪ই জ্যৈষ্ঠটির পাই নি। শুধু ২২শে জ্যৈষ্ঠেরটি দেখে তার সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখে-ছিলাম, ১৪ই জ্যৈষ্ঠের চিঠিটি পাবার পরেও অনবধানতা বশতঃ সেই মন্তব্য কেটে দিই নি।

—

"কণিকা"র আংশিক অনুবাদ ও ইংরেজী "চিত্রা"র ভূমিকা

"প্রবাসী"র বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানির ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি মুদ্রিত হ'ল, তাতে তারিখ নাই,

স্থানের নামও নাই। চিঠিটি ঠিক্ কোন্ দিন কবি লিখেছিলেন তা এখন স্থির করা যাবে না, কিন্তু কোন্ বৎসর কোন্ মাসে লেখা হয়েছিল তা বোধ হয় বলা যেতে পারে।

কবি চিঠিটিতে "কণিকা"র যে কবিতাগুলির তাঁর স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদগুলির উল্লেখ করেছেন, সেই অনুবাদগুলি ১৯১৩ সালের নবেম্বর মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে বেরিয়েছিল। মডার্ন রিভিয়ু প্রকাশের তাৎকালিক রীতি-অনুসারে ঐ সংখ্যা ৩১শে অক্টোবর প্রকাশিত হ'য়ে লেখক ও সম্পাদকদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। সুতরাং কবি তাঁর চিঠিটি ১৯১৩ সালের নবেম্বর মাসে লিখেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

চিঠিটি যে ১৯১৩ সালে লিখিত তার আর একটি প্রমাণ, ইংরেজী "চিত্রা" ("Chitra") ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। কবি ইংরেজী "চিত্রা"র ভূমিকাটি আমাকে লিখতে আদেশ করেন। আমি লিখে তাঁর আদেশ অনুসারে ইংলণ্ডে ফক্স ষ্ট্রাংওয়েজ্ সাহেবকে পাঠাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, এবং প্রকাশকেরা সেইটি ছেপে আসছেন। সুতরাং চিঠিটি "কণিকা"র কবিতাগুলির অনুবাদ প্রকাশের পরে এবং "চিত্রা" প্রকাশের আগে লেখা।

চিঠিটি ডাকে আসে নি, কোনো লোকের মারফৎ এসেছিল। তিনি তখন কোথায় ছিলেন মনে নাই। সম্ভবতঃ তৎকালীন প্রবাসী কার্যালয়ের অপেক্ষাকৃত অদূরবর্তী কোন স্থানে ছিলেন। ডাকে এলে খামের উপরকার পোষ্টমার্ক থেকে স্থান ও তারিখ জানা যেত।

সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রাশয়তা

সম্প্রতি দিল্লীর আইনসভার এক কক্ষে এক জন বেসরকারী সদস্য প্রশ্ন করেন, সুভাষবাবু কোথায় আছেন গবর্মেণ্ট জানেন কি না। সরকার পক্ষের যে সদস্য উত্তর দেন তিনি যদি বলতেন গবর্মেণ্ট কিছু জানেন না, তা হ'লেই ঠিক্ হ'ত; কারণ উত্তরটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে অজ্ঞ। কিন্তু সরকারী সদস্য কতকগুলা গুজবের উপর নির্ভর ক'রে বলেন, সুভাষবাবু রোম কিম্বা বার্লিনে আছেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্তে ব্যাপৃত আছেন, এবং ব্রিটেনের শত্রু একটা দেশের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়ে গেছে। এর প্রমাণস্বরূপ সরকারী সদস্য দুটা ইস্তাহার থেকে কিছু পড়েন। ইস্তাহার দুটা কে ছাপিয়েছে তা সরকার বলতে পারেন নি। সরকারী গুপ্তচর ও অন্ত-বিধ কর্মচারীদের মধ্যে সুভাষ বাবুর শত্রু আছে। তারা যে এই ইস্তাহারগুলা ছাপিয়ে বিলি করে নাই, তা কি নিশ্চিত বলা যায়?

সরকারী সদস্যপুঙ্গব ঐসব বলেই থামেন নি। তিনি সুভাষ বাবুর সম্পর্কে অধুনাপ্রচলিত 'পঞ্চমবাহিনী' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেমন ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতাদের অনেককে ইংরেজদের স্বদেশের ও এদেশের অনেক কাগজ কুইসলিং বলে। আমাদের বিবেচনায় এগুলা অপপ্রয়োগ। কুইসলিং ইংরেজ হ'য়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে ব'লে তাকে ইংরেজরা অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক ও স্বদেশদ্রোহী মনে করতে পারে। সুতরাং কুইসলিং নামটা বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীর সমার্থক হয়েছে। সুভাষবাবু যদি দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করেন যা ব্রিটিশ আইনের বিরুদ্ধ, তা হ'লে তাঁকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ধরতে পারলে শাস্তি দিতে পারেন, এবং সুভাষবাবুর অবলম্বিত পন্থা সম্বন্ধে ভারতীয়দের মধ্যেও মতভেদ থাকতে পারে—আমরাও তাঁর সব মত ও পথের সমর্থন করি না; কিন্তু তিনি ইংরেজদ্রোহী হ'লেও বিশ্বাসঘাতক স্বদেশ-দ্রোহী নিশ্চয়ই নন। সুতরাং তাঁকে কুইসলিং বললে ভাষার অপব্যবহার হবে।

সেইরূপ তিনি পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্গতও নন। যদি কোন দেশের কতকগুলা লোক শত্রুজাতির সপক্ষে ও স্বদেশের বিপক্ষে গোপন প্রপ্যাগ্যাণ্ডা (প্রচারকার্য) চালায়, তা হ'লে তাদিগকে বর্তমান যুদ্ধের সময় পঞ্চমবাহিনী বলার রেওয়াজ হ'য়েছে। কিন্তু কোন ভারতীয় যদি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালায় (সুভাষবাবু এখন সে রকম কিছু করছেন কিনা কিছুই জানা নাই), তা হলে সেই কাজকে তার স্বদেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রপ্যাগ্যাণ্ডা বলা চলে না, সুতরাং সেই ব্যক্তিকে পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্গতও বলা যায় না। এ সময়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এবং জার্মেনীর পক্ষে প্রচারকার্য চালান অনুচিত এবং ব্রিটিশ আইন অনুসারে রাজদ্রোহ, সুতরাং দণ্ডনীয় ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে। এইরূপ প্রচারক ইংরেজ হ'লে পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্গত বলে পরিগণিত হ'তে পারে; কিন্তু সে-যদি ব্রিটেনের অধীন অ-ব্রিটিশ বর্তমান বা প্রাক্তন প্রজা হয়, তাকে পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্গত মনে করা ও বলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ নয়, অশুদ্ধ প্রয়োগ।

সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের পর এরূপ গুজবও উঠেছিল যে, তিনি রাশিয়া গেছেন কিম্বা জাপানে গেছেন॥ উত্তরদাতা সরকারী সদস্য মহাশয় রাশিয়ার নাম করেন

"কণিকা"র আংশিক ইংরেজী অনুবাদ এবং ইংরেজী "চিত্রা"র ভূমিকা

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি। "বিবিধ প্রসঙ্গ" দেখুন।]

Babu Ramananda Chatterji
210/3/1 Cornwallis St.

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কণিকার ইংরাজিটা Modern Review তে বাহির হইয়াছে। ছাপার দুর্দশার যে ভয় পাইয়াছিলাম কেননা সেগুলি কাঁচা অক্ষরের লেখা, তাহার পরে আমার প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক পড়িয়া দেখিলাম তাহার কোনো কারণ নাই — আপনি আগাগোড়া মাজিয়া ঘষিয়া প্রায় নূতন করিয়া দিয়াছেন।

Ernest Rhys ও Andrews সাহেবের কাছ হইতে The Gardener সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছি তাহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মনে কিছু ভয় ছিল। গীতাঞ্জলির তর্জমায় ছন্দের অভাব তো বেশি গুরুতর নহে কিন্তু ক্ষণিকা সোনার তরী প্রভৃতি কবিতা বিশুদ্ধ গদ্যে পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে কেমন শোনাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না — এখন ভরসা হইতেছে ভাল লাগিতে পারে।

এইমাত্র বিলাত হইতে India Societyর সেক্রেটারি Fox Strangways সাহেবের নিকট হইতে পত্র পাইলাম তাঁহারা আমার চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ ছাপাইবার জন্য ছাপিতে দিয়াছেন। এই মেলেই আমার কাছে একখানি preface চাহিয়াছেন। এখানে মূল মহাভারত খুঁজিয়া পাইলাম না। আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদার মিলনকাহিনী মহাভারতে যেখানে আছে তাহা লইয়া সংক্ষেপে মোটামুটি ইংরেজিতে লিখিয়া যদি দিতে পারেন তবে এই মেলেই যথাস্থানে পাঠাইতে পারিব — আপনার হাতে নিশ্চিন্ত ভাল হবে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষকবৃন্দ, শান্তিনিকেতন
(আনুমানিক বিশ.বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত ফোটো হইতে)

উপবিষ্ট - জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দণ্ডায়মান—বালক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা-প্রণীত 'দেশীয় রাজ্য' ১ম ভাগ হইতে)

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনকালের রবীন্দ্রনাথ।
বাড়ীটি মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-ভবন

নি বোধ হয় এই জন্য যে, রাশিয়া এখন ব্রিটেনের বন্ধু, এবং জাপানের নাম করেন নি বোধ হয় এই কারণে যে, জাপানের সঙ্গে এখনও ব্রিটেনের যুদ্ধ বাধে নি; সুতরাং সুভাষবাবু রাশিয়ায় বা জাপানে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন এই অপবাদ দেওয়া এখন সুবিধাজনক হবে না।

বলা বাহুল্য, গুজবগুলার মধ্যে কোনটারই মূল্য নাই; কারণ সুভাষবাবু যে কেমন ক'রে বার্লিন, রোম, রাশিয়া, জাপান বা অন্যত্র যেতে পারেন বা গেছেন, তা সরকার বাহাদুর বলতে পারেন নি, সর্বসাধারণও তা অবগত নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইটালী স্বাধীন হয়! তাকে স্বাধীন করবার জন্যে যাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছিলেন, ম্যাট্সিনি তাঁদের মধ্যে প্রধান এক জন। সেই ম্যাটসিনি পলাতক হ'য়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় পেয়েছিলেন, ইংরেজরা তার অহঙ্কার করেন। ঐ শতাব্দীতে হাঙ্গেরীর স্বদেশপ্রেমিক কসুথও (Kossuth) ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারও অহঙ্কার ইংরেজরা করেন। বর্তমান যুদ্ধে হিটলার কর্তৃক বিজিত কোন কোন দেশের রাজা রাণী সেনাপতি ও সাধারণ লোকেরা ইংলণ্ডে আশ্রয় পেয়েছিল। এটা ইংলণ্ডের অহঙ্কারের বিষয়। অতীত কালের যে-সব অব্রিটিশ দেশভক্ত ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বর্তমানে যে-সব অব্রিটিশ দেশভক্ত সেখানে আশ্রয় পেয়েছেন, ইংরেজরা তাঁদের কোন নিন্দা রটনা করেন না। পরাধীন ভারতের কোন দেশভক্ত অন্য দেশে আশ্রয় নিলে তার অপবাদ কেন রটান হয়? অন্য যে-সব দেশ অতীত বা বর্তমান কালে পরদেশকে নিজেদের অধীন ক'রেছে, তাদের অধীনদেশ-শাসনের সঙ্গে ব্রিটেনের অধীন দেশ শাসনের তুলনা করছি না। বর্তমান সময়ে হিটলার যেমন অত্যাচারী, ইংরেজরা তেমন নয়। কিন্তু ইংরেজদের অধীনতাও পরাধীনতা, স্বাধীনতা নয়। সুতরাং ইংরেজাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা নিন্দনীয় নহে। সুভাষবাবু এই মুক্তির জন্য কি উপায় অবলম্বন ক'রেছেন জানি না, সুতরাং তার নিন্দা বা সমর্থন কিছুই করতে পারি না।

—

"রবীন্দ্রনগর"

শ্রীযুক্ত এন্ এস্ সেন জি. আই. পি. রেলওয়ের ডেপুটি চীফ ট্রান্সপোর্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তিনি বোম্বাই থেকে আমাদিগকে লিখেছেন—

"May I suggest that steps be taken to change the name of Bolpur to *Rabindranagar* to perpetuate the memory of our great Poet. I am sure the Government of Bengal and the E. I. Railway will readily agree."

সেন মহাশয় সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই বোলপুরের নাম "রবীন্দ্রনগর" করবার প্রস্তাব করেছেন সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করতে সর্বসাধারণের এক পয়সাও খরচ হবে না, এও ঠিক্। এর দ্বারা কবিকে কতটা সম্মান দেখান হবে, তার আলোচনাও অনাবশ্যক। তবে এর জন্যে আরম্ভেই গবর্মেণ্ট ও ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দ্বারস্থ হবার দরকার নাই। বোলপুরের অধিবাসীরাই স্থির করুন, তাঁরা তাঁদের বাসস্থানের নাম পরিবর্তন চান কিনা। চাইলেও, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্য উপায় অবলম্বনে আন্তরিক পূর্ণ সহযোগিতা করবার দায়িত্ব থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পাবেন না। তাঁরা জানেন, বোলপুরের নাম দেশে বিদেশে বিদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই জন্য।

—

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "আত্ম-কথা"

"রূপ ও রীতি"তে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী "আত্ম-কথা" লিখছেন। কার্তিক সংখ্যায় আরম্ভ হয়েছে। এই কিস্তির সব চেয়ে মজাদার জিনিষ কৃষ্ণনগরের মিশনরি স্কুলে তিনি যে ভজন শিখেছিলেন।

—

বাংলা দেশের চিঠিপত্র

কার্তিকের "রূপ ও রীত"তে প্রমথ বাবু নানা দেশের চিঠিপত্র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। বাংলা দেশের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:—

> সে যাই হোক, বঙ্কিম ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায় না। আমার যতদূর মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি মাত্র পত্র কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। নবীন সেন অবশ্য অনেক চিঠিপত্র লিখতেন সেগুলি বোধ হয় তাঁর আত্মজীবনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; কিন্তু সেগুলি সাহিত্য-পদবাচ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি চিঠি প্রথমে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ "বঙ্কিম-প্রতিভা" পুস্তকে প্রকাশ করেন। সেগুলি পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে সবগুলিই ইংরেজীতে লেখা, বাংলায় নয়।

—

পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ

পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন:

রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাঙলার প্রথম পত্রলেখক এবং অতুলনীয় পত্রলেখক। এ ক্ষেত্রেও তাঁর প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। তাঁর প্রথম পত্রসংগ্রহ 'ছিন্ন পত্র' নামে প্রকাশিত হয়। এবং আমার মতে সে পত্রাবলী উঁচুদরের সাহিত্য। তার স্ফূর্ত্তি অসাধারণ। পরে তাঁর আরও দু'একখানি ছোটখাটো পত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রমথবাবু আরও অনেক কথা লিখেছেন। যেমন—

আমার বিশ্বাস তাঁর লিখিত হাজার হাজার চিঠি বাংলা দেশে ছড়িয়ে আছে। এ বিশ্বাসের কারণ, তিনি কারও চিঠি পেলে হাত-হাত তার উত্তর দিতেন। আমি একবার যখন শিলাইদহে তাঁর বাড়ীতে ছিলুম, তখন দেখেছি তিনি মধ্যাহ্নভোজনের পর তাঁর ঘরে চলে যেতেন, আর চা পানের সময় যখন নীচে নামতেন তখন এক তাড়া চিঠি হাতে করে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। সে সব পত্রের দু'চারখানি এখন নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের লিখিত বিক্ষিপ্ত পত্রগুলি সংগ্রহ করে একত্র ছাপা'লে বাঙলার একখানি অপূর্ব্ব সাহিত্য গ্রন্থ পাঠক-সমাজের হাতে পড়বে।

কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। কার কাছে তাঁর কোন বয়সের কোন পত্র আছে, তা কেউ জানে না। তাঁরাই যদি নিজের চিঠি পাঠিয়ে দেন ত বিশ্বভারতী ছাপাবার ভার নিতে পারেন। কিন্তু সেগুলিকে বাছাই-গোছাই করতে হবে।

প্রমথবাবু আর যে-সব কথা লিখেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তারিখ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :—

এ ক্ষেত্রে আর এক মুস্কিল আছে। রবীন্দ্রনাথের একালের চিঠি chronologically সাজানো কঠিন; কেন না অনেক চিঠিই তারিখছুট্। যাঁরা মোড়কসুদ্ধ চিঠি রেখেছেন, তাঁরা অবশ্য ঐ লেফাফার উপরে ডাকঘরের ছাপ দেখে তারিখ জানতে পারেন। অন্যগুলির তারিখ অনুমান করতে হবে। এবং ভুল অনুমান করাও সহজ।

—

নিখিলভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিরক্ষা কমীটি

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ভারতীয় মহাজাতির শোক প্রকাশার্থ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে কলকাতার টাউন হলে যে সভার অধিবেশন হয়েছিল, তাতে একটি নিখিল ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিরক্ষা কমীটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমীটির সভাপতি সর্ তেজবাহাদুর সাপ্রু ও সম্পাদক ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমীটির পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের সাহায্যার্থী হ'য়ে একটি আবেদন প্রচার করেছেন। ধনী দরিদ্র সকলেরই নিকট সাহায্য চাওয়া হয়েছে; সকলেই রবীন্দ্রনাথের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

কমীটির সভ্য অনেক বিখ্যাত লোক, অনেক ধনী লোক হয়েছেন; অনেক মহারাজা নবাব প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন। আশা আছে সকলের নিকট থেকেই সাহায্য পাওয়া যাবে।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ও তার সমুদয় শাখা কোন পারিশ্রমিক বা ব্যয় না নিয়ে স্মৃতিরক্ষা ফণ্ডের টাকা গ্রহণ ক'রে তা আমানত রাখতে ও তার হিসাব রাখতে রাজী হয়েছেন।

সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। তার জন্যে শুধু নিখিলভারতীয় একটি কমীটি যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক প্রদেশে ও বড় বড় দেশী রাজ্যে শাখা কমীটি গঠন এবং তাঁদের সম্পাদকআদি নিয়োগ করতে হবে। তাঁরা জেলা সব্-কমীটি নিয়োগও করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় কমীটি হয়ত এরূপ কিছু ব্যবস্থা ক'রেছেন বা শীঘ্র করবেন।

—

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাংলা দেশের কর্তব্য

জগৎকে রবীন্দ্রনাথ দান ক'রেছেন তাঁর সাহিত্য, তাঁর বহুশত সঙ্গীত যার অন্তর্গত। বিশ্বভারতী ও তার আদর্শ তাঁর আর একটি দান। শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়ন ও গ্রাম পুনর্গঠনের যে কাজ চলে আসছে, বিশ্বভারতীর তা-ও একটি কাজ। এর আদর্শও তাঁর একটি দান। তাঁর রেখাচিত্র এবং রেখা ও বর্ণের সমাবেশে অঙ্কিত চিত্র তাঁর অন্যতম দান।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী ব'লে এবং তাঁর সাহিত্য মূলতঃ আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় লেখা ব'লে আমরা বাঙালীরা গৌরবান্বিত। বিশ্বসাহিত্যে বাংলাকে স্থান দিয়েছেন তিনিই। বিশ্বমানবের মনন ও হৃদয়ের স্পন্দন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

তাঁর সাহিত্য প্রধানতঃ ও মূলতঃ বাংলায় লেখা ব'লে বাঙালীই মানব জাতির মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী ও মহত্তম সাক্ষাৎ দান তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে। তিনি গানের রাজা। তাঁর সব গান বাংলায়। বাঙালী তার থেকে আনন্দ ও অনুপ্রাণনা পায়। সুতরাং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে যথাসাধ্য অধিক প্রতিদান বাঙালীকেই করতে হবে।

বিশ্বভারতী ও তার অন্তর্গত শ্রীনিকেতন বাংলা দেশেই অবস্থিত। এর গৌরব শুধু বাংলা দেশের না হ'লেও প্রধানতঃ বাংলার। এর দ্বারা দেশ যত উপকৃত হ'তে পারত ও পারে, এখনও তত হয় নি। কিন্তু যতটুকু হয়েছে, তার বেশীর ভাগ উপকার বাঙালী ছাত্রছাত্রীই পেয়েছে। এর দ্বারা উপকৃত হবার ইচ্ছা থাকলে ও উপকৃত হ'তে জানলে বাঙালী ছাত্রছাত্রীরাই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হ'তে পারবে।

প্রাপ্ত গৌরব এবং প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য উপকারের জন্য বাঙালীকে, মৌখিক নয়, কার্যগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

যে-সাহিত্য যে-ভাষায় লেখা সেই ভাষা না জানলে তার রস আস্বাদন করা যায় না, তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান নিজের করা যায় না। অনুবাদ হ'তে পারে এবং হয় বটে, কিন্তু তা হ'লেও প্রত্যেক ভাষার সাহিত্য থেকে সেই ভাষাভাষী লোকেরাই সমধিক জ্ঞান ও আনন্দ পায়।

চিত্র একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে আঁকা হয় বটে, কিন্তু চিত্র বুঝতে হলে এবং তার রস আস্বাদন ও উপভোগ করতে হলে বিশেষ কোন দেশের বিশেষ কোন ভাষা জানা আবশ্যক হয় না। সব দেশের চিত্রসমঝদারেরা যে-কোন দেশের যে-কোন ভাষাভাষী চিত্রকরের আঁকা ছবি বুঝতে ও তার রস গ্রহণ করতে পারেন।

এই জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাবলী সমভাবে সব দেশের মানুষকে দিয়ে গেছেন। সেগুলির সমঝদার ও গুণগ্রাহী হতে হলে বাঙালী বা অন্য কোনো জাতির লোক হবার দরকার নাই, বাংলা বা অন্য কোনো ভাষা জানবার দরকার নাই। তাঁর চিত্র তাঁর স্বকীয়, দেশী বা বিদেশী কোন চিত্রকরের অনুকরণ ক'রে বা তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি এগুলি আঁকেন নি। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবির বহুবর্ণে মুদ্রিত প্রতিলিপি তাঁর গত জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ইংরেজী বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের রবীন্দ্রনাথ জন্মদিবস সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে। এক জন বাঙালী যে এই রকম অভিনব ছবি এঁকেছেন, এতে বাংলা দেশ ও বাঙালী গৌরবান্বিত।

এর জন্যও বাঙালীকে কার্য্যগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

ধনী যাঁরা, সচ্ছল অবস্থার লোক যাঁরা, তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ দানের জন্য কার্যগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সহজ। কিন্তু অল্পবিত্ত ও দরিদ্রদেরও কিছু করা অসাধ্য নহে।

—

রবীন্দ্রস্মৃতি-সম্মাননা দরিদ্রদেরও কর্তব্য

যাঁরা অল্পবিত্ত ও দরিদ্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁদের কর্তব্য কারো চেয়ে কম নয়, বরং বিত্তশালীদের চেয়ে বেশী। রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রদের সঙ্গে একাত্ম হ'তে তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন।

এমন শিক্ষিত বাঙালী, এমন লিখনপঠনক্ষম বাঙালী, কে আছেন, যিনি ন্যূনকল্পে এক পয়সাও তাঁর স্মৃতি-সম্মাননা ফণ্ডে দিতে পারেন না? শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত এরূপ এক একটি পয়সা ধনীদের দেওয়া এক এক লক্ষ টাকার সমতুল্য।

—

রবীন্দ্রস্মৃতি-সম্বন্ধে তরুণদের, ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন সবুজদের, কাঁচাদের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজে শেষ পর্যন্ত অন্তরে চিরযৌবনসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর কাছে সবুজদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কারো চেয়ে কম নয়।

ছাত্রফেডারেশ্যনের ও কিশোরদলের উদ্দেশ্য বোধ করি শুধু রাজনীতির চর্চা নয়;—উদ্দেশ্য ব্যাপকতর। সমুদয় ছাত্রছাত্রী ও অন্য তরুণরা সুশৃঙ্খল ভাবে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন। অন্যদের কথা ছেড়ে দিলে, শুধু তাঁরাই ত বহু লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পারেন।

আমরা কলেজসমূহের মধ্যে, বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখতে চাই বিশ্বভারতীর জন্য কে কত সাহায্য দিতে ও সংগ্রহ করতে পারেন।

পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাডুয়েট বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ বাংলা দেশের মুখ রক্ষা কার্যে আন্তরিক সহযোগিতা করুন, এই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

—

"জয়প্রকাশ নারায়ণের পত্র"

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ এখন দেওলীতে বন্দী। সেখানে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎকারের সময় সরকারী লোক তাঁদের কাছে উপস্থিত থেকে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেই সময় নাকি 'গোপনে' জয়প্রকাশ নারায়ণ একটা লম্বা চিঠি তাঁর স্ত্রীকে দিতে চেষ্টা করেন। সরকারী লোক দেখতে পেয়ে চিঠিখানা হস্তগত করেন। সরকারী টিপ্পনীসহ সেই চিঠির সংক্ষিপ্তসার, সমস্ত চিঠিটার নকল, এবং তার ফটোগ্রাফ গবর্মেণ্ট সব দৈনিক কাগজে পাঠিয়ে দেন। কোন কোন কাগজ এই কারণে সংক্ষিপ্তসারটাও ছাপেন নি যে, জয়প্রকাশ নারায়ণকে ত তাঁর স্বপক্ষের কথা বলবার সুযোগ দেওয়া হয় নি, সুতরাং একতরফা কিছু ছাপা উচিত হবে না।

সরকারী টিপ্পনী অনুসারে জয়প্রকাশ নারায়ণ রাজনৈতিক ডাকাতি দ্বারা অর্থসংগ্রহ করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান চালাবার ফন্দীর কথা ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন। গবর্মেণ্টের ধারণা যদি ঠিক্ হয়, তা হ'লে তাঁকে ফৌজদারী সোপর্দ ক'রে তাঁকে আদালতে হাজির ক'রে নিজের পক্ষসমর্থনের স্থযোগ দেওয়া উচিত ছিল। সে স্থযোগ তাঁকে দেওয়া হয় নি। অধিকন্তু, তাঁকে যে দেওলীতে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে, তাও বিনা বিচারে। স্থতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রমাণ গবর্মেণ্ট প্রকাশ করলে স্বভাবতই প্রমাণটার সত্যতা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হয়।

জয়প্রকাশের চিঠি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী এই মর্মের মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন যে, কংগ্রেস গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং সহিংস কোন উপায় অবলম্বনের বিরোধী। স্থতরাং জয়প্রকাশ সত্যই যদি ঐ রকম চিঠি লিখে থাকেন তা হ'লে তাঁর মতের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন যোগ থাকতে পারে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী এও বলেছেন যে, যে-সব জাতি যুদ্ধ করে তারা গুপ্ত ষড়যন্ত্র, অস্ত্র ব্যবহার, লুণ্ঠনাদি দ্বারা অর্থাদি সংগ্রহ ইত্যাদি সব কাজই করে। স্থতরাং স্বাধীনতাকামী কোন ভারতীয় যদি ঐ সকল উপায় অবলম্বন করে বা অবলম্বনের সমর্থন করে, তবে তার নিন্দা যুদ্ধনিরত কোন জাতির মুখে শোভা পায় না।

কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট (সমাজতন্ত্রী) দলের সেক্রেটরি জয়প্রকাশ নারায়ণের তথাকথিত চিঠিতে ব্যক্ত মতামত ও কৌশল সম্বন্ধে বলেছেন যে, ওগুলার সঙ্গে ঐ দলের কোনই সম্পর্ক নাই।

চিঠিটার সত্যতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা বৃথা। আমরা অন্য কথা তু-একটা বলব।

চিঠিটাতে আছে, দেওলীর বন্দীদের বাস্তবিক বিশেষ কোন অভিযোগ নাই। অথচ শ্রীযুক্ত জোশীর মত প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় লোক দেওলী গিয়ে সব দেখে শুনে বলেছেন, বন্দীদের সত্যসত্যই ন্যায্য অভিযোগ আছে। বন্দীদের প্রায়োপবেশনও তাঁদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে। মানুষ মিছামিছি, শুধু একটা খেয়ালের বশবর্তী হ'য়ে উপবাস দিয়ে প্রাণ বিপন্ন করতে চায় না;—তাও এক জন নয়, তু-শ'র অধিক মানুষ। এই জন্যে, বন্দীদের বিশেষ কোন অভিযোগ নাই, জয়প্রকাশ এই কথা চিঠিতে লিখে থাকলে এই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, লেখক যেই হোক সে এই মিথ্যা কথা লিখেছে গবর্মেণ্টকে খুশি ক'রে নিজের কোন স্থবিধা ক'রে নেবার জন্যে।

চিঠিটাতে কম্যুনিষ্টদের নিন্দা আছে। এই নিন্দাও উক্ত প্রকার অভিসন্ধিমূলক ব'লে সন্দেহ করা অন্যায় হবে না। কারণ, ভারতবর্ষের যে অগণিত লোকেরা রাশিয়ার সোভিয়েটের পক্ষপাতী, রাশিয়া এখন ব্রিটেনের মিত্র ব'লে, তারা মন খুলে বলছে যে, তারা রাশিয়ার সাহায্য করতে চায়। ব্রিটেন ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা কয়েক পুরুষ ধ'রে চ'লে আসছে। আজ রাশিয়া মিত্র ব'লে ব্রিটেন সে কথা ভুলতে পারে না। রাশিয়ার সঙ্গে সহানুভূতি ব্রিটেনের ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মনোরঞ্জক নহে। স্থতরাং কেউ এখন কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সহানুভূতিকারী ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের মুখে গায়ে কালী মাখিয়ে দিলে, সেটা গবর্মেণ্টের ভালই লাগবে। জয়প্রকাশের ব'লে প্রকাশিত চিঠিটাতে এই মসীলেপন সম্পাদিত হয়েছে। চিঠিটার লেখক বা উদ্ভাবক তার দ্বারা গবর্মেণ্টকে খুশি করবার চেষ্টা করেছে সন্দেহ করা যেতে পারে।

চিঠিটা যে খাঁটি নয়, সেটা যে জাল, দেশী বহু খবরের কাগজে এই রকম সন্দেহ প্রকাশিত হওয়ায় গবর্মেণ্ট নিউ দিল্লী থেকে গত ৫ই নবেম্বর একটা জ্ঞাপনী বের করেছেন। তার থেকে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করছি।

The papers were actually seized from Mr. Jai Prakash Narain's own hands when he attempted to pass them surreptitiously to his wife in the course of the interview. They were not taken from his pocket by some one who knew previously that they were there, much less were they *intercepted* in course of transmission without his knowledge. What actually happened was that he handed to the official present at the interview a sheet of paper containing the measurement of his foot and asked him to pass it to his wife so that she could get a pair of shoes made for him. As the official was taking the paper to comply with his request, he noticed Mr. Jai Prakash Narain extracting with his other hand something which had been tucked under his *dhoti* and *langota* at the back and attempting to pass it to his wife. The official asked him to hand it over—it turned out to be a roll of papers tied together—but he refused to do so and tried to destroy the papers. A scuffle ensued in the course of which the official received some slight scratches, but the papers were recovered intact and taken straight to the Superintendent. The Superintendent then saw Mr. Jai Prakash Narain who begged him to destroy the papers. He was subsequently punished by the Superintendent for a breach of the camp rules by being deprived for two months (which have since expired) of the privilege of writing or receiving letters or having interviews.

এতে বলা হয়েছে, যে, চিঠিটা সত্যি সত্যি জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে সরকারী এক জন কর্মচারী কেড়ে নিয়েছিলেন। জয়প্রকাশ ও তাঁর স্ত্রীর সাক্ষাৎকারের সময় ঐ সরকারী কর্মচারী পাহারা দিচ্ছিলেন। জয়প্রকাশ এক হাতে ক'রে কর্মচারীটিকে নিজের পায়ের মাপের একটি কাগজ স্ত্রীকে দিতে বললেন স্ত্রী যেন ঐ মাপের এক জোড়া

জুতা বানিয়ে পাঠিয়ে দেন এই উদ্দেশ্যে। কর্মচারী যখন ঐ কাগজটি নিচ্ছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, জয়প্রকাশ অন্য হাত দিয়ে তাঁর পেছন দিকে ধুতি ও লেঙ্গটে গোঁজা একটা গোল-পাকান কাগজ বের ক'রে স্ত্রীকে দিতে চেষ্টা করছেন। কর্মচারী সেটা চাওয়ায় জয়প্রকাশ দিতে অস্বীকার ক'রে নষ্ট করবার চেষ্টা করেন। তার পর ধস্তাধস্তি ক'রে কর্মচারী চিঠিটা অছিন্ন আস্ত অবস্থায় পান।

এই বৃত্তান্তটা একান্ত হাস্যকর। আমরা ইতিপূর্বে জানতাম না যে, জগতে এমন কোন বোকা ও অসাবধান রাজনৈতিক চক্রান্তকারী আছে যে এক হাতে পাহারাওয়ালা সরকারী কর্মচারীকে জুতার মাপ সম্মুখে দণ্ডায়মান স্ত্রীকে চালান ক'রে দিতে বলে এবং সেই মুহূর্ত্তেই যুগপৎ অন্য হাত দিয়ে চক্রান্তের সমস্ত বর্ণনা সম্বলিত একটা চিঠি 'গোপনে' স্ত্রীকে দিতে চেষ্টা করে। আজব 'গোপন'!

সরকারী জ্ঞাপনীর বৃত্তান্তটা যদি সত্য হয়, তা হলে বলতে হবে, হয় জয়প্রকাশবাবু ফরমেশে বোকা চক্রান্তকারী, নয় সমস্ত ব্যাপারটা ঐ গবর্ন্মেণ্ট কর্মচারী ও জয়প্রকাশ উভয়ের মধ্যে যোগসাজশ দ্বারা সম্পাদিত অভিনয়—উদ্দেশ্য গবর্ন্মেণ্টকে খুশি ক'রে কিছু সুবিধা ক'রে নেওয়া।

—

আইন-সভায় আটলাণ্টিক সনন্দ

মিঃ চার্চিল ও মিঃ রুজভেল্টের আটলাণ্টিক সনন্দের কথা আগে বলেছি। এই সনন্দ যে ভারতের জন্য নয়, মিঃ চার্চিলের এই উক্তিরও উল্লেখ আগে করেছি।

আটলাণ্টিক সনন্দ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় অনেক সদস্য বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম নূতন সদস্য শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণেকে নানা প্রশ্ন করেন। ভারত-সচিব ও মিঃ চার্চিল এ বিষয়ে যা বলেছেন, শ্রীযুক্ত আণে তার অতিরিক্ত কিছু বলতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। তাঁর পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এর বেশী কিছু বলতে পারেন না, সত্য। কেন না, ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অধীন, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী যা বলেছেন, তার উপর কিছু বলবার ক্ষমতা বড়লাটেরই নাই, বড়লাটের কোন পারিষদের ত নাই-ই। কিন্তু তা হ'লেও বেসরকারী সদস্যরা যে শ্রীযুক্ত আণের উপর প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ ক'রেছিলেন, তাতে তাঁদের দোষ কি? শ্রীযুক্ত আণে যখন সরকারী পদ নিয়েছেন এবং মিঃ চার্চিল যখন আটলাণ্টিক সনন্দের অন্যায় রকম ব্যাখ্যা করেছেন; তখন মিঃ চার্চিল এবং তাঁর নিম্নপদস্থ রাজপুরুষদের উপর বেসরকারী লোকেরা সুবিধা পেলেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করবেই।

কিন্তু মিঃ চার্চিল যদি বলতেন যে, আটলাণ্টিক সনন্দ ভারতবর্ষের জন্যও, তা হ'লেই কি যুদ্ধের অবসানে তাঁর ঐ উক্তির বলে ভারত স্বাধীনতা পেত? আমরা বার বার পার্লেমেণ্টের কার্যবিবরণ হ্যানসার্ড থেকে প্রামাণিক কথা উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী পার্লেমেণ্ট কেবল নিজের রচিত আইন কিম্বা নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মান্‌তে বাধ্য, আর কিছু মান্‌তে বাধ্য নয়; বড়লাট, ভারত-সচিব, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী, এমন কি ব্রিটিশ নৃপতি—কারো প্রতিশ্রুতি পার্লেমেণ্ট পালন করতে বাধ্য নয়, যদি সেই প্রতিশ্রুতি তার মতের বিরুদ্ধ হয়।

যুদ্ধাবসানে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হ'তে দেওয়া, ন্যূনকল্পে তাকে ডোমীনিয়নত্ব লাভ করতে দেওয়া যদি পার্লেমেণ্টের অভিপ্রায় হ'ত তা হ'লে অনায়াসেই এই যুদ্ধকালের মধ্যেই একটা আইন ক'রে বা একটা প্রতিজ্ঞা (resolution) পাস ক'রে ঐ সভা প্রতিশ্রুতি দিতে পারত। কিন্তু বিলাতী ঐ আইন সভা ব্রিটেনের জন্য, এবং ভারতবর্ষের জন্যও, যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অনেক আইন করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার বাড়াবার কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নাই। অতএব, স্বাধীন হ'তে হ'লে কিম্বা তার চেয়ে কম কিছু অধিকার পেতে হ'লেও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বা তাঁর নিম্নপদস্থ কারো প্রতিশ্রুতি আদায় করলেই চলবে না—যদি সে প্রতিশ্রুতি পাবার সম্ভাবনা থাকত, যা নাই। এমন কি, পার্লেমেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি যদি আইন দ্বারা দেয়, তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; কারণ সে আইন পরবর্তী কোন পার্লেমেণ্ট রদ ক'রে দিতে পারে। সচরাচর এরূপ ঘটে না বটে, কিন্তু ভারতের ভাগ্যে ঘটতে পারে।

প্রধানতঃ শক্তি সঞ্চয় করা ও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করাই শ্রেয়।

শ্রীযুক্ত আণের সঙ্গে বেসরকারী সদস্যদের যে কথা-কাটাকাটি হয় তার মধ্যে সরদার শান্ত সিং বেশ একটু ব্যঙ্গ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যদি হিটলার ভারতবর্ষ দখল করে, তবে বোধ হয় আটলাণ্টিক সনন্দ ভারতবর্ষের পক্ষেও খাটবে!

উপরের সব কথা ছাপার অক্ষরে সাজান হবার পর খবরের কাগজে দেখলাম কেন্দ্রীয় ব্যাসেমব্লীতে একটা সুপারিশ পাস হয়েছে যে, গবর্ন্মেণ্ট আট্‌লাণ্টিক সনন্দ ভারতেও প্রযোজ্য করুন! তবে আর কি?

—

আইনসভায় সরকারী সৌজন্যের একটা নমুনা

কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরের পর এক জন বেসরকারী সদস্য উত্তরদাতা সরকারী সদস্যকে প্রশ্ন করেন, আপনি এটি কেন করেন নি? সরকারী উত্তরদাতা বলেন, "আমি যা করেছি তার কারণ বলতে পারি, যা করি নি তার কারণ বলা যায় না। আপনি (অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা বেসরকারী সদস্য) এই কক্ষের মাঝখানে পা উপর দিকে ক'রে মাথার উপর দাঁড়ান নি কেন, বলতে পারেন কি?" চমৎকার সৌজন্যপূর্ণ উত্তর। বেসরকারী সদস্য মহাশয় সরকারী সদস্য মহাশয়কে যদি প্রশ্ন করতেন, "আপনি চার পায়ে হাঁটেন না কেন (Why don't you walk on all fours?)", তা হ'লেই ঐ রকম উত্তর যথাযোগ্য মনে করা যেতে পারত।

—

জলে খেলা ও ব্যায়ামে কলিকাতার সাফল্য

সম্প্রতি এলাহাবাদে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে জলে খেলা, সাঁতার ও অন্যান্য ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হ'য়ে গেছে। তাতে একটি ছাড়া সব খেলা ও ব্যায়ামে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারুরা প্রথম স্থান অধিকার করে, ঐটিতে পঞ্জাব প্রথমস্থানীয় হয়।

কল্‌কাতা মোট ৭৯ পয়েণ্ট পায়, পঞ্জাব ২২, এলাহাবাদ ৫, এবং লক্ষ্ণৌ ২।

জলের খেলা ও ব্যায়ামাদির জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের একটি আধুনিক রীতিতে নির্মিত জলাশয় (tank) তৈরী হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তা নাই।

নদীমাতৃক বাংলার ছেলেরা যে প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থানীয় হয়েছে, তাতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অগৌরব হয় নি।

—

লাহোরে ছাদবিহীন থিয়েটার

লাহোরে একটি উন্মুক্ত উঁচু জায়গায় একটি থিয়েটার নির্মিত হয়েছে। তার উপর ছাদ নাই। দ্রষ্টা শ্রোতারা আকাশের নীচে উন্মুক্ত স্থানে বসবেন। একে ইংরেজীতে য়্যাম্‌ফিথিয়েটার বলে। ভারতবর্ষে প্রথম লাহোরেই বোধ হয় এ রকম রঙ্গালয় হ'ল।

—

ভারতবর্ষ দরিদ্র কেন

ভারতবর্ষ কেন দরিদ্র তার উত্তরে সচরাচর বলা হয়ে থাকে যে এদেশ থেকে নানা রকমে অপর্যাপ্ত অর্থ ইংলণ্ড ও অন্য বিদেশে যায় যা এদেশে রাখা যেতে পারত যদি দেশ স্বাধীন হ'ত। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের এটি একটি প্রধান কারণ বটে; কিন্তু মনে করুন যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় এবং ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যায়, শুধু তা হ'লেই কি ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হবে? তা হবে না। ভারতবর্ষকে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য চালাতে হবে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দরকারী সব পণ্যদ্রব্য তৈরি করতে হবে, বনে, মাটির নীচে, নদীতে, সমুদ্রে যত স্বাভাবিক সম্পত্তি এই দেশে আছে সেই সমস্ত কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে। কলকারখানা চালাতে শুধু মানুষের দেহের বল বা গৃহপালিত পশুর বল ব্যবহার না-ক'রে বাষ্পীয় শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও জলপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

সত্য বটে, দেশ স্বাধীন হ'লে এবং দেশের লোকদের বুদ্ধি ও উদ্যম থাকলে, এই রকম সব কাজ যত অবাধে করা যেতে পারে, পরাধীন অবস্থায় তত সহজে করা যায় না। কিন্তু কিছুই করা যায় না, এমন নয়। পরাধীন অবস্থাতেও আমরা অনেক কিছু করতে পারি। তা করা উচিত। বৈদেশিক গবর্মেণ্ট একটা সুচিন্তিত প্রণালী অনুসারে এই সব কাজে আমাদের সহায় হ'লে সুবিধা হয় বটে; কিন্তু তা না হ'লেও আমরা কিছু কাজ করতে পারি, এবং তা করলে দেশের আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল হয়। সেদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি বাংলা দেশে এখনও পড়ে নি বটে কিন্তু কিছু পড়েছে।

—

সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রদের ঝাঁপিয়ে পড়া

বাংলা দেশে এমন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, এখনও হয়ত আছেন, যাঁরা ছাত্রদের রাজনীতিক্ষেত্রে "ঝাঁপিয়ে পড়া"র পক্ষপাতী এবং তাতে উৎসাহ দিয়েছিলেন—এখনও হয়ত সুবিধা বুঝলে উৎসাহ দেবেন। তাতে কাগজের কাট্‌তি বাড়ে এবং নেতারা হাততালি পান এবং কোলাহলকারী ও পতাকাবাহী অবৈতনিক কর্মী অনেক পান। কিন্তু তাতে ছাত্রদের, অন্য জ্ঞান দূরে থাক, রাজনৈতিক জ্ঞান কতটুকু বেড়েছে? দেশ স্বাধীনতার দিকে কতটুকু এগিয়েছে? দেশের "গঠনমূলক" কাজ কতটুকু হয়েছে?

মান্দ্রাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন ছাত্রেরা রাজনৈতিক কর্মী হ'লে (অর্থাৎ active politics-এ যোগ দিলে) তাতে তাদের কোন উপকার হয় না; পলিটিক্স্ লাভবান হয় না, দেশেরও হিত হয় না। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচার্যও এতে সায় দিয়েছেন। এই ধরণের কথা গান্ধীজীও কয়েক বৎসর থেকে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে বোধ হয় বলতেন না—ঠিক্ মনে নাই। কিন্তু তাঁর কথা ছাত্ররা শুনে নি। এমন কি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করতে নিষেধ করেছিলেন, তারা তার পরেই অবিলম্বে ধর্ম্মঘট ক'রে তাঁর সম্মান রক্ষা ক'রেছিল।

—

গৌহাটীতে "প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র সম্মিলনী"

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছাত্রদের উদ্যোগে কয়েক বৎসর থেকে গৌহাটীতে "প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র-সম্মিলনী"র অধিবেশন হয়ে আসছে। এ বৎসর অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত সেপ্টেম্বর মাসে তার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। দৈনিক কাগজে এর বৃত্তান্ত যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্যোক্তারা এই উপলক্ষ্যে যে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র বন্ধুবান্ধব ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে পাঠিয়েছিলেন, তার উল্টা পিঠে ছাপা ছিল—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
* * *
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।
—রবীন্দ্রনাথ

একটি পংক্তিতে "যুঝিয়া" কথাটি থাকায় অসমিয়া-ভাবীদের একখানি কাগজ তার মধ্যে বোধ হয় মারামারি কাটাকাটির সন্ধান পেয়ে উদ্যোক্তাদিগকে আক্রমণ ক'রেছিলেন বলে সংবাদ পেয়েছি।

আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ হিটলারের মত অস্ত্র-শস্ত্রবলে সব দেশ নিজের করতে চান নি। তাঁর অস্ত্র ছিল বিশ্বমানবপ্রীতি। সেটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্ত্র। সেই কারণেই বোধ হয় লর্ড জেটল্যাণ্ড লণ্ডনে গত ৩০শে সেপ্টেম্বরের রবীন্দ্রস্মৃতি সম্বর্দ্ধনা সভায় নিম্ন-মুদ্রিত বাণী পাঠিয়েছিলেন:—

"In understanding literature and art **Dr. Tagore possessed qualities which entitled him to be regarded as a citizen of the world rather than of any particular country. He in some respects was as much at home in Europe and America as in Asia.** Yet despite his claims to be regarded as cosmopolitan his whole being was permeated with a passionate attachment to his own land."

—

খাসিয়া পাহাড়ে যুগপ্রবর্তক নীলমণি চক্রবর্ত্তী

খাসিয়া পাহাড়ে যুগপ্রবর্ত্তক মানবহিতৈষী নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আধ শতাব্দী পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। চেরাপুঞ্জী তাঁর কাজের কেন্দ্র ছিল। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অধিক বৃষ্টির জন্য চেরাপুঞ্জী বিখ্যাত। উঁচু পাহাড়ো জায়গা, তার উপর বৃষ্টি। সুতরাং এখানে সম্বৎসর শীত লেগেই থাকে।

নীলমণি বাবু যখন খাসিয়া পাহাড়ে যান, তখন সেখানকার ভাষা কিছুই জানতেন না। খাসিয়ারা তাদের কোন নিজস্ব বর্ণমালা ও সাহিত্য অতীত কাল থেকে পায় নি। খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিরা রোমান অক্ষর প্রচলিত করেন এবং তাঁদের ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য কিছু পুস্তক-পুস্তিকাও ঐ অক্ষরে ছেপে প্রকাশ করেন। নীলমণি বাবু খাসিয়াদের ভাষা শিখে ঐ ভাষায় অনেকগুলি ভগবদ্বিষয়ক বাংলা সংগীত অনুবাদ করেন এবং গদ্য পুস্তক পুস্তিকাও অনেক-গুলি ছেপে প্রকাশ করেন। পরে খাসিয়া লেখক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জীবন রায় ও তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায়কে উৎসাহিত ক'রে তাঁদের সাহায্যে খাসিয়া সাহিত্য গ'ড়ে তোলেন। কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে খাসিয়াদের ভাষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্যতম ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, নীলমণি বাবুর চেষ্টা তার মূলে। তিনি খাসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী ছাড়া আরও অনেক-গুলি জায়গায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। সেগুলির কাজ চলছে। অনেক খাসিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করেছে। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হন নি। খাসিয়াদের নানা কুসংস্কার বিনষ্ট করবার চেষ্টা তিনি ক'রেছিলেন এবং তাদের মধ্যে দুর্নীতির পরিপোষক অনেক কুপ্রথা ও কুঅভ্যাস উন্মূলনের চেষ্টা ক'রে বহু পরিমাণে সাফল্য লাভ ক'রেছিলেন। এদের মধ্যে মদ্যপান খুব প্রচলিত ছিল। গাঁজা ও আফিঙের চলনও খুব ছিল। তাতে তাদের নানা রোগ হ'ত এবং নানা দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ছিল। আফিং ও গাঁজার বে-আইনী আমদানীও এরা
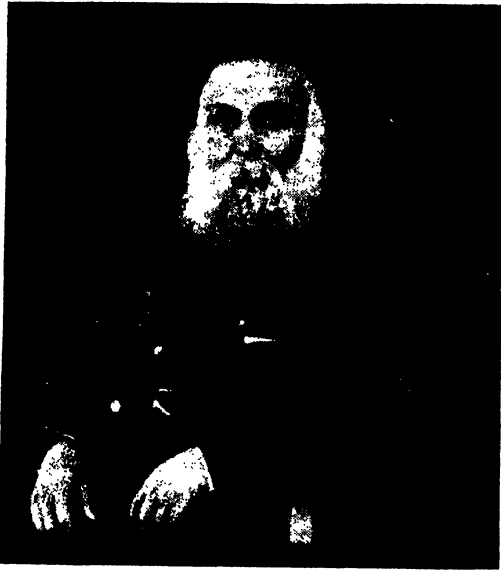
নীলমণি চক্রবর্তী

করত। দেশী :সিপাইদের কাছ থেকে এরা জুয়াখেলা শেখায় তাতেও এদের খুব অনিষ্ট হ'তে থাকে। নীলমণি বাবু এই সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর চেষ্টায় মদ্যপান অনেক কমে গেছে এবং বেআইনী গাঁজার চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। জুয়াখেলাও আর তত বেশী হয় না। এই সব কারণে খাসিয়াদের নৈতিক উন্নতি হয়েছে।

সদুপায়ে যাতে খাসিয়াদের আয় বাড়ে তার জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করেন। তাঁর লেখা "আত্মজীবন-স্মৃতি"তে এই সকলের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। দৈনিক "ভারত" তাঁর লেখা থেকে নিচের বাক্যগুলি উদ্ধৃত করেছেন।

"খাসিয়া জাতির উন্নতির জন্য আমাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কৃষি বিভাগের সহকারিতায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছি। আলুর নূতন প্রকারের বীজ প্রথমে বিতরিত এবং পরে বিক্রীত হওয়াতে কৃষকগণ উন্নত প্রণালীতে আলুর চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে। বর্জন নামে একজন খাসিয়া আমার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া প্রথমে এরারুট প্রস্তুত করিয়া ও পরে 'লেমন গ্রাস অয়েল' প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিল। জয়কৃষ্ণ নামে এক খাসিয়া রাজসাহী হইতে রেশমের চাষ শিখিয়া আসে। যে কফি পূর্ব্বে সাত আট টাকা মণ বিক্রয় হইত, আমার চেষ্টায় কলিকাতার সওদাগর-দিগের নিকট এক্ষণে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা মণে বিক্রয় হইতেছে।"

নীলমণি বাবু জুতা মেরামতের জন্যে মুচির কাজ করতে নিজে শিখেছিলেন এবং স্বয়ং জুতা মেরামত করতেন। ছুতারের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ প্রভৃতিও তিনি জানতেন ও করতেন। খাসিয়া পাহাড়ে যাবার আগে তিনি রাঁধতে জানতেন না। সেখানে তাও করতে হয়েছিল। বাংলায় যে "জুতাসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" প্রবাদবাক্য আছে, নীলমণিবাবুর জীবনে তার দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এক দিকে যেমন জুতা মেরামত এবং অন্যান্য সামান্য কাজ তিনি জানতেন ও করতেন, তেমনি আবার ভগবানের নাম গান, তাঁর আরাধনা, তিনি করতেন, ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ দিতেন; নিজে সাহিত্য রচনা করতেন ও অপরকে সেই কাজে উৎসাহিত করতেন। তিনি বিবাহ করেন নি; চিরকুমার, আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। বিরাশী বৎসর বয়সে গত ৩০শে অক্টোবর তিনি চেরাপুঞ্জীতে দেহত্যাগ করেছেন।

তাঁর "আত্মজীবনস্মৃতি" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

উনিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাশীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। এবার ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাশীতে তার উনবিংশ অধিবেশন হবে। উদ্যোক্তারা একটি দিন আলাদা করে রবীন্দ্রস্মৃতি সম্বর্ধনার জন্য রেখেছেন। এই ব্যবস্থা সাতিশয় সমীচীন হয়েছে। এবার সমুদয় শাখারই অধিবেশন হবে। কাশী তীর্থস্থান বলে প্রতিনিধি-সমাগম খুব হবে। তদ্ভিন্ন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সকল নগরের চেয়ে কাশীতে বাঙালীর সংখ্যা অধিক; তথাকার স্থায়ী অধিবাসী বাঙালীরাও অনেকে অধিবেশনে যোগ দেবেন। এবার সভাগুলি খুব জমাট হবে আশা হয়।

—

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সর্ গঙ্গানাথ ঝা

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন মহাপণ্ডিত হারাইল। তিনি দীর্ঘকাল আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে অধ্যাপকতা ক'রে শেষে তিনবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন, এবং দেশের ও বিদেশের বহু বিদ্বৎসভায় সম্মানিত সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য্য ("Doctor of Literature") পদবী লাভ ক'রেছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' ও পরে 'সর্' উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং সতত

কর্মীদিগকে উৎসাহদানের জন্য সোভিয়েটের প্রচার-বিভাগের চিত্রাবলী

ইয়াণ্টা। ক্রিমিয়া। কৃষ্ণসাগরতীরের প্রসিদ্ধ "ইংরাজ! পথ"

রষ্টভ নগরীর একটি জনাকীর্ণ অঞ্চল

বিদ্যানুশীলনে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, মিথিলায় তাঁর জন্ম। কিন্তু এলাহাবাদেই ঘরবাড়ী ক'রে সেখানকার অধিবাসী হয়েছিলেন।

—

ব্রহ্মদেশের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

যুদ্ধ চলছে; পূর্ব দিক্ থেকে ব্রহ্মদেশের খুব কাছে, এমন কি ব্রহ্মদেশেই এসে পড়তে পারে! ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক্ ত আগেই করা হ'য়ে গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশনিবাসী বাঙালীরা তাঁদের বাৎসরিক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছেন। সম্মেলন হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। প্রধান সভাপতি বাংলা দেশ থেকে মনোনীত হয়ে কেউ যাবেন, শাখা-সভাপতিরা ব্রহ্মদেশ থেকেই মনোনীত হবেন। সেখানকার লোকদের মধ্যে প্রধান সভাপতি হবার যোগ্য লোক যে নাই, তা নয়; আছেন। কিন্তু বাংলা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ রাখবার জন্য ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীরা যে বঙ্গের কোন এক জনকে সভাপতি ক'রে নিয়ে যান, এতে তাঁদের স্বজাতি-প্রীতিই প্রকাশ পায়।

—

"সুবর্ণ-ভূমি"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রেঙ্গুনস্থ ব্রহ্মদেশীয় শাখা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কাজ কিছু কিছু ক'রে থাকেন। ব্রহ্মদেশীয় বাঙালীদের বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলন এরই উদ্যোগে হ'য়ে থাকে। পরিষৎ "সুবর্ণ-ভূমি" নামক একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। তার ১৩৪৭ সালের পৌষ সংখ্যা পেয়েছিলাম। সম্প্রতি বর্ত্তমান বৎসরের সচিত্র শারদীয় সংখ্যা পেয়েছি। উভয় সংখ্যাতেই পাঠযোগ্য অনেক রচনা আছে। এই পত্রিকাখানির স্থায়িত্ব ও সফলতা কামনা করি।

—

"ব্রহ্ম-ভারতী"

"ব্রহ্ম-ভারতী" ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের আর একখানি সাময়িক পত্র। সম্প্রতি এর সচিত্র রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা পেয়েছি। এতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতকগুলি পাঠযোগ্য প্রবন্ধ ও কবিতা আছে, এবং ব্রহ্মদেশের অনেক রবীন্দ্র-শোকসভার বৃত্তান্ত আছে। এটিরও স্থায়িত্ব ও সাফল্য কামনা করি।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধ চলছে; শীঘ্র শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখছি না। চৈনিক জাতি ক্রমশঃ অধিকতর সংঘবদ্ধ ও সংগ্রামে শিক্ষিত হ'য়ে উঠছে। জাপান চীনের যে-সব জায়গা নিয়েছিল, তার কিছু কিছু চীন আবার দখল করছে। অন্য দিকে জাপানের চরমপন্থী যুদ্ধপ্রিয় দল প্রবল হয়েছে এবং তাদেরই এক জন নেতা প্রধান মন্ত্রী হয়েছে। চীন ব্রিটেনের কাছ থেকে ক্রীত যে-সব অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য যুদ্ধসামগ্রী ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে পায়, তা পাবার উপায় বন্ধ ক'রে দেবার নিমিত্ত জাপান ব্রহ্ম-চীন পথ নষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টা করছে। ইন্দো-চীন ও থাই (শ্যাম) দেশের নিকটেও জাপান বিস্তর সৈন্য এনে ফেলেছে। ঠিক্ উদ্দেশ্য এখনও প্রকাশ পায় নাই।

চীন খুব বড় দেশ। এর লোকসংখ্যাও খুব বেশী, এবং লোকদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, ধর্মসম্প্রদায়ভেদেও কোন প্রকার মনোমালিন্য নাই। সমস্ত চৈনিক মহাজাতির ছোট বড় সব লোক স্বাধীনতা রক্ষায় মেতে উঠেছে, অথচ সংযত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করছে। চীনের প্রাকৃতিক সম্পদও খুব বেশী। এমন দেশকে পরাজিত করতে ও নিজের অধীন করে রাখতে জাপান পারবে না।

—

নাৎসী-সোভিয়েট যুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধে প্রথম প্রথম যেমন জাপান ক্রমাগত জিতছিল এবং চীন হারছিল, নাৎসী-সোভিয়েট যুদ্ধেও নাৎসীরা তেমনি খুব দ্রুত কতক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। তার কারণ, রাশিয়া জার্মেনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। তার পর, যত দিন যাচ্ছে রাশিয়া ততই প্রস্তুত হয়ে উঠছে, নাৎসীরা দ্রুত এগোতে পারছে না।

রাশিয়া জার্মেনীর সঙ্গে যেরূপ যুদ্ধ করছে, তাতে তাকে খুব বাহাদুর বলতে হবে। কেন না, জার্মেনী বলতে গেলে রাশিয়া তুরস্ক ছাড়া ইয়োরোপ মহাদেশের আর সব দেশেরই ধন-সামগ্রী নিজের কাজে লাগাতে পারছে। সৈন্যও নাৎসীরা ইটালী রুমানিয়া প্রভৃতি থেকে আমদানী করছে। অন্য দিকে রাশিয়া এ পর্য্যন্ত একা লড়ে আসছিল, এত দিনে হয়ত ব্রিটেনের ও আমেরিকার সাহায্য কিছু তার কাছে পৌঁছেছে।

কিন্তু রাশিয়া জার্মেনীর সঙ্গে কার্যতঃ একা লড়লেও রাশিয়ার সমুদয় প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী স্টালিনের পেছনে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের সংখ্যা প্রাপ্তবয়স্ক জার্ম্যান পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশী। জার্ম্যান নারীদের কথা গণনার মধ্যে ধরছি না এই জন্য যে, রাশিয়াতে নরনারীর অধিকার যেমন সব বিষয়ে সমান, জার্মেনীতে তেমন নয়। হিটলারের

আমলে জার্ম্যান নারীদের স্থান পুরুষদের অনেক নীচে। হিটলারী আমলের আগেও জার্মেনীতে রাশিয়ার মত নর-নারী-সাম্য ছিল না। রাশিয়াতে পুরুষরা লড়ছে ও লড়বে এবং দরকার হ'লে নারীরাও লড়বে। জার্মেনীর শুধু পুরুষেরা লড়ছে ও লড়বে, তাদের সংখ্যা রাশিয়ান পুরুষদের চেয়ে কম। তা ছাড়া, তারা প্রথম প্রথম, "জার্ম্যানরাই আর্য্য ও পৃথিবীর সেরা মানুষ" হিটলারের এই বাক্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন ক্রমেই মোহ কেটে যাচ্ছে, এখন তারা হিটলারের ভয়ে যুদ্ধ করছে। ইটালী রুমানিয়া প্রভৃতির সৈন্যরা যে জার্মেনীর সৈন্যদলে আছে, তাদের তেমন উৎসাহ থাকবার কথা নয়; কেন না তারা বুঝেছে যুদ্ধে জয় হলেও তারা জার্মেনীর সমান অধিকার পাবে না, জার্মেনীর তাঁবেদারিই অনেকটা তাদের ভাগ্যে জুটবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বসাধারণের অধিকার সমান ব'লে, সেখানে তাদের উপর প্রভুত্ব করবার জন্যে পুরোহিতশ্রেণী, অভিজাত ক্ষত্রিয়সামন্তশ্রেণী এবং পরগাছা মধ্যবিত্তশ্রেণী নাই বলে, সবাই দেশটাকে পুরামাত্রায় নিজের জেনে লড়ছে ও লড়বে। দেশটাও অতি বিশাল। তাকে জার্মেনী সৈন্যদল দ্বারা ছেয়ে ফেলতে পারবে না। তার প্রাকৃতিক সমৃদ্ধিও প্রায় অফুরন্ত।

দেশের সব লোকদের দেশাত্মবোধ আততায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হবার এবং স্বাধীন থাকবার পক্ষে খুব আবশ্যক। ভারতবর্ষ যে বার বার পরাজিত হয়েছে তার একটা কারণ, এদেশে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়বৎ লোকেরা লড়েছে, কিন্তু অন্যেরা যারা জনগণের অধিকাংশ, তারা দেশের জন্য লড়ে নি। একথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব যুগের পক্ষে সত্য না হলেও মোটের উপর সত্য।

শিবাজী যে প্রবল পরাক্রান্ত মোগলদিগকে হারিয়ে দিয়ে দুর্ধর্ষ হ'তে পেরেছিলেন, তার একটা কারণ তিনি নিম্ন শ্রেণী থেকেও সৈন্য ও সেনানায়ক নিয়েছিলেন, তাঁর সৈন্যদলে "অস্পৃশ্য" লোকেরাও অন্যদের সমান পদ ও মর্য্যাদা পেয়েছিল।

এখনও ভারতবর্ষকে যুদ্ধ ক'রেই স্বাধীনতা পেতে হবে যদিও তা বাহুবলের ও অস্ত্রের সংগ্রাম নয়। কিন্তু এই নিরস্ত্র সংগ্রামেও দেশের সব লোকের অধিকার ও রাষ্ট্রিক মর্যাদা সমান হওয়া চাই। হিন্দুর জাতিভেদ ভেঙে দিতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ মৌলানা মৌলবী মোল্লাদের সঙ্গে মোমিন জোলা প্রভৃতির যে পার্থক্য আছে, তাও ভেঙে ফেলতে হবে।

—

ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য অষ্ট্রেলিয়ান সেনানায়ক

ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য গবর্মেণ্ট অষ্ট্রেলিয়া থেকে অফিসার আমদানী ক'রে ভারতবর্ষের যে অপমান করছেন, তার উপর জোর দিচ্ছি না—পরাধীন জাতির আবার মান অপমান কি? কেঁদে সোহাগ পাবার চেষ্টা নূতন অপমান ডেকে আনা।

কিন্তু একথা ব'লতেই হবে, গবর্মেণ্টের এ কাজটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। ভারতবর্ষেই অগণিত যুবক আছে যারা উৎকৃষ্ট সৈনিক ও সেনানায়ক হ'তে পারে। তাদের সকলকে কাজে লাগান উচিত। ভারতের সাধারণ সিপাই ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পায়; অথচ এদেশে অফিসার হবার যথেষ্ট লোক নাই, এটা মিথ্যা কথা। আজকালকার যুদ্ধ দু-দশ হাজার দু-দশ লাখ লোকের লড়াই নয়। স্টালিন বলেছেন, শুধু রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধেই জার্মেনীর পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়েছে। হিটলারের হিসাবে রাশিয়ার হতাহতের সংখ্যা আরও বেশী। সুতরাং ভারত-গবর্মেণ্ট যে বলেছেন, অচিরে ভারতবর্ষের দশ লক্ষ সৈনিক শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে—এখনও হয় নি, ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুদ্ধে নামতে হ'লে তার ঐ দশ লাখ কত দিন টিকে থাকবে? জার্মেনী রাশিয়া উভয়েরই লোকবল ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক কম; তবু তারা প্রত্যেকে কোটির উপর সৈন্য যুদ্ধশিক্ষিত ক'রেছে। ভারতবর্ষকে যদি তাই করতে হয়, তা হলে কোটি-পরিমিত সিপাহীর অফিসার ব্রিটেন জোগাতে পারে না—এখনই পারছে না, অষ্ট্রেলিয়াও পারবে না। তার মোট লোকসংখ্যাই এক কোটির কম, এবং তার থেকে তার আত্মরক্ষার সৈন্য ও অফিসার চাই। অন্য ডোমীনিয়ন-গুলির অবস্থাও ঐরূপ।

ভারতবর্ষকে কোনো মতেই আত্মমর্য্যাদাশালী হ'য়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে দেব না, ব্রিটেনের এ রকম কোন জেদ আছে কিনা জানি না। কিন্তু তা থাকা উচিত নয়—ন্যায়পরায়ণতার দিক্ দিয়ে নয়, সাংসারিক বুদ্ধির দিক দিয়েও নয়।

—

"জন-সেবা সমিতি"

"জন-সেবা সমিতি" থেকে কুমার বিশ্বনাথ রায় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি সুচিন্তিত। তিনি লিখে ও প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, অপরকে যা বলছেন নিজে তা

করছেন। "জন-সেবা" পুস্তিকাটির শেষে তিনি ঠিকই বলেছেন—

আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা বহু দিন হ'তেই আরম্ভ হয়ে গেছে। তবুও তাকে আরও স্পষ্ট ও প্রকৃত রূপ দিতে হলে জড় মানবের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হবে; কর্ম্মময় মানুষকে দিতে হবে সপ্তসিন্ধু, অনন্ত আকাশ ও সমগ্র পৃথিবীর অন্তরে বাহিরে অবাধ গতি! রূপান্তরিত করতে হবে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার আসুরিক অভিযানকে বিশ্বমানবতার কল্যাণে, তাঁর সেবায়! আর সহায়তা করতে হবে, অবকাশ দিতে হবে বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষিগণকে, যাঁরা সাধনা করবেন দিব্য জীবনের, সৃষ্টি করবেন উন্নত সমাজের ও আদর্শ রাষ্ট্রের। তখনই আসবে আদর্শ যুগ। আর সে যুগ একদিন আসবেই আসবে।

—

শ্রীগুরু সেবাশ্রমের বঙ্গভাষা-প্রচার বিভাগ

শ্রীগুরু সেবাশ্রমের বঙ্গভাষা-প্রচার বিভাগ সমুদয় বাঙালীর সমর্থন লাভের যোগ্য। ইহা দ্বারা প্রকাশিত "ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে বঙ্গভাষার উপযোগিতা" পুস্তিকাটি সব শিক্ষিত বাঙালীর পড়া উচিত। কলকাতার ৩৬ বি, মহানির্বাণ রোডে শ্রীমণিময় প্রামাণিক মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। "বিনিময় দান" এক আনা মাত্র। এই পুস্তিকার ১১ পৃষ্ঠার শেষে একটি খুব সত্য কথা বলা হয়েছে—

"হিন্দী বাংলাকে ডিঙ্গিয়ে রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করতে চায়, এর মূলে দেখতে পাওয়া যায় হিন্দীভাষীদের উৎসাহের আধিক্য এবং বাংলাভাষীদের ঔদাসীন্য ও (তথাকথিত) বিশ্বপ্রেমিকতা।"

—

দামোদরের বন্যায় বিপন্ন গ্রামবাসীরা

দামোদরের বন্যায় এ বৎসর বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার যে-সকল গ্রামের লোক বিপন্ন হয়েছেন (অনেকে গৃহহীনও হয়েছেন), গবর্ন্মেণ্টের ও সর্বসাধারণের তাঁদের সাহায্য নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু খুব বেশী বন্যা হ'লেই কতকগুলি গ্রাম উৎসন্ন হবেই, এই রকম বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয়। বন্যার প্রতিকারের অনেক চেষ্টা আমেরিকার এঞ্জিনীয়ারেরা ও রাশিয়ার এঞ্জিনীয়ারেরা করেছেন, এবং তাতে অনেক ফলও পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে কার্য্যগত চেষ্টা কমই হয়েছে। পঞ্জাবে ডক্টর নলিনীকান্ত বসু সরকারী গবেষণাগারে কিছু গবেষণা করেছেন। তাঁকে বাংলা দেশেও একবার আনা হয়েছিল। নদনদী সম্বন্ধে গবেষণার একটা আফিসও বসে হবে শুনেছিলাম। কি হয়েছে, জানি না।

দেওলীর বন্দীদের প্রায়োপবেশন

দেওলীতে যে-সকল লোককে আটক করে রাখা হয়েছে, তাঁদের এক জনও বিচারান্তে দণ্ডিত হন নি, সবাই বিনা বিচারে দণ্ডিত। সুতরাং সকলকেই নিরপরাধ মনে করা অন্যায় হবে না। এঁদের নানা অভাব অভিযোগ আছে। সাত মাস আগে একটি দরখাস্ত করে গবর্ন্মেণ্টকে তাঁরা সব কথা জানিয়েছিলেন; কোন ফল হয় নি। তার পর কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য শ্রীযুক্ত জোশী দেওলী গিয়ে নিজে দেখে শুনে রিপোর্ট দেন যে তাঁদের অনেক সত্য অভিযোগ আছে। তাতেও কোন ফল হয় নি। বন্দীরা উপবাস-ধর্ম্মঘট করায় তিনি এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব আইন-সভায় উপস্থিত ক'রেছিলেন; বৃথা চেষ্টা। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় এ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারী বলেন, বন্দীরা উপবাস ত্যাগ না করলে তাদের অভিযোগ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হবে না। হৃদয়হীন বিদ্রূপ! এই যে সাত মাস তাঁদের অভিযোগগুলা এই কর্ম্মচারীর সম্মুখে ছিল, এত দিন ত তারা উপবাস করে নি; তখন কেন বিবেচনা করা হয় নি? উপবাস না করলেও বিবেচনা হবে না, করলেও বিবেচনা হবে না। অদ্ভুত তামাশা।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। কর্ত্তারা কি রকম আলোচনা করছেন জানি না। রাজনৈতিক বন্দী প্রধানতঃ দু-রকম। যাঁরা বিনা বিচারে বন্দী হয়ে আছেন, তাঁদের মুক্তি দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। যাঁরা সত্যাগ্রহ ক'রে বিচারান্তে বন্দী হ'য়েছেন, তাঁদিগকে মুক্তি দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, যদি সত্যাগ্রহীরা মুক্তি পান, তবে তাঁদের মধ্যে যাঁদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় নি আবার সত্যাগ্রহ করা তাঁদের কর্ত্তব্য হবে। সুতরাং গবর্ন্মেণ্ট তাঁদিগকে আবার জেলে পাঠাবেন। তাঁদের এই পুনঃ পুনঃ জেলে যাওয়া নিবারণ করতে হলে সত্যাগ্রহের মূল কারণ উচ্ছেদ করতে হবে; অর্থাৎ কংগ্রেসকে যুদ্ধ সম্বন্ধে ও অন্য সব বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। গবর্ন্মেণ্ট তা দিতে রাজী হবেন কি?

—

কংগ্রেসীদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পুনরালোচনা

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ভাল কাজ কিছুই করতে পারেন নি এমন নয়। কিন্তু সেই ভাল কাজে মন দিতে গিয়ে

কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য, দেশকে স্বাধীন করা, চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। এখন কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি গ্রহণ করলে তাঁরা কিছু কিছু প্রাদেশিক হিত সরকারী ভাবে করতে পারবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোদ্যমে খুব সাহায্য করতেও লেগে যেতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ত্যাগ ক'রে, তাঁর অহিংসাবাদে জলাঞ্জলি দিয়ে কংগ্রেস নেতারা তা করবেন কি?

উপরে বলেছি, মন্ত্রিত্ব নিলে তাঁরা সরকারী ভাবে কিছু কিছু প্রাদেশিক হিত করতে পারবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমগ্র ভারতীয় হিত কিছুই করতে পারবেন না। এবং তাঁরা বাংলা পঞ্জাব আসাম ও সিন্ধুকে যেমন অবহেলা ক'রে আসছেন, সেই অবহেলার ভাবটাও কায়েম থাকবে।

—
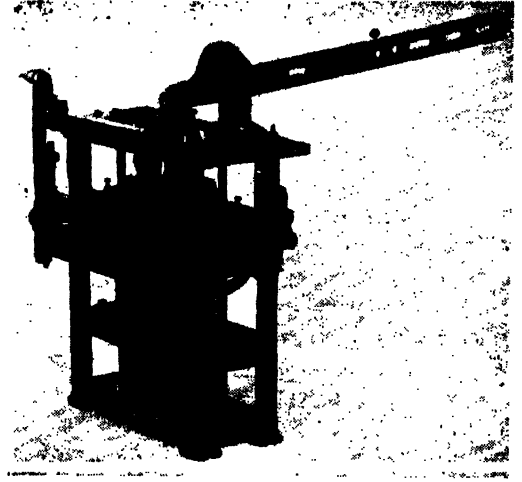
বিষ্ণুপুরের জ্যাকার্ড কল

জ্যাকার্ড কল

রেশমী ও সুতী কাপড়ের নানা রকম সুন্দর সুন্দর পাড় যে যন্ত্রের সাহায্যে বোনা হয়, তাকে জ্যাকার্ড বলে। এর উদ্ভাবক জ্যাকার্ড নামক এক জন ফরাসী যন্ত্রনির্মাতার নাম অনুসারে কলটির এই নাম হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে এই কল তৈরি হচ্ছে। বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কন্‌ফারেন্সের সঙ্গে যে প্রদর্শনী হ'য়েছিল তাতে বিষ্ণুপুরে তৈরি এই কলে বেশ কাজ হচ্ছে দেখেছিলাম। মূল্যাদি বিজ্ঞাপনে দেখুন।

তুমি নাই

শ্রীকানাই সামন্ত

ঘোরঘটা ক'রে এল শ্রাবণের মেঘে;
বৃথা বায়ুবেগে
টলোমল্ টলোমল্ সংগীতশতদল
অন্তরতরঙ্গে উঠিতে চায় রে হায় জেগে।
তুমি নাই, তুমি নাই, এ প্রভাতে তুমি নাই;
তব আঁখিঅনুরাগ আকাশে বাতাসে আছে লেগে॥

শরৎলক্ষ্মী ফিরে' শেফালির বনে,
স্মিতপ্রফুল্ল কাশে,
শিশিরিত ঘাসে ঘাসে,
নবীন ধানের মাঠে,
আলো-ঝলোমলো নীল নভঅঙ্গনে—
তোমারে কি খুঁজে পাবে নব গানে নব ভাবে
আলো-ভালো-লাগা চির পুলকআবেগে?
তুমি নাই, তুমি নাই, সে লগনে তুমি নাই;
তব কণ্ঠের সুর নীলিমায় নীল রঙে লেগে॥

বসন্তবনতলে কৌমুদীবন্যায় বায়ুহিন্দোলে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে প্রাণে যবে ঢেউ তোলে,
ছন্দ যদি সে ভুলে,
অশ্রু যদি গো দুলে
সহসা নয়নকূলে—
চিরবসন্তধনে
কেমনে ফিরাব আর, কোন্ দেবতার বর মেগে?
তুমি নাই, তুমি নাই; মধুযামিনীতে তাই
উৎসব ম্লান হবে বিরহবিষাদখানি লেগে॥

রবীন্দ্রনাথের কথা—আমার পরিচয়

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি স্বর্গগত। তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার আশ্রমে তাঁহার সান্নিধ্যে তাঁহার সাহচর্য্যে দীর্ঘকাল আমার জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আশ্রমে কবির নিকটে এই দীর্ঘবাসে আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা আমার অন্তিম জীবনপথের আমরণান্ত সারবান্ পাথেয়—অমূল্য রত্ন। অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিলে বুঝিতে পারি, কবির আশ্রয় পাইয়া সংসারের শিক্ষণীয় নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভে আমি কত দূর অগ্রসর হইয়াছি। জীবনের এই নানা বিষয়ে উৎকর্ষ, সজ্জন-সঙ্গতির—কবির আশ্রমে আশ্রয়ের সুফল। আমি সামান্য ব্যক্তি, এই মহদাশ্রয়ের কথা আমি কখনও ভাবি নাই—সে ভাবনায় আমার অধিকারও ছিল না—ইহা স্বপ্নেরও অগোচর বিষয়। ইহা ভাগ্যচক্রের ফল, কি ঘটনাচক্রের ফল, তাহা বলিতে পারি না—যে চক্রের ফলেই হউক, চক্রে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে কবিচক্রবর্ত্তীর চরণে চরম আশ্রয় পাইয়াছি. ইহাই বলিতে পারি। তাই মনে হয়, ভবিতব্যতা বলবতী সর্ব্বহরা—সে আপনার পরিণতি—শুভই হউক, আর অশুভই হউক—সকল বাধা-বিঘ্ন সর্ব্বাতিশায়ী শক্তিতে অভিভূত করিয়া সংঘটিত করিবেই করিবে—তাহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আমার এই মহদাশ্রয়লাভ সেই ভগবতী ভবিতব্যতার সুপরিণাম—শুভ ফল। এই ফলের ক্রমপরিণতির বিষয় এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

আমার বড়দাদা (পিসতুতো ভাই) স্বর্গগত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষিদেবের জোড়াসাঁকোর বাটীতে সদর বিভাগে খাজাঞ্চির কার্য্য করিতেন। সুদূর পল্লীগ্রামে ছাত্রজীবনে আমি যখন হাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যার্থী, তখন সুবিধামত ছুটিতে কলিকাতায় বড়দাদার কাছে আসিতাম। যে কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিতাম বড়দাদার আপিসে আসা আমার প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল। প্রায় সমস্ত অপরাহ্ণ এই আপিসেই কাটিত। এই সময় বড়দাদার কাছে কবির বিদ্যোৎসাহিতা, বিদ্যানুরাগিতার কথা, কবি-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা ও কবি-চরিত্রের নানা-বিষয়ক কথা তন্ময় হইয়া আনন্দের সহিত শুনিতাম। আমার পিতাঠাকুর দরিদ্র ছিলেন, অতি কষ্টে আমার লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করিতেন। বড়দাদা ইহা জানিতেন। এক দিন তিনি কবির নিকটে এই বিষয় জানাইয়া, আমার লেখাপড়ার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার এইরূপ সাহায্য প্রার্থনায় কবি তাঁহার নিকটে আমাকে লইয়া যাইতে বলেন। আমি তখন আপিসেই ছিলাম—ইহার কিছুই জানিতাম না। বড়দাদা আসিয়া আমাকে সকল কথা বলিয়া কবির নিকটে লইয়া গেলেন। কবি তখন স্বর্গীয় দ্বিপুবাবু মহাশয়ের সহিত দোতলার একটি ঘরে জাজিমপাতা বিছানায় বসিয়া ছিলেন। আমি বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলে, কবি আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন—আমি কবির নিকটে এক পাশে বসিলাম। কবি তখন আমাকে লেখাপড়ার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার তাহা মনে নাই। যাহা হউক, পরে শুনিলাম, কবি আমাকে মাসিক কিছু সাহায্য করিবেন। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম—ইহাতে পিতাঠাকুরের ভার-লাঘব হইল—ছাত্রজীবনের পথও কিছু অবাধ হইল। কিন্তু বিশেষ আনন্দের কারণ—কবির সহিত সাক্ষাৎকার। আমি পল্লীবাসী মূর্খ বালক—অনায়াসে সৎ কবির দর্শন-লাভ হইল—তাঁহার কৃপাপাত্র হইলাম—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। মনে হইতেছে, তখন আমার কিছু সৌভাগ্য-গর্ব্বও হইয়াছিল। আমি দরিদ্র—কবিপ্রদত্ত এই বৃত্তি আমাকে যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত আশা দিয়াছিল, তাহা অনুমানেরই বিষয় বলিবার নয়। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি এই বৃত্তিই তাহার মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কিছু বিদ্যালাভ হইয়াছিল, এই বৃত্তিই তাহার ভিত্তি।

কলেজে অধ্যয়নের ব্যয়বাহুল্য পিতাঠাকুর কষ্টেসৃষ্টে বহন করিতেছিলেন। পটলডাঙ্গার মল্লিক বাবুদের ছাত্রগণের সাহায্যার্থ একটি ফণ্ড্ ছিল। এক বন্ধুর নিকটে সন্ধান পাইয়া, কলেজের বেতনের নিমিত্ত ফণ্ডের সম্পাদকের কাছে আবেদন করিয়াছিলাম। এই দরখাস্তের সহিত কবির একটি সার্টিফিকেট ছিল। তাহার

কথাগুলি আমার ঠিক মনে নাই, তবে তাহার ভাবার্থ এইরূপ—"আমি এই ছাত্রটিকে কিছু দিন অর্থসাহায্য করিয়াছি। ছাত্রটি কোনস্থানে অর্থসাহায্য পাইলে বিশেষ সুখী হইব।" Indian Mirror-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ফণ্ডের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কবির সার্টিফিকেট দেখিয়াই আবেদনপত্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন—আমি ফণ্ডের সাহায্য কিছু দিন পাইয়াছিলাম। কলেজে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করিতে করিতে নানা কারণে আমার ছাত্র-জীবনের শেষ ও সাংসারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। আমি দরিদ্র, সহায়-সম্পত্তির বলে কার্য্য পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহারই বিনিময়ে পল্লীগ্রামের ও পরে কলিকাতার বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতাম, তাহাতে পিতাঠাকুরের সংসারভার বহনের ক্লেশ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইত।

এক দিন বড়দাদার মুখে কথায় কথায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা শুনিলাম। ছাত্রজীবনে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেখানেই যে কার্য্যেই থাকি না কেন, বিদ্যালোচনা, বিশেষতঃ সংস্কৃতের চর্চ্চা কখনও ত্যাগ করিব না। এই জন্যই আমি সর্ব্বদাই শিক্ষাবিভাগের কার্য্যেরই পক্ষপাতী ছিলাম। বড়দাদা বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপকেরা পরম সুখে অধ্যাপনা করেন—প্রভুর সমদর্শিতায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি শ্ববৃত্তি বলিয়াই বোধ হয় না, অধ্যাপনাদি সকল কার্য্যেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আহারের বিষয়ে পরাধীনতা থাকিলেও, তাহা সুখকর ও স্পৃহণীয়, কারণ শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের মনস্বিনী জননী প্রত্যহই নিয়মিত ভাবে সুখভোগ্য আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। শিক্ষকতায় পরাধীনতার তীব্র আস্বাদের সহিত আমি পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলাম, সুতরাং ঐরূপ স্পৃহণীয় অধ্যাপনাদির বিষয় শুনিবামাত্রই আমার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু আমার বিদ্যাবত্তার গভীরতা নিতান্ত অল্প, আমি সে আশ্রমে অধ্যাপকমণ্ডলীতে "হংসমধ্যে বকো যথা", সুতরাং আমার সে স্পৃহা উদ্বাহু বামনের প্রাংশুলভ্য ফলপ্রাপ্তির আশার ন্যায় নিতান্ত উপহাসাস্পদ, ইত্যাদি নানা প্রকারে নিজ বিদ্যাবত্তার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়া, আমি দুরাকাঙ্ক্ষ মনকে কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিলাম—তখন জানিতে পারি নাই যে, আমার ভাগ্যবিধাতা আমার পরোক্ষে "তথাস্তু" বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় আমার সেই অলীক আশা সফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইহার কিছু দিন পরে আমার বড়দাদা একদিন কবির নিকটে তাঁহার পূর্ব্ব প্রদত্ত বৃত্তির উল্লেখপূর্ব্বক আমার পরিচয় দিয়া মফস্বলে আমার জন্যে একটি কার্য্যের প্রার্থনা করিলে, কবি তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন এবং তদানীন্তন সদর-নায়েব অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া মফস্বলে কোন একটি কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই আমি কার্য্য পাইলাম—আমি কালীগ্রাম পরগণার সদরকাছারি পতিসরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইলাম। তখন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কালীগ্রামের ম্যানেজার ছিলেন। ১৩০৯ সালে শ্রাবণের প্রথমে আমি পতিসরের কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। তখন ভয়ানক বর্ষা। পতিসরের চারিদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর বর্ষার মহাপ্লাবনে একাকার হইয়া গিয়াছে—কোথাও কিছুই দেখা যায় না—কেবল বহুদূরব্যাপী নিমগ্নপ্রায় হরিত ধান্যশীর্ষ-সমূহ, আর সেই হরিতসাগরের মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে দূর হইতে প্রতীয়মান গ্রামবাসীর তৃণাচ্ছাদিত গৃহসমূহের পঞ্জরনিকর। এইরূপ ভীষণ বর্ষায় ম্যানেজারবাবু আমাকে মফস্বল যাইতে দিলেন না—আমি কাছারিতেই কিছু কিছু কাজ করিতে ও শিখিতে লাগিলাম। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল।

কবি এই সময়ে জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এক দিন কর্ম্মচারীদিগের নিকটে শুনিলাম, শ্রীযুত বাবুমহাশয় (অর্থাৎ কবি) শিলাইদহে আসিয়াছেন। দুই-এক দিনের মধ্যেই জলপথে এখানে আসিবেন। প্রভুর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকারের সুযোগ হইবে ভাবিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পরদিন শুনিলাম শ্রীযুত বাবুমহাশয় আসিতেছেন, অদূরে বোটের মাস্তুল ধান্যশীর্ষ ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, অবিলম্বেই বোট ঘাটে আসিয়া লাগিবে। সকলেই দেখা করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। আমিও দেখাদেখি প্রস্তুত হইলাম। এদিকে যথাকালে বোট ঘাটে আসিয়া লাগিল। কর্ম্মচারীরা পদগৌরবানুসারে অগ্রপশ্চাদ্‌ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বোটের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে বোটের মধ্যে গিয়া যথারীতি প্রভুর পাদবন্দনাদি করিলেন, আমিও সামাজিক নিয়মে সবিনয়ে ভক্তিভাবে প্রণতি করিলাম। আমি নূতন কর্ম্মচারী, সুতরাং এখন সাক্ষাৎকারে প্রথমে আমার সহিত বিশেষ কথোপকথনের সম্ভাবনা নাই—দুই-একটি কুশলপ্রশ্নাদির পরে, আমি পূর্ব্ববৎ প্রণতি করিয়া বিদায় লইয়া আমার

ঘরে আসিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে এক জন আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন,—"বাবুমহাশয় আপনাকে ডাকিতেছেন, আসুন"। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে বোটে গিয়া কবির সম্মুখে দাঁড়াইলাম, কবি স্বাভাবিক মধুর বাক্যে আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন, আমি বসিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কি কর?" আমি বলিলাম—"আমিনের সেরেস্তায় কাজ করি।" ইহার পরে বলিলেন,—"দিনে সেরেস্তায় কাজ কর, রাত্রিতে কি কর?" আমি বলিলাম—"সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি ও কিছুক্ষণ একখানি বইএর পাণ্ডুলিপি দেখিয়া press-copy প্রস্তুত করি।" পাণ্ডুলিপির কথা শুনিয়া কবি উহা দেখিতে চাহিলেন। আমি ঘরে আসিয়া পাণ্ডুলিপি লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ দেখিয়া কবি আমাকে পাণ্ডুলিপি ফিরাইয়া দিলেন, কিছুই বলিলেন না। আমি বিদায় লইয়া ঘরে আসিলাম।

এইরূপে পতিসরের কাছারিতে শ্রাবণ মাস অতীত হইল। ভাদ্রের প্রথমে এক দিন ম্যানেজার বাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবুমহাশয় আপনার নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—'শৈলেশ! তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও।' এ বিষয় আপনার মত কি?" বলা বাহুল্য, আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার স্বভাবের অনুরূপ হয় নাই। সুতরাং ঐরূপ অচিন্তিত সুসংবাদ শুনিয়াই আমি আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলাম, ভাবিলাম আমার আন্তরিক প্রার্থনা বুঝি পূর্ণ হইতে চলিল। আমি প্রস্থানের জন্য সজ্জিত হইয়া বিদায় লইয়া নৌকায় আত্রাই স্টেশনে আসিলাম এবং রাত্রি (বোধ হয়) দশটার মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কার্য্য থাকিলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি কলিকাতায় অপেক্ষা করিলাম না, পরদিন সকালের গাড়ীতেই শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সহিত দেখা করিলাম। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। কবি আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। এতদিনে আমার আশা সফল হইল—আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক হইলাম। কিছুদিন অধ্যাপনার পরে, এক দিন কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিচরণ! তুমি কি এই স্থানেই অধ্যাপনা করিবে, না পতিসরে ফিরিয়া যাইবে?" আমি উত্তরে জানাইলাম—"আশ্রমের কার্য্য আমার ভালই লাগিতেছে, আমি পতিসরে যাইতে ইচ্ছা করি না।" কবি শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, "বেশ! তবে এখানেই থাক।" আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তদবধি আমি এই আশ্রমের অধ্যাপক ছিলাম।

আমি যখন কলেজের বিদ্যার্থী ছিলাম, তখন পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট কাব্যাংশ ভিন্ন অন্য সংস্কৃত কাব্যের সহিত আমার পরিচয়ের অবসর হয় নাই। কোন সংস্কৃত কোষের বা পাণিনির পূর্ণগ্রন্থ আমি দেখি নাই—টীকায় উদ্ধৃত খণ্ডিত কোষাংশ ও পাণিনির সূত্রাংশ দেখিয়াছিলাম, সুতরাং আশ্রমের পুস্তকালয়ে সম্পূর্ণ সংস্কৃতকাব্যকোষ ও পাণিনি পাইয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। আমি উৎসাহের সহিত ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া নূতন নূতন বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময়ে কবির নির্দ্দেশানুসারে বালকগণের অধ্যাপনার্থ আমি "সংস্কৃতপ্রবেশ" রচনা করিতে আরম্ভ করি। এই পুস্তক রচনার সময়ে কবি এক দিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বাঙ্‌লা ভাষার অভিধান-সঙ্কলনের কথা বলেন। "সংস্কৃতপ্রবেশ"-এর তিনখণ্ডের রচনা শেষ করিয়া, আমি কবির পূর্ব্বপ্রস্তাবানুসারে ১৩১২ সালে অভিধানের কার্য্য আরম্ভ করি। অভিধানের সঙ্কলন-কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে আমাকে কলিকাতার কলেজে কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ে সঙ্কল্পিত অভিধানের কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাত-জন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও, আমার এ দুঃখনিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না—কেবল অবসরক্রমে মধ্যে মধ্যে যোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া কবির নিকট মনের বেদনা জানাইয়া গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া আসিতাম। সহৃদয় মহাত্মার নিকটে কোন সদ্বিষয়ের নিবেদন ব্যর্থ হয় না—আমার বেদনার নিবেদন সার্থক হইল—কবির মন বিচলিত হইল—তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া অভিধানের বিষয় জানাইয়া, বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার কথা বলিলেন—মহারাজও তদনুসারে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিবেন, স্বীকার করিলেন। এইরূপে আমার অর্থাভাবের মীমাংসা হইলে, কবি দেখা করার জন্য আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার নিকটে বৃত্তির ব্যবস্থার কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমার জন্যই কবি ভিক্ষুবেশে অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে

ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদনের চেষ্টা করিলাম—কিন্তু বাষ্পকলুষকণ্ঠে ভাষা ফুটিল না—কেবল অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম—বিগলিত অশ্রুধারা মনের ভাব ব্যক্ত করিল, নত হইয়া কবির পদরজ মস্তকে ধারণ করিলাম। কবি আমার হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পারিলেন—ধীর সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন—"স্থির হও, আমার কর্ত্তব্যই করিয়াছি।" আমি আর কিছু বলিলাম না—পাদস্পর্শ করিয়া বিদায় লইলাম। ইহার কয়েক দিন পরেই আমি কবির অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার আশ্রমে আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলাম এবং বৃত্তিলাভে উৎসাহিত হইয়া বহু দিনের পরে অভিধানের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ মনোযোগ দিলাম। এই সময়ে এক দিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন—"মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অভিধান-সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু নাই।" কবিগুরুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল—ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ১৩৩০ সালে ১১ই মাঘ অভিধানের সঙ্কলন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলাম।

ইহার পরে দীর্ঘ কাল নানা বাধাবিঘ্নে অভিধানের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিতে পারি নাই। অবশেষে ১৩৪০ সালে বৈশাখ মাসে ইহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয় এবং তদবধি প্রতি মাসে খণ্ডে খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

কবির সহিত আমার পরিচয় কিরূপে হইয়াছিল এবং সেই পরিচয়ে কি ফল হইয়াছে—এই বিষয় লইয়াই আমি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার বক্তব্য যে, উপরিলিখিত ঘটনাপরম্পরা আমার সে অভিপ্রেত বিষয়-সিদ্ধির অনুকূল হইবে, বোধ হয়।

আমার বিশেষ দুঃখের বিষয় যে, যাঁহার প্রদত্ত বৃত্তি পাথেয় রূপে মাসে মাসে আমাকে নব নব উৎসাহ দিয়া আমার সুদীর্ঘ কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য দিয়াছিল, সেই স্বর্গগত দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের করকমলে তাঁহার অভীষ্ট অভিধান মুদ্রিত আকারে সমর্পণ করিবার সৌভাগ্যের দিন আমার জীবনে আসিল না।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার সহিত পরিচয়ে আমি নানা প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছি—যাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় উৎসাহিত হইয়া এই অভিধান-সংকলনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম—যাঁহার সংসর্গগুণে আমার মানসিক মালিন্য অপনীত ও নবজন্ম-লাভ হইয়াছে, সেই পূজ্যপাদ পিতৃবৎ ভক্তিভাজন কবিগুরুর করকমলে মুদ্রিত অভিধানের শেষ খণ্ড সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখের আশীর্ব্বাদ লাভ করার সৌভাগ্যলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। "তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ করুণাময় স্বামী"—এই কবিবচনই এখন সান্ত্বনালাভের একমাত্র উপায়।

আমি কবির নিকটে যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, যেন সেই ঋণস্মৃতি আমরণ আমার অন্তরে জাগরূক থাকিয়া চিত্তকে তদভিমুখে ভক্তিপ্রবণ করিয়া রাখে, ইহাই এক্ষণে ভগবানের নিকটে আমার প্রার্থনা।

রুষের অগ্নিপরীক্ষা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শত্রুসেনাপ্লাবিত ইয়োরোপীয় রুষ দেশে যুদ্ধদেবতার রণতাণ্ডব অল্প যেন মন্থর ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহার কারণ শীতের দারুণ প্রকোপ অথবা জার্ম্মান বাহিনীর ক্লান্তি তাহা এখনও সুস্পষ্ট নহে। জার্ম্মান প্রচার বিভাগ অবশ্য বলিয়াছে যে "বর্ত্তমান আবহাওয়ার ভয়াবহ অবস্থায় সেনা চালনার চেষ্টা বাতুলতা," কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট প্রচার বিভাগও জানাইয়াছে যে মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে অবিরাম শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী ও রণসম্ভারের সরবরাহ চলিয়াছে যাহাতে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে ঐ দিক্ হইতে আক্রমণ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডস্থ সোভিয়েট দূত মায়স্কি বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহের ব্যবস্থায় "জেনারেল" শীত ও "জেনারেল" কর্দ্দম বিশেষ কার্য্যক্ষম নহেন। এ কথাও অনেক যুদ্ধ-বিশারদ বলিয়াছেন ও বলিতেছেন যে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাদা জমিয়া মাটি শক্ত হইলে সৈন্য ও যুদ্ধশকট চালনার কোনও বাধা থাকিবে না। সুতরাং বর্ত্তমানের অবিশ্রাম বৃষ্টিতে পথঘাট ও সমরক্ষেত্র মহাপঙ্কে পূর্ণ জলায় পরিণত হওয়ায় শত্রুর যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও থাকিবে না।

ইহা নিঃসন্দেহ যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ ও সওয়া শত বৎসর পূর্ব্বেকার নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে বহু প্রভেদ। কিন্তু রুষ দেশের মরু অঞ্চলের শীত অতি ভয়ানক হিম তুষার তুহীনময় ঝঞ্ঝাবাতপূর্ণ জীবসংহারী ঋতু। যুদ্ধশকট যন্ত্রবিশেষ, সুতরাং শীত গ্রীষ্মে তাহার গতির সামান্যই

মস্কো। "লাল" চত্বরে প্যান্জার যুদ্ধশকট-বাহিনী

ইতরবিশেষ হইতে পারে কিন্তু যে সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযান করিবে তাহারা তো পূর্ব্বেকারই মত মানুষ। এক দিকে বিপক্ষের সেনাদলের বল পরীক্ষা ও অন্য দিকে শীতরূপী কালান্তক যমের হস্তক্ষেপ হইতে আত্মরক্ষা এই দুই কার্য্যে তাহাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে সন্দেহ নাই। বিগত ১৯৩৯-৪০ সালের রুষ-ফিন যুদ্ধে অগণিত যুদ্ধশকট ও যুদ্ধযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও রুষদল শীতের কয়মাস বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই কেবলমাত্র এই ঋতুর প্রকোপে।

জার্ম্মানগণ বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং তাহাদের সেনাদল সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার ব্যবস্থায় সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত, সে কারণে হয়ত যুদ্ধক্লিষ্ট ও শ্রান্তক্লান্ত সোভিয়েট সেনাবাহিনী এ কয় মাস ততটা রেহাই পাইবে না যতটা তাহাদের অতি বিশেষ প্রয়োজন। তবে কিছু মাত্রায় যে যুদ্ধবিরতি ঘটিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না শীতের আবহাওয়ায় সৈন্যদলের সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা করিতে জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষকেও বেগ পাইতে হইবে। প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ যুদ্ধপ্রাঙ্গণে ৪৫ লক্ষ সৈন্যের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহ সাধারণ সময়েই অতি গুরুতর ব্যাপার—রুষ দেশের শীতকালের তো কথাই নাই। অধিক তুষারপাতে সাধারণ চক্রগামী মোটরযান অচল হইয়া যায়, রজ্জুপদগামী যুদ্ধশকটও—অর্থাৎ "ট্যাঙ্ক" বা "ট্রাক্টর"—অতি মন্থর গতিতে চলিতে পারে। তুষার ঝঞ্ঝাবাতের সময় দৃষ্টিপথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং যান-বাহনের গতি প্রায় রুদ্ধ হইয়া পড়ে, সুতরাং সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ নাম মাত্রই চলিতে পারে। রুষ সৈন্য এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যক্ষম থাকিবে মনে হয়, সুতরাং জার্ম্মানগণের পক্ষে শীতের মধ্যে অবিশ্রাম যুদ্ধ চালনা সহজ হইবে না।

সোভিয়েট এখন দারুণ যুদ্ধভার-প্রপীড়িত। হিটলার-ঘোষণায় রুষপক্ষের যে ক্ষতির তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা মনুষ্যধারণার প্রায় অতীত বলিলেও চলে। ৩৬ লক্ষ বন্দী, আরও ৩৬ লক্ষ হতাহত, ১৫০০০ এরোপ্লেন, ২২০০০ ট্যাঙ্ক ও ২৫০০০ কামান বিনষ্ট বা শত্রুহস্তগত। একথা বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও কি ভয়ানক ক্ষতি ও কি প্রচণ্ড আঘাত রুষবাহিনী স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের রক্ষার জন্য সহ্য করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। ৬ লক্ষ বর্গমাইলের অধিক ভূমি শত্রুপদদলিত; দেশের প্রধান শস্যক্ষেত্র, মূলধাতু (লৌহ ও ইস্পাত) ও এলুমিনিয়ম উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধানতম অঞ্চল এবং কয়লার আকরের শতকরা ৬০ অংশ শত্রুহস্তগত, নৌবহরের সর্ব্বপ্রধান দুইটি ঘাটিই শত্রুর ব্যূহে আচ্ছন্ন, কি নিদারুণ দুর্ব্বিপাক!

স্টালিনের বক্তৃতায় কিন্তু নৈরাশ্যের ছায়ামাত্র নাই। সেই গম্ভীর কণ্ঠ ধীরভাবে দেশের ও দেশবাসীর ক্ষতির ও বিপদের কথার সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া পুনর্ব্বার সতেজ ও সবল ভাবে শত্রুনিধন ও দেশ উদ্ধারের জন্য স্বজাতিকে যুদ্ধদানে আহ্বান করিয়াছে। "যে ক্ষতি আজ আমরা সহ্য করিতেছি তাহা জগতের অন্য কোন জাতি পারিত না।" এই ঘোষণা সম্পূর্ণ সত্য এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু বিতাড়ন ও বিনাশের জন্য যে সংকল্প দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে তাহাও অকৃত্রিম। এখন প্রয়োজন যুদ্ধশকটের, যুদ্ধবিমানপোতের ও সৈন্যদলের নানাপ্রকার রসদের। প্রশ্ন এইমাত্র যে সোভিয়েটের মিত্র পক্ষ তাহা কত দিনে এবং কি পরিমাণে যোগাইতে পারিবে।

সমগ্র ইয়োরোপের কলকারখানা ইতিপূর্ব্বেই নাৎসি দল অধিকার করিয়া লইয়াছে। বাকী ছিল সোভিয়েটের ইয়োরোপ অন্তর্গত অঞ্চলগুলি। সে সকলের দুই-তৃতীয়াংশ
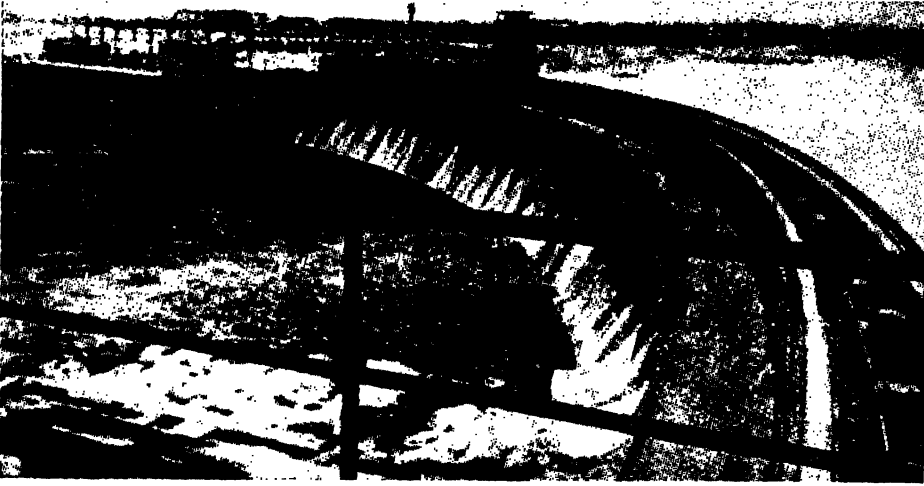
ড্নিপার নদের বাঁধ ও বিদ্যুৎপ্রজনন কেন্দ্র

এখন বিধ্বস্ত ও শত্রু-অধিকৃত। যদি জার্ম্মান কলবিশারদগণ সে কলকারখানা, খনি ও বিদ্যুৎআকর পুনর্গঠন করার সময় ও সুযোগ পায় তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রবাদের জয় সুদূর পরাহত। সুতরাং ইয়োরোপীয় রুষভূমিতে জার্ম্মানদিগের নিষ্কণ্টক অধিকার জন্মাইবার পূর্ব্বেই সোভিয়েটের যুদ্ধশক্তির পূর্ণসঞ্জীবন নিতান্তই প্রয়োজন। কেন না, এ যুদ্ধে—অন্ততঃপক্ষে স্থল ও বিমান যুদ্ধে—একমাত্র রুষই জার্ম্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। অন্য কোন শক্তির—একক বা সম্মিলিত—কথা অনুমানও করা যায় না যাহা রুষশক্তির অবর্ত্তমানে জার্ম্মানীর দিগ্বিজয় অভিযান প্রতিরোধ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, ইংলণ্ড ও আমেরিকার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ এখন তাহা সম্যকরূপে বুঝিয়াছে, কিন্তু উক্ত দুই দেশের জনসাধারণ এখনও তাহার সারকথা বুঝিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। "সরকারী প্রচার বিভাগ" এবং "সংবাদ শোধন (সেন্সর) বিভাগ" থাকার লাভ কতটা ও লোকসান কতটা সেকথা যুদ্ধের পরে বিচার হইবে। সম্প্রতি ইহার কার্য্যের ফলে সোভিয়েটের সাহায্যপ্রাপ্তির বিঘ্ন ষোল আনা না হউক যথেষ্টই বাড়িয়াছে।

এখন যুদ্ধের অবস্থা কি তাহা আমাদের অজানা। যেটুকু সংবাদ আমরা বিভিন্ন সূত্রে পাই বা শুনি তাহার বিচার করিলে যতটা আন্দাজ করা যায় তাহা এইরূপ যথা—

রুষ-জার্ম্মান যুদ্ধ। উত্তরে ফিনল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর স্থল- ও বিমান- বাহিনী সোভিয়েটের মেরুসাগরস্থ শীতকালে খোলা একমাত্র বন্দর মুরমান্‌স্ককে অনধিকৃত রুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ বন্দর হইতে রেলপথ ও রাজপথ ও জলপথ সবই অনেক স্থলে শত্রু-অধিকৃত হওয়ায়, রুষরাষ্ট্রে রসদ ও যুদ্ধসামগ্রী প্রেরণের এই শ্রেষ্ঠ পথ এখন অকেজো। ফিন-জার্ম্মান মিলিত বাহিনী এখনও সোভিয়েট সেনাদলকে এখান হইতে সমূহভাবে হারাইতে পারে নাই, কোথাও কোথাও স্থানচ্যুত করিয়া যাতায়াতের ব্যবস্থায় বিশেষ বিভ্রাট ঘটাইয়াছে। আরো দক্ষিণে, ফিনীয় উপসাগর অঞ্চলে রুষ নৌবহর ঘাঁটি ও বন্দরগুলি এখন সবই শত্রু-আক্রান্ত, যদিও এখানে রুষদল সমানে লড়িয়া চলায় ফিন-জার্ম্মান বাহিনী বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। শীতকালে এখানে যেরূপ অবস্থা হয় তাহাতে কোনও বৃহৎ পরিমাপে সৈন্য চালনা সম্ভব হয় না। সুতরাং এখানে সোভিয়েট সেনা হয়ত অপেক্ষাকৃত রেহাই পাইবে।

লেনিনগ্রাড এখন প্রায় অবরুদ্ধ। ইহার উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া মার্শাল ভোরোশিলভ বলিয়াছিলেন—"শত্রু এখন লেনিনগ্রাডে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে...

"ইহা কিছুতেই হইতে পারিবে না।"

"আমরা নিজহস্তে এই লেনিনগ্রাড নগরীর বিরাট কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ও মহা-শক্তিশালী যন্ত্রশালাগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও অনন্যসাধারণ প্রাসাদ অট্টালিকা স্বচেষ্টায় রচনা ও গঠন করিয়া এই নগরীকে

মার্শাল টিমোশেঙ্কো সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে বক্তৃতা দিতেছেন

ভূষিত করিয়াছি। সে সকল জার্ম্মান দস্যুদিগের হস্তগত হইতে দিব না।"

"ইহা কিছুতেই হইতে দিব না"...।

জার্ম্মানসেনা লেনিনগ্রাডের দুর্গমালা ও রক্ষাব্যবস্থা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া আজ দুই মাস যাবৎ নগরের অবরোধ সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। সঙ্গে সঙ্গে বল্টিক সাগরের রুষ নৌবহরের প্রধান ঘাটি ক্রনষ্টাড্ট্‌ও অবিশ্রাম গোলা ও বোমবর্ষণে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এই দুই চেষ্টাই সফল হয় নাই কিন্তু অন্য দিকে এ অঞ্চলের সোভিয়েট বাহিনীগুলিও ক্রমেই শত্রুব্যূহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। লেনিনগ্রাড-রক্ষী সেনানায়কগণ শত্রুপক্ষকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রামের অবসর না দেওয়ায় এখানকার অবরোধ জার্ম্মান ও ফিনদিগের পক্ষে বিশেষ শ্রম, ব্যয় ও লোকক্ষয়সাপেক্ষ হইতেছে। কিন্তু এখনও শত্রুব্যূহ কোথায়ও ছিন্ন হয় নাই।

এই লেনিনগ্রাডে সোভিয়েটের কীর্ত্তি অতি মহান্। ষাটটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০৩টি ব্যবহারিক শিল্পকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪৮৭টি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষালয় ২১টি স্টেডিয়ম ক্রীড়াঙ্গন, ২৫টি নাট্যশালা, ৪২টি সিনেমা, ৮৭টি হাসপাতাল, ২৪০টি শিশু পালনাগার এখানে সোভিয়েট নির্ম্মাণ ও স্থাপনা করিয়াছে। এক ১৯৩৮ সালেই এই নগরীতে নির্ম্মাণকার্য্যে সোভিয়েট বিশ কোটি টাকার সমান অর্থব্যয় করে। এই লেনিনগ্রাডই সোভিয়েটের অন্যতম যন্ত্রশিল্পাগার। এখানেই সর্ব্বপ্রথম ট্রাক্টরযান ও প্রথম বৈদ্যুতিক ডাইনামো নির্ম্মিত হয়, এখানেই সর্ব্বাগ্রে ইস্পাত উৎপাদনের ব্লুমিং মিল স্থাপিত হইয়াছিল। এখানেই প্রতি বৎসরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা মূল্যের নানাপ্রকার যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হইত, তাহার মধ্যে সমুদ্রগামী জাহাজ, রেলপথগামী এঞ্জিন হইতে দূরবীন, বিজলীবাতি, ছুরি কাঁচি সবই আছে।

"আমাদের এই সুন্দর নগরী শত্রুপদদলিত হইতে দিব না..." লেনিনগ্রাডের আবাল বৃদ্ধবনিতা, সৈনিক ও সাধারণ নাগরিক সকলেই ভোরোশিলভের এই আহ্বানে দৃঢ়চিত্তে সাড়া দিয়া জীবনমরণ পণ করিয়া লড়িতেছে। জার্ম্মানদিগের চেষ্টা অবরুদ্ধ নাগরিকদিগকে ক্ষুধা ও রোগক্লিষ্ট করিয়া বিবশ করা। একদিকে বিজ্ঞানের অভিনবতম ধ্বংসকারী যন্ত্র অন্য দিকে ত্যাগ ও অটল-প্রতিজ্ঞার চরম পরাকাষ্ঠা!

মধ্য ভাগে মস্কো আক্রমণে কিছু বিরতি পড়িয়াছে। এখানকার যুদ্ধে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, এখন সোভিয়েটের যুদ্ধশকট ও বিমান যুদ্ধপোত দুইই জার্ম্মান দলের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি টুলার নিকট যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে এবং মস্কোর পশ্চিমে যে যুদ্ধ কয়দিন পূর্ব্বে হইয়াছিল সেখানে, রুষ অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যবহার অধিক পরিমাণে হইয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্য সাধারণ যুদ্ধ-শকটেরও (বর্ম্মাবৃত মোটরযান) সঙ্গে লড়িতে পারে না—যদি তাহা সচল থাকে—প্যান্‌জার শকট (ট্যাঙ্ক) তো দূরের কথা। এ কথার চরম প্রমাণ পোলাণ্ডেই পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং হয় ঐ অঞ্চলগুলিতে জার্ম্মান
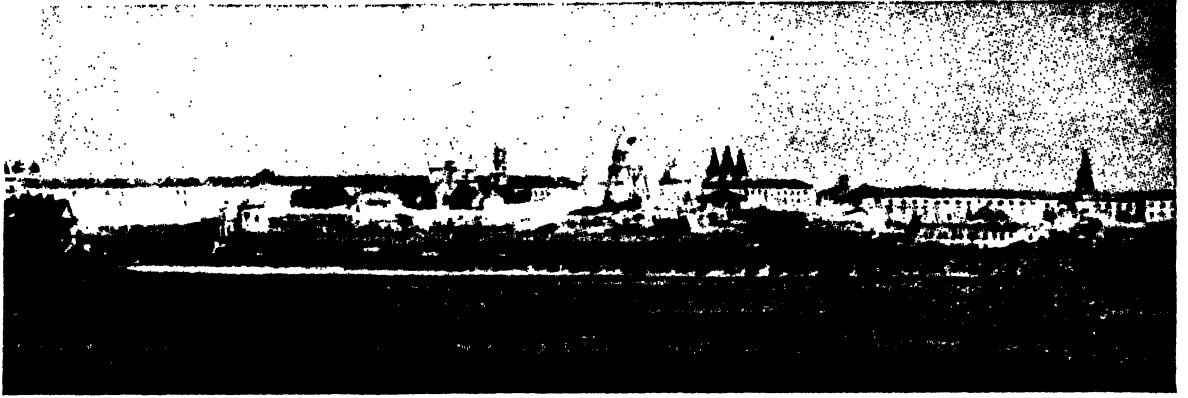
প্রাচীন রুষ সাম্রাজ্যের রাজধানী কাজান

প্যান্‌জার ও সাধারণ যুদ্ধ শকটগুলি মহাকর্দ্দমে নিমজ্জিত ও প্রায় অচল অবস্থায় আছে, নহিলে রুষ কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না পাইয়া শেষ চেষ্টায় এই অশ্বারোহী সৈন্য প্রয়োগে বাধ্য হইয়াছে।

স্টালিনের বক্তৃতায় রুষসৈন্যের যুদ্ধ সরঞ্জামের ঘাটতির কথা স্পষ্টই রহিয়াছে। এ অবস্থায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সোভিয়েট সৈন্য যে ভাবে শত্রুবাহিনীর সহিত লড়িতেছে তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বলভাবে লিখিত থাকিবে। কিন্তু অদম্য শৌর্য্য ও মরণবিজয়ী স্থিরসঙ্কল্পও আধুনিক যুদ্ধে সফল হয় না, যদি শেষ পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষের যুদ্ধাস্ত্রের প্রাধান্য থাকে। তবে সোভিয়েটের শেষ পন্থা এখনও সমানেই বর্ত্তমান। তাহার অর্থ মস্কো অঞ্চল ছাড়িয়া প্রথমে ভলগা নদের পিছনে দাঁড়ান এবং তাহার পর উরাল পর্ব্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ। সেখানেও সোভিয়েটের যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের বহু প্রতিষ্ঠান আছে, এবং বহু অন্য প্রতিষ্ঠানের দ্রুত গঠন চলিতেছে। সে সকল যন্ত্রশালায় যদিও সম্যকভাবে যুদ্ধোপকরণ যোগাইবার মত অবস্থা এখনও হয় নাই কিন্তু এতটা নিশ্চয়ই আছে যাহাতে সে দুর্গম ও দুরূহ অঞ্চল শত্রু হইতে রক্ষা করিবার মত অস্ত্র-প্রয়োগ চলে। অত দূরে যুদ্ধ চালনা জার্ম্মানীর পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইবে; কেন না, আধুনিক যন্ত্রযুদ্ধে মেরামত, যন্ত্রসংস্কৃতি ও যুদ্ধোপকরণ যোগান অতি জটিল ব্যাপার। এই সকলের ব্যবস্থার জন্য বিরাট যন্ত্রশালা ও বিশাল যান-বাহনের সরঞ্জামের আয়োজন অতি ব্যাপক ভাবে নিকটে থাকা প্রয়োজন। সুতরাং মস্কো ছাড়িয়া গেলে রুষ-সেনাবাহিনীর শক্তি হ্রাস—যত দিন না আমেরিকা ও ব্রিটেন যুদ্ধাস্ত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতে পারে—যেমন বাড়িবে, জার্ম্মানীর আক্রমণ শক্তিও কিছু কমিতে বাধ্য। উপরন্তু এতদিন যুদ্ধ ইয়োরোপীয় রুষদেশের সমতল ভূমিতেই চলিতেছিল। এখানে প্যান্‌জার ও যুদ্ধশকট বাহিনী চালনের জন্য ক্ষেত্র পরিষ্কার ছিল, এমন কি কোনও বৃহৎ নদনদীও সেরূপ বাধা রূপে ছিল না—দক্ষিণে ডিনিপার বাদে—কিন্তু ইহার পর রণক্ষেত্র ক্রমেই দুর্গম হইতে থাকিবে। যাহা হউক, এ সবই পরের কথা, সম্প্রতি মস্কোরক্ষী দুর্গমালা, "জেনারল" শীত ও "জেনারল" কর্দ্দম ইহাই অকুতোভয় সোভিয়েট-গণসেনাদলের প্রধান সহায় এবং ইহার উপর ও নিজের বলিষ্ঠ বাহুর উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা অক্ষুণ্ণ বিক্রমে যুদ্ধদান করিতেছে।

দক্ষিণে উক্রাইন অঞ্চলে পরাজিত মার্শাল বুডিয়েনি এখন অন্য কোথাও সৈন্যদল গঠনে প্রেরিত হইয়াছেন। এখন দক্ষিণের রক্ষার ভার সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ মার্শাল টিমোশেঙ্কোর হস্তে। মার্শাল মিখাইল টুকাচেভস্কি এবং ২।৩ জন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক "দ্রবীভূত" হইবার পর সোভিয়েটের বিপুল সেনাবাহিনীগুলিতে অভিজ্ঞ রণবিশারদের অভাব ফিন-রুষ যুদ্ধেই অনুভব করা গিয়াছিল, এখন সে অভাব নিদারুণ!

কৃষ্ণসাগরে ক্রিমিয়ায় জার্ম্মান ও রুমানীয় সৈন্যদল এখনও সফলকাম হয় নাই। রুষ নৌবহর এখনও আশ্রয়হীন নহে এবং সিবাস্টোপোল দুর্গমালা এখনও শত্রু-পথ রোধ করিয়া আছে। অন্য দিকে ইটালো-জার্ম্মান-বাহিনী ককেশশের পথে সম্প্রতি বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

রুষদেশের ক্ষতির পরিমাণ ভয়ানক। উক্রাইন ও ডনেজ অববাহিকার কয়লা ও লৌহ ইস্পাতের আকর ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, দিগন্ত বিস্তারিত শস্যক্ষেত্র, বিশাল যন্ত্রশালারাজী এবং ডিনিপার বাঁধের বিদ্যুৎপ্রজনন কেন্দ্রের সংযুক্ত কলকারখানা এ সবই এখন বিধ্বস্ত ও অকর্ম্মণ্য। যুদ্ধক্ষেত্রেও ক্ষতির পরিমাণ সাংঘাতিক। কিন্তু সোভিয়েট গণতন্ত্রে এখনও নৈরাশ্যের চিহ্নমাত্র দেখা দেয় নাই বা যুদ্ধ-প্রবৃত্তিতে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য আসে নাই।

হেগেলের দার্শনিক মতবাদ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৯৮ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় উহার নামেতেই ব্যক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের সম্পদ বাংলা ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করা দেশের হিতকর কাজ। যাঁহারা সে কাজ করেন তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু লেখকের ভাষা যদি সহজ, সরস এবং সুখপাঠ্য না হয়, তবে এই প্রশংসা তাঁহার কতটুকু প্রাপ্য, ভাবিবার বিষয়। বিদেশী ভাষায় তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করা কঠিন এই জন্ত যে সেখানে তত্ত্ব বুঝিবার পরিশ্রম ছাড়া ভাষা বুঝিবার জন্তও পরিশ্রম করিতে হয়। এই দ্বিগুণ পরিশ্রমে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, জানিবার আনন্দ সে অল্পই পায়। স্বদেশী ভাষাকেও পরিভাষা ইত্যাদির বেষ্টনে ফেলিয়া দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলা যায়; এবং তাহা হইলে ফল একই হয়; পরিশ্রম দ্বিগুণই করিতে হয়।

জার্ম্মান দর্শন আমাদের কাছে যে দুর্ব্বোধ্য মনে হয় তাহার প্রধান কারণ আমরা অনেকেই ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে উহা পড়ি; আর অনুবাদ অনেক সময় এমন লোকে করেন যাঁহারা জার্ম্মান জানেন, কিন্তু দর্শন তেমন জানেন না। ইউরোপীয় দর্শনের আলোচনা যাঁহারা বাংলায় করিবেন, তাঁহাদের দর্শন এবং বাংলা উভয়টিই সমান জানা থাকা দরকার। তাহা না হইলে ঠিক ঐরূপ অসুবিধা থাকিয়া যাইবে।

আমাদের মনে হয়, কথায় কথায় অনুবাদ এবং পরিভাষার উপর বেশী জোর দেওয়া ভুল। তাহা করিলে বিদেশী দর্শন সহজবোধ্য হইতে পারে না। আলোচ্য গ্রন্থে এই উভয় ত্রুটিই আছে বলিয়া মনে হয়। তা ছাড়া, পরিভাষা সম্বন্ধেও গ্রন্থকার মন স্থির করিতে পারেন নাই। যথা—"a priori method" কথার পরিবর্ত্তে তিনি কখনও 'আত্মজ পদ্ধতি' আবার কখনও "স্বাশ্রয়ী পদ্ধতি" ব্যবহার করিয়াছেন (৯৩ ও ৯৮ পৃ.)। 'necessary' কথার অনুবাদে কখনও অপরিবর্ত্তনীয় কখনও 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৯৩ ও ৯৪ পৃ.)।

পরিভাষা সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা কঠিন। অনেক সময় শক্তিমান্ লেখক যে-সব শব্দ ব্যবহার করেন, ব্যাকরণে অশুদ্ধ হইলেও তাহা চলিয়া যায়। সাময়িক সাহিত্যও এই ভাবে অনেক নূতন তৈয়ারী শব্দ বাংলায় চালাইয়াছে। দার্শনিক পরিভাষার জন্ত শুধু অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্য না লইয়া সংস্কৃত ও পালির বিরাট্ দর্শন ও ধর্ম্ম সাহিত্যের সাহায্য লইলে নূতন শব্দ নির্ম্মাণের পরিশ্রম হইতে রেহাই পাওয়া যায় হয়ত।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে লেখক ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যেই যখন হেগেলের আলোচনা করিয়াছেন, তখন আর একটু স্বাধীন ভাবে অনুবাদ ও আলোচনা করিলে হয়ত ভাল হইত। যদি বলি "Truth is universal" তাহা হইলে ইংরেজী জানা ব্যক্তিমাত্রেই ইহার মানে বুঝিবেন। কিন্তু "সত্য সার্ব্বিক" (১১ পৃ.) বাক্যটি বাঙ্গালী মাত্রেরই বোধগম্য হইবে কি না সন্দেহ।

কোন সাধু উদ্যমে বাধা দান করা উচিত নয়। যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ লেখেন, সমালোচকের সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের শুধু দোষ দেখানও বীরোচিত ধর্ম্ম নহে। তাহা না হইলে আমরা হয়ত বলিতাম যে যাঁহারা হেগেল সম্বন্ধে কিছু জানেন না, তাঁহারা এই বই দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন না; আর যাঁহারা অন্ত উপায়ে হেগেলের দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে উহা নিষ্প্রয়োজন। সামান্ত ৯৮ পৃষ্ঠার ভিতর হেগেলের বিশাল গ্রন্থরাজিকে সংক্ষিপ্ত করাও কঠিন। তা ছাড়া, এই বইয়ের ভাষা এত দুষ্পাচ্য হইয়াছে যে, উপক্রমণিকা হিসাবে ইহার ব্যবহারও সম্ভব নয়।

বিচার—শ্রীহরিদাস দে। প্রজ্ঞামন্দির, ২২ নং, পাইকপাড়া রো, বেলগেচীয়া পোঃ, কলিকাতা। ৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵৹ আনা।

বইখানিতে 'একাত্মবিজ্ঞান' বা 'অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচার' রহিয়াছে। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দে, কখনও বা সনেটের অনুকরণে, 'আমি'-র নিত্যত্ব ও বিভুত্ব, সুখ-দুঃখ, সংসার-বন্ধন ইত্যাদি মামুলী তত্ত্বকথার শুধু বিচার নয়, প্রচারও ইহাতে করা হইয়াছে। যথা—

'ত্রিবিধ-তীর্থের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,
জঙ্গম, মানস আর ভৌম নামান্বিত'

ইত্যাদি। (২৫ পৃঃ)। অথবা,

'মায়িক জীবত্ব, জীব খেলল মায়ায়'
(৫৩ পৃঃ) ইত্যাদি।

কথাগুলি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলার নাই। ছাপার ভুল মাঝে মাঝে রহিয়াছে, সেগুলি না থাকিলেই ভাল হইত।

সংস্কৃতে দার্শনিক তথ্য একাধিক স্থলে কারিকায় ছন্দোবদ্ধ করা হইয়াছে। যখন সূচী ইত্যাদি সমন্বিত ছাপার বই ছিল না, যখন স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই বিদ্যার অর্জ্জন ও চর্চ্চা করিতে হইত, তখন অভিধান পর্য্যন্ত ছন্দে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু আজ যীশুর আবির্ভাবের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে ছন্দের সাহায্যে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় লোকের রুচি হইবে কি? বিশেষতঃ আজ চারিদিকে এই অর্থনীতি ও রাজনীতির সংগ্রামের দিনে - জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার সংঘাতের মধ্যে—মার্কস ও লেনিনের যুগে—পেন্‌সনভোগী, অফুরন্ত অবসানের অধিকারী ছাড়া আর কেহ এরূপ বইয়ের সমাদর করিবে কি? তথাপি গ্রন্থকারের সদুদ্দেশ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আমরা মনে মনে শ্রদ্ধা পোষণ করিব।

জীবনের উদ্দেশ্য—ডাক্তার শ্রীঅভয়কুমার সরকার। প্রকাশক শ্রীঅমলকুমার সরকার। সরকার এণ্ড সন্স, ফরিদপুর। ২৮ পৃষ্ঠা। "ইষ্টভৃতি পালনের জন্ত মূল্য ৵৹।"

ক্ষুদ্র আটাশ পৃষ্ঠার বইয়ের ভিতর যতটা সম্ভব তত্ত্ব ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। Macrocosm ও microcosm, সৃষ্টি বা দেহতত্ত্ব, জন্ম ও মরণ, আমি কে, সত্ত ও পরম সত্ত, 'সুরত-শব্দ-যোগ', সৎগুরু, প্রভৃতি

মহাপুরুষপ্রদত্ত সৎ, সত্য, সন্ন্যাস ইত্যাদি শব্দের সংজ্ঞা, এবং এই প্রকার আরও বহু বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধনা, অনুভূতি প্রভৃতি দুরূহ শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তিও দেওয়া হইয়াছে। ব্যুৎপত্তি বুঝাইতে গিয়া কখনও লেখক ব্যাকরণের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তিনি বলেন, "কুল কথাটা এলো "কোল" কথা হইতে" (১১ পৃঃ)। বীজ হইতে অঙ্কুর, না অঙ্কুর হইতে বীজ জোর করিয়া বলা যায় না। তেমনি, 'কুল' হইতে 'কোল,' না 'কোল' হইতে 'কুল' এ বিষয়েও ত মতভেদ হইতে পারে ?

"জীবনের উদ্দেশ্য অভাব বা অশান্তিকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া" (৭ পৃঃ)। তার জন্ম সৃষ্টিতত্ত্ব জানা দরকার। সৃষ্টি তিন ভাগে বিভক্ত (২১ পৃঃ)—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। সৃষ্টির ভিতর 'পিণ্ড দেশ,' 'ব্রহ্মাণ্ড দেশ' আর 'দয়াল দেশ' আছে।

আমি কে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য "মৃত ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি আমরা বিচার করি, তবে দেখিতে পাই এই দেহ আমি নয়।" (২০ পৃঃ)।

সন্তদের সাধনপ্রণালীর নাম 'সুরত শব্দ যোগ'। ইহা বিশ্বজনীন সাধনপ্রণালী। "আজকাল আমাদের এই বাংলা দেশে সুরত শব্দযোগের সাধনপ্রণালী কতক পরিমাণে প্রচলন হয়েছে ও হচ্ছে।" (২৫ পৃঃ)।

প্রকাশকের নিবেদনে দেখিতে পাই যে, অতি অল্পকাল মধ্যে বইখানার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে হইয়াছে। প্রকাশক আশা করেন, এই পুস্তকের বহুল প্রচার দ্বারা মহাপুরুষের ভাবগুলি "সর্ব্বজনার ভিতর চারিয়ে তোলার জন্য প্রত্যেক বাঙালী আজকার এই দেশের অতি দুর্দ্দিনে চেষ্টা করিবেন।"

তাঁহার এই আশা ফলবতী হওয়া অসম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ রাজদ্রোহ কিংবা স্পষ্ট অশ্লীলতা না থাকিলে বইয়ের প্রচারে আইনের কোন বাধা নাই। দেহের ব্যাধির জন্য পেটেণ্ট ঔষধ আর আত্মার ব্যাধির জন্য এবম্বিধ পুস্তকের প্রচারের একমাত্র বাধা সমালোচনার কশাঘাত। কিন্তু এ দেশে এমন একটা অচঞ্চল, শিষ্ট জনমত নাই, যার দরবারে সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রলাপের কোন বিচার ও শাসন হইতে পারে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান ভারত---শ্রীসুনির্ম্মল সেন। 'অগ্রণী' পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা কর্ত্তৃক ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের যে সকল নূতন ব্যবস্থা ও বিবর্ত্তনের বার্ত্তা ভারতের উপকূলে পৌছিয়া তাহার চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে এবং যাহার প্রভাব নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক বর্ত্তমান ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই ব্যবস্থার দোষগুণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন কৃষি, শিল্প প্রভৃতি অর্থোৎপাদনকারী ব্যাপারে নানা প্রকার অন্তরায় আসিয়া বর্ত্তমান ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের শ্রেণীবিভাগও কতকটা এই জটিলতার জন্য দায়ী, তাহার

বুরজোয়া, প্রলেটারিয়েট, পেটি বুরজোয়া এই কৃত্রিম বিভাগ একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া ভারতের সামাজিক তথা অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক সমস্যাকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। সেই জন্য ভারতের মুক্তি-আন্দোলনও অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক প্রচেষ্টায় পর্য্যবসিত ছিল; এখন যদিও সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা আসিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা আধুনিক রাজনীতিক আন্দোলনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তথাপি উহা গণ-আন্দোলনে পরিণত হইতে পারে নাই। উহার জন্য দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন এবং সে সম্ভাবনা যে ক্রমশই প্রকট হইতেছে তাহাও লেখক গত আন্দোলনের ক্রমিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত, ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সহজ। সকল স্থানে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত না হইতে পারিলেও স্বীকার করিব এই পুস্তক প্রণয়নে লেখক বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ যথেষ্ট কালোপযোগী। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। কয়েকটি মুদ্রণদোষ লক্ষ্য করিলাম, আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইবে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বি-এ। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ১৬১।

এই পুস্তকখানি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বলিয়া প্রকাশিত হইলেও মূলতঃ ইহাতে তানসেনের জীবনী এবং তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের নানা কাহিনী বর্ণিত আছে।

গ্রন্থকারের মতে রাগিণীর আধুনিক রূপসমূহ নানাবিধ পরিবর্ত্তনের ফল; তাহাদের উপর তানসেনের রচনার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। সঙ্গীতানুরাগী গুণিগণ উক্ত বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ প্রকাশ করেন না।

গ্রন্থের স্থানবিশেষে কয়েকটি ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনাগুলির কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া সম্ভব না হইলেও যে চিন্তাধারা ও গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে জানিবার অনেক বিষয় আছে।

এই পুস্তকপাঠে তানসেন প্রমুখ গুণীদের জীবনী জানিবার কৌতূহল পাঠকদিগের অনেকাংশে চরিতার্থ হইবে। গ্রন্থকারের ভাষার সরলতা ও বর্ণনার সরসতার জন্য পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ডাঃ সেন—শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরি। মূল্য ১৲ টাকা। পৃঃ ৯১।

জীবন-মৃত্যু—শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরি ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল

চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ১।০ টাকা। পৃঃ ১২২। প্রকাশক—চিত্র পাবলিশিং কোং, ১১ নং কানাই ধর লেন, কলিকাতা।

প্রথম পুস্তকখানিতে লেখক এমন একজন ব্যক্তির পরিচয় দিয়াছেন সমাজে যাঁহার মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাঁহার ঔষধের কারখানায় শিক্ষানবিশী ছাড়া অধিক বেতনে লোকের পাকা চাকুরি মিলিত না। তাঁহার পত্রিকায় লেখক-লেখিকারা বিনামূল্যে লেখা দিতেন, এবং তাঁহার ছাপাখানায় কম মাহিনায় শ্রমিক অহরহ পরিশ্রম করিয়া ধনভাণ্ডার স্ফীত করিয়া তুলিত। সমাজজীবনেও ফ্যাশন-দুরন্ত প্রজাপতিধর্ম্মী মেয়েদের সঙ্গে ডাঃ সেনের হৃদ্যতা ছিল। অকস্মাৎ শ্রমিক আন্দোলনের সামান্য আঘাত খাইয়া সেনের জলৌকাবৃত্তির উপর বীতরাগ জন্মায় ও দেশের অনাদৃত বিদ্যালয় ও নানা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে একটি পল্লীগ্রামের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সমৃদ্ধি পর্য্যন্ত, দুই শত বৎসরের ঘটনার কতকগুলি চিত্র লেখকদ্বয় দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ঘটনাগুলি একই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ঘটিয়াছে বলিয়া পরস্পরের যোগসূত্র রাখিবার চেষ্টা লেখকদ্বয় করেন নাই।

দুইখানি উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে লেখকদ্বয়ের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে ঠিকমত গুছাইয়া বলিবার দক্ষতা তেমন প্রকাশ পায় নাই। কাহিনী গ্রন্থনে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বা চরিত্রসৃষ্টিতে তেমন বিশেষত্ব কোথাও চোখে পড়িল না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সন্ধানে—শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী। দি কালচার পাবলিশার্স, ২৫এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

রেণু আর সুপ্রিয়া চলিল উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে। পথে নির্ম্মলের সঙ্গে আলাপ। নির্ম্মল চঞ্চল-প্রকৃতি আবেগপ্রবণ যুবক, প্রতিভাবান্ শিল্পী। কখন অলক্ষিতে সে প্রভাব বিস্তার করিল সুপ্রিয়ার মনে। বাহিরে তাহাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিলেও মন হইতে সে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না। অনুপমের নিকট সে বাগদত্তা, তাহার উদার চরিত্রকে সে শ্রদ্ধা করে, মনে মনে তাহাকেই বরমাল্য দান করিয়াছে, আজ কি করিয়া আর এক জনকে তাহারই আসনে বসাইবে? এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নির্ম্মলের ত্যাগে গ্রন্থের অবসানভাগ সমুজ্জ্বল। বিলাতের ছবিগুলি লেখিকা সযত্নে আঁকিয়াছেন। ভাষামাধুর্য্যে এবং মনোবিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে উপন্যাসখানি মনোরম। কিন্তু পড়িতে পড়িতে মধ্যে মধ্যে মনে হয়, আমরা কেবল ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছি, কর্ম্মব্যস্ত মাটির পৃথিবীতে নহে। আবেষ্টনের সহিত পাত্রপাত্রীর মনোভাবের দুই-এক স্থানে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

রাজপথ—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য। সাহিত্যমন্দির, ৫৪।৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

ছেলেদের জন্য লিখিত স্ত্রী-ভূমিকাহীন নাটক। রাজপথের ধারে বসিয়া দুই বন্ধু নানা রকম লোকের আনাগোনা দেখিতেছে। কত লোক অন্নের জন্য ব্যতিব্যস্ত! দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, সংগ্রাম ও নৈরাশ্য দেশের বুক জুড়িয়া রহিয়াছে, অথচ প্রতীকার নাই। নাটক-

খানি মন্দ লাগে নাই। কিন্তু, ছোট ছেলেদের নাটকে "কী direction কী acting, কী Story value, কী tempo। আর আমাদের দেশের ছবিগুলো সেই একঘেয়ে প্যানপেনে প্রেমের গল্প। থ্যাং! ঘেন্না ধরে গেল।" —না থাকিলে ভাল হইত। আর এক জায়গায় শ্যামল বাংলায় কথা বলিতে বলিতে আবেগভরে বলিয়া উঠিল : "An unrecognised, unlamented death! And this is India our mother land!" আবেগভরে কিছু বলিতে হইলেই কি আমাদের ইংরেজী ছাড়া চলে না?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা; ডাকমাশুল এক আনা।

এই বৃহৎ অভিধানের ৮০তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ 'রজমহল' ও শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫৪৪।

১৯২৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ এই অভিধানের নিম্নমুদ্রিত পরিচয়পত্র সঙ্কলনকর্তাকে দিয়াছিলেন :

"শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বিশ বছর ধরিয়া বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান বাংলায় নাই। এই পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে আমরা প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছি। এই বৃহৎ কর্ম্ম সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রকাশসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বাংলা দেশের পাঠক-সাধারণ এই কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, একান্তমনে ইহাই কামনা করি।"

আর্থিক অসঙ্গতি হেতু 'বিশ্বভারতী' এই অভিধান প্রকাশ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে ইহার প্রকাশের নিমিত্ত বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

প্রকাশসমিতির সভ্যগণ স্থানীয় না হওয়ায়, ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

ড.

সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু। কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। শ্রাবণ, ১৩৪৮। ৮+১০৬ পৃ:। দাম দেড় টাকা।

বুদ্ধদেববাবুর "সব-পেয়েছির দেশে" শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা। লেখক গত গ্রীষ্মের ছুটির কতকটা অংশ শান্তিনিকেতনে দুর্লভ রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন; তীর্থ-সান্নিধ্য ও তার পরিবেশের প্রত্যভিঘাত কবিধর্মী লেখকের চিত্তে যে ভাবানুভূতি ও মননক্রিয়ার সঞ্চার করেছে তার পরিচ্ছন্ন এবং প্রীতিপূর্ণ সশ্রদ্ধ প্রকাশ এই বইটিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বকাল নিয়ে

লেখা এবং অব্যবহিত পরেই তার প্রকাশ বইখানাকে একটু অসামান্য মূল্য দান করেছে। কবির মৃত্যুর উত্তপ্ত স্মৃতি যখন আমাদের বুকে জলছে, তখন এ-বইটি অনেকখানি শান্তি বহন করে এনেছে বলে আমার বিশ্বাস। সেদিক থেকে বইখানির প্রকাশ খুবই সময়োপযোগী হয়েছে।

যে-রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়, যে-রবীন্দ্রনাথ নিত্যকালের সে-রবীন্দ্রনাথকে জানাবার ও বুঝাবার দায় ও অধিকার অনন্তকালের, অনাগত কাল তার বিচার করবে। সেজন্য আমাদের ভাববার কারণ নেই; রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ একান্তই আমাদের ব্যক্তিগত, যে-রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে, দেশে ও পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে, যে রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তী কাল জানবার ও বুঝবার সুযোগ পাবে না, সে-রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের দায়িত্ব একান্তই আমাদের। বুদ্ধদেববাবু যতটুকু জেনেছেন, দেখেছেন, বুঝেছেন, সেই পরিমাণে তিনি তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় ও শ্রদ্ধায়, সুষ্ঠ ভাব ও রূপ-সার্থকতায় পালন করেছেন। তাঁর এই রচনা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের চিত্তের নিকটতর করতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বুদ্ধদেববাবুর ভাষা ঝরঝরে, বলবার ভঙ্গি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টি ও মননভঙ্গি কবির, পরিবেশ রচনার ক্ষমতা সুন্দর, সর্বোপরি বিষয়টির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তাঁর চিত্ত। বইটি সেজন্য আমার খুব ভাল লেগেছে। শান্তিনিকেতনের শ্যামলী-গৃহ, তালগাছের সারি, আর বিস্তীর্ণ বন্ধুর খোয়াইয়ের প্রান্তর নিয়ে আঁকা রমেনবাবুর প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর। একটা জিনিস শুধু আমার ভাল লাগে নি; লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের টুকরোগুলো এ বইতে না থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। আর, ১০৬ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম দেড় টাকা একটু বেশী বলে মনে হ না কি?

শ্রীনীহাররঞ্জন রা

অস্পৃশ্যের মুক্তি—শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ, জলপাইগু ১৩৪৫। মূল্য তিন আনা, পৃঃ ৪৪।

হিন্দুসমাজকে লেখক অস্পৃশ্যতা পাপের সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাব সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ—মুরারি দে সম্পাদিত, শ্রী পুস্তক বিভাগ, ১০।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৩০।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে ছাত্রসমাজের নিকট প্রদত্ত শরৎচন্দ্রে কয়েকটি বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলিতে তরুণদের প্র শরৎচন্দ্রের আন্তরিক মমতা এবং সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীয় স্থান সম্বন্ধে তাঁহা বিনয় অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীহর্ষের পরিচালকগণ সঙ্কলনখানি প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছে

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

জরুরি আবেদন

বিদেশে প্রেরিত ভারতীয় সৈনিকদের পাঠের জন্য ইংরেজী অথ দেশীয় ভাষায় আধুনিক বা পুরাতন পুস্তক পত্রিকাদি কেহ দান করি সাদরে গৃহীত হইবে। পুস্তকাদি স্থানীয় যুদ্ধ-কমিটির নিকট প্রেরিতব্য।

দেশ-বিদেশের কথা

প্রবাসী-সম্পাদকের গ্রাম পরিদর্শন

গত ১২ই শ্রাবণ ১২৪৮ প্রবাসী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জন্মস্থান বাঁকুড়া শহরে গিয়াছিলেন। বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বিপুল কর্মসূচী ছিল। তাহা সত্ত্বেও শহরের সন্নিকটস্থ তাড়ুল-গ্রামবাসীদের অনুরোধে তিনি ঐ গ্রামে পদার্পণ করিয়া তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

এই অবসরের সুযোগ লইয়া গ্রামস্থ ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ার জেলা-জজ সুসাহিত্যিক শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস মহাশয় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পল্লীর বালক-বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধ তাঁহাদের মহামূল্য বাণী শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন।

প্রসঙ্গে জাপানের উন্নতির কথা উত্থাপন করিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী, জীবনপ্রবাহ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দেশবাসীকে জানাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া আজ তাহারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিকে চোখ রাঙাইবার সামর্থ্য রাখে।

এই গ্রামস্থ স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের বাল্য-বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার এই বাল্য-বন্ধুর পুত্র এবং পৌত্রাদি সহ তাঁহার কুটীরে পদার্পণ করেন এবং মৃত বন্ধুর ফটো-চিত্র দেখিয়া ছবিখানি যে ঠিক হইয়াছে তাহা মন্তব্য করেন। নিয়োগী মহাশয়ের প্রথম জীবনের প্রাণ-তুচ্ছ-করা জনহিতকর কার্য্যাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

গ্রন্থাগার ও অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠানে তাঁহার এই অনুগ্রহ এবং সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের সহযোগ পল্লী-বালকদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এক মহা শক্তিচেতনার সৃষ্টি করিয়াছে।

তাড়ুল গ্রন্থাগারের সম্মুখস্থ চত্বরে প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার জেলা-জজ শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায়, গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কয়েকজন বালক-বালিকা

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কর্মবহুল জীবনের মধ্যেও সময় করিয়া পল্লীর কর্দম, বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করিয়া কয়েক স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। পল্লীর উন্নয়ন, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি পল্লীর জীবনী শক্তি ও প্রাণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় ছিল তাঁহার বক্তৃতার প্রাণবস্তু। গ্রন্থাগারের সম্মুখে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয় গ্রন্থালয়ের নাম বদলাইয়া (পূর্বে দি লাইব্রেরী ছিল) সরস্বতী লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) নামকরণ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা

প্রবাসী বাঙালী ছাত্র-সম্মিলনী, গৌহাটি

গত আশ্বিন মাসে গৌহাটিতে আসাম-প্রবাসী বাঙালী ছাত্র-সম্মিলনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। ইহার পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। অভিভাষণাদি পাঠ ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার পর স্থানীয় ছাত্র ও যুবকগণ সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান করেন। বালক-বালিকাগণ কর্তৃক আবৃত্তি, মণিপুরী ছাত্র কর্তৃক নৃত্য, সুরসঙ্ঘের যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি বিশেষ উপভোগ্য

প্রবাসী বাঙালী ছাত্র-সম্মিলনের সভ্যবৃন্দ। মধ্যস্থলে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হইয়াছিল। সব শেষে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ডাকঘর' নাটিকাটির অভিনয় হয়। এই অভিনয়টি অতি সুন্দর হইয়াছিল।

রাঁচিতে হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য সম্মিলনী

হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য সম্মিলনীর (রাঁচি) দশম বার্ষিক অধিবেশন গত ৩রা হইতে ৬ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারি দিবস ধরিয়া বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কলিকাতার কয়েক জন গুণী পণ্ডিত ও অধ্যাপক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্মিলনীর অধিবেশনে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র গুহ সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ বিশেষ সারগর্ভ হইয়াছিল। তিনি অধিবেশনে আরও দুইটি উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মহিলা-সংবাদ

স্বর্গগতা কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পৌত্রী এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এক মাত্র কন্যা। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসরের কিছু অধিক হইয়াছিল। তিনি এই অল্প বয়সেই শাস্ত্রানুরাগিণী হইয়াছিলেন এবং উত্তমরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবার নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার উচ্চতর পরীক্ষা না দিয়া সংস্কৃতের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নীলিমা মুখোপাধ্যায়

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পল্লীশ্রী

শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
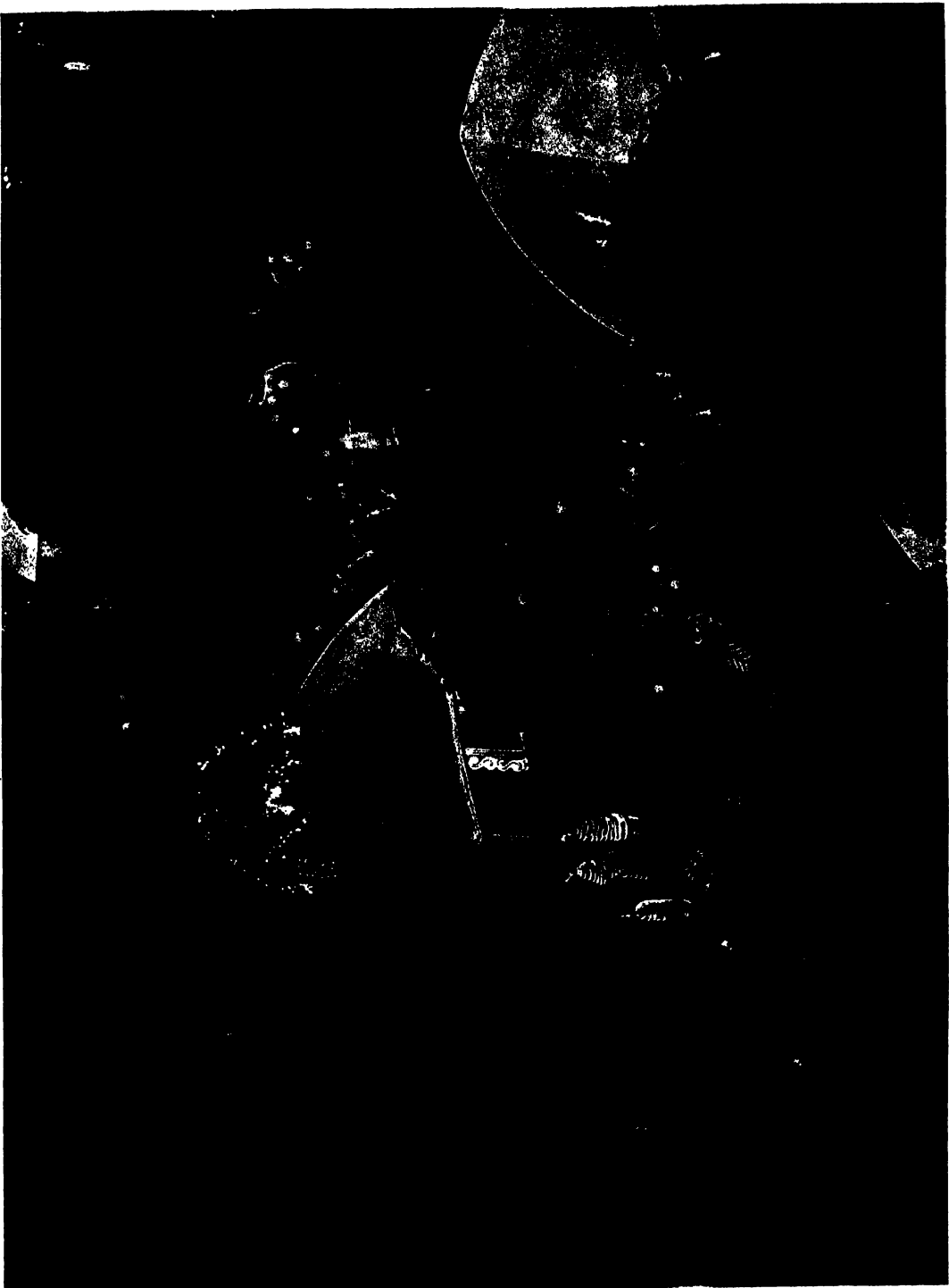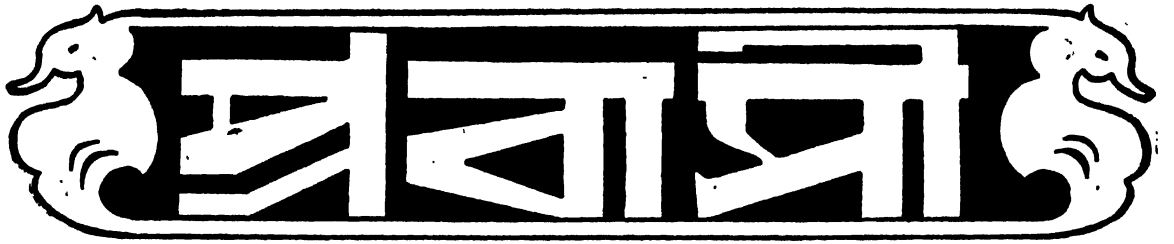
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৪৮

৩য় সংখ্যা

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত

৭

সখী সঁ নায়িকা উক্তি

বিহ মোর পরসন ভেল। রঘুপতি দরসন দেল॥

\+ + + +

এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়-সম্বন্ধে কবির মন্তব্য,—

রঘুপতি কেন? বিধাতা প্রসন্ন হওয়া, রঘুপতির দর্শন পাওয়া, বোধ করি একই কথা।

৮

নায়িকা সঁ সখী বচন

\+ + । + + ॥

* (মৃগমদ পংক করসি অংগ রাগ)।
কোন নাগর পরিনত হোঅ ভাগ॥
(পুনু২ উঠসি পছিম দিশ হেরি)।
কখন জাএত দিন কত অছি বেরি॥
নেপুর উপর করসি কসি থীর।
(দৃঢ় কয় পরিহসি তম সম চীর)॥

\+ + +

(… …)। কোন নাগরের ভাগ্য পরিণত হইল॥
(… …)। কখন দিন যায়, কত বেলা আছে॥
নেপুর উপরে কসিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে।
(… …)॥

* '(… …)' এই বন্ধনীর অন্তর্গত পদের বঙ্গানুবাদ কবি করেন নাই।

৯

নায়িকা সঁ সখী বচন

(সুংদরি কহ২ না কর বেআজে)।
পুরুব সুকৃত ফল কেদহ পাওত,
মদন মহা সিধি আজে॥

\+ + + +

(… …)। পূর্ব্ব সুকৃত ফলে মদন-মহাসিদ্ধি কে আজ পাইতেছে?

১০

নায়ক সঁ দূতি বচন

(মাধব জাইতি দেখলি পথ রামা)।
অবলা অরুণ তরা গন বেঢ়লি,
(চিকুর চামর অনুপামা)॥

\+ + + +

(… …)।
অবলা অরুণ, তারাগণ বেষ্টিত, (… …)।

[The spot of vermilion on her forehead was surrounded by a ring of silver stars.—Grierson.]

১১

রাহু মেঘ ভয় গরসল সুর।
(পথ পরিচয় দিবসহিঁ ভেল দূর)॥
নহিঁ বরিসয় অবসর নহিঁ হোএ।
পুর পরিজন সংচর নহিঁ কোএ॥

\+ + + +

(এহি সংসার সারবস্তু এহ)।
তিলা এক সংগম জাব জীব নেহ ॥
রাহু মেঘ হইয়া (মেঘের আকার ধারণ করিয়া) সূর্য্য গ্রাস করিল।
(... ...)॥
এখন বর্ষণ হইতেছে না, এবং দিনের বেলায় অবসর নাই, সেই হেতু পুরপরিজন কেহ সঞ্চরণ করে না ॥
(... ।
যাবজ্জীবন প্রেমের পর এক তিল সঙ্গম ॥

১২

সখী সঁ নায়িকা বচন

পএরহি অয়লুহুঁ তরনি তরংগ।
(পগ লাগল কত সহস ভুজংগ)॥
(নিশিথ নিশাচর সঞ্চর সাথ)।
ভাগন মোহি কেও ধয়লন্হি হাথ ॥
+ + +
তনি নহি পঢ়লন্হি মদনক রীতি।
(পিসুন বচন কয়লনিহ পরতীতি)॥
পায়ে হাঁটিয়া আসিলাম তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া (?)।
(... ...)॥
(... ...)। ভাগ্যে কেহ আমার হাথ ধরে নাই ॥
মদনের রীতি সে পাঠ করে নাই। (... ...)॥

১৩

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

(কুংজ ভবন সঁ চলি ভেলি হে, রোকল গিরধারী)।
একহিঁ নগর বসু মাধব হে, জনু কর বটবারী ॥
(... ...)। এক নগরে বাস কর, যেন বাটোয়ারী (ডাকাতী) করচ ॥

১৪

সখী সঁ নববিবাহিত নায়িকা বচন

+ + +
(বিচ২ সোভিত সুংদরি সজনী গে),
জনি ঘর মিলত মুরারি ॥
লৈ অভরন কৈ খোড়স সজনী গে,
পহিরি উতিম রংগ চীর।
দেখি সকল মন উপজল সজনী গে,
মুনি হুঁক চিত নহিঁ থীর ॥
(নীল বসন তন ঘেরলি সজনী গে),
সির লেলি ঘোঘট সারী।
+ + + +
সখি সভ লেলি ভবন কৈ সজনী গে,
ঘুরি আএলি সভ নারী ॥
(কর ধয় লেল পহু লগ কেঁ সজনী গে),
হেরৈ বসন উঘারী ॥
ময় বর সনমুখ বোলে সজনী গে,
করৈ লাগল সবিলাথে।
নব রস রীতু পিরিত ভেল সজনী গে,
(দুহু মন পরম হুলাসে)॥
+ + + +
বয়স জুগল সম চিত থিক সজনী গে,
(দুহু মন পরম হুলাসে)॥
(... ...)। যদি ঘরে মুরারি মিলে ॥
ষোড়শ আভরণ লইয়া,* উত্তম রঙ্গের চীর পরিয়া* দেখিয়া সকলের মনে এইরূপ উপজিল (বোধ হইল), মুনির চিত্ত স্থির থাকে না ॥
(... ...), মাথায় শাড়ীর ঘোমটা।
সখি সকলে ভবনে (:আমাকে) দিয়া আসিল ও সকলে ফিরিয়া গেল।
(... ...), প্রভু বস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিল ॥
আমার সম্মুখে বর সবিলাসে কথা কহিতে লাগিল।
নবরস রীতিতে পিরীত হইল, (... ...)॥
বয়স এবং চিত্ত উভয়ের সমান, (... ...)॥

১৫

নায়ক নায়িকা মিলন

(চলু২ সুংদরি শুভ করি আজ)।
তত মতত† করৈতি নহিঁ হোএ কাজ ॥
ধনিঅ বেআকুলি কোমল কংত।
(কোন পরবোধব সখি পরজংত)॥

---

* Griersonএর ইংরাজী অনুবাদের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই।

† ততমত—delay.—Grierson.

সখি পরবোধি সেজ জব দেল।
পিআ হরখি উঠি বাহি ধরি লেল॥
+ + + +
(ভনহিঁ বিদ্যাপতি হে জুবরাজ)।
সভ সঁ বড় থিক আঁখিক লাজ।

(… …)। থতমত করিলে কাজ হয় না॥
ধনি ব্যাকুল, কোমল কান্ত। (… …)॥
সখি প্রবোধিয়া শয্যায় লইয়া গেল। পিয়া হর্ষিয়া উঠি বাহু ধরি লইল।
(… …)। চক্ষুলজ্জাটাই সব চেয়ে বেশী॥

১৬

অভিসার মুগ্ধা নায়িকা

+ + +
জেসে ডগমগ নলনিক নীরে।
তৈসে ডগমগ ধনিক সরীরে।
(ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজে)।
আগি জারি পুনি আগিক কাজে॥

নলিনীর জল যেরূপ ডগমগ।
ধনীর শরীর সেইরূপ ডগমগ॥*
(… …)।
আগুন জেলে ফের আগুনের কাজ তো চাই॥

১৭

নায়ক ও মুগ্ধা নায়িকা মিলন

(মাধব সিরিস কুসুম সম রাহী)।
শোভিত মধুকর কৌসল অনুসর, নব রস পিবু অবগাহী॥
(পহিল বয়স ধনি প্রথম সমাগম,
পহিলুক জামিনী জামেঁ)।
আরতি পতি পরতীতি ন মানথি,
কি করথি কেলিক নামেঁ॥
(অংকম ভরি হরি সয়ন সুতাওল, হরল বসন অবিশেখে)।
চাঁপল রোস জলজ জনি কামিনি, মেদনি দেল উপেখে॥
আকুল অলপ বেআকুল লোচন, আঁতর পূরল নীরে।
মনমথ মীন বনসি লয় বেধল, দেহ দসো দিশি ফীরে॥
(ভনহিঁ বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন,
মধুকর লোভিত কেলী)।
(… …)।
লোভিত মধুকর কৌশল অনুসরি,
অবগাহিয়া নব রস পান করে॥

(… …, … …)।
আরতি পতি পরতীতি মানে না,
কেলির নামে কি করে॥
(… …, … …)।
রোষে যেন মাটিতে উপেক্ষায় পদ্মকে চাপিল॥
অল্প আকুল, ব্যাকুল লোচনান্তর নীরে পূরল।
মন্মথ মীনকে বংশী দিয়া বিঁধিল, তাহার চক্ষু দশ দিকে ফিরিতেছে॥
(… … , … …)।

১৮

সখি সঁ নায়িকা বচন

+ + । + + ॥
হরখ সহিত হেরলহুঁ মুখ কাঁতি।
পুলকিত তনু মোর ধর কত ভাঁতি॥
(তখন হরল হরি অংচল মোর)।
রস ভর সসরু কসনিকের ডোর॥
+ + । + + ॥
হর্ষে সে আমার মুখকান্তি হেরিল।
পুলকিত তনু কত ভাঁতি ধরিল॥
(… …)। কসন-ডোর রসভরে সরিয়া পড়িল॥

১৯

রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন

+ + । + + ॥
বদন মিলায় ধয়ল মুখ মংডল, কমল বিমল জনি চংদা।
ভমর চকোর দুঅও অলসাএল, পীবি অমিঅ মকরংদা।
মুখমণ্ডলে বদন মিলাইয়া ধরিল,
পদ্মের উপরে যেন বিমল চাঁদ।
অমিয় মকরন্দ পান করিয়া,
* ভ্রমর ও চকোরী দুজনই অলস হইল॥

* 'ভ্রমর'—পুরুষ। 'চকোরী'—কামিনী।

২০

সখী সঁ নায়িকা বচন

+ + । + + ॥
সমুদ্র ঐসনি নিসি ন পাবিঅ ওরে।
কখন উগত মোর হিত ভয় সুরে॥
(অব ন জাএব সখি পুনি পহু ঠামেঁ)।
… … … …
সমুদ্রের মত নিশির পার পাই না।
আমার হিতকর হইয়া সূর্য্য কখন উদিত হইবে॥

* ডগমগ—The act of trembling or quivering.
—Grierson.

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

"দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র]

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অনন্ত উন্নতির কথাটা আমরা য়ুরোপ হইতে পাইয়াছি। এক সময় খৃষ্টানের ঈশ্বর দূরবর্ত্তী স্বর্গের ঈশ্বর ছিলেন এই জন্য ক্রমশ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার কথাটা তৎকালীন খৃষ্টানদের মুখেই শোভা পাইত। আমাদের ব্রহ্ম সেরূপ দূরবর্ত্তী নহেন—অতএব "পাওয়া" প্রভৃতি শব্দ তাঁহার সম্বন্ধে খাটে না। এ কথার আলোচনা আমি অন্যত্র অনেক বার করিয়াছি।

"আত্মবোধ" প্রবন্ধটা এখানে আমার সম্মুখে নাই এই জন্য আপনারা যে বিশেষ অংশটির কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। আত্মবোধের শেষভাগে আমি এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রহ্মের প্রকাশ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ—কেবল মানবের ইচ্ছার মধ্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ করেন নাই—কারণ তাহা হইলে ইচ্ছার ধর্ম্মই লোপ হইত। হাঁ ও না দুই না থাকিলে ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। যেখানে "না" বলিবার সম্ভাবনামাত্র নাই একেবারেই "হাঁ", সেখানে অন্ধ শাসন—সেখানে প্রেম নাই, ইচ্ছা নাই। যেমন জড় প্রকৃতি—সেখানে যাহা না ঘটিলে নয় তাহাই ঘটিতেছে—অতএব সেখানে ঈশ্বরের নিয়ম প্রকাশ পাইতেছে, প্রেম প্রকাশ পাইতেছে না। প্রেম প্রেমকে চায়, ইচ্ছা ইচ্ছাকে চায়। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে 'না'কে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া যখন তিনি "হাঁ"কে জয় করেন তখনই আমাদের ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া যখন তাঁহার ইচ্ছাকে স্বীকার করি তখনই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মিলন হয়। সুতরাং ইহার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। এক সময় আমাদের যে প্রেম তাঁহাকে চায় নাই কেবল বিষয়ের রাজ্যে ঘুরিয়াছিল সেই প্রেম যখন তাঁহাকে চায় তখন তাঁহার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার মিলন হয়—তখনই আমার প্রেম তাঁহার প্রেমকে উপলব্ধি করে এবং চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করে। অতএব মানবাত্মার ইচ্ছার মধ্যে পরমাত্মার ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ জগতে আর কোথাও দেখিতে পাই না কেবল ভক্তের জীবনে দেখি। এ পর্য্যন্ত মানব ইতিহাসে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে পরিপূর্ণ মাত্রায় পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে জীবাত্মার ইচ্ছার একান্ত যোগ দেখা যায় নাই—কোথাও বা জ্ঞান প্রবল কর্ম্ম প্রবল নহে কোথাও বা অন্যরূপ। কিন্তু এই আদর্শ যে অসম্ভব তাহা নহে। বিশ্বমানবের চিত্তে এই ইচ্ছাই গূঢ়ভাবে নিয়ত কাজ করিতেছে—সে তাঁহাকে আপনার সকল দিয়া উপলব্ধি করিবে ইহাই তাহার সাধনা—মানুষ আপনার বুদ্ধি প্রীতি ও শক্তি এই তিন পাত্র পূর্ণ করিয়া ভরিয়া তাঁহার অমৃত পান করিবে এই পরম ইচ্ছাটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যেই আছে—ক্রমশ এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া উঠাই প্রেমের লীলা—এই লীলা কখনই শেষ হইয়া যাইতে পারে না—কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে এই লীলা কোনো কালে আরম্ভ হইতেও পারে না; অনন্তকাল উহা দূরেই থাকিয়া যাইবে—বাধা ব্যবধানের ভিতর দিয়া দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা চলিতেছে তাহারই মহা আনন্দের রূপ আমরা ভক্তের জীবনের মধ্যে দেখিতে পাই। ইতি ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিলাইদা
নদিয়া

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র

[ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

পরম কল্যাণীয়েষু—

আমার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আগরতলায় যে অভিনন্দন-সভা আহূত হয় সেজন্য সেখানকার সর্ব্বসাধারণকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

আমার সম্মানে তোমরা যে আন্তরিক আনন্দ বোধ কর ইহাই আমার যথার্থ পুরস্কার।

ভগবান তোমার কল্যাণ করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২০

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরম কল্যাণীয়েষু—

তুমি মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিবে ত্রিপুরার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত তোমাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যত প্রকার প্রস্তাব হইয়াছে এইটেই সকলের চেয়ে ভাল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহাতে পূর্ণশক্তিতে তুমি কাজ করিতে পার সেইরূপ অধিকার তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পদে পদে বাধা পাইয়া যাহাতে অকৃতকার্য্য না হও পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা পাকা করিয়া লইবে। কর্ম্মপ্রণালী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে সমস্ত পুরাতন জঞ্জাল জমিয়া আছে তাহা দৃঢ়তার সহিত অথচ সময় বুঝিয়া সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিয়া দিবে। তোমাদের রাজ্য-শাসনটিকে তোমার ধর্ম্মসাধনরূপে পালন করিও—কোথাও কোনো অন্যায় বা শৈথিল্য ঘটিতে দিয়ো না। কোনো যথার্থ বড় কাজ কখনই কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা হইতেই পারে না, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রয়োজন। তোমাদের ন্যায়বিচারের প্রতি সর্ব্বসাধারণের যেন অবিচলিত শ্রদ্ধা জন্মে। তাহারা এ কথা যেন নিশ্চিত বুঝিতে পারে তোমরা যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিবে সে নিয়মকে তুমি বা রাজা বা কেহই কোনো মতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহার প্রতি তোমরা বিরক্ত হইবে তাহার প্রতিও যথানিয়মে সদ্বিচার করিতে হইবে—মনে ক্রোধ জন্মিলে বা কোথাও কিছু অসুবিধা ঘটিলে তখনি নিয়ম ডিঙাইয়া যাইবার কথা যেন মনেও উদয় না হয়। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে ক্ষমতাকে বিধানের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার ভার তাহারই উপরে।

তোমাকে এত কথা বলাই বাহুল্য—কেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি নির্ব্বিশেষে সকলের সম্বন্ধেই সত্য রক্ষা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবে। তোমার হাতে ত্রিপুরার রাজ্যব্যবস্থা উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে এক দিন ইহাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম কারণ ইহাতে সমস্ত বাংলা

দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। তোমাদের দেশের ভূগর্ভে অরণ্যে কান্তারে অনেক সমৃদ্ধি প্রচ্ছন্ন আছে-লক্ষ্মী তোমাদের ওখানে ধরাশয়নে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহাকে জাগরিত কর—দেশের সর্ব্ব শিক্ষা স্বাস্থ্য বিস্তারিত কর—প্রজাদের প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য বহুকাল অননুষ্ঠিত রহিয়া তুমি তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন কর তাহাতে তোমার জীবন সার্থক হইবে।

ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্মের ক্ষেত্রে শক্তি দিন্, কল্যাণের পথে গতি দিন্, জীবনের সাধনায় সাহ দিন—বাধাবিপত্তিতে কোনোদিন তোমার মন অবসন্ন না হউক্—শুভ ইচ্ছা নিশ্চয়ই সফল হইবে এ ভরসা মনের মধ্যে দৃঢ় করিয়া স্তুতি নিন্দা ক্ষতি লাভে বিক্ষুব্ধ না হইয়া অবিচলিত অধ্যবসায়ে কা করিয়া যাইবে এবং সকল কর্ম্মই বিশ্ববিধাতাকে উৎসর্গ করিবে। ইতি ১১ ফাল্গুন

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের প্রধান জজের পদ খালি হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না—সে পদে প্রবী লোককে বসানই কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আজ হইতে আরম্ভ হইল। আগামী আষাঢ় হইতে বিদ্যালয়ের কাজে অ্যাণ্ড্রুজ ও পিয়ারসন সাহেব যোগ দিবেন—তাঁহাদের দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার আশা করি। এরূপ সহৃদয় ভারতহিতৈষী আমি ত দেখি নাই।

আমি কলিকাতায় সপ্তাহখানেক থাকিয়া আলমোড়ার নিকট রামগড় পাহাড়ে যাইবার সংকল্প করিয়াছি। সেইখানেই ছুটি যাপন করিয়া আসিব।

ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কল্যাণ কামনা করি। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩২১

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি আমার অন্তরের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তুমি যে বৃহৎ কর্ম্মভার লইয়াছ তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিবার শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দান করুন। তুমি বিজয়ী হও, তোমার তপস্যায় সিদ্ধি লাভ হউক্। ইতি ১৫ই আশ্বিন ১৩২১

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

আমি শিলাইদহে নদীতে কিছু দিন হইতে আছি। তোমাদের ত্রিপুরার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

কিরূপ কিছুই জানিতাম না। এমন সময় একজন আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন তোমরা মন্ত্রীপদের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ খুঁজিতেছ এবং ইতিমধ্যেই অনেক ডেপুটি উমেদারী করিতেছেন।

সংবাদটি কি সত্য? তুমি কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ? ইহাতে নিশ্চয়ই তুমি মনের শান্তি পাইবে। কিন্তু আমি একান্ত আশা করি এই ব্যাপারে তোমার সাংসারিক গুরুতর ক্ষতি কিছুই ঘটিবে না। গবর্ণমেণ্টের সহিত তোমার কিরূপ কথাবার্ত্তা এবং মহারাজার সহিত তোমার কিরূপ বন্দোবস্ত হইল তাহা জানিবার জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম।

একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই পদের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন—তাঁহাকে জানি—লোকটি যোগ্য বটেন। কিন্তু আমার ত কিছুই করিবার নাই। তার পরে ওখানকার অবস্থা কিছুই জানি না। তোমরা কি অবশেষে ডেপুটি লওয়াই স্থির করিয়াছ? তোমাদের জেলায় এ বৎসর বন্যা প্রভৃতি কারণে দুর্বৎসরের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে তোমাদের রাজ্যের মধ্যে এই সকল অব্যবস্থার আসন্ন সম্ভাবনা—ইহাতে মনে উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেছি।

মহামান্যবর মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর

একান্ত মনে তোমার কল্যাণ কামনা করি। ইতি ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২২

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন্ত্রিত্বপদ পরিত্যাগ করার পর লিখিত।

ওঁ

পোর্টসেয়েদ

কল্যাণীয়েষু,

য়ুরোপের পালা সাঙ্গ হ'ল। আজ বিকালে এখান থেকে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি দেব। আমরা হিসাব করেছিলেম যে ঠিক ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই আশ্রমে পৌঁছতে পারব। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কলম্বো পৌঁছতেই ৩রা পৌষ হবে। কোনো মতে হয়ত ৮ই পৌষে শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হতে পারি। কিন্তু মনে বড় দুঃখ বোধ হচ্ছে। জার্ম্মান জাহাজ এখান থেকে কলম্বো যেতে ১৬ দিন লাগাবে। পিএনো জাহাজে এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারতুম। কিন্তু হাড়পাকা এংলো ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এক জাহাজে বাসা করতে আমার রুচি হয় না। যাক্, দেশে ফিরে গিয়ে আশা করি তোমার

সঙ্গে দেখা হবে। স্বরাজ্য থেকে নেমে একবার শান্তিনিকেতনে দেখা দিয়ো। এবার য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আলোড়ন করে বেড়িয়েছি। সম্মান অভ্যর্থনা যথেষ্ট পাওয়া গেছে কিন্তু তোমারি মত মনের অবস্থাটা ছিল—মনটা অহোরাত্র দেশের দিকে উড়ু উড়ু করেছে। বোম্বাই ওয়ালা জাহাজ পেলে সুখী হতুম—কলম্বো দিয়ে যেতে অনেক হাঙ্গাম।—এবার য়ুরোপে তোমার ভ্রমণ হল বটে কিন্তু শরীরটা সারতে পারলে না এই আমার বড় আক্ষেপ রইল। আশা করি দেশে গিয়ে যথোচিত সেবা শুশ্রূষায় ভাল বোধ করচ। আমি মাঝে মাঝে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেম তাতে একটা এই সুবিধা হয়েছে যে আমার রাশিয়ায় যাওয়াটা বন্ধ হল। সেখানকার শীত এবং ভ্রমণের দুঃখ আমার কিছুতে সইত না।

প্রশান্ত ও রাণী আরো চার মাসের জন্যে য়ুরোপে রয়ে গেল। আমার সঙ্গ পেয়ে তারা য়ুরোপটা খুব ভাল করে দেখে নিতে পেরেছে। ইজিপ্টে এ কয়দিন বেশ কেটেছে—অনেক দেখবার জিনিস ছিল—আদর যত্নও প্রচুর পাওয়া গেছে। বিস্তৃত বিবরণ দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ। ইতি ৩ ডিসেম্বর ১৯২৬

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই য়ুরোপযাত্রা-সময়ে মহারাজকুমার সঙ্গী ছিলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই ফিরিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

চিত্রকলা শিখতে বিলাত যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ত্রিপুরার চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মাকে লিখিত চিঠি]

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। কিন্তু ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তুমি বিলাতে যাচ্ছ এ সংবাদে আমি কিছুমাত্র আনন্দ বোধ করচি নে। যদি বিজ্ঞান শিখ্‌তে যেতে আপত্তি করতুম্ না। কিন্তু চিত্রকলা? এইটেই কি প্রমাণ করতে যাবে যে এই হতভাগ্য দেশে কোনো বিভাগেই নিজের মধ্যে নিজের শক্তির উদ্ভাবন নেই! পিঠে ওদের দাগা নিয়ে তবে আমরা পণ্যের মতো হাটে বিকোতে যাব। জ্ঞান শিক্ষায় নম্রতার প্রয়োজন, কিন্তু সৃষ্টিশক্তির প্রতিভা মাথা হেঁট করার দ্বারা যে আত্মাবমাননা করে তাতে তার শক্তির হ্রাস হয়। * * * তার পরিচয় দিয়েচে। তবে কিনা টাকায় থলির পূরণ হয় সে কথা মানি। অজণ্টার চিত্রীদের সম্বন্ধে এই গৌরব চিরদিন করব যে তারা সম্পূর্ণ আমাদেরই—সাউথ কেন্সিঙটনের লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত নয় তারা। কিন্তু কোন্ প্রলোভনে কোন্ মোহে তোমরা এই অগৌরবের দাগা

স্বীকার করতে চল্‌লে যা'তে ইতিহাসে চিরদিন ঘোষিত হতে থাক্‌বে যে তোমার খ্যাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খ্যাতিরই উচ্ছিষ্ট! এমনি করে নিজের প্রতিভার জাত মেরে তার পরিবর্ত্তে অর্থ পাবে কিন্তু স্বদেশকে একেবারে অন্তরে অন্তরে বঞ্চিত করবে সেকথা মনে রেখো। আমাদের আপিসে পরোপজীবীদের দল আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরের ছাত্রদের ভিড়—কিন্তু ভারতে ভারতীর রাজ্যে কোথাও কি একটা জায়গা থাকবে না যেখানে বীণাপাণির বীণার অন্ততঃ একটি তারও এখানকারই খনির খাঁটি সোনায় তৈরি! সর্ব্বত্রই বিলিতী হাটের এইট্রিন্ ক্যারাট্ চালাতে হবে? দুর্ভাগা দেশে মজুররা যায় পরের দ্বারে অন্নের জন্যে, কিন্তু সেই দেশ তার চেয়ে আরো দুর্ভাগা যেখান থেকে গুণীরাও বিদেশী ধনীর কাছে সেলাম সেলাম ক'রে বলে, তোমার হাতের তিলক কপালে যদি আঁকি তবেই আমার জয় হবে! সাউথ কেন্সিংটনের দাগা দেশের আশীর্ব্বাদকে ব্যর্থ করবে এ মনে জেনে তোমার বিদেশ যাত্রায় আমি প্রসন্নতা প্রকাশ করি কেমন করে? ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউসে চিত্র অঙ্কনের জন্য যাওয়ার প্রাক্কালে।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হলুম। বিলিতী মাষ্টারের হাতে তোমরা যে ছাত্র ব'নে যাবে না, এটা ভালো কথা। ওখানকার চিত্রকলা ভালো করে দেখ্‌বে, বিচার কর্‌বে, তার থেকে যেটুকু সম্পূর্ণভাবে আপনার করে নিতে পারো সে চেষ্টাও ছাড়া উচিত নয়—কেবল নিজের মুণ্ডটা নিজের কাঁধেরই উপরে যেন থাকে এই হলেই হোলো। * * *-এর দুরবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি।

এখানে শরতের অবসান হয়ে এলো, শীত পড়েচে। দুপুর বেলায় আতপ্ত হাওয়াটি বেশ লাগচে ভালো—মাঠের প্রান্তে সুদূর বনরেখাটি দিক্‌লক্ষ্মীর নীল অঞ্চল দেওয়া চক্ষুপল্লবের মতো দেখা যাচ্চে। মাঠে বর্ষার রসপুষ্ট ঘাস এখনো ঘন সবুজ আছে, গোরুগুলি অলসভাবে চ'রে বেড়াচ্চে—কোথা থেকে ঘুঘুর ডাক শুনতে পাচ্চি—সামনে ঐ লাল রাস্তা দিয়ে চলেছে গোরুর গাড়ী—আকাশে পাণ্ডুবর্ণ ছিন্ন মেঘের স্তবক, যেন দ্যুলোকের ধেনুর পাল—মন্থর গমনে পরিপুষ্ট দেহে চরে বেড়াচ্চে।

প্রবাসে তোমার সাধনা সম্পূর্ণ সার্থক হোক্ এই আমি কামনা করি। ইতি ১১ নবেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী-স্মৃতি

শ্রীযদুনাথ সরকার

প্রায় আশি বৎসর গত হইল, এক জন স্বদেশপ্রেমী বাঙ্গালী কবি বিলাপ করিয়াছিলেন—

"যদি এই রাজ্য ছাড়েন তুঙ্গরাজ,
বিলাতী বসন বিনা কিসে রবে লাজ?
ধরবে কি লোকে দিগম্বরের সাজ
বাকল টেনা ডোর কপিন?
সুঁচ সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে বেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।
দিনের দিন সবে দীন
ভারত হয়ে পরাধীন।"

কিন্তু আজ, আর সে দুঃখ করিতে হইবে না। যাঁহাদের অক্লান্ত দেশসেবায়, দূরদৃষ্টি ও চরিত্রের বলের ফলে দেশ এই মহাবল লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী একজন শীর্ষস্থানীয়। একথা একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক।

১৯০৮ সালে মোহিনী মিল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে ভারতীয় লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত কাপড়ের কল ছিল, কিন্তু তাহা বাঙ্গলার বাহিরে স্থাপিত এবং অবাঙ্গালী দিয়া পরিচালিত, তাহাতে মোটা ধুতি মাত্র বুনা হইত। কিন্তু বাঙ্গলার মত নদনদী পুকুরে ভরা দেশে, এবং উষ্ণ জলীয় বাতাসের চাপের মধ্যে মোটা ধুতি পরিলে ঘামিয়া চর্ম্মরোগ এবং কাপড় না শুকাইতে পারায় সর্দি রোগ শীঘ্র আসিয়া পড়ে, সুতরাং ভদ্রলোকেরা পাতলা কাপড় পরিতে বাধ্য হন, আর সাধারণ লোকেরা যত দূর সম্ভব দিগম্বরের কাছাকাছি হইয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। ভদ্র বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহারের জন্য পাতলা ধুতি চাই, কিন্তু বঙ্গ-বিচ্ছেদ আন্দোলনের আগে পর্য্যন্ত বম্বের কলগুলি খুব কম পাতলা ধুতি বুনিত, তাহাতে লাভ হয় না বলিয়া। এমন কি লংক্লথ এবং নয়নসুক যাহা দিয়া শার্ট করা যাইতে পারে, তাহাও ধোলাই পাওয়া যাইত না। বম্বে অথবা বিওয়ার মিলে পাগড়ি বাঁধার জন্য পাতলা লম্বা কাপড় যাহার নাম সাফ্‌ফা, এবং এক রকম মাঝারি পাতলা মার্কিন কোরা অবস্থায় পাওয়া যাইত। আমি পাঠ্যাবস্থায় তাহা কিনিয়া দুই বা তিন বার উপরি উপরি ধোলাই করিয়া, তবে তাহা কাটিয়া শার্ট প্রস্তুত করিয়া লইতাম।

তাহার পর বঙ্গ-বিচ্ছেদের আঘাত পাইয়া বাঙ্গালী জাতি হৃদয়ে আহত, লজ্জিত, ক্ষুব্ধ এবং নিজকে অসহায় দেখিয়া যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। গভীর অন্তরের উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালী জাতি বিদেশী বর্জন করিব এই প্রতিজ্ঞা এক দিন এককণ্ঠে ঘোষণা করিল। সেটা আগস্ট মাসে ঘটে, তার দু-মাস পরেই দুর্গাপূজা, এই সপ্তকোটি নরনারীর সে সময় নূতন কাপড় কেনা চিরসংস্কার। কিন্তু কাপড়ের জন্য বম্বেতে অর্ডার পাঠাইলে সেখানকার ভাটিয়া ও পার্সী ধনকুবেরগণ এই সুযোগে ক্রোরপতি হইবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। চার পাঁচ কোটী টাকার কাপড়ের অর্ডার বাঙ্গলা হইতে গেল, আর বম্বে মিলওয়ালারা কাপড় দিতে দেরি করিলেন এবং যাহা দিতে চাহিলেন তাহারও দাম ত্রিগুণ হাঁকিয়া বসিলেন। এ সময় পূজার কাপড়ের বাজার খোলা রাখা যায়? কিরূপে বাঙ্গালীর সম্মিলিত জাতীয় স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায়? ইহার ইতিহাস আমি ৺সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি।

তিনি তখন কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, স্বদেশের সেবায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি কলুটোলার কবিরাজ-বংশের উপেন্দ্রনাথ সেন ও আর একজন যুবক কর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া বম্বে ছুটিয়া গেলেন, সেখানে ভাটিয়া ও পার্সী মিল-মালিকদের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিলেন যে প্রস্তুতের খরচের উপর সাধারণ লাভ, অর্থাৎ কস্টপ্রাইস এণ্ড নর্ম্যাল প্রফিট, লইয়া যেন কাপড় বাঙ্গলায় পাঠান, যেন এ বৎসরের মত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কথা রক্ষা হয়, বাঙ্গালী যেন লোক না হাসায়। কিন্তু বম্বের এই সব অবাঙ্গালী কুবেরগণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, নিলামে চড়াইয়া কাপড়ের চাহিদা অনুসারে যত দাম বাড়ে তাহার কমে বেচিবেন না বলিলেন।

এমন স্থযোগ কি ছাড়া যায়! মরুক শালা বংগালী লোক, কিন্তু বিজিনেস্ ইজ্ বিজিনেস্।*

বিফলতার গভীর লজ্জা বহন করিয়া স্থরেন্দ্র মল্লিক বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিলেন, সকল কথা জানাইলেন। জ্ঞানী ও তেজস্বী দু-দশ বাঙ্গালী পরিবার রাগে বলিলেন যে এ বৎসর পূজার সময় বস্ত্রের কাপড় এই চড়া দরে আমদানী করিব না, পুরাতন ছেঁড়া কাপড় ছেলেমেয়েকে পরাইব। কিন্তু জনসাধারণ ত তত বুদ্ধিমান বা ত্যাগী নহে। সে বৎসর কিরূপ ছোট ও মোটা বোম্বাই কাপড় কত অন্যায় বেশী দরে কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—বিদ্যাসাগরের কলেজের অফিসের উপরতলার ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে ঐরূপ কাপড় আমদানী করিয়া কোন কোন বাঙ্গালী লোকের অভাব মিটাইবার চেষ্টা করেন; সেখান হইতে আমি বস্ত্র কিনি।

স্থতরাং বাঙ্গলা দেশে এবং বাঙ্গালীর দ্বারা চালিত কাপড়ের কল স্থাপন করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। ইহার বিশ বৎসর পূর্ব্বে এ জন্য আয়োজন হইয়াছিল সত্য। রঙ্গপুরে কটন মিলের স্থাপনার প্রস্তাব, কোম্পানী গঠন এবং শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হয়, বঙ্গ-বিচ্ছেদের কুড়ি-একুশ বৎসর আগে। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব তাহাতে অনেক অংশ প্রথমেই কেনেন এবং কয়েক বৎসর একজন ডিরেকটরও নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু সে মিল একখানা ধুতি এক গুলি স্থতা পর্যন্ত এত দিনে উৎপন্ন করে নাই, পরে তাহা কলিকাতার নিকট উঠাইয়া আনা হয় এবং অবাঙ্গালীদের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হয়। এই মিলের নূতন কর্ত্তৃপক্ষগণের কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া আমার বাবা তাঁহার ডিরেকটরী ছাড়িয়া দেন এবং বাকী কলের টাকাও দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে টাকা দাবী করিয়া মামলা আনা হয়, তিনি ছোট গার্থ সাহেবকে কৌঁস্থলী দেন। শেষে তাঁহারা বাকী "কল-মানি"র দাবী ছাড়িয়া দিলেন, যখন আমরা তাঁহাদের কেলেঙ্কারি জেরা করিয়া বাহির করিতে নিরস্ত হইলাম। অবশ্য আমাদের প্রদত্ত পূর্ব্ব "কল-মানি" সব গেল। কোন পক্ষই খরচা পাইলেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী। তিনি ধনকুবের ছিলেন না, ঢক্কানিনাদকারী জননায়ক বা পেশাদার রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। বাগ্মী পর্য্যন্ত নহেন—যেমন মাদ্রাজী ভ্রাতাগণ দু-ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতা করিয়া যান, লোকে অবাক্ হইয়া শোনে, তিনি ঐ শ্রেণীর জীব ছিলেন না।

কিন্তু তাঁহার ছিল স্থির বুদ্ধি, প্রকৃত স্বজাতিপ্রীতি এবং মানবের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি—চরিত্র-বল। সেই জন্যই তাঁহার নিজ জীবনের ক্ষুদ্র সঞ্চিত পুঁজির টাকা দিয়া গঠিত এই আদি আকারের মোহিনী মিল দেখিবামাত্র আমাদের সকলের তাহাতে বিশ্বাস জন্মে এবং দেশবাসিগণ তাঁহাকে ধরিয়া ইহাকে যৌথ কারবারে পরিণত করায়। প্রথম প্রথম মূলধনের টানাটানি, নানা অস্থবিধা ও বাধা, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ডিভিডেণ্ড হয় না। তবুও কেহ এই মোহিনী মিলে বিশ্বাস হারায় নাই।

মোহিনী বাবুর সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকার আমার এই জন্য আছে যে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এবং তিনি এক-সঙ্গে একই ক্লাসে বোয়ালিয়া হাই স্কুলে (অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজশাহী কলেজেট স্কুলে) পাঁচ বৎসর পড়িয়া, একসঙ্গে ১৮৫৭ সালে অর্থাৎ মিউটিনির বৎসরে পাস করিয়া অন্যত্র কলেজে পড়িতে চলিয়া যান। তাঁহারা দু-জনে পরস্পরে তুমি তুমি বলিতেন। মোহিনী বাবু স্থতরাং আমাকে পুত্রের মতই দেখিতেন। আমার সঙ্গে তাঁহার শেষ

---

* এ বিষয়ে গান্ধীজীর ইংরেজী আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাঠনীয়—প্রবাসীর সম্পাদক।

The mill-owner opened the conversation.

"You know that there has been Swadeshi agitation before now?"

"Yes, I do," I replied.

"You are also aware that in the days of the Partition we, the mill-owners, fully exploited the Swadeshi movement. When it was at its height, we raised the prices of cloth, and did even worse things."

"Yes, I have heard something about it, and it has grieved me."

"I can understand your grief, but I can see no ground for it. We are not conducting our business out of philanthropy. We do it for profit, we have got to satisfy the shareholders. The price of an article is governed by the demand for it. Who can check the law of demand and supply? The Bengalis should have known that their agitation was bound to send up the price of Swadeshi cloth by stimulating the demand for it."

I interrupted: "The Bengalis like me were trustful in their nature. They believed, in the fulness of their faith, that the mill-owners would not be so utterly selfish and unpatriotic as to betray their country in the hour of its need, and even to go the length, as they did, of fraudulently passing off foreign cloth as Swadeshi."

"I knew your believing nature," he rejoined; "that is why I put you to the trouble of coming to me so that I might warn you against falling into the same error as these simple-hearted Bengalis."
The Story of My Experiments with Truth, pp. 605-606.

সাক্ষাৎ ১৯১৯ সালে কাশীতে ঘটে, তখনও তিনি হাঁটিয়া বেড়াইতেন।

এখন একটা হুজুক উঠিয়াছে যে শুধু চরকায় সুতা কাট, দেশ উদ্ধার হইবে, জাতীয় দৈন্য ঘুচিবে, পূর্ণ স্বরাজ হাতে নামিয়া আসিবে। কিন্তু জগতের অর্থনীতির ইতিহাস পড়িয়া এ সম্বন্ধে একটা কথাই মনে উঠে। দেড়-শ বৎসর আগে যখন ইংলণ্ডে সুতা কাটার ও কাপড় বুনিবার কাজ প্রথম বড় বড় উন্নত প্রণালীর কলে করা আরম্ভ হইল, তখন বাঙ্গলার তাঁতীদের অন্ন গেল ত বটেই, সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ইংলণ্ডবাসিনীগণ যাহারা হাতে সুতা কাটিত তাহারাও বেকার হইয়া পড়িয়া অন্য ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইল। পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে এই পরিবর্ত্তন ইংলণ্ডের জনসাধারণের পক্ষে ভালই হইয়াছিল, কারণ হাতে চরখা চালাইয়া সমস্ত দিন দশ-বারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেই এক মাত্র একঘেয়ে বৈচিত্র্য-বিহীন চিন্তা-বিহীন কাজ করিয়া, মেয়েদের দেহ ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িত, তাহারা কলুর ঘানির গরুর মত সজীব উদ্ভিদ্-বিশেষে পরিণত হইত, এরূপ কাজে হৃদয় বা প্রতিভার পোষণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না আর দশ-বারো ঘণ্টা চরখা কাটিয়া যে সুতা প্রস্তুত হয় তাহা বেচিলে শ্রমিকের মজুরি ইংলণ্ডেও ভাত কাপড় কেনার উপযুক্ত হইয়া উঠে না, অনেক কম থাকে। অর্থাৎ ইংলণ্ডের সেই যুগের ইতিহাস-রচয়িতারা দেখাইয়াছেন যে চরখা ও তাঁতে সাধারণ পরিধেয় পণ্য—যাহা সৌখিন বা কারুশিল্পের পদার্থ নহে—তাহা উৎপন্ন করিলে, ঘোর আর্থিক ক্ষতি বা National Economic Waste হয় এবং শ্রমিকগণও ক্রীতদাসে পরিণত হয়। ভারতে চরখায় সুতা কাটিলে সমস্ত দিনে এক জন দক্ষ সুস্থ লোক তিন আনার বেশী মজুরি উপার্জন করিতে পারে না।

ইহার তুলনায় কাপড়ের কলের শ্রমিক অনেক বেশী স্বাধীন, অনেক বেশী সুখী এবং অধিক উপার্জনশীল। অথচ একটা বাঁধা গৎ শুনা যায় যে চরখার প্রচারই দেশ-সেবার একমাত্র উপায় এবং কলের চালকগণ দেশের শত্রু, তাহারা ভারতকে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের পথে যাইতে বাধা দিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, ভারতের মত গরীব দেশ কি National Economic Waste সহ্য করিতে পারে; আমরা কি পুরাতন তীর ধনুক হাতে লইয়া বর্ত্তমান সভ্য জগতের মেশিনগানের সামনে দাঁড়াইতে পারি? এই যে চরখা চরখা বলিয়া অহোরাত্র হুংকার এই যে জাতীয় সর্বব্যাধিহরণকারী মহৌষধি চরখা বলিয়া একটা বাণী মুখে প্রচারিত হয়, অথচ অন্তরে কেহ বিশ্বাস করে না, কাজেও নেতারা নিজে চরখা কাটে না, এটা ঠিক মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের একটা রূপান্তর মাত্র।

সুতরাং কেহ যেন মনে না ভাবেন যে মোহিনীমোহন কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া "মহাত্মা" শব্দের বিপরীত পদবাচ্য হইয়াছেন। আমি বলি, তিনিই মহাত্মা যিনি অঘটনকে ঘটন করিয়াছেন, বাঙ্গালী যে যৌথ কারবারকে সফল করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় বঙ্গযুবকগণ যে ভাটিয়া ও পার্সীর পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত অর্থ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দীর্ঘকাল দাঁড়াইতে পারে, তাঁহার সৃষ্ট কোম্পানী প্রমাণ করিতেছে।

এই মিল অনেক বৎসর ডিভিডেণ্ড দিতেছে; এই মিলের কলেবর বৎসর বৎসর বাড়িতেছে। কিন্তু আমি বলি ইহাই মোহিনীমোহনের চরম কীর্ত্তি নহে। বাঙ্গালী জাতির নিকট তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান সেই উচ্চ নৈতিক দৃষ্টান্ত যাহা মোহিনী মিল্সের ভিতর দিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালী ব্যবসায়ে সৎ হইতে পারে, কর্ম্মী হইতে পারে, দীর্ঘ অধ্যবসায় ও স্থির বুদ্ধি খাটাইতে পারে। অতএব এই কলের নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের নিকট আমার প্রার্থনা যে, তাঁহারা মোহিনীমোহনের এই অমূল্য দানটির উপযুক্ত হউন, এই সুনাম কখনও যেন না হারান, কখন যেন আজ-কালকার বোগাস্ জীবন-বীমা কোম্পানী বা বর্ষাকালের ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য ছোট স্বদেশী ব্যাঙ্কের অনুকরণ করিতে গিয়া নিজে ডুবেন না, দেশকেও ডুবান না।

চরিত্রই বল, চরিত্রই ধন, চরিত্রই পরমার্থ লাভের পথ।
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অত্র।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(৩)

সুখের বিষয় আমার আন্দাজটা ফলিল—মিষ্টার রায় পরদিন সকালে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন। বেড়াইবার বাতিক আছে একটু ; বাহিরে গেলে আর সুযোগ ছাড়েন না ; পূর্ণিয়া-ফেরৎ মালদহে নামিয়া গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিলেন। ভুটানীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া বলিলেন —"So she is dead ? (তা হ'লে মারা গেল ?)। অপর্ণার পক্ষে ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল ঠিক বুঝতে পারছি না, অন্তত কতকটা অন্যমনস্ক থাকত। Poor girl we must watch and see how it re-acts on her. (ওর মনের উপর এর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় দেখা দরকার)।

আমি আর মীরা দুই জনেই ছিলাম। মীরা প্রতিক্রিয়াটা কি রকম সুরু হইয়াছে বোধ হয় বলিতে যাইতেছিল, আমি চোখের ইসারা করিয়া বারণ করিয়া দিলাম।

বিকালে আমার ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া আছি, আমি, মীরা আর তরু। তরুকে লইয়া বেড়াইতে যাইব, মোটরে একটা কি হইয়াছে ; ড্রাইভার সেটা শোধরাইতেছে। নিশীথ আসিল। নূতন একটা সেডান-বডি গাড়ি কিনিয়াছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখের ভাবটা। ভিতর থেকে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "গুড আফটারনুন্ মিস রায়"—সঙ্গে সঙ্গে ফেল্ট টুপিটা হাতে করিয়া নামিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুখটা একেবারে শুক্‌নো মত করিয়া প্রশ্ন করিল, "বাই দি বাই, মা কি রকম আছেন ? সকালবেলা কোনমতেই আসতে পারলাম না। নেক্‌স্‌ট বোটে বোধ হয় সেল্ করতে হবে। কতকগুলি প্রিলিমিনারিজ ঠিক করতে এমন আটকে গেলাম..."

কথা কহিতে কহিতেই হ্যাট-র‍্যাকে টুপিটা রাখিয়া উহারই মধ্যে চকিতে একবার আর্শির মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছায়াটা দেখিয়া লইয়া একটা চেয়ারে বসিল। আবার প্রশ্ন করিল, "মিসেস্ রায় আছেন কি রকম বলুন তো ; রাত্তিরটা বা কেটেছে ?..."

লোকটা দিনকতক, কি কারণে জানি না, একটু যেন ঢিলা দিয়াছিল, আবার প্রাণপণে স্বয়ম্বর-সমরে নামিয়াছে। নূতন মোটরও বোধ হয় একটা অস্ত্রই। বোধ হয় আমার এই কয়েক দিনের অনুপস্থিতির সুযোগে আবার নূতন স্টার্ট লইয়াছে। আমার প্রতি ভাবটা এমন দেখাইল যেন আছি কি নাই সে খবরই জানে না ও।

মীরা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "থ্যাঙ্ক ইউ, মা অনেকটা ভালই আছেন। শৈলেনবাবুর একটা পরামর্শে অনেকটা সুবিধা হ'ল। সামান্য কথা, অথচ আমাদের মাথায় একেবারেই আসে নি। মার ঘরটা রাত্তিরে বদলে দিলাম। এটুকুতেই অনেকটা যেন অন্যমনস্ক আছেন ব'লে বোধ হচ্ছে।"

আমি অন্য দিকে চাহিয়াছিলাম, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার নিশীথের দিকে চোখ পড়িয়া গেল। পরামর্শ দেওয়ার অপরাধে, আমাকে যদি একবার পায় তো যেন চিবাইয়া খায়। মুখের ভাবটা পরিবর্তন করিয়া লইয়া বলিল, "দাঁড়ান, ঠিক এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। আপনাকে বোধ হয় বলেও থাকব, বলি নি ?"

মীরা বলিল, "আমার ঠিক মনে পড়ছে না। ব'লে থাকবেন বোধ হয়।"

"তবে কি তরুকে বললাম ?"

তরু মীরার মত আর সন্দেহের কিছু রাখিল না, বলিল, "না, আমায় তো বলেন নি।"

নিশীথ আমার পানে আর একটা কটাক্ষ হানিল—এবার বোধ হয় আমার ছাত্রী স্পষ্ট কথা বলে এই অপরাধে। অন্যায় হইয়াছিল কি না জানি না, তবে আমি একটা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কতকটা উহার পানে চাহিয়া বলিলাম, "ঘর-বদলানর কথাটা আমার মাথায় প্রথমে আসে নি, এইখানেই কার মুখে যেন শুনলাম মনে হচ্ছে—তবে কি আপনিই মোটর থেকে নামতে নামতে বললেন কথাটা ? মনে হচ্ছে যেন..."

মীরা আমার পানে একবার চকিতে চাহিল—যেন না চাহিয়া পারিল না। নিশীথও আমার পানে আর একবার

বক্রদৃষ্টি হানিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা পাড়িল; প্রশ্ন করিল, "মিষ্টার রায় এসেছেন শুনলাম।"

মীরা বলিল, "আজ সকালে এসেছেন বাবা।"

একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনা যেন নামিয়া গেল, নিশীথ এই ভাবে বলিল, "বাঁচা গেল। I hope he was perfectly all right" (আশা করি বেশ ভালই ছিলেন)।

মীরা উত্তর করিল, "থ্যাংক্‌স্‌। ভালই ছিলেন বাবা। ওঁর বেড়াবার ঝোঁক; ফেরবার মুখে গৌরের রুইন্‌স্‌ দেখে ফিরলেন, তাইতেই দেরি হয়ে গেল।"

নিশীথ মুখ ভার করিয়া গাম্ভীর্যের অভিনয় করিয়া বলিল, "ওঁর সঙ্গে একচোট বোঝাপড়া আছে আমার, উনি ওদিকে মন্দির-মসজিদের রুইন্‌স্‌ দেখে বেড়ান, এদিকে মানুষের রুইন্‌স্‌ নিয়ে যে···"

সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্ট এত বড় একটা রসিকতায় বাড়ির অবস্থা ভুলিয়াই মুক্তকণ্ঠে হাসিতে যাইবে, ড্রাইভার আসিয়া বলিল—"ঠিক হ'য়ে গেছে গাড়িটা।"

আমি আর তরু উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিশীথ বলিল, "মিস রায়ের কোথাও এন্‌গেজমেণ্ট আছে নাকি?"

মীরা একটু বিলম্বিত কণ্ঠে বলিল, "কই-না।"

"তা হলে আমার গাড়িটা রয়েছে। সর্বদাই বাড়িতে ব'সে থাকাটা ঠিক নয় আপনার পক্ষে।'

মীরা শরীরটা একটু এলাইয়া শ্রান্তভাবে বলিল, "একেবারেই বেরুতে ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন একটা কুড়েমিতে পেয়ে বসেছে।

নিশীথ বলিল, "সে-সব কিছু শোনা হবে না; নিন উঠুন।"

নিমরাজি দেখিয়া এতটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে আমা হেন উপেক্ষণীয়কেও সাক্ষী মানিয়া বসিল, "কুড়েমিতে পাওয়াটা একটা দুর্লক্ষণ নয় মাষ্টার মশাই?"

বলিলাম, "নিশ্চয়ই, অবশ্য নিশীতে পাওয়াটাকে যদি সুলক্ষণ ব'লে ধরে নেওয়া হয়।"

মীরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিশীথও হাসিল, অবশ্য বুঝিলে কখনই হাসিত না। মীরা উঠিয়া গেল, বলিল, "দাঁড়ান, তাহ'লে এক্ষুণি আসছি, নেহাৎই যখন ছাড়বেন না।"

নিশীথ আমাদের একটু আটকাইয়া দিল। তরুকে বলিল, "মিস্ রায় জুনিয়ার, তোমার জন্যে একটা চমৎকার জিনিস জোগাড় ক'রে রেখেছি। আন্দাজ কর তো কি?"

তরু লুব্ধভাবে একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে আবদারের স্বরে বলিল, "না, আপনি বলুন, আমার কিছুই আন্দাজ আসছে না। বলুন, হ্যাঁ বলুন।"

নিশীথ একটু আরও লুব্ধ করিয়া তুলিল, তাহার পর দুই হাত দেখাইয়া বলিল, "এই ইয়া বড়া এক লালমোহন।"

নিশীথ স্বয়ম্বর-সংগ্রামে চারিদিক থেকেই তোড়জোড় লাগাইয়াছে।

তরু উৎফুল্ল হইয়া—"আজই আনতে যাব, নিশীথদা" —বলিয়া নিশীথকে জড়াইয়া ধরিয়াছে এমন সময় মীরা নামিয়া আসিল; বলিল, "নিশীথ বাবুর যদি আপত্তি না থাকে তো···"

নিশীথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "কি, কি? বলুন, আপত্তি কিসের?"

"মাকেও নিয়ে গেলে হ'ত না আমাদের সঙ্গে?"

নিশীথের মুখের সমস্ত দীপ্তি যেন নিবিয়া গেল। কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই; হাঁ নিশ্চয়ই···তাঁকে যদি নিয়ে যেতে পারেন তো···"

নিশীথের অলক্ষ্যে মীরা আমার পানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কেন যে—স্পষ্ট বুঝা গেল না।

অপর্ণা দেবীর অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠার কথাটা মীরাকে বলি নাই, রাত্রে আহারাদির পর মিস্টার রায়কে একান্তে তাঁহার ঘরে বসিয়া বলিলাম। মিস্টার রায় সুরাপাত্রটা ধরিয়া তীব্র উদ্বেগের সঙ্গে কাহিনীটা শুনিতেছিলেন, শেষ হইলে ছাড়িয়া দিয়া কৌচটাতে হেলান দিয়া নিজের কোলে হাত দুইটা জড় করিয়া লইলেন; বলিলেন—Here is a pretty piece of business! (চমৎকার ব্যাপার)। ভুটানীর আসার পর থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শৈলেন, যে এই রকম কিছু একটা ব্যাপার ঘটবেই; যদিও ওকে একটু ভুলে থাকতে দেখে এক একবার আশ্বস্তও হয়ে থাকব। আসল কথা—নিজের জীবনের যা ট্রাজেডী সেইটে অষ্টপ্রহর আবার অন্যের জীবনের মধ্যে দিয়ে দেখতে থাকা—এর ফল কখনও ভাল হয় না। আমি অপর্ণাকে দু-একবার হিণ্ট (hint) দিয়েছিলাম। কিন্তু জানই, she is self-willed (সে জেদী)। যাক, এখন করা যায় কি? This must not be allowed to continue." (এ ব্যাপারটাকে স্থায়ী হ'তে দেওয়া চলে না)।

মিস্টার রায় অনেকক্ষণ দুইটা হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক বার সুরাপাত্রটা তুলিয়া

এক চুমুক পান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু বিচলিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"Oh, the golden dreams!" (হায়, সোনার স্বপ্ন)।

বুঝিলাম মিস্টার রায় মনে মনে সমস্ত জীবনটা এমুড়ো-ওমুড়ো দেখিয়া যাইতেছেন।—অত স্বপ্ন দিয়া রচা জীবন। অথচ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া রচা, বিশেষ করিয়া সে-ই জীবনটা দুর্বহ করিয়া তুলিল; এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী আর কি হইবে? পাত্রের সুরাটুকু নিঃশেষ করিয়া আরও একটু ঢালিয়া রাখিলেন, চিন্তাশক্তিকে উত্তেজিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে;—কিংবা দুশ্চিন্তাকে ডুবাইবার প্রয়াস এটা?

আমি বলিলাম, "একটা ব্যাপার অপর্ণা দেবীর জীবনে বড় অপকার করছে, আপনাকে কয়েক বার বলব বলব মনে করেছি, এই সময়টা সেটা আবার খুব বেশি হানিকারক হয়ে উঠেছে..."

মিস্টার রায় স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "You mean her exclusiveness (ওর এই কুণোবৃত্তির কথা বলছ? If I have tried once, I have tried a hundred times. She is always her old obdurate self." (আমি অশেষ চেষ্টা করেছি, সেই পুরনো জিদ ওর)।

বলিলাম, "বলেন তো আমি একটু চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ওঁর প্রাণ বোধ হয় একটা পরিবর্তন চাইছে, এই আঘাতটা পাওয়ার পর থেকে,—এক কথাতেই উনি যেমন ঘরটা বদলাতে রাজি হলেন। আমার মনে হয় ওঁর দিন কতক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকা দরকার—দার্জিলিং, শিলং, পুরী—একটা চেঞ্জ অব্ সীন্ বিশেষ দরকার। যদি খুব রাজি নাও থাকেন, এক বার গিয়ে পড়লে নিশ্চয় ভাল লাগবে; উনি এইখানটা নিজের মনকে বুঝতে পারছেন না।"

মিস্টার রায় অর্দ্ধঅন্যমনস্ক ভাবে কথাটা শুনিতেছিলেন, ভিতরে ভিতরে ওঁর নিজের একটা চিন্তাধারা চলিতেছিল। বলিলেন, "দেখ ব'লে, by the by Sailen, I also have been maturing a plan all the time. It is a lovely plan, only somewhat of a fraud." (ইতিমধ্যে আমিও বরাবর একটা ছক্ পাকা ক'রে আনছি। ছকটা চমৎকার; তবে খানিকটা প্রবঞ্চনা আছে তার মধ্যে।)

আমি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহার পানে চাহিলাম। মিস্টার রায় বলিলেন, "তুমিও তার মধ্যে আছ, rather you are the hero of the piece" (বরং তোমারই প্রধান ভূমিকা)।

কৌতূহলটা আরও উদ্রিক্ত করিয়া মিস্টার রায় আবার খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমাদের প্রফেসার মিস্টার সরকার আমার এক জন বিশেষ বন্ধু শৈলেন। তাঁর কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনতে পাই, he has high hopes about you (তিনি তোমার সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন)। তোমার ভবিষ্যৎ কেরিয়ার নিয়ে আমাদের কিছু কিছু আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। তোমায় বোধ হয় এর হিণ্ট্ দিয়েছি। আমার ইচ্ছে তুমি এম-এ-টা দিয়ে ইংলণ্ডে চলে যাও, যদিও এম-এ দেওয়ার আমি তত প্রয়োজন দেখি না—sheer waste of time (নিছক সময় নষ্ট)। সেখানে গিয়ে তুমি গ্রেজ্ ইন্ বা ইনার টেম্পেলে ঢোক, আমি ঢুকেছিলাম ইনার টেম্পেলে। এই পর্য্যন্ত আমার আগেকার প্ল্যান ছিল, সম্প্রতি—মানে আজ এইমাত্র একটু বাড়ান গেল।"

মিস্টার রায় পাত্রে একটি ছোট চুমুক দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার প্রিন্‌সিপ্‌ল্ কি?—to remain scrupulously honest and clean (একেবারে সাধু আর নিদাগ হ'য়ে থাকা) না, এটা বিশ্বাস কর যে জীবনে মিথ্যা প্রবঞ্চনারও একটা ন্যায্য স্থান আছে?"

বলিলাম, "আলো-ছায়ায় জগৎ—এ তো নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।"

"বেশ, অপর্ণাকে বাঁচতে হ'লে ঐ ছায়ার সাহায্য একটু নিতে হবে। অবশ্য আশা করা যাক্ নাও হ'তে পারে, তবে মনে হয় we ought to be prepared for the worst (খারাপটুকুর জন্যই তোয়ের থাকা ভাল)। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই, তুমি গিয়ে একটু ভাল ক'রে নিতীশের সন্ধান নেবে। এ পর্য্যন্ত কেউ আপন জেনে এটা করে নি। খুঁজে বের করতে পার, ভালই, আমাদের মনের অবস্থা বুঝিয়ে, বিশেষ ক'রে তার মায়ের অবস্থার কথা ব'লে তার মতিগতি একটু ফেরাতে পার, আরও ভাল, না পার—ঐ যে বললে ছায়ার কথা, প্রবঞ্চনার কথা—তারই আশ্রয় নিতে হবে। You shall have to pretend—he has been found out, he has been reclaimed and write (তোমাকে লিখতে হবে যে তার দেখা পেয়েছ, সে শুধরে গেছে)।"

শোনার সঙ্গেই বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল; অপর্ণা দেবীর সেদিনের সেই কুশ-বৎসের কথা মনে পড়িয়া গেল।

কলিকাতার গয়লাদের নীচ ফন্দি—ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন অপর্ণা দেবী, বলিতেছেন—"উঃ, কি ক'রে পারলাম বল তো শৈলেন।"

কিন্তু এই জীবন, আরোগ্যের জন্য বিষপ্রয়োগেরও ব্যবস্থা এখানে,—সব সময়েই অমৃতের নয়। পাছে মিস্টার রায় আমার কুণ্ঠা ধরিয়া ফেলেন এই জন্য তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া বলিলাম, "প্ল্যানটা ভালই, আশা করি ভাল ক'রে চেষ্টা করলে ভগবান্ সহায়ও হ'তে পারেন। কিন্তু ধরুন যদি মিথ্যাই রচনা করতে হয় তো শেষকালে···"

মিস্টার রায়ের মুখটা হঠাৎ রূঢ় হইয়া উঠিল। আমার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইলেন, "তাহলে শেষকালে অপর্ণাকে বলতে হবে— The boy is dead, the rascal! We shall have to risk this and see what happens. The poor girl shall not be killed by inches like this." (তাহ'লে ব'লতে হবে হতভাগা ছেলেটা মরেছে। অপর্ণাকে এ চরম আঘাতটা দিয়ে একবার দেখতেই হবে কি ফল হয়। এ ভাবে তুষানলে দগ্ধ হয়ে মরতে দেওয়া হবে না ওকে)।

পেগে ধীরে আর একটা চুমুক দিয়া মিস্টার রায় শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "যাও শৈলেন, রাত হয়ে গেছে; good-night."

পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা কয়েক জন বাগানের লনে বসিয়া আছি। আজকাল সহানুভূতি দর্শাইতে এই সময়টা রোজই কয়েক জন করিয়া আসে; আজ এ, কাল ও—এই রকম; অবশ্য নিশীথ বাঁধা আগন্তুক। আজ ছিল নীরেশ, শোভন, আলোক আর সরমা। সরমা আসিলেই অপর্ণা দেবীর কাছেই বেশী থাকে, আজ মিস্টার রায় তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে গেলেন; সরমা আসিয়া আমাদের মধ্যে বসিল···রাজু চা দিয়া গেল।

প্রসঙ্গটা শেষ পর্য্যন্ত অপর্ণা দেবীর কথাতেই আসিয়া পড়িল।—মনের কথা বাদ দিলেও, বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভুটানীর মৃত্যুর পর ওঁর শরীর হঠাৎ খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।—লক্ষণটা ভাল নয়···নীরেশ বলিল, "মনটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আমার মনে হয় চিকিৎসাটা ওঁর মনের দিক্ থেকেই হওয়া উচিত। আমিও আমার মতটা বলিলাম—অর্থাৎ স্থান-পরিবর্ত্তনের কথা। মনের দিক্ থেকে যাঁহারা চিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলন করিতেছেন তাঁহারা এই চেঞ্জ অব্ সীন্ অর্থাৎ আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনের উপর খুব জোর দিতেছেন। বলিলাম—association (সাহচর্য্য) জিনিসটার প্রভাব আমাদের প্রতিদিনের জীবনের উপর খুব বেশি। উঁহারা বলিতেছেন মানসিক উদ্বেলতা যে-ব্যাধির মূল তাহার সব চেয়ে ভাল চিকিৎসা পুরাতন, হানিকারক এসোসিয়েশন থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন স্থানে নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি।

আলোচনায় সবাই যোগ দিল অল্পবিস্তর; দিল না শুধু সরমা আর নিশীথ। সরমা চিরদিনই কম কথা কয়, কয়েক দিন থেকে যেন আরও বেশি করিয়া দগ্ধ হইতেছে বলিয়া আরও স্বল্পবাক্। নিশীথ ঠিক বিপরীত, আজ কিন্তু যেন মুখে ছিপি আঁটিয়া গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আলোচনাটা আগাগোড়া শুনিয়া গেল,—যেন মনের কোথায় খাতা খুলিয়া প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছে, খুব সতর্ক, যেন একটিও বাদ না পড়িতে পায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মিস্টার রায় অপর্ণা দেবীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। উভয়েই আসিয়া আমাদের সহিত একটু গল্পগুজব করিলেন। মিষ্টার রায় বেশ প্রফুল্ল, যেন একটা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং কতকটা সফলও হইয়াছেন। রাজু ডিশ, প্লেট সরাইয়া টেবিলটা পরিষ্কার করিতেছিল, মিস্টার রায় একটা বিদ্রূপও করিলেন—"রাজু, লাটসাহেবের বাড়ির লেটেষ্ট নিউজ্‌টা এঁদের শুনিয়ে দিয়েছিস্?"

সকলে হাসিয়া উঠিতে রাজু বাসন কয়টা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

অপর্ণা দেবী উপরে চলিয়া গেলেন।

নিশীথ আর বিলম্ব করিল না,—কি জানি পৃথিবীতে সুযোগ তো প্রতি মুহূর্ত্তেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মিস্টার রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "ক'দিন থেকে ভয়ানক একটা দরকারী কথা ভাবছি—আপনার যদি কাজ না থাকে তো···"

"কি, বল, এখানে বলা চলবে?"

নিশীথ একটু যেন কিন্তু হইয়া চকিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল, বলিল, "হ্যাঁ, তা···কথাটা হচ্ছে কদিন থেকে মিসেস্ রায়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কয়েক জন বড় বড় সাইকোলজিষ্ট এ-সম্বন্ধে কি বলেছেন তাই মনে পড়ে গেল। তাঁদের লেটেস্ট থিয়োরী হচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসোসিয়েশনের প্রভাব খুব বেশী, সেই জন্য মানসিক উদ্বেলতা যার মূলে এই রকম অসুখের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা এই যে, পুরনো

হানিকারক এসোসিয়েশন থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন ক'রে··· বিচ্ছিন্ন ক'রে···মনটা বিচ্ছিন্ন ক'রে···"

সবাই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। নীরেশ নিশীথের নামই দিয়াছে গ্রীক-দেবতা Echo অর্থাৎ প্রতিধ্বনি; আজ কিন্তু চরম হইল। নীরেশ গম্ভীর ভাবে জোগাইয়া দিল, "আপনি বোধ হয় বলতে চান—নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি করা···"

একবার আমার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া লইল।

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই নিশীথ বলিল, "Just it (ঠিক তাই)। নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি করা। যেদিন থেকে কথাটা আমার স্ট্রাইক করেছে, সেই দিন থেকেই আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, মিস্টার রায়; এখন শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা—অবশ্য অনুমতি না দিলে ছাড়ানও নেই। রাঁচিতে আমাদের একটা বাড়ি আছে, the best place in Ranchi (রাঁচির মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা), চারিদিকে খোলা, কিছু দূরে মোরাবাদী পাহাড়। simply superb (অতি চমৎকার)। আমি আপনার অনুমতি পাবার আগেই বাড়ির চূর্ণটুন ফিরিয়ে ঠিকঠাক ক'রে রাখতে লিখে দিয়েছি···মানে ওঁর একটা change of scene নেহাৎই দরকার···মানে···"

তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিবার উত্তেজনায় একটু হাঁপাইয়াও উঠিয়াছে।

মিস্টার রায় বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, নিশীথের বাক্যস্রোতে বাধা পড়িতে বলিলেন, "Many thanks for your gracious offer (তোমার উদার প্রস্তাবের জন্য বহু ধন্যবাদ), নিশীথ। শৈলেনও কাল রাত্রে আমায় এই কথা বলছিল—অর্থাৎ এই change of sceneএর কথা। তা মিসেস্ রায়কে রাজি করতে পারি; আর ডাক্তাররা যদি অন্য জায়গায় যেতে না বলে তো তোমার কথাই হবে; and thanks for that" (আর তার জন্যে ধন্যবাদ)।

ক্রমশঃ

শরতের বাণী নীলিম-গগনে

শ্রীকমলরাণী মিত্র

শরতের বাণী নীলিম-গগনে
শরতের বাণী স্বচ্ছ-সরে,
শরতের বাণী জ্যো'স্না রাকায়
অমল শুভ্র সুর্য-করে!
কাশের গুচ্ছে, শেফালি-মালায়
সে-বাণী দুলিল ছন্দ-দোলায়,
সে-বাণী শুভ্র লঘু মেঘে মেঘে
ভাসিল সুদূর দিগন্তরে॥

সবুজ শ্যামল কচি তৃণে তৃণে
জাগিল সে বাণী—বিমল হাসি,
প্রভাতে, তপনে, চন্দ্রে, স্বপনে
রূপ-আনন্দে উঠিল ভাসি—
কেলি-কহ্লার, বিকচ-কমলে
ফুটিল হর্ষে নভে-স্থলে-জলে;
ফুটিল তোমার আমার কণ্ঠে
মধু-মিলনের স্বয়ম্বরে॥

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীসীতা দেবী

৩

এই সময় কলিকাতায় প্রতি বৎসর পূজার আগে 'স্বদেশী মেলা' বলিয়া একটি মেলা বসিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রায় সামনাসামনি একটু উত্তরে একখণ্ড খোলা জমি ছিল। বাল্যকালে জায়গাটাকে আমরা "পান্তির মাঠ" বলিয়া জানিতাম। এইখানে চালা বাঁধিয়া উপরি উপরি কয়েক বৎসর মেলা হইয়াছিল। মেলাতে বেড়াইতে গিয়া আর একবার বেলা দেবীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীও আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। অল্পকাল পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া অত্যন্ত খুশি হইলাম।

ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার খবর আগেই পাইয়াছিলাম। ১৩ই আগষ্ট বোধ হয় তিনি কলিকাতায় আসেন। পর দিন সকালে শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী একবার বেড়াইয়া গেলেন। প্রতিমা দেবী পুরাতন বন্ধুর মত অতি সহজভাবে অনেক গল্প করিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমাদের কলেজের সময় এসে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলাম না ত ?"

সপ্তাহখানিক পরে প্রতিমা দেবীর নিমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বিকালবেলা আমরা দুই বোনে বেড়াইতে গেলাম। এ বাড়ী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। উহা আমাদের জাতির, আমাদের সমাজের তীর্থক্ষেত্র; দেখিয়া মনে একটা শ্রদ্ধাজড়িত পুলকের সঞ্চার হইল।

একজন দরোয়ান আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া ভিতরে লইয়া চলিল। প্রায় যখন তেতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়াছি তখন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে সোজা উপরে উঠবে, না মাঝে বিশ্রামের দরকার ?"

বিশ্রামের কোনও প্রয়োজন ছিল না, সোজা উপরেই উঠিলাম। তেতলার একটি ঘরে বসিলাম, প্রতিমা দেবী আসিলেন। শুনিলাম এই ঘরে পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাস করিতেন। এই ঘরে তাঁহাদের পরিবারের অনেকের ছবি দেখিলাম। মৃণালিনী দেবীর বড় ছবি একখানি দেখিলাম। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত বাড়ীখানি দেখিয়া আসিলাম। বিরাট্ বাড়ী, সমস্তটা বেড়াইয়া আসিতে অনেক সময় লাগিল। তখন ইহা লোকজনে গম্‌গম্ করিত সারাক্ষণ। কে কোথায় থাকেন তাহাও জানিয়া লইলাম।

মিষ্টিমুখ করার অনুরোধ আসিল। কিছু খাইতেও হইল। রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণ কোথায় ছিলেন জানি না, এখন আসিয়া বলিলেন, "আমি চাই যে তোমাদের খুব ভাব হয়, কিন্তু আমি থাকলে আর কেউ কথাই বলে না, সব কথা একলা আমাকেই বলতে হয়। তাই আমি তোমাদের একলা ছেড়ে দিয়েছি।" শুনিলাম সকালে দুইজন মহিলা বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একেবারেই কথা বলেন নাই ; তাই কবির এই অভিযোগ।

বেলা দেবীও শেষের দিকে আসিয়া জুটিলেন, তিনি কি একটা কাজে আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাই এতক্ষণ আসিতে পারেন নাই। তিনিও অনেক গল্প করিলেন এবার। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও সেদিন প্রথম দেখিলাম।

২১শে আগষ্ট ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা হয়। জনতার চাপে প্রায় মন্দিরের দরজা-জানলা ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক আগে গিয়া বসিবার স্থান দখল করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ অবধি রাখিতে পারি নাই। দাঁড়াইয়াই বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। বক্তৃতার পরদিনই রাত্রে বোধ হয় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার দিনও বিকালবেলা একবার আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখনও স্কুল হইতে ফিরি নাই, সুতরাং তাঁহার দর্শন পাইলাম না।

এই সময় হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া বিলাত-যাত্রা করিবেন। অবশ্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর উহা ঘটিয়া উঠে নাই, পরের বৎসর তিনি গিয়াছিলেন। পূজার ছুটির আগেই

শান্তিনিকেতনে "শারোদোৎসব" অভিনীত হইবে শুনিলাম। যাইবার জন্য জেদ ধরিলাম এবং নানা বিঘ্ন-বাধা আসিয়া জোটা সত্ত্বেও সে জেদ কিছুতেই ছাড়িলাম না। আমাদের পুরাতন দলের অনেকে এবার যাইতে পারিলেন না। তবে নূতন অনেক সহযাত্রী ও সহযাত্রিণী জুটিলেন।

ট্রেন ছাড়িবার খানিক পরেই উপরের অমলনীল আকাশ, আর দুই ধারের মাঠে বনে শারদ-শ্রীর উজ্জ্বল প্রাচুর্য্যে মনটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। ধানের ক্ষেতের সেই উচ্ছল সবুজ ঢেউ আর মাঝে মাঝে কাশের ফুলের হাতছানি এখনও মনে পড়ে। মেমারী বলিয়া একটি ছোট ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়া গোছা গোছা কাশফুল তুলিয়া আনিয়াছিলাম।

রাত্রি হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে বোলপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবার দেখিলাম নেপালবাবু কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। সেই পূর্ব্বপরিচিত বলদের বস্‌টিও হাজির। এবার ঠিক করিয়াই আসিয়াছিলাম যে জোর করিয়া হাঁটিয়া যাইব, কিন্তু হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে সে সংকল্প আর রহিল না। বস্‌-এ চড়িয়াই যাত্রা করিলাম, তবে অল্পক্ষণের ভিতরই বৃষ্টি থামিয়া যাওয়াতে আবার নামিয়া পড়িয়া হাঁটিয়াই গেলাম। অমাবস্যার রাত্রি তবু হাঁটিতে কোনও কষ্ট হইল না। নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কিছুক্ষণের ভিতরই নীচু বাংলার সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম, কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং কবি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এবং দিনেন্দ্রনাথের পত্নী কমলার সঙ্গে পরিচয় হইল। শৈলবালাকেও উপস্থিত দেখিলাম।

সকলের সঙ্গে নীচু বাংলার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এবারেও এখানেই আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তবে বাহিরের ঘরখানি আর খালি ছিল না, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও বাবাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরের উঠানে আসিলেন। সেইখানে কয়েকটি চেয়ার অতিথিদের জন্য পাতা ছিল। তাঁহারা সেইখানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমরাও কাছেই বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতে লাগিলাম। এমন সময় আর-এক পশলা বৃষ্টি আসাতে সকলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকিলাম। হেমলতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে খাটের উপর বসিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "মেয়েরা এটা invidious distinction মনে করবেন।"

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চেহারা তাঁহার বয়স ও খ্যাতির তুলনায় অত্যন্ত কাঁচা দেখিয়া আমরা কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। রাত্রে খাইবার সময় পুরুষ অতিথিরাও আমাদের সঙ্গে বসিলেন। অধ্যাপক সরকার যে শুধু দেখিতেই অল্পবয়স্কের মত ছিলেন তাহা নহে, খাইতেনও অত্যন্ত কম। মেয়েরা খাওয়া শেষ করিতে দেরি করিত অনেক, কারণ গল্প করাটা হইত খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী। সরকার-মহাশয় ততক্ষণ হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেন পরিবেষণ ঠিক্ মত হইতেছে কিনা ও সকলের খাওয়া শেষ হইয়াছে কিনা।

শুইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, ঘুমাইতে রাত্রি হইল তাহারও অধিক। বড় গরম ছিল, খানিক পরেই খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া আমরা মাটিতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সকালে মন্দিরে উপাসনা হইবে শুনিয়াছিলাম, পাছে ঠিক সময় উঠিতে না পারি, এই ভাবনায় আর ঘুমই হইল না।

ভোরবেলা উঠিয়া, যথাসময়ের পূর্ব্বেই মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আজও দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঘণ্টা বাজাইলেন। উপাসনান্তে খানিক এদিক্-ওদিক্ ঘুরিলাম, খানিক ফুল কুড়াইলাম। সন্তোষবাবুর গোশালাও আর-একবার দেখিয়া আসিলাম। আমাদের জলখাবার ঠিক হইয়াছে, খবর পাইলাম চাকরের মুখে; আমরা তখন অতিথিশালার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। এই-খানেই জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল। উপাসনার পর অনেকেই এখানে আসিয়া বসিয়াছেন দেখিলাম। জলযোগের পর গান শুনিবার প্রস্তাব উঠিল। সেইদিনই রাত্রে অভিনয়, সুতরাং গায়কের দল কেহই গান করিতে প্রথমতঃ রাজী হইলেন না, বলিলেন রাত্রে তাহা হইলে গলা ধরিয়া যাইবে। কিন্তু তখনকার দিনে জেদ কখনও ছাড়িতাম না, সেদিনও গান শুনিয়া তবে ছাড়িলাম। প্রথমে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী একটি গান গাহিয়া শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ততক্ষণ নিজের গানের খাতার সন্ধান করিতে গেলেন। খাতা আনিয়া তিনিও গোটা দুই গান শুনাইয়া দিলেন, দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গে এস্রাজ বাজাইলেন। তিনজনে মিলিয়াও গান হইল। মেয়েরাও গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু প্রথমে কাহাকেও

সম্মত করা গেল না। অনেক অনুরোধের পর কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের দুই কন্যা একটি গান করিলেন। রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিলাম। একবার ছাতিমতলায় গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। ঠিক সেই সময় ধূলা উড়াইয়া ডালপালা ভাঙিয়া, প্রচণ্ড ঝড় ছুটিয়া আসিল। ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায়ও খানিকটা এবং কোনও ছাদ হইতে ঝড়ের পূর্ণ বিক্রম দেখার ইচ্ছায়ও খানিকটা, আমরা তাড়াতাড়ি সন্তোষবাবুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি রবীন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, কাজেই ঝড় দেখা বা বৃষ্টিতে ভিজার ইচ্ছাটা পুরাপুরি মিটিল না। নানা বিষয়ে কথা হইতে লাগিল, এমন কি আমিও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। এই সময় কবির আর-এক পরিচয় পাইলাম। তিনি যে আবার চিকিৎসকের কাজও করেন তাহা আগে জানিতাম না। তাঁহার পাশে দেখিলাম একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। তিন-চার মিনিট পরে পরে এক-একজন রোগী আসিয়া জুটিতে লাগিলেন এবং ঔষধ লইয়া যাইতে লাগিলেন। কাহারও মাথা ধরিয়াছে, কাহারও গলা ভাঙিয়াছে, কাহারও জ্বর, কাহারও পেটের গোলমাল। রবীন্দ্রনাথ সকলকেই ঔষধ দিতেছিলেন। সেদিন রাত্রে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় সকলের সুস্থ থাকিবার ঝোঁকটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বহুকাল আগে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাহার কথা, বিলাতযাত্রার কথা, অনেক গল্পই সেদিন রবীন্দ্রনাথ করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গল্পগুচ্ছের ভিতর কোন্ গল্পটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?" আমি প্রথমে বলিলাম, "সবগুলিই খুব ভাল লাগে," তাহার পর বলিলাম, "'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিই সবচেয়ে ভাল লাগে।" দাক্ষিণাত্যের যে প্রাসাদটি দেখিয়া তিনি এই গল্প রচনা করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিলেন। পাঁচ-ছয়জন মিলিয়া মুখে মুখে গল্প রচনা করার একটা খেলা তাঁহারা খেলিতেন, সে কাহিনীও শুনিলাম। দলের একজন গল্পকে নানা লোমহর্ষণ অবস্থায় ফেলিয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন, উদ্ধারের ভার পড়িত রবীন্দ্রনাথের উপর। অনেক সময় গল্পের আদি ও অন্ত দুয়েরই তাল সামলাইতে হইত তাঁহাকে। "দুরাশা", "গুপ্তধন" প্রভৃতি অনেক গল্পই নাকি এই ভাবে রচিত হইয়াছিল।

আমাদের সঙ্গে দুই-চারজন ছিলেন যাঁহারা কবির নিকটে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে পান নাই। তাঁহাদের ভিতর একটি বালিকার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার গান শোনে। কিন্তু নিজে বলিতে সাহস না পাইয়া সে ক্রমাগত আমার কানে কানে অনুরোধটা জানাইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বুঝিতেই পারিলেন ব্যাপারটা কি। মুখ ফুটিয়া অনুরোধ জানানো মাত্রই হাসিয়া বলিলেন, "এই পরামর্শ হচ্ছিল বুঝি এতক্ষণ?"

রাত্রে অভিনয়, সকলেই নিজের নিজের গলা সযত্নে বাঁচাইয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তবু বালিকার আগ্রহ পূর্ণ করিতে অস্বীকার করিলেন না। একটা গান গাহিয়াই নেপালবাবুকে ডাক দিয়া বলিলেন, "নেপালবাবু, দেখুন এরা ত আমাকে ধরে গানটান করিয়ে নিচ্ছে, আপনি ত আমাকে রক্ষা করতে পারলেন না।"

নেপালবাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, "আমি ত গান শুনেই ছুটে এলাম।" ইহার পরেও ঘণ্টা-খানিক সেখানে বসিয়া গল্প করিয়া তবে আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

নীচু বাংলায় ফিরিয়া খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতে হইল। ইহার আগের বার সঙ্গে অভিভাবিকা কেহ না থাকায় ইচ্ছামত রোদে ঘুরিয়া বেড়ানো যাইত, এবার মা সঙ্গে থাকায় সে সুবিধা হইল না। বিকালে আবার বেড়াইতে বাহির হইয়া মাঠে, বনে, লাল মাটির রাস্তায় অনেকখানি ঘুরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া, খাওয়াদাওয়া সারিয়া, "শারোদোৎসব" অভিনয় দেখিতে চলিলাম। গিয়া পৌঁছিবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয় তখনকার দিনে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হইত, কোনও ত্রুটি ত চোখে পড়িত না। বালকদের গান ও নৃত্য এত সুন্দর লাগিয়াছিল যে ত্রিশ বৎসর পরেও উহা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। দুইটি গানের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, "আমার নয়ন ভুলান এলে," এবং "আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ।" রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এবারেও তাঁহাকে তাঁহার সাধারণ বেশের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই, শুধু মাথায় একটি গেরুয়া রঙের পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন।

এইবার লালচে কাগজের উপর ছাপা একটি প্রোগ্রাম

পাইলাম। এটি এখনও আমার কাছে আছে। নূতন তিনটি গান রচিত হইয়াছে, তাহা উহাতেই দেখিলাম। একটি "ওগো শেফালী বনের মনের কামনা," দ্বিতীয়, "আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি," তৃতীয়, "আমাদের শান্তিনিকেতন।" প্রোগ্রামটি কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রেসে ছাপানো, ইহাতে নাটকের পাত্রদের নামও ছাপা হইয়াছিল। ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, লক্ষেশ্বর সাজিয়াছিলেন শ্রীযুত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বিশী সাজিয়াছিলেন ধনপতি। বালকদের ভিতরেও অনেকে এখন জনসমাজে সুপরিচিত।

অভিনয়ান্তে খানিকক্ষণ নাট্যঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কবি অন্যত্র ব্যস্ত থাকাতে তখন আর তাঁহার দেখা মিলিল না। নীচু বাংলায় ফিরিয়া আসিয়া খাওয়াদাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়া গেল। পরদিনটাও আমাদের থাকিয়া যাইবার কথা। কি ভাবে এই সময়টুকু কাটান হইবে সে বিষয়ে অনেক গবেষণা হইল। রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক "ডাকঘর" শুনিতেই হইবে এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইল না।

Visva Bharati Quarterlyর যে Tagore Birthday Number বাহির হইয়াছে, তাহাতে "অচলায়তন ও ডাকঘর" দুইটিই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিয়া লেখা আছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ত ১৯১২তে হইয়া থাকিবে, কিন্তু রচিত হইয়াছিল দুইটিই ১৯১১র মধ্যে।

অভিনয়ের শেষে ছেলেরা, "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটি গাহিয়া পালা সাঙ্গ করিল। নাট্যঘর হইতে বাহির হইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত তাহারা আশ্রমের পথে পথে এই গানটি গাহিয়া ফিরিয়াছিল।

পরদিন সকালটা মাঠে ও খোয়াইয়ে বেড়াইয়া কাটিয়া গেল। এই খোয়াইগুলিও এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন আশ্রম এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই, চারিদিকেই এই বালখিল্য পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইত। ভিতর দিয়া বহিয়া যাইত স্বচ্ছ জলের ধারা। ইহার মেটে লাল রংটার কেমন একটা স্নিগ্ধতা ছিল, চোখ জুড়াইয়া যাইত।

ইহার পর অতিথিশালার বাড়ীর দিকে চলিলাম। সেইখানে "ডাকঘর" পাঠ হইবার কথা ছিল। সকলেই কিছু কিছু পুষ্পার্ঘ্য বহন করিয়া লইয়া গেলাম কবিকে উপহার দিবার জন্য।

অতিথিশালার দোতলার মাঝের ঘরটিতে বসিয়া "ডাকঘর" পড়া হইল। পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রোতার দল একেবারে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।

এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব দ্রুতগতিতে আসিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ও তাহার উত্তর লইয়া, তেমনই দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার বয়স তখন সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, তবু দেহ বেশ ঋজু ও সবল। তাঁহার চক্ষু-দুইটি বড় অসাধারণ ছিল, এমন প্রদীপ্ত দৃষ্টি আর কখনও দেখি নাই।

ইহার পর ফিরিয়া আসিলাম; রবীন্দ্রনাথ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন বলিলেন। আসিয়াও ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমরা তখন কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলাম; তাঁহার সঙ্গে নামে মাত্র দেখা হইল, কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ ঘটিল না। তিনি এইমাত্র ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম ও বিদায় লইয়া আসিলাম।

বিকালের গাড়ীতে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। গরুর গাড়ী চড়িয়া ষ্টেশনে আসিলাম, পুরুষ অতিথিরা হাঁটিয়াই আসিলেন। অনেকেই নিজের নিজের ব্যাগ ও স্যুটকেস্ হাতে করিয়া বহন করিতেছেন দেখিয়া আমরা সেগুলি গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুতেই তাঁহার ব্যাগটি হাতছাড়া করিলেন না, ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল।

ষ্টেশনে আসিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ আমরা কিঞ্চিৎ আগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। ট্রেন যথাসময়ে আসিল, সকলে উঠিয়া পড়িলাম। বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছাত্রও এই সঙ্গে উঠিল। সকলকে বিদায় দিতে একদল ছাত্র আসিয়াছিল, তাহারা ট্রেন ছাড়িবামাত্র সমস্বরে, "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটি আরম্ভ করিল। ট্রেন যখন প্রায় প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনও দেখিলাম ছেলেরা গাড়ীর সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে গান করিতেছে,—

"আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন।"

শাঁকটিগড় (শক্তিগড়) বলিয়া একটা ষ্টেশনে আমাদেরই ট্রেনের তলায় একজন মানুষ কাটা পড়িল। মৃত্যুবিভীষিকার করাল ছায়া আমাদের উৎসবের আনন্দকে

একেবারে ম্লান করিয়া দিল। গাড়ীর কি একটা গোলমাল হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়াও বাড়ী পৌঁছিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

কবিবরের সপরিবারে বিলাত যাত্রার কথা তখনও চলিতেছে, নানাপ্রকার আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে। এই-সকল আয়োজনের সম্পর্কেই বোধ হয় পূজার ছুটির মধ্যে তিনি একবার কলিকাতায় আসিলেন। ২রা অক্টোবর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গেলাম। সেদিন বিজয়া দশমী, রাস্তায় প্রচুর জনতা দেখিলাম। এবারেও তিনিই আসিয়া সর্ব্বপ্রথম আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সেই তেতলার ঘরটিতেই গিয়া বসিলাম। বেলা দেবী আসিলেন, প্রতিমা দেবী বাজার করিতে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন বলিয়া শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা এ ঘরে থাকলে তোমরা কথা বলবে ত? না চুপ ক'রে থাকবে?" বাধ্য হইয়া তখন কিছু কথা বলিতেই হইল। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথও তখনই নিজেও কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি যখন কথা বলিতেন, তখন অন্য কাহারও কথা বলিবার ইচ্ছাই যে শুধু হইত না তাহা নহে, প্রয়োজনও অল্পই হইত। তাঁহাদের বিলাত-যাত্রার প্রসঙ্গ উঠিল, দেখিলাম তখনও পাকাপাকি কিছুই স্থির হয় নাই। আমাদেরও তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলায় আমি বলিলাম, "আমরা গিয়ে কি করব?"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার রাঁধুনী ক'রে নিয়ে যেতে পারি, রাঁধতে জান ত?"

রাত্রে আর এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া সেদিন আমরা তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম।

এই সময় কলিকাতায় তিনি মাসখানেকের উপর ছিলেন বোধ হয়। অনেকবার তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যাত্রার দিন পাকাপাকি কিছুতেই স্থির হয় না, নানা প্রকার বাধা পড়িতে লাগিল। কখনও শুনিতাম তিনি দুই বৎসরের অধিক সেখানে থাকিবেন, কখনও শুনিতাম অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। বহুদিন তাঁহার অদর্শনের সম্ভাবনাটা আমাদের বড়ই কাতর করিয়া তুলিত। পার্থিব জীবনে বিচ্ছেদ-দুঃখ আছে, ইহা তখন একটা কথার কথা বলিয়া জানিতাম, অনুভব তখনও করি নাই। আজ জীবনের অনেকখানি পথ মাড়াইয়া আসিয়াছি, বিচ্ছেদ যে কতখানি ভয়ানক হইতে পারে, নিরাশা কতখানি অতলস্পর্শী হইতে পারে, সকলই ভগবান্ বুঝাইয়া দিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে বিশ্বাস দিয়াছেন যে পৃথিবীর বিচ্ছেদটাই শেষ কথা নয়, ইহারও পরে অনন্তজীবন অপেক্ষা করিয়া আছে। যাঁহাদের হারাইয়া প্রাণ আজ হাহাকার করিতেছে, তাঁহারা সত্যই হারান নাই।

প্রশান্তচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা প্রফুল্ল (আমাদের কাছে বুলা নামেই সুপরিচিত) শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তিনি এই সময় কিছু অসুস্থ হইয়া বিদ্যালয় হইতে কলিকাতার বাড়ীতে চলিয়া আসেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। এই বালকটিকে দেখিতে একদিন তিনি তাঁহাদের বাড়ী আসিলেন। দিনটা ১২ই অক্টোবর। আমাদের বাড়ী একই পাড়ায়, কবি আসিয়াছেন শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম। তাঁহার চেহারা একটু খারাপ দেখিলাম, বোধ হয় অসুস্থ ছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অতি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, ঘরে ঢুকিবার সময় তাঁহার মাথা প্রায় চৌকাঠে ঠেকিয়া যাইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ মহলানবীশ মহাশয় বলিলেন, "আমি ত জানতাম না যে প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পৌত্র কোনোদিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন, তা হলে দরজাগুলো আরও উঁচু ক'রে করতাম।"

নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ বুলার পাশে বসিয়া গল্প করিলেন। আগে যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন কেমন শীত সহ্য করিতে পারিতেন, একবার ভুলক্রমে হোটেলে কি রকম ব্যাঙের তরকারি খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক গল্প শুনিলাম। চলিয়া যাইবার সময় কবিবর আশ্বাস দিয়া গেলেন যে শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

সেই সময় তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে খুব ঘটা করিয়া টাউন হলে কবি-সম্বর্দ্ধনার একটা কথা চলিতেছিল। আয়োজন বাঙালী মতে অতি ধীর গতিতে হইতেছিল, তবু এ বিষয়ে আলোচনা প্রায়ই শুনিতাম। তিনি বিলাত চলিয়া যাইবার আগে ইহা ঘটিয়া উঠিবে কিনা সে বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ ছিল।

১৪ই অক্টোবর তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া আর একবার বুলাকে দেখিতে গেলেন। তাঁহার জাহাজটা যাহাতে ছাড়িতে না পারে সেই রকম কামনা আমাদের অনেকের মনে জাগিতেছে শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,

"তার চেয়ে তোমরা আমার সঙ্গেই চল না? তাহলে সব দিক্ দিয়েই ভাল হয়, বেশ জমেও উঠবে।"

যাইবার সময় আবার অভ্যাস মত বলিয়া গেলেন শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

আজ এ আশ্বাস কোথাও পাই না কেন? পৃথিবীর জীবনের ভিতর আর দেখা হইবে না জানি, যদি অন্য কোথাও, অন্যভাবে দেখা হয়, তাহাতে এই মর্ত্ত্য জীবনের কোনও আনন্দের স্মৃতি থাকিবে কি?

৩০শে আশ্বিন তখন মহা ধুম করিয়া রাখীবন্ধন হইত। অনেক গানের মিছিল, অনেক সভা, ইত্যাদি হইত। অনেকের বাড়ী সেদিন অরন্ধন, আমরাও তাহা পালন করিতাম। রাখীবন্ধনের দিন পরিচিত অনেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে গিয়াছিলেন, আমরা যাইতে না পাওয়ায় বড়ই নিরাশ হইলাম। লাল ও হলদে রেশমী-সুতা দিয়া আমরা তখন নিজেরাই বাড়ীতে অতি সুন্দর রাখী তৈয়ারী করিতাম ও পরিচিত সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রাখী বাঁধিয়া বেড়াইতাম।

এই সময় প্রায়ই তিনি আসিতেন। কখনও বা নীচে অফিসের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেন, কখনও উপরে উঠিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেন। ভাইফোঁটার দিন একবার আসিয়াছিলেন। "জীবনস্মৃতি"র পাণ্ডু-লিপিখানি চাহিয়া লই গেলেন, কিছু পরিবর্দ্ধন করিবেন বলিয়া। তাঁহার ন র স্বর্ণকুমারী দেবীর) বাড়ী ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ ।হল বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

অল্পবয়স্কদের সঙ্গই যেন তাঁহাকে সর্ব্বদা বেশী আনন্দ দিত। ছেলেমেয়েরাও তাঁহাকে পাইয়া বসিত। দেবতাকে মানুষ যেমনভাবে ভক্তি করে ও ভালবাসে, সেই ভক্তি ও ভালবাসা মানুষ হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই পাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু দেবতার মত তিনি দুরধিগম্য ছিলেন না। বালকবালিকা, যুবকযুবতী, এমন কি ছোট শিশুও তাঁহাকে নিকটতম আত্মীয় অপেক্ষাও ভালবাসিত। অথচ তাঁহার সামনে ছ্যাবলামি করিতে বা হুড়াহুড়ি করিতে অতি দুরন্ত ছেলেকেও কখনও দেখি নাই, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেই আপনা হইতে মাথা ভক্তিতে নত হইত।

রিপন কলেজে এই সময় তাঁহার একটি বক্তৃতা হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা মেয়েদের বসিবার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া আমাদের সেখানে যাওয়া হইল না। ইহার পরই তিনি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। যাইবার আগে প্রতিমা দেবী ও তিনি আমাদের বাড়ী একদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

নবেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শিলাইদহে থাকিতেও বাবার কাছে প্রায়ই চিঠি লিখিতেন, তাহাতে তাঁহার খবর পাইতাম। আমাদের পাশের বাড়ীর দোতলায় তখন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মাতা ও পত্নী বাস করিতেন, তাঁহাদের কাছ হইতেও রবীন্দ্রনাথের সংবাদ পাওয়া যাইত। অজিতবাবুর প্রথমা কন্যা তখন শিশু, তাহাকে লইয়া আমরা সারাদিন কাড়াকাড়ি করিতাম। মা তাহাকে 'পারুলদিদি' বলিয়া ডাকিতেন। সত্যই ফুলের মতই সে সুন্দর ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন তাহাকে দেখেন, তখন শিশু হাত বাড়াইয়া তাঁহার একটি আঙুল ধরিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এ যে দেখি এখনই পাণিগ্রহণ করছে।"

এই সময় রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একটি পুত্র জন্মলাভ করে। মীরা দেবী ইহার পর কিছুকাল অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তখনও তাঁহাকে চোখে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার অসুখের খবর শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহারই কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ভূমিকম্প হইয়া গেল।

কন্যার অসুস্থতার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে কলিকাতাতে ফিরিয়া আসাতে আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। মীরা দেবীও ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)

টিকটিকির লড়াই

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বলতে তোমায় ডরাই,
দেখতে কি পাও আমার ঘরে টিকটিকিদের লড়াই ?
পুঁথির পাতায় কি লেখা যে কেবলি হয় ভুল,
দেখি তাদের দেয়াল-জোড়া দারুণ হুলস্থুল।

ঘরের পরে ঘর নিয়ে এই বাড়ী,
তার পরে ঐ নাপিত-পাড়া মাঠটি দিয়ে পাড়ি ;
দূরের ইষ্টিশনে
আমার গ্রামের জানাশোনা হাজার গ্রামের সনে ;
তারপরে এই পৃথিবীময় দেশের পরে দেশ,
তারও পরে আকাশ, যাহার কোথাও নাই শেষ ;
সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারা-উল্কা-নীহারিকা,
সকল লয়ে জলে তোমার রুদ্র তপের শিখা।
শুধাতে তাই ডরাই,
দেখতে কি পাও ক্রিমিয়া আর লেনিনগ্রাডের লড়াই ?

তোমার ধ্যানের মূর্ত্তিখানি হিয়ায় আঁকা আছে,
তাই ত কিছু চাই না তোমার কাছে ;
দুখের দিনে ডাকতে লাগে ভয়,
কি-জানি ঐ তপস্যাতে ব্যাঘাত কিছু হয় !
কেমন টানে টানে তোমার মন
অসীমকালের প্রান্ত থেকে তোমার ধ্যানের ধন,
ভালো ক'রেই জানি ;
মনের স্রোতে ভাসে যখন আমার প্রিয়ার মুখপদ্মখানি,
আমার কি আর চোখে তখন পড়ে
পরস্পরের ল্যাজের লোভে টিকটিকিদের লড়াই পরস্পরে ?

স্তিমিত ঐ দুটি ধ্যানের চোখে
পলক কভু পড়ে না ত, জল ঝরে না মোদের দুঃখে শোকে।
থেকে থেকে তবুও হয় মনে,
তৃতীয় কোন্ নেত্রে তোমার দেখি যেন জলতে ক্ষণেক্ষণে
আমাদের এই চেনা জানা ঘরের কোণের আলো ;
আমরা যখন কাঁদি হাসি, আমরা বাসি ভালো,
ঐ তৃতীয় নেত্রটিতে ধরা সবই পড়ে,
একটুখানি হাসি কেবল ফোটে ওষ্ঠাধরে।

তাই ত ব'সে ভাবি,
টিকটিকিদের পরস্পরের ল্যাজের 'পরে দাবী,
ক্রিমিয়া আর লেনিনগ্রাডের লড়াই তারই সাথে,
পড়ছে ধরা তৃতীয় ঐ তোমার নেত্রপাতে।
ওষ্ঠাধরের কোণে
একটু হাসির আভাস যেন দেখছি হ'ল মনে।

টিকটিকিদের লড়াই
দশ মিনিটে শান্ত হ'ল। চাকর ডেকে সরাই
ক্লান্ত তাদের দেহ-দুটো আমার ঘরের থেকে,
ঝাঁটার মুখে স্মৃতির রেণু তাও গেল না রেখে।
হঠাৎ মনে জাগে,
অকারণেই কেন এমন ভয়ের মত লাগে
এক নিমেষের দেখা বা না-দেখা
ঠোঁটের কোণে চকিত ঐ বাঁকা হাসির রেখা।
তোমার চোখে ঘরের কোণের ঐ যে আলো জলে,
তাই কি লাগে যুগে যুগে কালান্তকানলে ?

জানতে মনে ঠিকই,
ল্যাজের এ লোভ মিটবে যখন, রইবে না টিকটিকি।

রয় না তা'রা কেউ।
এই পৃথিবীর শ্যামল তটে উছল প্রাণের ঢেউ
বারে বারে ভাঙল কত, সময় হ'ল জেনে
তোমার ধ্যানের অতলতায় ফিরিয়ে নিলে টেনে।
কত লড়াই জিতল তা'রা, নিজের মত গড়ল নিজের বিধি,
অসীম প্রাণের তারাই ছিল এই ধরাতে সেদিন প্রতিনিধি।
সেই যাহাদের চরণ-ভরে পৃথ্বী টলমল,
ইকৃথিওসর, টিরানোসর, ব্রণ্টসরের দল,
যে-পথ দিয়ে ফিরে গেল আছে সে-পথ খোলা,
অসীম প্রাণের সাগরে আজ তাই কি লাগে দোলা ?
যে-পথ দিয়ে এল তা'রা খোলা যে তার দ্বারও,
তাই কি চোখে যাহাই পড়ে হাসতে এমন পারো ?

শুনি রুদ্ধশ্বাসে
নূতন সে কোন্ সৃষ্টি তোমার প্লাবন নিয়ে আসে।
ক্রিমিয়া আর লেনিনগ্রাডের লড়াই
দেখতে তুমি পাও কি না পাও শুধাতে তাই ডরাই

বিপরীত

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

সামান্য এক ফালি জমি—কিন্তু একদা তাহা লইয়াই যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সামান্যও নয়—তুচ্ছও নয়।

ঘটিয়াছিল তিন পুরুষ পূর্ব্বে; এবং তখন হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার জের সমান উৎসাহেই চলিয়া আসিতেছে।

ব্যাপারটা এই—

ভুবন চৌধুরী আর জগৎ মজুমদারের বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী যে জমিটুকু—উহারই মালিকানা স্বত্ব লইয়া একদা চৌধুরী আর মজুমদারের পিতামহদের মধ্যে বাধিয়াছিল প্রবল কলহ। তখন সালিশী আদালত প্রভৃতি অনেক কিছুই হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কলহের বীজ তাহাতেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইতে পারে নাই। তাই প্রথম পুরুষ যে বীজ উৎসাহে রোপণ করিয়াছিল, দ্বিতীয় পুরুষ জলসিঞ্চনে তাহাকে সযত্নে অঙ্কুরিত করিয়াছে, এবং তৃতীয়—অর্থাৎ বর্ত্তমান পুরুষ নিত্য তাহাকে ফলে ফুলে সুশোভিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাইতেছে।

*　　*　　*

সেদিন ভুবন চৌধুরী নিত্যকার মত তাঁহার প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় কুকুরটি। পরিশ্রমে সে জিব বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে, বড় বড় লোমগুলি তাহার চক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুকুরটি ঠিক এ দেশীয় নয়; সে তার বিদেশী বাপের চুল ও দেশী মায়ের রং পাইয়াছে। ঐ জীবটির প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের যত্নের সীমা নাই। আদর করিয়া নাম রাখিয়াছেন—টম্।

চৌধুরী মহাশয় গৃহে ঢুকিবেন—এমন সময় জগৎ মজুমদারের বাঘা নামক প্রকাণ্ড দেশী কুকুরটা তাহাদের দেখিয়া ঘেউ ঘেউ রবে বিকট চীৎকার সুরু করিয়া দিল।

ইহাতে চটিয়া গেলেন চৌধুরী। মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন - ভাগ্ নেড়ী কুত্তা।

মজুমদার হয়ত কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। শুনিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, নেড়ী!...হোক নেড়ী। কিন্তু আসল—তোর মত ভেজাল নয়।

মজুমদার ইঙ্গিত করিলেন কুকুরটিকে। কিন্তু কারণ না থাকিলেও চৌধুরী কথাটাকে নিজ গায়ে টানিয়া আনিলেন। বলিলেন, কি বললি রে চামার?

এবার মজুমদার কহিলেন, ঠিক বলেছি রে ছুঁচো। তার পর নিজ কুকুরটিকে কহিলেন, লে—লে—

বাঘা ছুটিয়া গিয়া টম্‌কে সজোরে কামড়াইয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

টম্ আর্ত্তস্বরে কঁ্যা—কঁ্যা করিয়া উঠিল।

ভুবন চৌধুরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারে ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল চৌধুরী মহাশয়ের ছেলে অমর। হাতে হকিষ্টিক্। আসিয়াই স্টিক্ দিয়া বাঘাকে দুই-এক ঘা বসাইয়া দিতেই, বাঘা কেঁউ কেঁউ করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

জগৎ মজুমদার এবার হুঙ্কার দিলেন। বলিলেন, কি আমার কুকুরের গায়ে হাত! ডাকিলেন, তু—তু—

বাঘা আবার ফিরিয়া দূর হইতে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল।

অমর স্পোর্টস্‌ম্যান, তদুপরি গোঁয়ার। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, সমঝে না চললে এর পর কুকুরের মনিবও বাদ যাবেন না।

কি—কি!—ক্রোধে জগৎ মজুমদারের কথাই আটকাইয়া গেল।

স্টিক্‌খানা একবার ঘুরাইয়া লইয়া অমর কহিল, ঠিক তাই।

ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্র—এই এক ফোঁটা ডেঁপো ছেলে, তার এতখানি সাহস! জগৎ মজুমদার ভেঙ্গচাইয়া বলিলেন, ঠিক তাই! তার পর কহিলেন, বাপ-ছেলে এসেছে একসঙ্গে লড়তে। ছেলে!—আচ্ছা...তিনি চীৎকার করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন, ইন্দ্র!

বাপের ডাকে ইন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। হাতে গৃহে নিত্য ব্যবহৃত একখানি দা। আসিয়াই কহিল, রণ—রণ দেহ মোরে—

ইন্দ্রের মাথায় বেশ একটু ছিট্ আছে। স্কুল ছাড়িয়াছে

সুবিধা হইল না বলিয়া; রাগিলেই থিয়েটারী ভাষায় কথা বলে। অন্য সময় নয়।

হকিস্টিক বগলে চাপিয়া অমর ঠাট্টা করিয়া বলিল, বজ্র ছেড়ে ইন্দ্রের হাতে অসি কেন? বজ্র ধর ইন্দ্র—বজ্র ধর।

ভুবন চৌধুরী উচ্চ শব্দে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ছেলেকে তোমার রাঁচি পাঠাও মজুমদার—রাঁচি।

মজুমদার-গৃহিণী দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রের হাত ধরিয়া উচ্চস্বরেই কহিলেন, তুই আয় ইন্দ্র, পরের ছেলেকে রাঁচি পাঠাবার পূর্ব্বে যেন নিজের ছেলেকে রাঁচি পাঠাতে হয়। ভগবান্ আছেন। তিনিই এর ব্যবস্থা করবেন; চোখ আছে তাঁর—একচোখো নন্।

বলিয়া হন্ হন্ করিয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন।

ঠিক তখনই চৌধুরী বাড়ীর একটা জানালা খুলিয়া গেল। সেখানে দেখা গেল চৌধুরী-গৃহিণীকে। চীৎকার করিয়া বলিলেন, ঢং। ছেলের মতই থিয়েটার ক'রে গেল। ভগবান্ আছেন তা জানি। আছেন যে, তা তোরাই একদিন বুঝবি।

প্রত্যুত্তরে মজুমদার-গৃহিণীও চৌধুরী-বাড়ীর দিক্‌কার একটি খোলা জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মুখ ও হাত নাড়িয়া কহিলেন, ন্যাকামি, এ্যাক্‌টো করতে ত বিবিও কম নন্।

দড়াম্ করিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া চৌধুরী-গৃহিণী কহিলেন, মুখ দেখলেও ঘেন্না করে।

জানালা মজুমদার-গৃহিণীও সজোরে বন্ধ করিয়া দিলেন। বলিলেন, কিন্তু ও মুখ দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

চৌধুরী-গৃহিণী ঘুরিয়া সদরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্বামী পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, ঘরে আসতে হবে না! না আজ ওখানে থাকলেই চলবে!

গৃহিণীর আহ্বানে ভুবন চৌধুরী সদলবলে চলিয়া আসিলেন।

সেইদিকে চাহিয়া জগৎ মজুমদার ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—মাগিমুখো।

বাঘা ছুটিয়া গিয়া চৌধুরীরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানকার মাটি খুঁড়িয়া, ধূলা উড়াইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। বোধ হয় সে চৌধুরীদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, ছুয়ো—ছুয়ো—

* * *

অমিয় কহিতেছিল, তুমি কি বেশী ভিজেছ মল্লিকা?

মল্লিকা কহিল, বেশী ভিজতে তুমি আর দিলে কই।

মল্লিকার আঁচলখানি হাতের মুঠোর মধ্যে লইয়া অমিয় বলিল, কমই বা কি! এই ত বেশ ভিজেছ দেখছি। এখন অসুখ না করলেই বাঁচি।

—থাম। তোমাকে আর বুড়ো মানুষের ঢঙে কথা বলতে হবে না।

—থামলাম। কিন্তু এবার উঠতে হয়। রাত্রি হয়ে এল অনেক।

—হোক। আজ আর উঠতে ইচ্ছে করছে না অমি।…চাঁদ উঠেছে দেখেছ! চল ঐ দিক্‌টায় গিয়ে বসি।

অমিয় বলিল, তা না হয় চল্‌লাম। কিন্তু তোমার বোর্ডিঙে ফিরতে অনেক রাত হবে যে! মেট্রনকে কি কৈফিয়ৎ দেবে?

—ভয় নাই, কৈফিয়তের পালা সাঙ্গ করেই এসেছি। তিনি জানেন শনিবার থিয়েটার দেখে ফিরতে একটু রাতই হয়।—হাসিয়া বলিল মল্লিকা।

—থিয়েটার দেখা ত নয়—নিজেই যে থিয়েটার করতে আরম্ভ করেছ এটা যদি তিনি টের পান?—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল অমিয়।

—কোন দিনই টের পাবেন না। বি-এ পড়া মেয়েদের কথায় অবিশ্বাস করতে নাই। তায় বড় হয়েছে; তিনি জানেন, তারা যা বলে তা সত্যি।

—সাবালিকা! তা ঠিক। হাসিল অমিয়।

—হ্যাঁ মশাই তাই। এবার তুমি ওঠ তো। কহিল মল্লিকা।

তারা এতক্ষণ ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার ধারে বসিয়াছিল। বেড়াইতে আসিয়াই এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে; মল্লিকার আরও ভেজা ইচ্ছা ছিল, অমিয় ভিজিতে দেয় নাই। তাহাতে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মল্লিকা।

অমিয় চলিল মল্লিকার হাত ধরিয়া। যেখানটায় তাহারা বসিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল, সামনে আসিয়া দেখিল গুটি-তিন ছোক্‌রা পূর্ব্ব হইতেই সেস্থান দখল করিয়া বসিয়া আছে।

অমিয় কহিল, এবার?

মল্লিকা মনে মনে তাহাদের মুণ্ডপাত করিয়া কহিল, তা হোক্। চল না হয় আউটরাম ঘাটের দিকে।

—আবার আউটরাম ঘাট?

—হ্যাঁ, চল।

—তোমার বাসনার কাছে আজ নিজেকে একেবারেই সমর্পণ করলাম মল্লি—তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।

—আত্মসমর্পণের আরও কিছু বাকী আছে নাকি? জিজ্ঞাসা করিল মল্লিকা।

—যেটুকু ছিল আজ তা পরিপূর্ণরূপেই সম্পন্ন করলাম। নিজের ব'লে আর কিছু রাখলাম না।

অমিয়র হাতের উপর ঈষৎ চাপ দিয়া মল্লিকা বলিল, মনে থাকে যেন!

—থাকবে।

গেট পার হইয়া তাহারা পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টির জলে সমস্ত পথটা ভিজিয়া গিয়াছে। দূর হইতে একখানি মোটর ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহার হেড্‌লাইটের তীব্র আলোকে পথটাকে যেন রূপার পাতে মোড়া বলিয়া মনে হইতেছিল। মোটর চলিয়া গেল। মল্লিকা আর অমিয় পথ পার হইয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিল।

বর্ষার গঙ্গা। দুকূল ছাপাইয়া গিয়াছে। উদ্দাম ঢেউগুলো সব নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। অতীতের সমস্ত শুষ্কতা শীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের মত্ততায় আজ সে যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান দেখিয়া জেটির শেষ সীমায় পা ঝুলাইয়া বসিল মল্লিকা—পার্শ্বে অমিয়।

গঙ্গার দিকে চাহিয়া মল্লিকা বলিল, বাঃ।

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, কি?

মল্লিকা কহিল, গঙ্গার এ রূপ তোমার কেমন লাগে অমি?

অমিয় বলিল, ভাল।

—সত্যই ভাল। শীতের গঙ্গাকে আমার সহ্য হয় না। শীর্ণা—যেন বুড়ী। গ্রীষ্মের গঙ্গার শুষ্কতা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে যৌবন কি ওর কোন দিন সত্যই ছিল? আর আজ—

মল্লিকার মুখের কথা টানিয়া লইয়া অমিয় কহিল, আর আজ যে ও তোমারই প্রতিচ্ছবি, না মল্লি?

—দূর!

সিটি দিতে দিতে একখানা বৃহৎ স্টীমার গঙ্গাবক্ষ একেবারে তোলপাড় করিয়া উঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মল্লিকা সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল, চুপচাপ যে?

—ভাবছি।

—কি?

মল্লিকা স্টীমারখানাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, দস্যুর মত ও, ঐ যে গঙ্গার বুকখানাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল—মানুষের জীবনেও ত এমনই ঘটে।

—দার্শনিক হয়ো না মল্লি। তার পর বলিল, মানুষের জীবনে যাহাই ঘটুক না কেন, তোমার জীবনে নিশ্চয়ই তা কোনদিন ঘটবে না।

মল্লিকা কহিল, কে জানে!

মল্লিকার একখানি হাত নিজের দুখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া অমিয় বলিল, আমি জানি। অন্যের কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমি বলছি মল্লি, আমার কাছ থেকে তোমাকে জীবনে কোন দিন এতটুকু দুঃখ পেতে হবে না।

—ঠিক?

—ঠিক।

জনার্দ্দন শর্ম্মা, চৌধুরী আর মজুমদারদের উভয়েরই কুলপুরোহিত। বয়স হইয়াছে তথাপি চপলতার শেষ হয় নাই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গ ভালবাসেন, বুড়োদের সঙ্গ নয়। বলেন, ওরা ত সব যাত্রাপথে পা বাড়িয়েই আছে—ওদের সঙ্গ নিয়ে লাভ!

বুড়োরা শুনিয়া বলেন, ছেলেরা আপনার যাত্রাপথের শেষ দিক থেকে আপনাকে গোড়ার দিকে টেনে আনবে নাকি?

জনার্দ্দন শর্ম্মা হাসিয়া বলেন, ওরা পারলেও পারতে পারে। কিন্তু তোমরা কেবল এগিয়ে নেওয়া ছাড়া পেছিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না এটা ঠিকই।

...জনার্দ্দন শর্ম্মা কি কাজে যেন কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া সেদিন দেখা করিতে আসিলেন ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে, নানা কথার পর কথায় কথায় কহিলেন, মেয়ের বিয়ে দেবে না চৌধুরী?

চৌধুরী কহিলেন, দেবার ত খুবই ইচ্ছা আছে ঠাকুর-মশাই, কিন্তু যোগ্য পাত্র পাচ্ছি কই? দিন না দেখে শুনে।

ঠাকুর মশাই বলিলেন, দিতে পারি ভুবন, এখন তোমাদের মত হ'লেই হয়।

—মল্লিকার উপযুক্ত পাত্র যদি হয়, তবে অমত কেন হবে ঠাকুর মশাই?

—পাত্র ভালমন্দের উপর কি সব সময় মতামত বিবেচ্য হয় চৌধুরী?

—হওয়া,ত উচিত।

—নিশ্চয়ই উচিত; কিন্তু তা হয় না। অভিভাবকের থাকে কতকগুলো খেয়াল। ঐ খেয়াল চরিতার্থ করতে, কত অভিভাবক যে তাদের পুত্রকন্যার সুখ-শান্তি বলি দিয়েছেন, কে তার খবর রাখে!

চৌধুরী বলিলেন, তা বটে। তার পর কহিলেন, যে পাত্রের কথা বলছেন সেটি পড়াশুনা কত দূর করেছে? জানেন ত মল্লিকা বি-এ পড়ে!

—পাত্রটি এবার বি-এ দেবে।

—বংশ?

—সৎ বংশ।

—অবস্থা?

—ভালই।

—বাড়ী কোথায়?

—এখানেই।

—এখানেই?

—হ্যাঁ।

—নাম?

—অমিয়।

—অমিয়?...

—হ্যাঁ, অমিয় মজুমদার। জগৎ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শুনিয়া ভুবন চৌধুরী অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ঠাকুর মশাই?

জনার্দ্দন শর্ম্মা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ভুল। চৌধুরী, আমি তোমাদের কুলপুরোহিত। তুমি আমার যজমান—ঠাট্টার পাত্র নও।

—তবে?

—তাইত বলছিলাম চৌধুরী, পাত্র ভালমন্দের উপরই সব নির্ভর করে না। অভিভাবকদের খেয়াল ব'লে যে কথাটা রয়েছে—সেটা ত মুছে ফেলবার নয়!

—কিন্তু এ ত আমার কোন অন্যায় খেয়াল নয় ঠাকুর মশাই!

—ন্যায় অন্যায় তুমি বুঝবে না চৌধুরী। তিন পুরুষ ধরে যা বুঝলে না, একদিনে তা বুঝবেই বা কেন! কিন্তু এ কথাটাও ভেবে দেখ চৌধুরী, মেয়ে তোমার বড় হয়েছে, ঢের লেখাপড়া শিখেছে। তোমার মতের উপরই সে সব নির্ভর করবে, এমন নাও হ'তে পারে!

—তার মানে?

—মেয়ে যদি বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামতের অপেক্ষায় না থাকে—তবে?

শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় শুধু বলিলেন, হুঁ...

এর পর কথাটা জনার্দ্দন শর্ম্মা জগৎ মজুমদারের কাছে পাড়িতেই মজুমদার একেবারে আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, আপনি বলেন কি ঠাকুর মশাই, ঐ চামারের মেয়ের সঙ্গে দেব ছেলের বিয়ে?

ঠাকুর মশাই কহিলেন, ক্ষতি কি?

—গুরুতর ক্ষতি। আর লোকেই বা বলবে কি?

—লোকে ভালই বলবে। এই বিবাহটা উপলক্ষ্য ক'রে যদি তোমাদের অন্তরের মনোমালিন্য চিরদিনের জন্য মুছে যায়—সে তো সুখের কথাই মজুমদার!

—ও কথা আমায় আর বলবেন না ঠাকুর মশাই। ও আমায় বলে কি না ভেজাল! আর ওরই মেয়ের সঙ্গে দেব ছেলের বিয়ে?

রাগের মুখে অমন কথাকাটাকাটি তো হয়েই থাকে মজুমদার, তা ধরতে গেলে কি আর চলে?

—চলতেই হবে।

—যদি না চলে?

—চলবে না কেন?

—অমিয় বড় হয়েছে।

—হয়েছে, তাতে কি?

—এখন তার একটা মতামত গড়ে উঠতে পারে।

—তার আবার মতামত কি? আমার ছেলে, আমি যা বলব সে তাই শুনতে বাধ্য।

—সে যুগ চলে গিয়েছে মজুমদার। এখন তা আর হবে না।

জগৎ মজুমদার চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

জনার্দ্দন শর্ম্মা হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, অমিয় কোন্ কলেজে পড়ে?

—স্কটিশ চার্চ্চে।

—ভুবন চৌধুরীর মেয়ে মল্লিকা কোন্ কলেজে পড়ে তা জান মজুমদার?

—না। কোথায়?

—স্কটিশ চার্চ্চে।

—এ্যাঁ!

—অমিয়র মেসের ঠিকানা কি?

—২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।

—আর মল্লিকাদের বোর্ডিঙের ঠিকানার খোঁজ রাখ?

ভয়ে ভয়ে জগৎ মজুমদার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ?

—২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।

—এঁ্যা !

—ওদের দুজনের আলাপ আছে, সে খবর রাখ জগৎ ?

জগৎ মজুমদার একেবারে হতাশ হইয়া কহিলেন, এঁ্যা !

জনার্দ্দন শর্ম্মা আবার কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবে কোন পক্ষই রাজী হইল না। না হোক; কিন্তু ইহা লইয়াই আবার নূতন করিয়া কলহ আরম্ভ হইল।

সেদিন মজুমদার-বাড়ীর দিক্‌কার সব কটা জানালা খুলিয়া দিয়া চৌধুরী-গৃহিণী অনাবশ্যক চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, মেয়ের হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারি না!...নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না।... ঐ মুখপোড়ার ছেলের সঙ্গে বিয়ে! মরণ আর কি!

যাহাকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হইতেছিল, তাহার কর্ণে যথাসময়েই কথাগুলো পৌঁছিল। উত্তরও তিনি ইহার যথাযথ দিলেন। কহিলেন, চাকরাণী রাখবার উপযুক্ত যে নয়, তাকে করব ছেলের বউ! ঠাকুর মশাই ক্ষেপেছেন নাকি ?

—ছেলের বউ!...আরে সোহাগী; পাগলের গোষ্ঠী— সাধ দেখ না!

এর পর জগৎ মজুমদারের গলা শোনা গেল। বলিলেন, ঠাকুর মশাই বলেন, চৌধুরীদের মেয়ের সঙ্গে ছেলের আলাপ আছে...থাকলই বা! সে নিন্দে কার! আমার —না ওদের!

—আলাপের মুখে মারি ঝাঁটা। কহিলেন, চৌধুরী-গৃহিণী।

—মারি লাথি। উত্তর দিলেন মজুমদার গৃহিণী।

চাবুক হাতে বাহির হইয়া আসিল অমর। হাতের চাবুক দিয়া শূন্যের উপরই ঘা মারিতে মারিতে কহিল, ইপ্, ইপ্ এর পর ভিতরে ঢুকে সব চাবুক পেটা ক'রে আসব।

জগৎ মজুমদার বাহির হইয়া আসিলেন। কহিলেন, মাতাল নাকি—চেঁচাচ্ছে দেখ না!

—গেঁজেলের চেয়ে মাতাল ভাল। কহিলেন ভুবন চৌধুরী আসিয়া।

হুকার দিলেন মজুমদার। কহিলেন, কি কি! এত বড় কথা! তার পর বাঘাকে ডাকিলেন, তু-তু-লে-লে—

চাবুক দিয়া বাঘাকে সায়েস্তা করা যাবে না বলিয়া অমর হকি-ষ্টিক আনিতে ছুটিল।

ইন্দ্র আসিয়া কহিল, আজ নাহিরে নিস্তার—

সন্ধ্যার আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তখন হইতেই আকাশ জুড়িয়া মেঘ করিয়াছিল; এই মাত্র মেঘ কাটিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। বৃষ্টির জলের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া ঝিকিমিকি করিতেছে। রাত্রি বোধ হয় একটু হইয়াছে। দুটো শৃগাল বন হইতে বাহির হইয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া খানিকটা ডাকিয়া বনান্তরে চলিয়া গেল। চৌধুরী আর মজুমদার বাড়ীর কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের উভয় বাড়ীর মাঝের বন-ঝাউ গাছটির পাতাগুলি বাতাসে সন্ সন্ করিয়া উঠিতেছে। কোথা হইতে দুইটা হুতম উড়িয়া বন-ঝাউ গাছটির উপর বসিল এবং তারস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। সাড়া পাওয়া গেল চৌধুরী-গৃহিণীর। বলিলেন, দূর-দূর—। তখন সাড়া দিলেন মজুমদার-গৃহিণীও। বলিলেন, দূর-দূর—। ইহাতেও তাহারা কিন্তু দূর হইল না। তেমনি করিয়াই ডাকিতে লাগিল—ভুত-ভুতুম-ভুত-ভুতুম—

পেঁচকের ডাক বৃথা হইবার নয়...অমঙ্গল টানিয়া আনে...। অত্যন্ত দুঃসংবাদ পাইয়া ভুবন চৌধুরী ছুটিয়াছেন। মন বিষণ্ণ। চলিয়াছেন আর ঘড়ি দেখিতে-ছেন। এই শেষ ট্রেন—এখন পাইলে হয়। এখনও যদি তিনি সময় মত উপস্থিত হইতে পারেন, তবে হয়ত ইহাতে তিনি বাধা দিতে পারিবেন। কিন্তু সময় মত উপস্থিত হইতে না পারিলে, সব মাটি হইয়া যাইবে।

চৌধুরী আরও জোরে ছুটিলেন।

কিন্তু এ পত্র কে পাঠাইল! কেহ তো ঠাট্টা করে নাই! না—তাহাও বিশ্বাস হয় না। এমন শত্রু সেখানে তাহার কেই বা আছে যে এই প্রকার চিঠি পাঠাইয়া পরিহাস করিতে পারে! তবে ?

মেয়ের সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সাবধান হইয়াছিলেন। তাই তো তাহাকে পত্রে জানাইয়া দিয়াছিলেন, সামনের মাসেই তিনি তাহার বিবাহ দিবেন, সুতরাং তাহার আর পড়াশুনা করিয়া কাজ নাই। পত্র পাইয়াই যেন সে চলিয়া আইসে, অন্যথায় তিনি নিজেই গিয়া তাহাকে লইয়া আসিবেন। তাহার সাবধানতার ফল কি শেষে ইহাই ফলিল।

মল্লিকা আসিল না। আসিল এ কাহার পত্র!

চলিতে চলিতেই ভুবন চৌধুরী চিঠিখানি আবার বাহির করিলেন।

কলিকাতা

চৌধুরী মহাশয়!

শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে আগামী ২৬শে বৈশাখ, বনমালী দত্তের ১২ নং বাড়ীতে, আপনার কন্যা মল্লিকার শুভ বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

ঐ দিন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আপনার কন্যা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে পারিলে উহারা আন্তরিক সুখী হইতে পারে। ইতি

শুভার্থী

ষ্টেশনে আসিয়া জগৎ মজুমদারকে গ্যাট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চৌধুরী একেবারে ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভাবিলেন, এ ব্যাটা আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল! আমার সর্ব্বনাশের কথা টের পাইল নাকি!

মজুমদার বসিয়া ছিলেন; চৌধুরীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্কিত হইয়া পকেটে হাত দিয়া কি যেন দেখিলেন। না—ঠিকই আছে। তবে ভুবন চৌধুরী আবার যাইতেছে কোথায়!

দূর হইতেই দুই জন দুই জনের দিকে টেরা চাহনিতে মাঝে মাঝে চাহিতে লাগিলেন। চৌধুরী ভাবিতেছিলেন, জগৎটা আবার সঙ্গ লইল কেন! আর মজুমদার ভাবিতেছিলেন, ভুবন টের পাইয়া রঙ্গ দেখিতে আমার সঙ্গে কলিকাতায় ছুটিল নাকি!

ট্রেন আসিয়া পড়িল। ত্রস্তে একখানি কামরায় চৌধুরী উঠিয়া পড়িলেন। ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, চৌধুরী মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন মজুমদার রহিয়া গেল না ট্রেনে উঠিল। মুখ বাড়াইতেই মজুমদারের সঙ্গে তাঁহার চোখাচোখি হইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চৌধুরী ভাবিলেন, না—সঙ্গেই চলল ব্যাটা।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। নিজ কামরায় বসিয়া জগৎ মজুমদার পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। চিঠিখানি না হোক বোধ হয় বিশ বার মজুমদার পড়িয়াছেন। আবার পড়িলেন—

কলিকাতা।

মজুমদার মহাশয়!

একটা সুখবর দিতেছি। আগামী ২৬শে বৈশাখ, বনমালী দত্তের ১২ নং বাড়ীতে শ্রীমান্ অমিয়র বিবাহ। ঐ দিন আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া শ্রীমান্ এবং আপনার বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যান, তবে উহারা যারপরনাই সুখী হয় ইতি—

শুভার্থী—

সুখীর নিকুচি করেছে—মজুমদার নিজ মনেই বলিয়া উঠিলেন। এখন ভালয় ভালয় যাইয়া উপস্থিত হইতে পারেন তবেই হয়!

বিবাহটা কত রাত্রে তা তো কিছু লেখা নাই। ট্রেন পৌঁছাইতে তো রাত্রি প্রায় ১০টা হইয়া যাইবে। বিবাহ তারপর তো!...

হু-হু-করিয়া ট্রেন ছুটিতে লাগিল। মেল ট্রেন, না থামিয়া স্টেশনের পর স্টেশন পার হইতেছে। ছুটিতেছে ৬০ মাইল বেগে। তথাপি চৌধুরী আর মজুমদার ভাবিতেছিলেন, ট্রেন আজ এত আস্তে চলিতেছে কেন!

অবশেষে ট্রেন আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল। ট্রেন হইতে নামিয়া চৌধুরী ছুটিলেন বাহিরের দিকে। পিছন ফিরিয়া মজুমদার আসিতেছে কিনা দেখিবার আর অবসরও পাইলেন না।

জগৎ মজুমদার পথে আসিয়া দেখিলেন, ভেঁপু বাজাইয়া এক বিবাহের শোভাযাত্রা চলিয়াছে। আঁৎকাইয়া উঠিলেন, অমিয় নয়তো!

না, এক মাড়োয়ারীর ছেলে রাজা সাজিয়া চলিয়াছে বিবাহ করিতে—অমিয় নয়।

জগৎ মজুমদার ট্যাক্সি ধরিলেন—

এইমাত্র বিবাহ শেষ হইয়া গেল। জনার্দ্দন শর্ম্মাকে প্রণাম করিয়া অমিয় আর মল্লিকা কেবল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় একই সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া সেখানে চৌধুরী আর মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হাসিমুখে জনার্দ্দন শর্ম্মা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, এস—এস—

সব দেখিয়া শুনিয়া মজুমদারের চক্ষু কপালে উঠিল। চৌধুরীর মুখখানা বেলুনের মত ফুলিয়া উঠিল। জনার্দ্দন শর্ম্মা হাসিয়াই বলিলেন, আজ আর এই শুভ দিনে তোমরা অমন গোমড়া মুখে থেক না—একটু হাস ভুবন, এ তো সুখের বিয়ে জগৎ। ওদের মুখ দেখে বোঝ না, আজ কত সুখী হয়েছে এরা।...এইটেই বড়, না তোমাদের জেদটাই বড়? বুঝলে জগৎ, ওদের মুখের হাসিই আমার কাছে বড় মনে হয়েছিল, তাই আমি আর কোন উপায় না পেয়ে এমনি করেই ওদের হাত দুটো এক ক'রে

দিলাম।... আমি তোমাদের কুলপুরোহিত, তোমাদের শুভার্থী। তোমাদের পারিবারিক শান্তির জন্য যে এ কাজ করেছি, আশা করি, এটা তোমরা বুঝবে চৌধুরী।

তার পর অমিয় আর মল্লিকাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ওদের তোমরা এখন প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর।

অমিয় আর মল্লিকা লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিল।

ভুবন চৌধুরী আর জগৎ মজুমদার মনে মনে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন কি না জানি না; কিন্তু মুখে চৌধুরী মজুমদারকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন, বেয়াই—

মুখখানা অন্ধকার করিয়াই জগৎ মজুমদার উত্তর দিল, হুম্।

বাঁকুড়ার কয়েকটি কারুশিল্প

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

বাংলা দেশে কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বাঁকুড়ার স্থান অনেক উচ্চে। এমন কি কোন কোন শিল্প বাঁকুড়ার একচেটিয়া। অন্ততঃ বর্ত্তমানে এমন দুই-একটি কারুশিল্প বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে যাহা বাংলা দেশের অন্যান্য জেলায় বহু পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিলেও এখন অজ্ঞাত।

অনেকে হয়ত জানেন না যে, কারুশিল্পের ক্ষেত্র ব্যতীত চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বাঁকুড়ার স্থান বাংলা দেশের সকলের উচ্চে। এ পর্য্যন্ত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা হইতে যে সকল চৌকা ও জড়ান পট পাওয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহে সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায়, কিন্তু বিষ্ণুপুরের পটুয়াদের আবিষ্কৃত পটের—কি বর্ণসমাবেশের দিক্ দিয়া, কি বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনের দিক্ দিয়া—তুলনা মেলে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঁকুড়ার জড়ান পটের (বিষ্ণুপুরী-চালের) নমুনা মাত্র একখানাই এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা গিয়াছে। এই পটখানি আমি ওন্দা গ্রাম হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া আনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পটসংগ্রহের মধ্যে ইহা একখানি মহামূল্য বস্তু।

বাঁকুড়ায় অন্য অনেক পট পাওয়া গিয়াছে সত্য এবং সেগুলির শিল্পমূল্য যথেষ্ট হইলেও, বিষ্ণুপুরী চালের পটের তুলনায় তাহা হীন। যখন বাংলার চিত্রকলার ইতিহাস লেখা হইবে তখন বাঁকুড়ার, বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরের চিত্র-নৈপুণ্যের বিষয়, স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চিত্রকলা আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল মাত্র কয়েকটি কারুশিল্প সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।
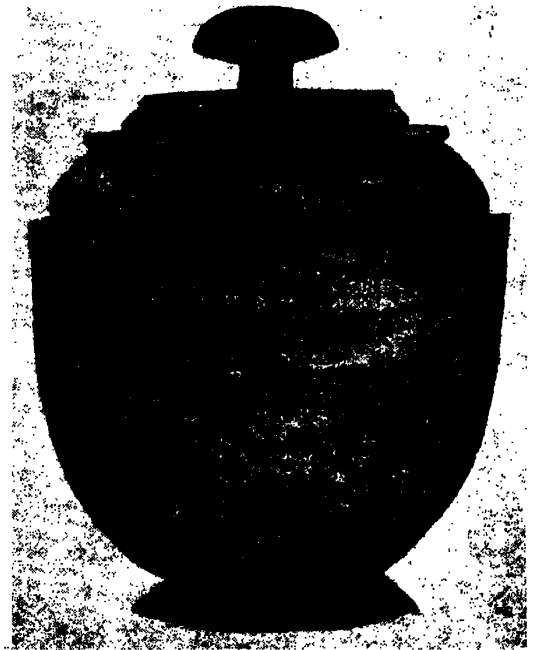
কাঠের ঘট। শুশুনিয়া পাহাড়ের করলা মিস্ত্রীদের তৈয়ারী

পরলোকগত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের একান্ত ই

কাঠের ঘট। শুশুনিয়া পাহাড়ের করঙ্গা মিস্ত্রীদের তৈয়ারী

ছিল বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার প্রচলিত লৌকিক শিল্পগুলির বিশদ্ বিবরণ সংগ্রহ করিবেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাকে বাঁকুড়া জেলায় কাজ আরম্ভ করিতে বলেন। এই উপলক্ষে আমাকে বাঁকুড়ায় প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহার ফলে আমি বাঁকুড়ার কয়েকটি জীবন্ত কারুশিল্পের সংস্পর্শে আসি। দুঃখের বিষয় আমার অনুসন্ধান-কার্য্যটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই দত্ত মহাশয় পরলোকগমন করেন। তিনি এই অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রায় পাঁচ-ছয় শত টাকা ব্যয় করেন। সময় পাইলে এই অনুসন্ধানের বিষয় তিনি নিজে লিখিয়া যাইতে পারিতেন।

দামোদরের কূলে মেজিয়া গ্রামে তিনি একটি উঁচু ঢিবি খুঁড়িয়া মাটির অজ্ঞাতনামা বহু মূর্ত্তি উদ্ধার করেন। এ সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল এখানে তিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন নিদর্শন পাইবেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দুই-তিন শতকে প্রচলিত "বসুমতী" মূর্ত্তির নিদর্শন তিনি এখান হইতে পাইয়াছিলেন।* বাংলা দেশের তথা বাঁকুড়ার ইহা দুর্ভাগ্য যে এই অনুসন্ধান-কার্য্যটি সমাপ্ত হইতে পারিল না। যাহা হউক, কারুশিল্প সম্বন্ধে আমার উপর তিনি যে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার কাজ যদিও আমাকে অর্দ্ধপথে সমাপ্ত করিতে হইয়াছে, তথাপি এই অভিজ্ঞতা হইতেই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

* এই মূর্ত্তিগুলি এখন রাণীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে পড়িয়া আছে। সেগুলি কলিকাতায় আনিবার ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই দত্ত মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পরে মারা যান।

বাঁকুড়ার তাস

তাসখেলা এখন সকলেরই জ্ঞাত। এই তাস বর্ত্তমানে কাগজের উপর নানা রঙে ছাপিয়া বিক্রয় করা হয়। তাস-খেলার পদ্ধতিও নানা প্রকার। কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় এক প্রকার তাসখেলা প্রচলিত আছে যাহার পদ্ধতি ও তাস উভয়ই বাঁকুড়ার নিজস্ব।

প্রচলিত সাধারণ তাসে সাহেব, বিবি, গোলামের ছবি ও হরতন, রুহিতন প্রভৃতি রঙের ব্যবহার হয়। বাঁকুড়ার তাসে দশ অবতারের ছবি ও প্রত্যেক অবতারের 'প্রহরণ'গুলি তাহার রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খেলিবার পদ্ধতিও সম্পূর্ণ স্বকীয়। এই খেলা এখন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে।

আমার নিকট কিন্তু খেলার চাইতে তাসগুলির মূল্য অনেক বেশী। কারণ তাসগুলি প্রস্তুত করিতে শিল্পীরা যে বিশেষ গঠন ও অঙ্কন-পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাহা বাংলা দেশের অন্যত্র অজ্ঞাত। মোটা কাপড়ের উপর

কাঠের ঘট। শুশুনিয়া পাহাড়ের করঙ্গা মিস্ত্রীদের তৈয়ারী

কাঠের বাটি। শুশুনিয়া পাহাড়ের করজা মিস্ত্রীদের তৈয়ারী

জমি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর চিত্রগুলি অঙ্কন করা হয়। পরে গালার প্রলেপ দিয়া গোল তাসগুলিকে শক্ত ও অঙ্কিত চিত্রগুলিকে স্থায়ী করা হয়। যদি এই পদ্ধতি-টিকে আমাদের শিল্পীরা শিখিয়া লইতে পারেন তবে ইহার দ্বারা প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য কাজ অনা-য়াসে ও অল্প ব্যয়ে করিতে পারিবেন। এখন হয়ত কেহ এই প্রকার দেশী তাস খেলিতে চাহিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এই দেশীয় চমৎকার কারু পদ্ধতিটি নষ্ট হইবে কেন? বিষ্ণুপুরে এখনও তাসের শেষ পটুয়া জীবিত আছেন। এখনও সময় আছে। আমরা কি তাঁহাকে উত্তরাধি-কারী না রাখিয়া মরিতে দিব? এমনি করিয়াই আমরা কালীঘাটের শেষ পটুয়াদের মরিতে দিয়াছি। সেদিন কেহ কাঁদে নাই। কাহারও প্রাণে বাজে নাই—শুধু বাজিয়াছিল একজনের কানে—সাত সাগরের পারে—ভারতপ্রাণ হাভেল সাহেবের।
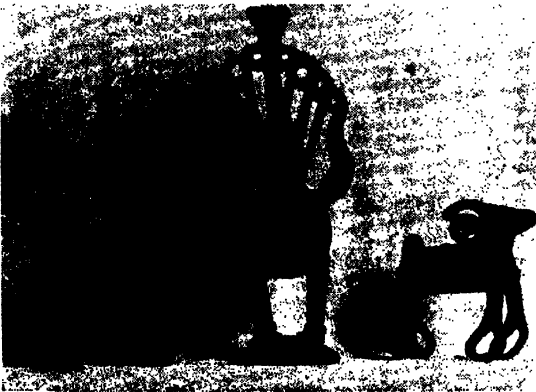
বাঁকুড়ার ঢালাই কাজ—নাহার মিউজিয়ম

এই তাসের উপরকার অঙ্কিত অপূর্ব্ব সুষমাময় সূক্ষ্ম চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। তবুও এই বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাঁকুড়া হইতে আমি তিন জোড়া এই-রূপ পুরাতন তাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এইগুলি যখন শান্তিনিকেতনে পূজনীয় নন্দলাল বসু মহাশয়কে দেখাই, তিনি এইগুলি দেখিয়া অতিমাত্রায়

অনন্তবাসুদেব-মূর্ত্তি (ঢালাই কাজ)। বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত
—নাহার মিউজিয়ম

আনন্দিত হন। তৎক্ষণাৎ কলাভবনে এই তাসগুলির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমানে উহার দুই জোড়া কলাভবন মিউজিয়মের সম্পত্তি ও এক জোড়া খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় দু-তিন জোড়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহ এক জিনিস, শিল্পীকে বাঁচাইয়া রাখা অন্য জিনিস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত, এই সব শিল্প-কৌশল যাহাতে মরিয়া না যায়

তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে এই অবহেলিত, অবজ্ঞাত কিন্তু প্রতিভাবান গ্রাম্য-শিল্পীদের জন্য একটু স্থান করা।

•

কাঠের কাজ

পশ্চিম-বঙ্গের কুটীর-স্থাপত্যের বিশেষত্ব উহার কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্য। এইরূপ খোদিত-চিত্র-সম্বলিত দরজা, কড়ি, বরগা, থাম প্রভৃতি বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ গৃহের শোভা বর্দ্ধন করে। এই সকল খোদিত চিত্রের রেওয়াজ যদিও ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তথাপি এখনও পশ্চিম-বঙ্গে কারুশিল্পের প্রচলন অন্য কোন কারুশিল্প হইতে বেশী আছে। চেষ্টা করিলে ইহাকে নূতন রূপ দিয়া জীবন্ত করা যায়। শান্তিনিকেতনে
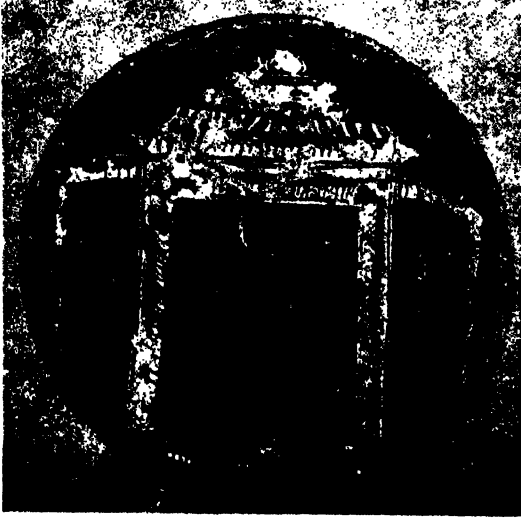
বাঁকুড়ার তাস (বরাহ অবতার)। বিষ্ণুপুরে এখনও প্রস্তুত হয়

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের কুটীর যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা আমার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এমন একটি কাঠের কাজের আলোচনা করিতে চাই যাহা একরূপ বাঁকুড়া জেলার একচেটিয়া। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনীয়া পাহাড়ের নিকট প্রায় এক শত ঘর করঙ্গা বা করগা মিস্ত্রী আছে। ইহারা নানা প্রকার কাঠের বাসন কুঁদিয়া তৈয়ারী করে। এই কাজের উপযোগী বিশেষ যন্ত্র তাহারাই উদ্ভাবন করিয়াছে এবং যে বিশেষ পদ্ধতিতে বড় বড় কাঠের ভিতরের অংশ কুঁদিয়া বাহির করে তাহা এ-প্রদেশের অন্য কোন কুঁদাইওয়ালার অধিগত নহে। কলিকাতায় বা আশে-

বাঁকুড়ার তাস (কল্কি অবতার)। বিষ্ণুপুরে এখনও প্রস্তুত হয়

পাশে আমরা অনেক মিস্ত্রিকে খাটের পায়া প্রভৃতি কুঁদিয়া বাহির করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু উপরের কাঠ কুঁদিয়া বাহির করা বিশেষ শক্ত নহে যতটা শক্ত কাঠের ভিতরের অংশ কুঁদিয়া বাহির করা। এই করঙ্গা বা করগা মিস্ত্রীরা ইহা অবলীলাক্রমে করে। করগা মিস্ত্রীদের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের কথা হইতেছে উহাদের তৈয়ারী প্রত্যেকটি দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ রূপবৈচিত্র্য। প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই সহজ, সরল অথচ সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠন এই সব
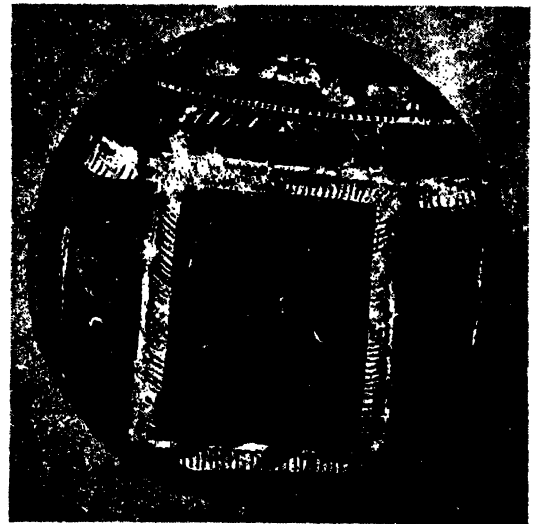
বাঁকুড়ার তাস (রাম অবতার)। বিষ্ণুপুরে এখনও প্রস্তুত হয়
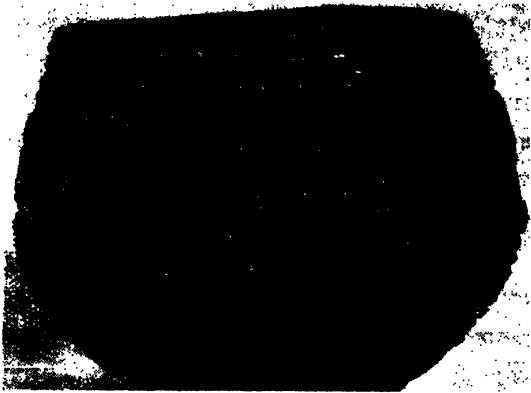
কুনিকা (ঢালাই কাজ)। বাঁকুড়ার ইহা একটি বিশেষ কারুশিল্প

করঙ্গা মিস্ত্রীরা যে কত উঁচুদরের কারু-শিল্পী তাহার পরিচয় দিতেছে।

বাঁকুড়া ভিন্ন বাংলা দেশে যে-সমস্ত শিল্পী এইরূপ কাঠের বাসন যৎসামান্য তৈয়ারী করে (যেমন বীরভূম) তাহাদের কাজ যেমন অল্প তেমনি বৈচিত্র্যহীন। বস্তুত তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তাই বাঁকুড়ার এই শত ঘর করঙ্গা বা করগাদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বা তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের অন্য পন্থা অবলম্বনের সঙ্গে বাংলার এই উচ্চাঙ্গের কারু-শিল্পটির চিরতরে বিলুপ্তি ঘটিবে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বাঁকুড়ায় যাই তখন পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে আমি এই কারু-শিল্পটি ও উহার নির্ম্মাতা করঙ্গাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনিও সম্মত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে কেহ গিয়া কোন শিল্প রক্ষা করিতে পারে না। একমাত্র বাঁকুড়া জেলার লোকেরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের জেলার শিল্পগুলিকে সহজেই রক্ষা বা পূর্ণ প্রচলন করিতে পারেন। তবে আমি বিশেষ করিয়া এই কাঠের কাজটির উন্নতির জন্য যাহা মনে করি তাহা লিখিতেছি। কিন্তু লেখা এক জিনিস আর করা আর এক জিনিস।

(ক) এই এক শত ঘর করঙ্গা মিস্ত্রিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ও তাহাদের দ্বারা আধুনিক কালোপযোগী জিনিস তৈয়ার করিয়া লওয়া। ইহার অর্থ এই নয় যে তাহারা যে-সব জিনিষ করে তাহা বাদ দেওয়া।

(খ) তাহারা যে কাঠ ব্যবহার করে তাহা সহজে ফাটিয়া যায় ও ঘুণ ধরে। সুতরাং যাহাতে তাহারা ভাল কাঠ পায় তাহার ব্যবস্থা করা।

(গ) তাহারা যে কাঠে কাজ করে তাহা যাহাতে সহজে না ফাটিয়া যায় তাহার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঘ) তাড়াতাড়িতে যাহাতে ঘুণ না ধরে তাহার জন্য এমন কোন প্রলেপের ব্যবস্থা করা যাহা অল্প ব্যয়সাধ্য।

(ঙ) ইহারা কাঠের উপর গালার রং পালিশ করিতে জানে না। তাহা উহাদের শিখাইয়া দেওয়া।

(চ) উহাদের প্রস্তুত দ্রব্যের নূতন ক্রেতার সন্ধান করা।

(ছ) কোন উৎসাহী বাঁকুড়ার অধিবাসী এই কাজটি হাতে লইলে তিনি নিজেও কিছু আর্থিক লাভ করিতে পারিবেন, পরন্তু এই মৃত্যুপথযাত্রী কারুশিল্পটি ও উহার ধারক করঙ্গারা বাঁচিয়া যাইবে।

সিরে-পারদু ঢালাই পিতলের কাজ

বাংলা দেশে দুই প্রকারের ঢালাই কাজ প্রচলিত

কুটীর-স্থাপত্যে কাঠের কাজের ব্যবহার। বাঁকুড়ার প্রায় প্রতি গ্রামে এইরূপ কাঠের কাজের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়

আছে। একটি মাটির ছাঁচ করিয়া তাহাতে গলা পিতল বা কাঁশা ঢালিয়া দিয়া বাঞ্ছিত জিনিসটি তৈয়ারী করা হয়, অন্যটিতে মোম ও গালা মিশ্রিত আদর্শের ছাঁচ হইতে প্রতিরূপ তুলিয়া লওয়া হয়। এই পদ্ধতির বিদেশী নাম 'সিরে-পারদু' বা Cire-Perdue ঢালাই।

এই সিরে-পারদু ঢালাই ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বর্ত্তমান। এখনও পশ্চিম-বঙ্গে মাত্র কয়েকটি জেলায় উহা প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ইহা এখনও বহুলপ্রচলিত। এই সব মিস্ত্রিরা যে কৌশলের অধিকারী তাহার সম্যক্ ব্যবহার করিলে এখনও আমাদের দেশে ঢালাই-শিল্প পুনরায় গৌরবময় আসন অধিকার করিতে পারিবে।

পূজনীয় নন্দলাল বসু মহাশয় শান্তিনিকেতনে একজন এইরূপ ঢালাই-শিল্পীকে বিষ্ণুপুর হইতে আনাইয়া কলা-ভবনের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে এখনও বহু ঢালাই-শিল্পী অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। কেহ যদি ইহাদের দ্বারা 'কাগজ-চাপা', 'ঘণ্টা', 'দোয়াতদানি' প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করেন তবে ইহারা মরিবে না, তিনি নিজেও উপকৃত হইবেন।

বাঁকুড়ায় আরও বহু কারুশিল্প আছে কিন্তু তাহার আলোচনা এখানে করা অনাবশ্যক, কারণ সেগুলি অন্যান্য জেলায়ও বর্ত্তমানে আছে এবং উহা কেবল বাঁকুড়ারই সমস্যা নহে। তবে যে তিনটি কারুশিল্পের কথা বর্ত্তমানে আলোচনা করিলাম তাহার মরণ-বাঁচন বাঁকুড়ার লোকের হাতে, কারণ তাহা প্রায় এক রকম বাঁকুড়ারই সম্পত্তি।

রাইকিশোরীর বটগাছ

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১

রসিক বৈরাগী তিন বৎসরের ছেলে রসরাজ ও স্ত্রী সৌদামিনীকে ছাড়িয়া এক দিন ওলাউঠায় ইহলোকের দেনাপাওনা মিটাইয়া চলিয়া গেল। তার পর পনর-ষোল বৎসর ধরিয়া সৌদামিনী অনেক দুঃখে কষ্টে রসরাজকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে রসরাজের বিবাহ হইল,—বৌয়ের নাম রাইকিশোরী—দিব্যি ফুটফুটে সুন্দর চেহারা, বৌ ঘরে তুলিয়া সৌদামিনী মৃত স্বামীর উদ্দেশে কিছুক্ষণ দুই চোখের জল ফেলিয়া পুনরায় গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

বছরখানেক এমনি করিয়া কাটিল। রসরাজ মাইল দুই দূরে শহরে মহাজনের গদিতে খাতা লিখিত, সারাদিন কাজকর্ম্ম করিত কিন্তু মন তাহার পড়িয়া থাকিত বাড়ীর পানে—কখন সন্ধ্যা হইবে আর বাড়ীতে আসিবে ছুটিয়া। পাড়ার লোকে ঠাট্টা তামাশা করিয়া বলিত—ছোঁড়ার একেবারে বউ-অন্ত প্রাণ।

কিন্তু এ সুখ বেশী দিন সহিল না—বৎসরখানেকের মধ্যে আর এক ওলাউঠার ধাক্কায় গ্রামের অর্দ্ধেক লোক শেষ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে গেল রাইকিশোরী। সৌদামিনী আর রসরাজ চেষ্টা যাহা কিছু করিবার সকলই করিল, কবিরাজ আসিল, বৈদ্য আসিল, এমন কি অনেক টাকা দর্শনী দিয়া শহর হইতে নূতন পাস-করা ডাক্তার পর্য্যন্ত আসিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাই-কিশোরী মরিয়াই গেল।

সৌদামিনী কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিল, কিন্তু রসরাজ একেবারে গুম্ হইয়া বসিয়াছিল—না ছিল তাহার চোখে জল, না করিতেছিল মুখ ফুটিয়া কোন হা-হুতাশ। বৈষ্ণবরা শ্মশানে লইয়া সমাধি দেয়—দাহ করে না। প্রতিবেশীরা যখন রাইকিশোরীকে বাঁধিয়া শ্মশানে লইবার উদ্যোগ করিতেছিল রসরাজ তখন যেন উঠিল সজাগ হইয়া, এতক্ষণ যেন তাহার বাহ্য জ্ঞানই ছিল না। রাই-কিশোরীকে সে শ্মশানে লইয়া যাইতে দিবে না, তাহার বাড়ীর পাশে পথের ধারে এক খণ্ড জমি ছিল—সে জেদ ধরিল সেইখানেই রাইকিশোরীর সমাধি দিতে হইবে।

কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া প্রতিবেশীরা অগত্যা তাহার কথাই মানিয়া লইল। রাইকিশোরীর যে কয়খানা সোনা-রূপার গহনা ছিল, ভাল ভাল কাপড় ছিল, সব তাহার সহিত দিয়া রসরাজ তাহাকে মাটি চাপা দিল।

রসরাজ মহাজনের গদির কাজ ছাড়িয়া দিল, সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝে মাঝে রাইকিশোরীর সমাধির কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিত। ছেলের ভাব দেখিয়া সৌদামিনীর বুক ফাটিয়া যাইত, কত বুঝাইত, কান্নাকাটি করিত, কিন্তু রসরাজ কিছুই বুঝিত না। মাস দুই পরে এক দিন পাঁজি খুলিয়া ভাল দিন দেখিয়া রসরাজ একটি বটগাছের চারা আনিয়া রাইকিশোরীর সমাধির উপরে পুঁতিয়া দিল। তার পর হইতে রসরাজের নিত্যকর্ম্ম হইল সেই চারাগাছটাকে দুই বেলা জল দেওয়া, গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ইত্যাদি। সৌদামিনী চেষ্টায় ছিলেন কেমন করিয়া আবার পুত্রকে ঘরবাসী করা যায়। মাঝে মাঝে দুই-একটি মেয়েরও সন্ধান লইতে লাগিলেন। কিন্তু রসরাজ সে কথা ত কানেই করিত না, বরং রাগিয়া চেঁচাইয়া একাকার করিয়া তুলিত।

ইহারই কয়েক মাস পরে মাত্র দুই-তিন দিনের জ্বরে সৌদামিনীর কাল হইল। কাজেই রসরাজের সকল বন্ধন গেল ঘুচিয়া। মা নাই যে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলে, পুনরায় সংসারী না হইতে চাহিলে কান্নাকাটি করিবে। সে বিষয়ে রসরাজ এখন একেবারে নিশ্চিন্ত। দিনে একবেলা দুটি সিদ্ধ করিয়া খাইত, তাহার পর সারাদিন যেখানে খুশি ঘুরিয়া বেড়াইত।

পৈতৃক কিছু খামার জমি ছিল তাহাতেই একটা পেটের খরচ চলিয়া যাইত। এমনি করিয়া বছর-দুয়েকের ভিতরে বিনা তত্ত্বাবধানে ঘর-দোর সব ভিটায় পড়িয়া পচিয়া গেল। রসরাজ সেদিকে তাকাইল না। সেই চারা বটগাছটির তলায় ছোট্ট একখানি খড়ের ঘর করিয়া লইল। তাহার খাওয়া থাকা প্রভৃতি সব কর্ম্ম সেই কুঁড়ে ঘরেই চলিতে লাগিল।

বটগাছের চারাটি ইহারই মধ্যে দিব্যি বাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার পরের প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাসে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। বটগাছটি এই দীর্ঘ সময়ের অবসরে শাখাপ্রশাখা মেলিয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। চারিদিক দিয়া অসংখ্য ঝুরি নামিয়াছে; রাখাল-বালকেরা গরু চরাইতে আসিয়া তাহারই তলায় খেলা করে, ঝুরিতে কাষ্ঠখণ্ড বাঁধিয়া দোলনা দোলে।

গ্রীষ্মকালে পথিকেরা দূর প্রান্তর হইতে গাছটিকে লক্ষ্য করিয়া ইহারই তলায় আসিয়া দু-দণ্ড বিশ্রাম করিয়া লয়। পাশেই গড়িয়াদহের জলায় যে পাহাড়িয়া পাখীর দল আহার-অন্বেষণে আসে, তাহারা সর্ব্বাগ্রে ইহারই মাথায় বসিয়া পথের ক্লান্তি দূর করিয়া লয়।

সত্তর বছরের বৃদ্ধ রসরাজ আজও বাঁচিয়া আছে। ছোট্ট কুটীরটি আজও সেইখানেই আছে। বছর-ত্রিশেক পূর্ব্বে একবার কিছু খরচ করিয়া সে গাছটির গোড়া বাঁধাইয়া লইয়াছিল। দিন রাত সে সেখানেই বসিয়া থাকে, গাছটির নাম দিয়াছে "রাইকিশোরীর বটগাছ," লোকের মুখে মুখে এই নামই প্রচলন হইয়া গিয়াছে। একবার বৈশাখের ঝড়ে গাছের একটি বড় ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—রসরাজ সে শোক সামলাইতে পারে নাই। কয়েক দিন ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিল। এ অঞ্চলে প্রচার হইয়া গিয়াছে রসরাজ সাধক—রসরাজ সিদ্ধপুরুষ।

এই গাছটিতে গভীর নিশীথে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। রসরাজের সহিত গাছটির গভীর নিশীথেই হয় বাক্যালাপ। প্রতি শনি মঙ্গল বারে এখানে আড়ং বসে। দূর গ্রামান্তর হইতে দুই-চারি জন করিয়া যাত্রীও আসিয়া থাকে। রোগীর দল আসিয়া রসরাজের চারি পাশে ঔষধের জন্য ভিড় করে, রসরাজ গাছের তলা হইতে মুঠি মুঠি ধূলি তুলিয়া দেয়, তাহাই ভক্তিভরে সকলে মাথায় তুলিয়া লয়। প্রায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ হইলেও রসরাজের শরীর এখনও অনেকটা দৃঢ় আছে, মাথা ভরিয়া দীর্ঘ জটা গজাইয়াছে। মুখে লম্বালম্বা দাড়ি গোঁফ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সাধুপুরুষের মতই দেখায় বটে।

২

সেদিন মঙ্গলবার শেষ বেলায় আড়ং-এর লোক জন প্রায় চলিয়া গিয়াছে। রসরাজ চাট্টি সিদ্ধ করিয়া লইয়া সারা দিনের মত আহারের যোগাড়ে যাইতেছিল। এমন সময় পঞ্চানন মণ্ডল আসিয়া খবর দিল—শুনেছ বাবাজী নতুন রেলগাড়ীর লাইন হচ্ছে? বড় লাইন থেকে বেরিয়ে একেবারে দক্ষিণ দেশে নাকি যাট-সত্তর মাইল চলে যাবে।

রসরাজ হাসিয়া বলিল, "কোম্পানীর অসাধ্যি কিছু নাই বুঝলে বাপু! ওরা হ'ল সব বিশ্বকর্ম্মার গোষ্ঠী। ইচ্ছে করলেই হ'ল।"—"হেসো না বাবাজী, শালকাটির সব লোক তো একেবারে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে, কত লোকজন সাহেব এসে লাইন দেগে আর খুঁটি পুঁতে এদিকে এগিয়ে আসছে। আজ এবেলা নাগাদ শালকাটির মাঠ পেরিয়ে

এল আর কি ? কারুর বসত-বাটী, কারুর বাগান পুষ্করিণী— সব লাইনে পড়ে গেছে। আমি দেখে এলাম যে সোজা আসছে, এমনি হ'লে তোমার আড়ং-এর খোলাট গাছ সব বেধে না যায়।"—"তুই বলিস কি পঞ্চানন—তাও কি কখনও হয়—এ যে দেবতার গাছ, আশপাশ দিয়ে দাগ কেটে যাবে।"

রসরাজ মুখে বলিল বটে, কিন্তু অবশিষ্ট বেলাটুকু এবং সারা রাত্রি সে শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল—তাই তো যদি এই সোজাই লাইন কাটিয়া আসে, তাহার গাছ যদি লাইনের মধ্যে পড়ে—সে ঠেকাইবে কেমন করিয়া? কোম্পানীর অসাধ্য কোন কাজই নাই। রসরাজের ভাল করিয়া আহার করা হইল না। রাত্রে শুইয়া শুইয়া শুধু এই কথাই তাহাকে পাইয়া বসিল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল—কাহারা যেন দলে দলে শাবল কুড়াল লইয়া তাহার গাছের গোড়ায় আঘাত করিতেছে। রসরাজ আতঙ্কে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দূর প্রান্তরের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল—কই কাহাকেও তো দেখা যায় না। রসরাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু সারা রাত্রের মধ্যে ঘুম আর তাহার হইল না।

দিন-দুয়েকের মধ্যে সত্যই রেল-কোম্পানীর লোক একেবারে সোজা রাইকিশোরীর বটগাছের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল, রসরাজ এ কয়দিন ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথা বলে নাই। আহার নিদ্রা ভুলিয়া বটগাছ-তলায় বসিয়া কেবল ভগবানকে ডাকিয়াছে।— হে ভগবান্ লাইন অন্য ধার দিয়া সরাইয়া দাও, আমার গাছটাকে রক্ষা কর।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেদিন বিকাল বেলা একেবারে বটগাছের গোড়ায় আসিয়া লাইনের খুঁটি পুঁতিয়া দিল। বটগাছ, রসরাজের ঘর, আড়ং-এর জায়গা সমস্তই একেবারে লাইনের মধ্যে গেল পড়িয়া। রসরাজ কাঁদিয়া দুই হাত জোর করিয়া এঞ্জিনীয়র সাহেবকে বলিয়াছিল—সাহেব আমার গাছটি বাঁচান।—এ দেবতার গাছ—সাহেব ধমক দিয়া বলিয়াছিল, যাও ভাগো।

সঙ্গের বাঙালী সাহেব বলিল—ভয় কি বুড়া, জমি গেলে জমির দাম পাবে, গাছ গেলে গাছের দাম পাবে।

রসরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দাম আমি চাই নে বাবু—ওখ'নে যে আমার পরিবারের সমাধি—তার উপর গাছ। সাহেব বলিলেন, কি আর করবো বল, উপায় নাই।

তাহার পর মাস-চারেক চলিয়া গেছে, রসরাজের আর সে মূর্ত্তি নাই, শুকাইয়া একেবারে আধখানা হইয়া গিয়াছে। আড়ং এখনও বসে, কিন্তু সে বড় একটা কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। গাছতলায় পোঁতা সেই খুঁটিটির দিকে যেই দৃষ্টি পড়ে, অমনি তাহার সারা অন্তর একেবারে শিহরিয়া উঠে। কত দিনে লাইন হইবে কে জানে—কেহ বলে পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে, কেহ বলে দুই-তিন বছরের মধ্যে, অবশেষে এক দিন খবর পাওয়া গেল দলে দলে কুলী লাইনের ভিতরের যত গাছ সব কাটিয়া সমস্ত জায়গা পরিষ্কার করিয়া আগাইয়া আসিতেছে।

সেদিন সারারাত্রি রসরাজ ঘুমাইতে পারে নাই, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামত আসিয়াছিল—হঠাৎ বাহিরে ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ শুনিয়া ঘরের বাহির হইয়া দেখে, দলে দলে লোক আসিয়া কোদাল কুড়াল লইয়া তাহারই গাছের গোড়া খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার জ্ঞান ছিল, তার পর চীৎকার করিয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কি হইয়াছে না হইয়াছে তাহার কোন খেয়ালই ছিল না। শেষবেলায় জ্ঞান হইলে দেখিল—সে পঞ্চানন মণ্ডলের বাড়ী শুইয়া আছে। পঞ্চানন কাছে আসিয়া বলিল—চুপ ক'রে শুয়ে থাক বাবাজী,আমি কবিরাজ ডেকে আনছি। জ্বর হয়েছে যে।

রসরাজ কিছুই না বলিয়া আচ্ছন্নের মত চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। পাঁচ-সাত দিন পরে যখন তাহার শরীর ভাল হইল, তখন রাইকিশোরীর বটগাছ আর দাঁড়াইয়া নাই। তাহার চারি পাশ খুঁড়িয়া শিকড় কাটিয়া একেবারে ভূমিতে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। রোগ হইতে উঠিয়া সেদিন ভোরবেলায় রসরাজ সেই ভূপাতিত বৃক্ষটির দিকে তাকাইয়াছিল। গোড়ার দিকের ক্ষতগুলি হইতে তাল তাল আঠা জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া আছে। রক্তের মত তাহার রং—রক্ত বই আর কি? এই তো সবে বৈশাখ মাস, নূতন পাতায় পাতায় সারাগাছ ভরিয়া গিয়াছিল—একটি পাতাও আজ আর বাঁচিয়া নাই—সবগুলি একেবারে কচি কচি ডাল সমেত শুকাইয়া গিয়াছে।

গাছটির একটি মোটা শাখা দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্নের মত রসরাজ কতক্ষণ পড়িয়া রহিল। একে একে তাহার পঞ্চাশ বছরের আগের কথা মনে পড়িতে লাগিল। রাইকিশোরীর মৃতদেহটাকে এখানে সমাধি দেওয়া—তার পর সেই শিশুগাছটিকে কত না যত্নে সে এখানে পুঁতিয়াছিল—একটি মানবশিশুর মতই না কত যত্নে, কত স্নেহে সে তাহাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

রাইকিশোরীর সমাধির উপরে—রাইকিশোরীর দেহরসকে নিজের দেহে গ্রহণ করিয়া এই গাছটি দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিয়াছে—তাইত রসরাজের সহিত তাহার সকল সম্পর্কের মূল কারণ, ইহাই ত তাহার নাড়ীর টানের সকল ইতিহাস। রাইকিশোরীর শোক সে ভুলিয়া গিয়াছিল—আজ পঞ্চাশ বছর পরে সেই শোক আবার তাহার নূতন করিয়া বিঁধিল, দুই চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

৩

তাহার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ রসরাজকে ইহার মধ্যে আর কেহ দেখে নাই। সে বাঁচিল কি মরিল কেহ খোঁজও লয় নাই। ইতিমধ্যে মাটি দিয়া খোয়া দিয়া তাহার উপরে কাঠের স্লিপার পাতিয়া রেলগাড়ীর রাস্তা তৈরি হইয়া গিয়াছে। আজ দুই-তিন দিন হইতে নূতন লাইনে যাত্রীগাড়ী চলাচল করিতেছে। এ অঞ্চলের লোকের সে এক বিস্ময়। তাহাদের গ্রামের উপর দিয়া বিল-বাদাড়ের উপরে রাস্তা গড়িয়া ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়া কলের গাড়ী অবাধে দৈত্যের মত গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। হয়ত কলিকাতা হইতে, বোম্বাই হইতে, দিল্লী হইতে কত না যাত্রী এই গাড়ীর ভিতরে বসিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে। চাষা লাঙ্গল থামাইয়া, পথিক থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ঝি বউ ঘরের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। গাড়ী হুস হুস করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ রাইকিশোরীর সেই বটগাছের কাছে সেদিন রসরাজকে দেখা গেল। চলন্ত গাড়ীর দিকে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সে চাহিয়া ছিল। চক্ষু দুইটি দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল। গাড়ী চলিয়া গেলে কতক্ষণ তেমনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনে মনে কি যেন সংকল্প আঁটিয়া সে সেখান হইতে লাইন ধরিয়া চলিতে লাগিল।

ইহার দিন দুই পরে গভীর নিশীথে একখানা কোদাল ও একখানা রেলের নাট্ খুলিবার "রেঞ্চ" লইয়া রাই-কিশোরীর বটগাছের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেষ রাত্রের দিকে একখানি গাড়ী কলিকাতার গাড়ীর যাত্রী লইয়া এই দিকে যাইবে। এই চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আর কোন গাড়ী নাই। সারা রাত্রি ধরিয়া অসীম পরিশ্রম করিয়া স্লিপার সরাইয়া লাইনের সংযোগ খুলিয়া রেল সরাইয়া ফেলিয়া রসরাজ দূরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিল। আর রাত্রি নাই—ভোরের গাড়ী আসিয়া পড়িল আর কি? কিছুক্ষণ পর একটা বিকট শব্দ হইল, তারপর লোক জনের হৈচৈ, আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। রসরাজ ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিলে সে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আগাইয়া গেল।

এঞ্জিনখানি রাস্তার খাদে গিয়া পড়িয়াছে। তাহার পরের তিন চারিখানি গাড়ী একেবারে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক, অন্যান্য গাড়ীর লোক সকলে মিলিয়া মানুষের দেহগুলা ভাঙা গাড়ীর স্তূপের নীচে হইতে টানিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে।

কাহারও হাত ভাঙিয়াছে, কাহারও পা ভাঙিয়াছে—আহতের আর্ত্তনাদে কান পাতা ভার। লাইনের ওপারের আমগাছতলায় সারি সারি দশ-বারটি মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। রসরাজ ইহারই মাঝে আসিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া আছে। চারি পাঁচ জনে একটি পনর-ষোল বছরের যুবতীর দেহ রসরাজের সম্মুখ দিয়া বহন করিয়া লইয়া গেল। একখানি তক্তা তাহার পেটের ভিতরে ঢুকিয়া ওপাশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মেয়েটি মরিয়া গিয়াছে। এতক্ষণে ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করা হইল।

একটি পাঁচ-সাত বছরের ছেলে মাথাটি তাহার ভাঙিয়া এমনই গুঁড়া হইয়াছে যে মোটেই আর চিনিবার উপায় নাই। রসরাজ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এই সব দেখিতেছিল। কিন্তু কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছিল না। কেমন করিয়া ইহা হইল? লাইন সে তুলিয়া ফেলিয়াছে—রাস্তা ভাঙিয়াছে—এমনি করিয়া গাড়ী ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাক তাহাও হয়ত চাহিয়াছে, কিন্তু এমনি করিয়া মানুষ যে মরিবে সে হিসাব ত করে নাই! একটি নয়—দুটি নয়—এতগুলি নরহত্যা করিয়া বসিল রসরাজ? তাহার মাথায় কিছুই ঢুকিতেছিল না, সম্পূর্ণ একটা জড়পিণ্ডের মত সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইতিমধ্যে এক রিলিফ ট্রেন করিয়া রেলের এক বড় সাহেব, ডাক্তার, নার্স সব আসিয়া পৌছিল।

সাহেব যখন রসরাজের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কি জানি রসরাজের খেয়াল হইল—তাঁহার দিকে আগাইয়া গিয়া দুই হাত তুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—ধরো সাহেব, ধরো—আমায় বেঁধে চালান দাও, নরহত্যা করেছি আমি—নরহত্যা!

সাহেব উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন।

সঙ্গের লোক বুঝাইয়া দিল লোকটির মাথা খারাপ। সাহেব নিজের কাজে মন দিলেন। তার পর দিন-দুইয়ের ভিতরে লাইন পরিষ্কার করিয়া পুনরায় ঠিকমত গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইল।

রসরাজ এ দুই দিন কেবল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠে, "ধর—আমায় বাঁধ—নরহত্যা করেছি আমি।" মাথা তার সত্যই খারাপ হইয়া গিয়াছে।

আজ তিন দিন, এ পর্য্যন্ত একটি দানাও তাহার পেটে যায় নাই। তাহার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইতেছিল—এখান হইতে পলাইয়া কোন দূর দেশে চলিয়া যায়। কিন্তু কোথায় যাইবে? কে আছে তাহার আত্মীয়? কে আছে বান্ধব? বারে বারে সেই দুর্ঘটনার স্থানের রেল-লাইন যেন তাহাকে টানিতে লাগিল।

বৈকাল হইতে এক গাছের নীচে সে শুইয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া স্থির করিল—না আর এ দেশে নয়—সে পলাইবে; আর এ দেশে মুখ দেখাইবে না। মাইল-খানেক চলিবার পর তার দেহ চলিল না, পথের পাশেই শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ এমনি কাটিবার পর আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এবার চলিতে লাগিল উন্টা দিকে। সেই রাইকিশোরীর বটগাছের কাছে রেলের লাইন দুর্নিবার আকর্ষণে যেন তাহাকে টানিতেছে।

সার্চ্চলাইটের আলো ফেলিয়া বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে ভোরের গাড়ী আসিয়া পড়িল। হঠাৎ এক লাফে লাইনের ভিতরে পড়িয়া রসরাজ বলিয়া উঠিল—আমায় ধর বাঁধ—আমি নরহত্যা করেছি, কিন্তু সব কথা আর বলা হইল না, ব্রেক কসিতে কসিতে এঞ্জিন একেবারে রসরাজের উপর আসিয়া পড়িল, তার পর গাড়ী থামাইয়া ড্রাইভার ও গার্ড মিলিয়া রসরাজের দেহটাকে চাকার নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, লাইনের এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া গাড়ী স্টেশনের দিকে ছুটাইয়া দিল।

"কাব্যবিচার"*

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় ইংরাজী ভাষায়, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিরাট ইতিবৃত্ত রচনায় আজীবন রত থাকিলেও তিনি কখনও বাঙ্গলা সাহিত্যকে, বাঙ্গলা পুস্তক-পাঠককে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার সংস্কৃত আলোচনা দর্শনশাস্ত্রে নিবদ্ধ নহে, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী। দর্শনশাস্ত্র অল্পাধিক পরিমাণে অনেকেই আলোচনা করেন, কিন্তু কতকগুলি শাস্ত্র, যেমন আয়ুর্ব্বেদ এবং অলঙ্কার, প্রাচীনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ভিন্ন, কেহই আলোচনা করেন না। প্রাচীন-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞেরা তাঁহাদের বিদ্যা অনভিজ্ঞ সমাজে প্রচার (popularise) করিতে অভ্যস্ত নহেন। আচার্য্য দাসগুপ্ত মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদ" লিখিয়া অ-বিশেষজ্ঞ সমাজের একটি অভাব পূরণ করিয়াছেন। "কাব্যবিচার" প্রকাশ করিয়া এই সমাজের আর একটি গুরুতর অভাব পূরণ করিয়াছেন। "কাব্যবিচারে"র বিচার করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। এই গ্রন্থ প্রচারের জন্য গ্রন্থকারের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ইহা পাঠ করিয়া আমরা যাহা শিখিতে পারিয়াছি তাহার কিছু পরিচয় দিব।

হিন্দু পণ্ডিতেরা ইহলোক এবং পরলোক এই দুই লোকের হিতের জন্যই কাব্য আলোচনা করেন বা করিতেন। ভামহ বলিয়াছেন—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥

সাধু বা ভাল কাব্যের চর্চ্চা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্বন্ধে এবং কলা বা শিল্প সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করে, এবং কীর্ত্তি এবং প্রীতিও দান করে।

যাহার চর্চ্চায় এত লাভ তাহা হিন্দু পণ্ডিতেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত চর্চ্চা করিতেন। ভাল করিয়া কাব্য আলোচনা করিতে গেলে তাহার স্বরূপ, তাহার দোষ গুণ রীতি ইত্যাদি জানা দরকার। এই সকল বিষয় আলোচনার জন্য অলঙ্কার শাস্ত্র সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সুতরাং কাব্যসেবকের অলঙ্কার শাস্ত্র চর্চ্চা অতি আবশ্যক। আচার্য্য দাসগুপ্তের পুস্তকের "শাস্ত্রধারা" অধ্যায়টি পাঠ করিলে মনে হয়, এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুরাতন সংস্কৃত কাব্য পাওয়া গিয়াছে, অলঙ্কারের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তার অপেক্ষা বেশি।

অলঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিলেই বহিরঙ্গের কথা স্মরণ হয়। অলঙ্কার শাস্ত্র কাব্যের বহিরঙ্গ লইয়াই বিব্রত, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে অন্ধ বা

* "কাব্যবিচার", শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত; কলিকাতা, মিত্র এবং ঘোষ প্রকাশিত।

উদাসীন, এইরূপ আশঙ্কায় এই দেশের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ তাহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না এবং তাহা লইয়া গৌরবও করেন না। আচার্য্য দাসগুপ্তের "কাব্যবিচার" পাঠ করিলে দেখা যায় এইরূপ সংস্কার ভুল। তিনি দেখাইয়াছেন, অনেক আলঙ্কারিক কাব্যের অলঙ্কার ভাগ কতক পরিমাণে উপেক্ষা করিয়া কাব্যের আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, এবং আধুনিক ইউরোপের সৌন্দর্য্যতত্ত্বশাস্ত্র বা aesthetics-এর এলাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। "কাব্যবিচারে"র শেষ ভাগে ভারতবর্ষে কাব্যবিচারের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থকার এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন -

"আমাদের দেশের আলঙ্কারিক কাব্য মীমাংসা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যদিও ভরত এবং ভামহ উভয়েই রসের কাব্যোপযোগিতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যদিও তাঁহারা উভয়েই, বিশেষতঃ ভামহ, কাব্যের চমৎকারিত্ব যে শব্দ, ছন্দ, অনুপ্রাস, ঔচিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি বহু ব্যাপারের সমাবেশের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ইহা বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কোনও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া কাব্যতত্ত্বের মূলসূত্র বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে দণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের দোষগুণরীতি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং বহিরঙ্গভাবে সাধুকাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর দিকে ভরতের টীকাকার ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক ও ভট্টনায়ক প্রভৃতি নাট্যে কি করিয়া রস প্রতীতি হয়, তাহা আলোচনা করিতে গিয়া মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া কবি ও পাঠক এবং দর্শকের কি করিয়া চিত্ত-বিনিময় হইতে পারে সে সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অভিনব গুপ্ত রসই কাব্য—এই কথা বলিয়া একটি সাধারণ মূলসূত্রের দ্বারা দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি কাব্যের সমস্ত বিবিধ অঙ্গকে এই রসের সূত্র দিয়াই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এদিকে ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধন কাব্যের শব্দ ও অর্থ কি উপায়ে কাব্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে তাহা আলোচনা করিতে গিয়া ধ্বনিবাদের স্থাপন করেন। এই ধ্বনিবাদের সহিত রসবাদের কোনও বিরোধ ছিল না, সেই জন্যই রসবাদটি ধ্বনিবাদের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ...পরবর্ত্তী মহিমভট্ট প্রভৃতি কোনও কোনও আলঙ্কারিক ধ্বনিবাদকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন...অভিনবের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে বক্রোক্তিজীবিতকার কুন্তকের যে একটি স্বতন্ত্রতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভামহ বক্রোক্তি স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু কুন্তক সেই বক্রোক্তিকে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ধ্বনিবাদ ও রসবাদ সমস্তই তাহার মধ্যে আসিয়া পড়ে।...পরবর্ত্তী কালে জগন্নাথ তাঁহার রসগঙ্গাধরে রস বা ধ্বনিকে প্রধান না করিয়া রমণীয়তাকে প্রধান বলিয়াছেন। এই রমণীয়তার মধ্যে রস এবং ধ্বনি উভয়ই পড়ে, কিন্তু রস ও ধ্বনির মধ্যে পড়িতে পারে না এমন যে সকল কাব্য আছে তাহাকেও গ্রহণ করা যায়। ... রসধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে ইহাই প্রধান অভিযোগ যে সকল প্রকার সাধু কাব্য রস ও ধ্বনির মাপকাঠির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু কুন্তক ও জগন্নাথ সৌন্দর্য্য বলিয়া আর একটি চিত্তভাবকে স্বীকার করায়, সকল প্রকার কাব্য সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভব হয়।" (২৬৯-২৭১ পৃঃ)।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে উল্লিখিত নানা প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ, কাব্যের চারুতার (aesthetic quality) নিদান বা আত্মা কোন্ পদার্থ তাহা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। আলঙ্কারিকেরা অনেক দিন হইতেই কাব্যের অলঙ্কারের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্য দাসগুপ্ত তাঁহার "কাব্য-বিচারে" অলঙ্কার শাস্ত্রের এই ভাগটি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা তাঁহার গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয় করিয়াছে। সর্ব্বপ্রথম "কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি"কার বামন প্রচার করিয়াছিলেন, রীতিই কাব্যের আত্মা বা প্রাণবস্তু (২০ পৃঃ)। রীতি শব্দের অর্থ লেখার ভঙ্গী। বামন গৌড়ী, বৈদর্ভী এবং পাঞ্চালী এই তিনটি রীতি স্বীকার করিয়াছেন। মাধুর্য্য (মধুর-বর্ণ-বিন্যাস) গুণ বৈদর্ভী রীতির প্রকাশক। অল্প সমাস-বদ্ধ বা সমাসবর্জ্জিত পদবিশিষ্ট রচনা মধুর হয়। "কোমল বর্ণের অর্থাৎ ল ব স র প্রভৃতির প্রয়োগে পাঞ্চালী রীতি প্রকাশ পায়।" বাক্যে সংযুক্ত বর্ণ এবং সমাসবহুল পদ থাকিলে ওজোগুণ হয়। তাহাই গৌড়ী রীতির প্রকাশক। অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা রীতির এই সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। "বামনের তিনটি রীতির সহিত রুদ্রট লাটী বলিয়া আরেকটি উল্লেখ করেন। অগ্নিপুরাণেও এই চারিটি রীতির উল্লেখ আছে। ভোজ ইহার সহিত মাগধী ও আবন্তিকা বলিয়া আরো দুইটি রীতির উল্লেখ করেন। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট পাঞ্চালী ও লাটী এই দুই রীতি স্বীকার করেন। তরুণ বাগ্‌ভট বামনোক্ত তিনটি রীতিই স্বীকার করেন।" (৫৫ পৃঃ)।

রীতির নামকরণ সম্বন্ধে আমরা একটি অতিরিক্ত কথা বলিব। গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী প্রভৃতি দেশের নামানুসারে কাব্যরীতির নামকরণ আশ্চর্য্যজনক। একই দেশে বিভিন্ন রীতিতে কাব্যরচনাকারী কবি অহরহঃ দেখা যায়। সুতরাং দেশভেদে কাব্যরীতিভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? অথচ আলঙ্কারিকেরা বরাবরই তাহা করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সময় সম্বন্ধে আচার্য্য দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন, দণ্ডী সম্ভবতঃ বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং দণ্ডী এবং ভামহের মধ্যে তুলনা করিলে ভামহকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। রীতি সম্বন্ধে বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণের উক্তি আলোচনা করিয়া দেখা যাক এইরূপ নামকরণের মূল পাওয়া যায় কি না। আচার্য্য দাসগুপ্ত ভামহের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> গৌড়ীয়মিদমেতত্তু বৈদর্ভমিতি কিং পৃথক্।
> গতানুগতিকন্যায়ান্নানাখ্যেয়ম মেধসাম্ ॥

গৌড়ীয় রীতি এবং বৈদর্ভী রীতিতে তফাৎ কি? মূর্খেরা গতানুগতিক ভাবে এই প্রকার বিভিন্ন আখ্যা দান করে।

এই শ্লোক পাঠ করিলে মনে হয় ভামহ গৌড়ী, বৈদর্ভী আদি কাব্য রীতির ভৌগোলিক নাম নিরর্থক মনে করিতেন। দণ্ডী "কাব্যাদর্শে" বৈদর্ভী এবং গৌড়ী রীতি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন -

> অস্ত্যনেক গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।
> তত্র বৈদর্ভী গৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ ॥
> শ্লেষঃ প্রসাদ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
> অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তি সমাধয়ঃ ॥
> ইতিবৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।
> এষাং বিপর্য্যয়ঃ প্রায়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্মনি ॥
>
> (৪০-৪২)

"পরস্পরের সহিত অতি অল্প প্রভেদ বিশিষ্ট অনেক পদবিন্যাস প্রণালী বা রীতি আছে। তন্মধ্যে বৈদর্ভী এবং গৌড়ীয় প্রভেদ আছে। সুতরাং পৃথক্ ভাবে তাহাদের নিরূপণ করা যাইতেছে। শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা,

মাধুর্য্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি, সমাধি এই দশটি গুণ বৈদর্ভী রীতির প্রাণ। গৌড়ী রীতিতে এই সকল গুণের একান্ত অভাব বা আংশিক অভাব দেখা যায়।"

শ্লেষাদি গুণবাচক শব্দের অর্থের জন্য "কাব্যবিচার", ৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গুণের অভাব বিদর্ভ দেশের কবির কাব্যে থাকাও সম্ভব ছিল। সুতরাং দণ্ডীর বিবরণ হইতে কাব্যরীতির ভৌগোলিক নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু বাণভট্টের "হর্ষচরিতে"র গোড়ায় কাব্য প্রসঙ্গে একটি শ্লোক আছে যাহা হইতে কাব্যরীতির ভৌগোলিক নামের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। শ্লোকটি এই—

শ্লেষ প্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম্।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরড়ম্বরঃ॥

"উত্তর দেশে শ্লেষ বা নানার্থ যুক্ত শব্দসম্বলিত কবিতার আদর বেশি। পশ্চিম দেশে মাত্র অর্থ আদৃত হয়। দাক্ষিণাত্যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের আদর। গৌড়ে আদর শব্দাড়ম্বরের।"

যে দেশের পাঠক যেরূপ রচনার আদর করেন সেই দেশের কবিগণ স্বভাবতঃ সেইরূপ রীতির কাব্য রচনা করিতে বাধ্য হয়েন। এই প্রকারে দেশভেদে কাব্যরীতিভেদ উৎপন্ন হইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে বাণভট্ট "হর্ষচরিত" রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বযুগ, খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দী, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের অভ্যুদয়ের যুগ। এই যুগে হয়ত বাণভট্টের বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের কাব্যরুচি বিভিন্ন দেশে প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং তাহার ফলে আলঙ্কারিকেরা আদৌ কাব্যরীতির নামকরণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিক যাঁহারা রীতির ভৌগোলিক সংজ্ঞার সার্থকতা আরোপ করেন নাই, তাঁহারা হয়ত বাণের পরবর্ত্তী কালের লোক।

রীতি কাব্যের পদসংঘটনা মাত্র। সুতরাং "রীতি কাব্যের আত্মা" বামনের এই মত অন্যান্য অনেক আলঙ্কারিক স্বীকার করিতে পারেন নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণের মধ্যে যাঁহারা poetry for poetry's sake (পদ্যের জন্যই পদ্য রচনা, পদ্যে পদযোজনাই মুখ্য, পদের অর্থ গৌণ বস্তু) এই মত পোষণ করেন, বামনের মত কতকটা তাঁহাদের মতের অনুরূপ। কাব্যের আত্মার অনুসন্ধানে আর এক ধাপ উঠিয়াছেন ভামহ। উক্তি দুই প্রকার, সহজ বা স্বাভাবিক এবং বক্র (বাঁকা)। ভামহ বলেন স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নয়, সুতরাং কাব্য নয়। "বক্রোক্তি সমস্ত অলঙ্কারের মূল এবং বক্রোক্তি ছাড়া কাব্য হয় না। যতদূর বুঝা যায়, বক্রোক্তি শব্দের দ্বারা তিনি (ভামহ) বলিবার ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ইহাই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার বা কাব্য বলিয়া মানেন নাই।" (৬০ পৃঃ)। ভামহ অন্যান্য অনেক আলঙ্কারিকের মত বক্রোক্তিকে একটি শব্দালঙ্কার মাত্র মনে করেন নাই, সকল অলঙ্কারের ভিত্তি স্বীকার করিয়াছেন। "সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তির প্রকার মাত্র।"

"বক্রোক্তিজীবিত"কার কুন্তক বক্রোক্তি শব্দটি আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং শব্দের বৈচিত্র্যের সহিত অর্থের বৈচিত্র্যও জড়াইয়াছেন। "কুন্তক এই প্রসঙ্গে বলেন যে শব্দ ও অর্থের যে বিশেষ অলঙ্কৃতি বা বৈচিত্র্য প্রযুক্ত তাহা আপনাকে কাব্যরূপে প্রকাশ করিতে পারে, এবং সুন্দর বলিয়া সহৃদয় সমাজে সমাদৃত হইতে পারে তাহাকেই তিনি বক্রতা এই আখ্যা দিয়াছেন। আমরা আধুনিক কালে যাহাকে aesthetic quality বলি সম্ভবতঃ কুন্তক বক্রতা শব্দে তাহারই সূচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন" (৭২ পৃঃ)। কাব্য এক প্রকার কলা, চারুকলা। কাব্যকলার চারুতা বা aesthetic quality কাব্যের প্রাণ বা আত্মা। কুন্তক সূক্ষ্মদর্শী কাব্যবিচারক। তিনি শব্দের এবং অর্থের বক্রতাকে কাব্যের প্রাণ অথবা আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলেও চারুতার অন্যান্য দিক উপেক্ষা করেন নাই। "কুন্তক রসকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু রসকে বক্রতারই প্রকারভেদ বলিয়া মানিয়াছেন।" আর এক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আলঙ্কারিক অজ্ঞাতনামা ধ্বনি-মত-স্থাপক কারিকাকার বা ধ্বনিকার এবং এই সকল কারিকার বৃত্তি লেখক আনন্দবর্দ্ধন। ধ্বনি শব্দের অর্থ, কবিতার সহজ অর্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গার্থ বা ইঙ্গিতে সূচিত অর্থ। ধ্বনিকার "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ" "ধ্বনি কাব্যের আত্মা" এইরূপ অভিমত স্থাপন করিয়াছেন। কুন্তকের মতে ধ্বনি বক্রোক্তির অন্তর্ভূত।

কুন্তক সূক্ষ্মভাবে কাব্যকলার চারুতার বিশ্লেষণ করিলেও তাহার মত সমাদর লাভ করে নাই। ইহার কারণ, অধিকাংশ আলঙ্কারিকই কাব্য-কলার চারুতার অঙ্গনিচয়ের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়াছেন রসকে। আচার্য্য দাসগুপ্ত তাঁহার "কাব্যবিচারে" রস ও কাব্য প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃতভাবে (৮৭-১১৬ পৃঃ) আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সাধারণ অর্থে রস শব্দে স্বাদ, পারিভাষিক অর্থে রস শব্দে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বুঝায়" (৮৮ পৃঃ)। এই সকল চিত্তবৃত্তি emotion, feeling অর্থাৎ ভাবোচ্ছ্বাসশ্রেণীভুক্ত। রস অর্থে সাধারণ emotion (ভাবোচ্ছ্বাস) বুঝায় না। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত emotion বা ভাবকেই রস কহে" (৯২ পৃঃ)। অভিব্যক্ত অর্থ উদ্বুদ্ধ। "রস সম্বন্ধে আলোচনার প্রধান প্রশ্ন এই যে, শিল্পগত কারণে কেমন করিয়া উহা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে।" অর্থাৎ কাব্যের বাক্যার্থ অথবা নাটকের অভিনয় কেমন করিয়া পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের মনকে রসে সিক্ত করে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া আলঙ্কারিকেরা যে বিপুল তর্ক করিয়াছেন তাহার ভিত্তি ভরতের নাট্যসূত্রের এই সূত্র—

বিভাবানুভাব ব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"

"বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের উৎপত্তি।"

বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন এবং উদ্দীপন। যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রস উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে বস্তুর সংসর্গ রস উৎপাদন করে তাহা আলম্বন বিভাব। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা রসোৎপত্তির অনুকূল হয় তাহা উদ্দীপন বিভাব। শরীরের যে চেষ্টার বা ক্রিয়ার দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশিত হয় তাহা অনুভাব। মনে কোনও গুরুতর ভাব বা রস উদ্দীপিত হইলে যে সকল ছোট ছোট আনুষঙ্গিক ভাব উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব কহে। মনোরাজ্যে বা কল্পনা রাজ্যে এই ত্রয়ীর কাব্যপাঠ বা নাট্যাভিনয়দর্শনজনিত সংযোগ মনের মধ্যে কাব্যরস বা নাট্যরস উদ্বুদ্ধ করে। এই উদ্বোধন ব্যাপার কি প্রকারে ঘটে তাহাই আলঙ্কারিকগণের তর্কের বিষয়। আচার্য্য দাসগুপ্ত এই সম্বন্ধে বিভিন্ন আলঙ্কারিকের মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার "কাব্যবিচার" গ্রন্থের এই অধ্যায়টি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান।

আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে এই কাব্যরস প্রসঙ্গ পরিষ্কার বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের সহিত ইহা তুলনায় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্বর্ত্তী রসতত্ত্ব যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে পাশ্চাত্য জগতে তাহার নাম Aesthetics। রস একটি নিরাকার সূক্ষ্ম বস্তু, সুতরাং এই সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় আলঙ্কারিকগণের মধ্যে যেরূপ মতভেদ, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও তেমনি মতভেদ দেখা যায়। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্য মতবাদী, ক্রোচের (Benedetto Croce) মতের সহিত আমাদের আলঙ্কারিকদিগের

মতের তুলনা করিব।* ক্রোচে বলেন, একটি ভাল কবিতা পাঠ করিলে তাহার মধ্যে আমরা দুইটি পদার্থের মিলন দেখিতে পাই। তন্মধ্যে একটি পদার্থ কল্পিত বিম্ব বা চিত্র (images), এবং আর একটি বিম্বের অন্তর্নিহিত সঞ্জীবনী রস (feelings)। ক্রোচের images ভরতের নাট্যসূত্রের বিভাবের স্থলবর্ত্তী। ক্রোচের feeling সাধারণ ভাব নহে, contemplation of feeling, ভাবের ধ্যান জ্ঞান, lyrical intuition অথবা pure intuition, সরস অথবা বিশুদ্ধ সহজ জ্ঞান। অভিনব গুপ্তের মতের প্রসঙ্গে আচার্য্য দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন, "এই ভাবকে একদিকে যেমন emotion বলা যায়, অপর দিকে তেমন সংবিদ্ বা জ্ঞানও বলা যায়। কারণ, জ্ঞানরূপেই ইহার আবির্ভাব এবং জ্ঞানরূপেই ইহার লয়।" (১২৯ পৃঃ)। পুনরায়, "রসের মধ্যেও যে একটি জ্ঞানস্বরূপতা বিরাজ করে এবং জ্ঞানস্বরূপতার মধ্যেও যে রস বিরাজ করে ইহা অভিনব অতি সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন। (১৩৪ পৃঃ।)

কাব্যগত রস কি প্রকারে পাঠকের বা শ্রোতার প্রাণে রস উদ্বুদ্ধ করে এই সম্বন্ধে অভিনব গুপ্তের মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্য দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন, "এই প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্ত স্বকীয় মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, কাব্যাত্মক শব্দ হইতে কাব্যজ্ঞের চিত্তে কাব্যার্থাতিরিক্ত নূতন নূতন কিছু প্রতিভাত হয়। কাব্যের শব্দার্থবোধের পর এমন একটি মানস সাক্ষাৎকার ঘটে যাহার ফলে বর্ণিত বিষয়ের দেশকালাদি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া একটি সাধারণ প্রতীতি জন্মে।" (১১০ পৃঃ)

দেশ-কাল-নিরপেক্ষ প্রতীতি বা ভাবকে বলা হয় সাধারণীকৃত প্রতীতি। এই প্রতীতির রসে পরিণতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"এই জন্যই কাব্যজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই ভয়াদি যে সমস্ত ভাব কাব্যার্থ হইতে উপস্থিত হয়, তাহা এক জাতীয় সর্ব্বসাধারণ প্রতীতি। আমাদের সকলের চিত্তের মধ্যেই প্রসুপ্তভাবে অনাদিকাল হইতে নানাজাতীয় ভোগানুভূতি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণীকৃত ভয়াদি ভাব চিত্তের মধ্যে উপস্থাপিত হইলে অনাদিকালসঞ্চিত কোন না কোন ভোগবাসনার সহিত যে পরিচয় ঘটে তাহার ফলেই সেই সাধারণীকৃত ভয়াদি ভাব রসরূপে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।" (১১১ পৃঃ)।

এখানে বলা হইয়াছে, কাব্যগত রস পাঠকের মনে সাধারণীকৃত ভাবরূপে প্রবেশ করে এবং প্রসুপ্ত অনাদিকাল সঞ্চিত বাসনার বা স্থায়ী ভাবের সহায়তায় রসের আকার ধারণ করিয়া মনকে সিক্ত করে। এই রস বা হৃদগত ভাব ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক রহিত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ। মানবের মনের উপর কাব্যরসের প্রভাব কবির সৃষ্ট কল্পনারাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, মানবমনকে আরও দূরে লইয়া যায়। আচার্য্য দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"অভিনব যদিও কাব্যার্থকে রস বলিয়াছেন এবং কাব্যের একান্ত তাৎপর্য্য রসের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন তথাপি এই রসের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের যে একটি অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে এবং কবি যে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব ভুবনের সত্যকে নিত্য নবোন্মেষিণী বুদ্ধির দ্বারা রসসিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির ন্যায় চরমানন্দ লাভ করেন তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।" (১৩৪ পৃঃ)।

*Croce, article "Aesthetics," Encyclopaedia Britannica, 14th edition.

অভিনব গুপ্ত "রস কাব্যের আত্মা" এই মতের প্রবর্ত্তক। এই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান অনুবর্ত্তী "সাহিত্যদর্পণ"কার বিশ্বনাথ কবিরাজ। বিশ্বনাথের কাব্যের সংজ্ঞা, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং", বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিশ্বনাথের রসের স্বরূপ এবং রসাস্বাদনের প্রকারবর্ণনা অতি সুন্দর। আমরা প্রথমতঃ তাহার মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিব—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥

আচার্য্য দাসগুপ্তের ব্যাখ্যা—"বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে বলিয়াছেন যে, যখন রজঃ ও তমঃ গুণ তিরোহিত হয় এবং সত্ত্ব গুণ উদ্রিক্ত হয় তখন হৃদয়ের চমৎকারিতা রূপ যে বিস্তার ঘটে তাহার ফলে কোন কোন প্রাক্তন পুণ্যশালীরা স্বপ্রকাশ, চিন্ময়, অখণ্ড, অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কবিহীন লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মাস্বাদতুল্য রসকে নিজের সহিত অভিন্ন ভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই সময়ে মন রজঃ ও তমঃ দ্বারা আক্রান্ত থাকে না এবং সেই জন্য স্বকীয় সত্ত্বস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে" (১৪২ পৃঃ)।

বিশ্বনাথের রসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদসহোদর—এই উক্তি হেগেলের the beautiful is the manifestation of Idea স্মরণ করাইয়া দেয়। হেগেলের আইডিয়া (Idea) ব্রহ্মস্বরূপ এবং সৌন্দর্য্য তাহারই অভিব্যক্তি। বিশ্বনাথ যেমন কাব্যরসকে সত্ত্ব গুণের উদ্রেককারক এবং রজঃ তমোগুণের দমনকারক বলেন, তেমন কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকও কাব্যের সৌন্দর্য্যকে সত্ত্বগুণের (goodness) এবং সত্যের (truth) সহিত অভিন্ন মনে করেন (Beauty again merges in to the Good and the True)।*

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সৌন্দর্য্যকে (beauty) শিল্পের বা কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। আমাদের আলঙ্কারিকদিগের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র "রসগঙ্গাধর"-রচয়িতা জগন্নাথ অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"জগন্নাথ পণ্ডিত তাঁহার রসগঙ্গাধর গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক শব্দকে কাব্য বলে। রমণীয়তা অর্থ লোকোত্তরাহ্লাদজনক জ্ঞানগোচরতা। লোকোত্তর শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জগন্নাথ বলিয়াছেন যে, যে জাতীয় আহ্লাদের মধ্যে একটা বিশেষ চমৎকারিত্ব থাকে, যাহা কেবল মাত্র রসজ্ঞের অনুভবের দ্বারা অনুভূত হয় এবং যাহাকে অপর সকল প্রকার আহ্লাদ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করা যায়। এই জন্য এই চমৎকারিত্বকে তিনি একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়াছেন।...জগন্নাথের মতে চমৎকারিত্ববত্ত্বই কাব্যত্ব। চমৎকার শব্দে জগন্নাথ আহ্লাদ বা আনন্দমাত্র বোঝেন না; কিন্তু কাব্যের আহ্লাদে যে একটি সৌন্দর্য্যরূপ বাসনার সহিত স্ফুট চিত্তের মিলনজনিত এবং দুর্ব্যাখ্যেয় অনুভূতি আছে তাহাকেই তিনি চমৎকার শব্দের দ্বারা লক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন (১৫৮-১৫৯ পৃঃ)।

কি যুক্তি অনুসারে যে জগন্নাথ কাব্যের আত্মা রস এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আচার্য্য দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"সাহিত্যদর্পণকার যে বলিয়াছেন যে, রসাত্মক বাক্যই কাব্য তাহাও ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে বস্তু বা অলঙ্কারপ্রধান কাব্যকে

* Art সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতের জন্য Tolstoy-এর *What is Art*, chapter III দ্রষ্টব্য।

কাব্য বলা চলে না এবং নানাবিধ স্বভাববর্ণনাত্মক কাব্যকেও কাব্য বলা যায় না। কারণ বর্ণনাস্থলে শৃঙ্গার বীর করুণাদি রসের আভাস পাওয়া যায় না। যদি বলা যায় যে, সে স্থলেও কোন প্রকারের রস হয় তবে সকল বাক্যেরই রস হয় ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বাক্য মাত্রেই কোন না কোন প্রকার বিভাব অনুভাবাদি প্রকাশ করিয়া থাকে" (১৬০ পৃঃ)। আর এক স্থলে আচার্য্য দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন, "এই সব স্থলে জগন্নাথ বলিয়াছেন, এরূপ দূরবর্ত্তীভাবে রসকে টানিবার কোনও প্রয়োজন নাই, চমৎকৃতি বা রমণীয়কত্ব থাকিলেও কাব্যত্ব হয়" (১৮৮ পৃঃ)।

সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় কাব্যের রস এবং কাব্যের সৌন্দর্য্য একই পদার্থ। সৌন্দর্য্য বলিলেই আমাদের মনে হয় চক্ষুর তৃপ্তিকর আকৃতি। কিন্তু চারুকলার চারুতাব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য অতীন্দ্রিয় বস্তু। উপরে উদ্ধৃত জগন্নাথের মতের ব্যাখ্যা হইতে দেখা যাইবে, তিনি ইঙ্গিতে বলিয়াছেন চমৎকারিত্বই রমণীয়তার প্রাণ। উপরে উদ্ধৃত "সাহিত্যদর্পণের" কারিকায় এই পংক্তিটি আছে—

লোকোত্তর চমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ

"অনেক প্রমাণকর্ত্তা (প্রামাণিক গ্রন্থকার) বলেন, রসের প্রাণ অলৌকিক চমৎকার।"

বিশ্বনাথ এবং আচার্য্য দাসগুপ্ত ধর্ম্মদত্ত নামক আলঙ্কারিকের গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহকৃতী-নারায়ণো রসম্।

"রসের সারভূত চমৎকার সকল রসের মধ্যেই অনুভব করা যায়। যেহেতু চমৎকার রসের সার, সুতরাং সর্ব্বত্রই অদ্ভুত রস বর্ত্তমান। এই নিমিত্ত পণ্ডিত নারায়ণ একমাত্র অদ্ভুত রসই স্বীকার করিয়াছেন।"

ইংরাজ চিত্র-সমালোচক বেল (Clive Bell) সাহেব বলিয়াছেন, চিত্রের সৌন্দর্য্য রসিকের চিত্তে প্রথম উৎপাদন করে pure aesthetic thrill, বিশুদ্ধ চমৎকৃতি বা বিস্ময়, এবং এই বিস্ময় উৎপাদন করে aesthetic mood, আনন্দ।* বিশ্বনাথ রসবিচারে এবং জগন্নাথ রমণীয়তা বিচারে মূলতঃ অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রণীত "কাব্যবিচার" যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি, ততটুকু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম। উপসংহারে বক্তব্য এই, এই গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বাঙ্গলা বিভাগে কাব্যবিচার শাস্ত্রের পঠনপাঠন প্রচলিত করা উচিত। ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে নব্যন্যায়ের শুষ্ক বিচার লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, ইহা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার। মস্তিষ্কের অপব্যবহার অপেক্ষা অব্যবহার বোধ হয় অধিকতর অনিষ্টকারক। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগে মস্তিষ্কের অব্যবহারের দিকেই লোকের বেশি ঝোঁক দেখা যায়। কাব্যচর্চ্চা আর্থিক হিসাবে লাভজনক না হইলেও বাঙ্গালী তাহা ছাড়িতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ হইলে কাব্যানুশীলন অধিকতর উপকারক হইবে।

* "Works of art, it seems, are charged with the power of (*a*) giving thrill, (*b*) inducing and sustaining a pleasurable state of mind." Clive Bell, *Enjoying Pictures*, London, 1934, p. 15.

বাঘসিং

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী, এম্. এ.

লম্বা পিয়াল গাছটার ভিতর দিয়া বিকেলের রোদ টেরচা হইয়া পড়িয়া ঝরা পাতার ওপর লম্বা লম্বা ছায়ায় ডোরা কাটিয়া দিয়াছে,—মাথার ওপর এক পাল বাঁদরের কিচিমিচিতে ঘুম ভাঙিয়া গিয়া বাঘসিং একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিল। চার-পাঁচ হাত দূরে লম্বা হইয়া শুইয়াছিল পত্নী ডোরী;—বাঘসিং একটু বাঁকা বাঘা-হাসি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া প্রকাণ্ড থাবায় গোঁফে তা দিল! ডোরীর মেজাজ ভাল ছিল না, সে মুখ খিঁচাইয়া গোঙ্রাইয়া উঠিল!

বাঘসিং ঝুনো জানোয়ার, ডোরীর এই বদমেজাজের কারণ তার অজানা নাই। ডোরী তার তৃতীয় পক্ষ মাত্র হইলেও অপর দুই পক্ষ পর পর প্রায় চারি বৎসর বাঘসিঙের ঘর করিয়াছে, সুতরাং মেয়েদের হঠাৎ খারাপ মেজাজের কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন বাঘসিঙের বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে।

ঘড় ঘড় করিয়া গত রাত্রের গুরু ভোজনের দুর্গন্ধ ঢেঁকুর তুলিয়া বাঘসিং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; শরীরটা একটা লম্বা টানা দিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া মুখ তুলিয়া বানরগুলির দিকে চাহিল। এই জানোয়ারগুলিকে বাঘসিং আদৌ দেখিতে পারে না। শিকার হিসাবে এগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ, কিন্তু বাঘসিংকে দেখিলেই এরা দল বাঁধিয়া এমন চেঁচামেচি সুরু করিবে যাহাতে দুই মাইলের

মধ্যে আর কোন জানোয়ার তিষ্ঠিতে না পারে। তাও শুধু এক জায়গায় থাকিয়া চীৎকার করিলেও যা হোক বাঘসিঙের কাজ চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু এরা বাঘসিং যেদিকেই যাক্ না কেন মাথার ওপর দিয়া চীৎকার করিতে করিতে ডালে ডালে ছুটিবে যেন বনের ত্রিসীমানায় আর কোন শিকার না থাকে।

আর শুধু বাঁদর কেন, কেই বা বাঘসিংদের বন্ধু বল? ফেউগুলি ত যেদিকে বাঘসিং যাইবে, পিছনে চীৎকার করিতে করিতে দেশ মাথায় করিয়া ছুটিবে, অথচ বাঘসিং শিকার করিলে তার ভাগ নিতে কসুর নাই। এই সব ছোটলোক জানোয়ারই বাঘসিঙের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ভগবান্ বাঘেশ্বর যে কেন এই সব জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই জানেন।

বাঘসিংকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ডোরীও উঠিয়া পড়িল, তার পর স্বামী স্ত্রী প্রায় পাশাপাশি লক্ষ বছরের পুরানো বনের স্যাঁতসেঁতে ছায়ায় হেলিয়া দুলিয়া চলিল।

হঠাৎ বাঘসিং ঘোঁৎ করিয়া গর্জ্জন করিয়া লাফাইয়া উঠিল, ডোরী আঁউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া বাঁদিকে সরিয়া গেল,—তাদের সম্মুখের শতাব্দীর শুক্‌না পাতার মধ্য দিয়া গড় গড় শব্দ করিতে করিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া এক ঝলক কালো বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল একটা শঙ্খচূড় সাপ!

এই জানোয়ারটাকে বাঘসিং ভয় করে। এর না আছে মেজাজের ঠিক্,—না গতির। অথচ এর মধ্যে এমন একটা কি আছে যাতে এর সাম্‌নে পড়িলেই এমন কি বাঘসিঙের পর্য্যন্ত সারাদেহে ভয়ের শিহরণ খেলিয়া যায়! বাঘসিং জানে ইহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে তার এক মুহূর্ত্তও লাগিবে না—কিন্তু যেখানে হত্যা করিয়াও আত্মরক্ষা করা যাইবে না বলিয়া বাঘসিং জানে, সেখানে কাপুরুষ সাজিতে বাঘসিং ভয় করে না! সুতরাং ইহাকে দেখিলেই বাঘসিং আঁৎকাইয়া উঠিয়া পলাইবার পথ খোঁজে!

বানরগুলি তখনও বাঘসিঙের মাথার উপর দিয়া ডালে ডালে লাফাইয়া ছুটিতেছিল, রক্তচক্ষু মেলিয়া সেগুলির দিকে চাহিয়া বাঘসিং একটা ভ্রূকুটি করিল। দুই-একটা ছোক্‌রা বাঁদর মুখ ভেংচাইতে ভেংচাইতে সাহস করিয়া নীচু ডালে নামিয়া আসিয়াছিল, ভয়ে চীৎকার করিয়া এ ওর গায়ে ধাক্কা লাগিয়া একটা পুঁচকে বাঁদর মাটিতে পড়িয়া গেল! কিচ্‌মিচ করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া সেটা আর একটা গাছের একেবারে মগডালে চড়িয়া বসিল। বাঘসিং দেখিল ডালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাঁদরটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! বাঘসিং একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিল।

ডোরী ততক্ষণ অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে মাটিতে নাক গুঁজিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। বাঘসিং একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসিল, এই সময়টাতে বাঘিনীরা একটু অতিসতর্ক হইয়া উঠেই!

কয়েক মাস আগের দৃশ্যগুলি আবছায়ার মত বাঘসিঙের মনে পড়িল। ডোরীর ভাই ডোরার সঙ্গে এই ডোরীকে লইয়াই কি যুদ্ধ! ছোক্‌রা লড়িয়াছিল কিন্তু খুব! বাঘসিং একটু চিন্তিতই হইয়া উঠিয়াছিল। হাজার হইলেও তার একটু বয়স হইয়াছে। কিন্তু বাঘসিঙের প্যাঁচের কাছে ওসব ছেলেছোক্‌রা টিকিবে কি করিয়া, সুতরাং দুই দিন ক্রমাগত লড়িয়া ডোরা জঙ্গল ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। তার পরের কয়েকটা দিন ডোরীর সঙ্গে কি পাগ্‌লামি! বাঘসিং একটু লজ্জার হাসি হাসিল।

ডোরী এখনও একেবারে ছেলেমানুষ! পেটে বাচ্চা নড়িয়া উঠিতে প্রথম ওর কি ভয়! চম্‌কাইয়া একেবারে বাঘসিঙের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া জড়সড় হইয়া থাকিত! মাঝে মাঝে অদ্ভুত বিস্ময়ভরা চোখে বাঘসিঙের দিকে চাহিত যেন তার ভিতরকার এই রহস্যের সঙ্গে বাঘসিঙের সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিত। এখন মোটা-মুটি এক রকম ব্যাপারটা টের পাইয়া গিয়াছে আর সারা জঙ্গলটাই তার পেটের বাচ্চার শত্রু কল্পনা করিয়া খালি দাঁত খিঁচাইতে আরম্ভ করিয়াছে! আর কিছু দিন পরেই বাঘসিঙের নিকট হইতেও পলাইবে! হউক গে,—বাঘসিঙের ও আর ভাল লাগে না। কিছু দিন সে একলা একলা ঘুরিবে। ডোরীও আর আগের মত ছুটিতে লাফাইতে পারে না, ওকে লইয়া শিকার করা এখন এক ঝক্‌মারি, কিন্তু পিছনে থাকিবার মত মেয়েও সে নয়। এর ওপর আবার দিনরাত দাঁত-খিঁচানি ত আছেই। কাল একবার মাত্র বাঘসিং গিয়া-ছিল ওর ঘাড়টা একটু চাটিয়া দিতে—কি জানি কি মনে করিয়া খামখা ডোরী দিয়াছে এক থাপ্পড় কসাইয়া। বাঘসিঙের কানের নীচের কতকগুলি রোঁয়ার সঙ্গে খানিকটা চামড়াই উড়িয়া গিয়াছে।

ডোরীর নেহাৎ অসময় বলিয়া,—নয়ত চড় থাপ্পড় কে ভাল মারিতে পারে বাঘসিং একবার দেখাইয়া দিত!

জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ী ছড়াটা আঁকিয়া বাঁকিয়া

চলিতে চলিতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তার দুই পাশে নলখাগের জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কত কি জানোয়ারের সদ্য চলিয়া যাওয়ার গন্ধ। ছড়ার বাঁকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অজানা বিদেশী ভাষায় ডাকাডাকি করে কত কি পাখী! বাঘসিঙের সঙ্গে ওদের কোন শত্রুতা নাই, কিন্তু সে ছড়ায় নামিলেই হঠাৎ নিস্তব্ধ অন্ধকার একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিবে যখন ছড়ার বাঁক হইতে একটা অদ্ভুত চীৎকার আকাশে উঠিয়া মাথার ওপর ঘুরিতে থাকিবে। এমনি বীভৎস সে চীৎকার যে বাঘসিঙের নিজেরই এক এক দিন হঠাৎ ভয় করিয়া ওঠে! অন্য সব জানোয়ার ত ছুটিয়া পলাইবেই। দুনিয়ার সব প্রাণীই যে বাঘসিংকে না খাইতে দিয়া মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে!

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে,—অন্ধকার নলখাগের বনের মধ্যে সরু পথ ধরিয়া ছায়ার ডোরাকাটা খানিকটা ভাঙা আলো ছড়ার অন্ধকারে নামিয়া চক্ চক্ করিয়া জল খাইতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ বাঘসিঙের সমস্ত শরীর লোহার মত শক্ত নিরেট হইয়া উঠিল—দিনের আলোর শিথিল অবসাদ তাহার দেহ হইতে যেন সাপের খোলসের মত ঝরিয়া পড়িল! ছড়ার ওপারে একটা ভারি জানোয়ারের সতর্ক খস্ খস্ শব্দ! বাঘসিং আর ডোরী জল খাইতে খাইতেই ঝকঝকে আড়চোখে পরস্পরের দিকে একবার চাহিল—তার পরেই নিঃশব্দে গুড়ি মারিয়া দুই জন ছড়ার পশ্চিম পাড়ের বনের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

একটু পরেই পূব পাড়ের অন্ধকার—বনের মস্ত খানিকটা সবল ছায়ার মত আসিয়া জল খাইতে লাগিল। একটা প্রকাণ্ড মহিষ। জলে নামিয়াই মহিষটা ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কয়েক বার বাতাস টানিতে টানিতে হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিয়া ছড়ার কিনারা বহিয়া হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া চলিল। কিন্তু এর মধ্যেই ব্যাঘ্রদম্পতি ছড়াটা পার হইয়া মহিষটার দুই দিকে ঝোপের আড়ালে ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল।

ডোরী যে ঝোপটার পাশে বসিয়া ছিল মহিষটাকে ছুটিয়া সেই দিকে যাইতে দেখিয়া বাঘসিং গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আর সেই মুহূর্ত্তেই ডোরী মহিষটার ওপর লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু লাফাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পেটের বাচ্চাটা নড়িয়া ওঠাতে কেমন এক রকম ইতস্ততঃ ভাব আসিয়া গিয়াছিল বলিয়া সমস্ত দেহটাকে শিকারের ঘাড়ে ছুড়িয়া দিতে পারিল না। ফলে তার বুক আর থাবা দুইটা পড়িল গিয়া মহিষটার একটা প্রকাণ্ড শিঙের ওপরে। ডোরীর আক্রমণে মহিষটা কাত হইয়া একটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, একটা ঝাঁকুনি মারিয়া টালটা সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার ছুটিয়া চলিল।

বাঘসিং আসিয়া দেখিল ডোরী ছড়ার জলে একটু চুবানি খাইয়া উঠিয়া পাড়ে বসিয়া গা চাটিতেছে। ডোরীর গা চাটিতে চাটিতে বাঘসিং মনে মনে বলিল—আচ্ছা আক্কেল হইয়াছে!

আর শিকারের চেষ্টা না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে তারা জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিল। আজ আহারের চিন্তা নাই। দু-তিন দিন না খাইলেও তাহাদের বেশ চলিয়া যাইবে। তবে একেবারে সামনে শিকার আসিয়া পড়িলে অভ্যাসবশে আক্রমণ না করিয়া থাকা যায় না!

আকাশে তখন চাঁদ মাথার ওপর দিয়া হেলিয়া পড়িয়া নলখাগের জঙ্গলটার সারা দেহে আলোছায়ার লম্বা ডোরা কাটিয়া দিয়াছে, গাছের নীচের ছায়াগুলি চিতাবাঘের দেহের মত বিচিত্র—ছমছমে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা গর্জ্জন, এক একটা তীব্র আর্ত্তনাদ জঙ্গলের বুক চিরিয়া উঠিতেছে—মাঝে মাঝে জোড়া জোড়া সবুজ আলোর স্থির বিন্দুগুলি বাঘসিঙের আগমনে চকিতে অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে—দূরের লোমহীন বড় বড় দু-পেয়ে বাঁদরদের ভয়ঙ্কর বাসাগুলি হইতে ভাসিয়া আসিতেছে অদ্ভুত এক রকম অস্পষ্ট কোলাহল—এক রকম লোমহর্ষণ শব্দ—দুম্ দুম্ দুম্! এরই মধ্য দিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল ডোরী আর বাঘসিং। একটা ফেউ আসিয়া কখন পিছন লইয়াছিল, কম্পিত কণ্ঠে অশ্রান্ত আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল—চারি পাশে সমস্ত বন যেন সভয়ে শ্বাসরোধ করিয়া বনরাজ-দম্পতির ভ্রমণলীলা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

২

ডোরী পলাইয়া গিয়াছে। ডোরী মনে করিতেছে বাঘসিং জানে না কোথায়। কিন্তু বাঘসিং জানে ডোরী গিয়া আঁতুরঘর লইয়াছে ছড়ার ওপারে বড় টিলাটার পিছনের ছোট টিলাটায়। সামনে গহন নলখাগের জঙ্গল, ডোরী এমন ভাবে তার মধ্য দিয়া যাওয়া-আসা করে যেন একটিও খাগ না ভাঙে! জঙ্গলের পরেই দিব্বি একটু পরিষ্কার জায়গা, তার পর অনেকগুলি এলোমেলো বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে; পিছনে একটা ছোট্ট গুহা। সেইখানেই ডোরীর দুইটি বাচ্চা হইয়াছে। বাচ্চা হইতেই বাঘসিং গিয়া গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া বাচ্চা দুইটি দেখিয়াও

আসিয়াছিল। কি দিব্বি তুলতুলে নাদুসনুদুস্ বাচ্চা দুটি। এমন সুন্দর গোলগাল বাচ্চা শুধু এক বাঘদেরই হয়। এখনও তারা বড় হয় নাই, কিন্তু আজই তাদের কি তেজ! দুটাতে একটু পর-পরই মারামারি লাগাইয়া দেয়। দুটা বাচ্চা কুস্তি করিতে করিতে একেবারে তালগোল পাকাইয়া গোলাকার বনিয়া যায়। ডোরী ছাড়াইয়া না দিলে কোন্ দিন একটা আর একটাকে মারিয়াই ফেলিবে। স্নেহে বাঘসিঙের মুখে জল আসিয়া পড়ে। ডোরী বাঘসিংকে বাচ্চার ধার ঘেঁষিতে দিবে না, নয়ত বাঘসিং এক দিন গিয়া বাচ্চা দুটাকে চাটিয়া আদর করিয়া আসিত। না কাজ নাই। বাঘসিঙের আদরও বড় ভয়ানক জিনিস। সে তার প্রথম পক্ষের একটা ছোট বাচ্চাকে আদর করিতে করিতে যেন কি রকমটা হইয়া গিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। ডোরীকে আদর করিবার সময়ে ডোরী হুঁসিয়ার না থাকিলে আর সেও প্রায় বাঘসিঙের মতই জবরদস্ত মেয়ে না হইলে হয়ত বাঘসিং আদর করিতে করিতে কোনদিন ডোরীকেই খাইয়া ফেলিত। সুতরাং বাচ্চাগুলি বড় না হইলে তাদের কাছে যাওয়া চলিবে না।

বাঘসিং রোজ একবার উঁকি মারিয়া বাচ্চাগুলিকে দেখিয়া আসে আর এক এক দিন এক একটা গরু বা মহিষ কি বুনো শুয়ার মারিয়া খাগের জঙ্গলের ধারে ফেলিয়া রাখে, ডোরী অবসরমত টানিয়া লইয়া খাইবে ও বাচ্চা দুটিকেও মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে শিখাইবে।

কিন্তু ডোরী আজকাল বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে—কোন্ দিন বিপদে পড়িবে। বাচ্চা দুইটা এখন একটু একটু ছুটিতে পারে, বাঘের বাচ্চার শিকার দেখিবার এই সময় বটে, না হইলে বড় হইয়া খাইবে কি করিয়া? কিন্তু ছেলেদের শিকার শিখাইবার জন্য ডোরী বড় বেশী বেশী জানোয়ার মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার পর আবার এত ছোট বাচ্চাদের লইয়া এত দূরে দূরে যাওয়াই বা কেন? ডোরী জানে না যে বাঘের বাচ্চা খাইবার মত জানোয়ারও জঙ্গলে আছে! এই ত সেদিন ডোরী গুড়ি মারিয়া মারিয়া বাচ্চা দুইটি সঙ্গে লইয়া একটা হরিণের পিছন লইয়াছিল। বাচ্চা দুইটাকে তফাৎ রাখিয়া সে গিয়াছে একটু ওধারে সরিয়া, আর এদিকে গুল-বাঘা হারামজাদা ওৎ পাতিয়া গিয়া বাচ্চা দুইটাকে ধরে আর কি! বাঘসিং যদি লুকাইয়া বাচ্চা দুইটার পাহারায় না থাকিত ত সেদিন মুশকিলই হইত! বাঘসিঙের এখনও হাসি পায়,—নোলা হইতে জল গড়াইতে গড়াইতে গুলবাঘাটা গুড়ি মারিয়া বাচ্চা দুইটার দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ বাঘসিঙের আচমকা একটা থাপ্পড় খাইয়া অন্ততঃ দশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে উঠিয়া পলাইয়াছিল!

কিন্তু কাল ডোরী যা একটা কাণ্ড করিয়াছে ভাবিতেও বাঘসিঙের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়!

কাল বাচ্চা দুইটা লইয়া গিয়াছিল ডোরী দু-পেয়ে লোমহীন বাঁদরগুলির বাসার দিকে। বোধ হয় কোন রকমে একটা বাঁদর সামনে পড়িয়া গিয়াছিল, ডোরী ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। ডোরী জানে না কি ভয়ানক এই দু-পেয়ে বাঁদরগুলি! কালই নিশ্চয় দলে দলে পঙ্গপালের মত তারা বন ছাইয়া ফেলিবে; এমন সব বিট্‌কেল কিচিরমিচির চীৎকার, ঠন্ ঠন্, ঢন্ ঢন্, দুম্ দাম্ আরম্ভ করিবে যে মাথা ঠাণ্ডা রাখে কার সাধ্য! এই জীবগুলি একেবারে আস্ত শয়তান, বাঘসিং এদের কয়টাকে মারিয়াছে, সে জানে এদের গায়ে এমন কি একটা গরুর জোরও নাই, কিন্তু এরা যে কোথা হইতে কি দিয়া কি করে কিছুই বোঝা যায় না। হঠাৎ এক-একটা বাঁদর দশ হাত লম্বা একটা প্রকাণ্ড নখ বাহির করিয়া তোমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া ফেলিবে। বাঘসিঙের মা এই দু-পেয়েদের নখের ঘায়েই মরিয়াছিল। বাঘসিং অবশ্য সেদিন তিনটা বাঁদরকে তার থাবার ঘায়ে নিকাশ করিয়া দিয়াছিল কিন্তু শেষটা বানরের পালের আক্রমণে তাকেও প্রাণ লইয়া পলাইতে হইয়াছিল!

এক-একটা বাঁদরের আবার লম্বা নলের মত কি একটা থাকে। বাঘের দিকে নলটা তুলিয়া ভয়ানক একটা আওয়াজ করিয়া ছুড়িয়া মারে 'লালমৃত্যু'র ঝলক্! বাঘসিঙের প্রথম গিন্নী ত তার চোখের ওপরই এই চোঙ-ওয়ালা বাঁদরদের আঘাতে মরিয়াছিল! বাঘসিং কিছুই করিতে পারে নাই। এই ভয়ঙ্কর জীবগুলিকে যে কেন ডোরী ঘাঁটাইতে গেল!

বাঘসিং মাটিতে কান পাতিয়া রহিল।

হঠাৎ চার দিক্ হইতে যেন লক্ষ কোটি জানোয়ার একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঢং ঢং দুম্ দাম্ শব্দ যেন চারি দিক্ হইতে বন ঘিরিয়া ফেলিল। বাঘসিং চমকাইয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিল,—দু-পেয়ে বানরের দল বন ঘেরাও করিয়াছে! ভয়ানক ভয়ে বাঘসিং থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! এই কুৎসিত জানোয়ারগুলি যখন দল বাঁধিয়া আসে, বাঘসিং কি এক রকম আতঙ্কে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে! এদের সে একেবারেই বোঝে

না,—এরা না পারে ছুটিতে—না আছে এদের দেহে শক্তি, অথচ এরা 'লালমৃত্যু' ছুড়িয়া মারিতে পারে!

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল দু-পেয়ের দল, ক্রমেই তাদের বীভৎস চীৎকার স্পষ্টতর হইতে লাগিল, বাঘসিঙের ঘাড়ের রোঁয়াগুলি ভয়ে ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল গভীর গর্জ্জন। তবু সে চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ তার মনে হইল দু-পেয়েদের চীৎকার কোলাহল যেন তিন দিক হইতে আসিতেছে, বেশী বেশী শব্দ শোনা যাইতেছে ডোরীর টিলাটার দিক হইতে। এতক্ষণ নিশ্চয় বাচ্চা দুইটা সঙ্গে লইয়া ডোরী বনের যেদিক নীরব সেই দিকে গিয়াছে!—কি সর্ব্বনাশ! ডোরী জানে না সবচেয়ে ভয়ানক ভয়ানক বানরগুলি লুকাইয়া থাকে গাছের আগায় 'লালমৃত্যু'র চোঙ্ হাতে লইয়া ঐ নীরব দিকটাতেই, বাচ্চা দুইটা এখনও তেমন ছুটিতে পারে না, তাদের লইয়া ডোরী গিয়া পড়িয়াছে চোঙওয়ালা দু-পেয়েদের সামনে! বাঘসিং একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে বন কাঁপাইয়া সেই দিকে ছুটিয়া চলিল! দূর হইতে ডোরীর হুঙ্কার শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ডাকিয়া উঠিল দু-পেয়েদের হাতের লালমৃত্যু গুড়ুম গুড়ুম করিয়া! বাঘসিং পাথর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

কিন্তু একটু পরেই তার মন উল্লাসে ভরিয়া গেল, ঐ আসিতেছে ডোরী একটা বাচ্চাকে মুখে লইয়া! দু-পেয়েদের চোঙ ও'র কিছু করিতে পারে নাই। এখন দু-পেয়েদের ঘের কাটিয়া বাহির হইতে পারিলেই হয়।

ডোরী কাছে আসিতেই বাঘসিং একটা হুঙ্কার দিয়া ছুটিল যেদিক হইতে বেশী বেশী চীৎকার শোনা যাইতেছিল সেই দিকে। ডোরী পাশ কাটাইয়া ছুটিয়াছিল বিদ্যুতের মত ঘুরিয়া আসিল। সাম্‌না আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল লম্বা বাঁশের নখ হাতে একটা প্রকাণ্ড বানর—ডোরীর দিকে আঘাত করিতে যাইতেই মাটিফাটা গর্জ্জনের সঙ্গে তার মাথার উপর পড়িল বাঘসিঙের থাবা! অসাড় হইয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, পাঁচটা কুঠার একসঙ্গে তার মাথায় মারিলেও, তার মাথাটা এমন গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইত না।

ঘের কাটাইয়া দুজনেই বাহির হইয়াছে, ডোরী অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, হঠাৎ বাঘসিঙের মনে পড়িল ডোরী মাত্র একটা বাচ্চা মুখে লইয়া গিয়াছে। আর একটা বাচ্চা দু-পেয়েদের ঘেরের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সে আবার বিদ্যুতের মত ছুটিল। দু-পেয়ে বানরগুলি আবার হৈ রৈ চীৎকার করিতে করিতে তার পথ ছাড়িয়া দিল। বনের নীরব দিকটাতে একটা ঝোপের আড়ালে—অসহায়ের মত বাচ্চাটা মাঝে মাঝে ঘড়্ ঘড়্ গর্জ্জন করিতেছিল, আবার দূরের গোলমালে ভড়কাইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল,—বাঘসিং লাফাইয়া গিয়া বাচ্চাটাকে মুখে তুলিয়া লইল।

বাচ্চা মুখে লইয়া বাঘসিং ছুটিয়া চলিতে চলিতে চম্‌কাইয়া উঠিয়া দেখিল একটা বাঁদর লম্বা চোঙ দিয়া তার দিকে লক্ষ্য করিতেছে। বাঘসিং একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া ঝোপের আরেক পাশে লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক শব্দে কানে তালা লাগাইয়া ছুটিয়া আসিল লালমৃত্যুর ঝলক্!

বাঘসিঙের মনে হইল অদ্ভুত কি একটা একেবারে তার বুকের এপাশ হইতে ওপাশে ছুটিয়া গেল। তবু সে প্রাণপণে লাফাইয়া ছুটিল। তার খালি ইচ্ছা হইতে লাগিল বুকফাটা চীৎকার করিয়া বুকের মধ্যের অসহ্য আলোড়নটাকে একটু মুক্তি দেয়;—হাঁ করিয়া বুক ভরিয়া টানিয়া লয় জঙ্গলের ছায়ায় ঠাণ্ডা বাতাস! কিন্তু তবু সে বাচ্চাটি মুখে করিয়া নীরবে ছুটিয়া চলিল ডোরীর গুহাটা লক্ষ্য করিয়া।

গুহার মুখে বাচ্চাটাকে নামাইয়া দূরের দু-পেয়েদের অস্পষ্ট কোলাহল সামনে লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেই এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তার শরীর কাঁপিতে লাগিল। বাচ্চাটাকে একটু চাটিতে জিব বাহির করিতে গিয়া তার মুখ হইতে হড় হড় করিয়া বাহির হইল একরাশ টক্‌টকে তাজা রক্ত!

তার ইচ্ছা হইল একবার সে চীৎকার করিয়া ডোরীর সাহায্য চায়,—কিন্তু পথে আছে লালমৃত্যু-হাতে দু-পেয়ের দল! প্রাণপণে সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল।

রুদ্ধ আক্রোশে সে মাটি কামড়াইয়া ধরিল,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাবায় সে মাটি চিরিতে লাগিল, তার পর আর একবার রক্তবমি করিয়া তার চক্ষু অন্ধকার হইয়া গেল। প্রাণপণে শ্বাস টানিতে টানিতে ঘাড় ঘুরাইয়া সে দেখিতে চেষ্টা করিল বাচ্চাটা কোথায় আছে।

কিন্তু বাচ্চাটা ততক্ষণ বাঘসিঙের নাক মুখ দিয়া ঝরিয়া পড়া অজস্র টক্‌টকে গরম রক্ত চক্ চক্ করিয়া চাটিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—ছুটাছুটিতে তার ক্ষুধা পাইয়াছে!

শ্রীরাগ

কুমার শ্রীমঙ্গল সিংজী (লাঠী)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

গ্রাম দেখা যোগমায়ার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। সেই বৈশাখ মাসের প্রথমে সই পাতানো লইয়া একবার যা রাধারাণীদের বাড়ি গিয়াছিল। কিন্তু সে কতটুকু পথই বা! বারেন্দ্রপাড়ায় যাইতে হইলে যেটুকু পাকা রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয়—যোগমায়াকে ততটুকুও হাঁটিতে হয় নাই। বেনে গলির মধ্য দিয়া হাত পঞ্চাশেক গিয়াই নিবু ভট্টাচার্য্যদের বাড়ি পড়ে। তাহাদের খিড়কীর দুয়ারের শিকল নাড়িয়া দুয়ার খোলাইয়া দুই মিনিটের মধ্যেই বারেন্দ্রপাড়ায় পৌছান যায়। রাধারাণীদের বাড়িটা আবার বারেন্দ্রপাড়ার প্রথমেই। কাজেই সংক্ষিপ্ত পথে কুলবধূর সম্ভ্রম যেমন বাঁচিয়া যায়, দু'ধারে দুই চারিটা সজিনা, জাম ও কাঁঠাল গাছ ছাড়া মানুষজন প্রায়ই চোখে পড়ে না। তবু বাড়ির বাহিরে এই পাড়াগাঁর একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। সঙ্কীর্ণ পথের উপর যে আকাশ—বর্ণে ও বিস্তারে সে বাড়ির মধ্যকার উঠান সীমানায় খণ্ডিত আকাশের চেয়ে নূতনতর; পথের ধারে যে সতেজ ও ধূলি-বিবর্ণ গাছ—সেগুলির শাখাপ্রশাখা মেলিবার ধরণ বাড়ির চেয়ে স্বতন্ত্র; পথের ধারে ছাগল, গরু ও কুকুরগুলিও যেন জীবজগতের এক রহস্যময় অধ্যায়।

আজ ঘোরা পথেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ইহারা হরি বাঁড়ুয্যের বাড়ি চলিল। এ বেলা ও বেলা দুই বেলাই নিমন্ত্রণ। এক দিনেই গায়েহলুদ ও বিবাহ। তা ছাড়া 'এয়ো বরণ' ইত্যাদির জন্য কমলা ও যোগমায়ার আবশ্যক আছে। শাশুড়ী রন্ধনের ভার লইয়া কোন্ সকালে রওনা হইয়া গিয়াছেন। বাড়ি আগলাইবার জন্য পিসিমা বাড়িতে রহিলেন। কমলা এ গাঁয়ের মেয়ে হইলেও, পাশের বাড়ির কুমুদিনীর বিধবা মাকে শাশুড়ী বার বার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—মেয়ে ও বউকে সঙ্গে করিয়া সে যেন নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া আনে। গাঁ শুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ, কুমুদিনীর মাও বাদ পড়েন নাই। তিনি ব্রাহ্মণের বিধবা নহেন বলিয়া ব্রাহ্মণকন্যার হাতে ব্রাহ্মণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে তাঁহার কোন বাধা নাই।

আগে চলিয়াছেন কুমুদিনীর মা, তার পিছনে যোগমায়া—সব শেষে কমলা। ঘোষালদের আট বছরের মেয়েটা ইহাদের সঙ্গ লইয়াছে, কাজেই কমলাকে সকলের পিছনে পড়িতে হয় নাই। অবগুণ্ঠনটা যোগমায়ারই বেশি এবং কৌতূহলও তাহার প্রবল। পথের দু'পাশে বাড়ি-ঘর, গাছপালা, মাঠ পুকুর কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না। কেবল মানুষজন দেখিলেই বাম হস্তোত্তোলিত ঘোমটাটি স্বস্থানে আসিয়া পড়িতেছে। যোগমায়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, দোকানে বসিয়া দোকানী কেনাবেচার সঙ্গে সঙ্গে পথের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিয়াছে, ময়রা তাড়ু নাড়িতে নাড়িতে পথের দিকেই চাহিয়া আছে। জিনিস-পত্র হাতে বা মাথায় লইয়া যাহারা পথ অতিবাহন করিতেছে—তাহারাও অন্য পথচারী বা চারিণীদের গতিবিধি সম্বন্ধে সতর্ক। সে দৃষ্টিতে তাহাদের লালসার চেয়ে কৌতূহলই বেশি। তথাপি যোগমায়ার সঙ্কোচ আসিল। কমলা গাঁয়ের মেয়ে, কে কোথায় হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল সে দিকে বড় ভ্রূক্ষেপই করিতেছে না, গল্পে মাতিয়া পথ চলিয়াছে আপন মনে। পিছনের ছোট মেয়েটা সময় সময় মল বাজাইয়া আপন মনে ছড়া কাটিয়া চলিয়াছে।

গ্রাম নয়—শহর। যোগমায়াদের গ্রামের চেয়ে কত বড় আর কেমন পাকা রাস্তা। দু'ধারে ঘন বসতি। বন নাই, নির্জ্জনতা নাই। এখানে উঁচু গলায় কথা বলিলে অনেকগুলি লোকই সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবে, এখানে আস্‌শেওড়া গাছের কটু গন্ধ নাকে ভরিয়া বন ঠেলিয়া 'কু—ঘস্ ঘস্' রবে রেলগাড়ি খেলা চলে না, রাস্তার ধুলায় লাফাইয়া জল ডিঙ্গাডিঙ্গি খেলাও না। প্রথম দৃষ্টিপাতে তবু সেই নিস্তব্ধ জনমানবহীন গ্রামের চেয়ে এই শহর-মার্কা গ্রাম কিশোরী যোগমায়ার ভালই লাগিল। বহুদিন পরে বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিয়াছে, বহু দিন পরে গা ভরিয়া গহনা পরিয়াছে, ঠাকুরঝির দামী একখানা চকচকে শাড়ী গায়ে উঠিয়াছে এবং নিমন্ত্রণ খাওয়ায় আনন্দ—এই সব মিলিয়াই বুঝি এই শহরতুল্য গ্রামখানি যোগমায়ার মনে অপরূপ সৌন্দর্য্যে ঝল্ মল্ করিয়া উঠিল।

ঐ না বিবাহ বাড়ি দেখা যায়? অনেক লোকজনের

কোলাহল, নহবতের আলাপধ্বনি, কুকুর ঠেঙানো ও পাতা, গ্লাস ফেলার শব্দ। মাছের পিত্ত চোক্‌রা প্রভৃতি পচিয়া একটি তীব্র আঁসটে গন্ধ বাহির হইতেছে। সদর দরজায় লোকজনের ভিড়, ওদিক দিয়া পুরুষ মানুষেরা ব্যস্ত ভাবে যাতায়াত করিতেছে। ওই দরজার উপরেই রোশনচৌকি বাজিয়া এই বাড়ির শুভ কার্য্যের নির্দ্দেশটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে। সদর দরজা দিয়াই হউক বা খিড়কি দিয়াই হউক, বাঁড়ুয্যে বাড়ির অন্দরে ঢুকিতে হইলে বড় উঠানটি পার না হইয়া উপায় নাই। সে উঠান আজ দেখিবার মত হইয়াছে। অতবড় উঠান—কোথাও ঘাসের চিহ্ন নাই, গাছের চিহ্ন নাই। এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত পাল খাটানো। পালের নীচে কাগজের বিচিত্র বর্ণের ফুল লতার শৃঙ্খল, ঝাড় বাতিদানের প্রাচুর্য্য। সুন্দর দেবদারু ও কামিনীপত্রমণ্ডিত বাঁশের খুঁটির গায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাগালের বাহিরে কত না পৌরাণিক চিত্র টাঙানো রহিয়াছে। প্রত্যেক চিত্রের মাথায় দুইটি করিয়া তিন-চার-রঙা কাগজের নিশান আড়াআড়ি ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। যেন যাত্রার আসর সাজানো হইতেছে। ধূলার উপর প্রকাণ্ড সতরঞ্চিখানা গুটানো রহিয়াছে। চাদর-গুলি একটু উঁচুতে বাঁশের পাড়ের উপর পাট করিয়া কাহারা রাখিয়া দিয়াছে। একপাল ছেলেমেয়ে সেই গুটানো সতরঞ্চির উপরে পড়িয়া চীৎকার ও হুড়াহুড়ি করিতেছে। আসর-সজ্জাকরেরা কখনও তাড়া দিয়া তাহাদের খেলা বন্ধ করিতেছেন, কখনও বা মৃদু হাসিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিতেছেন। কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সকলের হাতেই থেলো হুঁকা ও হাতপাখা, কাঁধে গামছা, কাপড় মালকোঁচা আঁটিয়া পরা। কখনও বামহস্তস্থিত থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন, কখনও বা ডান হাতের তালবৃন্ত নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছেন, কখনও বা এধার-ওধার ছুটিয়া কাজের বন্দোবস্ত করিতেছেন। সমস্ত উঠানটিই একটা হৈ হৈ হট্টগোলের মধ্যে গম্‌ গম্‌ করিতেছে।

দরজার বাহির হইতে কুকুরের একটানা ঘেউ ঘেউ ও খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ ঝগড়ার শব্দ কানে আসিতেছে। বাড়ির মধ্য হইতে চাপা হাস্যধ্বনি ও মল পাঁজরের আওয়াজ। রোশন-চৌকি একটানে বাজিয়া চলিয়াছে।

অন্দরের উঠানে পা দিতেই নানা জাতীয় ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণে রসনার ঘুম ভাঙিয়া যায়। এ-পাড়া ও-পাড়ার যুবক বৃদ্ধ মিলিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কোমরে গামছা বাঁধিয়া ও পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া বাইন হইতে বড় বড় ভাতের হাঁড়ি নামাইতেছে। ও-পাশে প্রকাণ্ড একটা মাটির চৌবাচ্চার উপর তিন-চারিটা ঝুড়ি বসানো আছে। বাইনে এক সঙ্গে দশ-বারটা তোলো হাঁড়িতে ভাত ফুটিতেছে। টুলের উপর বসিয়া কেহ বড় বড় চেলা কাঠ বাইনের মধ্যে ঠাসিয়া দিতেছে, কেহ কাঠের খুন্তিতে ভাত টিপিয়া পরীক্ষা করিতেছে সিদ্ধ হইয়াছে কিনা। ভাত সিদ্ধ হইলে দুই জনে সন্তর্পণে হাঁড়ি নামাইয়া সেই চৌবাচ্চার উপর রক্ষিত ঝুড়িতে উপুড় করিয়া ঢালিতেছে। ফেন ঝরিয়া গেলে দুই দিক্‌ হইতে দুই জন বাঁশের হাতল দেওয়া ঝুড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া প্রকাণ্ড একটা লম্বা ঘরে আনিয়া সেই অন্ন স্তূপীকৃত করিতেছে। অন্ন রাখিবার ব্যবস্থাও বেশ। মেঝের উপর দরমা বিছানো, তার উপর সাদা ধব ধবে চাদর। সেই বকপক্ষতুল্য চাদরের উপর মল্লিকাফুলের মত অন্নের রাশি স্তূপীকৃত হইতেছে। সে ঘরে যেন শরীরী হইয়া মা অন্নপূর্ণা দেখা দিয়াছেন।

উঠানে যেসব লোক কর্ম্মব্যস্ত রহিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই যোগমায়া চেনে না। কমলা যোগমায়ার কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, ওই যে আমতলায় টুলের ওপর বসে রয়েছে—কে বল দেখি?

যোগমায়া সেদিকে চাহিয়া দেখিল; অবগুণ্ঠন সরাইয়া একটু ভাল করিয়াই চাহিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। লোকটির বয়স খুব কম। কালো হইলেও গঠনে ও মুখশ্রীতে সুন্দর বলাই চলে। চোখ দুটি বড় বড়, কালো মুখে গোঁপের রেখাটি বেশ পরিস্ফুট, চুল কোঁকড়ানো। লোকটি লম্বা নহে, রোগাও নহে, সবশুদ্ধ মিলিয়া কান্তিমান পুরুষ। এত কোলাহলেও লোকটি কেমন যেন অন্যমনস্ক।

যোগমায়া মাথা নাড়িল।

কমলা হাসিয়া বলিল, তোর সয়া রে।

যোগমায়া আর একবার চাহিল। লোকটি অন্যমনস্ক না থাকিলে যোগমায়ার লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিত না। রাধারাণীর বর্ণনাগুলি মূর্ত্তি ধরিয়া চোখের সামনে নামিল। ও যদি আমগাছের তলায় ভাতের বাইনের সম্মুখে না বসিয়া যমুনার কূলে কদমতলায় অমনই ভাবে গালে হাত রাখিয়া চিন্তাসমুদ্রে ডুবিয়া থাকিত এবং ওর হাতে যদি বাঁশী থাকিত! এক জায়গায় রাধারাণীর বর্ণনা বড় ফিকে বোধ হইতেছে। ওই শান্তভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকা—ও যেন লোকটিকে মানাইতেছে না। চারি পার্শ্বের ওই কর্ম্মকর্ত্তাদের মত ও যদি মুখে চীৎকার ও পদক্ষেপে দ্রুততা আনিয়া নিজের মূল্য সম্বন্ধে আর পাঁচ জনকে

সচকিত করিয়া তুলিত তো সে বড় মন্দ দেখাইত না। রাধারাণীর বর্ণনার সঙ্গে না মিলুক—ওর ওই অন্তমনস্কতার মধ্যে যোগমায়া সইয়ের অনেক বার বর্ণিত সেই পুরাতন কথাটিকে যেন বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিল। প্রিয়ার বিরহে প্রিয়ের অবস্থা তো এমনই হইয়া থাকে! বিদ্যুতের মত রামচন্দ্র আসিয়া উঁকি দিল, এই কর্ম্মকোলাহলময় বাড়িতে তার মধুর ও মৃদু হাসির ধ্বনিটি যোগমায়ার কানে বাজিয়া উঠিল।

আহা—হা—এঁটো পাতার ওপর পা দিয়ে ফেললে গা? দাঁড়াও—মা—দাঁড়াও, এক ঘটি জল এনে দেই।

কমলা হাসিয়া রহস্য করিল, সয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলি যে, বউ!

যোগমায়ার গা দিয়া তখন গল্ গল্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। একবাড়ি লোকের সামনে এ সে কি করিয়া বসিল!

পা ধুইয়া যোগমায়া আরও বেশি কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে লাগিল।

স্থূলকায়া বাঁড়ুয্যেগিন্নী সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, এই যে, এতক্ষণে আমার কমলমণির দেখা মিলল! ও-ঘরে মেয়েরা বসে আছেন, খেতে বসতে পারছেন না। আহা, থাক, থাক, বউমাকে যেন রোগা রোগা ঠেকছে! চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড মুখে তাঁহার দুই ভরি ওজনের ফাঁদি নথটা সেই হাসির তালে তালে দুলিতে লাগিল।

মুখ নামাইয়া যোগমায়া তাঁহার গরদ-শাড়ীমণ্ডিত বিশাল দেহের পানে চাহিল। যেমন প্রকাণ্ড চক্ মিলানো বাড়ি, তেমনই বিবাহের সমারোহময় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে গৃহিণীও দেহ ও অলঙ্কারের মহিমা লইয়া লোকের সম্ভ্রম ও বিস্ময় কুড়াইতেছেন। সের দুই আড়াই সোনা তাঁহার সর্বাঙ্গে চাপানো আছে, তবু ভার না হইয়া সেই সোনাই ভূষণের মত দেখাইতেছে।

মেয়েটি অর্থাৎ কনে গৃহিণীর মতই গৌরী, কিন্তু দেহ-মর্য্যাদায় সমভাগিনী নহে। সারা দিনের উপবাসে মুখ-খানিতে তার ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে, একটু শুকাইয়াছে। কিন্তু শুকনা মুখে পাণ্ডুতার বদলে একটি জ্যোতি বাহির হইতেছে। বইয়ে পড়া তপস্যার জ্যোতির মত সেই ঔজ্জ্বল্য। লালপাড় শাড়ী হলুদ রঙে রঞ্জিত, কপালে হলুদ, হাতে কাজললতা, চুলগুলি এলো। তপস্যার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া মেয়েটি যেন অভীষ্টলাভের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

বেশি দিনের কথা নহে, তবু এই মেয়েটির মধ্যে যোগমায়া যেন নিজেকে এক বার ভাল করিয়া দেখিল।

মা, খিদে পেয়েছে।

আগে বিয়ে হোক, তার পর খাস।

হাঁ, পারি নাকি সারা দিন উপোস করে থাকতে!

এই একটি দিন তো, মা। একটু না সইলে কি হয়।

এ মেয়ে গৌরীকাল উত্তীর্ণ হইয়া কুমারী কালে পড়িয়াছে সুতরাং, ক্ষুধার জন্য সে হয়ত বায়না ধরে নাই। এই নারীজীবন প্রতিষ্ঠা মুখে পুণ্য ব্রত উপবাসের অনিবার্য্য অনুষ্ঠানটিকে হয়ত বা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। মুখখানি তাহার শুকাইয়া ঈষৎ মলিন হইয়াছে মাত্র। মলিন হইয়াছে বরং মহিমান্বিতও হইয়াছে।

একান্তে পাইলে মেয়েটির সঙ্গে যোগমায়া একটু আলাপ করিত হয়ত। কিন্তু আহারের ডাকে সকলেই হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কচি ছেলেমেয়েগুলি ককাইয়া উঠিল, বড় ছেলেমেয়েগুলি লাফালাফি ঠেলাঠেলি জুড়িয়া দিল। মায়েরাও নীরব রহিলেন না, কিলটা চড়টা কাহারও পৃষ্ঠে বা গালে বসাইয়া দিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সেই চীৎকারে মনে হইল, এই ঘরের ছাদটাই বা মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে।

রন্ধনের সুখ্যাতি রটিল। খাইতে বসিয়া যোগমায়ার মুখখানিও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই প্রশংসার অনেকখানিই যেন যোগমায়ার প্রাপ্য।

কে রেঁধেছেন গা? রামের মা? চমৎকার। এমন সুক্তো, এমন মোচার ঘণ্ট, এমন ছোলার ডাল এ তল্লাটে কেউ রাঁধুক দিকি!…আর ওই বুঝি ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া এককোণে রামের বউ খাইতে বসিয়াছে? বেশ বউ। যেমন শাশুড়ী করিৎকর্ম্মা, তেমনি সুন্দর বউ। ও বউও এক দিন—

ওকি বউ মা কিছু যে খাচ্ছ না? সব পাতে পড়ে রইল যে! ভাল লাগছে না বুঝি? রোজ যে অমৃত খায়—

কিন্তু তা নয়, এই সুরন্ধিত ব্যঞ্জনের চেয়ে সুউচ্চারিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি সে আকণ্ঠ গলাধঃকরণ করিতেছে। ব্যঞ্জন মাত্র রসনাকে তৃপ্তি দিতে পারে—প্রশংসা যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের।

পাশে বসিয়া একটি বউ মাটির গ্লাসে কিছু কিছু তরকারি জমা করিতেছিল। যোগমায়া এদিকে চাহিতেই একটু

অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, কি করি মা, ওঁয়ার বড় অসুখ, দু'মাস জ্বরে শয্যেগত—অরুচি। তাই একটু ভাল তরকারি,—পাশের ছেলেটিকে ধমক দিয়া বলিল, হাউড়ের মত খাচ্ছে দেখ তরকারি গুচ্ছেক। আসুক বঁদে আসুক—গিলো'খন।

যোগমায়ার দিকে ফিরিয়া কহিল, আমায় চিনতে পারছ না বোধ হয়! যেদিন গাঙ্গুলী বাড়ি সই পাতাতে যাও, সেদিন—ওদের জ্ঞেয়াত হই কিনা! দশ রাত্তিরের জ্ঞেয়াত। ওদের অবস্থা ভাল আর,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বউটি চুপ করিল।

বউটির মুখে লোভের ছায়া দেখিয়া যোগমায়া প্রথম হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল যে ইহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে। রাধারাণীদের জ্ঞাতি শুনিয়া সে তাহাকে রাধারাণী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্ম মনে মনে ছটফট করিতে লাগিল।

তাহার মুখে চোখে আগ্রহের আধিক্য দেখিয়া বউটিই বলিল, কিছু বলবে, মা? বল।

তথাপি অনেকক্ষণ ইতস্তত করিয়া যোগমায়া মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সই কেমন আছে?

তোমার সই? তা ভালই আছে। কিন্তু—একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বউটি আপন মনে বলিতে লাগিল, কপালে না থাকলে—দেবতার সাধ্যি কি দেয়—এই দেখ না মা, চার পাঁচটায় আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে মারছে দিনরাত। মরেও না তো একটা—আপদ যায়!

যোগমায়া শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, ষাট! ষাট!

বউটি বলিল, অথচ দেখ, যারা আরাধনা ক'রে আসে—তাদের কপালে সুখ সয় না। একটি ছেলের একটি বউ—পেরথম নাতি, কত না সাধ আহ্লাদ মানুষের মনে। পোড়া বিধাতা সেইখানেই বাদ সেধে বসে আছেন। মরণও হয় না যমের।

যোগমায়ার কণ্ঠতালু শুকাইয়া উঠিল, উদ্বিগ্ন স্বরে সে প্রশ্ন করিল, সইয়ের ছেলে—

ছেলেই হয়েছিল, মা। সোনার চাঁদ ছেলে—ঘর আলো করা রাজপুত্তুর। কিন্তু 'নত্তা'র দিন সেই যে কাঁদতে সুরু করলে—দু'দিন গেল না। বাবা পাঁচুঠাকুরই জানেন, কেন এমন ধারা করলেন!···

বঁদে ও দই আসাতে বউটি ওদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ছেলের গ্লাসের জলটা ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া সেই গ্লাসে বঁদে সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

যোগমায়ার চক্ষে তখন দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে ঘোমটাটা বাঁ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া আর একটু টানি দিয়া সে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

৬

প্রথম আঘাত বুকে বেশি লাগিবারই কথা। স্ব ভাষিণী বলিয়া যোগমায়ার ব্যথা বিশেষ কেহ টের পাইলে না। টের পাইবার অবসর বা কোথায়! বিবাহ-বাড়ি নিমন্ত্রণ পর্ব্ব শেষ হইতে না-হইতে জয়মঙ্গলবারের পূ আসিয়া পড়িল। সোমবারের বৈকালে প্রত্যেকের জ সতেরটি করিয়া কাঁঠালপাতা. বেলপাতা ও দূর্ব্বা তুলি আঁটি বাঁধিতে হইবে। ঘরের মেঝেয় সাদা আলিপন লতাপাতা কাটিয়া একটি করিয়া কড়ির ছোট ঝাঁ (ঝাঁপির মধ্যে আলতা, সিঁদুর, নোয়া, শাঁখা, ছোট আর চিরুণী প্রভৃতি সধবা নারীর নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ থাকে বসাইয়া তার কোলে দূর্ব্বা কাঁঠালপাতার আটি, ক তালশাঁস, আম, সন্দেশ প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিে হইবে। বাড়িতে যতগুলি স্ত্রীলোক আছেন—প্রত্যেকে জন্য এই আয়োজন। চার জনের জন্য বড কম কাঁঠা পাতা বা দূর্ব্বা বিল্বপত্র গুছাইতে হইবে না। আগে দিন না তুলিয়া রাখিলে সদ্য সদ্য আয়োজন করা কঠিন তার উপর এটি হইতেছে শেষ মঙ্গলবার, পূজা ও ব্র পালনের একটু বিশেষ রকম উদ্যোগ আছে বইকি।

আশ্চর্য্য মানুষের মন। পাতা ও দূর্ব্বা তুলিবা কালে কমলার মুখে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে যোগমায়ার চিত্ত সেই পৌরাণিক যুগের প্রতিবে মগ্ন হইয়া গেল। সেই চিরমহিমান্বিত দুর্গম কৈলাসপর্ব্বত ভাঙ ধুতুরা সেবনে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বিশ্বের সংহারক বিল্ববৃক্ষমূলে বাঘছাল পরিয়া ও বিভূতি লেপন করিয় বসিয়া আছেন; পার্শ্বে অর্দ্ধপ্রোথিত ত্রিশূলের উপ গৈরিকরঞ্জিত ভিক্ষার ঝুলি; অদূরে বসিয়া নন্দীভৃ ভাঙ পেষণ করিতেছে আর দেবী দুর্গা সেই যোগীরাজে একান্ত সন্নিকটে বসিয়া এই পুণ্য ব্রতকথার ইতিহা বলিয়া যাইতেছেন। যাঁর ঈষদ্ধাস্যের মধ্যে মঙ্গলম মৃত্যুর ইঙ্গিত, তাঁরই সম্মুখে নশ্বর জীবের সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দ মনে বাঁচিয়া থাকিবার কাহিনী দেবী বলি যাইতেছেন। জীবন আর মৃত্যু পাশাপাশি চলিয়া বলিয়া—দুই জনকে আশ্রয় করিয়া পালনকর্ত্তার সৃষ্টি কেমন পরিপূর্ণ মনে হইতেছে।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা যোগমায়া কত বার শুনিয়াছে

কিন্তু সে শুনায় প্রাণের যোগ ছিল না। রাধারাণীর জন্ত বেদনা বোধ ও তার মঙ্গল কামনাই আজ যোগমায়াকে এমন মনোযোগী শ্রোত্রীতে পরিণত করিয়াছে। আহা, সই না জানি কত কষ্ট পাইয়াছে! এখনও তার চোখের জল হয়ত শুকায় নাই। সরবে না হউক, রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া নিত্য সে চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়া কাঁদে। এ-সময়ে একবার যদি সে রাধারাণীর কাছে যাইতে পারিত! দেবতারা অন্তর্যামী। আর কিছু না পারুক—যোগমায়া তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করিতে পারিবে।

হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার সইকে কষ্ট ভুলাইয়া দাও। আবার যখন দেখা হইবে তখন সইয়ের মুখে হাসিটি যেন সে দেখিতে পায়।

কমলা বলিল, বউ, আজ বড় অন্যমনস্ক তুই। ক-গণ্ডা কাঁঠালপাতা, বেলপাতা আর দুব্বো দিয়ে আটি বাঁধলি?

কেন, সতেরটি করেই দিয়েছি তো।

উঁহু, গোন দেখি।

গনিয়া একগণ্ডা করিয়া কম হইল। কমলা হাসিয়া বলিল, বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িল।

তবে বুঝি দাদার জন্যে?

এ রহস্তেও যোগমায়ার মুখ সরমরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল না, মাথা নাড়িয়া ও ভ্রূকুটি করিয়া কহিল না, যাও। শুধু তাহার চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা জল টপটপ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, তুই কাঁদছিস? হ'ল কি, বউ?

ফোঁটা ধারায় রূপান্তরিত হইল। যোগমায়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হত বিস্ময়ে কমলা বলিল, ওমা, কেঁদে ভাসালি যে! আমি তো তোকে এমন কিছু বলি নি—!

না, ঠাকুরঝি। অনেক কষ্টে কান্নার বেগ থামাইয়া সে বলিল, পরশু নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে শুনলাম, সইয়ের ছেলে হয়ে মরে গিয়েছে।

বটে, কার মুখে খবর পেলি?

ওদের জ্ঞাতি হয়—সেই যে বউটি আমার পাশে বসেছিল—তারই মুখে শুনলাম।

আহা! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা প্রবোধ দিয়া বলিল, জগতের ধারাই এই ভাই। সে ছেলে শত্রু, নইলে এমন কষ্ট দেবে কেন! তুই কাঁদিস নে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে তোর সই যে সেরে উঠেছে—সেই ভাল।

কেন, ঠাকুরঝি—ও কথা বললে কেন?

ছেলে হওয়া মানেই জন্মমৃত্যুর কথা। দুটো দু-ঠাই হওয়া যে কত মানত করে হয়—তা জানিস? সাধ দেয় কেন? পাঁচ ভাজা করে, পায়েস করে, ভাল কাপড় পরিয়ে—পাঁচটা ভাল তরকারি রেঁধে খেতে দেয় কেন! ছেলে হ'তে গিয়ে অনেক পোয়াতীই মারা যায় কিনা। তাই জন্মের খাওয়া—

যোগমায়া শিহরিয়া উঠিয়া কমলার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, মা মঙ্গলচণ্ডী করুন—সই আমার শীগ্‌গির ফিরে আসুক।

কমলাকে বলিয়া তার অনেকটা লঘু হইল। হাল্কা মনে যোগমায়া গুণিয়া গুণিয়া বেলপাতা, কাঁঠালপাতা ও দূর্ব্বার আঁটি বাঁধিতে লাগিল।

পূজা ও কথা শেষ হইলেও যোগমায়ার প্রণাম করা আর শেষ হয় না। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে আকুল মনেই সে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

শাশুড়ী বলিল, দেখ্ কমলি, ঐ বড় খোরাটায় এক কাঠা চাল ভিজিয়ে দে। দইটা বসেছে কিনা দেখ্ দিকি।

না মা, জল টল্ টল্ করছে এখনও।

আমার তো মনে ছিল না—ভোরবেলায় দুধে দম্বল দিয়েছি। বোধ হয় দম্বল কম হয়েছে। না-হয় একটু তেঁতুল দিয়ে রাখ—খানিক পরে জমে যাবে'খন।

আজ আর রান্নার পাট নাই।

কমলা বলিল, তাস খেলবি, বউ?

যোগমায়া বলিল, আমি তো গ্রাবু খেলতে জানি নে।

না-হয় পেটাপিটি। দু-জনে দেখা বিন্তি খেলাও হয়। খেলবি? এবং যোগমায়ার সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া কুলুঙ্গি হইতে একজোড়া ধুলামাখা তাস বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, এমন করেও রেখেছিস? সব আছে তো?

গনিয়া একখানা কম হইল। কিন্তু কোন্‌খানা কম হইল ধরা কঠিন।

কমলা বলিল, আবার গোনা। আমি চিড়িতন হরতন সব আলাদা আলাদা করে রাখছি, তেরখানা করে তাস প্রত্যেক ভাগে। যেটার কম হবে গুনে আমায় বলবি।

গনিয়া হরতনের সাহেব পাওয়া গেল না। কমলা

রহস্য করিয়া বলিল, তা-ও বেছে বেছে লাল সাহেবটিই মিলছে না! একেই বলে কপাল! বলিয়া হাসিয়া যোগমায়াকে একটা ঠেলা দিল।

যোগমায়াও হাসিল। কহিল, তাহ'লে খেলা হবে না তো?

ইস্, হবে না বৈকি। এই হরতনের ছুরিটা যেন সায়েব হ'ল। কেমন?

কিন্তু যোগমায়াকে লইয়া খেলা জমিল না। কমলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। হয়তো পাড়াতেই বেড়াইতে গেল—কিংবা আর কোন খেলুড়ের সন্ধানে।

খানিক পরেই ও-ঘর হইতে পিসিমা ডাক দিলেন, বউমা কি ঘুমিয়েছ?

দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া যোগমায়া পিসিমার কাছে গিয়া বসিল।

পিসিমা আঁচলের খুঁট হইতে একখানা ভাঁজ-করা চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন, তোমার চিঠি—এই মাত্র নন্দী গয়লানী দিয়ে গেল। ওর ছেলে পানপাড়ায় বকনা বাছুর কিনতে গিয়েছিল কিনা, পথে বেয়াইবাড়ি পড়ে, তাঁরাই দিয়েছেন।

আগ্রহভরে যোগমায়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিল, এবং খানিকটা পড়িয়াই মুখখানি তাহার শুকাইয়া গেল। পিসিমা চরকায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তুলা ফুরাইয়া যাওয়াতে ও-পাশের পাঁজ ঠিক করিবার জন্য যেমন তিনি মুখ তুলিয়াছেন, অমনই যোগমায়ার নিশ্চল শুকনা মুখখানি তাঁহার চোখে পড়িল। ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন, খবর সব ভাল তো, মা? ওকি, অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে?

পিসিমা? ক্রন্দনের আবেগে যোগমায়ার পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপিয়া উঠিল।

চরকা এক পাশে রাখিয়া পিসিমা এধারে সরিয়া আসিয়া কহিলেন, কি, মা? কারও কি অসুখ করেছে?

বাবার খুব অসুখ। বলিয়া যোগমায়া কাঁদিয়া ফেলিল। সান্ত্বনা দিয়াও পিসিমা সে কান্না রোধ করিতে পারিলেন না।

কমলা পাড়া হইতে আসিয়া কত বুঝাইল, তাহাতেও যোগমায়ার মন বুঝিল না। অবশেষে শাশুড়ী বলিলেন যাই পাল্কী নিয়ে আসি গে একখানা। এই অবেলায় বাপের বাড়ি যাওয়া, কি জানি বাপু, আমাদের কালে এমন অনাছিষ্টি তো দেখি নি!

কমলা বলিল, পরশু পিসিমাকে নিয়ে আমি দেখতে যাব বউ। ভয় কি, মা বাগ্‌দেবী বড় জাগ্রত দেবতা. পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে ওখানে। মানত কর—জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দিবি মার, মা সব মঙ্গল করবেন।

মন বিচঞ্চল থাকিলে ঠাকুরদেবতাকে একমন হইয়া ডাকাও যেন চলে না। স্থির বিশ্বাসের মূলে—সংশয় আসিয়া আসিয়া অনবরত আঘাত করিতে থাকে। বিপদের দিনের মন—যেন চৈত্রবায়ুতাড়িত পেঁজা তুলার রাশি।

বকুলতলায় যোগমায়ার পাল্কী নামিল, জনপ্রাণী কেহ সেখানে ছিল না। পাড়ারই এক জন ভিন্ন জাতীয় অনুগত বর্ষীয়ান যোগমায়ার রক্ষী হইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল। যোগমায়া পাল্কী হইতে নামিলে সে বলিল, যাও মা, বাড়ির মধ্যে যাও। ভয় কি? আমি গাছতলায় দাঁড়াচ্ছি। একটা খবর পাঠিয়ে দিও—বেয়াই কেমন আছেন।

একটু পরে বছর দশেকের একটি ছেলে বকুলতলায় আসিয়া বলিল, আপনি একবার বাড়ির ভেতর আসবেন? মা ডাকছেন।

তুমি কি রামজীবনবাবুর ছেলে? ছেলেটি মাথা নাড়িলে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন তোমার বাবা?

ভাল। ঘুমুচ্ছেন তিনি। বাঃ রে, আপনি বাড়ির মধ্যে না গেলে মা রাগ করবেন যে!

তোমার মাকে ব'লো—বেয়াই ভাল হ'লে আর এক দিন এসে জলখাবার চেয়ে খেয়ে যাব, বুঝলে বাবা? আজ তো আর বেলা নেই, এক কোশ পথ ভাঙ্‌তে রাত্রি হয়ে যাবে।

ছেলেটির চিবুক ধরিয়া আদরের ভঙ্গিতে তিনি বার কয়েক নাড়িয়া দিয়া বেহারাদের বলিলেন, পাল্কী ওঠা হরিয়া। অন্ধকার রাত—বনের পথ—

ক্রমশঃ

ব্যাক্টেরিয়ার জীবন-কাহিনী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান জীবজগতের তুলনায় অদৃশ্য জীবজগতের বিশালত্বের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মিলিমিটারের শতাংশ পরিমিত কোন জিনিস খোলা চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রকায় প্রাণী হইতে অদৃশ্য জীবজগৎ সুরু হইয়াছে। মাইক্রস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই অদৃশ্য জীবজগতের আকৃতি-প্রকৃতি মানুষের অজ্ঞাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হল্যাণ্ডের ভন লিউভেনহক স্বহস্তনির্ম্মিত অতিসাধারণ আণুবীক্ষণিক যন্ত্রসাহায্যে পুকুরের ময়লা জল, পনির ও অন্যান্য বহুবিধ জিনিস পরীক্ষা করিতে করিতে এই অদৃশ্য জগতের কতকগুলি অদ্ভুত জীব প্রত্যক্ষ করেন। ইহারা অদৃশ্য জীবজগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার প্রোটোজোয়া-পর্য্যায়ভুক্ত প্রাণী। তৎপরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রোটোজোয়া অপেক্ষাও সহস্রগুণ ক্ষুদ্রকায় বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত অন্যান্য অসংখ্য জীবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের অদম্য অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির ফলে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রকায় প্রাণী অপেক্ষাও বহুগুণে ক্ষুদ্রতর এমন কতকগুলি জৈব (?) পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে যাহাদিগকে অতি-আধুনিক উন্নত ধরণের শক্তিশালী মাইক্রস্কোপের সাহায্যেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেও আমাদের দৃষ্টিশক্তির একটা সীমা আছে। মাইক্রস্কোপের 'লেন্স' যতই শক্তিশালী হউক না কেন, এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম কোন বস্তুই পরিষ্কার রূপে দেখা অসম্ভব। শেষোক্ত জৈব পদার্থ ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রাকার।

অদৃশ্য জীবজগতের প্রোটোজোয়া পর্য্যায়ভুক্ত বৃহত্তম প্রাণীদের মধ্যে এমিবা, ভর্টিশেলা, ছইলেরিয়া, প্যারামিসিয়াম, ষ্টেণ্টর প্রভৃতি বিচিত্র আকৃতির বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জিনিসকে এক শত গুণ বড় দেখায় এরূপ সাধারণ শক্তিসম্পন্ন একটি মাইক্রস্কোপ যন্ত্রের নীচে এক ফোঁটা ময়লা জল রাখিলেই তাহাতে এরূপ অসংখ্য জীবকে কিলবিল করিতে দেখা যাইবে। কয়েক জাতীয় প্রোটোজোয়া মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দেহে মারাত্মক রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ঘুম-রোগ প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ কয়েক জাতীয় প্রোটোজোয়া। দেড় শত হইতে দুই শত গুণ বড় দেখায় এরূপ শক্তিসম্পন্ন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এমিবিক আমাশয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষুদ্র এক বিন্দু মল পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে—তাহাতে অসংখ্য এমিবা নামক প্রাণী ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতেছে।

প্রায় দুই শত হইতে চারি শত গুণ বড় দেখায় এরূপ শক্তিসম্পন্ন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এক ফোঁটা ময়লা জল পরীক্ষা করিলে তাহাতে প্রোটোজোয়া অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় বিচিত্র আকৃতিবিশিষ্ট বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহারা প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝামাঝি ডায়েটম নামে এক প্রকার জৈব পদার্থ। বিভিন্ন জাতীয় অধিকাংশ ডায়েটমই প্রায় নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। তবে কোন কোন ডায়েটমের অপূর্ব্ব গতিভঙ্গী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সঞ্চরণশীল অবস্থায় ইহাদের সম্মিলিত কোষগুলি পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইয়া এত দূর প্রসারিত হয় যে, তখন অতি সাধারণ মাইক্রস্কোপের সাহায্যেও পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। ছয়-সাত-শত হইতে সহস্রগুণের উর্দ্ধ শক্তিসম্পন্ন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ অপেক্ষা বহুগুণ ক্ষুদ্রতর কতকগুলি জৈব পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই ব্যাক্টেরিয়া নামে পরিচিত। পাশাপাশি ভাবে এক ইঞ্চির ২৫,০০০ ভাগের এক ভাগ এবং লম্বায় উহার প্রায় পাঁচ হইতে আট গুণ, ইহাই সাধারণতঃ ব্যাক্টেরিয়ার দেহের পরিমাণ। অবশ্য ইহা অপেক্ষাও বড় এবং বহু গুণ ছোট ব্যাক্টেরিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, ব্যাক্টেরিয়া অপেক্ষাও বহুগুণ ক্ষুদ্রকায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জৈব পদার্থেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহারা এতই ক্ষুদ্র যে, অধুনা-আবিষ্কৃত চরম শক্তিশালী মাইক্রস্কোপের সাহায্যেও তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বিবিধ পরীক্ষায় ইহাদের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে নানাপ্রকার মারাত্মক রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থগুলি ভাইরাস নামে

পরিচিত। বসন্ত, হাম, ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ব্যাধি ভাইরাস কর্তৃকই মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। নানা কারণে ভাইরাসকে জীবপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে জৈব ও অজৈব এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক্রম-পরিণতি বা অভিব্যক্তির দিক্ হইতে ধরিতে গেলে স্বভাবতঃই মনে হয়, অজৈব পদার্থ হইতেই জৈব পদার্থের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু জৈব, অজৈবের মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্র কোথায়? ইহা একটি দুরূহ সমস্যা। ভাইরাসই হয়ত বা এই যোগসূত্র হইতে পারে। যাহা হউক, পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কাজেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ব্যাক্টেরিয়ার কথাই বলিব।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র, আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে বিভিন্ন জাতীয় অগণিত ব্যাক্টেরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতি ক্ষুদ্রকায় এক কৌষিক উদ্ভিদপর্য্যায়ভুক্ত জৈব পদার্থ। বিভিন্ন জাতীয় কত রকমের ব্যাক্টেরিয়া আছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে সংখ্যায় তাহারা যতই থাকুক সাধারণতঃ তিন প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যাক্টেরিয়াই দেখা যায়। কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া দণ্ডাকৃতি। তাহাদিগকে বলা হয়—ব্যাচিলাস্ (Bacillus) কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া গোলাকার। তাহারা কক্কাস্ (Coccus) নামে পরিচিত। আবার কতকগুলি দেখিতে আঁকাবাঁকা। তাহাদের নাম—স্পিরিলাম (Spirillum) অনেক ব্যাক্টেরিয়াই নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু কতকগুলি দ্রুত সঞ্চরণশীল। কোন কোন ব্যাক্টেরিয়ার গায়ে লেজের মত এক বা একাধিক সূক্ষ্ম তন্তু আছে। উহার সাহায্যেই তাহারা তরল পদার্থের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। কলেরা ভিব্রিও, টাইফয়েড্ ব্যাচিলি প্রভৃতির দেহে ঐরূপ সূক্ষ্ম তন্তু দেখা যায়। সেই তন্তু সাহায্যেই তাহারা ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। উচ্চশক্তিসম্পন্ন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ইহাদিগকে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রায় ৮৭ বৎসর পূর্ব্বে ডেভেইন নামক একজন ফরাসী রোগতাত্ত্বিক সর্ব্বপ্রথম রোগোৎপাদক ব্যাক্টেরিয়ার সন্ধান পান। রোগাক্রান্ত একটি ভেড়ার রক্ত মাইক্রস্কোপে পরীক্ষা করিয়া তিনি তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দণ্ডাকৃতি অসংখ্য পদার্থ দেখিতে পাইলেন। ইহারা এক জাতীয় ব্যাক্টেরিয়া। ইহারাই যে ভেড়ার দেহে রোগোৎপাদন করিয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত প্রমাণ পাইলেন। ব্যাক্টেরিয়াই যে অধিকাংশ রোগোৎপত্তির কারণ, ইহার প্রায় ৯ বৎসর পরে বিশ্ববিশ্রুত লুই পাস্তুর তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়া জগদ্বাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

ব্যাক্টেরিয়ার মত সূক্ষ্ম এক কৌষিক জীবের শরীরাভ্যন্তরে উচ্চ স্তরের প্রাণীদের মত কোন সুশৃঙ্খলিত বিশিষ্ট যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব নাই। উন্নত স্তরের উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদের দেহাভ্যন্তরে যেমন বিশেষ বিশেষ জটিলতা দৃষ্টিগোচর হয় ব্যাক্টেরিয়ার দেহগঠন তাহা অপেক্ষা অতিশয় সরল। এমন কি, ইহাদের দেহকোষে সুগঠিত কোন 'নিউক্লিয়াসে'র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। নিউক্লিয়াসের রাসায়নিক পদার্থগুলি রহিয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি ব্যাক্টেরিয়ার দেহ-কোষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাহার কোন কোষ বা নির্দ্দিষ্ট আবরণী নাই। পাতলা আবরণে আবৃত অতি সূক্ষ্ম এক বিন্দু আণুবীক্ষণিক জীবপঙ্ক ছাড়া ব্যাক্টেরিয়া আর কিছুই নহে। ইহাদের অঙ্গসংস্থানও যেরূপ সরল, জীবনযাত্রাপ্রণালীও সেরূপ সহজ। জন্মগ্রহণ এবং দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করাই ইহাদের প্রধান কাজ। এক একটি ব্যাক্টেরিয়ার জীবনকাল ২০ হইতে ৩০ মিনিট মাত্র। অবশ্য বিশ মিনিট পরেই যে ইহারা মরিয়া যায় তাহা নহে। তখন একটি ব্যাক্টেরিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুইটিতে পরিণত হয়। আবার দুইটি ভাঙিয়া চারিটি হয়। খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত হইলে এরূপে একটি ব্যাক্টেরিয়া হইতে ঘণ্টাদশেকের মধ্যে দুই কোটির অধিক ব্যাক্টেরিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথম ব্যাক্টেরিয়াটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সন্তানরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার ফলে তাহার আদি অবস্থার রূপান্তর ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার নিজস্ব সত্তার বিনাশ ঘটে না।

খাদ্য ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনজনিত প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইলে ব্যাক্টেরিয়া তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা বন্ধ করিয়া দেয় এবং নিজের শরীরের চতুর্দ্দিকে একটি কঠিন আবরণী সৃষ্টি করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাহার মধ্যে অবস্থান করে। আবরণী-বেষ্টিত এই নিষ্ক্রিয় ব্যাক্টেরিয়াকে তখন বলা হয় 'স্পোর' (spore) আমরা এই 'স্পোর'কে বীজাণু নামে অভিহিত করিব। এই 'স্পোর' বা বীজাণু অবস্থায় ইহারা বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই এই বীজাণু হইতে ব্যাক্টেরিয়া বাহির হইয়া আবার তাহার স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম সুরু করিয়া দেয়। মোটের উপর অস্বাভাবিক উপায়ে সময় সময় মৃত্যু বরণ করিলেও স্বাভাবিক মৃত্যু ইহাদের নাই। ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ফুটন্ত জলের উত্তাপে ব্যাক্টেরিয়া মরিয়া যায়। কিন্তু ঐ প্রকার উত্তাপে
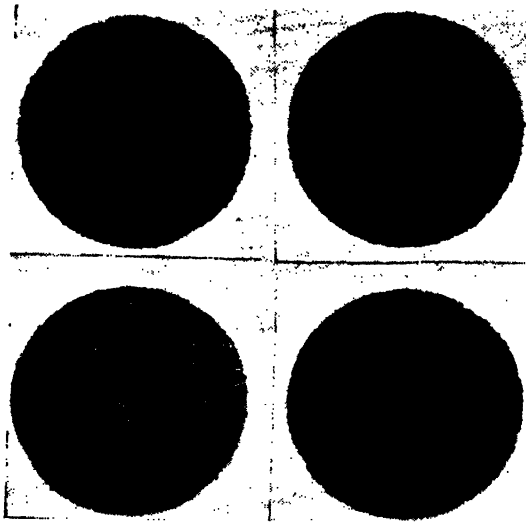
মনুষ্যরক্তে সঞ্চালিত রোগোৎপাদক বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া।
লেখককর্তৃক গৃহীত মাইক্রোফটো

ব্যাক্টেরিয়ার বীজাণু কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতিগুলিকে বীজাণুশূন্য করিবার নিমিত্ত এই কারণেই অটোক্লেভ নামক যন্ত্রে বায়ুমণ্ডলের দ্বিগুণ চাপে ১২০ ডিগ্রি উত্তাপে রাখিয়া দিতে হয়। বীজাণু নষ্ট করিবার এরূপ উপায় অবলম্বন করা সত্বেও কোন কোন বীজাণু জীবিত থাকিয়া ক্ষতকে বিষাক্ত করিতে দেখা যায়। অসম্ভব ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিয়াও ইহাদিগকে বিনষ্ট করা যায় না। তরল বায়ু অসম্ভব ঠাণ্ডা। ইহার উত্তাপের মাত্রা -১৯০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। ইহাতে কোন প্রণীকে ডুবাইয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। কিন্তু তরল বায়ুতে ব্যাক্টেরিয়ার বীজাণু রাখিয়া দেখা গিয়াছে—ছয় মাসের অধিক কাল তাহাতে থাকিয়াও তাহাদের জীবনী শক্তি বিনষ্ট হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বছর রাখিবার পর উপযুক্ত অবস্থায় নীত হইবামাত্র পুনরায় ব্যাক্টেরিয়ার আকার ধারণ করিয়া স্বাভাবিক দ্রুতগতিতেই বংশ বিস্তার করিয়াছে। ব্যাক্টেরিয়ার জীবনকাল বিশ মিনিট ধরিলে দেখা যায়—লক্ষাধিক পুরুষ উৎপাদনে যত সময় লাগিত তাহারও অধিক সময় এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি বীজাণু অবস্থায় ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে। অর্থাৎ পিরামিড বা ঐরূপ কোন কিছু নির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বে কোন আদিম প্রস্তর যুগের মানব রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত নিদ্রাভিভূত হইয়া আজ বিংশ শতাব্দীতে হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার ক্রিয়া-দেখিলে ব্যাপারটা যেরূপ দাঁড়ায়—বংশানুক্রমিক হিসাবে ধরিলে উক্ত ব্যাক্টেরিয়ার বীজাণুর অবস্থাও তদ্রূপ। বীজাণু অবস্থায় ব্যাক্টেরিয়া পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত হইয়া জলে, স্থলে, অকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। প্রায় চার মাইল উর্দ্ধের বায়ুস্তরের মধ্যেও ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে। বহু কাল সঞ্চিত বরফস্তূপ, শিলাবৃষ্টির শিলা-খণ্ডের মধ্যেও ইহাদের অস্তিত্বের অভাব নাই। অনুকূল অবস্থায় উপনীত হইবামাত্রই আত্মপ্রকাশ করিয়া ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

অতি নিম্নস্তরের প্রোটোজোয়া ও শৈবাল-জাতীয় এক কোষিক কোন কোন উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায়—উহাদের একটি কোষ অপর একটি কোষের সহিত মিলিত হইবার পর উভয়ে একত্রিত হইয়া যায়। ইহা এক প্রকার আদিম যৌন-মিলন। ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বংশবিস্তারের জন্য ইহারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। অটোক্লেভের সাহায্যে বীজাণু শূন্য করিয়া এক পাত্র তরল কাইয়ের (যাহাতে ব্যাক্টেরিয়া বাড়িতে পারে এরূপ পদার্থ) মধ্যে ব্যাক্টেরিয়াসম্পৃক্ত একটি সূচ ডুবাইয়া দিলে প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যাইবে—সেই তরল পদার্থ ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে—এক ঘনইঞ্চি কাইয়ের মধ্যে প্রায় ৮০০০০০০০০০০ ব্যাক্টেরিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কাচপাত্রে রক্ষিত কাইয়ের উপর মাছি হাঁটিয়া যাওয়ার পর
অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়া উৎপাদিত হইতেছে

আঁকাবাঁকা আকৃতিবিশিষ্ট ব্যাক্টেরিয়া—স্পিরিলাম

ইহা হইতেই ইহাদের দ্রুত প্রজনন-ক্ষমতার বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিন প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ব্যাক্টেরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার আকৃতির মধ্যেই অসংখ্য রকমের বিভিন্ন জাতীয় ব্যাক্টেরিয়া রহিয়াছে। ইহাদের কতকগুলি এক সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া অবস্থান করে। কতকগুলি আবার শিকলের আকারে পর পর গ্রথিত থাকে। বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া আছে যাহাদের আকৃতি একই রকমের। চোখে দেখিয়া পার্থক্য নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেবল ক্রিয়া দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য জানিতে পারা যায়। ইহারা দেখিতে গোলাকার কিন্তু শৃঙ্খলাকারে গ্রথিত। এইরূপ শৃঙ্খলাকার এক জাতীয় ব্যাক্টেরিয়া দুধকে দইয়ে পরিবর্ত্তিত করে। কোন কোন শৃঙ্খলাকার ব্যাক্টেরিয়া মনুষ্যদেহের রক্তের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি করে। আবার কতকগুলি শৃঙ্খলাকার ব্যাক্টেরিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। প্রায় অধিকাংশ সুস্থ ব্যক্তির মুখগহ্বরে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

নাইট্রেট-উৎপাদনকারী ব্যাক্টেরিয়া

অধিকাংশ ব্যাক্টেরিয়াই আমাদের দেহে গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। টোমেন-বিষের কথা সকলেই জানেন। বিভিন্ন রকমের দূষিত খাদ্যদ্রব্যে এই বিষ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তমরূপে বীজাণুশূন্য না করা হইলে অথবা কৌটার মুখ যথাযথভাবে আবদ্ধ না থাকিলে সংরক্ষিত মাংস, তরিতরকারি প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর মধ্যে এই বিষ যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত হয়। ব্যাচিলাস আরট্রাইক, ব্যাচিলাস বোরুলিনাস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ব্যাক্টেরিয়া এই বিষ উৎপাদন করিয়া থাকে। পশু, পাখী, ইঁদুর প্রভৃতির অন্ত্রের মধ্যে কয়েক জাতীয় ব্যাক্টোরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ব্যাক্টোরিয়া হইতেও টোমেন বিষের উৎপত্তি হয়।

খাদ্যদ্রব্য আগুনে সিদ্ধ করিয়া লইলে ব্যাক্টেরিয়া মরিয়া যায় বটে; কিন্তু তাহাদের দেহনিঃসৃত বিষাক্ত

কলেরার ব্যাক্টেরিয়া

দ্রব্য খাদ্যের মধ্যে থাকিয়া যায়। আগুনে সিদ্ধ না করিয়া এরূপ কোন কাঁচা খাদ্য খাইলে বিষের ক্রিয়া অতি উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। দুধের সাহায্যে অনেক সময় যক্ষ্মা রোগের বীজাণু বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় দুগ্ধব্যবসায়ী গোয়ালারা যে ভাবে দুধ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকে তাহাতে এই রোগবীজাণু বিস্তৃতির যথেষ্ট সুবিধা হয়। অবশ্য শরীরে প্রবেশ করিলেই যে সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাক্টেরিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে পারে এমন নহে, বৃদ্ধি পাইবার উপযুক্ত খাদ্য এবং স্থান পাইলেই তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে। শীত ঋতুর প্রারম্ভে অনেক সুস্থ ব্যক্তির গল-নালীতে নিউমোকক্কাস নামক ব্যাক্টেরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরে অন্য কোন নূতন ব্যাক্টেরিয়া ঢুকিলে ইহারা তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে পারে।

ক্লোষ্ট্রিডিয়াম টেটানি নামক ব্যাক্টেরিয়া কতকগুলি স্পোর বা বীজাণুরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ এই অবরোধ শক্তি হ্রাস পাইলেই দেহস্থিত বীজাণুগুলি সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। মুখের লালা, শ্লেষ্মা এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যেও এই সকল বীজাণু অপরের দেহে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট ঘটায়। কলেরা ভিব্রিও, টাইফয়েড ব্যাচিলাস পরিস্রুত জল অথবা স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। শহর কিংবা গ্রামের জল সরবরাহ ব্যবস্থার কোন স্থানে একবার দুই-একটি ব্যাক্টেরিয়া প্রবেশ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র এই রোগ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। শরীরের কোন স্থানে একটু ঘা হইলে বা কোন স্থান একটু কাটিয়া বা ছড়িয়া গেলে সেই ছিদ্রপথে ব্যাক্টেরিয়া শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। মেনিনজাইটিস্, বিসর্প, ডিপথেরিয়া; যক্ষ্মা, টাইফয়েড, আমাশয়, ধনুষ্টঙ্কার, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতির বীজাণু নাক, মুখ বা কর্ত্তিত স্থান প্রভৃতি নানা দ্বারপথে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং যেখানে শরীরের প্রতিরোধশক্তি কম সেইখানেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসে। বিশেষ বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া বিশেষ বিশেষ দেহযন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়; ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক জাতীয় ব্যাক্টেরিয়া আছে যাহারা আমাদের উপকার না করিলেও কোন অপকার করে না। কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া আবার আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে—এমন কি পরোক্ষভাবে হইলেও তাহারা আমাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী সুগম করিবার জন্য একান্ত অপরিহার্য্য। এরূপ কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া জমিতে অবস্থান করে এবং বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য্য—নাইট্রেট নামক পদার্থ উৎপাদন করে। এজোটোব্যাক্টর এই ধরণের ব্যাক্টেরিয়া। মটর, শিম প্রভৃতি গাছের শিকড়ে এক প্রকার গুটি জন্মিতে দেখা যায়। ইহাও এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়ার কাজ। ইহার সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রেট উৎপাদিত হয় এবং উদ্ভিদ তাহা শোষণ করিয়া লয়। ব্যাক্টেরিয়া জীবজন্তুর মৃতদেহের পচন ঘটাইয়া তাহাদিগকে অজৈব পদার্থে পরিণত করে, এরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটাইলে পৃথিবী মৃতদেহের স্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। তা'ছাড়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং চা, চুরুট, মদ প্রভৃতির বিশিষ্ট স্বাদ ও গন্ধ উৎপাদনে ব্যাক্টেরিয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

জীবদেহের পক্ষে অধিকাংশ ব্যাক্টেরিয়াই দুর্দ্দমনীয় শত্রু, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদেরও কতকগুলি স্বাভাবিক শত্রু রহিয়াছে। আমাদের রক্তের মধ্যে অসংখ্য শ্বেতকণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই ব্যাক্টেরিয়ার স্বাভাবিক শত্রু। শরীরের অভ্যন্তরে ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ আরম্ভ হইলেই শ্বেত কণিকাগুলি সেইস্থানে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। শ্বেত কণিকাগুলি সতেজ ও পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় থাকিলে ব্যাক্টেরিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নির্ম্মূল হয়, নচেৎ সংখ্যাধিক্যের জোড়ে জয়লাভ করিলেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেহকোষ হইতে ব্যাক্টেরিয়ার দেহনিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থের প্রতিষেধক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহাকে 'য়্যান্টি-টক্সিন' বলে। বিভিন্ন জাতীয় ব্যাক্টেরিয়াসঞ্জাত বিষ বা 'টক্সিনে'র বিভিন্ন রকম 'য়্যান্টি-টক্সিন' উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা শরীরে এই বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। 'য়্যান্টি-টক্সিন' সিরাম চিকিৎসার ইহাই মূল তত্ত্ব। প্রখর সূর্য্যরশ্মির উত্তাপের সাহায্যেও বহু জাতীয়
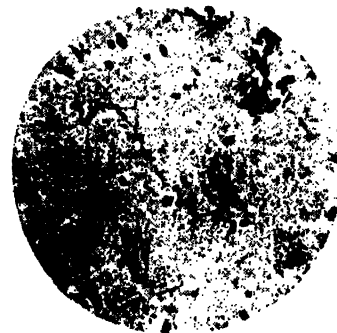
টাইফয়েড ব্যাক্টেরিয়া
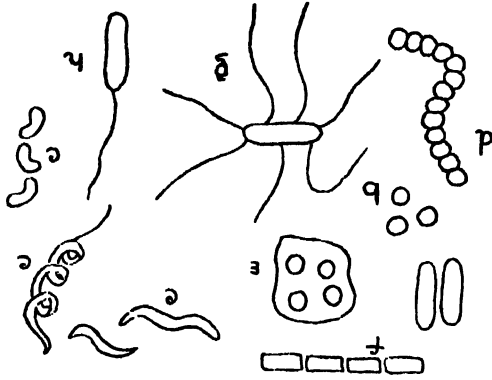
a—বাচিলাস্। b—ককাস্। c—স্পিরিলাম। d—ষ্ট্রেপ্টো ককাস্। g, h—লেজওয়ালা ব্যাক্টেরিয়া

ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস হয়, তা'ছাড়া ব্যাক্টেরিয়া ও তাহার জীবাণুনাশক বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থও রহিয়াছে। শ্লেষ্মার মত ছত্রাক ও বহুজাতীয় প্রোটোজোয়াও ব্যাক্টেরিয়া উদরস্থ করিয়া থাকে। ব্যাক্টেরিওফাজ নামে পরিচিত অতিসূক্ষ্ম এক প্রকার জীবাণুও খুব সম্ভব ব্যাক্টেরিয়ার ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যাক্টেরিয়া বা তাহার বীজাণু ছড়ানো রহিয়াছে। সুস্থ শরীরেও পর্য্যন্ত অগণিত ব্যাক্টেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যাক্টেরিয়ার অসংখ্য বীজাণু বাতাসে সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণাসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরের আকাশ বাতাস অধিক পরিমাণে ব্যাক্টেরিয়া-অধ্যুষিত। তাছাড়া মুক্ত বায়ু অপেক্ষা আবদ্ধ স্থানেই ব্যাক্টেরিয়া-বীজাণুর আধিক্য দেখা যায়। থিয়েটার, সিনেমা, বক্তৃতাগৃহ বা বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থারহিত কক্ষসমূহ নানা জাতীয় অগণিত ব্যাক্টেরিয়ায় ভর্ত্তি হইয়া যায়। দর্শক, শ্রোতা বা অগন্তুকেরা পায়ে পায়ে বা গাত্রবস্ত্রসংলগ্ন করিয়া অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়া লইয়া আসে। পাখার বাতাস বা অন্যবিধ বায়ুকম্পনে তাহা আবদ্ধ ঘরে ছড়াইয়া পড়ে। তাছাড়া লোকের কথা বলায়, হাঁচিতে, কাশিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাক্টেরিয়া বাহির হইয়া থাকে। সেগুলি সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগের পত্তন করে। অবশ্য যদিও নানাজাতীয় ব্যাক্টেরিয়া আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র ছড়ানো রহিয়াছে এবং তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষারও উপায় নাই, তথাপি যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে আক্রমণ-সম্ভাবনা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-উৎসবের সূচনা

শ্রীসাধনা কর ও শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

শান্তিনিকেতন আশ্রমকে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্র মনে করলে তাকে একপেশে ক'রে জানা হবে; এটি যেমন শিক্ষায়তন তেমনি মহর্ষির তপস্যার ক্ষেত্র এবং ঠিক সেইরূপই এটি কবির রচিত 'আনন্দ-লোক'। শান্তিনিকেতনের উত্তর দিকের তোরণ-শীর্ষদেশে লৌহফলকে লেখা আছে—"আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি।"

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বহুমুখী সৃজনী-প্রতিভার আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল। সে বিরাট্ শক্তিপুঞ্জের অংশবিশেষ কর্ম্মজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গড়ে তুললে এই আনন্দ-লোক, তার পরিচয় সর্বসমক্ষে এখনো সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। বিশেষ ক'রে আনন্দ সৃষ্টির অনেক অনুষ্ঠান লোকচক্ষুর অন্তরালে অবগুণ্ঠিত। কবির অবর্তমানে তাঁর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত আশ্রমের সেই রস-ঘন আনন্দ-পরিবেশের কথা আজ বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে।

আশ্রমের আনন্দধারার প্রধান প্রস্রবণ ঋতু-উৎসব-অনুষ্ঠান। দেশের প্রাচীন উৎসব-অনুষ্ঠানের মামুলি ধারাবাহিকতা গুরুদেবের ভাবস্রোতে পেল নতুন রূপ, নতুন প্রাণ। আজ দেশের অনেক স্থানেই ঋতু-উৎসবের প্রচলন হচ্ছে। বাইরেও বর্ষামঙ্গল, নববর্ষ প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৈদিক শ্লোকমন্ত্রে, নাচে-গানে, আবৃত্তি অভিনয়ে জমকালো ক'রে তুলবার যে-প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় তার মূল প্রবর্তনা-ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আশ্রম। এই

ধারা সঞ্চালিত করতে ঘরে বাইরে গুরুদেবকে যে কিছু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু শুধু গুরুদেবের দৃঢ় ইচ্ছার আনুকূল্যেই আজ এই উৎসবগুলি আধুনিক রূপে সঞ্জীবিত। বাইরের লোকের কাছে ঋতু-উৎসব খানিকটা রস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যরূপে প্রতিভাত হ'লেও গুরুদেবের কাছে এর মর্যাদা ছিল স্বতন্ত্র। এই ঋতুর উৎসব তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে ভাবসম্পদে, প্রসারিত করেছে লেখার অজস্রতায়। একে অবলম্বন করেই তাঁর অগুন্তি গান ও কবিতা রচিত, কত পালা-গান, নাটক অভিনয়ের অভ্যুদয়। শুধু তাই নয়, এই উৎসবের অসংখ্য অভিভাষণে সুযোগ পেয়েছেন তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বলবার। এবারে ১৩৪৮ সনের ১লা বৈশাখে 'সভ্যতার সংকট' নামে তিনি যে বিখ্যাত অভিভাষণ দিয়েছেন, এই তাঁর শেষ অভিভাষণ, নববর্ষ-উৎসব উপলক্ষ্যেই তা তৈরি। ভাবের অভিব্যক্তিমূলক সুরুচিসম্মত নাচ, ভদ্র মেয়েছেলেদের নাটক অভিনয়ে যোগদান এ সবও ঋতু-উৎসবের পরিবর্তন ধারায় প্রবর্তিত। আমাদের দেশের ধর্ম অনুষ্ঠানগুলি যেমন কোনক্রমেই বন্ধ থাকা নিষিদ্ধ, আশ্রমে ঋতু-উৎসবও ছিল তেমনি। এর জন্য বাইরে থেকে বাধা এসেছে অনেক, নানা রকম কথা পৌঁছেছে কানে, তবু কেন যে তিনি তা বন্ধ করতে নারাজ ছিলেন, সে সম্বন্ধে ১৩৪৫ সনের চৈত্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'বসন্ত উৎসব' থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। মহাত্মাজীর অনশন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এই অভিভাষণে আছে,—

"বৎসরে বৎসরে আশ্রমের এই আম্রকুঞ্জে দোল-উৎসবের দিনে আমাদের নৃত্যে গানে কাব্যে ছন্দে সুন্দরের অভ্যর্থনা করে থাকি। বসন্তের দক্ষিণ সমীরণে যে দৈববাণী ঊর্দ্ধলোক থেকে নেমে এসেছে এই ধরণীর ধুলায়, তাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত করে নেবার জন্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন...আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয়তার উপক্রমণিকা আমাদের দ্বারের নিকট সমাগত। কঠোর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁর সেই আত্মদানযজ্ঞের আরম্ভ হয়েছে।...এই আত্মদানযজ্ঞের মধ্যে এই মহৎ অর্থ আছে যে, যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে মানুষ লাভ করে কঠিন দুঃখেরই দুর্গম পথে।...দুঃখ-বিপদ সংশয় আশঙ্কার অন্তর থেকেই যাঁর প্রসন্নতার আবির্ভাব, জয়ধ্বনি ক'রে আমরা তাঁর অভ্যর্থনা করব। আজ তাঁর বাণী এসেছে বসন্তে অনাহত বীণায় অশ্রুত গানের সুরে, শালবীথিকার শাখায় শাখায়; তাকে মানুষের বাণীর শিল্প দিয়ে গ্রহণ করব।... মানুষের শ্রেষ্ঠদান দুঃখের দান। ত্যাগী পুরুষের হাত দিয়ে মানুষ এই দান ইতিহাসে সঞ্চয় করতে থাকে। সেই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আহুতির আহরণ আজ দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে। এই আত্মত্যাগের মধ্যে যে কঠোর আছে তারই অন্তরে আছে সুন্দর, আজ আমরা তারই প্রতীক দেখব বনশ্রীর আমন্ত্রণ সজ্জায়। দেখব, যা কিছু জীর্ণ ম্লান তা দক্ষিণ হাওয়ায় ঝরে পড়ছে, ধরণীর ধুলায় বিলীন হচ্ছে, আর তারি থেকে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে সুন্দরের শাশ্বত রূপ চির আশ্বাস বহন করে।"

এই প্রসঙ্গে প্রধান উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা দরকার। একমাত্র বংশধর দৌহিত্র নীতেন্দ্রকেও যখন মৃত্যু এসে নিয়ে গেল ছিনিয়ে, সে যে কী কঠিন আঘাত, তবু সেবারও (১৯৩২ সন) তিনি বন্ধ হ'তে দিলেন না আসন্ন বর্ষামঙ্গল। ভয়ে সংকোচে কেউ আর তাঁর সামনে নাচগানের মহড়া দিতে চায় না। আসল কারণটা যখন তিনি বুঝতে পারলেন, ডেকে বললেন সবাইকে "আমার কোনো ক্ষতি হয়েছে বা আমার দ্বারে এসেছে আঘাত, তার জন্যে বন্ধ থাকবে কেন আশ্রমের উৎসব। একে শুধু আমোদ-আহ্লাদ ব'লে দেখলেই জাগবে সংকোচ। আমি একে জানি ব্যক্তি বা সমষ্টির শোক দুঃখ আঘাত আন্দোলন থেকে উর্ধ্বে, এই রসসৃষ্টিতে বর্ষে বর্ষে কালে কালে পৃথিবীতে দুঃখের মধ্যে আনন্দের আগমন।" তিনি এমনি ভাবের দ্বারা মনে এবং কর্মে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তাই এবার (১৩৪৮) তাঁর তিরোভাবের পর বিচ্ছেদব্যথায় কাতর হয়েও আশ্রমবাসী তাঁকে নিগূঢ়ভাবে স্মরণ ক'রে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান সমারোহে সম্পন্ন করতে বাধ্য হলেন।

গুরুদেব যখন আপন কর্মরূপের পরিকল্পনায় ছিলেন নিমগ্ন, ভাবনার মধ্যে দেখছিলেন বিশ্বভারতীর নানা রূপ, সেই গোড়ার দিকের দিনগুলিতে অনেক কর্মানুরাগী অনেক জ্ঞান-পিপাসু এসে কবির ভাবের অভিব্যক্তিতে মিশিয়েছেন তাঁদের স্ব স্ব কর্ম-প্রচেষ্টা, তাঁদের বিভিন্ন চিন্তাপ্রবাহ। সে-সবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এখানকার কর্ম, সংস্কৃতি এবং আনন্দ সৃষ্টির রকমারি ধারা সঙ্গমে।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার ছ'সাত বছর পরে ১৯০৮ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আশ্রমের কাজে এসে যোগ দিলেন। স্বাধীন জ্ঞান-চর্চার স্পৃহাও তাঁকে প্রলুব্ধ ক'রে টেনে এনেছিল। আশ্রমের জীবনে তখন জ্ঞানালোচনার আবহাওয়াই একরূপ একান্তভাবে প্রবল। অনুষ্ঠান ক'রে উৎসবের রেওয়াজ সে সময় এখানে প্রবর্তিত হয় নি। আনন্দ-উৎসবের মধ্যে প্রধানত গুরুদেবের নিত্য নূতন রচিত গান দিয়ে তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল নাটের কাণ্ডারী', আচার্য দিনেন্দ্রনাথই রাখতেন আসর জমিয়ে। তিনিও তখন অল্পদিনেরই আগন্তুক। অবশ্য সে সময় বিনোদনপর্বে

প্রতিসন্ধ্যায় গুরুদেব ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে গানে, গল্পে, পাঠে ও হেঁয়ালি নাট্যাভিনয়ে থাকতেন মশগুল, সে কথা বলা হবে পরে। তখন একটা নিয়ম ছিল শিক্ষক এবং কর্মিগণকে ছেলেদের সঙ্গে বসবাস ক'রে তাদের দেখা-শুনা করতে হ'ত। ক্ষিতিমোহনবাবুও পেলেন এক ঘর ছেলের ভার। শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয় দেশের দশের কাজে উদ্যোগী এক দল ছেলেকে আপন ঘরে নিয়ে নিজের তদ্বিরে তাঁর ছাত্রদের পল্লীসংগঠন, দুঃস্থদের রক্ষা করা, দেশের লোকের অবস্থা জানা প্রভৃতি কাজে আকৃষ্ট করতে প্রচেষ্ট ছিলেন। আরেক দল ছেলের উৎসাহ ছিল সাহিত্যালোচনায়। এদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়। এই দুই দল থেকে বাদ পড়ল যারা, তাদের একটা বড়ো দলকে নিয়ে ক্ষিতিমোহন বাবু পড়লেন ভাবনার মধ্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন আজকের শ্রীযুক্ত মুকুল দে, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, মণি দত্ত ও মণি গুপ্ত প্রভৃতি। কেমন ক'রে কী শিক্ষা এঁদের দেবেন! শিশুমনের 'পরে অনিচ্ছায় কোনো শিক্ষাকে চাপিয়ে দেওয়াও গুরুদেবের শিক্ষা-রীতি-বিরুদ্ধ। ক্ষিতিমোহনবাবু এঁদের ব'লে দিলেন—'আমি তো তোমাদের চালাব না, তোমরাই আমাকে নেবে চালিয়ে। দেখছ তো সারাক্ষণ বই নিয়েই আমার কারবার, তোমরা ঠিক সময়ে আমাকে উঠিয়ে দিয়ো, কাজ করিয়ে নিয়ো ব'লে ব'লে। আমাকে পরিদর্শক ব'লে জেনো না, তোমাদের কর্তৃত্ব তোমাদেরই হাতে।" ব্যাপারটাতে ফল পাওয়া গেল আশাতিরিক্ত। ছোট ছেলের দল কর্তৃত্বের অধিকারে করিৎকর্মা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুসম্পন্ন করে নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ, স্নান ক'রে এসে তাড়া লাগায় উপরওয়ালাকে। ব্যস্ততার চাঞ্চল্য তাদের মনকে তুললে আনন্দিত ক'রে। তাদের স্ফূর্তি দেখে ক্ষিতিমোহনবাবুও হলেন অনুপ্রাণিত। বুঝতে পারলেন, এমনিভাবেই এদের চালিয়ে নিতে হবে। এখানে তখন ছাত্রদের সাহিত্যসভার ভিত পত্তন হয়েছিল, কিন্তু তখনো তৈরি হয়ে ওঠে নি তার উৎসবময় কোনো বাহ্য রূপ। সেই শুধু কথা দিয়ে সভাপতি নির্বাচন, অন্য জায়গার মতো চেয়ার টেবিলে বসা, বাহিরের পদ্ধতির অনুকরণ। সে নিয়ম প্রথম রূপ বদলালো ক্ষিতিমোহনবাবুর হাতে; তার গোড়াকার কথা ছিল ছাত্রদের কাজে লাগানো। তিনি কাশীর লোক। মন্দিরে মন্দিরে কথকতায়, ঋতুবিশেষে উৎসব-অর্চনায়, এবং দেউলের গাত্রোৎকীর্ণ পটে সাজসজ্জার বিচিত্র সমারোহ তিনি দেখে এসেছেন ছেলেবেলা থেকে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি নতুন সভা-সংগঠনে হাত দিলেন। আশ্রমে তখনো শিল্পশিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি, কোনো শিল্পীরও হয় নি আগমন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র যদুকিশোর চক্রবর্তী, সুধীর মিত্র, মুকুল দে, যতীন দে, যতীন দাস, মণিভূষণ গুপ্ত প্রভৃতিকে সভা সাজানো, আলপনা দেওয়া ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত ক'রে তোলা গেল। তখন ফুলে পাতায় সভাঘর হ'ল সুসজ্জিত, ধূপে-ধুনায় আমোদিত হ'ল চারি দিক, ভারতীয় নিয়মে আসন আর বেদী এলো, এলো মালা চন্দনে সভাপতি বরণ, অভ্যাগতদের বিনম্র নমস্কার দেওয়া আশ্রমে প্রচলিত হয়ে গেল। এ সবের নতুনত্ব নেশা ধরিয়ে দিলে ছেলেদের। সারা দিন ব'সে তারা সাধ্যমতো সুন্দর ক'রে জাঁকিয়ে তোলে সভা, দু-তিন মাইল দূর থেকে কাঁধে ক'রে নিয়ে আসে কেয়া, জলপদ্ম আর সাপলার বোঝা। তারা গ্রামের পরে গ্রাম পেরিয়ে অনেক কায়িক পরিশ্রম সহ্য করতেও বিমুখ হ'ত না সভা সাজানোর জন্যে। এ নিয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছে কত। গুরুদেব অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এদের শিল্প ও সৌন্দর্য-অভিমুখী কাজের উৎসাহ দেখে, আর এই উপলক্ষ্যে এদের মধ্যে নবীন প্রফুল্লতার আবেগ সঞ্চারে। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহে সভার জন্য এই নিয়মই বরাবর আশ্রমে অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। সাহিত্যে আর দেশীয় শিল্প-শ্রীতে হ'ল মিতালি।

গুরুদেব তখন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, প্রত্যেক সপ্তাহে সাহিত্য-সভা হবে এবং এক-একবার এক-একটা ঘরকে তার ব্যবস্থার ভার নিতে হবে। ছেলেরা নিজেদের ঘরে সভা ডেকে সাহিত্য আর শিল্পসজ্জার প্রতিযোগিতা চালাতো। অতি সুন্দর সুরম্য হ'ত ভিন্ন ভিন্ন বাস-কুটীরগুলি। ঘর সাজানোর প্রথম ইতিহাসে আছে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী-সম্পাদিত হাতে-লেখা 'বীথিকা' পত্রিকার উদ্বোধন। তখন একটা হাতে লেখা পত্রিকা এখানে বের হ'ত, নাম ছিল 'শান্তি'। আর একটি পত্রিকা বের হ'ত কালীমোহন বাবুর ঘরের থেকে, ঘরের নামানুসারে পত্রিকাটির নাম ছিল "প্রভাত"। এই দুই মণ্ডলীর বাইরের ছেলেরা ঠিক করলে তাদেরও একটা পত্রিকা বের করতে হবে। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ছিলেন এই দলের দলপতি, তাঁরা থাকতেন শালবীথির তলায় বীথিকা ঘরে। সেই ঘরেই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহনবাবুর নেতৃত্বে তাঁরা তাঁদের ঘর সাজিয়ে সভা ডেকে খুব জাঁক ক'রে করলেন "বীথিকা" পত্রিকা প্রকাশিত। সেই সাজানো থেকেই ঘর সাজানোর রেওয়াজ হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, "বীথিকা"

পত্রিকাতে গুরুদেবের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান "শমীন্দ্রনাথে"র সম্বন্ধে চমৎকার একটি পরিচয়মূলক প্রবন্ধ লিখিত আছে। আশ্রমে তখন এমনি ফুলে পাতায় সাজানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল যে, বীথিকার এই আকস্মিক জাঁকজমকের অনুষ্ঠান দেখে প্রতিদ্বন্দ্বীহিসাবে "বাগানবাড়ি"র ছাত্ররা খুব জাঁকিয়ে করল তাদের "প্রভাত" পত্রিকার জন্মোৎসব। তাতে সুন্দর ক'রে সাজানো হ'ল বাগানবাড়ির মাটির ঘর, এমন কি তার খড়ের চাল অবধি সজ্জায় বৈচিত্র্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আশ্রমবাসীদের, এবং স্বয়ং একেবারে গুরুদেবকেই নিয়ে এসে বসাল তারা সে দিন সভাপতি ক'রে। শুনেছি এই অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন তখনকার ছাত্র আজকের বিদেশপ্রত্যাগত চিকিৎসক ডাঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ রায় এবং আজকের বিহারের ইনকম ট্যাক্সের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত ইত্যাদি। এ সব সভানুষ্ঠান ছাড়াও বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় রান্নাঘরের খাবার জায়গা অবধি পদ্মফুল পদ্মপাতা ধূপধুনায় সুশোভন করবার অনুপ্রেরণা জেগে উঠেছিল। এই ফুলের জন্য আশ্রমের ছেলেদের অনেক কীর্তি জমা আছে পৌরাণিক আশ্রমবাসীদের স্মৃতির খাতায়। একবার ৺কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভাগ্নে শ্রীযুক্ত মণি দত্তের ঘরে ছিল সভার আয়োজন। "বীথিকা" গৃহের ছাত্র মণি দত্ত আরো দু-একটি ছেলেকে নিয়ে তো সকালবেলা বেরিয়ে গেলেন ফুল আনতে। তারপরে সারাটা দিন কেটে যায়, তাঁদের আর দেখা নেই। সবাই মহা চিন্তিত। আশেপাশের গ্রামে খোঁজ করা গেল, পাত্তা মিললো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো যখন, দেখা গেল ফুলের গন্ধমাদন কাঁধে নিয়ে তাঁরা এসে হাজির। শোনা গেল, আদিত্যপুর ছাড়িয়ে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন কোন্ এক গ্রামে, সেখানে দুপুর বেলা মুড়িগুড় চেয়ে খেয়ে নিয়েছেন। পদ্ম অনেক ছিল একটা পুকুরে, কিন্তু সে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। রয়েছে সেগুলি একেবারে মধ্যপুকুরে, তাতে নেই একটা নৌকা বা ডোঙা। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা এখো-গুড়-জাল-দেওয়া কড়াই নিয়ে সেই চেপে যান ফুল আনতে এবং শেষটা পুকুর উজাড় ক'রে এই ফুলের স্তূপ নিয়ে এসেছেন এতখানি পথ বেয়ে। এদিকে তাঁদের সভাঘর তখন হয়ে গিয়েছে সাজানো। এত ফুল দিয়ে কী করা যায়। এক জন পরামর্শ দিলেন পদ্মফুলের পাহাড় তৈরি করা যাক। তাই ঠিক হ'ল। অতি সুন্দর এক জলপদ্মের পাহাড় সেদিন পরিতৃপ্ত করেছিল দর্শকদের চোখ। আশ্রমের এক যুগ যে এমনি সভা করার আড়ম্বরে কেটেছে, সে-বিষয়ের অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গগত সন্তান শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (মুলুর) জীবনী "প্রসাদ" গ্রন্থে। আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় তাতে লিখেছেন,

'একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন বোধ হয় কোন সভার জন্মোৎসব। সকালে আর কয়েকটি ছেলে লইয়া মুলু ঘর সাজাইবার জন্ত ফুল আনিতে বাহির হইয়া গেল। দুপুর চলিয়া গেল, মুলুর দেখা নেই। আশ্রমস্থ সকলের আহারের পরে বিশ্রাম হইয়া গেল, মুলু ফিরিল না। মুলুর অভিভাবকগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার ছোট দিদি আসিয়া আমাকে যখন সংবাদ দিলেন মুলু তখনও ফিরে নাই, তখন যারপরনাই আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। তাহার অনুসন্ধানে যখন লোক বাহির হইবে এমন সময় মুলু ও তাহার সঙ্গী বালকেরা ফিরিয়া আসিল। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে চারি পাঁচ মাইল দূরে কোন্ এক পঙ্কিল পুকুরে পদ্ম তুলিতেছিল। সেই ভাদ্রের দুপুরের রৌদ্রের মধ্যে বেলা বোধ হয় তখন দুটো, খালি মাথায় ভিজা কাপড়ে, অভুক্ত অবস্থায় এক বোঝা পদ্ম লইয়া উপস্থিত।"

গুরুদেবের অন্তরে পৌরাণিক ঋতু-উৎসবের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তা এই সব সভার মনোরম কারুকার্য দেখে জেগে উঠল নতুন ক'রে। সে কথা তিনি এক দিন ক্ষিতিমোহনবাবুকে বললেন। ক্ষিতিমোহনবাবুও কাশীর ও অন্যান্য তীর্থের দেবমন্দিরে যে উৎসব আড়ম্বর দেখে এসেছিলেন এর পরে এখানেও তার আয়োজন করতে হলেন উন্মুখ। সেই বছরই বর্ষাকালে কার্যগতিকে গুরুদেব কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন আশ্রমে। প্রকৃতিতে দেখা দিল বর্ষার ঘনঘটা, উন্মুক্ত প্রান্তরে তার উদ্দাম নৃত্য উন্মত্ত ক'রে তুললে শাল-তাল-ঝাউ-দেওদারের শাখা-প্রশাখা। গুরুদেবের কথা স্মরণ ক'রে ক্ষিতিমোহনবাবু আরম্ভ করলেন বর্ষা-উৎসব। ছেলেদের কৈশোর-কোলাহলে, দিনুবাবুর প্লাবন-ডাকানো গানে, ফুলে পল্লবে ধূপধুনায়, সংস্কৃত শ্লোকে, আর দিনুবাবু ও অজিত চক্রবর্তীর ইংরাজি বাংলা আবৃত্তিতে অনুষ্ঠান হয়ে উঠল সরগরম। ছেলেরা পরেছিল গাঢ় নীল রঙের ধুতির সঙ্গে উত্তরীয়ের পীতরেখা টানা পরিচ্ছদ, মাথায় দিয়েছিল কেয়াপাতার মুকুট। আমবাগানে মাটির উঁচু ঢিবি তৈরি ক'রে তার চারিদিকে তাল ও কেয়াপাতা ঘিরে হয়েছিল উৎসব-স্থান রচিত। দিনুবাবু গুরুদেবের দেওয়া সুরে 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটি গাইলেন। বেদের পর্জন্য-প্রশস্তিও সেবার তাঁরই কণ্ঠে পেলো সুললিত সুরলহরী। আচার্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ও তাতে অনেক ভালো ভালো সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে উৎসবকে আরো তুললেন জমিয়ে।

সে উৎসবের সাফল্য সবাইকে এমনি অভিভূত করে দিলে যে, গুরুদেব আশ্রমে এসে পৌঁছবার আগেই দিনুবাবুর পত্র মারফৎ সে কথা গেল তাঁর গোচরে। উৎসবের অতিরিক্ত প্রশংসা জাগিয়ে তুললে ঔৎসুক্য কবির প্রাণে। কিন্তু বর্ষার তখন বিদায় নেবার পালা, শরতের রং লেগেছে বনে বনে পাতায় পাতায়। শিশিরে শিশিরে তার আভাস। এমন দিনে বর্ষা-উৎসব জমবে কি না সে দ্বিধা ছিল গুরুদেবের মনে। তিনি বললেন, "বর্ষা-উৎসব দেখবার ইচ্ছে আমার অপূর্ণই থাক্ এবার, দেবো আমি তোমাদের শরতের গান বেঁধে, তেমনি ভাবে করো না তোমরা শারদলক্ষ্মীকে আহ্বান।"

দিনুবাবুর পত্র পাবার পরে, আশ্রমে ফিরে আসবার পূর্বেই তিনি শরতের দু-একটা গান তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন, এখানে এসে হু হু ক'রে বাকী গানগুলি রচনা করলেন। সেই গানগুলি দিয়েই সেবার আশ্রমে শারদোৎসব হবার কথা। এ সম্বন্ধে ১৩৩৩ সালের শান্তিনিকেতন পত্রিকার "জন্মোৎসব" সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্গীয় অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের 'স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে আছে যে—

"ইহার অনেক দিন পরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরীর উপরকার দোতলায় খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড়ো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্ম ঐ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নতুন নতুন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেই সব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ "শারদোৎসব" নাটক। এই নাটকখানি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগাগোড়া শুনানো হয়, তাহাও মনে পড়ে। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন শারদোৎসব পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতাও কম নয়।

১৯০৮ সালেই প্রথম শারদোৎসব আশ্রমে অভিনীত হয়। তখন আশ্রমের সমস্ত উৎসবই দেশীয় প্রাচীন রূপটি পরিগ্রহ ক'রে উঠছে। সবার মনে জেগে উঠল প্রাচীনকালের অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্বে পঠিত নান্দীর কথা। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অনুরুদ্ধ হলেন একটি সংস্কৃত নান্দী রচনা করতে। তিনি তা রচনা করবেন, এমন সময়ে আশ্রমে সমাগত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করলেন গুরুদেবকেই দিতে হবে নান্দী কবিতা তৈরি করে; এবং বাংলা নাটকের নান্দী বাংলাতেই হবে রচিত। গুরুদেব প্রথমে নারাজ। শেষটা বললেন—"নাও, হয়ে গেছে তোমাদের নান্দী। দেখা গেল অচির-পূর্ব-রচিত একটি গানকে সেদিনই পাকাপাকিভাবে সুর দিয়ে তিনি ক'রে দিয়েছেন উদ্বোধন সঙ্গীত, গানটি হচ্ছে "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরণে গানে।" এবারে গান যখন পাওয়া গেছে, বলা হ'ল তাঁকে, "গান তো হ'ল, কিন্তু চাই যে একটি কবিতাও।" দাবি কি রয় অপূর্ণ! স্বল্পক্ষণের মধ্যেই রচিত হয়ে এল একটি কবিতাও—তার প্রথম পংক্তিটি হচ্ছে:—"শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়।" এ সব-ব্যাপারটাই হ'ল অভিনয়ের দিনই। সেবার যখন এই শারদোৎসব নাটক মঞ্চস্থ হয় একটা মজার ব্যাপার করেছিলেন গুরুদেব। কাশী ও উত্তর-পশ্চিমে ক্ষিতিমোহন বাবু পরিচিত ছিলেন ঠাকুর্দা নামে, এখানে এসেও সে-পরিচয় তাঁর রইল না লুকানো। দিনুবাবু, অজিত চক্রবর্তী মশায় সবাই তাঁকে ডাকতে সুরু করলেন ঠাকুর্দা ব'লে। গুরুদেবও কথাটা শুনলেন, উপরন্তু কেমন ক'রে তাঁর ধারণা জন্মেছিল ক্ষিতিবাবু ভালো গাইয়ে। সম্ভবত তার একটা সূত্র এই যে, ক্ষিতিবাবু পশ্চিমের শোনা হিন্দুস্থানী গানের সুর মাঝে মাঝে গেয়ে শোনাতেন দিনুবাবুদের কাছে, তারই খ্যাতি পল্লবিত হয়ে গিয়ে থাকবে গুরুদেবেরও কানে। তাই তখন ক্ষিতিবাবুকে দিয়ে অভিনয় করাবার জন্যে অনেকগুলি গান দিয়ে সৃষ্টি করলেন ঠাকুরদার চরিত্র। ক্ষিতিমোহনবাবুকে যখন বলা হ'ল সেই ভূমিকায় নাবতে, তিনি তো কিছুতেই হন না রাজী। দোহাই পাড়লেন গানের, বললেন—বাইরে থেকে আসবেন সব গণ্যমান্য অতিথি। আমার এই গানে তাঁদের নিরাশ করা হবে মাত্র। গুরুদেব বললেন, "আচ্ছা সে পদটি থাক্ তবে দিনু কি অজিতের জন্যে। আপনাকে হ'তে হবে রাজ-সন্ন্যাসী।" রাজ-সন্ন্যাসীরও গান আছে। গুরুদেব নাছোড়বান্দা, অগত্যা ক্ষিতিমোহনবাবুকে নাবতে হ'ল রাজ-সন্ন্যাসীরই ভূমিকায়। ঠিক হ'ল যে, অভিনয় করবেন ক্ষিতিমোহনবাবু, গানের সময় মূকচিত্রের মতো গান গাইবার ভাবভঙ্গিও করবেন তিনিই, কিন্তু নেপথ্যে গানক'টা গেয়ে দেবেন গুরুদেব নিজে। নাটক তো হ'ল মঞ্চস্থ। পরদিন রাজার গানের

প্রশংসা সবার মুখে মুখে। কিনা, রবীন্দ্রনাথের পরে এই রাজার গলার মতো সুমধুর কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় নি কোথাও। সবাই এসে ছেঁকে ধরে, ঠাকুর্দা গান করুন। ক্ষিতিমোহনবাবুর তো মহা ফ্যাসাদ। যতই বোঝাতে চান তিনি গান জানেন না, বিশ্বাস করে না কেউ। চারি দিকে তাঁর গানের প্রশংসা। অগত্যা আসরে আসরে এবং এখানে-সেখানে সমস্ত গুপ্ত বিষয়টি খুলে ব'লে তবে তিনি পান নিষ্কৃতি। চমৎকার হয়েছিল সেবার "শারদোৎসব" নাটক। এখানে বলা আবশ্যক যে, যজুর্বেদ থেকে শরত ঋতুর যে একটি সুন্দর বর্ণনা আছে "শারদোৎসবে", সেই শ্লোক কয়টি সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন শাস্ত্রীমশায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য। আশ্রমের দিক্ থেকে প্রত্যেক ঋতুতে প্রকৃতির সাদর অভ্যর্থনার সেই হ'ল সূচনা। এখানে আরো-একটুকু কথা উল্লেখযোগ্য যে, এ উৎসবের পর পূজার ছুটিতে ক্ষিতিবাবু, দিনুবাবু প্রভৃতি বেড়াতে যান পঞ্জাবে অমৃতসহরে। সেখানে তাঁরা চমৎকার কয়েকটি ভজন শোনেন শিখদের গুরুদরবারে ও অন্যত্র। আশ্রমে ফিরে এসে দিনুবাবু তার সুর হন বিস্মৃত কিন্তু স্মৃতিশেখর ক্ষিতিবাবু "বাদে বাদে রম্য বীণা বাদে", "এ হরি সুন্দর" আর "আজু কারি ঘটা ধুম কর আই" এই তিনটি গানের সুর ও কথা স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে শোনান গুরুদেবকে। এত ভালো লাগল তাঁর, যে, সেই থেকেই তৈরি হয়ে গেল তাঁর বিখ্যাত এই গান দুটি সেই সুরেই—"বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে" এবং আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।"

পরে ১৯১০ সালে জাঁকজমকে সুসম্পন্ন হয় গুরুদেবের ৫০তম জন্মোৎসব। এর একটি উজ্জ্বল চিত্র ১৩৪৮ সনের বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা সীতা দেবী লিপিবদ্ধ করেছেন "মানস পটে রবীন্দ্রনাথ" নামক তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধটিতে—

"২৫শে বৈশাখ ভোর ৫টার সময় আম্রকুঞ্জে কবিবরের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। উৎসবের স্থানে আসিয়া দেখিলাম, তখনও অনেকে আসেন নাই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আসেন নাই। শান্তি-নিকেতনের দিকে একটু আগাইয়া গিয়া দেখিলাম তিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারই সঙ্গে আমরা আবার উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্রমের অধিবাসী ও অতিথিবর্গে জায়গাটি ভরিয়া উঠিয়াছে। আলপনা ও পত্রপুষ্পে সভাস্থল সুন্দরভাবে সাজানো। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের লইয়া গান করিলেন। আচার্যের কাজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুক্ত নেপাল-চন্দ্র রায় মিলিয়া করিলেন। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের দিক হইতে কতকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অল্প কিছু বলিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে প্রীতির সম্বন্ধ সেখানে যোগ্যতাবোধের বিচার থাকে না, লজ্জা থাকে না, এই ধরণের কতকগুলি কথা তিনি বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। সভায় সকলকে ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল।"

এই উৎসবে যে ভাবে মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠানাদি হয় তাতে আপত্তি উঠল দু-দিক থেকে। প্রাচীনপন্থী যাঁরা তাঁরা বাধা দিলেন এই ব'লে যে, এই ভাবে প্রাচীন দেবযোগ্য বস্তুকে নবীনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে মানুষের ব্যবহারে; আর নবীনপন্থীর দল শঙ্কিত হলেন এতে মানুষ-পূজার সম্ভাবনায়। রক্ষণশীল ব্রাহ্ম হিন্দু সবাই তুললেন বিতর্ক। তার পরে ১৯১৫ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক আসেন শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিভ্রমণে তখনও ঠিক এই রীতিতেই বিরাট্ আকারে হয় তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজন। এবারেও উৎসাহী উদ্যোক্তাগণ গুরুদেবের ভরসায় সব প্রতিকূল মন্তব্যকে এড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন কাজ। রচিত হ'ল ২১টি তোরণ। বীথিকার সামনে আম্রকুঞ্জের কাছে ছিল সভাস্থল। বর্তমান পূর্ব-দিকের প্রধান গেট্ থেকে সভাস্থল পর্যন্ত ২১টি তোরণ হয়েছিল সাজানো। এক-একটি তোরণের দুই দিকের দুই স্তম্ভমূলে স্থাপিত হয়েছিল:—১। মহী ২। গন্ধদ্রব্য ৩। শিলা ৪। ধান্য ৫। দূর্বা ৬। পুষ্প ৭। ফল ৮। দধি ৯। ঘৃত ১০। স্বস্তিক ১১। সিন্দুর ১২। শঙ্খ ১৩। কজ্জল ১৪। গোরোচনা ১৫। শ্বেত সর্ষপ ১৬। কাঞ্চন ১৭। রৌপ্য ১৮। তাম্র ১৯। চামর ২০। দর্পণ ২১। দীপ, মোট এই ২১টি বস্তু। মূল অভ্যর্থনা বেদীও এই ২১টি মাঙ্গল্য দ্রব্যে ছিল পরিপূর্ণ। তাকে আরো সুশোভন ক'রে তুলেছিল অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পপাত্র, ধূপ, দীপ, পঞ্চব্রীহি, মধুপর্ক প্রভৃতি। নানা স্থান হ'তে আগত দর্শকদের অনুকূল এবং প্রতিকূল আলোচনার মধ্যেও সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এই ভাবে উৎসব করাটা। ক্রমে আশ্রমে-অনুষ্ঠিত গুরুদেবের জন্মোৎসব এবং সম্বর্দ্ধনার অনুরূপ আড়ম্বরেই কলকাতায় সুরু হ'ল গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করা।

বলা আবশ্যক, এ উৎসবগুলির সাজসজ্জা যে কেবল ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশীর হালকা ভিত্তি থেকে আকস্মিক ভাবে উদ্বুদ্ধ তা নয়। এর প্রবর্তনার মূলে রয়েছে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বনেদী পটভূমি। হাজার হাজার বছর আগে ভারতের বিদগ্ধজন-চিত্ত, ভারতের রূপরসিক শিল্পী-মন বহু জনসমাগমের মিলনক্ষেত্রে মনে হয়

যেন শুধু মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করাটাকে ভব্যতার অঙ্গহানিকর ব'লেই মনে করত। তাই দেখা যায়, উৎসবে, উদ্বোধনে, বিজয়যাত্রায়, অভ্যর্থনায় সর্বক্ষেত্রেই নানা আনুষ্ঠানিক বিচিত্র সজ্জা-প্রকরণ, যন্ত্র, মুদ্রা এবং পল্লীগ্রামের আলপনাদির প্রচলন। এ ছিল একটা ভাষার প্রকাশ, যে-ভাষায় কথা ব'লে এসেছে হাজার হাজার বছর এই আর্য ভারত। শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপনের এ সব হচ্ছে সাংকেতিক রূপ। যেমন অভ্যর্থনার উৎসবে আঁকা হ'ত বটপত্রের আলপনা। বক্ষ-স্থলের আকারের অভিব্যক্তি বটপত্র। সেই "যন্ত্র"-টির (চিত্রটির) অঙ্কন দ্বারাই কৌশলে জানিয়ে দেওয়া হ'ত, "হে ভদ্র, সমস্ত হৃদয় পেতে তোমাকে আমরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করছি।" আত্মীয়তার এই ব্যগ্রতাটি মুখের ভাষায় প্রকাশ করার চেয়ে গাঢ়তর উপলব্ধির বস্তু হ'ল শিল্পের আবেদনে। আরেকটি অনুষ্ঠান ধরা যাক, শুভাশীর্বাদ দ্বারা বরণ। সে ক্ষেত্রে আঁকা হ'ত একটি ত্রিভুজের উপরে আরেকটি ত্রিভুজ। কিংবা কুণ্ডলায়িত একটি সর্প-মূর্তি। ঊর্ধ্বমূল ত্রিভুজের উপরে অধোমূল ত্রিভুজ বা এই সর্পমূর্তি দুই-ই ক্রমান্বয়ে সূচনা করে জীবন-মৃত্যু-সমন্বিত অনন্ত কালকে। মানে "তুমি অনন্তকাল ধ'রে শুভের মধ্যে বিরাজ করো, এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।" এমনি সজাগ ছিল একদিন ভারতের শিল্পীমন সমাজের আচারে-অনুষ্ঠানে। কিন্তু দিনের পরিবর্তনে ভারতের সে চিত্তপ্রকর্ষ লুপ্তপ্রায়। তার কিছু কিছু চিহ্ন প'ড়ে ছিল পল্লীগ্রামের আলপনায়, পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রসজ্জায়, মন্দিরের বিগ্রহ-প্রসাধনে বা স্বল্পজনবিদিত তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় মুদ্রায়, যন্ত্রে ও স্থণ্ডিল-বিধানে। তন্ত্র অনুশীলনে, এ সব রহস্যের মর্মার্থ দিলে ক্ষিতিমোহনবাবুকে চমৎকৃত ক'রে। তিনি সেই মুদ্রা, যন্ত্র, স্থণ্ডিলাদি উদ্ধার ক'রে প্রয়োগ করলেন আশ্রমের উৎসব-সজ্জার ব্যাপারে। এতই ভালো লাগল তা-গুরু-দেবের যে, তিনি পরম সমাদরে সেই প্রাচীন লুপ্তরত্নের উদ্ধার-প্রচেষ্টাকে আরো ভালো মতো প্রকাশের পথ ক'রে দিলেন। এই আলপনা বা তান্ত্রিক মুদ্রাদি যেখানে গতানু-গতিক জীর্ণ শক্তিকে গা ঢাকা দিয়ে চলছিল, হয়তো তারা সেখানে সেভাবেই চলতো আত্মবিলোপের পথে, চোখে পড়ত না কারো। কিন্তু গুরুদেব তাঁর গানে, অভিনয়ে, নৃত্যে ও ভাষণে যখন এ'কে বিশ্বভারতীর পট-ভূমিতে লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করালেন শোভন ও মহান্ রূপ-গৌরবে, তখন থেকেই দেখা দিল এর পুনরুজ্জীবন। ক্রমে দিনে দিনে এ স্বীকৃত হ'ল প্রায় সারা হিন্দুস্থানের শিক্ষিত-সমাজের উৎসবে-অনুষ্ঠানে। চারিদিক থেকে যে বাধা এসেছিল তাকেও প্রশমিত করলে গুরুদেবের প্রোৎসাহই। বংশগত রক্তধারায় গুরুদেব ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দু অভিজাত পরিবারের রুচি ও সংস্কৃতিবাহী; সেদিক থেকে এই প্রাচীন ভারতীয় সজ্জা ও আচার-প্রক্রিয়ার সৌন্দর্যের আবেদন দিয়েছিল তাঁকে আনন্দ। অন্য দিকে মহর্ষি-প্রবর্তিত সাধনার উদারতার সংস্পর্শে তিনি যে-কোনো মহৎ ভাব ও শিল্প-সমৃদ্ধ জাতীয় সংস্কারকে সহজেই পেরেছিলেন অন্তর খুলে বরণ করতে। শুনেছি ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন এ সবের প্রবল অনুরাগী। তাঁদের পরিবারগত উদার স্বীকৃতিই সেদিন সম্ভব করেছে বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে আধুনিক এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃ প্রচলন।

"আনন্দ-লোক"

এই আনন্দ-লোকের পরিচয়টি লিখবার চেষ্টা করেছি চারটি অংশে। তার প্রথম অংশটির নাম দিয়েছি—"রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-উৎসবের সূচনা।" দ্বিতীয়টির নাম "শান্তিনিকেতনের শিল্প-নৃত্য-সঙ্গীত ও অভিনয়ের সূচনা," তৃতীয় অংশটির নাম দিয়েছি—"শান্তিনিকেতনের বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান" এবং চতুর্থ অংশটির নাম দিয়েছি—"শান্তি-নিকেতনের বিনোদনপর্ব"—এই অংশগুলি মিলেই হয়েছে ধারাবাহিক ভাবের একটি সমগ্র প্রবন্ধ—"আনন্দ-লোক"।

শান্তিনিকেতন প্রধানত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। তার সেই শিক্ষার পরিচয় সম্বন্ধেই লোকের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিও এখানকার শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার কথার মধ্যেই এসে যেত এ সবের কথা। কিন্তু নিজক্ষেত্র থেকেই এগুলি আশ্রমের সামাজিক জীবন, ধর্মজীবন ও জ্ঞানজীবনকে এত প্রভাবান্বিত করেছে, আর, স্বকীয় বিচিত্র ক্রিয়াপ্রাচুর্যে, চারিত্র-লক্ষণে, আয়োজনসম্ভারে, আবেদনে এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি এত বিশিষ্ট ও বৃহৎ একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি ক'রে আশ্রমে একেশ্বর হয়ে আছে যে, এখন আর গৌণভাবে অন্য কোনো বিভাগের অন্তর্গত ক'রে কিংবা শান্তিনিকেতনের কোনো বিভাগের চেয়েই একে ভাবা যায় না ছোট একটি বিভাগ ব'লে। কাজে এবং রূপগৌরবে এ নিজেই একটি বিভাগ—এরও সৃষ্টির দিক আছে, আছে এরও চিন্ময় উপযোগিতা। সৃষ্টি এবং আনন্দময় জ্ঞান-প্রবর্তন, এই দুই কাজের পরিচয়ই কৌতূহলী-গণ খুঁজে পাবেন,—এমন সব ঔপাদানিক তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রবন্ধের মধ্যে। কিন্তু তা ধ'রে ধ'রে দেখিয়ে দেওয়া হয় নি দফায় দফায়; শুধু দেখাবার চেষ্টা হয়েছে এর সমগ্রভাবের নিজস্ব উৎসব-রূপটি। নয়তো, এর মধ্যে অনেক বিষয়, অনেক কথা আরো দেওয়া যেতে পারত, যা আশ্রমের শিক্ষা ও সৃষ্টির ইতিহাসকে করতে পারত আরো স্পষ্ট, আরো সমৃদ্ধ; কিন্তু তা অন্য আরো অনেক স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। একটা প্রবন্ধে তা দিতে গেলে তারই স্ফীতিতে এর উৎসব-রূপে আসবে আচ্ছন্নতা, প্রবন্ধের আয়তনও এই বাজারে হয়ে যাবে অপরিমিত দীর্ঘ।

এমনিতেই মনে হয়েছে, বিষয়ের প্রাচুর্যে হয়ত প্রবন্ধটি ক্রমশই দীর্ঘ থেকে হয়ে চলেছে দীর্ঘতর। স্থানাভাব এবং পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি আশঙ্কা ক'রে, যে-সব কথা আমরা তুলতে সাহস পাচ্ছিলুম না, ইতি-মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় এক পত্রে সেদিকে

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কিছু লিখে পাঠিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পত্রটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে সংক্ষেপের মধ্যে এত ব্যঞ্জনাপূর্ণ যে, নিজেরা আমরা আর কথা না বাড়িয়ে, তাঁর সেই পত্রখানারই কিয়দংশ এখানে উপহার দিচ্ছি পাঠকদের। তাতে একদিকে যেমন প্রবন্ধটির অঙ্গহানিত্ব দূর হবে অনেকটা, সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাও তাতেই মনে করি প্রকাশ করা হবে সুষ্ঠুভাবে; তিনি লিখেছেন—"...আপনারা সভার সাজ সজ্জা, গান, অভিনয় ও নৃত্য সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা বেশ হয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আশ্রমজীবনের আরেকটি দিক আমি দেখেছি, যে'টি অনেকের কাছে আনন্দদায়ক, সুতরাং উৎসব নামের যোগ্য অন্যদিক দিয়ে।—যেমন অনেক ছেলে সার্কাস করত, সার্কাসের কঠিন tricks বা কসরৎ বা কৌশল দেখাত—যথা আগুনের চক্রের ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া। তৎকালে "দ্বিজেন গুণ্ডা" নামে ছাত্রদলে পরিচিত একটি ছাত্র এই রকম করত। ছাত্র ছাত্রীরা ছোরাখেলা শিখত ও দেখাত। তনয় বাবুর কন্যা (এখন বোধ হয় নন্দলালবাবুর পুত্রবধূ) এ বিষয়ে দক্ষ ছিল। একবারকার ছোরাখেলার প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথ তাকে এই মর্মের কথা বলেন—'ওগো বীরাঙ্গনা, কাউকে মেরো না কিন্তু।' আসামের বর্ত্তমান ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্‌শান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের ভাইঝি (রাধামাধব বাবুর কন্যা) একটিও বেশ ছোরা খেলত। রাধামাধব বাবু অনেক দিন বাসা ভাড়া নিয়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁর কন্যার নাম বোধ হয় গীতা। একজন শিক্ষক নাম বোধ হয় মনোমোহন বাবু লাঠিখেলা ও নানা রকম কুস্তি শেখাতেন। তাতে ছাত্রদের উৎসাহ ছিল।

"জিউজিৎসুও কিছুদিন বেশ চলেছিল।* অধ্যাপকদের মধ্যে গৌরবাবু বেশ শিখেছিলেন আর শিখেছিলেন আজিমগঞ্জের একজন বলিষ্ঠ ছাত্র (স্বর্গীয় পূরণচাঁদ নাহারদের বোধ হয় জ্ঞাতি, নীচু বাংলার ওদিকে থাকতেন)। কবি একবার একদা রায়বেঁশে খেলোয়াড় আনিয়ে তাদের খেলা দেখেছিলেন উত্তরায়ণে (যেখানটাতে প্রতিমা বৌমার বাগান ও রথীবাবুর খাস্ আফিস্ হয়েছে)।

"কবির নাটকগুলির অভিনেতাদের মধ্যে জগদানন্দ বাবুও ছিলেন। হয়তো আপনারা তা পরে লিখেছেন। যতটা মনে পড়ে, তিনি লক্ষেশ্বর সেজেছিলেন।

"নটীর পূজার প্রথম অভিনয় দেখে আমার মনে হয়েছিল ওটি কানে-শোনা sermonএর চেয়ে উপদেশের চেয়ে বেশী effective ও impressive। আমার যত দূর মনে পড়ে, ঐ প্রথম অভিনয়ে ফ্রান্সের ও ইটালীর কলিকাতাস্থ কন্সালরা সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন ও তাঁরা বলেছিলেন যে, তাঁদের দেশেও তাঁরা এমন চমৎকার অভিনয় দেখেন নি।..."

এই সব শারীরিক চর্চার অনুষ্ঠানগুলিকে আমরা "শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবন" শীর্ষক স্বতন্ত্র রচনাধারার বিষয় ব'লে মুলতুবী রেখেছিলাম। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় যা বলেছেন তা অতীব সত্য,—এর একটি উৎসবের দিকও আছে; অনেক উৎসব আসর জমেছে এ সব অনুষ্ঠানের সহযোগে। সেদিক থেকে সম্পাদক মহাশয়ের এই দৃষ্টি আকর্ষণ নিঃসন্দেহ এ ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী ও উপকারক হয়েছে।

* জিউজিৎসু-শিক্ষার্থী ও ক্রীড়া-প্রদর্শকদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কন্যা অমিতা দেবীর ও নন্দলাল বসু মহাশয়ের কন্যা যমুনা দেবীর এবং শিক্ষক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামও করা যেতে পারে। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও অন্যান্য ব্যায়ামের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোমোহন দের কথা বিশেষ ভাবেই বলা চলে। কারণ, এই সব বিষয়ের প্রধান কর্মী ও সংগঠক তিনিই ছিলেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বিশেষ ক'রে, শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পাঠকদের কাছে এ রকম আরো প্রস্তাবের সহযোগ আমরা প্রার্থনা করি। কারণ যতটুকু এ কাজে এগিয়েছি, মনে হয়েছে আমাদের তথ্য-সংগ্রহের পন্থা সীমাবদ্ধ। এই আনন্দ-লোকের পরিচয়টি সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে গিয়ে দেখি একখানে কোথাও তার সন্ধান নাই। বাইরের লোকের কথা দূরে থাক্, আশ্রম-বাসীদের স্মৃতির আবছায়ায় অংশে অংশে তা ক্রমশ বিলীয়মান। অথচ তার ধারাবাহিক বিকশিত রূপ আজ সকলেরই কাম্য। কেন যে এর ইতিহাস রক্ষায় আশ্রমের দিক থেকে ছিল যথোচিত অনুসন্ধিৎসা ও যত্নের অভাব, প্রথম প্রথম সেটাই জাগিয়েছে বিস্ময়; কিন্তু শেষটায় পেয়েছি এই ঔদাসীন্যের কারণ,—গুরুদেব বেঁচে থাকতে তিনিই যে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে ছিলেন বর্তমান, তিনি ছিলেন সব উৎসব, সব আনন্দস্মৃতি,—মূর্তিমান। এতই উজ্জ্বল ছিল তাঁর সেই স্থিতি।

এত দিন গেছে গুরুদেবের সেই প্রত্যক্ষ স্থিতিতে সকলেরই সৃষ্টি-কাজের অবাধ উৎসবের সময়। তখন ইতিহাসের দিকটায় দৃষ্টি দেবারই ছিল না উৎসাহ। কেবল শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনাথ কিছু চেষ্টা করেছেন তাঁর স্বভাবোচিত সুশৃঙ্খলতা বিধানের প্রবর্তনায়। কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ, অযথেষ্ট। আর যাঁরা এ যাবৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনায় হাত দিয়েছেন, শান্তিনিকেতনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁদের মুখ্য প্রতি-পাদ্য বিষয়। কিন্তু আজ রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে শুধু উৎসব অনুষ্ঠানের নয় শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গীন ইতিহাসের অভাবটাই খুব আকস্মিকভাবে নাড়া দিয়েছে সকলের অনুসন্ধিৎসু চিত্তকে। সৌভাগ্যক্রমে এখনো যে-কয়জন প্রবীণ আশ্রমিক বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন বর্তমান, তাঁরাই এ বিষয়ে তথ্যের একমাত্র জীবন্ত উৎস। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিয়ে ব্যক্তিগত আগ্রহেই আমরা প্রথমে ব্রতী হয়েছিলেম আশ্রমের উৎসবের এই ছায়াচ্ছন্ন রূপটির সমুদ্ধারে। কিন্তু এই কাজে নেমে যাঁদের কাছেই গিয়েছি, আগ্রহ দেখেছি সবারই। দিয়েছেন তাঁরা যাঁর যেটুকু দেবার। পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের "স্মৃতি" প্রবন্ধটি থেকে যা সাহায্য পেয়েছি, খুবই প্রাচীন ও মূল্যবান ব'লে তার কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তার মধ্যেও দু-এক স্থলে "বোধ হয়" এর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে সংশয়। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগত পুত্র প্রাক্তন ছাত্র "মুলু"র স্মৃতিগ্রন্থ "প্রসাদ"; সব গোড়াকার দিকের অধ্যাপক সতীশ রায় মহাশয়ের "রচনাবলী"র ডায়েরী অংশ; শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী" ও শ্রীযুক্ত অমল হোম সংকলিত "ক্যালকাটা মিউনিসি-প্যাল গেজেট" এর "টাগোর মেমোরিয়েল সংখ্যা," বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীযুক্তা সীতা দেবী এবং আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির প্রবন্ধ, অধুনা-লুপ্ত আশ্রমের মুখপত্র "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা এবং আধুনিক মুখপত্র ইংরেজি "বিশ্ব-ভারতী নিউজ" ও "প্রবাসী" থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। তা ছাড়া, মৌখিক আলোচনায় পূজনীয় আচার্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ আইচ, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার চন্দ, শান্তিদেব ঘোষ এবং প্রাক্তন ছাত্র শিবদাস রায় প্রভৃতিও অনেক তথ্য জুগিয়েছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, আজকের দিনের আশ্রমে বয়সে যিনি সর্বপ্রাচীন এবং সর্বজনমান্য প্রাক্তন অধ্যাপক বর্তমান, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের আশ্রমবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের এই রচনাটিকে যত্নের সহিত আগাগোড়া দেখে এর সত্যতা সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব নিঃসন্দেহ হয়ে সাধারণ্যে এর প্রকাশ কামনা

করেছেন; তাঁর কাছ থেকে আমরা তথ্যও কিছু পেয়েছি; যথাস্থানে তা সংকলিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

সর্বশেষে যাঁরা অনুগ্রহ করে এ রচনাটিকে সবদিক থেকে সংশোধন করে পরিচ্ছন্নরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন, পূজনীয় সেই শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়ের দান সকলের দানের সঙ্গে পরম আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় স্বীকার্য। বলা আবশ্যক, কী ধরণের অনুষ্ঠানগুলি হ'ত, তারই বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলা বাহুল্য, রচনাটি তথ্যের দিক থেকে একেবারে সম্পূর্ণ নয়, সংগ্রহ যা তাড়াতাড়িতে সম্ভব হয়েছে, তাই দিয়ে আশ্রম-দেবতার অর্ঘ্য সাজিয়েছি আশ্রমের সবার বড়ো ও আদিতম বার্ষিক উৎসব "৭ই পৌষের" আসন্নতা স্মরণ ক'রে। এর অঙ্গহানিটু দূর ক'রে এখন দিনে দিনে অনেকে বিষয়টিকে সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতায় সুন্দর করবেন, আর এক বার এ প্রার্থনা জানিয়ে এ ক্ষেত্রে আগামী কর্মীদের অপেক্ষা করে রইলাম।

সবশেষে জানিয়ে রাখা দরকার, আশ্রমের দিক থেকে শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় মন্তব্য। গোটা রচনাটি প'ড়ে তিনি প্রস্তাব জানালেন যে, "তুমি এ কথাটি বলবে, আমার নাম ক'রেই বোলো যে, এই উৎসব অনুষ্ঠান এবং সমগ্রভাবে শান্তিনিকেতনের শিল্পকলা-বিভাগ সম্বন্ধে এসেছে আমাদের ভাববার সময়। অচিরেই,—এখন থেকেই, আমাদের হ'তে হবে বিশেষ ভাবে সতর্ক, এই মনে করে যে,—প্রতি জিনিষেরই আছে দুটো দিক। প্রাণ না থাকলে অঙ্গ অচল, বিদ্যুৎহীন যেমন বিজুলীবাতির লাইন। গুরুদেব ছিলেন নিজেই সে প্রাণ,—মানে এ ক্ষেত্রের অনুপ্রেরণা: যে অনুপ্রেরণার থেকে দেখা দেয় নিত্য নতুন মহান্ সুন্দর "শিল্প-উদ্ভাবনা," নিত্য নতুন আবেগময় উৎস। তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টি এবং উৎসাহ দিয়ে গুরুদেব সঞ্চারিত করতেন এই প্রাণকে,—প্রতি উৎসব ও শিল্প-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। আমরা যে-ই যত কিছু ক'রে থাকি, গুরুদেবের সৃষ্টিক্ষেত্রে এত দিন কাজ করেছি তাঁরই আনুষঙ্গিক হয়ে অনেকটা নির্ভাবনায়, অনেকটা যন্ত্রের মতো। পরোক্ষে বা অপরোক্ষে আমাদের সব প্রেরণাই এসেছে এক রকম তাঁর থেকেই। এখন তাঁর অবর্তমানে সেই প্রাণকে যদি আমরা আমাদের তপস্যার আগ্রহে নিজেদের ভিতর বহন ক'রে এবং বাইরে তা বিলিয়ে দিয়ে না চলতে পারি, তবে সব জিনিষটাই হয়ে পড়বে যান্ত্রিকতা। প্রেরণার বড়ো না হয়ে, হয়ে পড়বে সবটাই আঙ্গিক-প্রধান। সেই আঙ্গিকের কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার যার স্থানে কথাকলি, মণিপুরী, অজন্টা, আর পৌরাণিক তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি। এরা সমগ্র দেশে যে আজ পরিচিত, সে শুধু গুরুদেবেরই প্রবর্তিত আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের ফলে। শান্তিনিকেতনের একটি ক্ষেত্রে এনে এক ক'রে এদের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছেন গুরুদেব নতুন আবেগে নতুন সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা। তার আগে কজনই বা জানত এদের নাম! শান্তিনিকেতনের চিত্র-শিল্প, নৃত্য ও উৎসব ক্ষেত্রের সব সাজসজ্জা ও কাজে কর্মে মুখ্য ক'রে বেশী করে চাই সেই প্রাণের অর্থাৎ আবেগময় উদ্ভাবনার জোগান। আঙ্গিকের জন্য আর সব ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, আমরা তাদের দান চিরদিনই মেলাব এনে এখানে, আমাদের আশ্রমের সাধনার ক্ষেত্রে এবং তা আরম্ভ করবার জন্যে সাধনাও করব একান্ত নিষ্ঠায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লোকে চাইবে শান্তিনিকেতনের কাছে প্রতিদিনই পর্বে পর্বে নতুন কিছু সৃষ্টি-প্রবর্তনা; সব কিছুর মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সেই আবেদনটি ফুটিয়ে তোলাই যেন প্রধান লক্ষ্য হয় প্রতি উৎসব ও শিল্পপ্রদর্শনীর ক্ষেত্রে। তবেই বলার অধিকার পাব যে, আমরা শান্তিনিকেতনের, যে-শান্তিনিকেতনের স্রষ্টা আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।"

মাধুরীলতা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বঙ্গের তথা ভারতের তথা বিশ্বজগতের বন্দনীয় মহাকবির, মহামনীষীর স্মৃতিপূত পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সারা বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমিও তাঁহাকে সশ্রদ্ধ বন্দনা করিতেছি। আমার আজিকার এই শ্রদ্ধা-নিবেদনটি শুধু বঙ্গীয় মহাকবিকে নয়, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতাকেও নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে বাঙ্গালীর গৌরব সিংহাসন স্থাপন-কর্ত্তাকেও নয়; এমন কি সমস্ত পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান সমুদয় কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকেও নয়। এ সমস্ত গুণরাশির জন্য তিনি ত প্রত্যেকের নিকট নমস্য আছেনই,—এতদ্ব্যতীত আমার সহিত তাঁহার যে আর একটি নিবিড়তর, নিকটতম সম্বন্ধ আছে, আজিকার এই শুভ তিথিতে তাঁহাকেই আমি আমার অন্তরের এই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আজ আমার বারে বারেই মনে পড়িতেছে আমার সেই বহু দিনের হারিয়ে-ফেলা পরম প্রিয় বন্ধুকে। তার সঙ্গে গভীর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তার আত্মীয়দের একদিন আত্মজনের মত বড়ই ভালবেসে-ছিলাম। তার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বেকার ভয়ভক্তির পাত্র কেমন করে আপনা হতেই আপন জন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই কথা আজ নূতন করিয়াই স্মরণ হইতেছে। সেও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁর বহুতর বিচিত্রতর সম্মানের বড় বড় বিশেষণগুলি অকস্মাৎ একদা আমার কাছে সহজ সাধারণ হইয়া গিয়া তাঁর মস্ত বড় একটিমাত্র

পরিচয়ে পৌঁছিয়াছিল, তাহা—"মাধুরীর বাবা।" এইখানে বলা ভাল তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী বা বেলা কয়েক বৎসর মজঃফরপুরে আমাদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সে সময়ে আমরা কি অচ্ছেদ্য কি সুগভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তা মজঃফরপুরবাসী এবং আমাদের দু-পক্ষের আত্মীয়েরা সকলেই অনেকখানি জানেন। তার সঙ্গে আলোচনায় তাঁর সমস্ত পরিচয় এমনি ভাবে পেয়েছিলাম যে তাঁকে তার পূর্ব্বে চোখে না দেখেও তিনি কি খেতে ভালবাসেন, কখন লেখেন, কি কলমে লেখেন, তাদের সঙ্গে কি কি কথা ক'ন—এমনি অনেক কিছুই আমার জানাশোনা হইয়া গিয়াছিল। তাঁদের বাড়ীর সঙ্গে আমার বাপের বাড়ীর ঘনিষ্ঠতা আমার পিতামহদেবের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

আমরা যখন নিতান্ত ছোট—শিশুমাত্র—সেই সময় আমাদের চুঁচুড়ার বাড়ীর পাশের মাধব দত্তের বাড়ী (পরে ৺গোকুল দত্তের পুত্রদের) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়াছিলেন। গঙ্গার তীরে—কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী গঙ্গাতীরে—তখনকার দিনে কলিকাতার বড়লোকদের মধ্যে অনেকেই বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়া বাস করিতেন। তিনিও হয়ত সেই উদ্দেশ্যেই গিয়াছিলেন। তার পর সেখানের সেই মুক্ত সৌন্দর্য্যের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া কয়েকটা বৎসর সেখানেই কাটাইয়াছিলেন। আমার পিতামহদেব ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত হৃদ্যতা তাঁহার হয়ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তবে উভয় পরিবারে সেই সময় হইতেই বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৺দিনু ঠাকুর (দিনুদা) তাঁর বোন ৺নলিনী দেবী এঁরা আমাদের সমবয়সী ছিলেন। এঁদের মা ৺সুশীলা দেবী ছিলেন আমার মায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর কথা আমার মায়ের মুখে এত বেশী করিয়া শুনিয়াছি যে, তাঁকে ঠিক মনে না পড়িলেও তাঁর প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা এতই অভিজ্ঞ যে তাঁকে যেন চোখে দেখিতে পাই। শিল্প এবং সঙ্গীতে তাঁদের মধ্যে আদানপ্রদান যথেষ্ট ছিল। তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে আমার মা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। তাঁর অকালমৃত্যু আমার মাকে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে অনেক চোখের জল তাঁকে ফেলিতে দেখিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথকে সে যুগে আমার অবশ্য মনে পড়ে না। মায়েদের কাছে গল্প শুনিতাম যে, ঘাটে বাঁধা তাঁদের বজরার ছাদের উপর জ্যোৎস্না রাত্রে বসিয়া সারেঙ্গি বাজাইয়া তিনি মাঝিদের সঙ্গে গান গাহিতেন। আমাদের বাগানের মালতীলতায় ঘেরা পাঁচিলের ধারে দাঁড়াইয়া মায়েরা এক এক দিন সেই গান শুনিতেন। একটা দুইটা গান মায়ের স্বরলিপির খাতায় লেখাও ছিল। তার মধ্যে একটা গান আমার বেশ মনে আছে—

> "হায়, আমি নে'কলাম সব ;—ঠিক দিতে পারলাম না।
> ভেক নেলাম বৈরাগী হলাম, ও আমার মন ;—
> ওরে, তোর হিসাব নে'কাশ হলো না।"

তাঁর লেখা একটি গীতিকবিতা বোধ হয় যেন পুরাতন "বঙ্গদর্শনে"-ই প্রথম পড়িয়াছিলাম। খুব ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া মুখস্থও হইয়া গিয়াছিল :—

> "বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই ?
> কুহরিছে পিকগণ, শিহরিছে সমীরণ,
> মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
> বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই ?

যে যুগে

> "গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেল ছাড়ি দিল।
> তেজ দেখি সকলের পরাণ উড়িল। ইত্যাদি

আমাদের মুখস্থ করার পুঁজি ছিল, সে দিনে ঐ রকম একটি সুললিত কবিতার পাঠক হঠাৎ হইতে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। ইহার পর হইতে আমাদের লাইব্রেরি ঘরে যখন তখন ঢুকিয়া বাঙ্গালা বইয়ের আলমারী খুলিয়া বাঁধান "বঙ্গদর্শন" হাতড়াইতাম যদি ঐ রকম কোন কবিতা পাই। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দিন দুখানা বই হাতে ঠেকিল—একখানা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাজর্ষি" এবং অপরখানা তাঁহার "কড়ি ও কোমল"। দুইখানি বইয়ের সমস্ত রচনাই যেন মনের ভিতর ছাপার অক্ষরের উপর প্রেসে চাপ দেওয়া সাদা কাগজের মত ছাপিয়া গেল। পরম বিস্ময়ের মত "কড়ি ও কোমল"-এর কবিতাগুলি আবৃত্তির পর আবৃত্তি করিয়া গিয়াছি। আজও তার অনেক কবিতাই মনে আছে। আর "রাজর্ষি" উপন্যাসের "ধ্রুব" ও "হাসি" যে কত রাত্রের ঘুম আসার পূর্ব্বের সঙ্গী তা গণিয়া রাখি নাই। "কড়ি ও কোমলে"র এক সমালোচনা বাহির হইয়াছিল—তার নাম ছিল "মিঠেকড়া।" লেখার শক্তি থাকিলে হয়ত তার আরও "কড়া" সমালোচনা করিয়াই বসিতাম। নিরুপায়েই দিদি (৺ইন্দিরা দেবী) এবং আমি রাগে দুঃখে ফুলিতে থাকিয়াছি।

তার পর জীবনের এই সুদীর্ঘ দিনে আমার চোখের উপর দিয়াই তাঁর অপর্য্যাপ্ত দানে বঙ্গসরস্বতীর ভাণ্ডার

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সমালোচকদের সমালোচনা ক্রমশঃ আলোচনায় পরিবর্ত্তিত হইল। "মিঠে কড়া"র 'কড়া' ভাব বাড়িয়া উঠিল, পরে একেবারেই গলিয়া পড়িল। 'মিঠে'র রস ঘনীভূত হইতে হইতে চিটে হইয়া থাকিয়া গেল। সূর্য্যের বিরুদ্ধে মেঘের অভিযান কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ে তাঁর কথা দিয়াই বলা চলে—

"ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ম্ময়
তোমারই হউক জয়।
প্রভাত-সূর্য্য এসেছ রুদ্র সাজে, দুঃখের পথে
তোমার তূর্য্য বাজে।
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হো'ক লয়।"

আমাদের দেশে মাত্র যে কয়জন পৌরুষের কবি, বরাভয়ের কবি, মৃত্যুঞ্জয়ের কবি জন্মিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই মধ্যের একজন। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক-দিগের নিকট তাঁর নিশ্চয়ই ঋণ আছে; কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তি অন্যান্য সকল বিষয়ের মতই এ বিষয়েও তাঁর নবনবোন্মেষিণী শক্তিতে মৌলিক বিষয়ের আবিষ্কর্ত্তার মহোচ্চ পদ দাবী করিতে পারে। এত বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ বিপুল রচনা আর কোন যুগে আর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা বিস্ময়ে ভাবিয়া কূলকিনারা পাই না যে একজন মানুষ এত বিভিন্নতার জোগান কেমন করিয়াই বা দেন! সেই অসাধারণকে দেখার সাধ মনে মনে খুবই প্রবল ছিল। কিন্তু ভরসা ছিল না। সমাজের ব্যবস্থাও তখন মেয়েদের জন্য এতখানি যে উদার ছিল না, সেকথা বলাই বাহুল্য মাত্র। আমাদের সমসাময়িক যাঁহারা তাঁহারা সে কথা ভাল করিয়াই জানেন। মনের ইচ্ছা মনেই ছিল।

তার পর হঠাৎ এক দিন মস্ত বড় একটা সুযোগ আসিয়া দেখা দিল। মজঃফরপুরে থাকি। আমার স্বামীর সহপাঠী ও বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে মাধুরীলতার বিবাহ হইল। তখন গ্রীষ্মকাল। বেহারে গ্রীষ্মের সময় মর্ণিং কোর্ট হওয়া প্রথা আছে। শেষ জ্যৈষ্ঠ—একদিন কোর্ট হইতে ফিরিয়া আমায় একটু ব্যস্তভাবে আমার স্বামী প্রশ্ন করিলেন,—

"আচ্ছা রবিবাবুর স্ত্রীকে তুমি দেখেছ?"

দেখি নাই। দেখার সাধ খুবই প্রবল ছিল। অগত্যা দুঃখিত চিত্তে উত্তর দিলাম,—"দেখি নি।"

তিনি বলিলেন, "কেন, ওঁদের বাড়ী যাও নি?"

বলিলাম, "তিনি তো শিলাইদা'য় থাকেন। তা ছাড়া আমি স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ী গেছি। জোড়াসাঁকোয় তো যাই নি। কেন?"

আমার স্বামী বলিলেন, "না, এম্নি জিজ্ঞাসা করছি। সরলা দেবীর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি দেখেছিলাম, তাই ভেবেছিলাম ওঁদের সঙ্গেও জানাশোনা আছে। ওঁর ক'টি মেয়ে?"

সে খবর লইতে ত্রুটি করি নাই। তা ভিন্ন আমার ছোট পিসিমা তাঁদের দেখিয়াছিলেন। একবার মাঘোৎসবে আমার বাবাও বেলা এবং রাণুকে (রেণুকা) দেখিয়া আসিয়া তাদের রূপের খ্যাতি করিয়াছিলেন। কাজেই উত্তর দিতে পারিলাম। আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হইল,—

"তাঁর বড় মেয়ের নাম কি জান? কেমন দেখতে?"

"নাম তার মাধুরীলতা, ডাকনাম বেলা। দেখতে বাপের এবং পিসিদের ধরণেরই ব'লে শুনেছি।" বলিয়াই একটা সন্দেহ হইল, প্রতিপ্রশ্ন করিলাম,—

"কেন বল তো? ঘটকালি করবে নাকি তোমার বন্ধুর সঙ্গে?"

ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কে বলেছে? আমার কোন্ বন্ধুর সঙ্গে? তুমিও যেমন!"

তাঁহার লুকাইবার চেষ্টাই তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। বলিলাম, "কেন তোমার আইবুড়ো বন্ধু শরৎ চক্রবর্ত্তী। তা ছাড়া আর কে আছে বিয়ে হ'তে বাকী?"

তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯০১ সালে ২৭ বা ২৮ বৎসর বয়স অবিবাহিত থাকার পক্ষে অত্যন্তই অসাধারণ। বিশেষতঃ তাঁর পরের ভাইকে তিনি বিবাহের অনুমতি দিয়া চির- কুমার থাকার সঙ্কল্প প্রচার করিয়াছিলেন।

উত্তরে শুনিলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়; তবে কথা তখনও খুব বেশী অগ্রসর হয় নাই। শরৎবাবুর ইচ্ছা নয় যে এখনই লোকজানাজানি হয়। বিশেষ বন্ধু দুই জন মাত্র (আমার স্বামী এবং হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়) জানেন। মেয়েটির কথা তিনিই ছলছুতায় জানিতে চাহিয়াছিলেন।

১লা আষাঢ় মাধুরীলতার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু আমার মনের আগ্রহ এবং কৌতূহল অদম্য হইলেও কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ আমায় ভাগলপুরে বাবার কাছে চলিয়া যাইতে হইল। সেখানে বসিয়া আমার স্বামীর মারফৎ নিত্য নানা প্রকারের সংবাদে "বেলা"র পরিচয় পাইতে লাগিলাম। বিবাহের অল্প দিন পরেই, মনে হয় যেন

মাসখানেকের মধ্যেই মাধুরী মজঃফরপুরে ঘর করিতে আসিল। সেদিনেও রকমের ঘরবসত আনা কেহ দেখে নাই। তারই আলোচনায় দেশ ভরিয়া উঠিল। বস্ত্রালঙ্কারের অপর্য্যাপ্ততার খ্যাতি, তার অনবদ্য রূপের প্রশংসা, তার সঙ্গে অতিথিরূপে সমাগত তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ পিতার, আর এ সমস্তকেও ছাপাইয়া উঠিল মাধুরীর অনন্যসাধারণ গুণরাশির মাধুর্য্য।

আমার স্বামীর পত্রে বা তিনি আসিলে তাঁর মুখে তাঁদের নূতন বন্ধুপত্নীর গল্প ধরিত না। বড়লোকের মেয়ে, ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে দেশে আসিয়াছে;—কৌতূহলী দ্রষ্টৃদের ভীড় যথেষ্ট হইত। পরীক্ষার শেষ ছিল না। উদ্ধত রসনা আত্মপর বিবেচনাও করে না। প্রথম প্রথম যথেষ্ট আলোচনা ও সমালোচনা চলিতে ত্রুটি হয় নাই। তাহাকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধও যথেষ্ট করা হইয়াছিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে পাইলাম, তখন নিতান্ত জবরদস্ত নিন্দুক দু-এক জন মাত্র ছাড়া, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেককেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। মাধুরীলতা বলিতে লোকে গলিয়া পড়ে, তার প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হয়।

মাধুরীর মা ছিলেন খাঁটি "বাঙ্গাল" দেশের মেয়ে। হয়ত সেই জন্যই ছিল তাঁর হাতের তৈরি সমস্ত খাদ্যই অতি পরিপাটি! মেয়ের সঙ্গে এবং পার্শেল করিয়া তিনি নিত্য নিত্য নানারূপ আচার, জেলি, নারিকেলের খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদাই পাঠাইতেন। মাধুরী কোন জিনিসই পাঁচ জনকে না দিলে তৃপ্তি পাইত না। মজঃফরপুরের অধিকাংশ বাঙ্গালী-ঘরের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটিয়াছিল। সুতরাং ভাগ-বাঁটোয়ারা তাহাকে ভাল করিয়াই করিতে হইত। তার বাড়ীর নিমন্ত্রণ তো লাগিয়াই থাকিত। স্বামীর বন্ধুদের নিজের হাতে নানা রকম রান্না করিয়া খাওয়ানো তার একটা বিশেষ সখের মধ্যে ছিল।

আমার সঙ্গে তার যেদিন প্রথম দেখা, সেদিনের সেই বিশেষ সন্ধ্যাটির কথা আমার জীবন-খাতার একটি পুরা পৃষ্ঠা ভরিয়া আজিও তেমনই উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে! চৈত্র-অপরাহ্নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটায় সমুদ্ভাসিতা মাধুরীলতাকে বাস্তবিক একটি দেবকন্যার মতই অপরূপ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। রূপ যে আমি দেখি নাই তা নয়। ঘরে বাহিরে গায়ের বর্ণ, মুখের শ্রী, অঙ্গের সৌষ্ঠব সবই যথেষ্ট দেখিয়াছি। মাধুরী তার যেসব পিসিমাদের অনুকৃতি, তাঁদেরও ত আমি বহুবার দেখিয়াছি। কিন্তু তাকে সেদিন যে দৃষ্টি, যে হৃদয় লইয়া দর্শন করিলাম, একেবারে যেন অন্তরের অন্তরঙ্গ করিয়া নিজের কাছেই পাইলাম, ঠিক তেমনটি ত আর কোথাও হয় নাই। শৈশব কৈশোরের প্রিয়সখীদের সঙ্গে দিনে দিনে যে প্রেমের বন্ধন রচিত হইয়াছিল, তার মধ্যে আত্মীয়জনের মতই সুখদুঃখের সহস্র স্মৃতি বিজড়িত থাকে; মিলনবিরহের ভালবাসার মধ্য দিয়া কালে তাহা সুদৃঢ় হয়, হয়ত দৃঢ়তরও হইয়া যায়। এ কিন্তু তা নয়; এর মধ্যে হয়ত খানিকটা রোমান্সের সম্পর্ক আছে, হয়ত পূর্ব্বশ্রুতির তীব্র একটা উন্মাদনার মধ্যেই এর সৃষ্টি! পরে এই কথা লইয়া মাধুরীর সঙ্গে অনেক হাসাহাসি চলিয়াছিল। আমার স্বামী শরৎবাবুকে বলিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রী তো তোমার স্ত্রীর কথা ছাড়া অন্য কথাই আর কন্ না!"

শরৎবাবু বলেন, "ভাগ্যে তোমার স্ত্রী পুরুষমানুষ নন; আমার গিন্নিরও ত ঠিক ঐ রকমই নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু-দিন না গেলেই বলেন, "অনেক দিন ওদের বাড়ী যাওয়া হয় নি। আজকে যাবে?"

মাধুরী আসিয়া হাসিয়া বলে, "তুমি নাকি আমাকে না দেখেই ভালবেসেছিলে?" "তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশী শুনেছি?" "তা বাঁশীই বা শুন্‌লে কোথায়?" বলিলাম, "বাঁশী কি শুধু এক রকমেই বাজে? শ্যামের বাঁশীর যে নানান্ সুর।" সুন্দর মুখের মাধুরীদীপ্ত মধুর হাসিতে মাধুরী ছড়াইয়া মাধুরী কহিয়াছিল, "তা বটে! তোমার এ একেবারেই শ্যামের বাঁশী! কিন্তু ভাই, সাবধান, বাড়ীর কর্ত্তারা ভারী "জেলাস্" হ'তে আরম্ভ করেছেন।"

সেই সব দিনের কথা মনে আসিয়া অনেক দিনই অনেক চোখের জল ঝরিয়াছে;—আজও এই জীবন-সায়াহ্নে উষর মরুভূমির মতই প্রায় শুষ্ক-হইয়া-যাওয়া চিত্তকে নববর্ষার প্লাবনের মতই প্লাবিত করিয়া দিয়া অশ্রু-উৎস ছুটিয়া আসে। জীবনের সব চেয়ে সুখের দিনগুলির মধ্যে প্রিয়বান্ধবীর মধুর স্মৃতি তাদের গায়ে যেন সোনালি জরির মিহি কারুকার্য্যের মতই সুশোভন হইয়া আছে। কালের হাত আজও তাদের স্পর্শ করিতে পারে নাই। কত গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার, কত বসন্ত-সায়াহ্নের, কত শীত-দ্বিপ্রহরের হাস্য রহস্যভরা কর্ম্মকুশলতা-তৎপর দিনগুলি স্মৃতির ভাণ্ডারে আজও যেন অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে; যার মাঝখানে জাগিয়া আছে মাধুরীর সুন্দর মুখ, সুমিষ্ট বাণী, স্নিগ্ধ হাস্য!

মজঃফরপুরে মেয়েদের কোন স্কুল ছিল না। সাব্-ডেপুটি কালীনাথ সেন এবং সাব্-জজ বিপিনবিহারী সেন মহাশয়ের পত্নী তদানীন্তন জেলা জজ মিঃ চ্যাপম্যানের স্ত্রী সহৃদয়া মিসেস চ্যাপম্যানের সহায়তা লইয়া "চ্যাপম্যান বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। স্বল্পদিন মধ্যে কালীবাবু এবং বিপিনবাবু উভয়েই মজঃফরপুর হইতে বদলি হইয়া চলিয়া যান। মাধুরী এবং আমি লেডিজ কমিটির জয়েণ্ট সেক্রেটারী বাহাল হই। প্রথমে আমি রাজী হই নাই। সে-ই আমাকে জোর করিয়া সর্ব্বপ্রথম সাধারণের কাজে টানিয়া নামায়। বলে, "তুমি না এলে আমিও যাব না। যাক্ গে স্কুলটা উঠে। তোমার যদি মায়া না হয়, আমারই বা কি?"

এ কথার পর আর আপত্তি করা চলে না। তখনকার দিনে বেহারে ভীষণ পর্দ্দাপ্রথা। লোকের বাড়ী গেলে বন্ধ গাড়ীতে এবং নামার সময় গাড়ির দু-দিকে চাদর ধরিতে হইত। আমাদেরও সে প্রথা পালন করিতে হইয়াছে। মাধুরীও তা অমান্য করে নাই। এইটিই ছিল তার চরিত্রের বিশেষত্ব! তার মতন বস্ত্রালঙ্কার সে যুগে অন্য কাহারও ছিল না; আর তা ছিল না বলিয়াই সে নিজে সে সকলের কিছুই প্রায় ব্যবহার করিত না। আমি ও দিদি (শরৎবাবুর এবং আমার স্বামীর সহপাঠী বন্ধু উকীল শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী, আমাদের দু'জনকার দিদির মতই শ্রদ্ধেয়া) অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও তাকে এমন কোন জিনিস ব্যবহার করাইতে পারি নাই, যা আমাদের নাই। সেখানে থাকিতে স্কুলের লেডিজ কমিটির মিটিঙের দিনটি মাত্র ভিন্ন তাকে জুতা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। অথচ 'পদপল্লব' বলিয়া যদি কিছু থাকে, সে তাহারই ছিল! আল্‌তা-পরা পায়ে রুণু-ঝুনু মলের ঝাঙ্কনা প্রথম কিছু দিন বড় সুন্দর লাগিয়াছিল। তখন তাহার বয়স ত মোটে চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

আমার "জ্যোতিঃহারা" উপন্যাসে আমাদের স্কুলের ও কাজের প্রথম অভিজ্ঞতার খানিকটা হয়ত আঁকা হইয়া গিয়াছে। স্কুলে মেয়ে-সংগ্রহের জন্য দুজনে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছি। চাঁদা চাহিতে গিয়াও যথেষ্ট তিরস্কার লাভ ঘটিয়াছে; আবার সহৃদয়তা সহানুভূতিরও অভাব ঘটে নাই। ঐ স্কুলটিকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলিতে গেলে মজঃফরপুরবাসী বাঙালী এবং বেহারীদের ঘরেও একটি স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার ফলে ভবিষ্যতের মজঃফরপুরের নারী-সমাজ সবল এবং সুস্থভাবে গড়িয়া উঠিল। যেখানে কিছুমাত্র চালচলন সাজসজ্জা না বদলাইয়াও আমরা "মেম-সাহেব" বলিয়া উপহসিত হইয়াছি, আরও কঠিনতর সমালোচনার ঘায়ে অতিষ্ঠ হইয়া ফিরিয়াছি, আজ হয়ত সেই সকল বাড়ীর মেয়েরাই বর্ত্তমানে আরও কত বড় বড় কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সমাজসেবায় ধন্যা হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সেদিনে অনেক সময়ই বিরক্তি আসিয়াছে, নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে; রাগ করিয়া বলিয়াছি, "কেন খেটে মরছো, ছেড়ে দাও। তোমায় কি ভূতে পেয়েছে? ভালও লাগে ঐ সব চিপ্‌টেন শুন্‌তে?"

বেলা মৃদু মৃদু হাসিয়াছে, কখনও বলিয়াছে "ছোট বেলায় পড়ে না থাকো, স্কুল থেকে চেয়ে নিয়ে একখানা পদ্যপাঠ পাঠিয়ে দেবো পড়ে দেখ;

> "পড়েছি তুফানে তবু ছাড়িব না হাল,
> আজিকে না হলো, কিন্তু হ'তে পারে কাল।"

কোন কথাটাই প্রায় সে বিনা রসযুক্ত করিয়া বলে না; সে যে মস্ত বড় কবিকন্যা এইখানেই মাত্র ছিল তার সেই মহৎ পরিচয়।

বয়সে যদিও মাধুরী আমার চাইতে কয় বৎসরের ছোট ছিল, কিন্তু কোন মতেই সে কথা সে স্বীকার করিতে চাহিত না। শরৎবাবু ছিলেন আমার স্বামীর অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়, সেই হিসাবে মাধুরীর ইচ্ছা ছিল সে-ও সেই স্থানটা দখল করে। সাধারণতঃ লোকে বয়সে ছোট হইতেই ভালবাসে, ওর সে প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না। সাজসজ্জায় বুড়ো সাজিলে রাগ করিতাম, বলিত "তুমি করো কেন?"

যদি বলিতাম "আমি ছেলের মা। তুমি হলে বউ।" সে হাসিয়া বলিত, "সাত সকালে দশ বছরের কনে হয়েছিলে কি করতে? ভারী বুড়ো গিন্নি!"

অথচ আমি তার প্রকৃত বয়স ভালই জানিতাম।

এমনই করিয়া জীবনের রথচক্র মন্দমধুর গতিতে যাত্রা-পথ অতিবাহন করিতেছিল। সে পথের দু-ধারে বসন্তের উপবনে ফুল ফোটার বিরাম ছিল না। ফলও ফলিয়াছে। কোকিল পাপিয়ার সাড়াও কানের তারে বাজিয়াছে, বায়সের কর্কশ রবও হয়ত কদাচ ধ্বনিত হইয়াছিল, কিন্তু কানের তারে তার রেশ প্রতিধ্বনিত হয় নাই। অথচ এই সুখের দিনে দুঃখ আসারও ত কোন বিরাম ছিল না! করাল কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়া ইতিমধ্যে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে অশান্তির বজ্র হানিয়া গিয়াছে। মাধুরীর পরম স্নেহময়ী মা অকালে তাঁর সোনার সংসার, জগতে অতুল স্বামী সন্তান সব ছাড়িয়া গিয়াছেন। বৎসর না

কাটতেই সোনার পুতলী রাণু (রেণুকা) তাঁকে অনুসরণ করিয়াছে। যে মায়ের কথা মাধুরীর বলিয়া শেষ হইত না তাঁর সম্বন্ধে সে প্রায় নীরব। শুধু কখনও কখনও আমার কাছে একা নিরালায় তার চোখে জল ঝরিয়াছে, মায়ের সম্বন্ধে মনের গোপন কথা সে প্রকাশ করিয়াছে। বাহিরে অধৈর্য্য একেবারেই হয় নাই। রাণুর শোকটা তার বড় বেশী লাগিয়াছিল; সেটাকে বহু চেষ্টাতেও সে চাপা দিতে পারিত না। তথাপি চেষ্টারও ত্রুটি করিত না। তার কিছু দিন পরেই মীরাকে কাছে পাইয়া তার মধ্যে হয়ত অনেকখানি সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইল।

গ্রীষ্মের সময় "মাধুরীর বাবা" তার কাছে আসিলেন। রথীন্দ্রনাথরা বদরীনারায়ণ গেলেন। উনি শমীকে লইয়া মাসখানেক বা তার কিছু বেশীও হইতে পারে, ঐখানেই রহিলেন। সেই সময়ই আমি সর্ব্বপ্রথম তাঁর নিজের গলার গান শুনি। আর একবার মাত্র শুনিয়াছিলাম মাঘোৎসবে।

"ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্ল্লভ
আমি মর্ম্মের কথা, অন্তর ব্যথা আর কারে নাহি কব।"

এবং—

"যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন সেকথা রয় মনে।"

এই দুইটি গান তার পর তো অন্যের কণ্ঠেও কতবারই শুনিয়াছি, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আজিও যেন কানে বাজিয়া আছে! নিজের জীবনের অনুভূতিতেও ঐ দুইটি পদ আজও যেন সেই সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরে সমান ভাবেই সাড়া দেয়;—

"যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।"

আমার দিকেও বিপদের ঝড় যে কিছু কম আসিয়াছিল, তাও নয়! কিন্তু বিপদে যেন ভয় না মানার সাধনা আমাদের দুজনকার মধ্যেই সমান ভাবে চলিতেছিল। দুঃখ ভুলিবার জন্যই সে বিশেষভাবে স্কুলের সঙ্গে জড়িত হইল এবং আমাকেও সেই সঙ্গে জড়াইয়া লইল। আর শুধু স্কুলের সীমানাতেই ত নয়, তার বাহিরে আমাদের গহন প্রাণের গোপন তলে ধীরে ধীরে যে বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল, তাহাকেও যেন সুদৃঢ়তর করিয়া দিল, এই দুঃখের সাধনা। সেই দুঃখের মসিময়ী কৃষ্ণা রজনীতে ভাল করিয়াই দুজনে দুজনকার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম। নিবিড়ভাবে পরস্পরকে অনুভব করিয়াছিলাম। ঝড়ের ঝাপটায় দুজনকার মধ্যেকার বাহ্যিক ব্যবধান ছিঁড়িয়া পড়িয়াছিল, উড়িয়া গিয়াছিল; নগ্ন হৃদয়ের মধ্যে অনাবৃত চিত্তের প্রগাঢ় সম্মিলন সাধিত হইতে অবসর লাভ করিয়াছিল।

তার পর সহসা একদিন "মিলনের পাত্রটি পূর্ণ" হইয়া যাইতেই "বিচ্ছেদ-বেদনা"র পালা পড়িল। শরৎবাবু চলিয়া গেলেন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার জন্য বিলাতে। মাধুরী বাপের বাড়ী গেল। সেই বৎসরই অকস্মাৎ মারা গেল শমী। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র সংস্করণ, শিশু রবীন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি, বুদ্ধিতে দীপ্ত, পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্ট শমী হঠাৎ নিদারুণ ভাবেই চলিয়া গেল। মাধুরীর সেই সময়কার অনেকগুলি দীর্ঘ পত্র আমার কাছে ছিল। কিন্তু বিগত বিহারের ভূমিকম্প আমার অনেক কিছুর মত, (১লা মাঘ ১৩৪০) সেগুলির চিহ্নমাত্র রাখে নাই। এত করুণ, অথচ এত সংযমপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ সে-সব পত্র, তার মধ্যে পিতাপুত্রীর চরিত্রের একটি অন্তরালবর্ত্তী দিক্ প্রস্ফুট হইয়া উঠিতে পারিত। পরম দুর্ভাগ্য সেগুলি আমি বাঙালী জাতিকে দিতে পারিলাম না। সে-সব পত্রে, "বাবা কাল বলছিলেন," এই রকম ভূমিকা করিয়াই অনেক রকম উচ্চাঙ্গের আলোচনা থাকিত।

যখনই কলিকাতায় আসিয়াছি, যেখানেই উঠিয়াছি প্রথম দিনেই মাধুরী আমাকে দেখিতে আসিয়াছে;—তা কি ভবানীপুরে দিদিমার (সৌরীনদের) বাড়ী, কি হ্যারিসন রোডে দিদির কাছে, কি পদ্মপুকুরে নিজের বাসায়। তার উপলক্ষ্যেই আমি প্রথম জোড়াসাঁকোর বাড়ী আসা-যাওয়া করি। জগৎপূজ্য মহাকবিকে পাই পরমাত্মীয় রূপে, মাধুরীর স্নেহময় পিতার পরিচয়ে। প্রথম দেখাতেই প্রশ্ন করেন,—

"তুমিই বেলার সবচেয়ে বড় বন্ধু? তোমার কথা ওর কাছে ঢের শুনেছি।"

আমিও একটুখানি হিউমারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিয়া ফেলিলাম,—"শুনিয়ে শুনিয়ে আপনাকে অতিষ্ঠ ক'রে দিয়েছে বোধ হয়?"

মাধুরীর বাবা হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "ততটা এখনও পারে নি। তবে ভবিষ্যতে কি করবে সে ও-ই জানে।"

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেই বা জানিত! রুদ্রের মহাতাণ্ডবে সমস্তই ওলটপালট হইয়া গেল।···

আমার জীবনের একটি ব্যথাময় অধ্যায়ের মধ্যে পাওয়া এই একটি মাত্র পত্র ভূমিকম্পের সমস্ত প্রচণ্ড বেগকে সংহত করিয়া আজও বাঁচিয়া থাকিয়া আমায় আমার পরম হিতৈষিণীর পরম মঙ্গলময় বাণী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেইটুকুমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ পত্রের সমস্তটা দেওয়া সম্ভব হইল না।

ওঁ

২৭ নং ডিহিশ্রীরামপুর রোড

ইটালি

১৩. ৭. ১৪.

সুহৃদ্বরাসু

আজ প্রায় মাসখানেক হল পড়ে গিয়ে পায়ে বড় ব্যথা হয়েছিল, তখন তত গ্রাহ্য করি নি, অল্প অল্প কোমরের ব্যথা হয়েছিল ক্রমে সেই ব্যথা বেড়ে আমাকে এত দিন প্রায় শয্যাশায়ী করে রেখেছিল, এখন একটু নড়ে চড়ে বেড়াতে পারছি।

তোমার চিঠিখানি পড়ে বড় কষ্ট হল, এ রকম ঘটনা ত প্রায়ই হয়, কিন্তু সকলকার অনুভব করবার শক্তি সমান হয় না, তোমার মনে যে আঘাত লেগেছে সে আঘাত মোচন করবার মত একটিও সান্ত্বনা বাক্য আমার কাছে নেই। আমিও একদিন রোগশয্যায় পড়ে পড়ে ভাবতুম যে এ জীবনের মত হাসি সুখ সব ঘুচে গেছে। আর কিছুতে আনন্দ পাব না—জীবনে মৃতবৎ হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু তা ত নয়।. মহৎ দুঃখ একটা মহৎ শিক্ষা, দুঃখ না পেলে মন পরিপূর্ণতা লাভ করে না, হৃদয় সরস হয় না, পরদুঃখে দ্রব হয় না। সমস্ত জগৎ থেকে যেন একটা আবরণ সরে গেছে, মানুষকে যেন নূতন করে দেখতে শিখেছি! এ রকম কঠিনভাবে মনটা নাড়া না পেলে হয়ত কখনো জাগত না, কোন জিনিস বিশেষ করে দেখতে শিখত না, পশুর মত খেয়ে খেলে ঘুমিয়ে জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যেত। মা, ভাই, বোন তাঁদের বিয়োগে ত এ রকম চেতনা হয় নি, তাতে সমস্ত হৃদয় জুড়ে একটা তুমুল বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল, কেবল মনে প্রশ্ন উঠ্‌ত, কেন এমন হ'ল? অসময়ে এদের জীবন-প্রদীপ কেন নিভে গেল? কোন্ মহৎ অপরাধের জন্যে এ কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে? মায়ের মত এমন পুণ্যবতী সতী কেন এত যন্ত্রণা পেলেন? তবে কি ভগবান্ আনন্দময় মঙ্গলময় নন, তিনি কি শুধু ধ্বংস করবার সুখের জন্য জগৎ সৃজন করেছেন? বাবা কত উপদেশ দিয়েছেন, সঙ্গে নিয়ে কত উপাসনা করেছেন, তবু সব সন্দেহ দ্বিধা দূর করতে পারেন নি, তার মানে বোধ হয় যে আত্মার সঙ্গে মনের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ কখনও পাই নি। এই যে গত বৎসর সুদীর্ঘকাল জীবনমৃত্যুর মাঝখানে আন্দোলিত ছিলুম, এই সময় আত্মাতে মনেতে যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এতেই চেতনা লাভ করেছি, প্রাণে নব বল পেয়েছি, জীবনের কিছু সামান্য সার্থকতা হয়েছে।

তোমার শরীর এখন কেমন আছে? আর জর আসে না? বেশ উঠে বেড়াতে পারছো? বুড়ী এখন তোমার কাছে থাকবে? জামাই তাকে নিয়ে যাবার জন্যে বলে না?

মাঝে মাঝে কেমন থাক লিখ। মনে রেখ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা অবধি—

"বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে
থাকি বসে অবসন্ন মনে"

এর মধ্যে দু-একখানা চিঠিপত্রে তোমাদের খবরাখবর পেলে প্রফুল্ল বোধ হয়। ভালবাসা জেনো।

তোমার

মাধুরী

এর পর আর এক বার মাত্র ঐ ডিহিশ্রীরামপুর রোডের বাড়ীতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়,—আর হয় নাই। আমার কনিষ্ঠ পুত্র অশোকের জন্ম প্রভৃতিতে কলিকাতায় আসিতে পারি নাই। মাধুরীও কঠিন রোগের উপক্রমে কিছুদিন হাজারীবাগে ছিল, তার পর শয্যাগত হইয়া পড়ে।···

বাংলার সতীদের যে আদর্শ আজও বিশ্ববন্দিত হইয়া আছে, এই বাঙালী মেয়েটিও সেই সতীলোকের যাত্রিণী। পতিভক্তির ও তদাত্মতার সে ছিল একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! আর সকল বিষয়েই তার তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু এখানে সে ছিল কিশোরীর মতই বিনম্র ও সঙ্কোচ-কুণ্ঠিতা নববধূ। কোন উপহাসই তাহাকে টলাইতে পারে নাই।

···এক দিন সংবাদ মিলিল মাধুরী চলিয়া গিয়াছে।··

বহুদিন আর দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নাই, ইচ্ছাও হয় নাই। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একেবারে পরমাত্মীয়ের মত নিকটে পাইয়াছিলাম, তাঁহার সঙ্গে তাহারই সুবাদে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সূর্য্যের সঙ্গে সূর্য্যোপাসকের নয়, শ্রদ্ধেয় গুরুজনের সহিত স্নেহাস্পদের নিকটতম সম্পর্ক। মাধুরীর বাবা বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার নিজের মনের মধ্যেই যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, তাহা আমি নিজেই অনুভব করিয়াছি। আর তাঁহার দিক হইতেও যে আমার প্রতি একটা সবিশেষ স্নেহের বন্ধন আছে, যখনই কোন উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়াছি। যখনই দেখা হইয়াছে, অন্যের অনুপস্থিতির সুযোগে বেলার কথা, শমীর কথা আলোচনা করিয়াছেন। একবার আমার বোন্‌পো

প্রভাত (শান্তিনিকেতনের ছাত্র কবি ও চিত্রকর প্রভাত-মোহন) কথায় কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিল, "ছোটবেলায় মাধুরী মাসিমা আমাদের বাড়ী কত এসেছেন। তখন কি জানি তিনি আপনার মেয়ে!"

আশ্চর্য্য ভাব দেখাইয়া বলেন, "বাঃ তাও বুঝি জান্তে না? তবে কি জান্তে?"

সে উত্তর করে, "জানতুম তিনি আমাদের মাধুরী মাসিমা; আমাদেরই তিনি।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলেন, "সে সেই রকম ভালোই ছিল; সে সবাইকারই হ'তে পারতো।"

বাস্তবিক ইহাই ছিল তাহার সত্যকার পরিচয়। সে সকলকারই হইতে পারিত! দশ জন লইয়া গঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের লেডিজ্ কমিটির অধিবেশন হইতে আসিয়াই নিরক্ষর প্রতিবেশিনীর বিশেষভাবের গ্রাম্য রসিকতা অম্লান মুখে উপভোগ করিতে তাহার বাধিত না। আমি আড়ালে আসিয়া যদি ঐ সকল রসিকতার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিতাম, মাধুরী হাসিত,—বলিত, "তুমি রুচি-বিকারের দলে ভিড়েছ দেখ্‌ছি! আচ্ছা, ও বেচারীরা জানেই বা কি? শিখেছে কতটুকু? দুটো চারটে নিধুবাবুর টপ্‌পা জানে মাত্র; তাও একটু গাইবে না? তবে যায় কোথায়?"

আমার জীবনগঠনে যত লোকের সহায়তা আমি লাভ করিয়াছি, তার মধ্যে আমার প্রিয়বন্ধু মাধুরীলতার মূল্য নিতান্ত অল্প নয়! তাহাকে ঐখানে ঐ সময়ে অমন করিয়া না পাইলে আমার জীবনের খুব বড় একটা অংশই হয়ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। দশের মধ্যে অগ্রসর হইয়া যাওয়া আমার ধাতুগত ছিল না। মজঃফরপুর এক হিসাবে আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ। আমার শ্বশুর মহাশয় বহু বৎসর ঐখানে বাস করায় সেখানকার তখনকার বাঙ্গালী সমাজে আমি অধিকাংশেরই "বউমা" সম্পর্কিতা ছিলাম। মাধুরী সঙ্গে না থাকিলে একা আমি সেদিনে অন্তঃপুরের গণ্ডী কাটাইয়া "মেমেদের মত" তাদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে অগ্রসর কখনই হইতে পারিতাম না। যদিও আমার স্নেহশীল শ্বশুর মহাশয় আনন্দের সহিতই এ সব কাজে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে প্রোৎসাহিতই করিয়াছিলেন, কিন্তু বাধা তো শুধু আমাদের ঘরেই থাকে না, থাকে প্রতিবাসীদের মধ্যে ও নিজেরও মনে। সেই সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া দিয়াছিল মাধুরী, অথচ সেখানে সে-ও আমারই মত ছিল পর্দ্দানসীন অন্তঃপুরনিবাসিনী। তাই ভাবি ৺স্বর্ণকুমারী দেবী আমার সাহিত্য-জগতে অগ্রসর হওয়ার এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যা বেলা আমার জনসেবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার প্রধান সহায়, না হইলে হয়ত আজ আমার পরিচয় স্বতন্ত্র ভাবেই থাকিত। জানি না কোন্ কর্ম্মফলে একই পরিবারের এই দুইটি নারী (দুই জনের বাহ্যরূপেও অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল) দুই দিক হইতে আমার জীবনপথের যাত্রার বাধা অপসারণে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাকেই কি পূর্ব্বকর্ম্মের অজ্ঞাত আকর্ষণ বলা হয়? এত বড় একটা বিস্ময়জনক অপ্রত্যাশিত সংস্পর্শ শুধুই কি আকস্মিক? অথবা ইহার জন্য অনেক পূর্ব্ব হইতেই জমি প্রস্তুত করা হইতেছিল? সে বয়সে সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করিয়া কোন নূতন কাজে অগ্রসর হওয়া সে-সব দিনে খুবই সহজ ছিল না। বিশেষ করিয়া বেহারী-বাঙ্গালী সমাজে বাস করিয়া এবং বধূ সম্পর্কে সম্পর্কিতা থাকিয়া। প্রথম দিনেই আমি বেলাকে বলিয়াছিলাম, "তুমি তো জান আমি স্কুল-কলেজে পড়ি নি। আমি কি স্কুল চালাতে পারবো?" (তখন লোয়ার প্রাইমারী, আপার প্রাইমারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করা প্রভৃতি ভার আমাদেরই লইতে হইত। প্রশ্নপত্র ইনস্‌পেক্টর অফিস হইতে আসিত না)।

মাধুরী বলিয়াছিল, "নিশ্চয়। স্কুলে ফাঁকি দিতে দিতে পড় নি, ভূদেব মুখু'য্যর কাছে ও সামনে বসে পড়েছ বলেই ত আরও ভাল করেই পারবে।"

ভাল হয়ত পারি নাই। বেলা কলিকাতায় চলিয়া আসিলে বহু দিন পর্য্যন্ত ঐ স্কুলটির দায়ভার বহন করিতে হইয়াছে এবং তার পর বহুতর বালিকা-বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাদের ভালমন্দের অংশ গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইয়াছি। আজিও তার বিরাম হয় নাই। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া সারাজীবন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যে কর্ম্মভার যেখানেই যখন থাকি না কেন, এই যে বহন করিয়া চলিয়াছি, তাহার সূচনা করিয়া দিয়া গিয়াছে আমার পরম সুহৃদ মাধুরীলতা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহার পূর্ব্বে আমি বেশী লোকের সহিত মিশিতেই পারিতাম না। তা লইয়া মধ্যে মধ্যে দু-একটা খোঁচাও খাইয়াছি। স্কুলের সম্পর্কে আসিয়া নানারূপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা, লেডিজ কমিটির কর্ম্ম সম্পর্কে মেম এবং বেহারী হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের সহিত কথাবার্ত্তা চালানো, আলাপ-পরিচয় করা ইত্যাদির ফলে আমার "কুণোভাব"টাকে বাধ্য হইয়া ছাড়িতেই হইয়াছিল।

মাধুরীর মজঃফরপুর ত্যাগ করার পর ১৯০৮ এবং

১৯১০ সালেই তার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী বার দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। বৈবাহিক ব্যাপারে বার দুই, তা ছাড়া একটা পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসার জন্ম মাস কয়েক দিদির (৺ইন্দিরা দেবী) বাড়ী ছিলাম। শরৎবাবু এবং মাধুরী সেই সব সময়ে প্রায়ই আমার কাছে আসিতেন। গানে গল্পে কি আনন্দেই তিন জনে কাটাইতাম তাহা বলিবার নয়। মনে হয় সে যেন এক স্বপ্নেরই জগৎ ছিল! সেইবারেই মাধুরীর নিমন্ত্রণে দিদি ও আমি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর মাঘোৎসব দেখিতে যাই।

সে দৃশ্য বোধ হয় চিরদিনই স্মরণে থাকিবে। মহর্ষির মৃত্যু হইলেও জোড়াসাঁকোর বাড়ী তখনও ভরপুর রহিয়াছে। সুপ্রশস্ত অঙ্গনে যে সভা দেখিলাম তাহাকে পুরাণ-বর্ণিত ইন্দ্রসভা বলিয়া ভুল করিলে কিছু দোষ দেওয়া যায় না! রূপের সঙ্গে সুরের তরঙ্গ মিশিয়া একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব অবর্ণনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুকুমারী-পিসিমা এবং স্বর্ণকুমারী-পিসিমা আমার খুবই পরিচিতা। বাঁকীপুরে বাবা থাকেন; বাড়ীর কাছেই ব্যারিষ্টার নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। তাঁর স্ত্রী চিরপ্রভা দেবী সুকুমারী-পিসিমার মেয়ে। সেখানে তিনি বার দুয়েক যান, সেই সময় মার সঙ্গে যাতায়াত হইয়াছিল। বর্ষীয়সী সৌদামিনী দেবীকে দেখিলাম, মনে হইল এই বয়সই যেন এঁর পক্ষে সবচেয়ে শোভন হইয়াছে! বার্দ্ধক্যের রূপ যে যৌবনের রূপেরও উপরে উঠিতে পারে, তাহা দেখিয়াছি শুধু আমার পিতামহে আর ঠাকুরবাড়ীর এই কয় ভাই বোনে। রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখিয়াও মনে মনে ভাবিয়াছি যে এঁরা কম বয়সে বেশী সুন্দর ছিলেন, না এখন?

মাঘোৎসব দেখার ইচ্ছা অনেক দিন যাবৎই ছিল। এত দিনে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সেদিন যে গানগুলি শুনিয়াছিলাম আজও তাহা মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন চার পাঁচটা গান গাহিয়াছিলেন। সবগুলির কথা মনে নাই, কিন্তু সুরের রেশ আজও কানের তারে ঝঙ্কৃত হইতেছে। শৈশব-সঙ্গিনী নলিনীর সঙ্গে দেখা হইল, বলা বাহুল্য পরস্পরকে চিনিতে পারা সম্ভবই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ যেন চারিদিক হইতে বন্ধনমুক্ত হইয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আজ তাহার যে অর্থই করা যাক না কেন, সেদিনে শুধু ভাবিয়াছি তাঁর অপগত ধনদের স্মৃতি-সমুদ্ভাসিত আলোহাওয়ার মধ্যে কোন মতেই টি'কিতে পারিতেছেন না,—তাই অমনধারা করিয়া পৃথিবীময় উল্কার মতই ছুটিয়া বেড়াইতেছেন! কি সব জিনিস যে তাঁর ছিল, যা নির্ম্মমভাবে খোয়া গিয়াছে, সে ত আমি নিজে দেখিয়াছি,—শুধুই দেখি নাই,—মনে প্রাণেও তাদের জানিয়াছিও যে। কাঙ্গালের মত কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়েন নাই বটে, কিন্তু অন্তরের অন্তর্যামী যে নিয়তই অন্তরের অফুরন্ত অশ্রুনির্ঝরের কলকল্লোল শুনিতে পাইতেছেন। পরের মেয়েকয়জনাকে প্রাণপণে স্নেহ দিতেছিলেন,—দেখিতাম, শুনিতাম, জানিতাম, অনুভব করিতাম, সে সব কার প্রাপ্য তাও না জানিতাম তা নয়! কা'দের প্রতিনিধিত্বে এরা এতখানি ভোগ করিতেছে তাঁর বিশেষ আত্মীয়দের মত আমিও সেটুকু ভাল করিয়াই জানিতাম।

হঠাৎ একদিন,—বেলার মৃত্যুর পর প্রথম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এক বিয়ে বাড়ীতে। বিয়ে বাড়ী, লোকজন আসা যাওয়া করিতেছে, বেলার কথা ইচ্ছা করিয়াই তুলিলাম না। আশপাশ, আধুনিক সাহিত্য এই সব কথাই হইতেছিল। কথায় কথায় বলিলেন,—

"জাতি যখন পতিত হয়, সব দিকেই নেমে পড়ে। ঘরভাড়ার ঝি হয় হিরোইন! আর বাঙলার বড় বড় ঘরেও ত দেখছো, সে রকম সব ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে কি?" অন্য দু-এক জনেরও উল্লেখ করিলেন, আমার পিতামহেরও তুলনা দিলেন।

তাঁর শেষ কথাটার জবাবে আমি বলিলাম, "জন্মায়, তবে থাকতে পায় না। আমার ভাই সোম আর আপনার শমী বেঁচে থাকলে হয়ত তাদের পিতৃবংশের নাম রাখতে পারতো।"

ইজিচেয়ারে শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া উজ্জ্বল দীপ্ত মুখে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তাকে দেখেছিলে? কি সুন্দর ছিল সে! কি বুদ্ধি ছিল তার!"

আবার অবসাদগ্রস্তভাবে শুইয়া পড়িলেন। মুখের উপর হইতে সমস্ত আলোকের দীপ্তি বাতাসে নে'বা আলোর শিখার মতই মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। একটা গভীর শোকের ছায়া চলন্ত মেঘের মতই ক্ষণকালের জন্য যেন মধ্যাহ্ন ভাস্করকে আড়াল করিয়া দিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,—

"বেলা তোমায় বড্ড ভালবাসতো। তোমার দেখাদেখি ইদানীং গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিল। বেঁচে থাকলে হয়ত তোমার মত লিখতে পারতো।"

ভাবিলাম "আমার মত"! সে কার মেয়ে! আমার

চেয়ে যে তার অনেক ভাল লিখিবারই কথা। মুখে কিছুই বলিবার ছিল না।

পুনশ্চ কহিলেন,—হয়ত একজন যে তাকে সত্যকার জানিত, প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, তার সঙ্গে তার কথা বলিতে ভাল লাগিতেছিল,—

"সবুজ পত্রে ওর গল্পগুলো তুমি পড়েছিলে ?"

সাগ্রহে বলিলাম, "পড়েছি বই কি। লেখার ষ্টাইল কি রকম শীঘ্র শীঘ্র ফিরে আসছিল! আমার চাইতে সে ভালই লিখতে পারতো বেঁচে থাকলে। তবে লিখতে রাজী অবশ্য তাকে আমিই অনেক ব'লে ব'লে করিয়েছিলুম, সে ত সহজে আত্মপ্রকাশ করতে চাইতো না।"

ঘরে অন্য লোক ঢুকিতেই সহজভাবে উঠিয়া বসিয়া দিব্য হাসিমুখে কথা কহিলেন; বলিলেন, "তুমি একবার বোলপুর এস না। বেশ ভাল লাগবে।"

তার পর খুব হাসিখুশি খোস গল্প চলিতে লাগিল। আমি কিন্তু সেই ক্ষণিকের বিদ্যুতালোকের মধ্যে দিয়া গভীর শোকভারসমাচ্ছন্ন পিতৃহৃদয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছিলাম। অন্যের নিকট সযত্নে ঢাকা দিয়া রাখিলেও তাহার দাহজ্বালা অগ্নিগর্ভ গিরিশৃঙ্গের মত শীতল হইয়া যায় নাই। অন্তরের নিবিড় অন্ধকাররাশি বাহিরের দীপ্তশিখ দীপাবলীকে নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই মাত্র। নবীনচন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্রের 'বীরের শোক' শব্দটা মনে পড়িয়া গেল। আমাদের নিজের ঘরেও এই ধৈর্য্য আমি দেখিয়াছি তাহাও স্মরণ করিলাম।

এর পরেও যতবারই দেখা হইয়াছিল, কোন না কোন ছলে মাধুরীর নাম আসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য কোন লোকের সাক্ষাতে সে আলোচনা ইচ্ছা করিয়াই করি নাই। ক্রমে তাঁর ও আমার মধ্যের একটি অন্যের অপ্রবেশ্য পবিত্র সংযোগ এই তত্ত্বটি আমি বুঝিয়াছিলাম, অনধিকারীর ইহার মধ্যে স্থান ছিল না। আমায় দেখিলে যে তাঁর চিত্তে বেলার স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, সে পরিচয় বারে বারেই অমি পাইয়াছি।

আলোচনা

মেছো পাখী

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

গত কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৎস্যাশী পাখী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের দেশীয় কোড়াল, বক, মাছরাঙা সকলেরই পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু পল্লী-অঞ্চলের সুপরিচিত পাখী মাণিকজোড়-এর উল্লেখ কেন করেন নি বুঝলাম না। এদের গতিবিধি গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা জানি তাই সংক্ষেপে বলব।

মাণিকজোড় বড় অসামাজিক পাখী। এরা কখনও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে না—সর্ব্বত্রই দেখা যায় এক জোড়া ক'রে। সন্তানসন্ততি হলেও তারা দূরে দূরে গিয়ে নিজেদের এলাকা নির্ব্বাচিত ক'রে নেয়। এদের দাম্পত্যসম্প্রীতি ও পরস্পরের প্রতি আসক্তি একনিষ্ঠ প্রেমের উদাহরণ-স্বরূপ পল্লীগীতিতে উল্লিখিত হয়ে থাকে। মাণিকজোড় সাধারণতঃ চার সাড়ে চার ফুট উঁচু হয়। এদের পা লম্বা ও লাল রঙের। ঠোঁট প্রায় দেড় ফুট দীর্ঘ, কাল দুখানা তরবারির মত। এরা নদী বা বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানে উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় বাসা নির্ম্মাণ করে। শরৎকালে মাণিকজোড় একবারে চারটি ডিম পাড়ে। শাবকগুলি যত দিন বড় না হয় তত দিন পুরুষ, এবং স্ত্রী-পাখীটি পালা ক'রে সর্ব্বদা বাসায় ব'সে পাহারা দেয়। সেই অবসরে অপরটি নিজে খেয়ে বাচ্চাদের জন্য মাছ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে ঠোঁটের মধ্যে ক'রে জল নিয়ে এসে এদের বাসা ধুয়ে ফেলতেও দেখা যায়। এরা নিরীহ পাখী; কিন্তু বাসার নিকটে মানুষ কিংবা কোন বড় পাখী গেলে মাণিকজোড় আকাশের দিকে মুখ তুলে দিয়ে ঠোঁট দিয়ে খটা-খট্ খটা-খট্ এমন শব্দ করে যে মনে হয় কে যেন কতকগুলি শুকনো বাঁশ দিয়ে ভীষণভাবে ঠোকাঠুকি করছে!

প্রথমে শাবকগুলির দীর্ঘ গ্রীবা ও মস্তক কোমল লোমে আবৃত থাকে। পরে গাঢ় নীল ময়ূরকণ্ঠী রঙের উজ্জ্বল পালক উদ্গত হয়। মাণিকজোড়-শাবক বেশ পোষ মানে ও বাধ্য হয়। স্বাধীনভাবে বিচরণ ক'রে বাড়ীতে ফিরে এসে নিঃশঙ্কভাবে এদের প্রতিপালকের পিছনে পিছনে বেড়াতে দেখা যায়।

গোপালবাবু মেরুপ্রদেশের যে 'স্কিমার' নামক টার্ণ-জাতীয় পাখীর উল্লেখ করেছেন এবং টার্ণ পাখীর ছবি দিয়েছেন ঠিক এই পাখী আমাদের দেশে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা, পদ্মা, হড়াসাগর প্রভৃতি নদীতেও বড় বড় বিলে দেখা যায়। এখানে এরা গাঙচিল নামে পরিচিত। এই পাখী অত্যন্ত লঘুপক্ষ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। এদের ওড়বার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, নিম্নতলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে না চলে এরা বাতাসের মধ্যে ঢেউয়ের মত গতিতে উড়ে এবং শিকার ধরবার সময় নীচের ঠোঁট জলের মধ্যে ডুবিয়ে "লাঙ্গল দিয়ে" বেড়ায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাপানে ব্রিটেনে যুদ্ধ ঘোষিত

জার্মেনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নি বটে, কিন্তু বিমান-পোত দ্বারা বার বার ব্রিটেন আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছে এবং অন্য রকমেও ব্রিটেন আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে। অন্যত্রও জার্মেনীতে ব্রিটেনে যুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের অধীন। এটা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সুতরাং জার্মেনী ভারতবর্ষেরও শত্রু। এতে কোন সন্দেহও নাই যে, যদি জার্মেনী রাশিয়াকে হারিয়ে দিতে পারে—সব দিকে না হোক, যদি ককেসাসের দিকে হারিয়ে দিতে পারে, তা হলে জার্মেনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার জন্য এই দিকে ধাওয়া করবে। এই সব বিষয় বিবেচনা ক'রে এপর্যন্ত বলা হ'য়ে আসছিল যে, যুদ্ধ ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে বা এসেছে। কিন্তু, জাপানে ও ব্রিটেনে যুদ্ধ ঘোষিত হবার ফলে, জার্মেনী ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসবার আগেই, অন্য দিক্ থেকে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয়েছে। হয়ত এই কথাগুলি ছাপা হ'য়ে প্রকাশিত হবার আগেই ভারতবর্ষের কোন-না-কোন স্থান জাপানী এরোপ্লেন দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে—দৈনিক কাগজে খবর বেরিয়েছে যে আসামের ডিগবয়ের দিকে জাপানী এরোপ্লেন ধাওয়া করেছে। তার আগেই থাইল্যাণ্ডের (শ্যামদেশের) রাজধানী ব্যাঙ্ককে জাপানীরা বোমা বর্ষণ করেছে। ব্যাঙ্কক রেঙ্গুন থেকে বেশী দূরে নয়, এবং রেঙ্গুন চট্টগ্রাম ও কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়, কয়েক শ মাইল মাত্র—আজকালকার এরোপ্লেন দু-হাজার আড়াই হাজার মাইল দূর থেকে এসে বোমা ফেলে ফিরে যেতে পারে।

উত্তর মালয়ে জাপে ব্রিটিশে যুদ্ধ চলছে। দুটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত হ'য়েছে। (১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪১)।

চীনের, ব্রিটেনের, জার্মেনীর, রাশিয়ার, অনেক শহরকে যে প্রকারে বিপন্ন হ'তে হ'য়েছে, এখন ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে সেই রকম বিপদ আসন্ন। আমাদিগকে সেই বিপদ সহ্য করতে হবে—মানুষের মত সেই বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে, ঠিক্ একথা লিখতে পারছি না। তার কারণ বলছি।

অন্য যে-যে দেশে শত্রুপক্ষ বোমা ফেলছে বা অন্য ভাবে তাদিগকে আক্রমণ করছে, সেই সব দেশের লোকেরা সে-অবস্থায় কি করা উচিত, তার চিন্তা ও ব্যবস্থা নিজেরাই করছে—অর্থাৎ তাদের দেশের লোকদের প্রতিনিধিরা, তাদের স্বজাতীয় শাসনকর্তারা, বা স্বজাতীয় ডিক্টেটররা করছে। যুদ্ধ চলবে, না শান্তি স্থাপিত হবে, তাও তারাই স্থির করছে ও করবে।

আমাদের অবস্থা এর বিপরীত। ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দেবে কি দেবে না, এ বিষয়ে ভারতবর্ষের জনপ্রতিনিধিদের মত নেওয়া হয় নি—ভারতীয় এক জন মানুষেরও এ বিষয়ে "হাঁ," "না," বলবার আইনসঙ্গত ক্ষমতা ছিল না, নাই। ভারতবর্ষ আক্রান্ত হ'লে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে কোন উপায় স্থির ক'রে ব্যবস্থা করবার ভার কোনও ভারতীয় প্রতিনিধি-সভা বা কোনও এক জন ভারতীয়ের উপর নাই। বিদেশী কর্তারা যা ঠিক্ করবেন তাই হবে, অন্য কিছু করবার ক্ষমতা কোন ভারতীয়ের নাই। এর চেয়ে দুঃখকর, লজ্জাকর, অপমানকর অবস্থা কী হ'তে পারে?

ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হ'ত, তা হ'লে এ দুরবস্থা হ'ত না। ভারতবর্ষ আক্রান্ত হ'লে সে অবস্থার উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশের লোকদের দেশী প্রতিনিধিরা ও দেশী শাসনকর্তারাই করতেন।

শুধু তাই নয়। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ত, তা হ'লে এই যে মহাযুদ্ধ বেধেছে, এবং এর আগে ১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে মহাযুদ্ধ বেধেছিল, তার কোনটাই বাধত না।

আমরা গত জুলাই মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে, ব্রিটেন ভারতবর্ষ দখল ক'রে খুব ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান্ হয়েছে ব'লে অন্য কোন কোন দেশের—যেমন, জার্মেনীর ও জাপানের—ঈর্ষ্যাভাজন হ'য়েছে। তারাও ব্রিটেনের মত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'তে চায়—বিশেষ ক'রে চায় ভারতবর্ষ দখল করতে। এমন কামধেনু ত আর পৃথিবীতে নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে ব্রিটেনের উপর কারো ঈর্ষ্যা হ'ত না, মহাযুদ্ধও বাধত

না। স্বাধীন ভারতবর্ষকে আক্রমণ ক'রতেও হঠাৎ কারো ইচ্ছা বা সাহস হ'ত না। কারণ, ভারতবর্ষ আততায়ী অন্য কোন দেশ আক্রমণ করতে ও দখল করতে চাইত না ব'লে তার প্রতি কারো শত্রুতার কারণ ঘটত না, এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ জলে স্থলে আকাশে এত শক্তিশালী হ'ত যে, তাকে আক্রমণ করা ছেলেখেলা হ'ত না।

মডার্ন রিভিয়ুর ঐ প্রবন্ধে আমরা এও দেখিয়েছি যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হ'লে পৃথিবীতে শান্তি বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে না। ভারতবর্ষ যত দিন ব্রিটেনের অধীন থাকবে, তত দিন অন্যান্য সাম্রাজ্যলিপ্সু দেশের লোভের বস্তু থাকবে, এবং অন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মত যথেষ্ট ক্ষমতাও তার নিজের জন্মিবে না।

মডার্ন রিভিয়ুর তার পরবর্তী আগষ্ট সংখ্যায় আমরা স্বর্গীয় লালা লাজপত রায়ের একটি প্রবন্ধ ছেপেছিলাম। তাতে আমাদের তার আগেকার মাসের প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত মত সমর্থিত হ'য়েছিল।

আমাদের শোচনীয় দুরবস্থা এই যে, বিদেশীর আক্রমণ থেকে ধনমানপ্রাণ রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ রূপে বিদেশী শাসন-কর্তাদের উপর আমাদের নির্ভর। তাঁরা নিজেদের জমিদারী ভারতবর্ষ রক্ষার জন্যে যা করবেন, তার বেশী আমরা কিছু করতে পারব না; তাতে প্রাণ রক্ষা হয় ভাল, নইলে হাত পা গুটিয়ে মরতে হবে।

পৃথিবীর স্বাধীনতা ও সুদশার জন্য ভারতের স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক

আগ্রা-অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশের আইন-সভার কংগ্রেসী দলের সদস্য, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্যগণের লক্ষ্ণৌতে একটি সভার অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়েছে :—

লক্ষ্ণৌ, ৭ই ডিসেম্বর

"জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে আইন-সভাগুলিকে সরকারের হাতের যন্ত্রস্বরূপ এক একটি প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টাকে এই সভা ভারতীয়গণের পক্ষে বিশেষ অপমানসূচক বলিয়া মনে করিতেছে। আইনসভাগুলি একমাত্র জনসাধারণের ইচ্ছানুরূপ ভাবেই পরিচালিত হইতে পারে।

ইয়োরোপ, এসিয়া এবং আফ্রিকায় যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার ভয়াবহতা এবং অন্যান্য দেশেও উহার বিস্তৃতির আশঙ্কা সম্পর্কে এই সভা বিশেষ ভাবে অবহিত আছে। এই ভীষণ যুদ্ধে যাহারা বিপর্য্যস্ত, তাহাদের প্রতি এই সভা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের প্রতি এই সভা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে। এই সভা বিশেষ করিয়া স্বদেশ—রক্ষায় চীন এবং রুশিয়ার অধিবাসিগণের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে।

এই সভা আশা করে যে, ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের এই তাণ্ডবলীলার মধ্য হইতে পৃথিবীর এমন একটি উৎকৃষ্টতর অবস্থার সূচনা হইবে যাহাতে জাতিসমূহ স্বাধীনতা এবং সাম্যের ভিত্তিতে পরস্পর সমান সুবিধা উপভোগ করিবে, এক দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভুত্ব তিরোহিত হইবে এবং আন্তর্জ্জাতিক গোলযোগের মীমাংসার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান ঘটিবে।

পৃথিবীর এইরূপ অবস্থার সূচনার জন্য ৪০ কোটী ভারতবাসীর স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক। ভারতীয়গণের স্বাধীনতা ব্যতীত যুদ্ধের অবসান বা কোনরূপ মীমাংসার চেষ্টা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই সভার সমবেত যুক্তপ্রাদেশিক আইন-সভার সদস্যগণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে নূতন করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম পরিচালনে দৃঢ়তা জ্ঞাপন করিতেছে।—

("কৃষক" দৈনিক হইতে।) এসোসিয়েটেড প্রেস

এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। পৃথিবীর স্বাধীনতা ও শান্তির নিমিত্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক ব'লে আমরা মডার্ন রিভিয়ুতে আমাদের প্রবন্ধে যে মত প্রকাশ ক'রেছিলাম, এর শেষ ভাগে তা সমর্থিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের একত্ব কি ব্রিটেনের দান ?

অনেক দিন থেকে ইংরেজ রাজপুরুষেরা ও অন্য অনেক ইংরেজ ব'লে আসছেন, ভারতবর্ষ নানা দেশের সমষ্টি এবং এতে নানাভাষাভাষী নানান্ জাতির বাস;—এই সবকে একত্ব দিয়েছেন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট। গত ১০ই নবেম্বর ম্যাঞ্চেস্টর শহরে ভারতসচিব মিঃ এমারিও এক বক্তৃতায় অহংকার ক'রে বলেছেন, ব্রিটেন ভারতবর্ষকে দিয়েছে একত্ব, তার চতুঃসীমার মধ্যে শান্তি, এবং পক্ষপাত-শূন্য আইনের সর্বব্যাপী রাজত্ব ("Unity and peace within her borders and an all-pervading reign of the inpartial law")।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসবার আগেই, প্রাচীন কালে এবং মধ্য যুগেও, নানা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যে একদেশ এবং ভারতীয়েরা এক মহাজাতি ছিল, তা ভারতীয়েরা অনেকে এবং কোন কোন ইংরেজও অনেকবার দেখিয়েছেন। সে সব কথার পুনরাবৃত্তি করব না। কিন্তু যে বক্তৃতায় মিঃ এমারি পূর্বোক্ত অহংকার করেছেন, তাতেই তিনি অন্যত্র যা বলেছেন, তাতেই তাঁর অহংকৃত উল্লিখিত উক্তি খণ্ডিত হ'য়েছে। যথা—

"Beneath all differences of religion, culture, race, and political structure, there is an underlying unity. There is the fundamental geographical unity which has walled off India from the outside world, while, at the same time, erecting no serious internal barriers. There is broad unity of race which makes Indians as a whole, whatever the differences among themselves, a distinctive

type among the main races of mankind. There is the political unity which she has enjoyed from time to time in her history and which we have confirmed in a far stronger fashion than any of our predecessors in the unity of the administration of law, economic development and of communications."

এতে মিঃ এমারি বলছেন, ধর্ম, সংস্কৃতি, রেস্ (race), এবং রাষ্ট্রনৈতিক গড়নের নানা প্রভেদের নীচে ভারতবর্ষে একটি ভিত্তিগত একত্ব আছে। তার পর তিনি বলেছেন, ভৌগোলিক একত্বের কথা—পর্বত ও সমুদ্রবেষ্টিত ভারতবর্ষকে তার ভৌগোলিক একত্ব যেন প্রাচীর দিয়ে বাহিরের জগৎ থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে, অথচ তাতে তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের আভ্যন্তরীণ সংযোগ রক্ষায় বিশেষ কোন বাধা জন্মে নি। ভারতবর্ষের এই যে ভৌগোলিক একত্ব, মিঃ এমারি স্বীকার করবেন, এটি ব্রিটেনের দান নয়—ইংরেজরা হিমালয়কে ভারতবর্ষের উত্তরে এনে বসায় নি, তার তিন দিকে সমুদ্রও খনন করে নি। তার পর তিনি বলছেন, ভারতের অধিবাসীদের নিজেদের মধ্যে যত প্রভেদই থাক, তারা মানবজাতির প্রধান প্রধান ছাঁচের মানুষদের মধ্যে মোটের উপর একটি আলাদা ছাঁচের মানুষ। তিনি অবশ্যই জানেন, ভারতবর্ষের নানা জা'তের মানুষকে মোটের উপর এক ছাঁচে ঢেলেছেন বিধাতা, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নয়। তার পর তিনি বলছেন, রাষ্ট্রীয় একত্বের কথা। তাও, তিনি বলছেন, ভারতের ইতিহাসে এই দেশ মধ্যে মধ্যে ভোগ করেছে। তিনি দৃষ্টান্ত দেন নি। কিন্তু মোটের উপর এই রাষ্ট্রীয় একত্ব ভারতবর্ষে ঘটেছিল মৌর্য্য যুগে ও গুপ্ত যুগে, এবং মোগল সাম্রাজ্যের সময়। এই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় একত্বও ইংরেজের দান নয়। তা হ'লে ইংরেজ কি একত্ব ভারতবর্ষকে দিয়েছেন? মিঃ এমারি বলছেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তার পূর্ববর্তী যে-কোনও গবর্মেণ্টের চেয়ে এই রাষ্ট্রীয় একত্বকে আরো দৃঢ় করেছেন আইনানুগ শাসনকার্যের একত্ব দ্বারা, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবহার দ্বারা এবং রাস্তা প্রভৃতি দ্বারা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগ স্থাপন দ্বারা। কিন্তু ইংরেজ এদেশে আসবার পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই রকমের একত্ব যে-পরিমাণ ছিল, তা ভারতবর্ষেও ছিল।

ভারতবর্ষকে ব্রিটেন কি অর্থে কতটুকু একত্ব দিয়েছেন, তা মিঃ এমারির কথা থেকেই দেখা গেল। ভারতবর্ষের একত্ব নষ্ট করবার জন্য ব্রিটেন যা করছেন, তাও লক্ষ্য করা উচিত।

১৯৩৫ সালে যে ভারতশাসন-আইন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে প্রণীত হয়, সেই অনুসারে এখন ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি শাসিত হচ্ছে। এই আইন কেমন-ধারা হবে, তা স্থির করবার জন্যে পার্লেমেণ্টের একটি কমীটি (Joint Parliamentary Committee on Indian Constitutional Reform) নিযুক্ত হয়। সেই কমীটির রিপোর্টের প্রথম ভল্যুমের প্রথম খণ্ডের ২৬ প্যারাগ্রাফে তাঁরা বলছেন যে, প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব (Provincial Autonomy) দ্বারা তাঁরা প্রদেশগুলিকে নিজ নিজ স্বাধীন ও সতেজ রাষ্ট্রনৈতিক জীবন গ'ড়ে তুলতে উৎসাহ দিতে চেয়েছেন এবং তার দ্বারা প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের একত্বকে দুর্বল বা, এমন কি, বিনষ্ট করতে চেয়েছেন। যথা—

"We have spoken of unity as perhaps the greatest gift which British rule has conferred on India; but in transferring so many of the powers of Government to the Provinces, and in encouraging them to develop a vigorous and independent political life of their own, we have been running the inevitable risk of weakening or even destroying that unity."

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রণীত ভারত-শাসন আইন ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বপূর্ণ অন্য নানাবিধ ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া বিবাদ ও কখন কখন রক্তারক্তি, এবং প্রদেশে প্রদেশে ঈর্ষ্যা ও ঝগড়া খুব বেড়ে চলেছে।

"ডোমীনিয়ন স্টেটস্ পৃথিবীতে সব চেয়ে উঁচু রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও মর্য্যাদা"

ভারতসচিব মিঃ এমারি আগে বলেছিলেন, গত ১৯শে নবেম্বর ম্যাঞ্চেস্টারের বক্তৃতায় আবার বলেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ডোমীনিয়ন স্টেটস্ পৃথিবীতে সব চেয়ে উঁচু রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও মর্য্যাদা। ব্রিটিশ রাজ-পুরুষরা, কোন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকালে এবং ভারতবর্ষ তাঁদের ফরমাশ্ অনুযায়ী কতকগুলি আজগুবি সর্ত্ত পালন ও পূর্ণ করতে পারলে, এই দেশকে ডোমীনিয়ন মর্য্যাদা দেবেন বলেছেন। যা তাঁরা দিতে চেয়েছেন, সেটা যে কেমন আশ্চর্য সরেস চীজ্, তাই বোঝাবার জন্যে মিঃ এমারি ডোমীনিয়ন স্টেটসের তারিফ করেছেন। এটা আমাদের অদৃষ্টে ঘটুক বা না-ঘটুক, জিনিসটা সত্যিই কি এত বড় ও ভাল? তা হ'লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যাদের এই স্টেটস্ আছে, তাদের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ড সেটা প্রায় ছুঁড়ে ফেলেছে কেন এবং প্রায় স্বাধীন হয়েছে কেন? দক্ষিণ-আফ্রিকার বড় একটা রাষ্ট্রীয় দল কেন দক্ষিণ-আফ্রিকাকে ঐ স্টেটস্ থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছে? মিঃ এমারির কথা সত্য হ'লে

আমেরিকা ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বড় ভুল করেছিল ; এখন বোধ হয় রাষ্ট্রপতি রুজ্‌ভেল্ট আপসাচ্ছেন এবং আমেরিকাকে ব্রিটিশ ডোমীনিয়ন করবার জন্যে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট গোপনে গোপনে দরখাস্ত করেছেন, যদিও বাইরের লোকে জানে যে, ব্রিটেনই আমেরিকার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হ'য়েছে !

—

সুভাষবাবু সম্বন্ধে ব্রিটিশ কল্পনা জল্পনা

ইংলণ্ডের এম্পায়ার নিউস্ নামক কাগজ লিখেছে, সুভাষ বাবু স্ত্রীলোকের বেশে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলেন এবং তাঁকে জার্মেনী ও ইটালীর এজেণ্টরা আফগানিস্থান, সীরিয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রোমে পৌঁছিয়ে দেয় ; সেখান থেকে তিনি ভারতীয়দিগকে নিজের বাণী রেডিয়ো দ্বারা শোনাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখলেন মুসোলিনির ধ্বনি-প্রেরক যন্ত্রগুলা (transmitters) ভারতবর্ষ পর্যন্ত ধ্বনি পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয় ; সেই জন্যে তিনি বার্লিন চলে গেছেন এবং সেখানে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যে একটা ফৌজ (army) পাঠাবার চুক্তি হিটলারের সঙ্গে হয়ে গেছে ; ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক সেজে পালাতে সম্মত হওয়া সুভাষ বাবুর মত পৌরুষসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা, তার বিচার করব না। কিন্তু সুভাষ বাবুর বাড়ীর দরজায় দিনরাত পুলিস পাহারা থাকত ; তাদের এড়িয়ে তিনি পালালেন কেমন করে ? তার পর তিনি সেই বেশে বাংলা, বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা, দিল্লী, পঞ্জাব পার হলেন, পেশাওয়ার পৌঁছলেন এবং বিনা ছাড়পত্রে খাইবার পাস্ পার হ'লেন ; আফগানিস্থান সীরিয়া প্রভৃতিতে জার্মেনী ও ইটালীর লোক ছিল এবং তাদের সে দেশে এরূপ প্রভাব ছিল যে, তারা সুভাষ বাবুকে ইয়োরোপে চালান ক'রে দিতে পারল—ইত্যাদি সব কথাই সত্যি ব'লে মেনে নিতে হবে। তা না-হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তার পর একটু খটকা বাধছে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের ১৭ই নবেম্বরের একটা খবরে প্রকাশ যে, ১২ই নবেম্বর ইটালী থেকে প্রেরিত একটা হিন্দুস্থানী বেতার বক্তৃতা নিউ দিল্লীতে শোনা গিয়েছিল। ইটালী থেকে বেতার বক্তৃতা যদি নিউ দিল্লীতে শোনান যায়, তা হ'লে সুভাষবাবু যে-কারণে রোম ছেড়ে বার্লিন চলে গেলেন, সেটা কেমন করে সত্য হতে পারে ? তিনি ত ইটালী থেকেই ভারতবাসীদিগকে বেতার বক্তৃতা শোনাতে পারতেন। আর যদি ঐ খবর সত্য হয়ও, তা হ'লে তিনি বার্লিন থেকেও ত ভারতীয়দিগকে এ পর্যন্ত কোন বক্তৃতা শোনান নি।

তার পর আর একটা ব্রিটিশ জল্পনা, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য একটা ফৌজ পাঠাবার চুক্তি হিটলার ও সুভাষবাবুর মধ্যে। এই যে বাহিনী, এই সৈন্যদল, কার ও কে পাঠাবেন ? সুভাষ বাবুর বাহিনী ? তিনি পাঠাবেন ? তাঁর কিন্তু স্বদেশে কিম্বা বিদেশে কোন সৈন্যদল নাই। স্বদেশে তাঁর দলের "আপোষবিহীন অবিরামসংগ্রামপরায়ণ" লোকেরা আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা অস্ত্র নিয়ে একা একা বা দলবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করতে কখনও শিক্ষা পান নি, কুচকাওয়াজ কিছুই জানেন না। সেকেলে বা একেলে কোন রকম যুদ্ধাস্ত্রই তাঁদের নাই। সুতরাং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য যে সৈন্যদল পাঠাবার চুক্তি হয়েছে ব'লে প্রচার করা হয়েছে, সেটা সুভাষবাবুর হ'তে পারে না। সেটা যদি হিটলারের অধীন কোন সৈন্যদল মনে করা হয়, তা হ'লে তা পাঠাবার জন্যে সুভাষবাবুর সঙ্গে চুক্তি করা অনাবশ্যক। হিটলার তা কেন করবেন ? সৈন্যদল হিটলার কারো সঙ্গে চুক্তি না ক'রেই ত পাঠাতে পারেন ? অতএব, ব্রিটিশ জল্পনার এ অংশটার কোন মূল্য নাই। তা ছাড়া, সুভাষবাবু হিটলারের সঙ্গে এরূপ চুক্তি কেন করতে যাবেন ? তিনি কি এত অন্ধ ও এত বোকা যে, এখনও বুঝতে পারেন নি যে, হিটলার কোন দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে সেখানে সৈন্য পাঠান না, দেশটা দখল করবার জন্যই পাঠান ?

বলা হয়েছে, সুভাষবাবু এদেশে "পঞ্চম বাহিনী"র কাজ চালাবেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য অগ্রহায়ণের প্রবাসীতেই লিখেছি। এদেশে "পঞ্চম বাহিনী"র কাজ চালাতে হ'লে সুভাষবাবুকে ভারতবর্ষে আসতে হবে। কেমন করে আসবেন ? যদিই বা কোন জাদুমন্ত্রবলে ছদ্মবেশে এসে পৌঁছেন তা হলে ক'দিন তিনি জেলের বাইরে স্বাধীন থাকতে ও "পঞ্চম বাহিনী"র সেনাপতিত্ব করতে পারবেন ? সুতরাং এ দেশে এসে "পঞ্চম বাহিনী"র কাজ তিনি চালাতে পারবেন না। বাইরে থেকে হুকুম পরামর্শ ইত্যাদি কিছুই তিনি "পঞ্চম বাহিনী"কে পাঠাতে পারেন না ; কেন না, ডাক, তারের টেলিগ্রাফ, বেতার বার্তা, সমুদয় বিভাগই গবর্মেণ্টের হাতে। গবর্মেণ্টকে এড়িয়ে গবর্মেণ্টবিরোধী কোন

খবরই পাঠান যায় না। সুতরাং তিনি "পঞ্চম বাহিনী"র কাজ চালাবেন, এ জল্পনাটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মূল্যহীন।

তাঁকে কুইসলিং বলাটা যে ভাষার অপপ্রয়োগ, তা আমরা অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে দেখিয়েছি। এখানে বলা আবশ্যক, আমরা যে কুইসলিংকে ইংরেজ বলেছিলাম, সেটা ভুল। তিনি নরওয়ের লোক, সেখানকার সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। তিনি যখন রাশিয়ায় নরওয়ের দৌত্য-বিভাগে কাজ করতেন, তখন ব্রিটেনের স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন এবং তার জন্য ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট তাঁকে উপাধিভূষিত করেছিলেন। ব্রিটেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এই পর্যন্ত। তিনি তাঁর স্বদেশ নরওয়েতে হিটলারের গুপ্তচর রূপে চক্রান্ত করে মাতৃভূমিকে হিটলারের পদানত করবার সাহায্য করেছিলেন এবং তার পুরস্কারস্বরূপ হিটলার নরওয়েতে নিজের হাতের পুতুল গবর্মেণ্টে তাঁকে প্রধান পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কেউ না মানায় সে পদ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কুইসলিং ইংরেজ নয়, খুলনা জেলার ইসলামকাটির ক্ষিতিনাথ সুর আমাদিগকে জানিয়ে দেওয়ায় আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

—

সুসংলগ্ন আকস্মিক ঘটনামালা

পৃথিবীতে কত জায়গায় হঠাৎ আকস্মিক কত কি ঘটছে, যাদের পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আকস্মিক কতকগুলি ঘটনাও হঠাৎ পরে-পরে ঘটতে পারে, যেগুলির পরস্পরের সঙ্গে বেশ একটা সম্পর্ক আছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এরূপ ঘটনামালা অকস্মাৎ ঘটতে পারে, কারো চেষ্টায় ঘটে না। সম্প্রতি এইরূপ ঘটনামালার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে যা সম্পূর্ণ আকস্মিক।

সুভাষ বাবু বাঙালী; সেই জন্যে তাঁর মিত্র ও বিরোধী উভয়ই অন্য প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে বেশী। বঙ্গে তাঁর দলের লোকেরা তাঁর কোন খবর না-পেয়ে উদ্বিগ্ন ও বিরোধীরা তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী। এই উদ্বেগ ও কৌতূহল বঙ্গেই বেশী হ'লেও অকস্মাৎ বঙ্গের বাইরের এক জন কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্যেরই—কোন বাঙালী সদস্যের নয়—উদ্বেগ ও কৌতূহল বেশী হওয়ায় তিনি প্রশ্ন করেন, গবর্মেণ্ট সুভাষ বাবুর কোন খবর জানেন কি না। অকস্মাৎ তার আগে গবর্মেণ্টের হাতে কিছু মুদ্রিত ইস্তাহার এসে পড়েছিল, যাতে সুভাষ বাবুর সম্বন্ধে খবর ছিল। তারই কিছু কিছু অংশ পড়ে মিঃ কনর‍্যান স্মিথ অবাঙালী সদস্যটির উদ্বেগ দূর করতে ও কৌতূহল তৃপ্ত করতে পারলেন। ইস্তাহারের খবরগুলাতে সর্বসাধারণ সন্দেহ প্রকাশ করছিল। বিলাতী কাগজগুলা কিন্তু তার উপর নির্ভর করে সুভাষ বাবুকে আক্রমণ করতে লাগল। অকস্মাৎ ২।১ দিনের মধ্যেই এসোসিয়েটেড প্রেস, আর কেউ নয়, টোকিয়ো, রোম ও বার্লিনের এ রকম রেডিয়ো বক্তৃতা শুনতে পেলেন, আগে পান নি, যাতে ইস্তাহারের খবরগুলা সমর্থিত হয়। এখানে একটা অবান্তর প্রশ্ন করতে পারা যায়—টোকিয়ো রোম বার্লিন থেকে যে-সব বেতার-বক্তৃতা আসে, সরকারী মতে তার সব কথাগুলাই সত্য, না কেবল সুভাষ বাবুর নিন্দাগুলাই সত্য?

তার পর আর একটা ব্যাপার ঘটল। কেন্দ্রীয় ব্যাসেমব্লীতে শ্রীযুক্ত এন এম জোশী এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দেওয়া হোক। আগে আগে সুভাষ বাবুর সম্বন্ধে অকস্মাৎ উপরে-লিখিত ব্যাপারগুলি ঘটায় জোশী মশায়ের বক্তৃতার উত্তরে স্বরাষ্ট্র মেম্বর সর্ রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওএলের অকস্মাৎ বলবার সুবিধা হ'য়ে গেল যে, সুভাষ বাবুর সম্বন্ধে যে-রকম সব খবর পাওয়া গেছে তাতে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কেমন ক'রে মুক্তি দেওয়া যায় বলুন!

অতএব দেখা যাচ্ছে, আকস্মিকতা-নাম্নী দেবী সর্ রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওএল ও তাঁর গুরুভাইদের প্রতি খুবই দয়াময়ী।

—

লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভয়

১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে যত মানুষ ছিল, ১৯৪১ সালে তার চেয়ে পাঁচ কোটি বেড়েছে। এতে পণ্ডিত অপণ্ডিত অনেক লোক ভয় পেয়েছেন। এত মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে, তাঁদের এই ভয়। ভাবনার বিষয় বটে। ভরসা ও সান্ত্বনা এই, যে, ভারতবর্ষের লোকেরা এক বিষয়ে এমন একটা "রেকর্ড" স্থাপন করেছে যা এখনও পৃথিবীর কোথাও অতিক্রান্ত হয় নি। সেটা হচ্ছে, কত কম খেয়ে ও কি পরিমাণ উপবাসী থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, তারই "রেকর্ড"।

ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে যত মানুষ বাস করে, ইয়োরোপের অনেক দেশে প্রতি বর্গমাইলে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক বাস করে। এবং তারা খায় দায় আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। সেই সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যে ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী, তাও নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যদি আরো অনেক বাড়ে, তা হ'লেও তারা না-খেয়ে মরবে না যদি

তারা ইয়োরোপের লোকদের মত উদ্যোগী হয় এবং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে তাদের মত দক্ষ হয়।

নানা কারণে আমাদের দেশের অনেক পণ্যশিল্প লোপ পেয়েছে বা লোপ পেতে বসেছে। যে-সব লোক পুরুষানুক্রমে সেই সব শিল্পের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করত, তাদের কিছু জমিজায়গা থাকলে তাতেই তারা মাটি কামড়ে পড়ে আছে। কিন্তু চাষের দ্বারা কতই আর আয় হবে? যাদের জমি ছিল না, তারা ভূমিশূন্য শ্রমিক বা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে গেছে। কিন্তু দেশের এরূপ অবস্থা হ'লেও জমির থেকে আর কিছুই হ'তে পারে না মনে করা ভুল। বাংলা দেশে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৬২১ জন মানুষ বাস করে। তাতে মনে হতে পারে, চাষ করবার যোগ্য জমি বাংলা দেশে যা ছিল, সবই লাঙ্গলের নিচে এসেছে। কিন্তু বঙ্গে চাষের যোগ্য জমি কত আছে এবং তার মধ্যে পতিত কত আছে, তার কোন হিসাব না দিয়েও আমরা বলতে পারি, আমরা সবাই বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে অনেক জমি দেখতে পাই যা পতিত আছে কিন্তু যাতে চাষ হ'তে পারে। চাষ বলতে বাংলা দেশে শুধু ধানের আর পাটের, কিম্বা তার উপর আকের চাষ বুঝলে চলবে না। আরো নানা রকম ফসল হ'তে পারে, উঁচু শুক্‌ন ডাঙা জমিতেও হ'তে পারে। কাপাসের চাষ বাংলা দেশের অনেক স্থানে হ'তে পারে এখন যেখানে হয় না। চীনে-বাদামের চাষ এমন অনেক জায়গায় হ'তে পারে যেখানে এখন হয় না। আজকাল বাজারে কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। বাংলা দেশে কাগজের কলকারখানা আরো বাড়লে লাভের সহিত চলতে পারে। কাগজ তৈরি করবার নানা উপাদান আছে। বাবুই ঘাস তার মধ্যে একটি। এই ঘাস শুক্‌ন উঁচু জায়গাতেও হয়। মেদিনীপুর জেলায় কয়েক হাজার বিঘা জমিতে এক জন ব্যবসাদার এই ঘাস লাগিয়ে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছেন; তিনি বাঙালী নন।

নূতন নূতন ফসল থেকেই যে বঙ্গে আমাদের আয় বাড়তে পারে, তা নয়; যে-সবের চাষ সচরাচর হয়ে থাকে, তার থেকেও হতে পারে।

বাংলা দেশের প্রধান ফসল ধান আমরা বিঘা প্রতি যত পাই, অন্য অনেক দেশের চাষীরা উৎকৃষ্টতর কৃষি-প্রণালীর দ্বারা ও উৎকৃষ্ট সার ব্যবহার দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশী ধান পায়। তাদের মত ফল যদি আমাদের কৃষকরা চান, তা হ'লে তাদের মত চাষের জ্ঞান, তাদের মত উদ্যম এবং সেই সব দেশে যে-যে ব্যবস্থায় চাষীরা দরকার মত মূলধন পায়, সেই রকম জ্ঞান উদ্যম ও ব্যবস্থা চাই।

অপেক্ষাকৃত ঘনবসতি অঞ্চলের লোকগুলা দরিদ্র, আধপেটা খায়, এবং অপেক্ষাকৃত বিরলবসতি অঞ্চলের লোকেরা সঙ্গতিপন্ন, যথেষ্ট খেতে পায়—এ রকম মনে করা যে ভুল, শুধু ভারতবর্ষেরই নানা অঞ্চলের দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যায়। বঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে ৬২১ জন মানুষ থাকে; বিহারে ৪৬৯, আগ্রা-অযোধ্যায় ৪৫৬, আসামে ১৫৬, ইত্যাদি। কিন্তু যাঁরা এই সব প্রদেশের চাষীদের ও অন্য সাধারণ লোকদের অবস্থা দেখেছেন, তাঁরা কেও বলবেন না যে, আসামের, আগ্রা-অযোধ্যার, ও বিহারের সাধারণ লোকদের অবস্থা বঙ্গের সাধারণ লোকদের অবস্থার চেয়ে ভাল।

ঘনবসতি অঞ্চলের চেয়ে বিরলবসতি অঞ্চল নিশ্চয়ই অধিকতর সমৃদ্ধ সকল স্থলে বটে কিনা, সে প্রশ্ন তুলবার কারণ এই যে, যাঁরা ভারতবর্ষের লোক বাড়ায় ভয় পেয়েছেন তাঁরা বলছেন কৃত্রিম উপায়ে এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি থামিয়ে দেওয়া হোক তা হ'লে দেশের দশা ভাল হবে।

জন্মনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সব আপত্তির কথা এখানে উত্থাপন করব না। কেবল একটা কথা বলব। জন্মনিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ দেহের অনিষ্ট না ক'রে যে-যে উপায়ে হ'তে পারে ব'লে অনেক ডাক্তার বলেন, সেই সব উপায় অবলম্বন ব্যয়সাধ্য এবং কিঞ্চিৎ শিক্ষাসাপেক্ষও বটে। ঘড়বাড়ীর ব্যবস্থাও তার উপযোগী হওয়া চাই। যারা সামান্য এক কুঠরির কুঁড়েঘরে পুরুষজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয় নানা বয়সের অনেক লোক বাস করে, তাদের ঘর এসব "সভ্য" সমাজের ব্যাপারের উপযোগী নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র ও নিরক্ষর। জন্মনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ এদেশে চালাবার চেষ্টা করলে শিশু কম জন্মাবে শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন লোকদের মধ্যেই, অর্থাৎ অনেক শিশু পালন করবার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের বাড়ীতেই শিশুর অভাব হবে, বা শিশুর আবির্ভাব কম হবে; এবং যাদের শিশুপালন করবার সব রকম সামর্থ্যই কম, তাদের বাড়ীতে শিশুর প্রাচুর্য্য এখনকার মতই থেকে যাবে। তা হ'লে দেশে শিক্ষিত "ভদ্রলোক" শ্রেণীর মানুষ অশিক্ষিত "সাধারণ" লোকদের তুলনায় ক্রমশই কমতে থাকবে। তা কি বাঞ্ছনীয়? তা ছাড়া, যাঁরা জন্মনিরোধ চান, তাঁদের উদ্দেশ্য ত মোটের উপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে দেওয়া—সে উদ্দেশ্য সফল

হবে না। কারণ, যে দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকেরাই দেশের জনসমষ্টির প্রধান অংশ, তাদের বৃদ্ধি কমবে না, থামবে না।

সেই জন্য আমাদের মত, দেশের কৃষির আরও উন্নতি ও বিস্তার করা হোক এবং নূতন নূতন পণ্যশিল্পের প্রবর্তন করা হোক, ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ান হোক। এই উপায়ে আরও অনেক লোক ভারতবর্ষে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে। এও দেখা গেছে যে, কোনো মনুষ্যসমষ্টি যে-পরিমাণে জান্তব দৈহিক জীবনের উপরে উঠে' সাহিত্য ললিতকলা বিজ্ঞান ধর্ম প্রভৃতির অনুশীলনে মন দেয়, সেই পরিমাণে তাদের বংশবৃদ্ধি কমতে থাকে। ব্যক্তিগত দু-একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে এই কথার প্রতিবাদ করা যায় বটে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে ইহা সত্য। সেই জন্য মনে হয়, দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল হ'য়ে যদি সকলে শিক্ষিত হয় এবং কৃষ্টি বা সংস্কৃতিতে মনোযোগী হয়, তা হ'লে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারও স্বভাবতঃ কমবে; তা কমাবার জন্যে কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হবে না।

গত দশ বৎসরে বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গেই বেশী হারে লোকসংখ্যা বেড়েছে—শতকরা ২০ বেড়েছে। পুরুষানুক্রমে বঙ্গে যাদের বাস, এত বেশী বৃদ্ধি তাদের পক্ষে উদ্বেগের কারণ। বাইরের থেকে যে-সব অবাঙালী বঙ্গে আসে, তারা কুলি মজুর মিস্ত্রী কারিগরের কাজ ও দোকানদার সওদাগরের কাজ ক'রে অর্থ উপার্জন করে। বাঙালীদিগকেও এই সব দিকেই মন দিতে হবে। মুটে-মজুর-মিস্ত্রীর কাজে সাধারণ কেরানীগিরি ও শিক্ষকতার চেয়ে আয় বেশী এবং দেশে কেরানী ও শিক্ষকের চেয়ে সাধারণ শ্রমিক ও কারিগর আবশ্যকও হয় অনেক বেশী।

—

কোন কোন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা

ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের জন্যে অনেকে ভাবছেন, এ-দেশে মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়েছে, আর যেন না বাড়ে, কেমন ক'রে বাড়টা থামান যায়। কিন্তু অন্য অনেক দেশের সমস্যা এর উল্টো। ফ্রান্স যে জার্মেনীর কাছে হেরে গেল, মার্শ্যাল পেতাঁ তার একটা কারণ বলেছিলেন ফ্রান্সে শিশু জন্মায় খুব কম "(too few children)", সুতরাং মানুষ বাড়ে কম, যুদ্ধ করবার জন্যে সৈনিক যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড ঠিক্ এ রকম কথা না বললেও দেখা যাচ্ছে, সেখানে যথেষ্ট লোকের অভাব অনুভূত হচ্ছে; কারণ, স্ত্রীলোকদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে না-পাঠালেও সেখানকার গবন্মেণ্ট উর্দি-পরা অনেক কাজে "(uniformed services"-এ) লাগাচ্ছেন যে-সব কাজ আগে পুরুষেরা ক'রত এবং যা না করলে যুদ্ধ চালান যায় না।

কোন কোন দেশে, লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্যে অবিবাহিত পুরুষদের উপরে ট্যাক্স বসান হচ্ছে এবং সন্তান বৃদ্ধির জন্যে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। শিশুপালনের জন্যে ভাতাও দেওয়া হচ্ছে। জাপানে ও জার্মেনীতে এই রকম সব উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। তারা বেশী মানুষ চায়; নইলে আজকালকার দিনে যুদ্ধ চালান যায় না। সে-কালে এক একটা জায়গার এক একটা লড়াইয়ে দু-শ পাঁচ-শ দু-হাজার দশ হাজার মানুষ মরলে লড়াইটাকে খুব ভীষণ বলা হ'ত। আজকাল চীনা, জাপানী, রাশিয়ান, জার্ম্যান—সবাই বলছে শত্রুপক্ষের অনেক লক্ষ সৈন্য বধ করেছে। সুতরাং মরবার ও মারবার জন্যে আরো বেশী মানুষ চাই! এই সব দেশের শাসনকর্তারা ও নেতারা ত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন না যে, আরও লোক বাড়লে খাওয়াবে কী। অথচ জাপান বা জার্মেনী বিরলবসতি দেশ নয়। তাদের পৌরুষ আছে, আরো মানুষ বাড়লে খাওয়াবে কী, সে উদ্বেগ তাদের হয় না—কোন প্রকারে খাওয়াতে পারবে ও কাজে লাগাতে পারবে, এ বিশ্বাস তাদের আছে। অবশ্য, তারা পরদেশ-লুট স্বদেশের লোকদের পেট পুরাবার একটা উপায় মনে করে বটে, কিন্তু লুটকেই একমাত্র উপায় মনে করে না।

—

দেশে আরো "মানুষ" চাই

আমরা যুদ্ধ ক'রে মরবার বা অন্যকে মারবার জন্য আরো মানুষ চাই না—যদিও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা আমরা গর্হিত মনে করি না। আমরা মানুষের মতন মানুষ চাই মানুষের মতন বেঁচে থেকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করবার জন্য এবং দেশের ও জগতের মানসিক ও আত্মিক ঐশ্বর্য্য বাড়াবার জন্য।

বাংলা দেশে মহৎ মানুষ যথেষ্ট নাই। সে রকম মানুষ অবশ্যই চাই। কিন্তু মানুষের মত সাধারণ মানুষও ত বঙ্গে কম। বাংলা দেশে, শুধু কল্‌কাতায় নয়, শ্রমসাধ্য কাজ, ব্যবসাবাণিজ্য ও নানা বৃত্তির কাজ ক্রমেই বেশী ক'রে অবাঙালীদের হাতে গিয়ে পড়ছে। কলকারখানা চালাতে হলে মজুর মিস্ত্রী আমদানী করতে হয় বাইরে থেকে। কলকাতার মিউনিসিপালিটির নানা রকমের শ্রমিক ও মিস্ত্রী প্রধানতঃ অবাঙালী। ধোপা নাপিত গোয়ালা অবাঙালী। ছোট ছোট দোকানদার ও সওদাগরদের মধ্যে অবাঙালী বিস্তর। গৃহস্থবাড়ীর

চাকর রাঁধুনী অবাঙালী। খেয়াঘাটের মাঝি মাল্লা অবাঙালী। ধান কাটাবার সময় অনেক জেলায় স্থানীয় লোকেরা সে কাজ করে না বা করতে পারে না, দূর থেকে সাঁওতাল বা সেই রকম অন্য শ্রমিক এসে সেই কাজ ক'রে দেয়। এই সমস্ত কাজই মানুষের কাজ। এই সমস্ত কাজ অবাঙালীরা করবে, অথচ বাঙালী জাতি টিকে থাকবে ও একটা বড় জা'ত ব'লে আত্মাভিমান করবে—এ হ'তে পারে না।

সব বয়সের সব রকম বাঙালীকেই, যিনি যে কাজই করুন না, জগতের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সমকক্ষ হ'তে হবে। এক সময় ছিল যখন বাঙালী ছাত্রেরা ছাত্রের সেরাদের মধ্যে ছিল। এখন কিন্তু অন্য অনেক প্রদেশের ছাত্রেরা বাঙালী ছাত্রদের চেয়ে অধিক পরিশ্রমী ও একাগ্র এবং তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা (earnestness) অধিক। অবাঙালী কারো উন্নতিতে আমরা দুঃখিত নই, কিন্তু বাঙালী হ'টে গেলে বড় দুঃখ হয় ও লজ্জা বোধ হয়।

—

ইংরেজের চোখে কম্যুনিষ্টরা খুব ভাল,—আবার খুব মন্দ !

স্বাধীনতার কত প্রশংসাই না ইংরেজী সাহিত্যে আছে ! যারা ইংরেজদের স্বদেশে ও বিদেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ ক'রে লড়েছে, প্রাণ দিয়েছে, তাদের মাহাত্ম্য-কীর্তন কত ইংরেজ লেখকই না করেছেন ! কিন্তু এই যে প্রশংসা, এই যে মাহাত্ম্য-কীর্তন, এ ইংরেজদের জন্য ও সেই-সব জাতির লোকদের জন্য যারা ইংলণ্ডের প্রজা নয় (কিম্বা শত্রু নয়), ভারতীয়দের জন্য ত নই-ই।

এমন এক সময় ছিল যখন ভারতীয়দের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীন অবস্থাকে আদর্শ অবস্থা বলা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত। এখন যদিও তা হয় না, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্যে ভারতীয়দের কার্যতঃ কিছু করা অপরাধের সামিল।

এর থেকে এই একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, যে, যা ইংরেজদের পক্ষে ও ইংরেজদের মিত্র স্বাধীন জা'তদের পক্ষে ভাল, ভারতীয়দের পক্ষে তা যে ভাল হ'তেই হবে, এমন নয়, মন্দও হ'তে পারে—অনেক স্থলে, যেমন স্বাধীনতা লাভ-প্রযত্নে, মন্দই।

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে এবং তার পরেও কিছু দিন পর্যন্ত কম্যুনিস্টরা গবর্মেণ্টের রোষভাজন ছিল—ভারতীয় কম্যুনিস্টরা এখনও আছে। কিন্তু যখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করায় রাশিয়া জার্মেনীর শত্রু সুতরাং ব্রিটেনের বন্ধু হয়ে গেল, তখন রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা (রাশিয়ার সব রাশিয়ানই কম্যুনিস্ট) বড় ভাল লোক ব'নে গেল। সেই জন্যে স্টেট্‌স্‌ম্যান পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে রাশিয়া বেড়িয়ে আসবার পরামর্শ দিয়ে ফেলেছেন ! কিন্তু ভারতবর্ষের কম্যুনিস্টদের উপর গবর্মেণ্টের মনের ভাব ও ব্যবহার বদলালো না—তারা শত্রুই র'য়ে গেল।

এই-দেশী কম্যুনিস্টদের অনেককে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়েছে, অনেকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এ পর্যন্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটা মোকদ্দমার সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব।

মান্দ্রাজে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অল্প দিন আগে হ'য়ে গেছে, তাতে প্রধান আসামী ছিলেন মান্দ্রাজের ডক্টর সুব্বারায়েনের পুত্র। তাঁর কারাদণ্ড হয়েছে। তাঁর পক্ষসমর্থক ব্যারিস্টর বলেছিলেন, রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা ত এখন ব্রিটেনের বন্ধু, অতএব তাঁর মক্কেলকেও বন্ধু মনে করা হোক। আদালত সে যুক্তি মানেন নি। ডক্টর সুব্বারায়েন বিদ্বান্ লোক, বড় জমিদার, মান্দ্রাজে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। আগে তাঁর রাজনৈতিক মত যাই থাক্, এখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী গান্ধীজীর মতাবলম্বী। তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা রাধা বাঈ সুব্বারায়েন বিদুষী এবং কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য। তাঁদের উল্লিখিত পুত্রটিও সুশিক্ষিত, ইংলণ্ডে শিক্ষিত। এ-হেন পিতা মাতার পুত্র গান্ধীজীর দলভুক্ত বা তদ্রূপ কিছু না হ'য়ে হলেন কম্যুনিস্ট। এর কারণ কেমন ক'রে জানব।

মান্দ্রাজের যে কম্যুনিস্ট চক্রান্তের মোকদ্দমার কথা বলছি, তাতে আর একজন আসামী ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের পুত্র। ইনিও সুশিক্ষিত। পিতার মধ্যবর্তিতায় ও তদ্বিরে এই যুবকের বিচার হয় নাই, আদালত তাকে ছেড়ে দেন। সে বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। আমরা কেবল এই বলতে চাই যে, বাপে-খেদান মায়ে-তাড়ান অকালকুষ্মাণ্ডরা কম্যুনিস্ট হচ্ছে না, অজ্ঞাতকুলশীল লোকদের ছেলেরাই কম্যুনিস্ট হচ্ছে না, তাদের মধ্যে কোন কোন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ লোকদের সুশিক্ষিত ছেলেরাও আছে। এর কারণ কি? একটা কারণ, তারা দেখছে অন্য কোন উপায়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'তে পারল না—গান্ধী-প্রদর্শিত পন্থাদ্বারাও নয়। তা ছাড়া, তারা এও দেখছে যে, গান্ধীজী স্বয়ং দারিদ্র্য বরণ ক'রে দারিদ্র্যব্রতী হ'লেও দেশের অধিকাংশ লোকদের, দরিদ্র লোকদের, অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। তারা মনে করেছে দেশকে স্বাধীন করবার ও দরিদ্রদের অবস্থা

ভাল করবার এখন কম্যুনিজমই একমাত্র পন্থা। তাদের চোখের সামনে তারা দেখতে পাচ্ছে রাশিয়ার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এও দেখছে যে, প্রবল হ'তে পারায় ইংলণ্ডের একদা-শত্রু রাশিয়া এখন মিত্র ব'লে পরিগণিত হচ্ছে। আমেরিকা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে স্বাধীন হয়েছিল। এখন সে ইংলণ্ডের প্রধান অনুগ্রাহক বন্ধু। রাশিয়া ছিল একদা শত্রু এবং দীর্ঘকালের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জুজু, কিন্তু এখন বন্ধু।

আমরা ভারতবর্ষের বা বাইরের কম্যুনিস্টদলভুক্ত না হলেও এবং যুবকেরা তাদের দলভুক্ত হোক এ আমরা না চাইলেও, তাদিগকে আমরা দোষ দিতে পারি না।

রাশিয়ার কম্যুনিস্ট নেতারা সাধারণ লোকদের আর্থিক অবস্থা ভাল করেছে, সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করেছে, দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তারসাধন করেছে। এর জন্যে তারা প্রশংসাভাজন—যদিও তাদের নৃশংসতা নিন্দনীয় এবং ধর্ম সম্বন্ধে ও অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমরা একমত নই।

রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বা বলশেভিকদের নৃশংসতা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ গর্হিত মনে করতেন, কিন্তু তারা ভাল যা করেছে তার জন্যে তাদের প্রশংসা করতেন। আমাদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি অনেক বার বলেছেন, "আমি কম্যুনিস্ট।"

—

সর্ আলফ্রেড্ ব্রাট্সনের মিথ্যা কথা

সর্ আলফ্রেড্ ব্রাট্সন্ এক সময় কল্‌কাতার স্টেট্স্‌ম্যানের সম্পাদক ছিলেন। সন্ত্রাসনবাদীদের পক্ষ থেকে তাঁকে গুলি করবার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি তার পর দেশে চলে যান। সেখানে মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অথরিটিত্ব ফলান। সম্প্রতি ব্রিটেনের "গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড দি ঈস্ট" নামক কাগজে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেকটি উপযুক্ত প্রস্তাব গবর্ন্মেণ্টের তরফ থেকেই এসেছে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি থেকে আসে নি।" এটি মিথ্যা কথা। কংগ্রেস পুণা-প্রস্তাব দ্বারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও "অচল অবস্থার" উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, গবর্ন্মেণ্ট তাতে সাড়া দেন নি। হিন্দু মহাসভাও এরূপ প্রস্তাব করেছিলেন। তাও সরকার বাহাদুরের মনঃপূত হয় নি। নানা দলের নেতাদের এবং বে-দল নেতাদের যে কন্‌ফারেন্স্ হয়েছিল সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে, তার পক্ষ থেকেও প্রস্তাব হয়েছিল।

তবে যদি সর্ আলফ্রেড ব্রাটসনের মতে গবর্ন্মেণ্টের অগ্রাহ্য ও অগৃহীত কোন প্রস্তাবই "উপযুক্ত" বিশেষণের যোগ্য না হয়, তা হ'লে তিনি সত্যি কথাই বলেছেন!

—

সর্ মোহম্মদ আজিজুল হকের নূতন পদ

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল সর্ মোহম্মদ আজিজুল হক ভারতবর্ষের হাই কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। এই নিয়োগে এলাহাবাদের "লীডার" ও বোম্বাইয়ের "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া" অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের অসন্তোষের দু-একটা কারণ বলছি। লীডার বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্ শফাৎ আহমদ খাঁ এই রকম বড় চাকরী পেয়েছেন। আবার এই রকম একটা বড় চাকরী আর একজন মুসলমানকে কেন দেওয়া হ'ল? তা ছাড়া, লীডারের মতে আজিজুল হক সাহেব সামনের সা'রের (front rank-এর) পব্লিক ম্যান নন। টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া বলেন, ভারতবর্ষে

সর্ মোহম্মদ আজিজুল হক

সর্ আজিজুল হকের চেয়ে যোগ্য লোক এই কাজের জন্য পাওয়া যেতে পারত। হয়ত পারত; কিন্তু সরকারী ছোট বড় চাকরী যোগ্যতম লোক বেছে বেছেই দেওয়া হয়ে থাকে কি?

আমরা কারো বিদেশী গবর্ন্মেণ্টের ছোট বা বড় চাকরী পাওয়াটাকে উল্লাসের কারণ মনে করি না। কিন্তু তা মনে না করলেও এও ঠিক মনে করি না যে, যে সব পদে অধিষ্ঠিত থাকলে মানুষ পরোক্ষ ভাবে ভারতের কিছু হিত করতেও পারে, সেই সকল পদ থেকে হিন্দু ও মুসলমান-বাঙালীদিগকে সুপ্রণালী ক্রমে বঞ্চিত রাখা হবে। এই রকমের উচ্চ পদে অনেক বৎসর আগে সর্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার পর বিলাতে, দক্ষিণ-আফ্রিকায়, আমেরিকায়, কোন বাঙালীকে এ রকম কাজ দেওয়া হয় নি। আমেরিকায় গেলেন সর্ গিরিজাশঙ্কর বাজপাই ও সর্ ষন্মুখম্ চেট্টি ; আগে থেকেই সেখানে ছিলেন সরদার হরি সিং মালিক। দক্ষিণ-আফ্রিকায় গেলেন সর্ শফাৎ আহমদ খাঁ। কেউ বাঙালী নন। অথচ বাংলা সব প্রদেশের চেয়ে জনবহুল এবং ভারত-গবর্ন্মেণ্টের রাজস্ব জোগায় সকলের চেয়ে বেশী।

সর্ আজিজুল হকের মতামতের বিচার আমরা করব না। তিনি বাঙালী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষে গৌরব বোধ ও প্রকাশ করেছেন। কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে (এবং এর আগে শিক্ষামন্ত্রী রূপে) তিনি বঙ্গের নানা শিক্ষাসমস্যার বিষয় অবগত আছেন। তাঁর নূতন পদ তাঁকে বাঙালী ও অন্য বিদ্যার্থীদের শিক্ষালাভে কিছু সুবিধা ক'রে দেবার সামর্থ্য ও সুযোগ দেবে। তিনি ইচ্ছা করলে অন্য কোন কোন দিকেও ভারতবর্ষের প্রতি দরদ রেখে কাজ করতে পারবেন। তিনি কিরূপ কাজ করেন, তার দ্বারা পরে তাঁর এই নিয়োগের বিচার হওয়াই ভাল।

একটা কথা তাঁকে বলতে পারি কি? সর্ ফিরোজ খাঁ নূন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে অসুবিধাজনক মিথ্যা ব্রিটিশ প্রপ্যাগ্যাণ্ডা কানাডায় ও য়ুনাইটেড্ স্টেট্‌সে করেছিলেন। তা করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। ওটা ভারতবর্ষের হাই কমিশনারের একটা অন্যতম কর্তব্যই নয়। সুতরাং সর্ আজিজুল হক এ রকম কিছু না-করলে তাঁর কর্তব্যের ত্রুটি হবে না এবং তাঁর স্বদেশবাসীরা খুশি হবে। সর্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, এবং ঠিক্‌ই বলেছিলেন, যে, হাই কমিশনারের পদ ভারতসচিবের ও ভারতের বড়লাটের অধীন কোন পদ নয়। সুতরাং হাই কমিশনার ইচ্ছা করলে ও তাঁর দৃঢ়তা থাকলে, নিজের পদমর্যাদা রক্ষা ক'রে, ভারতসচিব ও বড়লাটের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে চলতে পারেন।

—

বর্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের দশম অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। এতে সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বক্তৃতা উত্তম হ'য়েছিল। ছাত্রদের সম্মেলনে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এবং সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতাও বেশ হ'য়েছিল।

হিন্দু সম্মেলনে বহুসংখ্যক প্রস্তাব ধার্য হয়। অনেক-গুলিরই গুরুত্ব খুব বেশী।

—

"হিন্দু সংগঠন ও বিবিধ সংস্কার"

বর্ধমানের বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে গৃহীত "হিন্দু সংগঠন ও বিবিধ সংস্কার" বিষয়ক নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবটির গুরুত্ব সকলের চেয়ে অধিক।

এই সম্মেলন মনে করেন যে, হিন্দু সংগঠন অর্থাৎ হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শাখা ও শ্রেণীর মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষতঃ এই প্রদেশের হিন্দুগণের পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে এবং শাখা হিন্দুসভাসমূহের সমগ্র শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্মেলন হিন্দু সংগঠন কার্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন। প্রতি গ্রামে ধর্ম্মসভা অথবা সাধারণ দেবায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হউক। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন পূজা ও উৎসব প্রচলনের ব্যবস্থা করা হউক। এই সব পূজায় বিশেষতঃ দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি উৎসব ও মহাবীরপূজা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যপালনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হউক। এই সব পূজার অনুষ্ঠানে সর্ব্বজাতীয় হিন্দুর সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হউক। সর্ব্বত্র সম্মিলিত উপাসনা, স্তোত্র ও স্তব পাঠ, কথকতা, কীর্ত্তন, বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত, গ্রন্থসাহেব, ত্রিপিটক ও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের জন্য যথাশক্তি প্রযত্ন করা হউক। সর্ব্বত্র হিন্দু সমাজের মহাপুরুষগণ, ধর্ম্ম-গুরুগণ ও বীর পুরুষগণের বাৎসরিক উৎসব সমবেতভাবে প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুর আত্মগৌরব বোধ জাগ্রত করা হউক। হিন্দুমাত্রেই যাহাতে নিজদিগকে জাতিবাচক সংজ্ঞায় আত্মপরিচয় না দিয়া কেবল হিন্দু নামে পরিচয় দেন তজ্জন্য প্রচারকার্য্য চালান হউক। হিন্দুজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে যাহাতে বিবাহের প্রচলন হয় তজ্জন্য প্রযত্ন করা হউক। যে সব অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সেই সব বিবাহে পাত্রপাত্রী-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর যাহাতে কোন প্রকার সামাজিক উৎপীড়ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। বিবাহে সম্মত বিধবাগণের পুনর্বিবাহের প্রচলন করা হউক। সাধারণ মন্দির ও দেবস্থানে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকে প্রবেশ ও পূজার অধিকার দেওয়া হউক। বাল্যবিবাহ প্রথা নিরোধ করা হউক। পণপ্রথা উচ্ছেদের জন্য ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা করা হউক। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে বিবিধ অবান্তর বিষয়ের খরচ যতদূর সম্ভব কমান হউক।—"হিন্দুস্থান।"

হিন্দু সংগঠন আমরাও চাই।

হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে

ভেঙে না দিলে এবং অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত না হ'লে তার "বিভিন্ন শাখা ও শ্রেণীর মধ্যে একাত্মবোধ" কখনও জন্মিবে না এবং হিন্দু সংগঠনও হ'বে না। যাঁরা হিন্দু সংগঠন চান, তাঁদের ইহা বুঝা ও বিশ্বাস করা এবং সেই বোধ ও বিশ্বাস অনুসারে কাজ করা আবশ্যক। কেবল বাক্যে হিন্দু সংগঠন চাইলে হবে না।

সম্মিলিত উপাসনার আমরাও পক্ষপাতী। সার্বজনীন উৎসবও চাই। "বিশেষতঃ দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি উৎসব ও মহাবীরপূজা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যপালনীয় বলিয়া ঘোষণা" সম্মেলন করেছেন। হিন্দু মহাসভা "হিন্দু" শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছেন, যে-কেউ ভারতবর্ষজাত কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধ জৈন শিখ ব্রাহ্ম আর্যসমাজী প্রভৃতি ঐ পূজা ও উৎসবগুলিতে বিশ্বাস করেন না ব'লে সম্মেলন "সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হিন্দুগণে"র জন্য ঐ ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও প্রকৃত বৈষ্ণবেরা পশুবলির বিরোধী, সুতরাং যে দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় পশুবলি হয়, তাতে তাঁরা যোগ দিতে পারেন না। সম্মেলন বলেছেন, "এই সব পূজার অনুষ্ঠানে সর্বজাতীয় হিন্দুর সর্ববিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হউক।" কিন্তু সম্মেলন যাকে সনাতন হিন্দুধর্ম বলছেন, সেই হিন্দুধর্মের শাস্ত্র অনুসারে কেবল ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্যে এবং ভোগ প্রসাদ রন্ধন বিতরণে অধিকার আছে। সর্বজাতীয় হিন্দুকে এই অধিকার দিতে হ'লে নূতন শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং জাতিভেদ ভাঙা আবশ্যক। সম্মেলন এই শাস্ত্র রচনা করুন।

যাঁরা কেবল প্রস্তাব ধার্য্য ক'রে হিন্দু সংগঠন করতে চান, তাঁরা তা করুন; কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জাতিভেদ বর্জন এবং কেবলমাত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁর পূজা প্রবর্তন, এই দুটি ভিন্ন হিন্দু সংগঠন হবে না।

সম্মেলন চাচ্ছেন,

"হিন্দুজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে যাহাতে বিবাহের প্রচলন হয় তজ্জন্য প্রযত্ন করা হউক। যে সব অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সেই সব বিবাহে পাত্রপাত্রী [ও] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর যাহাতে কোন প্রকার সামাজিক উৎপীড়ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।"

আমরা এর সমর্থন করি। অসবর্ণ বিবাহজাত সন্তানেরা কোন্ জাতির অন্তর্গত হবে, প্রস্তাবে তা বলা হয় নি। এর অর্থ এই যে, সম্মেলন চান জাতিভেদ থাকবে না, সব জাত এক হ'য়ে যাবে। তাই নয় কি? তাই ব'লেই ত মনে হচ্ছে; কেন না সম্মেলন চাচ্ছেন, "হিন্দু মাত্রেই নিজদিগকে জাতিবাচক সংজ্ঞায় আত্মপরিচয় না দিয়া কেবল হিন্দু নামে পরিচয় দেন" এবং এই বৎসরের সেন্সসে যে সব হিন্দু তাঁদের জা'ত না লিখিয়ে কেবল "হিন্দু" লিখিয়েছেন সম্মেলন তাদিগকে অভিনন্দিত ক'রেছেন। ঠিকই ক'রেছেন।

আমরা সম্মেলনের কেবল একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু লিখলাম; স্থানাভাবে অন্য কোনটি সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারলাম না। কিন্তু আরও অনেকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

—

ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

আমরা আগেই খবর দিয়েছি যে, গত কয়েক বৎসরের মত এবারেও ডিসেম্বরের শেষে রেঙ্গুনে ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হবে। তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে মূল সভাপতি মনোনীত করেছেন। এই মনোনয়ন সমীচীন হয়েছে, বিশেষতঃ যখন উদ্যোক্তারা এবার একটি দিন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজার জন্য আলাদা ক'রে রেখেছেন। অমিয়বাবু দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটরী থাকায় এবং তাঁর সঙ্গে বিদেশেও কোথাও কোথাও ভ্রমণ করায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশপ্রবাসী বাঙালীদিগকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত ও নূতন কথা শোনাতে পারবেন।

—

কাশীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন কাশীতে হবে। তার যে-দুটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছি, তা নীচে মুদ্রিত হ'ল।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন আগামী ২৬, ২৭, ২৮শে ডিসেম্বর বড়দিনের অবকাশে কাশীধামে অনুষ্ঠিত হইবে। উনিশ বৎসর পূর্বে এই কাশীধামেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে সম্মেলনের সূচনা হয়।

এবারকার সম্মেলনের সাফল্যকল্পে স্থানীয় বিশিষ্ট কর্মী ও উৎসাহী ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বরণ করা হইয়াছে শ্রীবিমলচন্দ্র গুপ্ত—এডভোকেট, শ্রীবিমলানন্দ ঘোষ ও ধীরেন্দ্রনাথ বিশী যথাক্রমে সম্পাদক, সহযোগী ও সহকারী-সম্পাদকরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

অভ্যর্থনা-সমিতি নিম্নলিখিত বিভাগীয় অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছেন, যথা:—

(১) সাহিত্য (২) বিজ্ঞান (৩) দর্শন (৪) ইতিহাস (৫) বৃহত্তরবঙ্গ ও প্রবাসী বাঙালীর সমস্যা (৬) সঙ্গীত (৭) শিল্প (৮) মহিলা শাখা।

বারাণসীর এই অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'রবীন্দ্রস্মৃতি-বাসর' উদ্‌যাপন। 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এই বিভাগ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

মূল এবং শাখাসভাপতিরূপে বাংলা এবং বাংলার বাহিরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

সম্মেলন সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সম্পাদক, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—সোনারপুরা বেনারস সিটী, এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সুরেশ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক, প্রচার বিভাগ।

আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন কাশীধামে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। এই অধিবেশনের সাফল্য-কল্পে নিম্নলিখিত মনীষিগণ বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(১) সাহিত্য: শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
(২) দর্শন: ডক্‌টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
(৩) সঙ্গীত: শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
(৪) ইতিহাস: ডক্‌টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন
(৫) শিল্প: শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৬) রবীন্দ্র-স্মৃতি-বাসর: শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
(৭) মহিলা বিভাগের সভানেত্রী: শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

সুরেশ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক প্রচার বিভাগ।

—

যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ও ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ছিল। তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বি এ, এম এ ও বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ২৩ বৎসর বয়সে দিনাজপুরে ওকালতী আরম্ভ করেন। প্রথম হ'তেই তাঁর খুব পসার হ'তে থাকে। তিনি সরকারী উকীল নিযুক্ত হন কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় তৎকালীন লাট ফুলার সাহেবকে দিনাজপুর ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও পুনর্গ্রহণ করেন নি। সমগ্র উত্তরবঙ্গ, কুচবিহার ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে তাঁর বিশেষ পসার ছিল। শুনা যায় একবার ৪৬০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের উপর তিনি ট্যাক্স দেন। বাংলা ও আসামের আইনজীবীদের প্রারম্ভিক কন্‌ফারেন্সের তিনিই সভাপতি হন। তিনি খুব বড় ব্যবহারবিৎ ছিলেন—যে কোন হাইকোর্ট তিনি অলঙ্কৃত করতে পারতেন।

প্রথম জীবনে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। আজীবন কংগ্রেসের সেবা ক'রেছেন ও তার বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। বিগত আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি সমগ্র উত্তরবঙ্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার জন্যে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। স্বরাজ্য পার্টির আমলে এম্ এল সি রূপে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী ছিলেন। নিখিল বঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতির দিনাজপুর অধিবেশনের ও সমগ্র বঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক কনফারেন্সের অধিবেশনের সভাপতিত্ব তিনি অতীব কৃতিত্বের সহিত করেন।

তিনি সুদীর্ঘকাল দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ডিস্‌ট্রিক্‌ট্ বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং স্থানীয় অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙালীর মধ্যে ব্যবসায়ে উৎসাহ বাড়ান তাঁর জীবনের ব্রতরূপ ছিল। নানাবিধ দেশহিতকার্যে ব্রতী থেকে তিনি দেশের প্রভূত উপকারসাধন করেন।

অধুনালুপ্ত দিনাজপুর পত্রিকার বহু কাল সম্পাদক ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক জন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরহিতকারী ছিলেন—প্রতি দিন ৩০।৩৫ জন দরিদ্রকে নিয়মিতরূপে অন্ন দান করতেন। একবার কোচবিহারে মামলা করতে গিয়েছিলেন; মক্কেল নিজ বাড়ী বিক্রী ক'রে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রাপ্য ফী যোগাড় করতে উদ্যোগ করলে তিনি তাঁর প্রাপ্য ৮০০০৲ টাকা পরিত্যাগ করেন।

—

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ম্যুজিয়ম

খবরের কাগজে দেখলাম, শান্তিনিকেতনে একটি রবীন্দ্র ম্যুজিয়ম স্থাপিত হচ্ছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় নানা দ্রব্যের মধ্যে তাঁর ফোটোগ্রাফ, হস্তলিপি, চিঠি, তাঁর সম্বন্ধে খবরের কাগজের কর্ত্তিত অংশ, বহি, সাময়িক পত্র রাখা হবে। তাঁর সম্বন্ধে যত রকম রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও সংগৃহীত হবে, সমস্তই বিষয় অনুসারে সাজিয়ে রাখা হবে। এর উপযোগী জিনিস যাঁর কাছে যা আছে, পাঠিয়ে দিলে সংগ্রহটি সমৃদ্ধ হবে।

—

কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা

গত ৩১শে জুলাই তারিখের প্রসিদ্ধ বিলাতী দৈনিক টাইম্‌স্ লিখেছিল যে, যুদ্ধের আগে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ লক্ষের উপর; ১৯৩৯-৪০ সালে তা ক'মে হয় ত্রিশ লক্ষের কম; এবং ১৯৪১ সালে তা পনর লক্ষের কিছু অধিক। এই সংখ্যাগুলি গত ২৬শে

সেপ্টেম্বরের বিলাতী স্পেক্টেটর কাগজে টাইম্‌স্‌ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই সংখ্যাগুলি কি ঠিক? টাইম্‌স্‌ এগুলি কোথা থেকে পেয়েছেন?

বঙ্গের কোন ওয়াকিফ্‌-হাল কংগ্রেস-নেতা ঠিক সংখ্যাগুলি কাগজে প্রকাশ করলে ভাল হয়। নইলে এই কথাই লোকে বিশ্বাস করবে যে, কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ কমেছে।

—

মিঃ এমারি সুভাষবাবুর ঠিক পাত্তা জানেন না

পার্লেমেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ এমারি ব'লেছেন তিনি সুভাষবাবুর ঠিক্‌ পাত্তা জানেন না। কিন্তু লণ্ডন থেকে বার্লিন যত দূর, নিউ দিল্লী থেকে বার্লিন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী দূর হ'লেও, ভারতবর্ষে তাঁর তাঁবেদাররা ও জা'ত ভাইরা সুভাষবাবুর পাত্তা জানেন! বিলাতী কাগজওয়ালারাও জানেন! সুতরাং মিঃ এমারির অজ্ঞতা শোচনীয়।

—

জবাহরলাল ক্ষুদ্রতর কারাগার থেকে বৃহত্তর কারাগারে

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু জেল থেকে বেরিয়ে অনেক কথাই বলছেন। সমস্তই শুনবার ও প্রণিধান করবার যোগ্য। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে দেখে সুখ হয় বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর কারাগার থেকে পরাধীন স্বদেশরূপ বৃহত্তর কারাগারে এসে কোন আনন্দ হয় না, তিনি এই মর্ম্মের কথা কারামুক্তির পর বলেছেন। সত্য কথা।

—

"আমার যা নয় তার জন্যে লড়ি কেমন ক'রে?"

গত ৮ই ডিসেম্বর লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেন :—

"যদি রাশিয়ার পরাজয় হয় আমি দুঃখিত হব, তবে আমি সে আশঙ্কা করি না।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই যুদ্ধে আমার সহানুভূতি কোন্‌ পক্ষে, তবে আমি বলব যে, রাশিয়ার পক্ষে, চীনের পক্ষে, আমেরিকার পক্ষে, ইংলণ্ডের পক্ষে। তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি সত্ত্বেও আমার পক্ষে ব্রিটেনকে সাহায্য করতে যাওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আমি যে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত, যা আমার নয়, তার জন্য আমি যুদ্ধ করব কেমন ক'রে?

লোককে সন্ত্রস্ত ক'রে রাখাই ভারতে ব্রিটিশ নীতি বলে মনে হয়, কেন না ত্রস্ত হয়ে ভারতবাসীরা ব্রিটিশের আশ্রয় চাইবে।"

—

গবর্মেণ্টের বন্দীমুক্তির নীতি

গবর্মেণ্ট কতকগুলি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন, আরো দিতে পারেন। কোন্‌ নীতি অনুসরণ করে কি উদ্দেশ্যে মুক্তি দিচ্ছেন, বোঝা যাচ্ছে না।

সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দিলে, গবর্মেণ্ট কি মনে করেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রতি এবং যুদ্ধের প্রতি কংগ্রেসের মনের ভাব বদলাবে? বদলাবে না যে, তা গান্ধীজী ব'লেই দিয়েছেন।

গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করলেই যাকে তাকে বন্দী করতে পারেন, আবার যাকে তাকে ছেড়ে দিতেও পারেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এই রকম। কতকগুলি বন্দীকে মুক্তি দিলে এ অবস্থার ত পরিবর্ত্তন হবে না। দেশ চায় স্বাধীনতা। দেশ বিদেশীর অধীন থাকতে, বিদেশীর খামখেয়ালের অধীন থাকতে চায় না।

বন্দীমুক্তির মূল্য যে কতটুকু তা কোন কোন বন্দীর—যেমন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের—মুক্তির পরই আবার গ্রেপ্তার থেকে এবং যাঁরা কোন কালেই দেশী বিদেশী কোন রাজনীতির সঙ্গেই সংস্রব রাখতেন না—যেমন অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ—এ রকম লোকেরও স্বাধীনতা হরণ থেকে বোঝা যায়।

গবর্মেণ্টের মর্জ্জি অনুসারে কতকগুলি লোকের কারামুক্তি তাঁদের ও তাঁদের পরিবারবর্গের সাময়িক অসুবিধা কিছু দূর করতে পারে, এবং তাঁরাও দেশের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারবেন এ সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু তার দ্বারা দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থার প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ কোন প্রতিকার হবে না।

প্রতিকার কারামুক্তিতে নাই; আছে দেশের কারাগার রূপের সম্পূর্ণ বিনাশে। সমগ্র দেশ যখন আর বৃহৎ কারাগার থাকবে না, তখনই প্রকৃত আনন্দের কারণ হবে।

—

ডক্টর কালিদাস নাগ আটক

ডক্টর কালিদাস নাগকে আটক করায় অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছেন :—

The arrest, under the Defence of India Act, of Dr. Kalidas Nag, Calcutta University Professor and a research scholar of great eminence, will cause the profoundest surprise to the public. Dr. Nag's work, as all scholars, Indian and foreign, know, was purely

cultural. He had nothing to do with politics. He had the unique distinction of being invited to lecture in many Universities in the West and in the East, including those of Japan. His pioneer work in the domain of ancient historical association between India and Indian colonies in Siam and the East Indian Archipelago had earned for him world-wide renown. He had personal contact with many intellectuals of countries which are now our enemies. He was Secretary of the Jayanti Committee of the Mahabodhi Society and as such may have naturally come into contact with Japanese Buddhists. In a moment of panic a mere piece of rope may be mistaken for a snake. We trust the persons on whose information Dr. Nag has been arrested did not mistake the one for the other. If ever there was time for the Government to keep its head cool it is now.

কুষ্ঠরোগীদের সেবক মিশনের রিপোর্ট

কুষ্ঠরোগীদের সেবক মিশনের ("The Mission to Lepers"এর) ৬৭তম বৎসরের (১৯৪০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ আগস্ট পর্য্যন্ত) সচিত্র রিপোর্ট পেয়েছি। এই মিশনের ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে কাজের এই রিপোর্ট। করুণাপূর্ণ, মৈত্রীপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবপূর্ণ এত বড় কাজ এদেশে আর কোন মিশন করেন না। যে-রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহ থেকে মানুষ চোখ ফিরিয়ে নেয়, এই মিশনের কর্মীরা ও সেবাব্রতীরা অনুরাগ ও বিশ্বাসের সহিত সেই রোগে আক্রান্ত লোকদের সেবা করেন। চিকিৎসার ফলে আক্রান্ত কতক লোক আরোগ্য লাভ করে, কতক লোকের রোগ স্থগিত হ'য়ে যায় আর বাড়ে না, বাকী রোগীরা সেবাশুশ্রূষা পেয়ে অন্ততঃ মনে কিছু শান্তি নিয়ে মরে। রোগাক্রান্তদের সুস্থ শিশুদিগকে মিশন আলাদা করে রেখে তাদের লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের শেষে ৭১৮৩ জন রোগী এই মিশনের আশ্রমগুলিতে ছিল।

এ বৎসর মিশন বেসরকারী দান পেয়েছিলেন ৩,৮২,৯৩০ টাকা, তার মধ্যে তিন লাখ টাকার উপর এসেছিল বিদেশ থেকে—প্রধানতঃ যুদ্ধে-বিব্রত ব্রিটেন থেকে। দাতারা ধন্য। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩,৬৫,৬৬০ টাকা। এই কাজে যিনি যত বেশী সাহায্য দিতে পারেন, ততই ভাল। কিন্তু খুব সামান্য দানও পুরুলিয়ার এ ডোন্যাল্ড মিলার সাহেব কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবেন।

প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্যায়বাগীশ

তিরাশি বৎসর বয়সে প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্যায়বাগীশ মহাশয় গত কার্ত্তিক মাসে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি যৌবনকালে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম্, এ, পরীক্ষা দিবার আগেই পরীক্ষা দিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর আর এম্, এ, দেওয়া হয় নি। তিনি দক্ষ কর্মচারী ছিলেন এবং পেন্সান নেবার আগে য়্যাডিশ্যনাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়েছিলেন। চাকরীতে উপরওয়ালার হুকুমে বা অনুরোধে তিনি বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করতেন না।

কুমিল্লায় ১৮৯৩ সনের চাকুরী-জীবনে তাঁহাকে এক গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। মিঃ আর. টি. গ্রিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। তিনি এবং পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একযোগে মাকু নামক এক ফেরারি (proclaimed) আসামীকে আশ্রয় প্রদান করার অভিযোগের তদন্তের পর কালেক্টরীর Record-keeperকে ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করেন এবং প্রকাশ বাবুর উপর বিচারের ভার অর্পণ করেন। যাহাতে আসামীর কঠিন সাজা হয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। এমন অবস্থায় আসামী খালাস পাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অসন্তুষ্টির সীমা থাকিবে না ইহা এক প্রকার জানাই ছিল। প্রকাশ বাবু মাত্র সেদিন চাকুরিতে ঢুকেছেন। যাহাতে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরাগভাজন না হন সেজন্য কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে উপদেশ দেন। প্রকাশবাবু কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন তাহা হইতে কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইবেন না এ বিষয়ে প্রথম হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মোকদ্দমায় আসামীর বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে খালাস দিলেন, ইহাতে গ্রিয়ার সাহেব তাঁহার উপর খুবই চটিয়া গেলেন।

তিনি যখন ভোলার মহকুমা হাকিম,

এই সময় বঙ্গ-বিভাগজনিত প্রবল স্বদেশী আন্দোলন চলিয়াছে। বরিশালে একজন অল্প বয়স্ক Offg. Dt. Magistrate আসেন—বড়ই দুরন্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার policy ছিল ন্যায় অন্যায় যে ভাবেই হউক স্বদেশী আন্দোলনকারীদিগকে জব্দ করিতেই হইবে। প্রকাশ বাবু কিছুতেই কোনরূপ বে-আইনী কাজ করিতে রাজী হইলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তিনি একমত হইতে পারিলেন না—নিজে যাহা ন্যায় পথ বলিয়া বুঝেন তাহাতে তিনি অটল থাকিবেন, তাঁহাকে এইরূপ জানাইলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন তবে আপনি কাজে ইস্তফা দেন। প্রকাশবাবু উত্তরে বলিলেন, "অন্য কাহাকে খুসি করিবার জন্য আমি কাজে ইস্তফা দিব না ইহা আপনি স্থির জানিবেন।" ইহার পাঁচ-সাত দিন মধ্যেই তিনি পাবনা বদলি হন।

তিনি পেন্স্যন নেবার পর অনেকগুলি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের কাজ করেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি তর্কবিজ্ঞান, ধর্ম্মযোগ, বেদান্তসোপান, দর্শনসোপান, ইংরেজীতে গীতার ভূমিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের যথাযোগ্য সম্মান

ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগের একটি সেণ্ট্র্যাল

য়্যাডভাইসরি বোর্ড আছে। আলোক বায়ুচলাচল স্বাস্থ্য-রক্ষা ও মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদ্যালয় সকলের ঘরবাড়ী কি রকম হওয়া উচিত," তার আলোচনা করবার জন্যে এই বোর্ডের একটি সব-কমীটি আছে। প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টররা এবং কতকগুলি বড় দেশী রাজ্যের প্রতিনিধি এর সভ্য, ভারতবর্ষের এডুকেশ্যন কমিশনার মিঃ জন সার্জেণ্ট এর সভাপতি। এই সব-কমীটি বিশ্বভারতী কলাভবনের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে তার সভ্য মনোনীত ক'রে নিয়েছেন। চিত্রকলায় খ্যাতি নিয়ে সুরেনবাবু কর্মজীবন আরম্ভ করেন। স্থাপত্যে খ্যাতি তার পর তাঁর স্বোপার্জিত।

—

নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখার অধিবেশন

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ ভবানীপুরে গোখলে (গোখেল রোহে) মেমোরিয়্যাল গার্ল্‌স্‌ স্কুলে নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখার বার্ষিক অধিবেশন হয়। স্বর্গগত ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা রায় সভানেত্রীর কার্য করেন। তাঁহার বক্তৃতার সার অংশ এইরূপ :—

বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রশ্ন সম্পর্কে সভানেত্রী মিসেস পি কে রায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, শিক্ষা সম্পর্কে ঠিক পথ অনুসরণ করা হইতেছে কিনা, তৎসম্পর্কে এক্ষণে চিন্তা করার এবং বিচার করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। তিনি বলেন, "উত্তর-কালে ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হওয়ার মত উপযুক্ত শিক্ষা কি আমাদের বালিকারা বর্ত্তমানে পাইতেছে? ভারতের জীবনাদর্শ এবং জীবনযাত্রাপ্রণালীর দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। নারীত্বের পূর্ণ-বিকাশের জন্য এই পরিবর্ত্তনও অবশ্য প্রয়োজন। আজ আমরা এই অভিমত পোষণ করিলে বাল্যবিবাহ নিরোধ করা প্রয়োজন, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি প্রয়োজন এবং মহিলাদের আজ বাহিরে আসিয়া নিজেদের জীবিকার্জ্জনে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বিবাহে স্ত্রী স্বামীর সমান অংশীদার এবং সাথী হইবেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত বলিয়াও আমরা অভিমত পোষণ করি। কিন্তু আমাদের গৃহে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কি এই সকল আদর্শের পরিবর্ত্তন স্বীকৃত হইয়াছে? বালিকারা যাহাতে এই পরিবর্ত্তিত আবহাওয়ার উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, স্কুল কলেজ বা বাড়ীতে কি আমরা তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছি? শিক্ষয়িত্রীগণ বা মেয়েদের মাতারা কেহই এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া চিন্তা করেন না। অতীতে ঠাকুরমায়া ৮।৯ বৎসরের মেয়েদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ভাল হউক, মন্দ হউক মেয়েরা কিছু শিক্ষা পাইত। কিন্তু এক্ষণে বাল্যবিবাহ বন্ধ করিয়া সকলে বালিকাদের যৌবনোন্মেষ কালের গুরুত্ব গ্রহণ করিতেছেন। বালিকাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে চিন্তা করিলেই হইবে না, তাহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কেও অবহিত হইতে হইবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিই এ সম্পর্কে সব কিছু করিবেন—আমি এরূপ মনে করি না। প্রাথমিক দায়িত্ব বাড়ীতেই। তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এ সম্পর্কে অনেকখানি করিতে পারেন। বালিকাদের চরিত্র গঠনের দিকেই তাঁহাদের সমধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মেয়েদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই শিক্ষা ধর্ম্মবিষয়ক হইবে আমি একথা বলিতেছি না। যাহাতে বালিকারা চিন্তাশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়, যাহাতে তাহাদের শৃঙ্খলাবোধ এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে অর্থাৎ এক কথায় যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে আদর্শ-বোধ জাগ্রত হয়, বালিকাদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষাদান এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান একসঙ্গে চলা উচিত।"

অতঃপর মহিলাদের সামাজিক অসুবিধা সম্পর্কে শ্রীযুক্তা রায় বলেন, "এই সমস্যার মূল কারণ—শিক্ষার অভাব।

বাল্যবিবাহ যে ক্ষতিকারক এ জ্ঞান না থাকিলে স্বভাবতই আমরা বাল্যবিবাহরূপ প্রাচীন প্রথা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব। একই কারণে পর্দ্দপ্রথার উচ্ছেদ হয় না বা জাতিবিভাগ ও অনুন্নত শ্রেণীদের সম্পর্কে পুরাতন মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই আজ সমাজ এই সকল দোষ বিমুক্ত হইতে পারে নাই।

এ বিষয়ে গৃহেই সর্ব্বাধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। গৃহ লইয়াই সমাজ, আর সর্ব্বদেশে নারীই হইল সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি। বাড়ীর আবহাওয়া যদি উন্নত হয়, মহিলাগণ যদি একবার বুঝিতে পারেন যে, বাড়ীর আবহাওয়ার উন্নতি বিধান কতখানি তাঁহাদের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ সামাজিক সমস্যার সমাধান অধিকতর সহজসাধ্য হইবে।" — আনন্দবাজার পত্রিকা।

—

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে বার্ষিক বক্তৃতা

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁহার দেহান্তের পর প্রতি বৎসর ৩০শে নবেম্বর তাঁহার নামে অভিহিত একটি বক্তৃতা হয়ে থাকে। প্রথম বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য বিজ্ঞান-মন্দিরে এসে পড়তে পারেন নি, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সেবারকার বার্ষিক সভার সভাপতি ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত হ'য়েছিল। এর পর বৎসর "জগদীশচন্দ্র বসু বক্তৃতা" করেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা। তার পর বৎসর করেন, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর সর্ শান্তিস্বরূপ ভটনাগর। এই বৎসর বক্তৃতা ক'রেছেন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। প্রধানতঃ জামশেদজী টাটার দানে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব্ সায়েন্সের তিনি এখন ডিরেক্টর্। এটি ভারতবর্ষের একটি খুব বড় বৈজ্ঞানিক পদ। তাঁর বক্তৃতায় তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন।

ভারতবর্ষ যে-সকল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা হেতু ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীদের লোভের জিনিস হয়েছে, সেই সকল

সম্পদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতবর্ষের লোকদের কাজে লাগাবার সুবিধা ক'রে দিলে তাতে যে শুধু ভারতীয়েরা লাভবান হ'ত তা নয়, নাৎসী ও ফ্যাসিষ্টদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবারও উপায় তার দ্বারা হ'তে পারত। কিন্তু গবর্মেণ্ট তার জন্যে যথেষ্ট কিছু করেন নি। ডক্টর ঘোষ গবর্মেণ্টকে দূরদৃষ্টির সহিত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে বলেছেন।

কৃষি ও পশুপালনেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাফল্যের প্রতিও ডক্টর ঘোষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে মানুষের আয়ু কিরূপ বাড়ে, তার উল্লেখও তিনি করেন।

যুদ্ধের সময় মিথ্যা কথার প্রচার দ্বারা মানব জাতির যে কিরূপ অনিষ্ট হয়েছে ও হতে পারে, ডক্টর ঘোষ তা অনুভব ক'রে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট জগতের হিতের নিমিত্ত যে আটটি সর্ত নির্দেশ করেছেন তার উপর আরও একটি যোগ ক'রে বলেছেন :—

"If democracy is to survive, to the eight points of President Roosevelt must be added a ninth, which is the elimination from the future world of all attempts at mass hypnotism by interested propaganda."

—

শিক্ষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসীতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন বাংলা-গবর্মেণ্ট এবং বাংলা দেশের মন্ত্রিমণ্ডল শিক্ষাক্ষেত্রে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের নিমিত্ত অবারিতদ্বার অনেক বিদ্যালয় ও কলেজ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সুবিধার নিমিত্ত কত অধিক খরচ ক'রে থাকেন। যে ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য সরকারী অন্যূন ১৫।১৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়, সেখানে হিন্দুদের জন্ম তার দশমাংশও ব্যয় করা হয় না।

তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা-বিভাগটি কার্যতঃ মুসলমান পরিচালনাধীন হ'য়ে পড়েছে—যদিও হিন্দুরা সমষ্টিগত ভাবে মুসলমানদের চেয়ে শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর, যদিও বিদ্যাবত্তায় ও শিক্ষাদানদক্ষতায় যত হিন্দু এ পর্যন্ত বিখ্যাত হয়েছেন, তার সামান্য অংশও মুসলমানরা হন নি এবং যদিও হিন্দুরা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্ম যত টাকা দান করেছেন, সময় ও শক্তি ব্যয় করেছেন এবং ত্যাগস্বীকার করেছেন, মুসলমানেরা তার মত কিছুই করেন নি। পাঠ্য-নির্বাচন কমীটিতে প্রধানতঃ মুসলমান সভ্য বোঝাই করা হয়েছে, যদিও মুসলমানরা বাংলা-সাহিত্যে অগ্রণী নহেন। তার ফলে এবং মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিমণ্ডলের সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট নীতির ফলে, এতে প্রধানতঃ দু-দিকে ঘোরতর অনিষ্ট হয়েছে; বিস্তর পাঠ্যপুস্তক বিকৃত বাংলায় লেখা হয়েছে—যদিও ভাল বাংলা লিখতে পারেন এ রকম মুসলমান লেখকের অভাব নাই—এবং ঐতিহাসিক তথ্যের ও সত্যের অপলাপ হয়েছে।

রমেশবাবু এই প্রকার নানা সত্য কথা "শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা" বহিতে নিবদ্ধ করেছেন। পুস্তকখানি বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা দেশে যাঁরা সম্প্রদায়নির্বিশেষে সুশিক্ষার বিস্তার চান, বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক চান, বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসের গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক মনে করেন, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যোগ্যতম বিদ্বান ও শিক্ষাদক্ষ লোকদের দ্বারা দেশের শিক্ষাকার্যের পরিচালন চান এবং শিক্ষার জন্ম সরকারী টাকার অপক্ষপাত ব্যয় চান, রমেশবাবুর গ্রন্থখানি তাঁদের সকলের পড়া উচিত।

—

বস্ত্রসঙ্কট

ইংরেজ রাজত্বের আগে ভারতবর্ষ নিজে কেবল যে নিজেরই আবশ্যক সমুদয় কাপড় জোগাত তা নয়, বিদেশেও অনেক কাপড় রপ্তানী করত। তার পর তাকে খুব বেশী পরিমাণে বিদেশী কাপড়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। পরে দেশেই অনেক সুতার ও কাপড়ের কল হওয়ায় বিদেশের উপর নির্ভর কমে এসেছিল। যে-সব তন্তুবায় ও জোলা পরিবার হাতের তাঁতে কাপড় বুনত, তারা অনেকে কৌলিক ব্যবসায় ছেড়ে দিলেও, অনেকে এখনও কাপড় বোনে। কিন্তু তারা অনেক দিন থেকে প্রধানতঃ কলের সুতায় কাপড় বুনতে অভ্যস্ত। এখন বিলাত থেকে ও জাপান থেকে সুতা আসছে না। দেশের সুতার কলগুলিও সমস্ত চাহিদা মিটাতে পারছে না। ফলে সুতার অভাবে জোলা ও তন্তুবায়দের অত্যন্ত দুরবস্থা হয়েছে। তাদের তাঁতে বোনা কাপড় যথেষ্ট উৎপন্ন হচ্ছে না, দেশী কাপড়ের কলগুলি এত কাপড় তৈরি করতে পাচ্ছে না যাতে বিলাতী ও জাপানী কাপড়ের অভাব মোচন হ'তে পারে। নূতন নূতন সুতার কল ও কাপড়ের কল স্থাপন করা ব্যয়সাধ্য এবং তার জন্ম আবশ্যক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে এখন আসছে না বা খুব কমই আসছে।

এই রকম নানা কারণে বস্ত্রসঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। এখন চরখার ও হাতের তাঁতের মূল্য বোঝা যাচ্ছে। দুই-ই অল্প খরচে দেশেই তৈরি হয়, তুলাও দেশেই হয়। আমরা একথা কখনও মনে করি নি, বলিও নি, যে চরখা ও হাতের তাঁতের দ্বারাই বিদেশী সুতার কলের ও কাপড়ের কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মত বরাবরই এই যে, যেমন স্থানবিশেষে মোটর লরি ও স্থানবিশেষে গোরুর গাড়ীর দরকার—সেই রকম কোথাও কোন অবস্থায় সুতার ও কাপড়ের কল চালাতে হবে, আবার অন্যত্র অন্য অবস্থায় চরখা ও হাতের তাঁত চালাতে হবে। ইয়োরোপের নানা দেশে সুতার ও কাপড়ের কলের প্রাধান্য বেশি হ'লেও কোন কোন রকম পশমী সুতা হাতে কাটা হয় এবং কোন কোন রকম কাপড় হাতের তাঁতে বোনা হয়। ইয়োরোপে মোটর যানের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও আমি লণ্ডনেও ভারবাহী ঘোড়ায়-টানা ওআগন গাড়ী দেখেছি, চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগের নিকটবর্তী বীটের ক্ষেতে ঘোড়ায়-টানা ওআগন গাড়ী দেখেছি।

—

জ্বালানি কয়লার মহার্ঘ্যতা

যুদ্ধ চালাবার জন্য যে-সব অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস দরকার, সেগুলি যে-সকল কারখানায় তৈরি হয়, তাদের যন্ত্রপাতি চালাতে হ'লে যত কয়লার দরকার, খনি থেকে সেই সব কারখানায় তত কয়লা রেলওয়ের ওআগন সাহায্যে সেগুলি সরবরাহ করা সর্বাগ্রে আবশ্যক, আমরা স্বীকার করি। যুদ্ধের নিমিত্ত দরকারী বালির চটের থলি চটকলে তৈরি হয়। থলি তৈরি করবার জন্যে চটকলগুলি চালাতে হ'লে কয়লা দরকার। সে কয়লাও আগে আগে দেওয়া উচিত। কিন্তু অন্য নানা কাজের জন্যে কয়লা জোগাবার আগে মানুষ যে উনন জেলে রান্না করে, তার কয়লা নিশ্চয়ই চাই। যুদ্ধের চেয়ে রান্না ক'রে খেয়ে বেঁচে থাকা কম দরকারী নয়। অথচ জ্বালানি কয়লা খনি থেকে আনবার যথেষ্ট ওআগন না-থাকায় জ্বালানি কয়লা বাজারে যথেষ্ট আসছে না; ফলে তার দাম খুব বেড়ে গেছে। এতে গরিব লোকদের অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে, মধ্যবিত্তদেরও অসুবিধা হচ্ছে। অনেকেই একবেলা কোন প্রকারে রান্না ক'রে তাই দিনে রাতে যতবার দরকার খাচ্ছে। তাতে সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ সম্ভাবনা হয়েছে। এই বিষয়টির প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া গবর্মেণ্টের একান্ত কর্তব্য।

—

ভক্ত বিশ্বেশ্বর দাস

শান্তিপুরের পরম শ্রদ্ধেয় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ কিছু দিন পূর্বে পেয়েছি। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রের তাঁহার বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল। শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে পাণ্ডিত্য লাভ তত কঠিন নয়, ভক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়া যত কঠিন। তিনি ভক্তিমার্গে অগ্রসর হয়ে পরমভক্ত হয়েছিলেন। ভক্তি তাঁকে এত নম্র ও সকলের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধাবান্ ক'রেছিল যে, তিনি যে এত জ্ঞানী তা বোঝাই যেত না। আমি এক সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলাম, এ কথা মনেই ছিল না; শান্তিপুরে তাঁর সঙ্গে পুনঃপরিচয়ে জানতে পেরে আমাদের উভয়েরই খুব আনন্দ হয়। প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতি 'তৃণাদপি সুনীচ' যে বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, তিনি তাঁর যোগ্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের যে শতবার্ষিক স্মৃতিসভা শান্তিপুরে হয়, দাস মহাশয় তাতে একটি ঐকান্তিকতাপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে, কেশব-চন্দ্রের ধর্মই তাঁর ধর্ম ছিল।

—

কলেজ-প্রিন্সিপ্যাল ও তাঁর অবাঞ্ছনীয় ছাত্র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এই একটি নিয়ম ক'রেছেন, যে, যদি কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কোন ছাত্রের সে কলেজে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে না-করেন, তা হ'লে তাকে অন্য কলেজে ভর্তি হবার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট বিনা ব্যয়ে দেবেন। কলেজের গবর্নিং বডি ও বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জানাতে হবে যে, এ রকম করা হ'য়েছে।

কোন কারণে কোন কলেজে কোন ছাত্রের থাকা প্রিন্সিপ্যাল অবাঞ্ছনীয় মনে করলে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে এই ব্যবস্থা ভাল বটে। কারণ, তাড়িত ছাত্র দাগী হ'য়ে থাকে এবং সেই জন্য অন্য কলেজে তার ঢুকবার বাধা জন্মে। কিন্তু ছাত্রটির ও তার অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাত্রকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটসহ বিদায় দিলে অনেক স্থলে তার বিশেষ অসুবিধা, এমন কি শিক্ষা বন্ধও, হ'তে পারে। যে-সব ছাত্র তাদেরই গ্রামের বা শহরের একমাত্র কলেজে পড়ে, তাদের কাউকে এই রকমে বিদায় দিলে তাকে অন্য জায়গার অন্য কলেজে যেতে হয়। নিজের বাড়ীতে থেকে পড়ার খরচ অপেক্ষাকৃত কম, অন্যত্র খরচ বেশী। নিজের গ্রামে বা শহরে কলেজ থাকতে অন্যত্র যেতে বাধ্য হওয়া তাদের পক্ষেও অসুবিধাজনক যাদের এই ব্যয় করবার সামর্থ্য আছে; আর যাদের সে সামর্থ্য নাই,

তাদের পক্ষে এরূপ ট্রান্সফার শিক্ষা বন্ধ করার সমান। অথচ যে-প্রিন্সিপ্যাল যে-ছাত্রকে চান না, তাঁকে সেই ছাত্রকে কলেজে রাখতে বাধ্য করাও সঙ্গত নয়। তাতে উভয়ের সম্পর্ক গুরুশিষ্যোচিত থাকে না। প্রিন্সিপ্যালরা ছাত্রদের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ, অতএব তাদের চেয়ে বিবেচক, সাধারণতঃ এ কথা সত্য হ'তে পারে; কিন্তু তাঁরা কেউই অভ্রান্ত নন। এই জন্য, প্রিন্সিপ্যাল আলোচ্য অবস্থায় কোন ছাত্রকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করবার আগে গবর্নিং বডি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি নেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্মতি দেবার আগে তদন্ত করবেন, নিয়মটি এই রকম করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কিনা, বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করলে ভাল হয়। যে-স্থানে কেবল একটি কলেজ আছে, সেখানকার পক্ষে এই রকম পরিবর্তিত নিয়ম একান্ত আবশ্যক মনে করি। সে রকম পরিবর্তন হ'লে ছাত্র-বিশেষকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করা নিয়ে কাগজে-পত্রে আন্দোলন ও ধর্মঘট আদি কম হবে, বা হবেই না। এ রকম আন্দোলন ও ধর্মঘট আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

—

"ঘরোয়া"

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত ও শ্রীমতী রাণী চন্দ কর্তৃক লিপিবদ্ধ "ঘরোয়া" বইটি ভারি চমৎকার হয়েছে। বড় অক্ষরে ছাপা ব'লে আগাগোড়া পড়ে ফেলেছি। তা না হ'লেও গল্পগুলির টানে পড়তে হ'ত, কিন্তু পড়া এতটা অনায়াসসাধ্য হ'ত না।

শ্রীমতী রাণীর বাহাদুরি আছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি একটি ক'রে বাক্যগুলি ও গল্পগুলি লিখিয়ে গেছেন, এমন নয়। তিনি অবসর মত গল্প ক'রেছেন, শ্রীমতী রাণী শুনেছেন। শ্রীমতী পরে সেগুলি স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন এবং অবনীন্দ্রনাথ দেখে দিয়েছেন। একবার শুনে হুবহু এই রকম ঠিক্ লেখা সোজা কথা নয়।

গল্প ত নয়, যেন ছবি-দেখা। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার আচার্য, আবার শ্রীমতী রাণীরও চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা আছে। এই জন্যে ভাষার সাহায্যে এই ছবিগুলি অঙ্কিত হ'তে পেরেছে।

বইটিতে অবনীন্দ্রনাথের নিজের দেখা নানা ঘটনা ও ব্যাপারের গল্প আছে, আবার বয়োবৃদ্ধদের কাছে শোনা নানা গল্প আছে। তাঁর নিজের এস্রাজ বাজাতে শেখার কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি শিল্প জিনিষটা কি তার বেশ ব্যাখ্যা করেছেন। নিজের ছবি আঁকার গোড়ার কথাও বলেছেন।

"ঘরোয়া" নামটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে এতে প্রধানতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের গল্প আছে, কিন্তু অনেক ধনী লোকের শখের গল্পও আছে। স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথের রাখী-স্নান, রাখী-মন্ত্র রচনা ও রাখী-বন্ধনের গল্প, সহিসদের হাতে ও মসজিদের মুসলমানদের হাতে রাখী বাঁধবার গল্প, নাটক রচনা ও অভিনয়ের গল্প, গান রচনা ও গাইবার কাহিনী ইত্যাদি আছে। মহর্ষির ও তাঁর পত্নীর ঘরোয়া জীবনের ছবিগুলি বেশ স্পষ্ট হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের দাদা মশায় দিদিমা ও পিতামহের গল্প, তাঁর মার কথা, দ্বিপেন্দ্রনাথের নানা মজার কথা, "খামখেয়ালী" ক্লাবের কাহিনী—কত কি যে এতে আছে বলবার জায়গা নাই! এতে শুধু যে ঠাকুর-পরিবারের কথাই আছেই তা নয়, বেলুনবাজ রামচন্দ্র দত্তের কাহিনী, তাঁর বেলুনে ওড়া প্যারাশুটে নামা ও বুনো বাঘের সঙ্গে লড়াই দেখান প্রভৃতির গল্প, নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা ও ন্যাসান্যাল সার্কাসের কথা, গুপ্তবৃন্দাবনের আখ্যায়িকা প্রভৃতি আছে।

কিছু নমুনা দিতে পারলে ভাল হ'ত। দ্বিপু বাবুর গল্পই কত আছে। গোরুর দুধ মিষ্টি হবে বলে মহর্ষির আদেশে তাঁর বড় কন্যা সৌদামিনী দেবী তাঁদের গাভীকে গুড় খাওয়াতেন। তাতে দ্বিপু বাবু ব'লেছিলেন, কর্তা দাদা মশায়ের নাতী হওয়ার চেয়ে গোরু হওয়া ভাল! এই রকম কত মজার কথা।

নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশনে সমুদয় বক্তৃতা, এমন কি লালমোহন ঘোষের বক্তৃতাও বাংলায় হওয়ার বৃত্তান্ত এবং সেই সময়কার ভূমিকম্পের বর্ণনা চমৎকার।

—

বঙ্গে সম্মিলিত দলের মন্ত্রিসভা গঠন

বঙ্গের সাবেক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় গবর্ণর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আবুল কাসেম ফজলল হক সাহেবকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলেন। হক সাহেব গত ১১ই ডিসেম্বর আপাততঃ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ঢাকার নবাবকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।

অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম আজ (১২ই ডিসেম্বর) বা পরে জানান হবে। যে-সকল প্রদেশে কংগ্রেসওয়ালারা মন্ত্রী ছিলেন, সেখানে তাঁরা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন, সুতরাং বঙ্গে 'পার্লেমেণ্টারি' কংগ্রেস দলের কেউ মন্ত্রী হবেন না; কিন্তু তা হ'লেও সেই দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলেছেন তাঁরা নূতন মন্ত্রিসভার সব কাজই কাজগুলিরই উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা ক'রে সমর্থন বা বিরোধিতা করবেন, নির্বিচারে বিরোধিতা করবেন না। কংগ্রেসী এই দল ছাড়া অন্য সব দলের কোন না কোন প্রতিনিধির মন্ত্রী হবার কথা।

কংগ্রেসীরা সাতটি প্রদেশে মন্ত্রী হয়ে প্রদেশগুলির যতটুকু হিত করতে পেরেছিলেন, বঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা তার চেয়ে বেশী প্রাদেশিক হিত করতে পারবেন, এ আশা কেউ করে না। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সমগ্রভারতীয় পূর্ণ-স্বরাজের দিকে দেশকে যতটুকু অগ্রসর করতে পেরেছিলেন বা পারেন নি, বঙ্গের মন্ত্রিসভার সেদিকে তার চেয়ে বেশী কৃতিত্বের আশা কেউ করবে না। ১৯৩৫ সালে প্রণীত ও বর্তমানে চালু ভারত-শাসন আইনটাই এরূপ যে, দেশের চূড়ান্ত ও চরম হিত এর অনুসরণ ক'রে করা যায় না।

সুতরাং, আমরা নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্ণ সমর্থন করলেও উল্লিখিত কোনরূপ মঙ্গলের আশায় করছি না। সমর্থন করছি এই আশায় যে, যে-সাম্প্রদায়িকতাবিষে গত কয়েক বৎসর বাংলাদেশ জর্জরিত হয়েছে ও যার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রভাবে দেশে অত্যন্ত সাংঘাতিক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে, এবং যার প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের মত অনিষ্টকর বিল আইন-সভায় পেশ হয়েছে, সেই সাম্প্রদায়িকতার—বিনাশ না হোক—প্রাদুর্ভাব কমবে ও উপশম হবে, এবং সকল দলের লোক দেশের প্রকৃত হিত চিন্তা করবার ও হিত সাধনের উপায় অবলম্বন করবার উপযোগী শান্ত অবস্থা পাবেন। হক সাহেব ঐক্যের জন্য বঙ্গের লোকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার সমর্থন করবেন। দেশহিতৈষী সকলেই তা করবেন।

—

শরচ্চন্দ্র বসু স্বগৃহে আটক বন্দী!

আজকার (১২ই ডিসেম্বরের) দৈনিক কাগজে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসুর নিজ গৃহে আটক বন্দী হওয়ার সংবাদে সর্বসাধারণ স্তম্ভিত হবেন। আমরা কাল (১১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এই খবর পেয়েছিলাম। আমরা মনে করি, গবর্নেণ্টের এই কাজে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হ'য়ে ফল বিপরীত হবে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

শরৎবাবুকে আটক করার কারণ এই বলা হয়েছে যে, সকৌন্সিল বড়লাট প্রমাণ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, শরৎবাবুর সঙ্গে জাপানের এরূপ সংস্পর্শ ঘটেছিল যাতে তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক হয়েছে। কিন্তু গবর্নেণ্ট বরাবর বলে আসছেন যে, দেশের লোকে ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে তাঁরা ইহা চান। সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে দেশের লোকের মনে এ বিশ্বাস জন্মান আবশ্যক যে, গবর্নেণ্ট যা কিছু করছেন, তা নিতান্ত আবশ্যক ও ন্যায়সঙ্গত। সুতরাং শরৎবাবুর সঙ্গে জাপানের অবৈধ রকম সংস্পর্শ ঘটেছিল, এই বিশ্বাস শুধু বড়লাটের জন্মিলে চলবে না; দেশের লোকদেরও এই বিশ্বাস জন্মান চাই। সেই জন্যে, বড়লাটের বিশ্বাসের কারণ যে-প্রমাণগুলি, তা প্রকাশ করা আবশ্যক এবং সেগুলির বিরুদ্ধে শরৎবাবুর কি বলবার আছে, তাও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। সে-রকম কোন প্রমাণ না থাকলে শুধু চরদের কথায় বিশ্বাস ক'রে তাঁকে আটক ক'রে রাখা সমীচীন হবে না, তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত হবে। আর যদি গবর্নেণ্টের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ থাকে তা হ'লে তাঁকে কোন নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুন্যালের সমক্ষে হাজির করা হোক না?

শরৎবাবুকে আটক করায় লোকের মনে নানা সন্দেহ হচ্ছে। সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁর ও তাঁর দলের লোকদের পূরা সম্মতি ও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল; কাল (১১ই ডিসেম্বর) পর্যন্ত তাঁর অন্যতম মন্ত্রি হবার কথা লোকে জানত এবং তিনিও জানতেন। গবর্ণর যুদ্ধসমর্থক ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার পোষক মন্ত্রিসভা চান, তা জেনেই শরৎবাবু ও অন্য অনেকে মন্ত্রী হ'তে চেয়েছিলেন। তাঁরা জাপানের বিরোধিতাই করতে প্রস্তুত ছিলেন ও আছেন। ভারতবর্ষে এমন কোন দল নাই যারা জাপানের বর্তমান অভিযানকে গর্হিত মনে করে না। ফরোআর্ড ব্লকও তা গর্হিত মনে করে। এ অবস্থায় শরৎবাবুকে বন্দী করায় লোকের মনে এই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, যে, গবর্নেণ্ট সকল দলের মিলন চান না এবং সেই কারণে, যাতে শরৎবাবু মন্ত্রী মনোনীত হ'তে না পারেন সেই অভিসন্ধিতে তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। এ রকম সন্দেহ ভিত্তিহীন হ'তে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। গবর্ণর হক সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অনুরোধ করতে বিলম্ব করায় লোকের সন্দেহ হচ্ছিল যে, সকল দলের মিলন (যা মিঃ এমারি বার বার উচ্চকণ্ঠে

বলেছেন চান) গবর্মেণ্ট বাস্তবিক চান না; শরৎবাবুর বন্দিত্বে সেই সন্দেহ দৃঢ়তর হবে। লোকে মনে করতে পারে, শরৎবাবু বন্দী হওয়ায় আইন-সভার ফরোআর্ড-ব্লক-দলভুক্ত সদস্যেরা যদি হক সাহেবের নূতন সম্মিলিত দল ত্যাগ করে, তা হ'লে খাজা নাজিমুদ্দিনের দল সংখ্যায় বড় হয়ে যেতে পারে এবং গবর্ণর খাজা নাজিমুদ্দিনকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে তখন আহ্বান করতে পারেন,—এই রকম অভিসন্ধিতেই শরৎবাবুকে বন্দী করা হয়েছে লোকে সন্দেহ করতে পারে। এটাও অবশ্য অমূলক সন্দেহ হ'তে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক সন্দেহ নয়।

তাঁর সঙ্গে জাপানের যোগ থাকলে সেই যোগের কথা ঠিক্ মন্ত্রিদল গঠনের অব্যবহিত প্রাক্‌কালেই বড়লাট জানতে পারলেন ও বিশ্বাস করলেন, এ রকম সুবিধাজনক আকস্মিক ঘটনা সহজে বিশ্বাস করা যায় না—যদিও অবশ্য তা অসম্ভব নয়।

যাই হোক, আমরা আশা করি, গবর্মেণ্ট শরৎ বাবুকে ছেড়ে না-দিলেও আইন-সভার বসুদলভুক্ত সদস্যেরা নূতন হক মন্ত্রিসভার সমর্থক সম্মিলিত দলেই থাকবেন। তা হলে খাজা নাজিমুদ্দিনের দলের আপেক্ষিক বলবত্তা বাড়তে পারবে না এবং গবর্নর তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলতে পারবেন না।

আমরা পরিশেষে আবার শরৎবাবুকে বন্দী করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোন্ দেশ যে কবে ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধে নামবে, তা আগে থাকতে জেনে কেউ তার সঙ্গে সব রকম সাংস্কৃতিক সংস্পর্শও এড়িয়ে চলতে পারে না।

বিলাতেও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা

ভারতবর্ষে কাগজের দাম খুব বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সব রকমের কাগজই পাওয়া কঠিন হয়েছে। অনেক আগে থাকতেই ভারতবর্ষের দৈনিক ও সাপ্তাহিক-গুলি তাঁদের পৃষ্ঠার সংখ্যা কমিয়েছেন, কেও কেও দামও বাড়িয়েছেন। মাসিক পত্রগুলিও অতি কষ্টে কাগজ সংগ্রহ ক'রে কাজ চালাচ্ছেন।

বিলাতেও কাগজ দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। সেখানে গবর্মেণ্ট প্রত্যেক পত্রিকার আকৃতি, পৃষ্ঠাসংখ্যা ও কাট্‌তি বিবেচনা ক'রে নির্দিষ্টপরিমাণ কাগজ বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন। তার বেশী কাগজ কারো পাবার জো নাই। এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অবিখ্যাত একটি এবং খুব বিখ্যাত একটি পত্রিকা নিজেদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

জর্ন্যাল অব দি রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্টস্ আগে সপ্তাহে সপ্তাহে বেরত, এখন যুদ্ধের সময় পাক্ষিক বেরচ্ছে। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর এই রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্টসের পৃষ্ঠপোষক এবং খুব নামজাদা লোকেরা এর সভ্য। জর্ন্যালটি বিখ্যাত না হলেও এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়। এর গত ১৮শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞাপনটিতে বলা হচ্ছে যে, কাগজের ঘাটতির দরুন এক জন প্রসিদ্ধ লেখকের একটি দরকারী প্রবন্ধ ছাপা হয় নি, সেটি আলাদা অল্পসংখ্যক ছাপা হয়েছে, সোসাইটির কোন সদস্য চাইলে সেক্রেটরির সঙ্গে পত্রব্যবহার করবেন।

NOTICE

—::—

"THE ENGLISH PUBLIC SCHOOLS."

Owing to the paper shortage it was not possible to publish in the last issue of the *Journal* the full text of Canon Leeson's paper on the above subject as he read it to the Society on May 1st. Canon Leeson's paper has, however, been reprinted privately, and if any Fellows interested in the subject would like to see the full paper they should communicate with the Secretary, as it may be possible for copies to be made available for them.

বিখ্যাত স্পেক্টেটর (The Spectator) কাগজখানি কত বৎসর চলছে হিসাব করি নি; কিন্তু ওর সদ্যঃপ্রাপ্ত গত ২৬শে সেপ্টেম্বরের কাগজটিতে দেখছি নং ৫৯০৯ (No. 5909)। এহেন বিখ্যাত সাপ্তাহিক যুদ্ধের আগের গড়ে প্রতি সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠা থেকে এখন ২৪ পৃষ্ঠা দিচ্ছেন, কখন কখন তার চেয়েও কম। এখন হয় পৃষ্ঠা আরো কমাতে হবে, নয় কাট্‌তি কমিয়ে দিয়ে কাগজের দরকার কমাতে হবে। এর কর্তৃপক্ষ কাটতি কমানই স্থির করেছেন। এই সব কথাই অংশতঃ নিম্নমুদ্রিত প্যারাগ্রাফটিতে বলা হয়েছে।

FEWER "SPECTATORS"

The progressive decrease in the paper-ration—it stands at present at 22½ per cent. of pre-war consumption, plus a small supplementary allowance in some cases—has faced the *The Spectator* with a choice between still further curtailing its size and deliberately reducing its circulation. It has been decided with regret, after full consideration, to adopt the latter course. The reduction in the number of pages from the pre-war average of 48 to the present 24 and occasionally even less, has been carried as far as can be carried without sacrificing the paper's essential characteristics.

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের রজত জয়ন্তী

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষাবিষয়ে—বিশেষতঃ চিকিৎসাশিক্ষাবিষয়ে—বঙ্গের স্বাবলম্বনের একটি
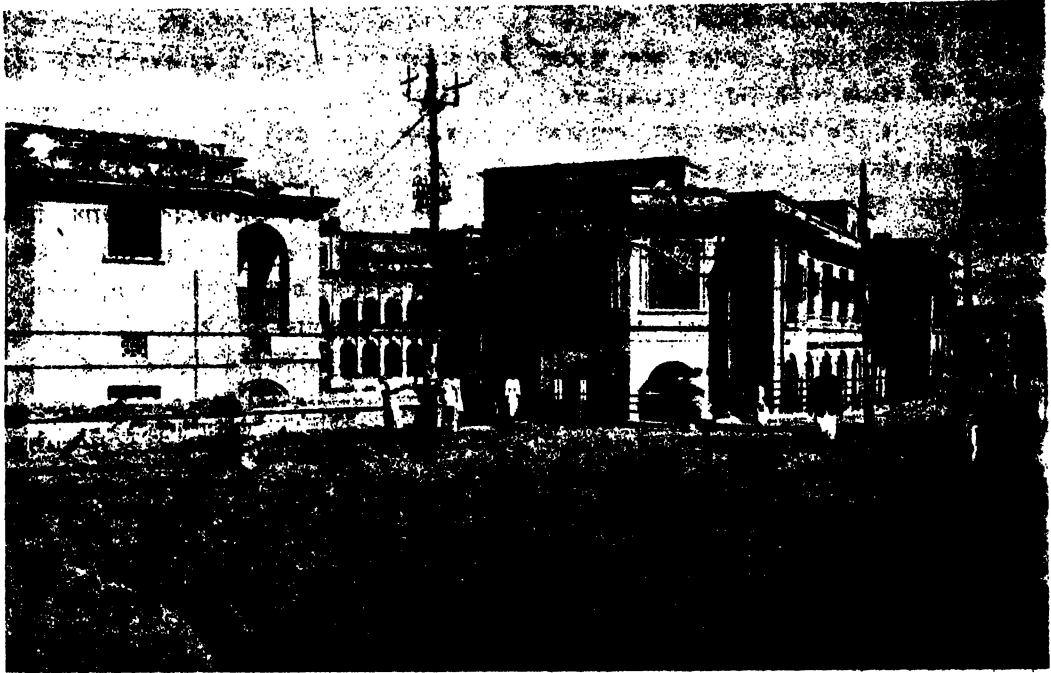
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ—প্রধান প্রবেশদ্বার

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২৫ বৎসর পূর্বে সামান্য ভাবে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এখন এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজকে য়্যাফিলিয়েশ্যন দেন, তখন এর সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় সাত লক্ষ টাকা। এখন এর জমির দাম ১১ লক্ষ টাকা এবং ইমারৎগুলির মূল্য ১৪ লক্ষের উপর। ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরি, হাসপাতাল প্রভৃতির সাজ সরঞ্জাম ১৬ লাখ টাকারও উপর। আমরা এর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এর রজত জয়ন্তী উৎসব হবে। তার বিস্তারিত কার্যসূচী দৈনিক কাগজে বেরবে।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পরিচালিত ১৯৪১ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল নীচে মুদ্রিত হইল।

প্রথম বিভাগ :—(গুণানুসারে)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভট্টাচার্য্য, আরঙ্গাবাদ (গয়া); শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্ণৌ; শ্রীসুকৃতি সান্যাল, বেনারস।

দ্বিতীয় বিভাগ :—(বর্ণানুক্রমিক)

অনিমা নিয়োগী, বেনারস; কুমারী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ, শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, কলিকাতা; শ্রীনিখিলেন্দ্র নাথ ঘোষ, বেনারস; শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্বামী, বেনারস; শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্ণৌ; শ্রীপ্রতিমা ভট্টাচার্য্য, আরঙ্গাবাদ (গয়া); শ্রীপ্রিয়বালা দেবী, বেনারস; শ্রীমমতা ঘোষাল, বেনারস; কুমারী মহামায়া মিত্র, মীরাট; শ্রীমতী মায়া দেবী, আরঙ্গাবাদ (গয়া); শ্রীরাধু ভট্টাচার্য্য, বেনারস; শ্রীরাধা ঘোষাল, বেনারস; শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্ণৌ; শ্রীলীনা মুখোপাধ্যায়, বেনারস; শ্রীসাবিত্রী ভট্টাচার্য্য, আরঙ্গাবাদ (গয়া); শ্রীমতী সুধালতা দেবী, আরঙ্গাবাদ (গয়া); শ্রীসুনীলকুমার বসু, লক্ষ্ণৌ।

তৃতীয় বিভাগ :—(বর্ণানুক্রমিক)

শ্রীমতী আনন্দময়ী মিত্র, মীরাট; শ্রীআভা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরাট; শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বেনারস; শ্রীনীহারিকা চট্টোপাধ্যায়, মীরাট; শ্রীপ্রতিভা দেবী, এলাহাবাদ; শ্রীবেলা রায়, কলিকাতা; শ্রীমতী মাধুরী রাণী বসু, এলাহাবাদ; শ্রীযতীন্দ্রনাথ সান্যাল, বেনারস; শ্রীরণজিতকুমার ঘোষ, লক্ষ্ণৌ; শ্রীমতী রেণুকা চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; শ্রীহিরণ্যকুমার মুখোপাধ্যায়, বেনারস।

আংশিক :—

কুমারী মঞ্জুশ্রী সেন, সাহাজাহানপুর।

আগামী বৎসর আংশিক ভাবে পুনরায় পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলেন :—

শ্রীনন্দলাল পাল (বিজ্ঞান), এলাহাবাদ; শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায় (ইতিহাস), এলাহাবাদ; শ্রীনীলিমা চৌধুরী (ইতিহাস), বেনারস; শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য (ইতিহাস), মীরাট।

অবশ্যগ্রহণীয় বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভট্টাচার্য্য, আরঙ্গাবাদ (গয়া); শ্রীসুকৃতি সান্যাল, বেনারস; শ্রীরাধু ভট্টাচার্য্য, বেনারস; শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্ণৌ।

রবীন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

১

শীতকাল। সকাল বেলা 'শ্যামলী'তে গিয়েছি কবি-গুরুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি একলা বসেছিলেন বারান্দায়, সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে। প্রণাম করে একটা মোড়া টেনে নিয়ে পাশে বসলাম। কথাবার্ত্তা চলছে। এমন সময় হঠাৎ তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন—বারণ করে দাও, চলে যেতে বল ওকে।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। আশেপাশে কেউ নেই, রাস্তার দিকে তাকিয়েও কাউকে আসতে দেখলাম না। এদিকে তিনি অধৈর্য্য হয়ে বার বার বলছেন—চলে যেতে বল, এক্ষুণি যেতে বল। তাঁর চোখেমুখে, গলার স্বরে ক্রোধ, না বিরক্তি, না, আর কিছুর লক্ষণ? মনে হল, ক্রোধ বিরক্তি, দুই-ই হয়ত আছে, কিন্তু সে গৌণ, একটা অসহ্য বেদনাবোধ যেন মুখের সমস্ত শিরা উপশিরাকে আকুঞ্চিত করে তুলেছে। খুব একটা নির্ম্মম, করুণ দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়লে আচমকা আমাদের সমস্ত অনুভূতি শিউরে উঠে যে অবস্থা হয়, এও ঠিক তাই। অথচ, কোথায় কি হল, ঠাহর করতে না পেরে আমার অবস্থা হয়ে উঠল অত্যন্ত করুণ।

কেউ যেন মনে না করেন যে তত্ত্বান্বেষী দর্শকের মত তখন আমি তাঁর চোখমুখের ব্যঞ্জনা থেকে ধীরেসুস্থে মনোভাব বিশ্লেষণ করার বিলাস উপভোগে নিবিষ্ট ছিলাম। তাঁর উত্তেজনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজের অজ্ঞাতসারে তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে পড়েছি এবং যন্ত্রচালিতের মত তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের রাস্তার দিকে রওনা হয়েছি। ফটকের কাছে আসতে বোধ হয় আমার এক সেকেণ্ডের বেশি লাগে নি এবং ঐ এক সেকেণ্ডের মধ্যেই উপরোক্ত চিন্তাধারাও তড়িৎপ্রবাহে মাথায় ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করেছে।

ফটকে এসেও কোন উল্লেখযোগ্য দৃশ্য চোখে পড়ল না বা লোকজন কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু একটি নিরীহগোছের চাষাভুষোশ্রেণীর গাঁয়ের লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আমি পুনরায় যন্ত্রচালিতের মত একবার ঐ লোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসুভাবে ফিরে তাকালাম কবির দিকে। তিনি অস্থিরভাবে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ লোকটিই, ওকে এক্ষুনি চলে যেতে বল এখান থেকে।

লোকটিকে বিদায় করে দিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা গেল না। একটি অতি-সাধারণ গ্রাম্য লোক, দড়ি বেঁধে কতকগুলো মুর্গী ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে বিক্রী করতে। অস্বাভাবিক কিছুই না দেখে ভাবলাম, হয়ত ইতিপূর্ব্বে এই লোকটি অন্যায় কিছু করে থাকবে, সেই কথা মনে পড়তেই তিনি এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ফিরে এসে কাছে বসতেই বললেন—এ আমি সইতে পারি না। নিরীহ পাখীগুলোকে নির্দ্দয়ভাবে বেঁধে আবার চোখের সামনে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কত দিন বারণ করেছি এদিকে আসতে।

তখনো তাঁর চোখেমুখে ক্লিষ্ট বেদনা-বোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা তখন আমি বুঝতে পারলাম। কত লোক মুর্গী বিক্রী করতে আসে,—পায়ে দড়ি বাঁধা, মাথা নীচের দিকে ঝোলানো, মুর্গী চেঁচাচ্ছে, হয়ত বা ভয়ার্ত্ত যন্ত্রণায়, এ দৃশ্য ত আমরা অহরহই চোখের সামনে দেখছি, আমাদের ত কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটে না। কিন্তু এর যে একটা নিষ্ঠুর, করুণ ও মর্ম্মান্তিক দিকও আছে এবং মানুষের অনুভূতি যে তাতে কত গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে সেদিন ঐ অবস্থায় না দেখলে হয়ত চিন্তাও করতে পারতাম না।

দুর্ব্বল, অসহায়ের প্রতি সবলের যে পীড়ন, তাতে বীর্য্য নেই, আছে নিষ্ঠুরতা, মর্ম্মান্তিকতা এবং পৌরুষের লজ্জাকর গ্লানি, এ কথা রবীন্দ্রনাথ আজীবন কত ভাবেই বলে এসেছেন। কিন্তু তার পিছনে যে কত গভীর এবং ব্যাপক আন্তরিকতা রয়েছে, ঐ দিনের ঘটনায় তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

পাখী, খরগোষ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণী শিকার ঠিক এই কারণেই তিনি সইতে পারতেন না। শৈশবে এক বার খরগোষ শিকারের নিষ্ঠুরতা তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। শিকার সম্বন্ধে তাঁর সেই প্রথম দুঃসহ

অভিজ্ঞতার কাহিনী তখন তিনি আমাকে বললেন।* বালকমনে সেদিন যে গভীর বেদনাবোধ জেগেছিল, সেই অনুভূতি জীবনে কখনো তিনি বিস্মৃত হ'তে পারেন নি। কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে সংশোধনের জন্য যখন তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম, তখনো তিনি চিঠিতে তার উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

"বালককালে চিফ সাহেবের ভাঙা কুঠিতে খরগোষ শিকারের নিদারুণতা চিরকালের মত আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।"

২

একদিন সকালবেলা রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ-রচনায় ব্যস্ত। রচনা যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন বেলা দশটা, সাড়ে দশটা। তিনি তখন থাকেন 'কোনারকে'। 'কোনারকে'র সামনের দিকে একটি ছোট ঘরে একজন অধ্যাপকবন্ধু বসে কাজকর্ম্ম করতেন। প্রবন্ধ রচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঐ অধ্যাপকবন্ধুকে ডেকে প্রবন্ধটি কপি করতে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি সেটি সযত্নে টেবিলের উপরে রেখে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিতে বেরিয়ে পড়লেন। 'কোনারকে' ফিরতে ফিরতে তাঁর হয়ে গেল বেলা প্রায় একটা দেড়টা। অন্যান্য কাজকর্ম্ম রেখে প্রথমেই ঐ প্রবন্ধটি কপি করার উদ্দেশ্যে তিনি যথাস্থান থেকে সেটি আনতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, সেখানে প্রবন্ধটি নেই। টেবিলের আনাচে-কানাচে এবং ঘরের সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লেখাটি পেলেন না। চাকরবাকর সকলকেই একে একে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউই কিছু জানে না। কোনারকে 'প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যে'র দপ্তরে যে-দু'জন কর্ম্মী বসে কাজকর্ম্ম করতেন, তাঁরাও এ বিষয়ে কোন সন্ধান দিতে পারলেন না। বিপন্ন অধ্যাপকবন্ধুটির তখনকার মনের অসহায় অবস্থা বর্ণনাতীত। তিনি শুধু ভাবছিলেন, এমন ভয়ঙ্কর ফাঁড়া তাঁর জীবনে আর আসেনি।

রবীন্দ্রনাথ কোনারকের ভিতরের বড় ঘরটিতে বসে লেখাপড়া করছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে আস্তে আস্তে অপরাধীর মত অধ্যাপকবন্ধু তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং মাথা নীচু করে আমতা আমতা করে বললেন— "সকালের সেই লেখাটি—

রবীন্দ্রনাথ কলম থামিয়ে লেখা থেকে মাথা তুলে শুধু শুধু বললেন—"ও! সে ত হয়ে গেছে।" বলে টেবিলের একপাশে দেখিয়ে দিলেন এবং পুনরায় লেখায় মনোনিবেশ করলেন।

বন্ধুবর দেখলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতেই প্রবন্ধটি কপি করে নিয়েছেন। দেখে তিনি শুধু জিভ কামড়ে মনে মনে উচ্চারণ করলেন—"ইস্!"

রবীন্দ্রনাথ যখনই নতুন কিছু রচনা করতেন, সঙ্গে সঙ্গে রচনাকালীন কাটাকুটি থেকে উদ্ধার করে পরিষ্কার কপিতে তার পরিচ্ছন্ন পরিপূর্ণ রূপটি না দেখা পর্য্যন্ত তাঁর শিল্পীমন কিছুতেই শান্ত হত না। এ বিষয়ে একটুও তর সইত না তাঁর। তাঁর লেখা নকল করে দেওয়ার জন্য একেবারে শেষ বয়সে তিনি অন্যের উপর নির্ভর করতেন, নতুবা, বরাবর তিনি যেমন রচনা শেষ করেছেন, অমনি তক্ষুনি বসে নিজেই সে লেখা কপি করার নীরস কর্ত্তব্যটুকুও অম্লানচিত্তে সম্পন্ন করে গেছেন। বয়স এবং খ্যাতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে নানা আবশ্যক অনাবশ্যক কাজকর্ম্মবৃদ্ধির জন্য বাধ্য হয়েই পরে তাঁকে এবিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজে বিন্দুমাত্র ফাঁকি, অবহেলা-অথবা ঢিলেমি ঘটলে তার শাস্তি নিজে গ্রহণ করে অন্যকে তিনি কিভাবে কর্ত্তব্যে সচেতন করে তুলতেন, তার কঠোর অভিজ্ঞতা আমাদের উপরোক্ত অধ্যাপকের ঘটেছিল। তিনি যখন তাঁর ত্রুটি বুঝতে পেরেছিলেন, তখন যদি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতেন, তবে তিনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু একটি ভর্ৎসনার কথাও না বলে রবীন্দ্রনাথ অপরাধীকে যে নীরব শাস্তি দিতেন, তাতে চিরজীবনের মত অপরাধের সংশোধন হয়ে যেত। বলা বাহুল্য, এরূপ শিক্ষালাভ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে আরো অনেকের অদৃষ্টেই ঘটেছে।

৩

অধ্যাপক নিতাইবিনোদ গোস্বামী মশায় দু-চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখেন, তিনি একখানা বই পড়ছেন নিবিষ্ট মনে এবং আরো এক তাড়া মোটা মোটা বই তাঁর ডান দিকে টেবিলের উপরে পাঠের অপেক্ষায় স্তূপীকৃত। গোঁসাইজীকে দেখেই কবি বই রেখে তাঁর দিকে মনোযোগ দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু গোঁসাইজী তাঁকে পড়াশোনায় ব্যস্ত দেখে তখনকার মত চলে গেলেন, পরে আসবেন জানিয়ে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে ফিরলেন তিনি। এসে দেখেন, কবির ডান দিকের বইগুলো সব বাঁ-দিকে স্থানান্তরিত।

* ১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

একটু বিস্মিত হয়ে গোঁসাইজী জিজ্ঞেস করলেন—"বই-গুলো কি আপনার পড়া হয়ে গেল ?"

—"হাঁ।"

"ঐ সবগুলো বই-ই পড়লেন ?"

রবীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে বললেন—"হ্যাঁ, সবগুলোই।"

গোঁসাইজীর কৌতূহল ও বিস্ময় বাড়ছিল উত্তরোত্তর। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ইতস্ততঃ করে—"এই অল্প সময়ে এতগুলো বই আগাগোড়া পড়ে শেষ করলেন ?"

রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন—"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি তোমার। ভাবছ, রবিঠাকুর ভেল্কিবাজী বা যাদুবিদ্যা জানে নিশ্চয়। বিদ্যা একটা অবশ্যই আছে, তবে কারো কাছে ফাঁস করে না দিলে তোমাকে চুপি চুপি বলতে পারি, সে যাদুবিদ্যা নয়। ছোট শিশু যখন 'অ' 'আ' শিখতে আরম্ভ করে, তখন প্রতিটি অক্ষর তাকে আলাদা করে পড়তে হয় এবং তাতেই তার কত সময় লাগে! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ দৃষ্টি, জ্ঞান ও বোধশক্তি বাড়লে সে ক্রমশঃ 'অক্ষর' ডিঙিয়ে একেবারে গোটা 'শব্দ' এবং 'শব্দ' ডিঙিয়ে এক এক 'ছত্র' একসঙ্গে পড়তে পারে। পাঠের গতিও হয় দ্রুততর। এমনি ভাবে এগিয়ে চলতে পারলে একসঙ্গে বইয়ের এক পাতা, এমন কি পুরো এক এক অধ্যায়েরও উপরে অনেক সময় শুধু চোখ বুলিয়ে গেলেই তার সারবস্তু সংগ্রহ করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়।"

যে জন্মলব্ধ বুদ্ধিদীপ্তির বিদ্যুচ্চমকে অনধীত বিদ্যার ক্ষেত্র অনায়াসেই আলোকিত ও অধিগত হয়ে যায়, তারই যে প্রচলিত নাম 'প্রতিভা', সে কথা হয়ত সব সময় আমাদের মনে থাকে না।

৪

একদিন কি একটা কার্য্যোপলক্ষ্যে 'শ্যামলী'তে গিয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি পিছন ফিরে বসেছিলেন বারান্দায়। কাছাকাছি যেতেই আগন্তুকের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ফিরে তাকালেন। পাশের টেবিলে একখানা খাতা খোলা, হাতের কলমটি তার উপরে রেখে দিয়ে আমার দিকে ঘুরে বসলেন। বললেন, বোসো, তারপর, কি বৃত্তান্ত, শোনা যাক।

এদিকে খাতার উপর হঠাৎ নজর পড়তেই আমি দেখলাম, একটা নতুন কবিতার দু-চার পংক্তি লেখা হয়েছে মাত্র। অত্যন্ত অসময়ে মূর্ত্তিমান বাধার মত উপস্থিত হয়েছি ভেবে আমি কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। বললাম—আপনি এখন ব্যস্ত আছেন, আমি বরং অন্য সময় আসব এখন। বলে বিদায় নেওয়ার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাতই করলেন না। বললেন—না, তা হোক, তোমার বক্তব্যটাই আগে বলে ফেল।

আমার অবস্থা 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—চলে আসতে পারি না, তিনি বারণ করছেন, থাকতেও অস্বস্তিবোধ করছি এই ভেবে যে, একটা কবিতার রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটিয়ে হয়ত তার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছি।

যাই হোক, আমাকে বাধ্য হয়ে বসতে হ'ল এবং যত দূর সংক্ষেপে কাজটি সেরে নিতে হ'ল। বিদায় নেওয়ার সময় বললাম—অসময়ে এলে আমাদের এ ভাবে প্রশ্রয় না দিয়ে তাড়িয়ে দিলেই ত পারেন। নইলে শেষে আমরাই যে ঠকব। হয়ত একটা কবিতা আজ হারালুম চিরদিনের মত।

তিনি সস্নেহে মৃদু হেসে বললেন—না, সে ভয় নেই, কবিতা হারিয়ে যাচ্ছে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এইভাবে কবিতা লেখার মাঝখানে বাধা পেলে আপনার বিরক্তি বোধ হয় না ? আর তার চেয়ে ও বড় কথা হচ্ছে, লেখার ও ত অসুবিধা হয় নিশ্চয়ই।

তিনি বললেন—না, অসুবিধা হয় না, বরং ভালোই হয়।

"ভালোই হয়!"—আমি একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

তিনি বললেন—দ্যাখো, লেখা যখন আসে, তখন অনেক সময়ই উদ্দাম বেগে বাঁধভাঙা প্লাবনের স্রোতে ভাষাকে খড়ের কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তোমরা কেউ যখন লেখার মাঝখানে হঠাৎ এসে উপস্থিত হও, তখন লেখা বন্ধ রেখে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগে কিছুক্ষণের জন্য আর তার 'ব্রেক' কষে রাখি। তাতে লেখার রেশ ও পরিবেশ মন থেকে ছিন্ন হয়ে যায় না, অথচ, এ ভাবে একটুখানি বাধা পেয়ে ভাষা সংহত ও ভাব দানা বেঁধে ওঠার অবকাশ পায়। আর কবিতায় যখন এক বার পেয়ে বসে, তখন তাকে সাময়িক বাধা দিলেও সে ত মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে, নিষ্ক্রমণের নিখুঁৎ ভাষা না দেওয়া পর্য্যন্ত সে কি আর নিষ্কৃতি দেয়, ভেবেছ ? হারিয়ে যাবে কি করে ?"

আর এক বার অনুরূপ অবস্থায় আর এক জন অধ্যাপক বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন—চিত্রশিল্পী ছবি আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে তফাতে গিয়ে দূর থেকে তাকিয়ে দেখেন,

অন্তরের কল্পনা কতটা যথাযথভাবে রূপ পেয়েছে তাঁর তুলির আঁচড়ে ও রেখার টানে। এমনি করে স্বেচ্ছায় ছবির সঙ্গে সাময়িক ব্যবধান রচনা না করলে শিল্পীর চোখে ধরাই পড়বে না, কোথায় রঙের ব্যঞ্জনা অস্পষ্ট রইলো আর কোথায়ই বা দূর হ'ল না রেখার অসঙ্গতি। কবিতা রচনাও ত এমনি মনের ছবি আঁকা, শুধু তার ভাষা পৃথক। লিখতে লিখতে যে থেমে গেলুম, এ আর কিছু নয়—রইলুম খানিকক্ষণের জন্য আলাদা হয়ে। আবার একটু পরেই কাছে গিয়ে দেখব, তখন বুঝতে পারব, মনের ভাব ঠিক ঠিক প্রকাশ পেল কিনা লেখার মধ্যে। তোমাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলাতে আমার লেখার কাজে ব্যাঘাত হয় না কিছুই।"

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে লেখার স্রোতে এই ধরণের আকস্মিক ব্যাঘাত লেখক সাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর ও অত্যন্ত বিরক্তিজনক উপদ্রববিশেষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য ধরণের লেখা সম্বন্ধে যাই হোক, বিশেষ ভাবে কবিতা রচনাকালে অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগকে রূপায়িত করে ছন্দের সূক্ষ্মতন্তুজালে ভাষার সুকুমার শিল্প বুনতে যখন নিবিড় রসোন্মাদনার অধীরতায় কবি থাকেন আত্মহারা, তখন হঠাৎ-বাধায় তাঁর রচনা থমকে দাঁড়ায় না এবং মানসিক সাম্য বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না, জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না।

মনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাঘাতের বিঘ্নকারী শক্তিকে অত্যন্ত সহজে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। তাই 'ব্যাঘাত' আর তাঁর কাছে ব্যাঘাত ছিল না। শুধু তাই নয়, সেই ব্যাঘাতকে বরং তিনি আবার অনুকূল সুযোগের মত কাজেও লাগিয়েছেন। এর পিছনে যে তাঁর কত দীর্ঘকালের অভ্যস্ত গভীর আত্মসাধনার গোপন ইতিহাস অন্তর্নিহিত ছিল, সে কথা সহসা উপলব্ধি করা হয়ত আমাদের পক্ষে সহজ নয়।

(৫)

শরৎ কাল। অতি প্রত্যূষে গোয়ালপাড়ার রাস্তা থেকে বেড়িয়ে ফিরছি। তখনও আলো-অন্ধকারের ঝিকিমিকি ভেঙে রোদ ফুটে ওঠে নি, ভোরের হাওয়ায় আসন্ন শীতের মৃদু মধুর আভাস।

পথের পাশেই পড়ে কবির মাটির বাড়ী 'শ্যামলী'। ভাবলাম, একটা প্রণাম করে যাই। রাস্তার দুপাশে সারি সারি শিউলী ফুলের গাছ। টুপ টুপ করে অজস্র শিউলী ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে, যেন শিশুর স্নিগ্ধ একরাশ হাসি। কোমল গন্ধ ছড়িয়ে আছে পথে পথে।

'শ্যামলী'র কাছে গিয়ে ফটক খুলে ভিতরে ঢুকতে যাব, এমন সময় হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। 'শ্যামলী'র ছোট্ট আঙিনায় একটা চেয়ারে বসে আছেন ধ্যানমগ্ন কবি। মাথা ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, চোখের দৃষ্টি মুদিত, এক হাতের উপর আর এক হাত কোলে ন্যস্ত। সমস্ত মুখমণ্ডলে এক আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত জ্যোতি। মনে হল, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে যেন তিনি প্রভাতের মাধুর্য্যরস শুষে পান করে নিচ্ছেন। পূব আকাশে সবে মাত্র একটি নব-জাতক দিনের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে, ঘুমন্ত পৃথিবীর সদ্য-জাগা তন্দ্রালস দৃষ্টি, গাছের ডালে আবডালে পাখীদের কলধ্বনি। আমি দাঁড়িয়ে আছি চিত্রার্পিতের মত।

রবীন্দ্রনাথের অতি পুরাতন ভৃত্য 'বনমালী' হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে সম্ভাষণহাস্যে সাদর আহ্বান জানাল। আমি তাকে ইসারায় নীরব থাকতে ইঙ্গিত করলাম। যেন, একটি পরিপূর্ণ ধ্যানকে আগলে রয়েছি দাঁড়িয়ে, তার চারিদিককার শান্ত পরিমণ্ডলীর মৌনভঙ্গের ক্ষীণতম ব্যাঘাতকেও দূরে সরিয়ে রাখার কর্ত্তব্যভার আমার উপরে ন্যস্ত। কতক্ষণ এভাবে একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে নেই। এক সময় সেই ধ্যানমূর্ত্তিকে পিছনে রেখে, কিন্তু মনের নিভৃত কোণে সঞ্চয় করে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে চলে এলাম।

রবীন্দ্রনাথ অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করতে চিরাভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর আকাশের মিতা জেগেছেন, অথচ, তিনি জাগেন নি, এমন দুর্ঘটনা তাঁর জীবনে কোন দিন ঘটেছে কিনা সন্দেহ। পাখী যেমন রাত্রিশেষের বিলীয়মান অন্ধকারে ও আপন অশান্ত ডানার ব্যাকুলতায় পূর্ব্বাহ্নেই প্রভাতের আগমনীবার্ত্তা পেয়ে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, তিনিও তেমনি আগন্তুক দিবসের সূচনা সমগ্র চৈতন্যে অনুভব করে বেরিয়ে পড়তেন প্রাতর্ভ্রমণে। আশ্রমে যখন প্রথম গিয়েছি, তখন তাঁর চলৎশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তখনো দেখেছি, আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন রাস্তায়। তার পর চলাফেরা যখন কঠিন হয়ে পড়েছে, তখন খোলা আকাশের নীচে বাইরে এসে তিনি চুপটি করে বসে থাকতেন। এই সময় যখনই গিয়েছি তাঁর কাছে, মনে হয়েছে, একটি নতুন দিন এসেছে আমাদের পৃথিবীর আঙিনায়, সেই আনন্দসংবাদ যেন একমাত্র তিনিই সংগ্রহ করেছেন গোপনে এবং তারই নির্ম্মল মাধুর্য্যে তিনি প্রতি প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত করে রাখতেন নিজের সান্নিধ্য।

কিন্তু সেই এক শরৎপ্রাতে যে তাঁর এক অপূর্ব্ব আত্মসমাহিত মূর্ত্তি দেখেছিলাম, ধ্যানের প্রশান্তিতে স্থির, নিষ্কম্প, আনন্দে উজ্জ্বল এবং প্রভাতসূর্য্যের নীরব বন্দনাগানে মর্ম্মরিত গাছের পাতার মত সমস্ত সত্তাকে উদ্‌ঘাটিত করে রেখেছেন নবোৎসারিত আলোর পানে, সেই একটি বিশেষ দিনের চিত্র অন্য সমস্তকে অতিক্রম করে স্মৃতিকে আন্দোলিত করে রেখেছে চিরকালের মত।

কৃষি ও সংস্কৃতি

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অঘটনঘটনপটীয়সী কলা হইতেছে কৃষি। সকল আবিষ্কারের মধ্যে কৃষির আবিষ্কারই মানুষকে অসভ্য হইতে সুসভ্য করিয়াছে। তুষার-যুগের অবসানে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া মানুষের অনুকূল হইল, তখন মানুষ কৃষি আবিষ্কার করে এবং ঐ আবিষ্কারের ফলে তাহার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভাবে বদলাইয়া ফেলে। প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৬,০০০ বৎসর কালে দেখা গেল মিশর, মেসোপোটেমিয়া ও পঞ্জাবে মানুষ ছোট ছোট গ্রাম ও শহর নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে এবং কৃষিকার্য্যও প্রবর্ত্তন করিয়াছে। নীল নদ, ইউফ্রেটিস, টাইগ্রীস এবং সিন্ধু নদীর উপত্যকাভূমিতে নিয়মানুগত ঋতুপর্য্যায়, গ্রীষ্মাবসানে বর্ষণ এবং প্লাবন, পলিমাটির উর্ব্বরতা, জলসেচের সুবিধা এবং নানা প্রকার বন্য জন্তুর গৃহপালন,—সবই মানুষের কৃষি ও আদিম স্থায়ী বসবাসের সহায় হইয়াছিল। হয়ত ঠিক এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত না হইলে মানুষের প্রগতির বহু বিলম্ব ঘটিত, কারণ এই অঞ্চলেই অনেকগুলি বন্য জন্তুকে প্রথম বশ করা হয় এবং এই বশীকরণের ফলেই কৃষির উন্নতিসাধন। মানুষ যেখানে পশুর দ্বারা লাঙ্গল চালাইতে পারে নাই, সেখানে তাহার জীবনযাত্রা এখনও অনিশ্চিত রহিয়াছে।

রুশ বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি প্রধান কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন যেখানে মানুষের খাদ্যশস্যগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। একটি হইল আবিসিনিয়া যেখানে এমার গম, যব এবং কয়েকটি মটর ও পশুখাদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আর একটি অঞ্চল হইতেছে হিমালয় ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল। প্রথম অঞ্চল হইতে যে কৃষি উদ্ভূত হয় তাহা পরে মিশর-সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। দ্বিতীয় অঞ্চল হইতে উৎপন্ন কৃষি বেবিলন ও সিন্ধুদেশীয় সভ্যতার ভিত্তি গঠন করিয়াছিল। প্রমাণিত হইয়াছে যে খ্রীঃ পূঃ ৫,০০০ বৎসরের সময় এমার গম মিশরে উৎপন্ন হইত এবং তাহার ১,০০০ বৎসর পরে বেবিলন ও মিশর কৃষিলব্ধ গম, যব ও জোয়ারের উপর নির্ভর করিত। সৈন্ধব সভ্যতায়, খ্রীঃ পূঃ ৩,২৫০—২,৭৫০ গম ও যবের ব্যবহার ছিল। যে-যব মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া গিয়াছে তাহা মিশরের পুরাতন সমাধিগহ্বরে প্রাপ্ত যবের সমজাতীয়। যে-গম তখন ব্যবহৃত হইত তাহাও এখনকার পঞ্জাবে উৎপন্ন গমের এক বর্গীয়।

ধান্যের আদিম জন্মস্থান খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চলের নদীর উপত্যকাভূমি যেখানকার বার্ষিক প্লাবন ও বৃষ্টিবাহুল্য সিক্তভূমিতে উৎপন্ন ধান্য চাষের সুবিধা দিয়াছিল। ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ ৩,০০০ বৎসর কালে এবং চীনে খ্রীঃ পূঃ ২,০০০ বৎসর কালে ধান্য চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বৈদিক সভ্যতায় নানা প্রকার ধান্যের উল্লেখ রহিয়াছে। ঈজিয়ান সাগরের উত্তরে ইউরোপের আবহাওয়া ও মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে প্রতিকূল ছিল। অরণ্য ও জলাভূমির বিস্তারও বহুকাল কৃষি প্রবর্ত্তন অসম্ভব ঘটাইয়াছিল। এশিয়ায় কৃষি উদ্ভবের অনুমান দুই হাজার বৎসর পরে কৃষিকার্য্য ইউরোপে প্রবেশ করিল দুই পথ দিয়া—উত্তর-আফ্রিকা হইতে সমুদ্রপথে পশ্চিম-ইউরোপ এবং ডানিয়ুবের উপত্যকাভূমি দিয়া জার্ম্মানী ও বেলজিয়মে। ইউরোপীয় কৃষি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। বালকানের উত্তরে বন্য গম ও জোয়ার মিলে না।

কি ভাবে প্রথম চাষের প্রবর্ত্তন হয় তাহা অনেকটা

কল্পনাসাপেক্ষ। তুষার-যুগের অবসানে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং বনজঙ্গলের পরিবর্ত্তে ধূসর প্রান্তর ও মরুভূমি দেখা দিল সেই যুগে নদী-সৈকতে, জলাভূমিতে বা সমুদ্রতটে স্বচ্ছন্দ বনজাত নানা প্রকার ঘাসের বীজ সংগ্রহ করিতে করিতে কোন স্থানে বীজ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হয় এবং নদীপ্লাবনের ফলে উহা হইতে স্বতই অঙ্কুর উদ্গত হয়। কোথাও কোন গাছের তলায় বা কুটীরের পাশে সম্ভবতঃ কোন প্রাগৈতিহাসিক স্ত্রী যাহার শিকারী ভর্ত্তা খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়া ফিরিতে পারে নাই সে ঐ অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়া প্রথম কৃষির কল্পনা করিয়াছিল। বীজ ছড়াইলে কিছু পরে বৃষ্টিপাতে বা নদীপ্লাবনে শস্য উৎপন্ন হয়, এই পর্য্যবেক্ষণেই কৃষির প্রথম উদ্ভব এবং খুব সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকই বন্য ঘাস হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রথম বপন করিয়াছিল, নিজের ও শিশুগুলির অন্নসংস্থানের জন্য। বন্য ঘাসই শস্যের জনক। বন্য ঘাস হইতে দৈবাৎ-সঙ্ঘটিত নির্ব্বাচনের ফলে ক্রমশঃ শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বীজ বা ফসল দান করিল এবং মানুষের যত্ন ফসল রক্ষা ও বৃদ্ধিরও কারণ হইল। ইহারই নাম কৃষি।

নানা দিক্ হইতে কৃষিকর্ম্ম মানুষের মন ও সমাজকে রূপান্তরিত করিয়াছে। কৃষির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেও মানুষ আরও অনেক জিনিস আবিষ্কার করিয়াছিল সকলে মিলিয়া যাহাতে সত্য সত্যই মানব সভ্যতা নূতন ও উচ্চতর সোপানে উঠিল। কৃষি মানুষকে স্থাণু করিয়াছে। মানুষও স্থাণু হইয়া কৃষির উন্নতি সাধন করিয়াছে। কৃষি হইতে প্রথম আসিল প্রকৃতির নিকট দাসত্বমোচন, জীবন-যাত্রায় মানুষের আপেক্ষিক স্বাধীনতা। শিকারী মানুষের একসঙ্গে কয়েক শত মিলিয়া বসবাস অসম্ভব। বন্য জন্তুর অভাবে বা ভীতি সঞ্চারে তাহাদের খাদ্যের অকুলান ঘটিবেই। অথচ কৃষিতে হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে। লোকবহুল গ্রাম্যজীবনে অন্ন-সংস্থানের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নাই। মানব জাতির ইতিহাসে কৃষি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সংখ্যা প্রথম দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষি, লোকবহুলতা ও আবিষ্কার পরস্পরের সহায় হইয়াছিল। এই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমকালীন নানা প্রকার উদ্ভাবন ও আবিষ্কার একসঙ্গে এমন ভাবে হঠাৎ দেখা দিয়াছিল যাহা অভূতপূর্ব্ব এবং মানুষের উত্তর ইতিহাসেও যাহার তুলনা মিলে নাই।

শিকারী মানুষ লোকবৃদ্ধিজনিত বন্যজন্তুর সংখ্যা হ্রাস প্রতিকার করিতে না পারিয়া অসম্বদ্ধ ভাবে যে ঘুরিয়া বেড়াইত শুধু তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোভাব ও সমাজ-জীবন এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে সে স্থাণু ও মুষ্টিমেয় থাকিয়া শুধু বন্য জন্তু, মাছ, ফল, কন্দমূল খাইয়াই অনিশ্চিত জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিত। শিকারী দলের লোকসংখ্যা শিকার-অঞ্চলের বন্য সম্পদের দ্বারা মুখ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। কৃষির প্রবর্ত্তন হইলে লোকবৃদ্ধির অন্তরায় দূরীভূত হইল। অন্নসংস্থানের জন্য বন কাটিয়া নূতন জমি দখল করিয়া বীজ ছড়াইলেই হইল। লোকবৃদ্ধি ঘটিলে ক্ষেতের পরিশ্রমের লোকও বৃদ্ধি পায়। এমন কি শিকারী যাহার প্রধান ও দুর্ব্বহ বোঝা ছিল বালকবালিকারা, তাহারাও কোন না কোন উপায়ে কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে পারে। এই সকল কারণে যে-অঞ্চল পূর্ব্বে জনবিরল এমন কি জনশূন্য ছিল, সেগুলি কৃষি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বহুলোকসমাকীর্ণ জনপদে পরিণত হইল।

ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, এই আদিম কৃষকেরা যাহারা লোকবহুল গ্রাম ও নগরে প্রথম বাস করিতে আরম্ভ করিল তাহারা বিশ্বশক্তিকে আরাধনা করিল জনন ও বর্দ্ধনের প্রতীক রূপে। আদিম কৃষক-সভ্যতা ধরিত্রী, বিশ্ব-জননী অথবা আদ্যাশক্তির উপাসক। প্রজননের বহুবিধ প্রতীকের তাহারা কল্পনা করিয়াছিল। সিন্ধু-সভ্যতায় জননীর কল্পনায় তাঁহার জরায়ু হইতে একটি শাক উদ্ভূত হইয়াছে। লিঙ্গ ও যোনি পূজার প্রথম আবির্ভাব সম্ভবতঃ এইখানেই হইয়াছিল।

মানব জাতি যখন প্রথম অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং স্বচ্ছন্দ জীবন লাভ করিয়া খুব প্রজননশীল হয় এবং লোক-বহুল জনপদ কৃষির দ্বারা ভরণপোষণ করিতে আরম্ভ করে, তখনই বেবিলনে বা সিন্ধুতটে মানবের আদিম প্রজনন-কৌতূহল নানা প্রকার অদ্ভুত যৌনপূজা অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করে। এখনও আমাদের দেশে শিব ও শক্তি পূজা এবং লিঙ্গ ও যোনির প্রতীক পাথর বা নানাবিধ আকর্ষণক্ষম দ্রব্যের উপাসনা সেই পুরাতন রীতি ও প্রথার সাক্ষ্য দিতেছে।

কৃষিজনিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ব্যক্তি ও সমাজের রূপ বদলাইয়া দিল। লোকবাহুল্য ও বর্দ্ধন হইতে আসে মানুষের সমাজবিন্যাসের দৃঢ়তা। জলসেচ বা বনজঙ্গল কাটা, বাঁধ বাঁধা বা সঞ্চিত ভাণ্ডার রক্ষাকল্পে সমবেত উদ্যোগ হইতে রাষ্ট্র উদ্ভূত হইল। কখনও বা রাষ্ট্র আসিল স্থাণু, শান্তিপ্রিয় ও মিতব্যয় কৃষককে দুর্দ্দান্ত পশুপালক

জাতির অভিযান, অত্যাচার ও শোষণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিন্যাসে শ্রমবিভাগ বিচিত্র রূপ ধারণ করিল। পশুপালক-সমাজে দেখা যায় পালক, দোম্বা, তন্তুবায় প্রভৃতি যাহারা সকলেই গোষ্ঠীপতির অধীনে আপন আপন কাজ করে। কৃষিপ্রবর্তনের সঙ্গে শুধু যে কৃষিকাজে স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্ন কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা নহে, কৃষির সঙ্গে আসিল সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ক্ষেতমজুর এমন কি ক্রীতদাস। সমাজে বহুবিধ শ্রম ও শ্রেণী বিভাগের পত্তন হইল সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম কৃষকসমাজে।

কৃষিকার্য্যে যখন লাঙ্গল ব্যবহৃত হয় নাই, হরিণের শিং কিংবা বক্রাগ্র গাছের ডাল বা কোদালের কোন প্রাগৈতিহাসিক রূপ সড়কির দ্বারা যখন চাষ হইত তখন স্ত্রীলোকই উহার ভার লইয়াছিল। পরে লাঙ্গল যখন ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং লাঙ্গলের বলদ মানুষের শ্রমলাঘব করিল, তখন কৃষিকার্য্য পুরুষ আপনার হাতেই গ্রহণ করিল। সেই হইতে সভ্যতার ইতিহাসে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এখনও শিল্পবিপ্লবের যুগের ভিতর দিয়াও স্ত্রীজাতি সভ্যতার প্রাক্কালে যখন পুরুষ ছিল ভ্রাম্যমাণ শিকারী এবং সে আপনার কুটীরে বা কুটীরের পাশে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল বপন ও বয়ন, গৃহস্থালী ও যাবতীয় চারুশিল্পকলা, যে নৃত্যসঙ্গীত, ভোজন ও আমোদ-প্রমোদের ছিল কেন্দ্রস্বরূপ তাহার সেই প্রাগৈতিহাসিক সামাজিক সম্মান এখনও ফিরিয়া পায় নাই। বরং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মূলধন সঞ্চয় ও বৃদ্ধির ফলে যখন ধনিক, অবসরপ্রিয় বিলাসী শ্রেণী দেখা গেল, তখন হইতে স্ত্রী হইল জমির মত বিলাসের উপকরণ, ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী। ক্রীতদাস প্রথা ও স্ত্রী জাতির দাসত্ব দুই-ই কৃষক-সভ্যতার বিষময় পরিণতি।

তবুও কৃষি মানুষকে নানা দিক্ দিয়া মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিয়াছে। কৃষির প্রবর্তনের পূর্ব্বে মানুষ ছিল মুষ্টিমেয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরাধীন। প্রকৃতি বিরূপ হইলে সে পলাইয়া বাঁচিত। কয়েক পুরুষ ধরিয়া একই স্থানে পূর্ব্বকালে সে বসবাস করে নাই। কৃষি আনিল মানুষের অন্তরে সাহস, নিয়মানুবর্তিতা, পরিণামদর্শিতা এবং স্বগৃহ স্বপরিবার এবং স্বগ্রাম প্রীতি।

শিকারীর ও পশুপালকের জগৎ পরিবর্তনশীল অনিশ্চিত জগৎ। কৃষকের পরিবর্তনশীল জগতে আছে নিয়মের মর্য্যাদা। কৃষকের কল্পনায় প্রকৃতি নিদারুণ ও নিষ্ঠুর নহে বরং তাহারই স্নেহক্রোড়ে সে লালিত পালিত। সহিষ্ণুতা, স্থিতিশীলতা, রক্ষণশীলতা একটা পরস্পর-সম্বদ্ধ বিশাল নিয়ম ও সঙ্গতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সহজেই কৃষকের আসে। ইহাতে যে প্রকারে কৃষক প্রাচীন সভ্যতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং তাহাকে যুগপরম্পরাক্রমে উত্তরপুরুষদিগের নিকট ন্যস্ত করে এমন কেহ করিতে পারে নাই। কৃষক উত্তরাধিকারসূত্রে দান করিয়া যায় শুধু ভিটা ও জমি নহে, সে দান করে পারিবারিক নীতি, ধর্ম্ম ও সামাজিক সংস্কৃতি।

যে নীতি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি কৃষক-সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা কেন্দ্রীভূত হয় গৃহ ও পরিবারকে লইয়া। শিকারী মানুষ স্থায়ী, দৃঢ়সম্বদ্ধ পারিবারিক জীবন বিকাশ করিবার সুযোগ পায় নাই। বিচরণশীল ও জননশীল পশুপালের মধ্যে পশুপালক জাতিরা প্রায়ই হইয়াছে বহুবিবাহকারী এবং ধনকে বিচার ও পরিমাপ করিয়াছে বহু স্ত্রীর মাপকাঠিতে। মানুষের পারিবারিক জীবন প্রথম ঘন ও দৃঢ় সংসক্ত হয় কৃষক-সমাজে। কৃষিকার্য্যে যথাকালে ক্ষেতে অধিকতর পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্যক। আবালবৃদ্ধবনিতা সেই সময় একযোগে পরিশ্রম না করিলে যথোচিত ফসল লাভ অসম্ভব। এই সহযোগিতা হইতে আসিল একান্নবর্ত্তী পরিবারের ঐক্য, বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর অটুট সম্বন্ধ, পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি তর্পণ এবং উত্তরপুরুষের নিকট বাস্তুভিটা জমি ও সঞ্চিত ভাণ্ডার অর্পণ করিবার অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব। গৃহের অন্তরে এখন আসিল গৃহদেবতা ও প্রজ্জ্বলিত, সেবনীয় হোমকুণ্ড। উত্তর-ভারতে ভূমিয়া হইতেছেন বাস্তুদেবতা যাঁহার নিকট প্রতি সন্ধ্যায় কৃষকবধূ প্রদীপ জ্বালাইয়া আনে এবং প্রথম ফসল ও প্রথম গো-দোহনের দুধ অর্পণ করে। সেইরূপ ক্ষেতের ফসল ও পশুর রক্ষক হইতেছেন ক্ষেত্রপাল। তাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত সুপক্ব ফসল বিনষ্ট হইতে পারে ও মড়ক আসিয়া গ্রামে গ্রামে পশুপাল বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। কৃষক জাতির সংস্কৃতির স্তর-বিভাগ অনুসারে কোথাও বা দেবতা হইয়াছেন রক্ষাকালী বা মঙ্গলচণ্ডী। শরৎকালে যখন পক্ব শস্যের হরিৎ আভা কৃষকের মনোরঞ্জন করে এবং দিকে দিকে অতসীপুষ্প প্রস্ফুটিত, তখন আসন্ন সমৃদ্ধির আশায় ও প্রতীক্ষায় গ্রামে গ্রামে পূজিতা হন রক্ষা ও পালনকর্ত্রী হরিৎবর্ণা মহাদেবী। অমাবস্যার অন্ধকারে যখন প্রকৃতি নিগূঢ় রহস্যজালে ধরিত্রীকে আবৃত করিয়া দেয়, তখন কৃষক সেই পালনী দেবীকেই আরাধনা করে মহাকালীর মূর্তিতে- যিনি জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও প্রলয়ের সুনিয়মিত ছন্দে বিশ্বময় নিয়ত নৃত্য করিতেছেন। শ্রাবণের অপরাহ্ণ বেলায়

নীলনবমেঘোদ্গম যখন কৃষকের অন্তরে নবীন উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করে, যখন বিদ্যুৎ-শিখা ও মেঘগর্জ্জন কৃষক-বধূকে ব্যাকুল ও উন্মনা করিয়া দেয়, তখন গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ঝুলন-উৎসব। সকলের স্মৃতিপটে তখন পুনরায় অঙ্কিত হইয়া যায় যমুনাতটের প্রস্ফুটিত কদম্বতরুতলে রাখালরাজা ও গোপিনীগণের নিত্য অভিসার ও মিলন। আবার যখন বসন্তকালে অশোক ও পলাশ পুষ্প ও নবকিশলয়ের রক্তিম আভায় মাঠ ও বন প্রজ্জলিত এবং কৃষক-পরিবার বর্ষাকাল যাবৎ বিপুল পরিশ্রমের পর শ্রান্তি-বিনোদনের জন্য কিয়ৎকাল অবসরলাভ করিয়াছে তখন দোল-উৎসবে তাহারা সকলেই মাতোয়ারা হয়। প্রকৃতির যৌবনলীলা এবং শ্যামলা ধরণী ও অরণ্যের নবীনতার সহিত মাঠে ঘাটে শস্যশিহরণের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা তখন প্রকটিত হয়। মাঠে ঘাটে নদীতে পুষ্করিণীতে গৃহে গৃহপ্রাঙ্গণে বার মাসের বার পার্ব্বণে কৃষক বহুদেবতাকে উপাসনা করে। ধরিত্রী মাতা, গঙ্গা মাতা, সরযূ মাতা, যমুনাজী, গৌরীশঙ্কর গো মাতা, সিদ্ধিদাতা, মঙ্গলচণ্ডী, প্রত্যেকেই কৃষির কল্যাণ বিধান করেন। কোন্ দেবতা বা দেবী, কোন্ জড় বা শক্তি আরাধ্য তাহা নির্ভর করে লৌকিক সংস্কৃতির উপর। একই প্রথা একই উৎসব একই পূজা-অনুষ্ঠান সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসারে বিচিত্র ভাবে ব্যাখ্যাত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয় প্রত্যেক উৎসবের বিচিত্র প্রতীকোপাসনার মধ্য দিয়া।

কিন্তু কৃষক-পরিবারই উৎসব-পর্য্যায়ের প্রাণস্বরূপ। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকার নিয়মানুগত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুচক্রের পর্য্যায়ক্রমে কৃষকের নানাবিধ পূজা অনুষ্ঠান উৎসব বৎসরের পর বৎসর ফিরিয়া আসে এবং অনন্তকাল প্রবাহের সঙ্গে কৃষির শক্তি ও উদ্দেশ্যের একটা নিবিড় অক্ষুণ্ণ যোগ সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। ঋতুপর্য্যায় অনুসারে কৃষির কাজ বিচিত্র হয়। পরিশ্রম ও ফসল, কর্ম্ম ও ফলের একচক্র ঘুরিলে আবার নূতন চক্র আসে এবং এই চক্র-পরিবর্ত্তন অনাদি ও অনন্ত; গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্তের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমপর্য্যায়ের মত।

ইহাতে কৃষক হয় লোকাতীত নিয়ম, সুষমা ও সঙ্গতির বিশ্বাসী যাহাকে কখনও সে বলে অদৃষ্ট, কখনও বলে ঈশ্বরের ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, কখনও বলে অনাদি সত্য-ধর্ম্ম। কৃষক বহু দেবতার উপাসক হইয়াও, বহু শক্তির ও আধারের সেবা করিলেও সকল দেবতা ও সকল শক্তিকে এক বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বোত্তর নিয়মের মধ্যে তাঁহাদিগকে লীন করিয়াছে। ঐ নিয়মের সে নৈতিক ব্যাখান করিয়াছে কর্ম্মবাদে ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনের উপর যাহার প্রভাব বড় কম নহে।

কৃষক বুঝে গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষ একসঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। গাছপালা ও ফসলের নীরব কালচক্রানুযায়ী ক্রমাভিব্যক্তির মত মানুষও অনন্তকাল ধরিয়া জন্ম-পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্ম্মবাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জন্মান্তরবাদীর নিকট অদৃষ্ট একটা অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তি নয়, বরং জন্ম-পরিবর্ত্তনের মাপকাঠিতে পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের বিচার মানুষের অন্তরে দুর্ভাগ্যের সময় একটা ধৈর্য্য আনে ও সৌভাগ্যের সময় আনে ক্ষমা ও শান্তি। সব সময়ে পাপে ও পুণ্যে ব্যক্তি অনুভব করে নিজ কর্ত্তব্যের অপরিহার্য্য দায়িত্ব, বহুধাপ্রসারিত জীবনের অসীম গুরুত্ব। সেইরূপ সমাজ-জীবনেও অদৃষ্টবাদ আনিয়া দেয় প্রত্যেক সামাজিক স্তরে একটা সহিষ্ণুতা ও অক্ষুব্ধতা। শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে আসে অদৃষ্টবাদের প্রভাবের ফলে সামাজিক শান্তি ও সহযোগিতা। •

সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের পরিণতি ও প্রাচ্যে মিত্রশক্তিদের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুশদেশে প্রবলপ্রতাপ "জেনারেল শীত" দখল দিয়াছেন। গত মাসেই লিখিয়াছিলাম যে রুশদেশের যমতুল্য শীতদেবতার কাছে মানুষকে এখনও মাথা নীচু করিতেই হইবে। কার্য্যতঃ এখন দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মান সেনাকে পিছু হটিয়া উপযুক্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। উত্তর অংশে লেনিনগ্রাডের পথে তুষারময় যুদ্ধক্ষেত্রে শীত ঝঞ্ঝাবাতে অভ্যস্ত সোভিয়েট সেনাবাহিনী এখন চারিদিক হইতে জার্ম্মান দলকে আক্রমণ করিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় "ময়দানের লড়াই" প্রায় অসম্ভব, সুতরাং এক্ষেত্রে রুশদলেরই আধিপত্য হইবার কথা। মধ্যভাগের বিরাট্ জার্ম্মানবাহিনী এখন প্রায় অচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, যদি শীতের মধ্যেই রুশদলের শস্ত্র-বল বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে তাহাদেরও পিছু হটিতে হইবে। নিদান পক্ষে যেসব অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যদলের সংযোগসূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছিল—যথা, লেনিনগ্রাড-মস্কৌ—সেখানে পুনর্ব্বার সংযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিতে রুশদল সমর্থ হইবার কথা। দক্ষিণ অঞ্চলে বিচক্ষণ রণনায়ক টিমোশেঙ্কোর অধীনে সোভিয়েটবাহিনী ককেসসের ঘাঁটি নিরাময় করিয়া ডন্ ও ডোনেটস্ নদের অববাহিকাদ্বয় হইতে শত্রু বিতাড়নের কার্য্যে তৎপর হইয়া লাগিয়া আছে। এখানকার জার্ম্মান দলের অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের সহস্র মাইল ব্যাপী পথ এখন শীতের প্রকোপে বাধাবিঘ্নপূর্ণ এবং প্রচ্ছন্ন গেরিলা সৈন্যদলের আক্রমণে বিশেষভাবে উত্যক্ত।

এক কথায় এখন শীত-দেবতার প্রচণ্ড বাহুবেষ্টনে জার্ম্মান যন্ত্রযুদ্ধাস্ত্র ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ সময় মানুষের বাহুবল, ধৈর্য্য ও শৌর্য্যের পরীক্ষার অবকাশ। এরূপ অবস্থায় অসীম শৌর্য্য এবং অশেষ সহ্যগুণশালী সোভিয়েট সেনাদলের পৌরুষ জয়যুক্ত হইবার কথা। তবে এ জয়লাভ ক্ষণস্থায়ী এবং স্বল্পপরিসর হইবে কেন-না যে প্রতিকূল প্রাকৃতিক কারণে জার্ম্মানবাহিনী নিস্তেজ হইয়াছে তাহার প্রভাব রুশ দলের উপরেও বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং দ্রুত সৈন্য চালন বা ব্যাপক আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষেও দুরূহ এবং যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে যন্ত্র চালনা সম্ভব হইবে সেই ক্ষণেই রণকুশলী জার্ম্মান রণাধ্যক্ষগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধশকটের আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে ইহা নিশ্চিত। এই অবকাশে যদি সোভিয়েটের যুদ্ধশকট ও বিমান রথের ক্ষতিপূরণ যথাযথ ভাবে হয় তবেই রুশদল এই সুযোগে গৃহীত অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে। কেন-না এখন যেভাবে জার্ম্মান দল পিছু হটিতেছে এবং আক্রমণের পরিবর্ত্তে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইতেছে তাহার কারণ তাহাদের বলের অভাব বা রুশদলের বলের আধিক্য নহে, ইহা জার্ম্মান দলের সম্যক ভাবে বলপ্রয়োগে অক্ষমতা এবং এরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় অভিজ্ঞতর নিপুণ সোভিয়েট অধিনায়কবর্গের সুযোগ গ্রহণের ফল। যদি ইতিমধ্যে সোভিয়েট দল রণক্ষেত্রের প্রধান অভিযান-কেন্দ্রগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় তবে তাহাই যথেষ্ট; তাহার অধিক এরূপ সময় আশা করাও উচিত নহে। জার্ম্মান সেনানায়কগণ যুদ্ধে নিপুণ। তাহারা কোনও সাংঘাতিক ভুল না করিলে এক্ষেত্রে রুশদলের ব্যাপক বিজয়প্রাপ্তি সম্ভব নহে। তবে জার্ম্মানদলের অভিযান এখন লক্ষ্যভ্রষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই—এবং তাহার কারণ সোভিয়েট গণসেনার মরণবিজয়ী অদম্য শৌর্য্য—সুতরাং বিভিন্ন জার্ম্মানবাহিনীর নেতৃবর্গের মধ্যে মতভেদ হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। যদি তাহা ঘটে তবে রুশদলের বিশেষ সুযোগপ্রাপ্তি হইলেও হইতে পারে।

শীতের অবকাশে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ চেষ্টা এখন নিশ্চয়ই চলিতেছে। ইহাও যুদ্ধেরই অঙ্গবিশেষ। এই ব্যাপারে সোভিয়েট এখন বিশেষভাবে পরমুখাপেক্ষী। সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের সংক্রামণে ইহাতে কিছু বিঘ্ন হইবে সন্দেহ নাই। অন্য দিকে এখন মার্কিন দেশে যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণ-প্রচেষ্টা বহুগুণ বাড়িবে বলিয়া মনে হয় এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে মার্কিন জলপোতবাহিনী অতঃপর সম্পূর্ণ ভাবে প্রযুক্ত হইবে। সেই জন্য যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহে ভাঁটা পড়িলেও তাহা স্থায়ী হইবে না বোধ হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এখন সকল দিকেই সময়ের প্রবাহ ও আবহাওয়ার অবস্থার সহিত বিশেষভাবে জড়িত, এবং সেই জন্যই নানা দিকে মনুষ্য-প্রচেষ্টার অতীত। সুতরাং এখনকার ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া কোনও যুক্তির উত্থাপনা মূর্খতামাত্র।

* * * * *

যুদ্ধের দাবানল এশিয়া মহাদেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরে

জলিয়া উঠিয়াছে। এই বৎসরের গোড়ার দিকে লেখকের জনৈক বিশেষ বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, "অভি ক্যা হুয়া হ্যায়, ইয়ে লড়াই সারা সংসার ফইল যায় গা, কোইসি দেশ কোইসি কোম ইস্‌কে অসর্‌সে নহী বচ্ সক্‌তা। হম লোগোঁকো অওর ভি বহোৎ সারা কঠিনাই, বহোৎ ঝঞ্ঝট কা সামনা করনা পড়ে গা।" এই উক্তির প্রায় দুই মাস পরে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং এখন সমগ্র পৃথিবীতে দক্ষিণ-আমেরিকার কয়েকটি দেশ, সুইডেন, সুইৎজারল্যাণ্ড, পোর্ত্তুগাল, তুর্কি ও তিব্বত মাত্র যুদ্ধের বাহিরে রহিল। গত মহাযুদ্ধের পর "ব্যাপক ও স্থায়ী শান্তির প্রচেষ্টা" যেভাবে করা হইয়াছিল তাহার বিষময় বীজবপনের ফসল এখন জগতের অধিবাসিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে।

জাপান যে ভাবে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বহু দূর দূরান্তস্থিত দেশে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে সমরবিশারদ মাত্রেই বলিতেছেন যে ইহা সুচিন্তিত অভিযানের অংশ। কি ভাবে যুদ্ধচালনা পরে হইবে সে বিষয়ে কেহই মতামত প্রকাশ করেন নাই। জার্ম্মান অভিযানে সমরবিশারদগণ যে ভাবে বারম্বার হতভম্ব হইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের এরূপ স্বল্পভাষণ স্বাভাবিক মনে হয়। সাধারণ খবরে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে জাপানীগণ প্রথম মোহাড়ায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান শক্তিদ্বয়কে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাহাদের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূর্ণ হিসাব এখনও আসে নাই।

জাপান নৌবলে পৃথিবীতে তৃতীয় ছিল। তবে গত তিন চারি বৎসরের বলবৃদ্ধির হিসাব জাপানের বাহিরে কাহারও সঠিক জানা নাই। যদি ইতিমধ্যে তাহার নূতন তিনটি ৪০০০০ টন যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মিত হইয়া গিয়া থাকে তবে জাপান এখন বড় জাহাজের হিসাবে আমেরিকার প্রায় সমকক্ষ। অন্য দিকে বিমানপোতবাহী জাহাজের হিসাবে তাহার নূতন আয়োজনের কিছু শেষ হইয়া থাকিলে সে দিকে সে আমেরিকা অপেক্ষা বলশালী। ছোট জাহাজ (ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার) হিসাবে আমেরিকা গরিষ্ঠ। সকল দিক দিয়া হিসাব করিলে নৌবলে দুই শক্তিতে বিশেষ প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। বৃটিশ রণপোত বহরের সুদূর প্রাচ্যের অংশ কতটা বলশালী তাহা আমাদের জানা নাই এবং উচিত কারণেই তাহার প্রকাশ হয় নাই সুতরাং তাহার স্থিতি বিচার এখানে কর্ত্তব্য নহে। তবে সম্প্রতি দুইটি বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ নষ্ট হওয়ায় এবং হংকং, মানিলা ও সিঙ্গাপুর যুদ্ধের আবর্ত্তে আসায় এই দুই নৌবহর—অর্থাৎ বৃটিশ সুদূর প্রাচ্য ও আমেরিকান প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত বহরদ্বয়—সংযুক্ত অভিযান করার পথে বিশেষ অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং কিছুদিনের জন্য ফরমোসা হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত জাপানী নৌবহরের কিছু প্রাধান্য থাকা সম্ভব।

জাপানের এরোপ্লেনগুলি বৃটিশ বা আমেরিকান প্লেনগুলির সমকক্ষ নহে। তাহাদের গতিবেগ বা অগ্নিক্ষেপণ ক্ষমতা—অর্থাৎ যন্ত্রকামান বল—বৃটিশ বা আমেরিকান এরোপ্লেনের সমান নহে। বোমাবাহী প্লেন হিসাবেও বৃটিশ ও আমেরিকান প্লেন অধিক শক্তিশালী। জাপানের বিমানবাহিনী ৩০০০-৪০০০ বলিয়া বিশেষজ্ঞদিগের মত। যদি এই সংখ্যা ঠিক হয় তবে বিমান শক্তিতে জাপান এখনই আমেরিকার সমকক্ষ নহে। বৃটিশ বিমান শক্তি ইয়োরোপে ও ভূমধ্যসাগরে জড়িত, তবে তাহার কিছু অংশও যদি এদিকে আসে তবে জাপানের বিমান-শক্তির স্থিতি প্রবল থাকা সম্ভব নহে।

সেনাবলে জাপান শক্তিশালী। কিন্তু চীন দেশে ও মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে এই সৈন্যবলের প্রধান অংশ জড়িত। জাপানী সৈন্যের যুদ্ধক্ষমতা কি, তাহার প্রমাণ পাইবার কোনও বিশেষ সুযোগ ইতিপূর্ব্বে হয় নাই, কেন-না এতদিন ইহারা প্রায় নিরস্ত্র চীনাসৈন্যের সঙ্গেই লড়িয়াছে। সুশিক্ষিত ও সশস্ত্র সৈন্যের সঙ্গে বল-পরীক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

জাপানী বৈমানিকগণ বিগত কয় বৎসর নিরস্ত্র চীনের উপর অভ্যাস করিয়া লক্ষ্যভেদ ও এরোপ্লেন চালনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। সুতরাং সুশিক্ষিত ও সাহসী বোমাক্ষেপী বৈমানিক তাহাদের অনেক আছে। কিন্তু বিমান-যুদ্ধে জাপানীদের পরীক্ষা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। নৌযুদ্ধেও তাহাদের পরীক্ষা বহুকাল হয় নাই। এখন এ সকলই অজ্ঞাতসংজ্ঞার পর্য্যায়ভুক্ত।

বর্ত্তমান অভিযানে মানিলা ও সিঙ্গাপুর যেভাবে আক্রান্ত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে জাপানীদিগের প্রধান উদ্দেশ্য বৃটিশ ও আমেরিকান নৌবহরের অভিযান পথ রোধ করা। তাহার পর মনে হয় ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারত দ্বীপপুঞ্জ তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে। সেখানে এখনও কোন আক্রমণ হয় নাই বোধ হয় দুই কারণে। প্রথমতঃ মানিলায় ও সিঙ্গাপুরে মিত্রশক্তির সুদৃঢ় ঘাঁটি থাকিলে দ্বীপময়ভারতে জাপানী অভিযান অতি সঙ্কটপূর্ণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ এখনও আক্রমণপথ প্রকাশে জাপানী অধিনায়কগণের অনিচ্ছা।

চুংকিং আক্রমণকারী জাপানী বিমান-সৈন্য

বিমান-আক্রমণরোধকারী চীন-সেনানী (চুংকিং)

বিমান-বোমা নিষ্ক্রিয়কারী অসমসাহসী চীন-সেনা (চুংকিং)

বিমান-বোমা নিষ্ক্রিয়করণ

চুংকিং-আক্রমণকারী জাপানী বৈমানিক দল

নিজনি নভগরডে "সোভিয়েট প্রাসাদ'
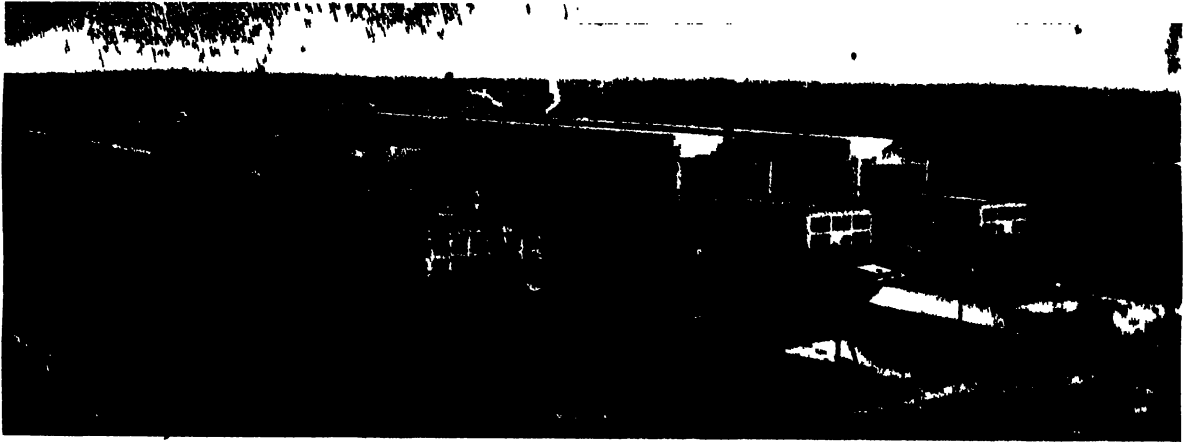
নিজনিস্থিত সোভিয়েট ট্যাঙ্ক-কারখানা
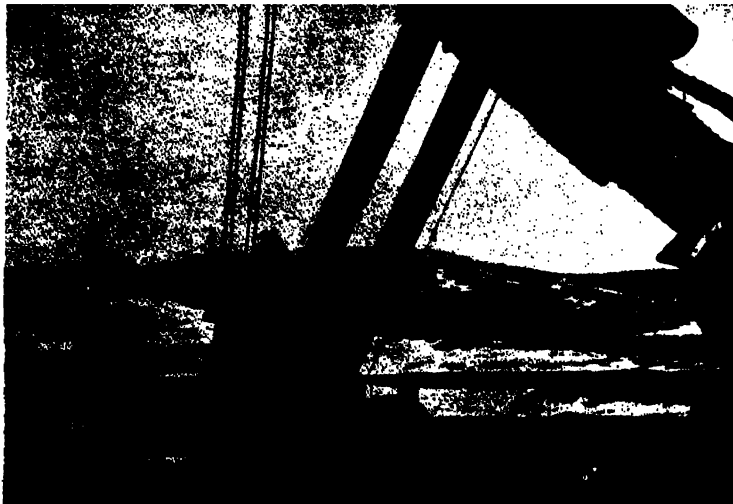
সোভিয়েট রুশিয়ায় ম্যাগ্নেটোগ্রস্থিত লৌহখনিজ আকর

"স্কী"চারী সোভিয়েট সেনাদল

ককেসসে আহত সৈন্যদিগের আরোগ্যশালা
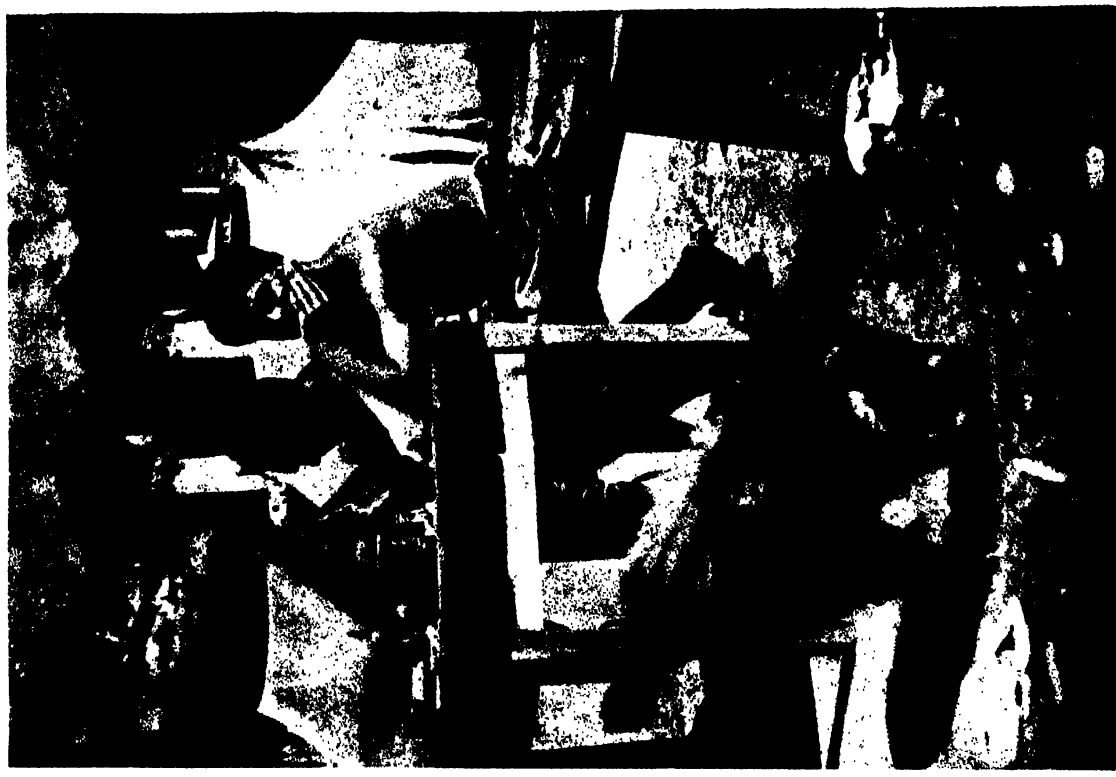
বঙ্গীয় শব্দকোষ। পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ অভিধানের ৮১তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ রাজস্থান্ ও শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫৭৬।

বঙ্গীয় মহাকোষ। পরলোকগত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এই মহাকোষ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি ইহার ২১শ সংখ্যা পাইয়াছি। তাহার শেষ শব্দ অন্ধকূপ হত্যা।

ড

ভারতের দেব-দেউল। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯৪১। পৃঃ ১/০+২৪৪+৪০ খানি চিত্র। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বাংলা দেশের সাধারণ নরনারী এবং ছাত্রগণের নিকট ভারতবর্ষের দেব-মন্দির ও ভাস্কর্য্যের সরল পরিচয় প্রদান করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার লেখক ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু নিজে যাহা দেখিয়াছেন তাহা না লিখিয়া বহু ভাল মন্দ বই হইতে বহুজনের মন্তব্য অথবা উক্তি নির্ব্বিচারে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের অধিকাংশ পূরণ করিয়াছেন। উক্তিগুলির স্থানে স্থানে ভুল আছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েরও অবতারণা করা হইয়াছে।

রসপিপাসু অথবা শিক্ষার্থী, কেহই ইহা পাঠ করিয়া লাভবান হইবেন না।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

প্রাণতত্ত্ব—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত "লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা"র পঞ্চম পুস্তিকা।

এই বইখানি হাতে পড়বামাত্র ভূমিকাটি পড়ে মনটা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল এবং একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্‌লাম। রসগোল্লাটা খেলেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু রসঋদ্ধ পুস্তক আগোপান্ত গলাধঃকরণ করলেও লুপ্ত হয় না। টেবিলের উপর পরিচিত মাধুর্য্যে বিরাজ করে, যত বার ইচ্ছে পুনশ্চ পড়া চলে এবং রসাস্বাদনের জন্যে অপরকে দেওয়া যেতে পারে। আলোচ্য পুস্তিকাটি পড়ে ভাল লেগেছে ব'লে প্রাণতত্ত্ববিৎ না হ'য়েও মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি না ক'রে থাকতে পারলাম না।

সব জ্ঞানের মূলেই কুতূহলী জিজ্ঞাসা। এই কৌতূহল যে পুস্তকে

উদ্দীপ্ত হয়, তার প্রশংসা বিশেষজ্ঞ না হয়েও করা যেতে পারে যদি সে বইখানি লেখনপদ্ধতি ও সংগৃহীত তথ্যসম্ভারে সাধারণ পাঠকের চিন্তাকর্ষক হয়। জড় ও জীব নিয়ে এই জগৎ। প্রাণবান্ জড় হচ্ছে জীব। সুতরাং এই প্রাণতত্ত্বে আমরা আত্মপরিচয় পাই বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী বিবরণে। ধারাবাহিক আটটি অধ্যায়ে প্রাণের লক্ষণ কি এই প্রশ্ন দিয়ে সুরু করে পর্য্যায়পরম্পরায় জীবকোষ, উদ্ভিদ্ ও জন্তুর দেহ-ক্রিয়াতত্ত্ব, প্রজনন, বংশানুক্রম, জীবসমাজ ও তার ক্রমবিবর্ত্তনের ধারার কথা লেখক অতি প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। শেষ অধ্যায়ে জীবরহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর পরীক্ষাসিদ্ধ আংশিক মীমাংসা এবং তাঁর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি কোথায় হালে পানি পায় না এই ইঙ্গিত ক'রে পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন।

প্রাণের লক্ষণ সাড়া। এই সাড়া জাগে জীবন্ত জড়ে। মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের যন্ত্রাগারে ব'সে তার পরিপ্রেক্ষিতের ধাক্কায় প্রতিনিয়তই যন্ত্রে যন্ত্রে উচ্চকিত হ'য়ে উঠছে অন্যান্য জীবের মত। কিন্তু তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, সে কেবল পরিস্থিতির তাড়নায় সাড়া দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নেই। সে তার চোখের সাড়াকে সূক্ষ্মতর করবার জন্যে অণুবীণ দূরবীণ প্রভৃতি যন্ত্রের উদ্ভাবনা করেছে। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাকে পাকে চক্রে ইন্দ্রিয়ের এলাকার মধ্যে এনে তার তথ্যসংগ্রহে যত্নবান্ হয়েছে। পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ ও যুক্তিবিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ-তৎপর সন্ধানী মানুষ। বিশ্বের সঙ্গে তার অন্তর্গূঢ় যোগটিকে নানা দিক থেকে নিবিড়তর করবার জন্যে প্রয়াসী। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা তাকে একদিন অতিমানবে উন্নীত করবে আত্মপ্রচেষ্টার কৃতিত্বে।

আমরা সজীব প্রাণী হয়েও বহুযুগ ধরে জড়ভাবাপন্ন হয়ে আছি! বিশ্বভারতী-প্রবর্তিত এই 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' তরুণদের প্রাণে নব-জীবনের সাড়া উদ্বুদ্ধ করুক্। সর্বান্তঃকরণে এই 'প্রাণতত্ত্ব' পুস্তিকার বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

দৃষ্টি-কোণ। জ্যোতির্ম্ময় রায়। কবিতাভবন। দাম দেড় টাকা।

চমৎকার ঝরঝরে রচনা। মননের রাজ্যে অবাধ সঞ্চরণের ভাষা; কখনো কথা উড়ো ভাবনায় রঙীন, কখনো রহস্যে ডুবুরি, কোথাও বা শক্ত ডাঙায় ভাবের বাহন। প্রবন্ধের ভাষাকে ইচ্ছামতো সর্ব্বচর হতে হয়; জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বইখানিতে সেই শক্তি দেখতে পাই। চলন এবং বলনের যুক্তবর্ণালায় তাঁর লেখা সমৃদ্ধ। অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় অথবা বল্বার ভঙ্গী রাসায়নিক অযৌগিক পদার্থের কথা স্মরণ করায় না, মসৃণ হয়ে মিশেছে। কতকগুলি রচনায় মনের অভিনিবেশ আছে, সেখানে তত্ত্ব অনুশীলনের সৌকর্য্য; চিন্তার প্রাধান্য। ভাষাও অনুষঙ্গী, অথচ সহজতা নষ্ট হয় নি। বইয়ের দ্বিতীয় অংশে, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রবন্ধে, ভাবের ঘনতা সার্থক হয়েছে। অন্য ভঙ্গীর রচনায় মনের চলন দেখাতেই আনন্দ। নানান্ ছন্দে বিচিত্র

বস্তুতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে কল্পনা—পাঠক সঙ্গ নিয়েই খুশি। কিন্তু খোলা চোখের কল্পনা ব'লে আলোচনার সুযোগও ঘটেছে পদে পদে; ছবি-দেখায় সঙ্গে কথা কয়ে যাওয়ায় বাধা নেই। কারো বাড়ির দরজায় মস্ত কুকুর বাঁধা, সেখান থেকে ফেরা গেল (কিছু মন্তব্য রেখে): রাস্তার বিবিধ চীৎকার, এখানেও বেশিখন নয়। ঘরে ফিরেও রেডিও, ট্রাম্ বাস্এর ঘড়ঘড়ানি; শহরে কানের উপর নিরন্তর অত্যাচার। (এইরূপ বাক্যৌষধি)। শব্দক্ষুধার এমন উৎকট প্রবণতা কেন মানুষের, বিশেষ ক'রে বাঙালি মনুষ্যের? মরণান্তে দেহের শেষ যাত্রাকালে বাহকদের অশোভন কণ্ঠের উগ্রতা কী প্রমাণ করে? বেসুরধর্ম্মী যুগে বাহাং ক'রে ঐটুকু পুরনো চীৎকারলালসা রক্ষিত হচ্চে, নির্লজ্জ হয়ে শোনো। তাছাড়া আছে রাত্রে পাহারাঅলার ঘুমতাড়ানো স্বরবিলাস, চোর পালায় কিনা জানা নেই। ইন্‌সম্‌নিয়ার উপর রচনাটি এই প্রসঙ্গে পড়া চাই। বাধ্য হয়ে সভ্যতার এই উপসর্গকে লেখক সম্মান জানিয়েচেন। নানা কথা জমে উঠেচে।

বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ, এবং যথার্থই চিত্রময়। পড়ে দেখবেন। হয়তো হাল্কা পাখাতেই আরো একটু গভীর চিন্তাকাশে ঘোরা চল্‌ত; তাতে লঘুতার রস কম্‌ত না, বাড়ত। দুচার জায়গায় মাত্রা ঠিক রক্ষা হয় নি। অপ্রয়োজনে ইংরেজি কথা ব্যবহার না করা ভালো। কৌতুক-প্রদ হলেও এ রকম সামান্য বাহুল্যই ক্লান্তিকর। কিন্তু এ যেন ছাপার ভুলের মতো পাঠকের মনে থাকে না, যদিও বলা চাই। বইখানি যথার্থ সাহিত্য হয়েচে; বাংলা প্রবন্ধের সঙ্কীর্ণ রাজ্যে এমনতর লেখা দুর্লভ। তার কারণ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর নিজস্ব দৃষ্টি আছে এবং দেখবার শক্তিও। বইয়ের নাম তাই পুরোপুরি সঙ্গত মনে হয়।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

আচার্য্য শঙ্কর যে এগারখানা উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন সেগুলিই প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাদের মধ্যে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য ছাড়া বাকী নয়খানাই এই প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে উপনিষদের মন্ত্রসকল, অন্বয় মুখে তাদের প্রতিশব্দের বাঙ্গালা অর্থ ও কঠিন শব্দসকলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং শেষে সরল বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে; তা ছাড়া দুরূহ মন্ত্রসকলের নীচে প্রাঞ্জল টীকা দেওয়া হইয়াছে এবং অনুরূপ মন্ত্রসকলের মূল ও সংখ্যার যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপনিষদের এইরূপ উৎকৃষ্ট সংস্করণ একখানাও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কি Dr. Roer প্রভৃতির প্রকাশিত সংস্করণ অপেক্ষাও এই পুস্তক উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হইবে। কারণ এই পুস্তকে সর্ব্বত্র আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের অনুসরণ করা হইয়াছে। এই পুস্তকের ভাষা সর্ব্বত্র বাহুল্য বর্জ্জিত; অনুবাদ নির্ভুল; ব্যাখ্যা ও টীকা মন্ত্রের আশয় সুপরিস্ফুট করিয়াছে, ঐগুলি সম্পাদক ও টীকাকারের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও

অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। ফলতঃ এই পুস্তকের সাহায্যে চিন্তাশীল পাঠক উপনিষদের রহস্য এবং শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্ম সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

শ্রীচৈতন্যদেব—মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ, পুরাণা পল্টন, রমণা, ঢাকা।

চৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনকাহিনী সুললিত ভাষায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মুদ্রণের পারিপাট্য এবং অগণিত চিত্র ও মানচিত্র ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। চৈতন্যভক্তগণ ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। আধুনিক যুগের সাধারণ পাঠকের নিকট ইহার দুইটি বিষয় কথঞ্চিৎ বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে। প্রথম—অযথা পরনিন্দা, দ্বিতীয়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের কার্য্যাবলীর অত্যধিক প্রচার-স্পৃহা। চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী সময়ে বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের যে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থার বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে তাহা পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। প্রাচীন অনেক গ্রন্থে এ জাতীয় পরনিন্দা প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া অর্থবাদ বলিয়া গণ্য করা হয়; স্বমতের গুণকীর্ত্তনই তাহার তাৎপর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের বিবরণকেও সেইভাবেই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বাংলা দেশে সুসাহিত্যের অভাব ছিল এবং 'সুসাহিত্যের এইরূপ দুর্ভিক্ষের দিনে…জয়দেব, গুণরাজ খান প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য সাহিত্যিকগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনী গীতি গান করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন' (পৃঃ ১১)—এরূপ উক্তি ঐতিহাসিক সমাজকে বিস্মিত করিবে। আবার, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনপ্রসঙ্গে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান একটু অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্য লইয়া বিদ্রূপের সুরে লেখা কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। গল্প ফাঁদিবার কৌশল আছে, লেখায় ঝাঁজ আছে এবং সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের মনে বেদনাও আছে। কোথাও কোথাও হাসি পাইতেছিল, সহসা সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় দেখিলাম, লেখক বলিয়াছেন, "ইহা পড়িয়া যদি বাঙালী পাঠক হাসে, তবে বুঝিব, বাঙালী পাঠককে আমি যাহা ভাবিয়া আসিতেছি, তাহাই—অর্থাৎ মূর্খ।" আর হাসিতে পারিলাম না। গ্রন্থের প্রথম গল্পে শ্রীকান্ত, শেষ গল্পেও শ্রীকান্ত, মধ্যে বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, সিন্ধবাদ, হিন্দবাদ প্রভৃতি অনেক লোকের আনাগোনা। শ্রীকান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নয়, অপ্রসন্ন হইয়াই লেখক পঞ্চম পর্ব্বে

পদার্পণ করিয়াছেন। শেষ গল্পে শরৎচন্দ্র-কৃত রোহিণী-চরিত্র সমালোচনাকে কটাক্ষ করিয়া তিনি রোহিণী ও সাবিত্রীর তুলনামূলক ছবি আঁকিয়াছেন। গল্পগুলি উপভোগ্য, ঝালে-নুনে মুখরোচক, ভাবিবার বিষয়ও ইহাদের মধ্যে অনেক আছে। কিন্তু বিক্ষোভ, বিরক্তি এবং উপহাস করিবার প্রলোভন কোন কোন গল্পের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। প্রথম গল্পটি নিতান্তই তরল বলিয়া মনে হইল। অমার্জ্জিত-রুচি পাঠকসমাজের প্রতি যাঁহার অবজ্ঞা, স্থূল পরিহাস বা অধীর চটুলতা তাঁহাকে শোভা পায় না। সূচিপত্রের অভাব, অনেকগুলি ছাপার ভুল এবং অতিরিক্ত মূল্য—বাহিরের দিক্ হইতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ত্রুটি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বৈকালী (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীকালিদাস রায়। রসচক্র সাহিত্য সংসদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সারস্বত মন্দির, ১ নং রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ২০০ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ১১২টি বিভিন্ন রকমের গীতিকবিতা আছে। অধিকাংশই দীর্ঘ ত্রিপদী এবং আয়ত পয়ারে লিখিত হইয়াছে। পরিচায়িকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ছন্দোবৈচিত্র্যে তাঁহার আর লোভ নাই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মনোহর বিষয়বস্তু ও আখ্যান লইয়া অভিনবভাবে কতিপয় কবিতা রচিত হইয়াছে। কতকগুলি কবিতা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিরূপক; যেমন,—অশোক। এই সব কবিতায় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে অলঙ্কার সজ্জিত হইয়াছে। আধুনিকগণ এগুলিকে মর্য্যাদা দিতে চাহেন না। বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের নানা চিত্র অঙ্কিত করিতে কবি কার্পণ্যবোধ করেন নাই। মায়ের কাঁকণ, দুর্লভ সন্ধ্যা, সাড়ে চার আনা, পল্লীজননী, কন্যাদায় প্রভৃতি কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বতত্ত্বের মূলসূত্র লইয়া অনেক ভারতীয় তথ্যকে সুন্দরভাবে ছন্দোবদ্ধ করা হইয়াছে, দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া কতিপয় কবিতা রচিত হইয়াছে—বেদ, বৈশ্বানর, আদিত্য প্রভৃতি কবিতার ভিতর উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রসোত্তীর্ণ কাব্যের নিদর্শন ও প্রাচুর্য্য আলোচ্য গ্রন্থে দেখা গেল; উপরন্তু বৈরাগ্যের সুর, বেদনার বাণী, আবেগের গভীরতা এবং ছাত্রজীবনের ও শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাস্তব চিত্র, প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত বর্ত্তমান সংস্কৃতির যোগাযোগ অনেকগুলি কবিতায় রহিয়াছে। শব্দচয়নে ও ব্যঞ্জনায় গ্রন্থকার কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বৈকালীর কবি একদিকে মিষ্টিক, অপর দিকে রিয়ালিষ্টিক। রচনার ভঙ্গী ক্লাসিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইলেও দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক। আধুনিক জগতের সঙ্গে কবি বাস্তবের সংযোগ ঘটাইয়া আলোচ্য গ্রন্থে যে সব কবিতা লিখিয়াছেন, সেগুলি পড়িয়াও তাঁহার সহৃদয়তা এবং দৃষ্টিভঙ্গিমার জন্য প্রশংসা করা যায়। প্রকৃতির সহিত মানব-মনের যোগাযোগ ঘটাইয়া যে সুর তিনি 'দিবাবসানে' 'গিরিভূমে' 'সন্ধ্যায়' 'আকাশপ্রদীপে' 'গিরিডিতে' 'প্রপাততটে' প্রভৃতি কবিতায় মূর্ত্ত

করিয়াছেন, তাহা হৃদয়রসে সিক্ত ও প্রাণস্পর্শী। শব্দ, রীতি, অলঙ্কার ও ব্যঞ্জনার বিচার করিতে গিয়া ত্রুটিবিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হইল না। 'বৈকালী' সাগ্রহে পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করা গেল এবং নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, কাব্যগ্রন্থখানি পাঠকপাঠিকাদের সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গীতা — ডাক্তার এ, গুপ্ত, এম-বি. বি-এস প্রণীত ও সিটি প্রিণ্টার্স ও পাবলিসার্স, ১৪২ ই. রসা রোড. কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গীতার সহজ বাংলায় পদ্যানুবাদ। যাঁহারা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ তাঁহাদের জন্য পুস্তকখানি মুখ্যতঃ লিখিত হইয়াছে। গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ইহাতে বেশ প্রস্ফুট হইয়াছে, কেবল এক স্থানে একটি শ্লোকের ভুল অনুবাদ চোখে পড়িল।

অষ্টম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ করা হইয়াছে, যথা—

'শুক্লগতি, কৃষ্ণগতি এই দুই পথ,
খ্যাতি যারা লভিয়াছে শত,
একের সহায়ে হয় মোক্ষের কারণ
অপর সংসারে পুনঃ, করে আবাহন।'

'জগতঃ শাশ্বতে মতে'র বাংলা অনুবাদ গ্রন্থকার করিয়াছেন 'চিরন্তন খ্যাতি যারা লভিয়াছে শত'। ইহা ঠিক হয় নাই। জগতের দুইটি গতি—শুক্লাগতি ও কৃষ্ণাগতি। সংসার অনাদি হওয়ায় এই মার্গদ্বয়ও 'শাশ্বত' অর্থাৎ অনাদি। অনুবাদ এইরূপ হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

(১) শ্রীশ্রীনাম রসায়ন। (২) পাগলের খেয়াল।

এই দুইখানি বইয়ের প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রবোধ দেবশর্ম্মা (চট্টোপাধ্যায়) এবং প্রাপ্তিস্থান (কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালয় ছাড়া) ডুমুরদহ, পোঃ নয়াসরাই, জেলা হুগলী। পৃষ্ঠাঙ্কও উভয় বইয়ের প্রায় সমান—যথাক্রমে ৯৪ ও ৯৯। মূল্য এক—।০ আট আনা মাত্র।

দ্বিতীয় বইখানির ভিতর গ্রন্থকারের জীবনের অনেক কথা পাওয়া যায়। মাইনর স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি মামার বাড়ী আসিয়া টোলে পড়িতে যান। পড়া হইত না। সুতরাং টোল ছাড়িয়া ১৬।১৭ বৎসর বাড়ীতে বসিয়া থাকেন। অনিবার্য্য রোগভোগ আর অভাবের তাড়না—বাঙ্গালী গৃহস্থের অকপট নিত্য সহচর—অবশ্যই ছিল। এই সব নানা কারণে তিনি আজন্ম সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তার পর একাধিক গুরুর সাহচর্য্যে এবং অনুগ্রহে এবং তাঁহাদের উপদেশ দ্বারা উপকৃত হইয়া তিনি এই বই দুইখানি লিখিয়াছেন।

প্রথমটিতে রাম-নামের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, সুতরাং উহা যথার্থনামা। দ্বিতীয়টিও বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও বলিবার ভঙ্গির জন্য একেবারে অযথার্থ-নামা নয়। প্রাচীন শাস্ত্রবচন, মোহমুদ্গরীয় ভাব ইত্যাদি দুই বইয়েতেই প্রচুর রহিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার দিকে গ্রন্থকারের অত্যধিক প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই জিনিষটি আরও একটু সংযত হইলে হয়ত বই দুইখানি ভালই হইত।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্ত্রী-স্বাধীনতা—শ্রীযদুনাথ দে তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

গ্রন্থকার স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। বহু তথ্য ও মতামত উদ্ধৃত করিয়া তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষময় ফল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার চিন্তাশীল। যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে লেখকের সহিত একমত নহেন তাঁহারাও পুস্তকখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য।—পুস্তক-পরিচয় বিভাগে যে-সকল বহির পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই পড়িবার অবসর ও সুযোগ আমার হয় না। "স্ত্রী-স্বাধীনতা" বহিখানিও আমি পড়ি নাই। বিষয়টি সম্বন্ধে আমার সাধারণ বক্তব্য এই যে, স্ত্রী-স্বাধীনতার "বিষময়" ফল যেমন কেহ কেহ লিখিয়াছেন, সেই রূপ উহার সুফলও বর্ণিত হওয়া উচিত। যে সকল দেশে ও ভারতবর্ষের যে-সকল প্রদেশে ও সম্প্রদায়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, তথাকার সমাজে নারীরা মানবসমাজের কল্যাণকর কি কি কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য কিরূপ, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত লিখিত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে ও অন্য কোন কোন দেশে যখন যেখানে কঠোর অবরোধ-প্রথা ছিল বা আছে, তাহার ফলে এবং তাহা সত্ত্বেও কি "বিষময়" ফল ফলিয়াছে, তাহাও বর্ণনার যোগ্য।

শেষে বক্তব্য "পুরুষ-স্বাধীনতা"র সুফল ও "বিষময়" ফলও বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইলে তবে স্বাধীনতা নরনারী উভয়ের পক্ষেই মোটের উপর ভাল কি মন্দ, তাহার অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার হইতে পারে। ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৮। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

—

ভ্রম-সংশোধন

গত (অগ্রহায়ণ) মাসের প্রবাসীতে "রবীন্দ্রনাথের কবিতাকণা"য় (পৃ. ১৪৫), "লুকায়ে আছেন যিনি জগতের মাঝে," এই পংক্তিটির শুদ্ধ পাঠ, "লুকায়ে আছেন যিনি জীবনের মাঝে"।

গত (অগ্রহায়ণ) মাসের প্রবাসীতে ২৩২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে ১৮শ পংক্তিতে "রবীন্দ্রনাথকে"র পরিবর্ত্তে "রথীন্দ্রনাথকে" হবে। —

চিত্র-পরিচয়

শ্রীরাগ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র-বর্ণিত ছয় রাগের তৃতীয় রাগ। শাস্ত্রে ইহার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়:—

"মালবী ত্রিবণী গৌরী গৌরা পূর্ব্বী তথৈব চ।
রাগিণ্যো রাগরাজস্য শ্রীরাগস্য বরাঙ্গনাঃ।"

সঙ্গীত-সারে আছে—

"এমনী টঙ্কী সংযুক্তা মালীগৌরা তথৈব চ।
নাগধ্বনী চৈতিকা চ শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ।" (২।৫)

দেশ-বিদেশের কথা

রাঁচি রামকৃষ্ণ-মিশনের যক্ষ্মা-স্বাস্থ্য-নিবাসস্থলী

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বামী সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও নরেন মহারাজের সৌজন্যে ২১শে সেপ্টেম্বর রাঁচি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আট মাইল দূরে গিরি উপত্যকার উপর হ্রদের পার্শ্বে যক্ষ্মা-স্বাস্থ্য-নিবাসস্থলী দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

সমস্ত স্থানটিকে অসংখ্য আমলকী, হরিতকী ও বহড়া প্রভৃতি বৃক্ষ চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া আছে। এখানে পরিচালন-বিভাগের গৃহ ব্যতীত চল্লিশটি রোগী থাকিবার উপযোগী দুইটি সাধারণ রোগী-নিবাস হইবে স্থির হইয়াছে। বারোটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আরও কুড়িটি রোগীকে রাখা হইবে। এক একটি রোগী থাকিবার জন্য এক একটি কুটীর বা

উত্তর দিক হইতে হ্রদের একটি দৃশ্য

কটেজ ১৪´×১৪´ ফুট পরিমিত রোগ শয্যাসহ ৩৬´×৩৬´ ফুট আয়তন বিশিষ্ট হইবে ও তাহাতে তিন পার্শ্বে বারান্দা, ভাঁড়ার ঘর, রন্ধন-গৃহ, স্নানাগার, মলমূত্রাগার, ও পরিচর্য্যকের থাকিবার নিদ্দিষ্ট ঘরও নির্ম্মিত হইবে। ৫০´×৫০´ ফুটের মধ্যে এইরূপ একএকটি বাড়ি নির্ম্মাণে ৩০০০ টাকা ব্যয় হইবে। কলিকাতা টালা ওয়াটার ওয়ার্কসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এস, কে, ঘোষ দুইটি রোগশয্যার উপযোগী একটি কুটীর নির্ম্মাণের জন্য ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই প্রকারের দান প্রত্যেক কুটীরের প্রবেশ পথে প্রস্তরফলকে লিখিত রহিবে এবং দাতার কোন প্রিয়জনের স্মৃতি রক্ষার্থে পরলোকগত আত্মীয় বা আত্মীয়ার নামানুসারে কটেজগুলির নামকরণ হইবে। আনুষঙ্গিক খরচের উপযোগী যথেষ্ট অর্থের তহবিল না থাকায় নির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

স্বাস্থ্য-নিবাসের পরিচালনা-বিভাগীয় অংশে রঞ্জন-রশ্মি-গৃহ, ভারপ্রাপ্ত-চিকিৎসকাগার, অভ্যাগতের অপেক্ষা-গৃহ, সম্পাদক ও হিসাব রক্ষকের আপিস, ঔষধাগার, শুশ্রূষাকারিণীদের গৃহ, অস্ত্রোপচার-গৃহ (Oporation Theatre) প্রভৃতি বহু কক্ষ হইবে। কেবল অস্ত্রোপচার-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মাত্র ৫০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। অসম্পূর্ণ গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে মোট দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক।
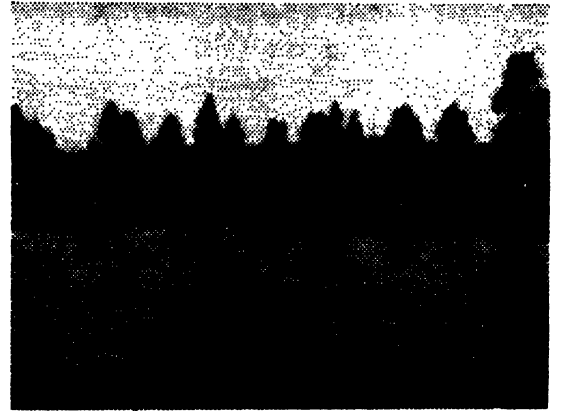
হ্রদের আর একটি দৃশ্য

পরিচালনা-বিভাগ হইতে দূরে কর্ম্মীদের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে থাকিয়া স্বামী সত্যানন্দ ও নরেন মহারাজ প্রভৃতি কয়েক জন কর্ম্মী বর্ত্তমান কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের অফুরন্ত কর্ম্ম-শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। স্বামী সত্যানন্দের মনেই এইরূপ একটি স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপনের অভিপ্রায় প্রথম উদিত হয়। তাঁহার উদ্যম ও আদর্শ রামকৃষ্ণ মিশনের—যাহা দুঃস্থের সেবাকেই ঈশ্বর লাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাঙ্গালোর দীপালি সম্মিলনীতে সমবেত প্রবাসী বাঙ্গালীগণ

বাঙ্গালোরে দীপালি সম্মিলনী

দীপালি সম্মিলনীর সম্পাদক আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

বাঙ্গালোরের বাঙ্গালীদের বাৎসরিক উৎসব "দীপালি-সম্মিলনী" অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও অনুষ্ঠিত হয়। গত ২রা কার্ত্তিক (ইং ১৯শে অক্টোবর ১৯৪১) স্থানীয় সমস্ত বাঙ্গালী এবং কোলার গোল্ড ফীল্ডস, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে শুভাকাঙ্ক্ষিগণ এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সম্মিলনীর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। অসুস্থতাবশতঃ এই বৎসর আচার্য্যদেব উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

সান্ধ্য-সম্মিলনীর প্রারম্ভে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। ইহার পর ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বৎসর ন্যূনাধিক অর্দ্ধশত বাঙ্গালী যুবক "এমার্জেন্সি কমিশন" প্রাপ্ত হইয়া ব্যাঙ্গালোরে শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইঁহাদের ভিতরে শ্রীপ্রিয়কুমার বসুঠাকুরের বাংলা গান, শ্রীদেবকুমার ঘোষের হিন্দী ভজন, শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায়ের গান, এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সেতার ও কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানের শ্রীঅজিত সেনের গিটারযোগে ইটালীয়ান ও স্প্যানিশ গান সকলে যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া কুমারী সুষমা গুহের গান, শ্রীমতী শেফালী মজুমদারের কীর্ত্তন, কুমারী পুষ্প গুহের নৃত্যকলা, কুমারী রাণী গুহ, কুমারী মায়া বসু ও কুমারী ছায়া বসুর নৃত্যসম্বলিত গীত এবং শ্রীমান্ রমেন ভট্টাচার্য্যের আবৃত্তি সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছিল।

ইহার পর স্থানীয় সায়েন্স ইনস্টিটিউটের বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা 'সরলরেখা' নাটিকাটি অভিনীত হয়।
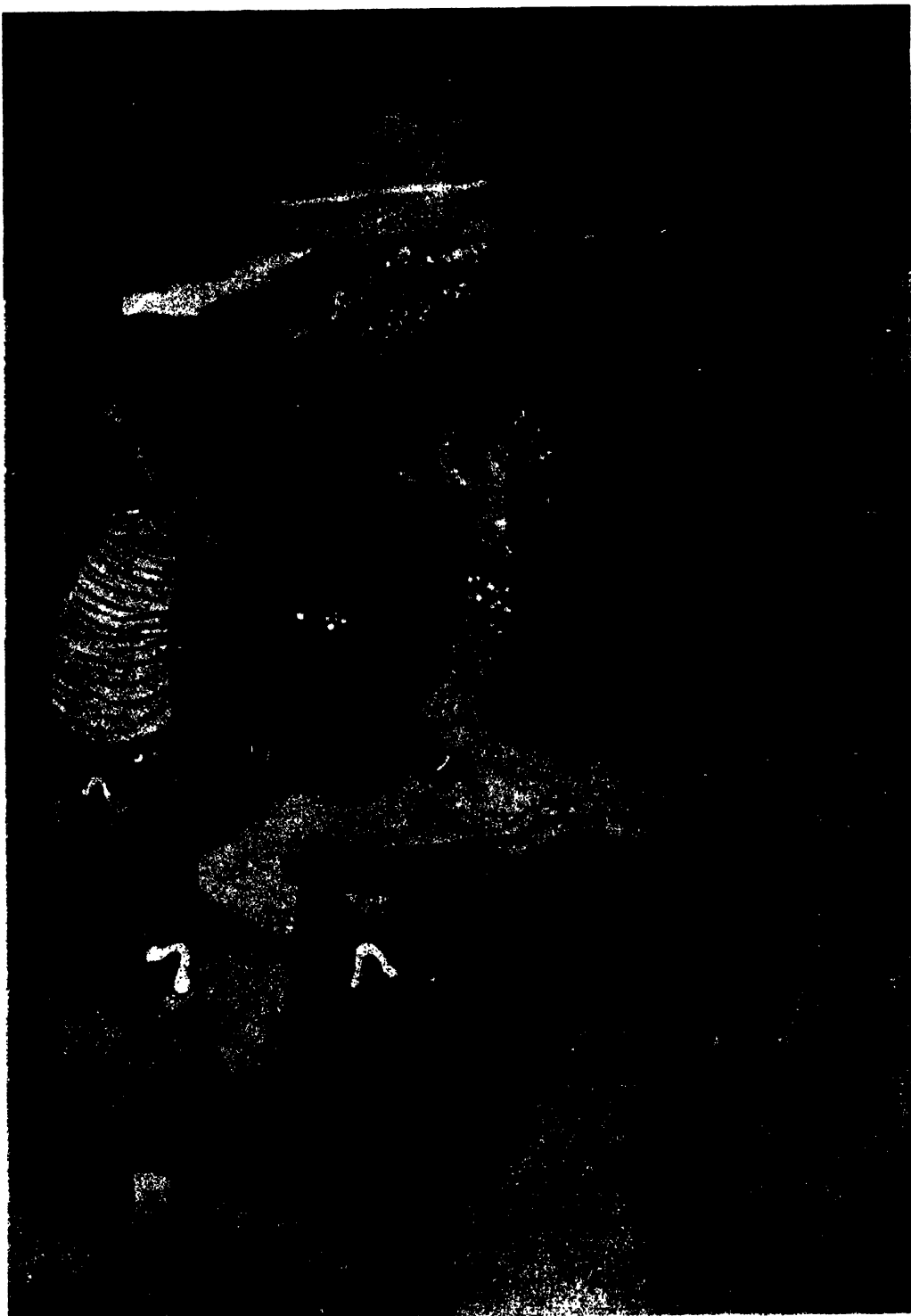
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাঁওতাল-জননী

শ্রীতারাপ্রসাদ বিশ্বাস
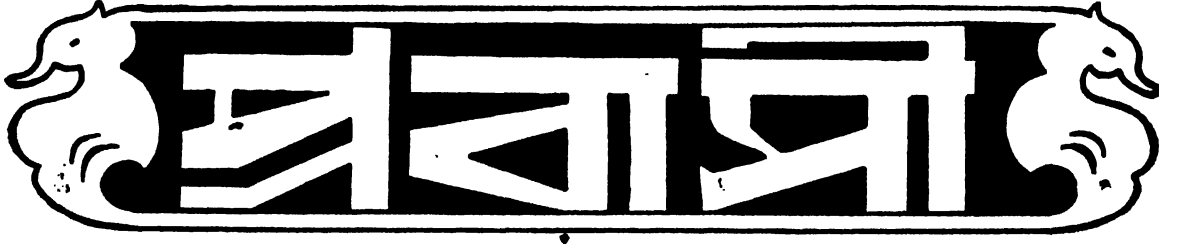
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪১শ ভাগ ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪৮ | ৪র্থ সংখ্যা

আশীর্ব্বাদ

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী,

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্ম্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কালস্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর,
দুঃখেরে স্বীকার করি ; অনিত্যের যত আবর্জ্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জ্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্ম্মে তব—উত্তিষ্ঠত নিবোধত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই আশীর্বাদটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—]

ওঁ

Glen Eden
Darjeeling

শ্রীমতী রমা কল্যাণীয়াসু,

যে আশীর্ব্বাদ তোমাকে পাঠালুম এখনি তার সম্পুর্ণ অর্থ বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি নেই, রইল তোমার কাছে। এর মধ্যে যে কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই, ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, এ'কে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় এ'কে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তাহলেই এই দান সার্থক হবে—নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য্য পেয়েও হারানো হবে। "উত্তিষ্ঠত নিবোধত" এই মন্ত্রের অর্থ এই—"ওঠো, জাগো।" জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধনা করতে হয়। ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশীর্ব্বাদ

[শ্রীমতী ইষিতা দেবী কল্যাণীয়াসু]

Glen Eden
Darjeeling

আলোর আশীর্ব্বাদ জাগিল
তোমার সকাল বেলায়,
ধরার আশীর্ব্বাদ লাগিল
তোমার সকল খেলায়।
বায়ুর আশীর্ব্বাদ বহিল
তোমার আয়ুর সনে,
কবির আশীর্ব্বাদ রহিল
তোমার বাক্যে মনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০ই জুন, ১৯৩৩।]

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীসীতা দেবী

৪

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসটায় রাজা পঞ্চম জর্জ কলিকাতায় আসাতে এখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। তাহার উপর কংগ্রেসের একটি অধিবেশন এবং থীষ্টিক কন্‌ফারেন্সের (একেশ্বরবাদীদের সম্মেলনের) অধিবেশন প্রভৃতিও হইয়া গেল। শুনিলাম শেষোক্ত কন্‌ফারেন্সে একদিন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বক্তৃতা দিবেন।

পুরাতন সিটিকলেজ গৃহে এই কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। এখন সেই বাড়ীটিতে সিটি স্কুল হয়। বাড়ীটি পুরাতন, নড়বড়ে গোছের, সিঁড়িটিও সঙ্কীর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন শুনিয়া সেদিন যে কি বিপুল জনতা হইয়াছিল তাহা, যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই মনে করিতে পারিবেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল যে জনতার ঠেলায় এইবার জীর্ণ বাড়ীটি ধরাশায়ী হইবে, এবং আমরাও জীবন্ত সমাধি লাভ করিব। ভাগ্যক্রমে সেই দিনই আবার শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুও সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্যও ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। সেই তাঁহাকে আমি প্রথম দেখিলাম। ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখন তিনি দেখিতে অনেকটাই অন্য রকম ছিলেন।

সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত উল্লাল রঘুনাথাইয়া নামে কেরল দেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মনেতা। ইহার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাঁহার চেহারাটি অতি অমায়িক ও ভদ্র, চোখের দৃষ্টিও স্নেহসিক্ত, বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার যেন মৈত্রীর সম্পর্ক।

জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কোলাহলও প্রায় সাগরের গর্জ্জনের মত শুনাইতে লাগিল। শুনিলাম কবি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন সপরিবারেই, কিন্তু ভক্তবৃন্দের ভীড় ঠেলিয়া উপরে আসিতে পারিতেছেন না। কিছু পরে প্রতিমা দেবী প্রভৃতি কয়েকজন কোনওমতে উপরে আসিয়া উঠিলেন। সভা হইতেছিল তিনতলার হলটিতে।

জনতার কোলাহল ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া অনুষ্ঠাতারা সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। প্রথমে একটি গান হইল, তাহার পর সভাপতি উঠিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনার ভিতরেই প্রচণ্ড করতালিধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে রবীন্দ্রনাথ ভীড় ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছেন। কখন করতালি দেওয়া চলে এবং কখন চলে না সে-বিষয়ে বাঙালী জনতা চিরকালই অজ্ঞ, ত্রিশ বৎসর আগেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভাপতির পাশে আসন গ্রহণ করিলেন, সভার কাজ আবার আরম্ভ হইল। বিদেশী কয়েকজন ভদ্রলোকের বক্তৃতার পর কবি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঘরের ভিতর তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শোনা গেল, বাহিরে তখনও পূর্ণ বিক্রমে গোলমাল চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা করিলেন। একটি গানের পর সভাভঙ্গ হইল। গান শেষ হইবামাত্র রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন। জনতার কোলাহল কোনোদিনই তিনি পছন্দ করিতেন না, তবে চিরদিনই তাহা সহ্য করিয়াছিলেন।

প্রতিমা দেবীর নিকট শুনিলাম যে বিলাত-যাত্রা মার্চ্চ মাসে হইবে বলিয়া কথা চলিতেছে, তবে রবীন্দ্রনাথ হয়ত একলাই যাইবেন। ভীড় এইবার কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই আমরা এবার নীচে নামিবার পথ পাইলাম। কবি দোতলার একটি ঘরে গিয়া বসিয়াছিলেন, পথ একেবারে সুগম না হইলে তিনি নামিবেন না শুনিলাম। সন্তোষবাবু প্রভৃতি শান্তিনিকেতনের অনেককেই দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। গাড়ী পাওয়া গেল না বলিয়া আমরা এক দল হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিলাম।

ইহার দুই-তিন দিন পরে রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা হাঁটিয়াই আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসও সেই সময় আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি কবিবরের সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনিলাম, মার্চ্চ মাসে তাঁহার যাওয়া একেবারে স্থির, passage পর্য্যন্ত book করা হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার সময়ও তিনি হাঁটিয়া যাইবারই

উপক্রম করিতেছিলেন; চারুচন্দ্র তাড়াতাড়ি সামনে যে গাড়ীখানা পাইলেন, তাহাই ভাড়া করিয়া আনিলেন। গাড়ীটির ছাদ অতি নীচু, কবি হাসিয়া বলিলেন, "দু-তিন পাট হ'য়ে কোনোমতে পৌছে যাব।" ইহার পরদিন তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

জানুয়ারী মাসে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইল। শুনিলাম মীরা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যেই নিমন্ত্রণ, তবে সেই দিনই তাঁহার জন্মদিন ছিল কিনা জানি না। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার পুত্রটিকেও দেখিলাম। অনেকগুলি মহিলাকে দেখিলাম, অধিকাংশই ঠাকুর-পরিবারভুক্তা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীকে দেখিলাম। তাঁহার সৌদামিনী নাম সার্থক ছিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী টাউনহলে বিরাট সভায় কবি-সম্বর্দ্ধনা হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনের আট মাস পরে এই সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল।

সেদিন আবার মাঘোৎসবের উদ্যান-সম্মিলনের দিন। দুই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া সারাদিনটাই হুড়াহুড়ির ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। ভয় ছিল পাছে টাউনহলে গিয়া ভাল জায়গা না পাই। টাউনহলে পৌছিয়া দেখিলাম সৌভাগ্যক্রমে ভাল জায়গা তখনও অনেক খালি রহিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে মেয়েদের হাত দিয়া কবিকে পুষ্পঅর্ঘ্য প্রদান করা হইবে। পৌছিয়া শুনিলাম ফুলও আসিয়া পৌছিয়াছে। ফুলের গুচ্ছ হাতে করিয়াই আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একটি সাঁচ্চা জরির স্তবকের মালা দেওয়া হইবে, তাহার পর মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, তাহার পর পুরুষরা, এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আমরা গিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনও সভাস্থলে আসিয়া পৌছান নাই। জনতা কখনও নীরব থাকিতে পারে না, এক-একজন করিয়া সুবিখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাব হয় আর করতালির মহাঘটা পড়িয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি এই প্রকার করতালির ভিতর দিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। গোখলে মহাশয়কে কলিকাতা-বাসী অনেকেই দেখেন নাই, তাই তাঁহার প্রবেশের সময় মহা ঠেলাঠেলি লাগিয়া গিয়াছিল।

বিরাট্ টাউনহল যখন করতালির শব্দে টলিতে আরম্ভ করিল, তখন বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে বিষম ভীড়, মঞ্চের উপর আসিয়া না-বসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে এক রকম দেখিতেই পাওয়া গেল না। তাহার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল ঐকতান বাদ্যের দ্বারা। তখনও এত কোলাহল চলিতেছে যে অতগুলি বাজনার শব্দ তাহার ভিতরে ডুবিয়াই গেল। সভাপতি হইয়াছিলেন সারদাচরণ মিত্র মহাশয়। তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, তখন সভাস্থ লোকেরা একটু স্থির হইলেন। তিনি বিদেশী অনেক কবির উদাহরণ দিয়া বলিলেন, কবিদের সম্মান নিজেদের দেশে প্রায়ই হয় না। রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহারা নিজেদেরই সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

অতঃপর পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য্য সংস্কৃতে স্বস্তি-বাচন করিলেন। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হইল, তাহা পাঠ করিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। রচনাটিও তাঁহারই। তাঁহার সেই আনন্দ-বিকশিত মুখ এখনও মনে পড়ে। কেমন জলদগম্ভীরস্বরে "কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন," বলিয়া শেষ করিলেন, তাহা এখনও কানে বাজিতেছে। কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগ্‌চী রচিত একটি গান, তাহার প্রথম লাইন, "বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভামাঝে," এই সভায় গীত হইল গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও একটি অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। সকলেই কবির শতায়ুঃ কামনা করিলেন। কিন্তু মানুষের কামনা চিরকালই বিধাতার বিধানের কাছে হার মানে তাহা ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যের সুন্দর উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ভিতর একটি সোনার পদ্মফুল ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর কবিকে জরির স্তবকের মালা পরাইয়া এই ফুলটি উপহার দিলেন। সভার লোকেরা উপহারগুলি দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হস্তিদন্তের ফলকে উৎকীর্ণ অভিনন্দনটি একবার উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি বহু বৎসর পূর্ব্বে বাল্মীকি-প্রতিভা নাটক অভিনয় দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেইটি এতকাল পরে তিনি পড়িয়া শুনাইলেন এবং কবিকে উপহার দিলেন। কবিতাটি এই—

> উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
> অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হের।
> উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
> নব বাল্মীকি-প্রতিভা দেখাইতে পুনর্ব্বার।

হের তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
"মণিময় ধূলিরাশি" খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিলেন। তিনি নিজেকে উপলক্ষ্যমাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া সেদিনকার সভায় প্রাপ্ত সকল সম্মান ও আদর জননীবাণী ও দেশের দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ইহার পরে ডাক পড়িল মেয়েদের পুষ্প-অর্ঘ্য দিবার জন্য। অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা রাস্তা পরিষ্কার হইল এবং বালিকারা সকলে অগ্রসর হইয়া গেলাম। দুই-চারিজন মহিলাও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প উপহার গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহাদের পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এইখানে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। তিনি লোকের ভীড়ে কিছুতেই অগ্রসর হইতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সামনে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তিনিও কবির হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। সঙ্গীত ও ঐকতান-বাদ্যের পর সভাভঙ্গ হইল। প্রবল জয়ধ্বনির ভিতর রবীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ী আগাগোড়া ফুলে সজ্জিত করা হইল। টাউনহলের একদিকে রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফের ছোট একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, তাহাও গিয়া দেখিয়া আসিলাম।

জনতা যেমন বন্যাস্রোতের মত আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়াও গেল। অল্পক্ষণের ভিতরেই আমরা বাহির হইতে পারিলাম, এবং ট্রামে করিয়াই বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাইলাম। আমাদের দোতলার ঘরে আসিয়া বসিয়া আগের দিনের সভার অনেক গল্প তিনি করিয়া গেলেন। ভীড়ে আমাদের কোনও কষ্ট হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাপতি মহাশয় বড় তাড়াতাড়ি সব চুকাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন, সেই কথার প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার ইচ্ছে ছিল দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলি, কিন্তু যে President, আমাকে যেন একেবারে engine-এ জুতে দিয়েছিলেন, এক মিনিটও কোথাও দাঁড়াতে দিলেন না। কোনোরকমে টেনে বের ক'রে দিলেন।"

ইয়ুরোপে গিয়া কিছুকাল নরওয়েতে বাস করিবেন বলিলেন। তাঁহার এক বন্ধু নাকি তাঁহাকে Land of the Midnight Sun দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাবাকেও আমাদের লইয়া বিলাত যাইতে বলিলেন। পরদিন তাঁহাদের বাড়ীতে বাবাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের বলিলেন, "তোমাদের নিমন্ত্রণ রহিল পরিবেষণ করবার।" আমাদের কি একটা কারণে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ঘটিয়া উঠিল না।

এই বৎসর ১১ই মাঘ রাত্রে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য হইবেন শুনিয়াছিলাম। ভাল জায়গা পাইবার লোভে অনেক আগে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদেরও আগে অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। অত বড় দালান, উপরের চারিপাশ ঘোরানো বারান্দা সব লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। পরিচিত লোক প্রচুর দেখিলাম। আমাদের স্কুলের দুই-তিনজন খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীকে সেখানে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা মনে আছে। তখন অল্প বয়সের বুদ্ধিহীনতায় বুঝিতে পারিতাম না যে রবীন্দ্রনাথ কোনও বিশেষ সমাজের সম্পত্তি নহেন।

ঠাকুরদালানটি বড়ই সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। উপরে প্রথমে চন্দ্রাতপ ছিল, পরে তাহা সরাইয়া দেওয়া হইল। মেয়েরা যেদিকে বসিয়াছিলেন, তাহার সামনাসামনি উপাসনার স্থান, গানের ব্যবস্থাও সেইখানে। অনেকগুলি বিপুল বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব হইল, গায়করাও আসিয়া বসিলেন। গম্ভীর মধুর মন্দ্রে পূজার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে উপাচার্য্যরূপে আসিয়া বসিলেন শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও উপদেশের ভার লইয়াছিলেন, স্বাধ্যায়ের ভার ছিল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর। উপদেশের পরে দু-লাইন গান গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ করিলেন। গানগুলি যদিও অনেক নামকরা ওস্তাদরা গাহিলেন, তবু শুনিতে কিছু ভাল লাগিল না। রবীন্দ্রনাথ পিছন ফিরিয়া অনেক বার গানের সুর ও তাল সংশোধন করিয়া দিলেন, তাহাতেও সুবিধা হয় না দেখিয়া নিজেই গায়কদের সঙ্গে গান ধরিয়া দিলেন। "জীবন যখন শুখায়ে যায় করুণাধারায় এস", এই গানটি প্রথম শুনিলাম সেই দিন, আর শুনিলাম "জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।" এই মহাসঙ্গীতটি কয়দিন আগেই রচিত হইয়াছিল।

উপাসনার পর কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়াইয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম। বাহির হইবার পথ আর কিছুতেই পাই না, এত লোকের ভীড়। অবশেষে উপরে উঠিয়া গেলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তখনও ১১ই মাঘ রাত্রে বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো হইত। অনুরোধে পড়িয়া কিছু জলযোগও করিতে হইল। পাশের ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কয়েকজন ভদ্রলোকের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন দেখিলাম, এতগুলি মেয়েকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রশান্তচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা কে?" পরিচয় পাইয়া সস্মিত মুখে দুই-চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

১২ই মাঘ রাত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করিলেন। এখানেও এত অধিক জনসমাগম হইল যে উদ্যোক্তারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কবিকে হলের ভিতরে আনা ও বাহির করিয়া লইয়া যাওয়াও এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বক্তৃতান্তে কোনও মতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া গিয়া তিনি কিছুক্ষণ মহলানবীশ মহাশয়ের বাড়ীতে বসিলেন। সেখানেও অবিলম্বে ভীড় জমিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া, কন্যা ও পুত্রবধূকে লইয়া অল্পক্ষণ পরেই বাড়ী চলিয়া গেলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। সেদিন একলাই আসিয়াছিলেন। বাবা কি কারণে নীচে আটকাইয়া পড়িলেন, কবি উপরে আসিয়া আমাদের সঙ্গেই গল্প করিতে লাগিলেন। পাড়ার আর দুই-চারিটি মেয়েও আসিয়া জুটিল। আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক আসিয়া খানিকক্ষণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিষয় তাঁহার সঙ্গে গল্প করিয়া গেলেন। দিদির তখন আই-এ পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহারই উল্লেখ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "শান্তা পরীক্ষার চোটে শুকিয়ে গেছে।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ। আমি কিন্তু ঐ পরীক্ষা জিনিষটার থেকে খুব উৎরে গিয়েছি, যদি পুনর্জন্ম থাকে তাহলে হয়ত আমার কাছ থেকে সুদ শুদ্ধ আদায় করে নেবে।"

বিলাত-যাত্রার গল্প আজও হইল। প্রথমে হয়ত তিনি ফ্রান্স যাইবেন বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম কতদিন তিনি ইউরোপে থাকিবেন। বলিলেন, "কি জানি, এক বৎসর প্রায় হবে বোধ হয়। যদি গিয়ে দেখি যে ভাল লাগছে না, তাহলে হয়ত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। শেষ যেবারে গিয়েছিলুম, সেবার আমার term ফুরাবার আগেই চলে এসেছিলুম। তবে এবার বয়স ঢের বেশী হয়েছে, একটু স্থির হয়ে বসে দেখার ইচ্ছে হতে পারে।"

জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিখানি আমি নকল করিয়া প্রেসে দিতাম, যাহাতে আসল লেখাটি পরিষ্কার থাকে। চৈত্র মাসের কিস্তি নকল হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম "হ্যাঁ।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটাতে কি হয়েছে? আমি বিলেত গিয়েছি?" বলিয়া হাসিয়া বলিলেন "এবারেও চৈত্রে বিলেত যাচ্ছি। বিলেতের চিঠি দেখতে পাবে তোমরা, যদি অবশ্য চিঠি লিখি।" জীবনস্মৃতি আরও খানিকদূর লিখিবার জন্য অনুরোধ করায় বলিলেন, "বিদ্যালয়ের ছাত্র আর অধ্যাপকদের কাছে মুখে মুখে আরও খানিকটা বলেছিলুম, সন্তোষ সেটার নোট্‌ রেখেছিল, যদি তার থেকে সহজে লিখবার কোনো material পাই, তাহ'লে আবার লিখতে পারি।"

ইহার মধ্যে একটি বালিকার নিকট হইতে গান গাহিবার অনুরোধ আসিল। অনুরোধ রক্ষা না করা তখন তাঁহার স্বভাবেই ছিল না। যদিও বালিকার দিকে ফিরিয়া একবার বলিলেন, "আমি কি আর এখন গাইতে পারি গো?" তবু একটি গান গাহিয়া শুনাইয়াও দিলেন। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে," এই গানটি গাহিলেন। গান শেষ করিয়া বলিলেন, "একবার জগদীশের বাড়ী ঘুরে আসি।" বলিয়া নামিয়া নীচে চলিলেন। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, আমি লণ্ঠন হাতে করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিলাম। সদর দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "এবারে আমাকে আলোটা দাও।" তাঁহাকে অবশ্য দিলাম না, দাদার হাতে আলো দিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তাঁহার বিলাত যাত্রা উপলক্ষ্যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্তের দল বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় করিয়া কবিকে দেখাইলেন। শুনিলাম তাহা খুব ভাল হইয়াছিল। দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। মেয়েরাও একদল "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য তিনি শিলাইদহ চলিয়া গে । ফিরিয়া আসিলেন মার্চ্চ মাসের প্রথম দিকে।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে তাঁহাকে দিয়া একদিন উপাসনা করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন, তাঁহার নিকটেই এ খবরটা পাইলাম। Mr. Myron Phelps নামক এক আমেরিকান ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে

গল্প করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার গল্পও কিছু শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে ভদ্রলোক নিজে কোনো কথাত বললেই না, তার উপর আমি যা কিছু বললুম, তা নোট বুকে টুকে নিলে। আমার সমস্ত কথা যখন ফুরিয়ে গেল, তখন আমি হতাশ হয়ে চুপ করে রইলুম, ভাবলুম দেখি এখনও কিছু বলে কি না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে কথা বললেই না, শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ত তখন বাঁচলুম। বাস্তবিক এক তরফা conversation-এর মত কষ্টকর আর আমার কাছে কিছু লাগে না।" এ কষ্ট তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে যাঁহারা যাইতেন, তাঁহাদের ভিতর অধিকাংশই তাঁহার কথা শুনিতেই যাইতেন, নিজেরা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহিতেন না।

ইহার মধ্যে একদিন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি বলিয়াছেন, "আমিও পিতামহের মত ঐখানেই থেকে যাব।" শ্রোতারা একথা শুনিয়া প্রচণ্ড আপত্তি করাতে তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, "না না, ফিরেই আসব, এখনও আমার এখানে অনেক কাজ বাকি আছে।"

ইহার পরেও যে প্রায় ত্রিশ বৎসর আমাদের মধ্যে ছিলেন, সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি লইয়াই আমাদের এই হতভাগ্য দেশকে যুগযুগান্তর কাটাইতে হইবে। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে এমন কাহাকেও বিধাতা আর পৃথিবীতে পাঠাইবেন কি? আশা হয় না।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে উপাসনা করা বোধ হয় সেবার সম্ভব হইল না। ১৫ই মার্চ্চ সেখানে একটি আলোচনা সভা হইল। বাবা সভাপতি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান বক্তা। এই সভাটি ছাত্র সমাজের উদ্যোগে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিলেই যে বিপুল জনতা উপস্থিত হইত, তাহা আলোচনা অসম্ভব করিয়া তুলিত। সুতরাং এই সভার কোন বিজ্ঞাপন বাহিরে দেওয়া হয় নাই। তবু যখন সভাস্থলে গেলাম, তখন হল পূর্ণ ই দেখিলাম। অবশ্য গেট্ ভাঙা বা জানালা ডিঙাইয়া ভিতরে ঢোকা, এগুলি আর এবার দেখিতে হইল না। সভার আরম্ভে আমাদের পাড়ারই এক তরুণী গান গাহিলেন। রবীন্দ্রনাথের সামনে গান গাহিতে হইবে শুনিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং অর্গ্যানের শব্দই আমরা শুনিলাম, গান আর কিছু কানে আসিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ছোট একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহার পর আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুত হীরালাল হালদার, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি প্রবীণ ভদ্রলোক কয়েকজন কিছু কিছু বলিবার পর ছাত্রসমাজের তৎকালীন সভ্যরাও দুই-তিন জন বলিবার চেষ্টা করিলেন। ফল যাহা হইল তাহাতে মনে হয় ভাল করিয়া প্রস্তুত না হইয়া এ চেষ্টাটা তাঁহারা না করিলেই পারিতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনেক জায়গায় হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, দেখিলাম। ৯টা বাজিয়া যাইবার পর বাবা আলোচনা থামাইয়া দিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিতে উঠিলেন। খুব মৃদু কণ্ঠে কথা বলিলেন, পিছনের অনেকে শুনিতে পাইল না। ৯॥ টার পর তিনি সভা ত্যাগ করিলেন।

১৬ই মার্চ্চ ওভারটুন্ হলে তাঁহার একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম, "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা"। পাড়ার কয়েকজন মেয়ে দল বাঁধিয়া বক্তৃতাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চারুচন্দ্র পথ দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং ভাল বসিবার জায়গা জোগাড় করিয়া দিলেন। মেয়েদের জন্য আলাদা কোনও জায়গা করা হয় নাই, সামনের লাইনের চেয়ারে গিয়া আমরা বসিলাম। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের convocation ছিল বলিয়া অনেকেই বেশ দেরি করিয়া আসিলেন দেখিলাম। সভাপতি হইয়াছিলেন আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়। তিনি কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পত্নী প্রতিভা দেবীকে সঙ্গে করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। খুব একচোট করতালির ঘটা পড়িয়া গেল। প্রতিভা দেবীকে এই প্রথম দেখিলাম।

অল্পক্ষণের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌছিলেন, এবং সভার কাজ আরম্ভ হইল। সভাপতি মহাশয় কেন যে ইংরেজিতে কথা বলিলেন তাহা তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিয়াছিলাম যে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত নহেন। রবীন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়াই প্রবন্ধটি পড়িলেন। মাঝে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসাতে খানিক গোলমাল হইল, কবি কয়েক মিনিটের জন্য থামিয়া গেলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বসিলে পর আবার আরম্ভ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনা হইবে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সভাপতি বলিলেন যে তাঁহারা যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহার উপর আর কোনও আলোচনা চলে না। কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রথম হইতেই মনে হইতেছিল যে

জিহ্বা শানাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর "নায়ক" পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া মনে আছে। ইঁহাদের ক্ষুণ্ণ মুখ দেখিয়া হাসি পাইতেছিল। সভপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া একটি বক্তৃতা করিলেন, যদিও ইহাও বলিয়া লইলেন যে বেশী প্রশংসা করা তাঁহার সাজে না, কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং পর দিনই বিলাত যাত্রা করেন। আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ও সেবার তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলকে তিনি কবিবরের শুভযাত্রা ইচ্ছা করিতে অনুরোধ করিলেন। খুব করতালি-ধ্বনি হইল। স্যার গুরুদাস বক্তা ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া একটি সরস ছোট বক্তৃতা করিলেন। তাহার পরে বলিলেন চুনীলাল বসু মহাশয়।

বক্তৃতা শেষ হইবার পর বাহিরে আসিলাম। রবীন্দ্রনাথও বাহিরে আসিয়া প্রবন্ধটি বাবাকে দিলেন। বলিলেন, "অনেক কাটাকুটি আছে, চারুকে একবার ভাল করে দেখে দিতে বলবেন।"

ইহার পর দিনই বোধ হয় ভবানীপুর সম্মিলন-সমাজে তাঁহার উপাসনা ছিল। এখন সম্মিলন-সমাজ মন্দির যেখানে, তাহারই নিকটে আর-একটি বাড়ীতে তখন মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভোরে উঠিয়া ট্রামে করিয়া ভবানীপুর গিয়াছিলাম। পরিচিত অনেক লোককে ট্রামে দেখিলাম। মন্দিরে গিয়া বসিবার অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। সেদিন তাঁহাকে বড়ই অসুস্থ দেখাইতেছিল, ভাবিলাম হয়ত বেশী পরিশ্রমে এইরূপ হইয়াছে। তাহার পরদিনই তাঁহাদের বিলাত যাত্রা করিবার কথা। সকাল হইতে মেঘলা, খানিক ঝড়বৃষ্টিও হইয়া গেল, মনও যেন কেমন মুষড়াইয়া গেল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। আমরাও বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন ভোরবেলাই দাদা বাহির হইয়া গেলেন, বাবাও গেলেন কিছু পরেই। ঘরে বসিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণে জাহাজে উঠিতেছেন বোধ হয়। কিছু পরে বাবা ও দাদা ফিরিয়া আসিলেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ষ্টীমার ঘাটে কি খুব লোক হয়েছিল?" উত্তরে শুনিলাম রবীন্দ্রনাথের যাওয়াই হয় নাই। আগের রাত্রে বালীগঞ্জে এক পার্টিতে গিয়াছিলেন, ফিরিতে রাত হয়, সারারাত তাহার পর আর ঘুমাইতে পারেন নাই। সকালে যখন যাত্রার সময় আসিল, তখন দেখা গেল যে তিনি এত অসুস্থ যে কোনোক্রমেই সেদিন আর তাঁহার যাওয়া সম্ভবপর নয়। তবে কিছু সুস্থ বোধ করিলে দিন-দুই পরে মাদ্রাজে গিয়া তিনি জাহাজ ধরিতে পারেন। সমস্ত দিন তাঁহার খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম এবং নানা রকম আশঙ্কাজনক কথা শুনিতে লাগিলাম। বিকালে সন্তোষবাবুর পত্নী শৈলবালার সহিত দেখা হইল, তাঁহার নিকট শুনিলাম যে চিকিৎসকগণ সাত দিন অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ঘর হইতে বাহির হওয়া বা কথাবার্ত্তা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দেশসুদ্ধ মানুষ তাহাদের প্রিয়তম কবির এই অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদে যেন মুহ্যমান হইয়া গেল।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি

[শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

ওঁ

চৌরঙ্গী

কল্যাণীয়েষু,

শিলাইদহে আমার জীবনযাপনের যে বর্ণনা বাঙ্গলার কথায় প্রকাশ করিয়াছ তাহা পড়িয়া দেখিলাম। আমার সেই সময়কার অজ্ঞাতবাসের কথা কেহই ঠিকমত জানিবে না। তখন আমি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত ছিলাম বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আজ আমি জনতার মধ্যে নিরাশ্রয়—আমার বাসা ভাঙিয়াছে। মোটের উপর তখনকার সহরের বাতাসও এমন বিষাক্ত ছিল না—আজ দেখি মানুষের অধিকার যতই সঙ্কীর্ণ তাহার ঔদ্ধত্যও ততই প্রবল। আজই পদ্মার নিভৃত শুশ্রূষা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল আজই তাহা দুর্লভ হইয়াছে। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

* * * মানুষের এক জীবনে জন্ম জন্মান্তর ঘটে। সাজাদপুরের সীমানার মধ্যে যে দিনগুলি গাঁথা পড়েছিল তার রূপ তার রস তার হাওয়া তার আলো আরেক জন্মের। এখনকার থেকে কেবল আমিই যে স্বতন্ত্র ছিলুম তা নয় তখনকার মানুষ ছিল অন্য জাতের। সেই আমার দূরবর্তী জন্মের সাজাদপুর অনেকবার আমার মনকে টানে—কিন্তু সে কি এখন কোথাও আছে? সে যে ছিল আমার মনকে জড়িয়ে নিয়ে—সে মন কোথায় হারিয়ে গেছে। না হারালে কাজ চল্‌তো না। এখন জন্মান্তরের পালা। ইতি ৪।২।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আমার "দুই বোন" গল্পের যে সমালোচনা লিখেচ তা পড়ে খুসী হয়েছি। তোমার সাহিত্য-বিচারে আধুনিক মনোবিকলনতত্ত্বমূলক বিশ্লেষণপদ্ধতি সুনিপুণভাবেই প্রয়োগ করেচ। তবু একটা কথা মনে রেখো সাহিত্যকে একান্তভাবে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করাই তার প্রতি একমাত্র সঙ্গত ব্যবহার নয়। সাহিত্য প্রকাশধর্ম্মী—সেই প্রকাশের মূলে যে শক্তি কাজ করে সে থাকে অগোচরে রন্ধনশালার উপকরণ ও রন্ধনতত্ত্বের মতো। ভোজনে যে স্বাদ পাই রসগ্রাহীর পক্ষে সেইটেই মুখ্য, সেই স্বাদের বিশ্লেষণ চলে না, কেবল আছে তার উপলব্ধি। অসুস্থ দুর্ব্বল শরীরে

কর্ম্মবিমুখ চিত্ত ছুটির জন্যে উৎসুক হ'য়ে থাকে। আ . র বয়সে কর্ম্মপরায়ণতাকে উচ্চমূল্য দেওয়া চলবে না। ইতি ৬।৪।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Gouripur Lodge
Kalimpong

কল্যাণীয়েষু,

প্রতিদিন অন্তবিহীন চিঠি লেখালেখি, আশীর্বাণীর দাবী, অভিমতের অনুরোধ, বাংলা দেশের নবজাতদের নামকরণ, আসন্ন বিবাহের সরকারী রস্নুনচৌকিগিরি আমার শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের শান্তির পক্ষে অসহ্য হয়েছে। দাবী অসঙ্গত হলেও আমি সহজে অস্বীকার করতে পারি নে বলেই আমার কাঁধ থেকে বোঝা নামলো না। যখন শক্তি ছিল তখন খ্যাত অখ্যাত কাউকেই বঞ্চিত করতে পারি নি, কিন্তু প্রাণোদ্যমের মিতব্যয়িতা যখন অত্যাবশ্যক হয়েছে তখন বিপন্ন অবস্থায় জনসাধারণের কাছে নিষ্কৃতি চেয়ে সংবাদপত্রে চিঠি দিয়েছি এতদিনে হয় তো ছাপা হয়ে থাকবে। এই মৌনব্রত আরম্ভ করার পূর্বে তোমাকে এই চিঠিতে আশীর্বাদ না ক'রে থাকতে পারলুম না। আমার পল্লীচিত্র সম্বন্ধে তোমার বইখানি প'ড়ে বিশেষ খুশি হয়েছি তার কারণ এ নয় যে তুমি আমাকে প্রশংসা করেছ। বাংলাপল্লী থেকে আমি যে আনন্দ পেয়েছি এবং যত আনন্দ ঢেলে দিয়েছি তার পরে, যত বিচিত্র আকারে গদ্যে পদ্যে, আর শেষ পর্য্যন্ত পল্লীবাসীদের কল্যাণ সাধনের জন্য যতটা চেষ্টা করেছি আর কোনো বাঙালী লেখক বা রাষ্ট্রনেতার জীবনে তার কোনো লক্ষণ দেখেছি বলে আমি তো মনে করি নে। এতদিন পরে উদাসীন বাঙালী পাঠকদের হয়ে আমার জীবনের অত্যন্ত সত্য অনুভূতিকে তুমি যে এমন আনন্দের ভাষায় প্রকাশ করেছ এতে আমি পুরস্কৃত হয়েছি।

ডাকযোগে তোমার প্রতি এই আমার শেষ অভিনন্দন। বিশ্রামের চেষ্টায় চললুম—আশা করি চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। বিশ্রামের আবাদে যদি ফসল ফলে সে ফসল তোমাদেরি ঘরে তুলতে পারবে। ইতি ২৬, ৬, ৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়

"ভাস্কর"

কয়দিন হইল নূতন ফ্ল্যাটে আসিয়াছি। ভাড়া কম, আলো-বাতাস প্রচুর। সুতরাং খুবই সুবিধা।

দেখি, বারান্দায় আমার মেয়ে টুনি আর একটি মেয়ের সঙ্গে পুতুল-খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে?

গৃহিণী বলিলেন, ওই তো পাশের বাড়ীর মেয়ে পুনি।

এক দিন আপিস হইতে ফিরিয়া টুনিকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, টুনি কোথায়?

উত্তর আসিল, টুনি গেছে পুনিদের বাড়ী।

সন্ধ্যার সময়ে বারান্দায় গড়াইতেছি। শুনি, ছাদের উপর বিষম দুম্ দাম্ শব্দ হইতেছে। সংবাদ লইয়া জানিলাম, টুনি এবং পুনি জোরসে স্কীপিং করিতেছে।

কিছু দিন পরে।

খাইতে বসিয়াছি। দেখি থালার পাশে রেকাবিতে কয়েকখানি ক্ষীরের পুলি-পিঠে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি?

উত্তর পাইলাম, পুনির মা পাঠিয়েছে।

আর এক দিন। দেখি একটি কাঁসার বাটি সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে ঠাকুর।

ব্যাপার কি?

ব্যাপার আবার কি! একটু চুষি-পিঠে পাঠিয়ে দিলাম পুনির মাকে।

শনিবার সন্ধ্যা। শরীরটা ভাল লাগিতেছে না। একটু চুপচাপ পড়িয়া আছি। গৃহিণী হঠাৎ ঘরে আসিয়া বলিলেন, ওঠ তো, একটু ওঘরে যাও।

কেন বল তো!

কেন আবার! পুনির মা বেড়াতে এসেছে। যাও, ওঘরে গিয়ে একটু ব'স।

কয়েক দিন পরে। আপিস হইতে ফিরিয়া দেখি, শোবার ঘরের দরজায় তালা। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাইজি কোথায়?

চাকর বলিল, মাইজি গেছেন পুনি-খোখীর বাড়ীতে।

কখন আসবেন, বলে কছু

সে তো হামি জানি

গৃহিণী ফিরিলেন সন্ধ্যার পর। প্রশ্নোত্তরে জানিতে পারিলাম, পুনির কাকীমা আসিয়াছেন দেশ হইতে, তাঁরই সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য টুনির মার ডাক পড়িয়াছিল।

রবিবার। একটু দিবানিদ্রার পর উঠিয়া দেখি, টুনি সাজিতেছেন এবং টুনির মা তাহাকে সাজাইতেছেন। রঙীন শাড়ী ঘাঘরার মত করিয়া পরানো হইয়াছে। হাতে, গলায়, মাথায় নানা আকারের ফুলের সাজ।

ব্যাপার কি?

ব্যাপার আবার কি? আজ সন্ধ্যার সময়ে টুনি আর পুনি নাচবে—ওই পাশের বাড়ীতে। তাই একটু আগে থেকে—

তা বেশ! আচ্ছা, ও শাড়ীখানা কোথায় পেলে? আমি কিনেছি ব'লে তো মনে পড়ে না!

তুমি কবেই বা কি কিনলে? আজকাল মেয়েদের কি লাগে না-লাগে, কিছু খবর রাখ?

স্বীকার করলাম রাখি না।

তবে চুপ ক'রে থাক। ও শাড়ীখানা পাঠিয়ে দিয়েছে পুনির মা।

সন্ধ্যার পর টুনি নাচিয়া ফিরিয়াছে। গলায় একটা ছোট মেডাল চক চক করিতেছে।

মেডাল কে দিল?

কে আবার দেবে? ওই পুনির কাকীমা দিয়েছে।

এমনি করিয়াই ছয় মাস এই ফ্ল্যাটে কাটিয়া গিয়াছে।

২

শনিবার। ড্যালহৌসি স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে ট্রামে উঠিতেছি। ভীষণ ভীড়। একটুও স্থান নাই। অল্প চলন্ত ট্রামেই কোন গতিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেই 'ঠকাস্, উঃ'—আমার কপালটা ভীষণ জোরে ঠুকিয়া গেল এক ভদ্রলোকের টাকের সঙ্গে। কোন মতে দাঁড়াইবার একটু স্থান করিয়া লইয়া বলিলাম, কি রকম ভদ্রলোক মশাই, আপনি? একেবারে চোখ বুজে ছিলেন নাকি?

ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন, আপনিই বা কেমন ভদ্রলোক, ট্রামে উঠবার সময়ে কি চোখ বুজে চলন্ত ট্রামে উঠছিলেন?

পরস্পরের দিকে রোষ এবং বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার পর ভদ্রলোক কোনমতে একটা সীটে স্থান করিয়া লইলেন। আমি নিকটস্থ একটা হাতল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম।

ট্রাম হইতে নামিবার সময়ে দেখি, ভদ্রলোকটিও নামিয়া পড়িলেন। কিছু দূর যাইবার পর দেখি, ভদ্রলোকটিও সঙ্গে আসিতেছেন। যখন ডান দিকে মোড় ঘুরিলাম, দেখি ভদ্রলোকটিও ডান দিকে ঘুরিলেন। যখন আমি বাঁ দিকে মোড় ঘুরিলাম, তখনও ভদ্রলোক আমারই সঙ্গে বাঁ দিকে ফিরিলেন। ব্যাপার কি? একটু বিরক্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন কেন বলুন তো? কিছু বক্তব্য আছে?

ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমিও ঠিক সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আপনি কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন?

আমি? আমি তো যাচ্ছি আমার বাসায়!

কোথায় আপনার বাসা?

ওই তো, ওই যে লালবাড়ীটা—ওরই দোতলার ফ্ল্যাট—

ওই ফ্ল্যাটে 'টুনি' বলে একটা মেয়ে থাকে না?

হ্যাঁ, টুনি আমারই মেয়ে। তা, আপনি জানলেন কি ক'রে?

আমিও তো থাকি এখানেই—ওই সাদা বাড়ীটায়।

ওখানে 'পুনি' বলে একটা মেয়ে থাকে না?

হ্যাঁ, পুনি আমারই মেয়ে।

বটে! আপনিই অশোকবাবু—হেঁ, হেঁ—নমস্কার!

আপনিই তাহলে প্রকাশবাবু—হেঁ, হেঁ—নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি খুশি হলুম।

৩

আপিসের পোষাক ছাড়িতেছি। গৃহিণীকে বলিলাম, আজ পুনির বাবার সঙ্গে আলাপ হ'ল। খাসা লোক।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তুমি যে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পার, তা তো আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার যত ফটর ফটর কেবল কাগজে কলমে।

কপালে হাত দিয়া দেখি, একটা জায়গা ফুলিয়া আস্ত সুপারির মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিহাসের খুঁটিনাটি

শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম-এ

ভারতের প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপিগুলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগঠনের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। ঐতিহাসিকগণের কত পরিশ্রমের ফলে যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়গুলির উদ্ধার হইয়াছে তাহা যাঁহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আসিয়াছেন তাঁহারাই ভালরূপে জানেন। তবে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সব প্রামাণ্য উপকরণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও লিপিগুলির পঠনের তারতম্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে বহুস্থানে বস্তু-বিষয়ের অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ, বর্ত্তমানে লুপ্ত অধ্যায়গুলি অধুনা একটা সু-অবয়ব ধারণ করিলেও একেবারে নির্দ্দোষ হয় নাই। এইজন্য অদ্যাপি ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসে গবেষণা করিবার প্রচুর উপকরণ বর্ত্তমান।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র বিষয়-বস্তুর অবতারণা করিব। এ যাবৎকাল মুদ্রাতত্ত্ব লইয়া যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ভালরূপেই জানেন যে অদ্যাবধি এত প্রচুর মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও সুবিখ্যাত "মৌর্য" বা "শুঙ্গ" বংশীয় রাজার নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা

পাওয়া যায় নাই। অশোক, পুষ্যমিত্র প্রমুখ নৃপতিগণ যাঁহারা আপনাদের শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সভ্যতায় সুদূর সুদূরান্তরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহারা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনাদের ধর্ম্মনীতি ও রাজ্যনীতি পর্ব্বতে, পর্ব্বতে, স্তম্ভে স্তম্ভে, গহ্বরে, গহ্বরে খোদিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিজ রাজ্য মধ্যে স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করেন নাই—ইহাও কি সম্ভব? আমার নিজের ধারণা অন্য প্রকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সকল মুদ্রা এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যেই ঐ দুই বংশীয় নৃপতিগণের মুদ্রাও আছে। সঠিকরূপে পঠিত না হইবার জন্যই এই প্রকার বিভ্রমতা।

আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, স্মিথ, হোয়াইটহেড, র‍্যাপসন্, অ্যালান্, গার্ডনার, টমাস, ভাণ্ডারকর, ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ—ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশীয় মুদ্রার ইতিহাস বৈজ্ঞানিক রীতি-সম্মত ভাবে রচনা করিয়া জগতের চির-শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদের অমূল্য গবেষণা ভারতের ইতিহাসে চির-সম্পদ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের গবেষণা একেবারে ত্রুটিবিচ্যুতিহীন এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

ভিনসেণ্ট স্মিথের সুবিখ্যাত *Catalogue of the Indian Coins* নামক পুস্তকখানি নাড়াচাড়া করিতে করিতে আমি আশ্চর্য্যরূপে সুঙ্গবংশীয় দুইজন রাজার নামাঙ্কিত দুইটি মুদ্রা প্রাপ্ত হই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে অন্ততঃ এই দুই সুঙ্গবংশীয় রাজার মুদ্রা স্বস্থান প্রাপ্ত না হইয়া, উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে তাহা কি আশ্চর্য্য ঘটনা নহে? অবশ্য, মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই দুই বংশের কোনও প্রকার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত না হইয়া বড় নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমসাময়িক অপর কোন কোনও বংশের মুদ্রাকে সুঙ্গবংশীয় রাজাদের মুদ্রা বলিয়া প্রমাণ করিতেও চাহিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের বেরেলী জিলার অন্তর্গত প্রাচীন অহিচ্ছত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অগ্নিমিত্র, ভদ্রঘোষ, ভূমিমিত্র, ইন্দ্রমিত্র......বিষ্ণুমিত্র ইত্যাদি কতকগুলি "মিত্র" নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোনও কোনও মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ ঐ মুদ্রাগুলিকে সুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের মুদ্রা বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন। ঐ মুদ্রাগুলির মুদ্রণের ধরণ ও লিপি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৭৬-৬৬ অব্দের হওয়ার সম্ভাবনা। ঐ সময়ে ভারতে সুঙ্গবংশীয় রাজগণের প্রাধান্যই ছিল। আরও একটা বিশেষ কারণ যে অহিচ্ছত্রের মুদ্রাস্থিত রাজাদের নামের ন্যায় সুঙ্গনৃপতিগণের নামও "মিত্র" শব্দযুক্ত। কিন্তু স্মিথ, কানিংহাম উহা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে একমাত্র "অগ্নিমিত্রের" নাম অহিচ্ছত্র রাজগণের মধ্যে ও পৌরাণিক সুঙ্গবংশাবলীতে সাধারণ। অন্য কোনও রাজার নামের মিল নাই। উপরন্তু, তৎকালীন ঐতিহাসিক ও অপরাপর প্রমাণ ঐ সময়ে সুঙ্গ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি উত্তর-ভারতে নির্দ্দেশ না করিয়া পূর্ব্ব মালবে নির্দ্দেশ করে। অহিচ্ছত্র মালব হইতে বহুদূরে অবস্থিত; সুতরাং স্মিথ, কানিংহামের মতে ঐ সকল মুদ্রা সুঙ্গরাজ বংশের হওয়া স্বাভাবিক নহে।

আবার ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রায় সেই সময়ে কতকগুলি একই ধরণের মুদ্রা অযোধ্যা, মথুরা, কৌশাম্বী ইত্যাদি স্থানেও পাওয়া গিয়াছিল। মথুরার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গ্রীক ও শক রাজগণের মুদ্রার সহিত বহু প্রাচীন ব্রাহ্মী-অক্ষর ব্যবহৃত, রাজার নাম সম্বলিত তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। বলভূতি, পুরুষদত্ত, ভবদত্ত, রামদত্ত, উত্তমদত্ত, গোমিত্র প্রমুখ রাজার মুদ্রাগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য। মথুরার "ব্রহ্মমিত্র" পাঞ্চালের "ইন্দ্রমিত্রের" সমসাময়িক ছিলেন।

এই সময় অযোধ্যাতেও ব্রাহ্মী অক্ষরে নামাঙ্কিত "মিত্র" শব্দ যুক্ত ছাঁচে ঢালাই করা মূলদেব......সূর্য্যমিত্র, সঙ্ঘমিত্র,......ইত্যাদি রাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়।

যাহা হউক, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে সুঙ্গ রাজত্বে ভরহুত, বিদিশা, অহিচ্ছত্র, অযোধ্যা, (বৎস) কৌশাম্বীর রাজগণের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ছিল ও প্রায় সকলেই সুঙ্গ নৃপতিগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে তাঁহারা কোন্ সুঙ্গদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন? বিদিশা অথবা মগধে যে সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের অধীনতা, না অপর কোন সুঙ্গ বংশীয় রাজপরিবার যাঁহারা হয়তো উত্তর-ভারতে রাজত্ব করিতেন তাহাদের বশ্যতা? পুরাণ অথবা অন্য কোনও প্রকার উপকরণ হইতে মূল সুঙ্গবংশ ব্যতীত অন্য কোনও সুঙ্গবংশের রাজাদের নামাবলি বা ইতিহাস আমরা এ যাবৎ পাই নাই। কিন্তু একমাত্র প্রাচীন মুদ্রার সহায়তায় আমরা এইরূপ একটি অজ্ঞাত রাজবংশের অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যের সংবাদ লাভ করিতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে যখন ভরহুত, কৌশাম্বী-অহিচ্ছত্র ও

অযোধ্যাতে উক্ত রাজগণ রাজত্ব করিতেন তখন মথুরাতেও এক পৃথক্ শুঙ্গরাজপরিবার রাজত্ব করিতেন। এই মথুরার শুঙ্গগণ এত ক্ষমতাশালী ছিলেন যে খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা তাঁহাদের চতুস্পার্শ্বস্থ ভূস্বামিগণকে আপনাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মথুরায় প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির মধ্যে আমরা যদি ভালরূপে "পুরুষদত্ত" ও "উত্তমদত্তের" মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলেই "মথুরা-শুঙ্গদের" অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিব। কানিংহাম তাঁহার বিখ্যাত *Ancient Indian Coins* গ্রন্থের ৮ নং প্লেটে রামদত্তের চারিটি মুদ্রা ও পুরুষদত্তের একটি মুদ্রার প্রতিচ্ছবি দিয়াছেন। র‍্যাপসন্‌ও *Indian Coins*-এ (পৃ. ১৩) রামদত্তের কতকগুলি মুদ্রার সম্বন্ধে বলিতেছেন যে রামদত্তের কতকগুলি মুদ্রার পাঞ্চালের মুদ্রার সহিত সামঞ্জস্য থাকাতে তাহারা প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। কানিংহাম, র‍্যাপসন, স্মিথ কেহই রামদত্তের ও পুরুষদত্তের মুদ্রাগুলি ভালরূপে পরীক্ষা করেন নাই। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহার প্রণীত "ইণ্ডিয়ান-মিউজিয়ম ক্যাটালগে"র ১৯২ ও ১৯৩ পৃষ্ঠাতে (২২ নং প্লেট) পুরুষদত্ত ও রামদত্তের মুদ্রাগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে পাঠ করিয়াছেন।

স্মিথ—প্লেট ১২—নং ১০ (পৃ. ১৯২)

(ক) পুরুষদত্তের মুদ্রা

স্মিথ্ এই মুদ্রাটিকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা:—

সোজা পিঠ	উল্টা পিঠ
দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দক্ষিণে চিহ্ন; এবং প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিতে "পুরুষদতস"— বলিয়া রাজার নাম লিখিত।	বামে একটি হস্তী এবং উপরে ২ সারি বিন্দু

(খ) রামদত্তের মুদ্রা

সোজা পিঠ	উল্টা পিঠ
দণ্ডায়মান মূর্ত্তি বড় অক্ষরে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত "(রা) মদতস"	অস্পষ্ট; খুব সম্ভবতঃ চালকসমেত ৩টি হস্তী।

কানিংহাম ও স্মিথ উভয়েই—

"পুরুষদতস"

"রামদতস"

পাঠ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা মুদ্রাগুলি সম্পূর্ণ পাঠ করেন নাই। "গো" অক্ষরটি ও "স" এর "উ"কারটি একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। ঐ দুইটি প্রয়োজনীয় শব্দ ও চিহ্ন উপেক্ষিত না হইলে উহাদের পঠন নিম্নলিখিত হইত।—

অর্থাৎ পুরুষদতসুগো

এবং

রামদতসুগো

অর্থাৎ মুদ্রাগুলি পুরুষদত্ত শুঙ্গের ও রামদত্ত শুঙ্গের। কানিংহাম স্মিথ "গো" অক্ষরটিকে একেবারেই বাদ দিয়াছেন ও "সু" অক্ষরের 'উ'-কারটিকে বিসর্জ্জন দিয়া "স" বলিয়া ধরিয়া পুরুষদত শব্দটির সহিত যোগ করিয়া "পুরুষদতস" পাঠ দিয়াছেন। "গো" অক্ষরটি মুদ্রাতে এত স্পষ্ট যে উহাকে উপেক্ষা করা কঠিন। "গো" অক্ষরটি একই কালীন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ও অক্ষরটির গঠনরূপ ও লিপিধরণ এক। সুতরাং ইহাকে নিজের ইচ্ছানুসারে বাদ দেওয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে গর্হিত এবং উহা সাংঘাতিক ভ্রমের কারণ হইয়াছে। "সু" অক্ষরটির "উ"কার কানিংহামের ৮ম প্লেটের ১৭ নং মুদ্রাতে ও স্মিথের ১২শ প্লেটের ১০ নং মুদ্রাতে চমৎকার ভাবে প্রতীত হয়। কিন্তু স্মিথের উক্ত প্লেটের ১১ নং মুদ্রাটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে উক্ত "গো" ও "উ"কারের কোনও চিহ্নই নাই। ঐ মুদ্রাটি "উত্তমদত্তের" মুদ্রা;—উহাতে স্পষ্টই "উতমদতস" লিপি রহিয়াছে: অর্থাৎ মুদ্রাটি উত্তমদত্তের মুদ্রা কিন্তু উত্তমদত্ত শুঙ্গ বংশীয় বা অপর কোন বংশীয় নৃপতি তাহা মুদ্রা হইতে ধরিবার কোনও উপায় নাই।

কানিংহাম রামদত্তের ৪টি মুদ্রা সম্বন্ধে *Coins of Ancient India* নামক গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠাতে "রাঞো রামদতস" পাঠ দেন অর্থাৎ মুদ্রাটি রামদত্ত নামক রাজার মুদ্রা। ঐ ৪টি মুদ্রাই গোলাকার। উহার দুইটি মুদ্রাতে অর্দ্ধদ্রব অবস্থায় ছাপ ব্যবহৃত হইবার কালে চতুষ্কোণ ছাঁচ ব্যবহৃত হইয়াছিল ও অপর দুইটিতে গোলাকার ছাঁচ ব্যবহারের প্রমাণ,

যথা—কানিংহাম—*Coins of Ancient India* প্লেট ৮—
নং ১৪ (...রামদতসুগো)
নং ১৭ (...মদতসুগো)

কানিংহামও কিন্তু "রামদতসুগো" না পড়িয়া "রামদতস" পাঠ দিয়াছেন।

আমরা জানি প্রাকৃতে শুঙ্গ শব্দের প্রথমার এক বচনে "সুগো" হয়।

যাহা হউক, উক্ত রামদত্ত ও পুরুষদত্ত নৃপতিদ্বয় যে শুঙ্গ-বংশীয় ছিলেন—ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

সামান্য পঠনের তারতম্যে ঐতিহাসিক তথ্যেরও যে তারতম্য ঘটিতে পারে এই দুইটি মুদ্রা তাহার প্রমাণ।

(খ) পুরুষদত্তের মুদ্রা

(৪) কানিংহাম্ *C. A. I.* প্লেট ৮ম, নং ১৭ (পৃ. ৮৪) কানিংহামের পাঠ "পুরুষদতস" (শ্মিথ্ *I. C.* প্লেট ১২শ, নং ১০ (পৃ. ১৯৩) শ্মিথের পাঠ "পুরুষদতস"

(৬) (গ) উত্তমদত্তের মুদ্রা

[এই মুদ্রায় "সুঙ্গ" শব্দটি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং উত্তমদত্ত কোন্ বংশীয় নৃপতি মুদ্রা হইতে জানিবার সম্ভাবনা নাই]

শ্মিথ *I. M. C.* প্লেট ১২শ—নং ১১

শ্মিথের পাঠ—"উত্তমদতস"

সুতরাং পুরাণ-সমর্থিত রাজকীয় সুঙ্গবংশ ব্যতীত যে উত্তর-ভারতে সুঙ্গবংশীয় অপর একটি সুঙ্গ রাজবংশ রাজত্ব করিতেন তাহা ঐ দ্বিতীয় মুদ্রাদ্বারা জানিতে পারা যায়। তাঁহারাও সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতিপত্তি পারিপার্শ্বিক রাজারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১ ২ ৩

(ক) রামদত্তের মুদ্রা

(১) কানিংহাম *Coins of Ancient India* প্লেট ৮ম, নং ১৪ (৮৪ পৃষ্ঠা) কানিংহামের পাঠ "রজ্ঞ রমদতস" (২) শ্মিথ *I. M. C.* প্লেট ১২শ, নং ১২ (পৃঃ ১৯৩) শ্মিথের পাঠ "রমদতস"

(৩) র‍্যাপ্‌সন্ *Indian Coins* প্লেট ৪র্থ, নং ১

র‍্যাপ্‌সনের পাঠ—"রজ্ঞ রমদতস"

লাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৪

নিশীথ না উপকার করিয়া ছাড়িল না, একেবারে অপর্ণা দেবী পর্যন্ত ধর্ণা দিল, এবং রাজি করিল। যে-ভাবেই হোক একটা খুব ভাল কাজ হইল। আমার কলেজ আছে, যাওয়া সম্ভব নয়; ঠিক হইল সঙ্গে যাইবে মীরা, তরু, বিলাস, রাজু বেয়ারা, ড্রাইভার; এখানে অস্থায়ী ভাবে একজন ড্রাইভার রাখা হইবে। মিষ্টার রায় রাখিয়া আসিবেন, তাহার পর ছুটি-ছাটা হইলে মিষ্টার রায় বা আমি দেখিয়া আসিব।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি, যাইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, বালিকাসুলভ উৎফুল্লতার মাঝে মীরা যেন একটু আবার ম্রিয়মাণও হইয়া পড়িতেছে। যাইবার আগের দিনের কথা। আমরা ভ্রমণে বাহির হইব, মীরা নামিয়া আসিয়া বলিল, "তরু, তোমাদের মোটরে একটু জায়গা হবে?"

তরু উল্লসিত হইয়া বলিল, "এস না দিদি, তুমি তো অনেক দিন আমাদের সঙ্গে যাও নি-ও, আজকাল নিশীথ-দা..."

মীরা রাগিয়া বলিল, "তা'হলে যাও।"

তরু বলিল, "না, এস, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি দিদি।"

মীরা আসিয়া বসিল। তরু রহিল আমাদের মাঝখানে।

গেট দিয়া বাহির হইতে হইতে ড্রাইভার ঘুরিয়া আমায় প্রশ্ন করিল, "কোন্ দিকে যাব?"

আমি মীরার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আজ ভেবেছিলাম ভায়মণ্ড হারবার রোড হয়ে যাব খানিকটা।"

মীরা গ্রীবা বাঁকাইয়া উত্তর করিল, "মন্দ কি ?"

ময়দান পারাইয়া খিদিরপুরের পুল উৎরাইয়া একটু পরে আমাদের গাড়ী অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মীরা একেবারে নীরব, খালটা পার হইয়া একবার শুধু ড্রাইভারকে গতিবেগটা আরও একটু বাড়াইতে বলিল; আর একবার তরুকে বলিল, "দয়া ক'রে একটু চুপ করবে কি তরু ?"

তরুর রসনা মুক্ত প্রকৃতি আর অবাধ গতিবেগের মধ্যে প্রগলভ হইয়া উঠিয়াছে।

এইটুকু ব্যতীত মীরা অখণ্ড মৌনতায় আর নরম, শান্ত দৃষ্টিতে বরাবরই সামনের দিকে চাহিয়া আছে। মীরা আজ এ রকম কেন ?—মনে হইতেছে সে যেন একটি অচঞ্চল সরোবর, বুকে তাহার কিসের একটি শান্ত প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে, সে চায় না সামান্য একটি শব্দের আঘাতেও এতটুকু বীচিভঙ্গ হয়, প্রতিবিম্ব এতটুকুও চঞ্চল হইয়া ওঠে। আমি আবিষ্ট মনে একটি মাত্র চিন্তাকে পরিপুষ্ট করিতেছিলাম, সে-মীরার হস্তখানেক ব্যবধানের মধ্যে যে-কেহই থাকিত তাহারই মনে ঐ এক চিন্তাই উঠিত ;—ভাবিতেছিলাম, মীরার ধ্যানশান্ত মনে এই যে প্রতিচ্ছবি তাহা শুধু কি এই মূক প্রকৃতিরই ? মীরা এর মর্ম্মস্থলে কাহাকেও বসাইয়া কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইয়া লয় নাই ? স্পষ্ট উত্তর কোথায় পাব এ-প্রশ্নের ? তবে মীরার কেশের, বসনের সুবাস যে সমস্তই মুক্ত বায়ুতে অপচয় হইয়া যাইতেছে না, নিশ্চয়ই একজনের মর্ম্মকে যে ব্যাকুল করিতেছে, আবিষ্ট ধ্যানের মধ্যে মীরার এ চৈতন্যটা নিশ্চয় সজাগ ছিল—সব যুবতীরই থাকে—এবং এই সূত্রে আমি তাহার অন্তরের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম যোগ অনুভব করিতেছিলাম।

বেহালা পার হইয়া আমরা বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। রাস্তার ধারে আর বাড়ি নাই, ছোট বড় বাগান, ঘনপল্লবিত তরুলতায় পূর্ণ। প্রায় মাইল-চারেক এই রকম গিয়া ফাঁকা মাঠে আসিয়া পড়িল। শুধু রাস্তাটুকু বাদ দিয়া যে সবুজের সমারোহ দুই দিকে আরম্ভ হইয়াছে সেটা শেষ হইয়াছে একেবারে দিক্‌রেখার নীলিমায় গিয়া। মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে পল্লী, মেটে দেয়ালের ওপর গোলপাতায়-ছাওয়া ধনুষাকৃতি চাল, ছোট ছোট পুকুর, বিচালির গাদা; এক-আধটা পাকা বাড়িও আছে—রং-করা, চারিদিকের সবুজের গায়ে যেন ঝিক্‌মিক করিতেছে। সবার উপর মাথা খুঁড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য নারিকেলের গাছ, হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া অস্তমিত সূর্য্যের রশ্মি যেন সর্বাঙ্গ দিয়া মাখিয়া লইতেছে।

ড্রাইভার প্রশ্ন করিল, "ফিরব এবার ? প্রায় বার-তের মাইল এসে পড়েছি।"

আমি মীরার পানে চাহিলাম। মীরা প্রশ্ন করিল, "কাজ আছে নাকি তেমন কিছু ?"

উত্তর করিলাম, "কী আর কাজ ?"

ড্রাইভার আগাইয়া চলিল। মীরা বলিল, "বরং একটু আস্তে ক'রে দাও।"

মীরার দৃষ্টিটা আজ অদ্ভুত রকম নরম, অথচ কি দিয়া যেন পূর্ণ। কয়েক দিন থেকে মনে হইতেছে মীরা দীর্ঘ বিদায়ের পূর্বে কিছু বলিয়া যাইতে চায়, অথবা যেন চায় আমি কিছু বলি,—এইটেই বেশী সম্ভব। প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।...মীরা আজ কি আমায় একটা চরম সুযোগের সম্মুখীন করিয়া দিতেছে ?...ও আজ সাজিয়াছে, সাদাসিদার উপর নিখুঁৎ-ভাবে নিজেকে মানাইয়া যেমন সাজিতে পারে ও। একটা অদ্ভুত মৃদু এসেন্স মাখিয়াছে যাহা ওর চারিদিকে একটা স্বপ্নের মোহ বিস্তার করিয়াছে। মীরার আসাতেও আজ একটা সুমিষ্ট লজ্জা ছিল; আমায় প্রশ্ন নয়, তরুকে,—"তরু তোমাদের মোটরে একটু জায়গা হবে ?"

একটা বেশ বড় গ্রাম পার হইয়া গেলাম, নামটা উদয়-রামপুর বা ঐ রকম একটা কিছু, ফলতা-কালীঘাট ছোট-লাইনের একটা স্টেশন আছে। গ্রামটা পারাইয়া খানিকটা যাইতে রাস্তার ধারে একটা মাইলস্টোনের দিকে চাহিয়া তরু বলিল, "উঃ, সতের মাইল এসে গেছি।"

মীরা ড্রাইভারকে বলিল, "এবারে তাহ'লে ফের।"

আমায় প্রশ্ন করিল, "একটু নামবেন নাকি ?"

যাহা যাহা চাই সে-সব যেন আপনিই হইয়া যাইতেছে, বলিলাম, "মন্দ হয় না, হাতপা যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে।"

অপূর্ব জায়গা! সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু মনে হইল সন্ধ্যার আবির্ভাব হয় নাই, আমরাই যে মায়ারথে চড়িয়া সন্ধ্যার নিজের দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। মীরা একবার মুগ্ধবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "আজকেও তরুকে পড়াবেন নাকি ?"

অবশ্য না পড়াইবার কোনই হেতু নাই, কিন্তু উত্তর করিলাম—"নাঃ, আজ আর..."

"তা হ'লে একটু বসা যাক্ না, কি বলেন ?"

আমরা রাস্তার ধারে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখিয়া বসিলাম, যেমন মোটরে বসিয়াছিলাম,—মাঝখানে তরু; শুধু তিন জনের মধ্যে ব্যবধানটা আর একটু বেশি।

এক সময় অন্ধকার একটু গাঢ় হইলে পূর্বচক্রবাল-রেখা ভেদ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠিল।

অল্পে অল্পে মীরা হইয়া উঠিল মুখর। তরুর মাথার উপর দিয়া সোজা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "অন্যের কথা জানি না, কিন্তু আমার তো মনে হয় শৈলেনবাবু যে সন্ধ্যে আর চাঁদ ব'লে যে দু'টো জিনিস আছে, কলকাতায় থেকে সে-কথা আমি ভুলেই গেছলাম।"

মীরার মুখে উদীয়মান চন্দ্রের দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে; তাহার উপর রহস্যময় আরও একটা কিসের দীপ্তি। মীরা কালো, এই চন্দ্রালোকিত ধূসর সন্ধ্যার সঙ্গে তাহার চমৎকার একটা মিল আছে; আমার দৃষ্টি যেন স্খলিত হইয়া তাহার মুখের উপর সেকেণ্ড কয়েক পড়িয়া রহিল, তাহার পরই আত্মসংবরণ করিয়া আমি চক্ষু দুইটা সরাইয়া লইলাম, সামনে নিবদ্ধ করিয়া বলিলাম, "বলেছেন ঠিক, সন্ধ্যেকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে যে স্নিগ্ধশিখা প্রদীপের দরকার তা কলকাতায় নেই; সন্ধ্যেকে দূর থেকে বিদেয় করবার জন্যেই সে যেন তার বিদ্যুৎ-আলোর চোখ রাঙিয়ে ওঠে। আমিও যেন অনেক দিন পরে দুটো হারান জিনিস ফিরে পেলাম—যেন..."

এক মুহূর্ত, একটু থামিলাম, তাহার পর নিজের চিন্তাটাকে পূর্ণ মুক্তি না দিয়া পারিলাম না, বলিলাম, "সব দিক্ দিয়ে মনে হচ্ছে বিধি হঠাৎ বড় অনুকূল হ'য়ে উঠেছেন আজ..."

অতি পরিচিত একটা সঙ্গীতের একটা সমস্ত পংক্তি তুলিয়া বলিয়াছি; মীরা সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, একটা কিছু না বলিবার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই সামনের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন?"

জীবনের এইগুলা অমূল্য মুহূর্ত, কিন্তু মাঝখানে আছে তরু, আর অনিশ্চিতের আশঙ্কাও তখন সম্পূর্ণভাবে যায় নাই, মাত্র একটি সুযোগে সব সময় যায়ও না। একটু অন্তরাল থাকুক, সবটা আর পরিষ্কার করিব না। আজ মীরা যে-মন আনিয়াছে তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে ওটা আমার অন্তরের সঙ্গীতের একটা কলি—'আজু বিহি মোরে অনুকূল ভেয়ল'। বাকিটা থাক্ না একটু অস্পষ্ট—আজকের সন্ধ্যার মত, এই নূতন জ্যোৎস্নার মত।

মীরার প্রশ্নে আমি একটু মুখ নীচু করিয়া রহিলাম,—ও বুঝুক্ সত্যটা গোপন করিয়া একটা মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছি, তাই কুণ্ঠা, তাই বিলম্ব। একটু পরে তরুর মাথার উপর দিয়া ওর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বিধি অনুকূল এই জন্যে বলছি যে এত দিন বঞ্চিত থাকবার পর একবারেই অমন চমৎকার সূর্যাস্ত দেখলাম আবার এমন সুন্দর চন্দ্রোদয় দেখছি।"

মীরাও একটু মুখ নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর স্মিত হাস্যের সহিত একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আপনি কবি..."

আমি বলিলাম, "কবির যশ ততটা কবির প্রাপ্য নয় মীরা দেবী, যতটা প্রাপ্য সেই মানুষের...বা সেই অবস্থার যা তাকে কবি ক'রে তোলে।"

মীরা আর মুখ তুলিতে পারিল না। একটু সময় দিয়া আমিও কথাটা বদলাইয়া দিলাম, বলিলাম, "আর বিশেষ ক'রে আজ তো কবি-যশে আমার মোটেই অধিকার নেই; ভুললে চলবে কেন যে আজকের মূলকাব্য আপনার—আপনিই সন্ধ্যা আর চাঁদের কথা তুললেন, আমি যা বলেছি তা তারই ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছি মাত্র, আমায় হদ্দ আপনার কাব্যের টীকাকার বলতে পারেন।"

মীরা ঘাসের উপর পা দুইটা ছড়াইয়া দিল। শরীরে একটা ছোট্ট আন্দোলন দিয়া হাসিয়া বলিল, "নিন্, কবি চুপ ক'রলে; কে অমন টীকাকারের সঙ্গে কথায় এঁটে উঠবে বলুন?"

এইটুকুর মধ্যে কী যে একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে,—মীরাকে কত যেন ছেলেমানুষের মত দেখাইতেছে. বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আর স্বভাবের গাম্ভীর্যের জন্য যে মীরাকে বয়সের অনুপাতে একটু বড়ই দেখায়।...চাঁদ আরও অনেকটা উপরে উঠিল, জ্যোৎস্না হইয়াছে আরও স্বচ্ছ।...খানিকটা দূরে মোটরটা দাঁড়াইয়া আছে, ড্রাইভার ফুরফুরে হাওয়ায় গা এলাইয়া সীটের উপর লম্বালম্বি শুইয়া আছে, পা দুইটা বাহির হইয়া আছে। তরু একটু আবিষ্ট, স্পষ্ট বুঝিতেছে না কিন্তু বেশ উপভোগ করিতেছে আমাদের কথাগুলা,—কথাবার্তার মধ্যে হাসি থাকিলেও বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া উপভোগ করে, গাম্ভীর্য আসিলেই শঙ্কিত হইয়া ওঠে। এক বার হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "মেজগুরুমার বরকে দেখলাম দিদি, এত আমুদে লোক!"

বাস্তব কথাটা এতই অপ্রাসঙ্গিক যে আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "এর মধ্যে তোমার মেজগুরুমা আর মেজগুরুমশাই কোথা থেকে এলেন তরু?"

তাহার পর তরুর উচ্ছ্বাসের উৎসটা কোথায় বোধ হয় সন্ধান পাইয়া একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং একটা ঘাসের শীষ তুলিয়া দাঁতে খুঁটিতে লাগিল।

...কী চমৎকার একটা রজনী যে আসিয়াছিল জীবনে!...

যেন আরও ছেলেমানুষ হইয়া গিয়াছে মীরা। ওর সঙ্গে কথা কহিতে আর ভয়-ভরসার কথা মনেই আসে না; ছেলেমানুষকে যেমন না বলিলে চলে না, সেই ভাবে কতকটা হুকুমের ভঙ্গিতেই বলিলাম, "যেখান-সেখান থেকে যা তা তুলে নিয়ে দাঁতে দেবেন না; ওতে…"

মীরা সঙ্গে সঙ্গে আমার পানে চোখের কোণ দিয়া লজ্জিত ভাবে চাহিল, তাহার পর অবাধ্য বালিকা যেমন ভাবে বলে, কতকটা সেই ভাবে ঈষৎ হাসিয়া এবং চিবুকটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমি দোব; আপনি তরুর টিউটার, তরুকে শাসাবেন।"—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবাধ্যতার আর একটা নমুনা দাখিল করিবার জন্যই যেন হাতের খণ্ডিত শীষটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা বড় শীষ খুঁটিয়া দাঁতে দিল। তরু হাসিয়া একবার বোনের মুখের পানে চাহিয়া আমার দিকে চাহিল। বলিলাম, "দিদির মত কখনও অবাধ্য হয়ো না তরু।"

মীরা গম্ভীর হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, সব্বাইকে গুরুজন ব'লে মনে ক'রবে, আর…"

গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিল না, হাসিয়া মুখটা ওদিকে ফিরাইয়া লইল।

এ-সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল মীরা, যতটা পারিলাম সদ্ব্যবহার করিলাম। এর পরে বিধাতা একটু সুযোগ সৃষ্টি করিলেন।—

কতকগুলা চাষাভূষা লোক আমাদের পিছনের মাঠ দিয়া আসিয়া রাস্তা পার হইয়া বোধ হয় সামনের কোন এক গ্রামে যাইতেছিল, রাস্তায় মোটর দেখিয়া কৌতূহল-বশে একটু ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া মোটরের রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ লাগাইয়াছে।

তরু প্রশ্ন করিল, "কারা ওরা দিদি? কি অত জিগ্যেস করছে? মোটর দেখে নি কখনও?"

মীরা বলিল, "ওরা চাষা।"

তরু ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "চাষা কখনও দেখি নি দিদি; যাব দেখতে?"

দু-জনেই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "মন্দ নয়, ওরা মোটর দেখে নি, তুমি চাষা দেখ নি—অবস্থা প্রায় একই দাঁড়াল।…যাও।"

তরুর কৌতূহল মিটাইতে অনেকক্ষণ লাগিল। জ্যোৎস্না আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। হাওয়াটা আর একটু জোর হইয়া উঠিয়াছে, মীরার কানের দুল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, বাঁকা সিঁথির রেখা চূর্ণ কুন্তলে এক একবার অবলুপ্ত হইয়া আবার বেশি করিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে,—একখানি মুক্ত অসির ঝলমলানি।… দু-জনেই সামনে চাহিয়া আছি, খুব বেশি কথা বলিবার সময় একেবারে হইয়া গেছি নীরব।…দেখিতেছি চক্ষের সামনে বিশ্বপ্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে,—বাস্তব হইয়া পড়িতেছে যেন স্বপ্ন, আর জীবনের যাহা কিছু এত দিন ছিল স্বপ্ন হইয়া, যেন বাস্তব হইয়া এবার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে…।

ঘাসের উপর মীরার ডান হাতটা আলগাভাবে পড়িয়া আছে, আঙুল কয়টি হালকা মুঠির মধ্যে গুটাইয়া লইয়া ডাকিলাম, "মীরা…"

"কি বলছেন?"—বলিয়া মীরা স্বপ্নালু দৃষ্টি আমার পানে ফিরাইল।

কি বলি?—কি ভাবেই বা বলি?…মীরার হাতটা বুকের আরও কাছে টানিয়া কি একটা বলিব—এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না, তরু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, ড্রাইভার বলছে মেঘ উঠেছে দক্ষিণ দিকে।"

দেখি সত্যই মেঘ উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া আমরা মোটর আশ্রয় করিলাম।

বাসায় আসিয়া ঘরে ঢুকিতে রাজু বেয়ারা আসিয়া চেয়ারটেবিলগুলা ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। যেন সহসা মনে পড়িয়া গিয়াছে এই ভাবে বলিল, "ব্লটিং প্যাডের নীচে একটা চিঠি রেখেছিলাম, পেয়েছেন মাষ্টার মশা?"

দিতে ভুলিয়া গিয়া সামলাইতেছে। আমি প্যাড দেখিবার পূর্বে নিজেই বাহির করিয়া দিল।

অনিলের চিঠি। লিখিয়াছে—একটা সুখবর আছে, সৌদামিনী বিধবা হইয়াছে।

৫

কবে, সুদূর হিমালয়ের কোন্ এক অজ্ঞাত পল্লী হইতে এক পুত্রহারা জননী ব্যর্থ-সন্ধানের নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল। ঘটনাটি আকস্মিক, কিন্তু আমার জীবনে এর প্রভাব আছে; অল্প নয়, বহুল পরিমাণে।

ভুটানী না আসিলে মীরার আপাতত রাঁচি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

মীরার এই রাঁচি যাওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম আসুকই না একটু বিরহ

মীরা যে-স্মৃতিসম্পদ্ দিয়া যাইতেছে তাহাকে পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য অবসর চাই না ?

কিন্তু বিচ্ছেদ কি শুধু স্মৃতিকেই পুষ্ট করে ?

কলিকাতায় এই কয়টা মাসে অনুকূল প্রতিকূল নানা ঘটনার মধ্য দিয়া একটা বিশেষ অবস্থা এবং একটা পরিচিত সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে আমি আর মীরা যেন পরস্পরের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিলাম। রাঁচিতে মীরা নিজেকে নিজেদের অভিজাত সমাজে আবার নূতন ভাবে দেখিবার সুযোগ পাইল।

আবার ভাবি আমাদের উভয়ের জীবনে বোধ হয় এটুকুর প্রয়োজন ছিল। বিনা প্রয়োজনে কোন্ ঘটনাই বা ঘটে জীবনে ?

কিন্তু থাক্ একথা এখন, যথাস্থানেই আলোচনা হইবে।

মিস্টার রায় সকলকে রাঁচিতে রাখিয়া আসিবার দুই দিন পরে তরুর চিঠি পাইলাম। মীরার চিঠির অপেক্ষায় আরও কয়েক দিন থাকিতে হইল। তাহার পর আসিল একদিন চিঠি।

মীরা উচ্ছ্বসিত হইয়া রাঁচির কথা লিখিয়াছে। ওদের বাসাটা রাঁচি-হাজারীবাগ রোডে; খুব চমৎকার ফাঁকা জায়গা। সামনেই মোরাবাদী পাহাড়। ওরা গিয়াছিল এক দিন বেড়াইতে এর মধ্যে। পাহাড়ের উপর মহাপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী। আরও উঠিয়া গেলে, পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে চারিদিকে খোলা একটি চমৎকার মন্দির, এইখানে বসিয়া তিনি উপাসনা করিতেন। এইখান হইতে নীচের চারিদিকের দৃশ্য যে কী চমৎকার বলিয়া বুঝান যায় না। কৃষ্ণনগরের গড়া, বাগান দিয়া ঘেরা মডেল পুতুল-বাড়ির মত দূরে-কাছে বাড়ি সব—বাগানে পুতুলের মত মালী কাজ করিতেছে—কোন বাড়ির গেটের ভিতর খেলনার মোটরের মত একটি মোটর প্রবেশ করিল—পুতুলের মত কয়েক জন ছোট্ট ছোট্ট মানুষ নামিয়া ভিতরে গেল। সামনে চাহিলে অনেক দূরে দেখা যায় রাঁচি শহর, মাঝখানে রাঁচি হিল্। তাহার চূড়ায় মন্দির। আরও অনেক দূরে কাঁকের নব-নির্মিত পল্লী। অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশ আর চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ উঁচুনীচু পল্লী দেখিয়া মনটা আপনি আপনিই যেন কিসে ভরাট হইয়া আসে। মীরার অসুবিধা হইয়াছে যে সে কবি নয়, তাহারও উপর অসুবিধা যে একজন কবির কাছে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথম ছুটিতেই যেন যাই আমি একবার, যদি মনে করি পড়িবার ক্ষতি হইবে তো সে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও।

সবচেয়ে ভাল খবর, মা ভাল আছেন, এত প্রফুল্ল তাঁহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মীরার মনে পড়ে না। ধন্যবাদটুকু আমার প্রাপ্য। নিশীথবাবুর বাড়িটা চমৎকার, কয়েক দিন হইল মায়ের জবানীতে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে পত্র দেওয়া হইয়াছে

চিঠিতে ডায়মণ্ড হারবার রোডের দিক দিয়াও যায় নাই মীরা, যদি যাইত তো শ্রদ্ধা হারাইত আমার।

অনিলের পত্রের উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল, কেন না মীরার চিঠির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লিখিলাম—

"অনিল,

সৌদামিনীর বৈধব্যের খবরটা কি আগাগোড়াই সুখবর ? ভগবান্ সুস্থভাবে চলাফেরা করবার জন্যে দু'টি ক'রে পা দিয়েছেন; কিন্তু এমন হতভাগ্যও তো আছে যাদের এই কাজটুকুর জন্যে একজোড়া কাঠের ক্রচই সম্বল ? এখন এই ক্রচ্-বেচারিরা আসল পা নয় বলে সে দুটির ওপর চটলে চলবে কেন ?…সৌদামিনীর পঁচাত্তর বৎসরের স্বামী—বা তোর দিক দিয়ে বলতে গেলে স্বামী-পদবাচ্য জীবটি তার ঠিক স্বামী না হ'তে পারুক, একটা মস্ত অবলম্বন ছিল, যার জোরে সদু দাঁড়িয়ে ছিল, ভুঁয়ে গড়িয়ে পড়ে নি। এইবার ওর সেই দুর্দিন এল।"

সৌদামিনীর বৈধব্য সম্বন্ধে এইটুকু অভিমত দিয়া মীরার কথাও একটু লিখিয়া দিলাম, উদ্দেশ্য, আরও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যে অনিল স্কুলের মাঠে সদুর সম্বন্ধে যাহা উচ্ছ্বাসের মুখে বলিয়াছিল, সে দিক্ দিয়া আর কোন আশাই নাই। লিখিলাম—"এদিককার খবর এই যে মীরারা গেছে রাঁচি, বোধ হয় মাসখানেক থাকবে। যাওয়ার আগের দিন ও আমায় এমন একটা জিনিস দিয়ে গেল যা রক্ষা করতে হ'লে আমার আর সব কথাই ভুলতে হবে। এই জিনিসটি পাওয়ার জন্যই আমার এই এত দিনের তপস্যা, তোকে আমি সে কথা ব'লেও ছিলাম। এ-ভোলার মধ্যে কর্ত্তব্যহানি এসে পড়বে বোধ হয়, কিন্তু সে-অপরাধ আমি নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ক'রলাম এইটে জেনে আমায় মার্জনা করিস।"

কয়েক বার পড়িয়া গেলাম, তাহার পর অন্য একটা কাগজে শুধু উপরের কথাগুলি, অর্থাৎ সদুর বৈধব্য সম্বন্ধে আমার মন্তব্যটুকু লিখিয়া চিঠিটা পাঠাইয়া দিলাম। দেখিলাম ওইটুকুতেই আমার উদ্দেশ্যটা বেশ স্পষ্ট হইয়া আছে, বেশি বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই।

একটা কথা আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহা এই যে

মীরা আসিয়াছে পর্য্যন্ত অনিলের সঙ্গে আমি লুকাচুরি করিতেছি, কথা বলিতেছি মাপিয়া জুপিয়া; কাটছাট করিয়া; না লুকাইবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোথায় কি যেন আপনিই আটকাইয়া যাইতেছে। ভাবি, কেন হয় এমন? মীরাকে কাছে আনিতে অনিল কি দূরে পড়িয়া যাইতেছে? প্রশ্নটা অন্য দিক দিয়া করিলে এই রকম দাঁড়ায়—জীবনে প্রিয়তম কি শুধু এক জনই হয়?

একটা দিন বাদ দিয়াই অনিলের উত্তর আসিল। লিখিয়াছে—"সত্যটাকে তুই পুরোপুরি দেখতে পাস নি, দেখেছিস তার অর্ধেকটা। আসল কথা, আমাদের দেশে মাত্র পুরুষ মানুষেরই পা আছে, মেয়েদের নেই। এই কথাটা শাস্ত্র নানা ভাবে যুগ যুগ ধ'রে প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। পা নেই ব'লে—কিম্বা আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে, পা যে নেই এই সিদ্ধান্তটা নানা উপায়ে সাব্যস্ত ক'রে মেয়েদের জন্যে আগাগোড়া পরিবর্তনশীল ক্রচেটের ব্যবস্থা করেছে—যেমন বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র। এর মধ্যে আগের আর শেষের দু'টি বিধাতার হাতে, মাঝেরটি সমাজ রেখেছে নিজের আয়ত্তের মধ্যে। ব্যবস্থাটার দোষগুণ নিয়ে আমি আলোচনা করছি না এখানে। আমার কথা হচ্ছে—যদি সমাজই এ-ভার নিয়ে থাকে তো, মেয়েদের এ-বিষয়ে স্বাধীনতা যদি না দেয় তো এই যে একটা সুস্থ সবল "রোগী"র জন্যে ঘুণ-ধরা ক্রচের ব্যবস্থা করা হ'ল, এ-প্রবঞ্চনার কে জবাবদিহি করবে? সদুর ক্ষেত্রে জবাবদিহি কেউ চাইবেও না, কেউ দেবেও না, বরং সমাজের যদি অনার্স লিস্ট বের করবার ক্ষমতা থাকত তো ভাগবত হালদার অচিরেই নাইট উপাধিতে ভূষিত হ'ত, কেন না সে যা শিভ্যালরির কাজ ক'রেছে তা মধ্যযুগের ইউরোপীয়ান নাইটের দ্বারাই সম্ভব ছিল। আমি জানি এসব কথা, তাই সাজা-পুরস্কারের কথা না তুলে সেই নবীনের কাছে এ্যাপীল করেছিলাম যে (আমি ভেবেছিলাম) যৌবনের স্পর্ধিত বিক্রমে এই অন্যায়ের একটা সমাধান করতে পারবে। সদু যদি শুধুই বিধবা হ'ত তো আমি তাও করতাম না, করলাম এই জন্যে যে ওর বৈধব্য-যন্ত্রণার শেষে আছে ভাগবতপ্রাপ্তি। আজকাল আমাদের হাসপাতালের চার্জে একজন নতুন ডাক্তার এসেছে। সে রোগীদের ভাল করবার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেছে যে রোগীমহলে একটা আতঙ্ক এসে গেছে এবং সুস্থ মানুষেরা প্রাণপাত ক'রে চেষ্টা করছে যাতে রোগী হ'য়ে না প'ড়তে হয়। ডাক্তার বাড়ি বাড়ি ঘুরে দু-বেলা কুশল-সংবাদ নিয়ে বেড়াচ্ছে, এবং ঘুণাক্ষরেও কোথাও রোগের আঁচ পেলেই হয় আউট্‌ডোর নয় ইন্‌ডোর পেশেণ্ট ক'রে ভর্তি ক'রে ফেলছে। লোকেরা খাতিরে প'ড়ে কিছু বলতে পারছে না,—একটা অতবড় ডাক্তার—গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালের চার্জে রয়েছে—সে এসে যদি দু-বেলা তোমার বাড়ির স্বাস্থ্যের জন্যে তোমার চেয়েও উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ে তো কি রকম একটা বাধ্যবাধকতায় প'ড়ে যেতে হয় ভেবে দেখ না। মনে হয় না যে অসুখে না প'ড়ে কত বড় একটা অন্যায় করছি? এর ওপর বিপদ হয়েছে লোকটা রোগ সারাতে পারে না, এবং তার চেয়েও বিপদের কথা এই যে, না সারাতে না পারা পর্য্যন্ত ছাড়েও না। আউট্‌ডোর পেশেণ্টরা দেখতে দেখতে ইন্‌ডোরের বিছানা ভর্তি ক'রে ফেলছে এবং ইনডোর পেশেণ্টদের মনের ভাবটা এই যে যদি যমের দোর দিয়েও তারা বেরিয়ে পড়তে পারে তো বাঁচে।...পরশু একটা ইন্‌ডোর পেশেণ্ট রাত দুপুরে জানলা টপকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, তার ধারণা ছিল তার কোন রোগ নেই অথচ তাকে নাহক্ আটকে রাখা হয়েছে। এখন তার সে ভুল ধারণাটা গেছে, পা ভেঙে কায়েমী ভাবে পড়ে আছে হাসপাতালে। একটা এমন ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়ে গেছে যার তুলনা শুধু কলকাতার দাঙ্গার সঙ্গে হ'তে পারে। যার যেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে সেইখানে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে বাড়ি খালি করে ফেলছে।

অবশ্য ভাগবত হালদারের সঙ্গে পরেশ ডাক্তারের তুলনা হ'তে পারে না, তবু উপকারীর হাত থেকে মুক্তি-সমস্যার কথায় পরেশ ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল। মুক্তি সম্বন্ধে আমি তোর কথা ভেবেছিলাম অনেক কারণে, প্রথমত, এখানে "রোগী" আমাদের সৌদামিনী, আমাদের ছেলেবেলাকার 'সদী'।

দ্বিতীয়ত, সৌদামিনী দুর্লভ স্ত্রীরত্ন, গলায় হার ক'রে পরবার জিনিস।' ওর মত মুক্ত-প্রকৃতির স্ত্রীলোক কটা পাওয়া যায় সংসারে? ওর অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেও অমন নিষ্কলুষ শুদ্ধি! আর জানিস?—তোকে কথাটা বলেছি কি না আমার মনে পড়ছে না—সদু শিক্ষিতা। শিশুশিক্ষা আর ধারাপাত পড়া নয়—বাঙালী শিক্ষিতা মেয়ে বলতে সাধারণত যা অর্থ দাঁড়ায়; সদু সংস্কৃত খুব ভাল জানে। ভাগবত সৌখীন মানুষ, সংস্কৃত কাব্যে সদুকে বেশ ভাল রকম তালিম দিয়ে রেখেছে, এদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যেও। উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় এই যে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে হাতে কলমে কৃষ্ণপ্রেম চর্চা করবে, তাতে

কোন গ্রাম্যতা দোষ না এসে পড়ে। তারপর জ্ঞানের একটা স্পৃহা জাগায় চুরি ক'রে ইংরিজীও শিখেছে ও, অবশ্য অল্প। তুই লক্ষ্য করেছিস কি না জানি না, সদু যখন কথা বলে মাঝে মাঝে শুদ্ধ শব্দ এসে পড়ে, যদিও ওর বরাবর চেষ্টা থাকে ওর শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা কেউ টের না পায়।···এ হেন অমূল্য রত্ন কোন্ ধুলায় গড়াগড়ি দেবে ?

ওকে গ্রহণ করতে বলার—আরও স্পষ্ট ক'রে বলি, বিয়ে করতে বলার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল—সমাজকে একটা আঘাত দেওয়া, এমন একটা আঘাত দেওয়া যাতে সমাজকে জেগে উঠে বিস্মিত, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অপলক ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে হবে। আঘাত অন্য ভাবে দেওয়া যেত, সদুকে রিফিউজে ভর্তি ক'রে দিয়ে বা হিন্দু মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে সহজেই একটা বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারা যেত; ভাগবত হ'ত নিরাশ, সমাজ একটু চোখ রগড়াত কিন্তু তাতে আমার আশ মিটত না। আমি চাই আঘাত হবে রূঢ় এবং তা করতে হলে এমন একজন এসে সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এই সদ্য বিধবাকে গ্রহণ করবে যে বংশে, মর্য্যাদায়, শীলে, শালীনতায়, শিক্ষায় সমাজের একজন আদর্শ যুবা, যার এই দুঃসাহসিকতা দেখে সমাজ যেমন একদিকে স্তম্ভিত হবে, তেমনি অপর দিকে যাকে হারাবার ভয়ে সমাজের বুক উঠবে কেঁপে। আমি এই জন্যে বিশেষ করে বেছেছিলাম তোকেই। সদুর প্রতি অন্যায় হয়েছিল—সদুর মত মেয়ের প্রতি। শুধু তো সদুর ক্ষতিপূরণ করলে চলবে না, যে-সমাজ এই অন্যায় হতে দিয়েছিল, তার প্রতিও যে আমাদের একটা আক্রোশ আছে। শুধু ক্ষতিপূরণে হবে না, তার ওপর চাই আক্রোশের আঘাত। তা না হলে সৌদামিনীর মত অত্যাচরিত হ'য়ে আজ পর্য্যন্ত যত নারী মরেছে, সদুরও জীবনের যে দেবদুর্লভ অংশ এই অর্ধযুগ ধরে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে ছাই হয়ে গেছে, তাদের তর্পণ হবে না।··এই যুগের নারীর প্রতিনিধি হিসাবে সদু তার এই অর্থহীন সদ্য-বৈধব্যকে অস্বীকার করে নিতান্ত শুদ্ধ শুচি কুমারীর মতই এসে দাঁড়াবে, আর পুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে তুই তার গলায় মালা দিয়ে তুলে নিবি। সমাজের বিস্মিত নীরব প্রশ্নের এই হবে উত্তর—অর্থাৎ এ-অন্যায়, এ-অত্যাচার এ-যুগের আমরা আর সহ্য করব না।

আমার ছিল এই উদ্দেশ্য; আশা ছিল সৌদামিনীর মধ্যে দিয়ে জীবনে যে দারুণ আঘাত পেলাম তার একটা সুফল হবে, কেন না শক্ত রকম সব আঘাতেরই একটা সুফল আছে শোনা যায়। নিরাশ হলাম, আমারই ভুল হয়েছিল। কবি, সে এত দিন প্রণয়ের স্বপ্ন নিয়েছিল; এখন, যখন সেই স্বপ্ন হ'তে চলল বাস্তব, তার কাছে এসব বাজে কথা তোলা উপদ্রব নয় কি? আমাদের আপিসের বীরু গাঙ্গুলীর কথাটা আমার মনে পড়ে যাওয়া উচিত ছিল। বীরু ছিল আন্‌পেড এ্যাপ্রেন্টিস্। যেদিন তার মাইনে হবার খবর বেরুল, সেদিন লড়াইয়ে বাঙালী পল্টন হয়ে ভর্তি হবার ফরম্ আপিসে এল। বড়বাবু একটু উঠে পড়ে লাগলেন। বীরু হাতজোড় ক'রে বললে, "স্যার, কাল পর্যন্ত বললে যে-কোন বীরত্বের কাজ করতে বীরু পেছপা ছিল না, দু-বচ্ছর এই পনরটি টাকার স্বপ্ন দেখে দেখে যেই ফলল স্বপ্নটা আর সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ে চল?"

"কাল পর্যন্ত বললে হ'ত" একথা অবশ্য তুই বলতে পারবি না, কেন না সদুর কথা তোকে অনেক দিনই ব'লে রেখেছি। তবে তোতে আর বীরুতে তফাৎ আছে নিশ্চয়, সে তবুও কেরাণী, তুই একেবারেই কবি।

অম্বুরী বলছে—'এবার যদি ঠাকুরপো আসতে মাস-খানেকের বেশী দেরী করেন তো সদলবলে গিয়ে সবাই উঠব, আর তো ঠিকানা লুকুন নেই, মা এক রকম ভাল আছেন। সানু তোর দেওয়া বন্দুকটা নিয়ে খুব বড়াই ক'রে বেড়ায়, বলে—'শৈলটাকা খুব বা-আ-ডুর, এট্টো বড়ো বণ্ডুক আছে।'···কত যে বাহাদুর আর বলি নি। আমার ছেলে যদি কখনও গ্রামের ইতিহাসের এ-অংশটা জানতে পারে আর আমার দৃষ্টি পায় তো নিজেই বিচার করতে পারবে।

অত্যন্ত চটিয়াছে অনিল। দুঃখ হয়। কিন্তু আমি যে কত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি তাহা কি কোন দিনও বুঝিবে না? ওর তো বোঝা উচিত, কেন না ও-ও তো এক দিন ভালবাসিয়াছিল। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করি—আজ পর্যন্ত সৌদামিনীর দুঃখ ওর প্রাণে অত বাজে কেন তাহা হইলে কি ও আমার অন্তরের বেদনা বুঝিতে পারিবে না? ওর এটা কি শুধুই কর্তব্যের তাগিদ? শুধুই সমাজ-সংস্কার? শুধুই সদুর মত নারীরত্নের ক্ষতিপূরণ?

ক্রমশঃ

বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত

২১

সখী সঁ নায়িকা বচন

(সখি হে কিলয় বুঝাএব কংতে)।
জনিকা জন্ম হোইত হম গেলহুঁ,
ঐলহুঁ তনিকর অংতে ॥
জাহি লয় গেলহুঁ সে চল আএল,
তেঁ তরু রহলি ছপাঈ।
তে পুনি গেল তাহি হম আনলি,
তেঁ হম পরম অন্যাঈ ॥
জেঁ তহিঁ নাল কমল হম তোরলি,
করয় চাহ অবশেখে।*
(কোহ কোহাএল) মধুকর ধায়ল,
তেঁহি অধর কর ...
কেলি ভরল কুংভ তেঁ উর গাসলি,
সসরি খসল কেশ পাশে।
সখি দস আগু পাছু ভয় চললিহি,
তেঁ উর্ধ্বশ্বাস ন বাকে ॥
(ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি),
ঈ সভ রাখু মন গোঈ।
দিন২ ননদি সঁ প্রীতি বঢ়াএব,
বোলি বেকত জবু হোঈ ॥

(... ...)।

যাহার জন্মে গেলাম, তাহার অন্তে আসিলাম ॥

[সুর্য্যোদয়ে বা চন্দ্রোদয়ে গেলাম, সুর্য্যাস্তে বা চন্দ্রাস্তে আসিলাম।]

যাহার জন্য গেলাম, সে চলিয়া আসিল, তাই তরুতলে লুকাইলাম।

সে পুন গেল, তাকে আমি আনিলাম, সে আমার পরম অন্যায় ॥

যখন কমলনাল ভাঙ্গিয়া অবশেষে* হাতে লইলাম। শব্দ করিয়া মধুকর ধাইল, আমার অধর দংশন করিল ॥

কুম্ভ ভরিয়া লইলাম, তাই উরস্থল গ্রাসিয়া কেশ-পাশ সরিয়া খসিয়া পড়িল।

দশ জন সখী আগু পাছু হইয়া চলিল, তেঁই উর্দ্ধশ্বাস ও বাক্য নাই ॥

(... ...), এ সব মনে গোপন করিয়া রাখ।

দিনে দিনে ননদীর সহিত প্রীতি বাড়াইবি, বল্লে পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে ॥

* করয় চাহ অবশেখে—I wished to bathe.—Grierson

২২

ননদি সঁ নায়িকা বচন।

(ননদী সরূপ নিরূপহ দোসে)।
বিনু বিচার ব্যভিচার বুঝৈবহ,
সাসু করয়বহ রোসে ॥
কৌতুক কমল নাল হম তোড়লি,
করয় চাহ অবতংসে।
রোষ কোষ সঁ মধুকর ধাওল,
তেঁহি অধর কর দঁসে ॥
সরোবর ঘাট বাট কংটক তরু,
হেরি নহিঁ সকলহুঁ আগ।
+ + । + + ॥
(গরুঅ কুংভ সির থির নহিঁ থাকয়),
তেঁ ও খসল কেশ পাসে।
সখি জন সঁ হম পাছু পড়লহুঁ,
তেঁ ভেল দীর্ঘ নিশাসে ॥
পথ অপরাধ পিশুন পরচারল,
তথি হুঁ উতর হম দেলা।
অমরথ তাহি ধৈরজ নহিঁ রহলৈ,
তেঁ গদ গদ সুর ভেলা ॥
(ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহু বর জউবতি,
ঈ সভ রাখহ গোঈ)।
নংদী সঁ রস রীতিঁ বচাওব,
গুপুত বেকত নহিঁ হোঈ।

(... ...)।
বিনা বিচারে ব্যভিচার বুঝ, শ্বাশুড়ীকে রাগাও ॥
কে কে কমলনাল তুলিয়া অবতংস করিতে চাহিয়াছিলাম।
রোষে আক্রোশে মধুকর ধাইয়া অধর দংশন করিল ॥
সরোবর ঘাটে বাটে কণ্টকতরু, সকলগুলো আবার চোখেও পড়ে না।
(গুরু কুম্ভ, শির স্থির রাখিতে পারিলাম না), তাই কেশপাশ খসিল, আমি সঙ্গীদের পিছিয়ে পড়েছিলাম, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ॥
পথে অপরাধের নিন্দা খল প্রচারিল, তখনই তার উত্তর দিলাম।
মূর্খ তাই ধৈর্য্য ছিল না, খবরটা সেইজন্যে গদ্‌গদ গোছ হয়েছিল ॥
(বিদ্যাপতি কহে বর যুবতী শুন, এ সব গোপনে রাখ)।
ননদী হইতে রসরীতি বাঁচায়ে রেখো, দেখো গোপন যেন ব্যক্ত না হ'য়ে পড়ে ॥

২৩

সখি সঁ নায়িকা বচন

\+ + । + + ॥
একহিঁ নগর বসু মাধব সজনী, পর ভাবিনি বস ভেল।
\+ + । + + ॥
অভিনব এক কমল ফুল সজনী, দোনা নীমক ডার।
সে হো ফুল ওতহী সুখাএল সজনী,
রসময় ফুলল নেবার ॥
বিধি বস আজ আএল ছথি সজনী,
(এত দিন ওতহি গমায়)।
কোন পরি করব সমাগম সজনী,
মোর মন নহিঁ পতিআয় ॥

এক নগরে মাধব বাস করে, কিন্তু পর ভাবিনীর বশ হইল।
\+ + । + + ॥
অভিনব এক কমল ফুল, নীমের দোনায় ডারে।
সে ফুল আতপে শুখাইল, রসময় হইয়া ফুটিতে পারিল না ॥
বিধিবশে আজ আইল, (এত দিন সেখানে গমাইয়া)।
পরে আবার কাহার সহিত সমাগম হইবে, আমার মন প্রত্যয় যায় না।

২৪

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

লোচন অরুণ বুঝলি বড় ভেদ।
রৈনি উজাগরি গুরুঅ নিবেদ* ॥
ততহিঁ জাহ হরি ন করু লাথ।
রৈনি গমৌলহ জনিকেঁ সাথ ॥
কুচ কুংকুম মাখল হিঅ তোর।
জনি অনুরাগ রাগি কর গোর ॥
আনক ভূষণ লাগল অংগ।
উকুতি বেকত েঁাঅ আনক সংগ ॥
ভনাইঁ বিদ্যাপতি বজবহুঁ বাধ।
বড়াক অনয় মৌন পয় সাথ ॥

নয়ন অরুণ, ইহার ভেদ বুঝেছি। রাত্রি জাগরণ গুরু নিবেদ* ॥
হরি আর ভান করো না। যার সঙ্গে রাত কাটালে, তার কাছে যাও।
কুচ-কুঙ্কুম তোর হৃদয়ে মাখল।—যেন অনুরাগের রঙ্গে গৌর করিয়াছে।
অন্যের ভূষণ অঙ্গে লাগিল। ইহাতে অন্যের সঙ্গ ব্যক্ত হইতেছে ॥
বিদ্যাপতি ভণে, এরূপ বলা ভাল নয়। বড়র অন্যায় মৌন থাকাই উচিত ॥

২৫

নায়িকা সঁ দূতি বচন

কমল ভ্রমর জল অছএ অনেক।
সভ তঁহ সঁ বড় জাহি বিবেক ॥
মানিনি তোরিত করিঅ অভিসার।
অবসর থোড়হু বহুত উপকার ॥
মধু নহিঁ দেলহ রহলি কি খাগি।
সে সম্পতি জে পরহিত লাগি ॥
অতি অতিশয় ওলনা তুঅ দেল।
জীব জীব অনুতাপক ভেল ॥

---

* নিবেদ—to betray (Grierson)। গুরু রাত্রি জাগরণ প্রকাশ করিতেছে।

তোহে নহিঁ মন্দ২ তুঅ কাজ।
ভলো মন্দ হোঅ মন্দ সমাজ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ।
নিজ ক্ষতি বিনু পরহিত নহিঁ হোএ॥

কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে। সবার চেয়ে সেই বড় যাহার বিবেক আছে॥
মানিনি ত্বরায় অভিসার কর। অল্প অবসর কিন্তু বহুত উপকার॥
মধু না দিলি, (অভাব কি আছে?)। সেই সম্পত্তি যাহা পরহিতের জন্য॥
তোতে মন্দ না থাক, তোর কাজ মন্দ। মন্দ সমাজে ভালও মন্দ হয়।
বিদ্যাপতি কহে হে দূতি গোপনে বল। নিজ ক্ষতি বিনা পরহিত হয় না॥

২৬

নায়িকাক প্রতি সখিক প্রবোধন

ধন জোবন রস্ রংগে।
দিন দশ দেখিঅ তুলিত তরংগে॥
সুঘটিত বিহ বিঘটাবে।
বাঁক বিধাতা কী ন করাবে॥
ঈও ভল নহিঁ রীতী।
হঠেঁ ন করিঅ দুরি পুরুষ পিরীতী॥
সচ কিত * হেরয় আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা॥
নয়ন তেজয় জল ধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা॥
লখ জোজন বস চন্দা।
ভৈঅও কুমুদিনি করয় অনন্দা॥
(জকরা জাস রীতী)।
দুরহুক দুর গেলেঁ দো গুন পিরীতী॥
(বিদ্যাপতি কবি গাহে)।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে॥

ধন যৌবন রস রঙ্গে।
দিন দশ তরঙ্গ তোলে॥
বিহি সুঘটিতকে বিঘটায়।
বাঁকা বিধাতা কি না করায়॥
ইহা ভাল রীতি নয়।
জোর করে পূর্ব্ব পিরীত দুর করো না॥
সচকিতে* আশাপথ দেখ।
সুপ্রভুর সমাগম স্মরণ করিয়া॥
নয়নে জল। কাপড় পরাও নেই, হার পরাও নেই॥
লাখ যোজনে চাঁদ।
তবুও কুমুদিনী আনন্দ করে॥
(যার সনে যার পিরীতি)।
দুর হ'তে দূরে গেলে দ্বিগুণ পিরীতি বাড়ে॥
(বিদ্যাপতি কবি গায়ে)।
সুপ্রভু কথিত কথা নির্ব্বাহ করে॥

২৭

কোন বন বসথি মহেস।
কেও নহিঁ কহসি উদেস॥
তপোবন বসথি মহেস।
ভৈরব করথি কলেস॥
কান কুংডল হাথ গোল।
তাহি বন পিআ মিঠি বোল॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল।
তাহি বন স বোল॥
একহি বচন বিচ ভেল।
পহু উঠি পরদেশ গেল॥

কোন বনে মহেশ বসে।
কেহ উদ্দেশ কহে না॥
তপোবনে বসে মহেশ।
ভৈরব করিছে ক্লেশ॥
কানে কুণ্ডল হাতে গোলা
তাতে বনে পিয়ার মিঠি বোল॥
যে বনে তৃণও না দোলে।
সে বনে পিয়া হেসে বোলে॥
একটি কথা মাঝে হইল।
প্রভু উঠি পরদেশে গেল॥

২৮

নায়িকা কৃত স্বদুখ বর্ণন

এক দিন ছলি নব রীতি* রে।
জল মিন জেহন প্রীতি রে॥

* সচকিত—Tell me the truth (Grierson)।

একহিঁ বচন ভেল বীচ রে।
হাসি পহু উতর ন দেল রে॥
এক হিঁ পলংগ পর কান্হ রে।
মোর লেখ দুর দেশ ভান রে॥
জাহি বন কেও ন ডোল রে।
তাহি বন পিআ হসি বোল রে॥
ধরব জোগিনিআক ভেস রে
করব মেঁ পহুক উদেশ রে
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুস ন করে নিদান রে॥

এক দিন নূতন রীতি* হয়েছিল।
জলে মীনে যেমন পিরীতি রে॥
একটি কথা মাঝে হল।
হাসি প্রভু উত্তর না দেল॥
এক পালঙ্ক পরে কান।
মোর মনে দূর দেশ জ্ঞান॥
ধরিব যোগিনীর বেশ রে।
করিব প্রভুর উদ্দেশ রে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ না করে নিদান রে॥

২৯

নায়িকা সঁ নায়ক বচন।

মানিনি আব উচিত নহিঁ মান।
এখনুক রংগ এহন সন লগইছি, জাগল পয় পচোবান॥
জুড়ি রইনি চকমক কর চানন, এহন সময় নহিঁ আন।
এহি অবসর পহু মিলন যেহন সুখ, জকরহিঁ হোএ সে জান॥
রভসি২ অলি বিলসি২ করি, জেকর অধর মধু পান।
অপন২ পহু সবহু জেমাওলি, ভূখল তুঅ জজমান॥
ত্রিবলি তরংগ সিতাসিত সংগম, উরজ শংভু নিরমান।
আরতি পতি পরতিগ্রহ মগইছি, করু ধনি সরবস দান॥
দীপ দিপক দেখি থির ন রহয় মন, দৃঢ় করু অপন গেআন।
সংচিত মদন বেদন অতি দারুন, বিত্তাপতি কবি ভান॥

মানিনি, এখন উচিত নহে মান।
এখনকার রঙ্গ এমন মত লাগিছে,
জাগিল পঞ্চবাণ॥
জুড়িয়া রজনী চকমক করে চন্দ্র,
এমন সময় নহে আন।
হেন অবসরে প্রভু মিলন যেমন সুখ,
যাহার হয় সেই জান॥
রভসি২ অলি বিলসি২ করে, যেমন (?)
অধর মধু পান।
আপন২ প্রভু সবাই সম্ভাষলি,
ক্ষুধিত তোমার যজমান॥
ত্রিবলি তরঙ্গ গঙ্গা যমুনা সঙ্গম,
উরজ শম্ভু নির্ম্মাণ।
আরতি পতি প্রতিগ্রহ মাগিছে,
কর ধনি সর্ব্বস্ব দান॥
একজন দীপ অপর আলো, মন স্থির রহে না,
কর দৃঢ় আপন জ্ঞেয়ান।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুণ,
বিদ্যাপতি কবি ভাণ॥

৩০

পরকীয়া নায়িকা সঁ নায়ক বচন।

পূর্বক প্রেম ঐল হুঁ তুঅ হেরি।
হমরা অবৈত বৈসলি মুখ ফেরি॥
পহিল বচন উতরো নহিঁ দেলি।
নৈন কটাক্ষ সঁ জিব হরি লেলি॥
তুঅ শশিমুখী ধনি ন করিঅ মান।
হমহুঁ ভ্রমর অতি বিকল পরান॥
আস দেই ফেরি ন করিঐ নিরাসে।
হোহু প্রসন হে পুরহ মোর আসে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুমু পরমানে।
তুহু মন উপজল বিরহক বানে॥

পূর্ব্ব প্রেমে আসিনু তোমা হেরিতে।
আমি আসিতেই বসিলে মুখ ফিরায়ে॥
প্রথম বচনে উত্তর না দিলে।
নয়ন-কটাক্ষে জীবন হরি নিলে॥
তুমি শশিমুখি ধনি না করিও মান।
আমি যে ভ্রমর অতি বিকল পরাণ॥
আশ দাও পুন নাহি করিও নিরাশ।
হও হে প্রসন্ন পূরাও মম আশ॥

* নব রীতি—A young love (Grierson)।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ।
দুহু মনে উপজিল বিরহের বাণ॥

৩১

নায়িকা বিলাপ।
মাধব ঈ নহি উচিত বিচারে।
জনিক এহন ধনি কাম কলা সনি, সে কিঅ করু
ব্যভচারে॥
প্রাণ হুঁ তাহি অধিক কয় মানব, হৃদয়ক হার সমানে।
কোন পরিযুক্তি আন কৈঁ তাকব, কী থিক হুনক
গেআনে॥
কৃপিন পুরুখ কৈঁ কেও নহি নিক কহ, জগ ভরি কর
উপহাসে।
নিজ ধন অছৈতি নৈ উপভোগব, কেবল পরহিক আসে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুহু মধুরাপতি, ঈ থিক অনুচিত কাজে।
মাঁগি লাএব বিত সে যদি হোয় নিত, অপন করব কোন
কাজে॥

মাধব এ নহে উচিত বিচার।
যাহার এমন ধনি কামকলা সম,
সে কিরে করে ব্যভিচার॥
প্রাণ হ'তে তারে অধিক মানি,
হৃদয়ের হার সমান।
কোন যুক্তিতে সে অন্যেরে তাকায়,
এ কিরূপ তার জ্ঞান॥
কৃপণ পুরুষে কেহ খ্যাতি নাহি কহে,
জগ ভরি করে উপহাস।
নিজ ধন থাকিতে না করে উপভোগ,
কেবল পরের প্রতি আশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন মথুরাপতি,
এ বড় অনুচিত কাজ।
মেগে আনা বিত্ত সে যদি হয় নিত্য,
তবে আপন করিবে কোন কাজ॥

৩২

হরি সঁ নায়িকা বচন।
আজু পরল মোহি কোন অপরাধে।
কিঅ ন হেরিঐ হরি লোচন আধে॥
আন দিন গহি গৃম লাবিঅ গেহা।
বহু বিধি বচন বুঝাএব নেহা॥
মন দৈ রুসি রহল পহু সোঈ।
পুরখক হৃদয় এহন নহিঁ হোঈ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুহু পরমান।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান॥
আজ পড়িনু আমি কোন অপরাধে।
কেন না হেরিছে হরি লোচন আধে॥
আন দিন গ্রীবা ধরি নিয়ে আসে গেহ।
বহুবিধ বচনে বুঝাও নেহ॥
মনে হয় রুষিয়া রহিল প্রভু সেহ।
পুরুষের হৃদয় এমন নাহি হয়॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ।
বাড়িল প্রেম চলি গেল মান॥

৩৩

সখী সঁ নায়িকা বচন।
মাধব কি কহব তিহরো জ্ঞানে।
সুপহু কহল জব রোস কয়ল তব, কর মুনল দুহু কানে॥
আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু, তেঁ কিছু
পুছিও ন ভেলা।
এহন করমহিন হম মনি কে ধনি, কর সে
পরসমণি গেলা॥
জেঁা হম জনিত হুঁ এহন নিঠুর পহু, কুচ কংচন
গিরি সাধী।
কৌসল করতল বাহুলতা লয়, দৃঢ় কয় বধিতহুঁ
বাঁধী॥
ই সুমরিঐ জবে জঁ ন মরিঐ তব, বুঝি পড়
হৃদয় পখানে।
হেমগিরি কুঁমরি চরন হৃদয় ধরু, কবি বিদ্যাপতি ভানে॥
মাধব কি কহিব তাহার জ্ঞেয়ানে। (অর্থাৎ মাধ-
বের জ্ঞানের কথা কি কহিব)
সুপ্রভু কহনু যবে, রোষ করিল তবে, করে মুদিল
দুই কানে॥
আইল গমন বেলা নীদ না টুটিল, সে ত কিছু
নাহি শুধাইল।
এমন করমহীন মম সম কোন ধনি, হাত হৈতে
স্পর্শমণি গেল॥

যদি আমি জানিতাম এমন নিঠুর প্রভু, কুচে
কাঞ্চন গিরি সাধি।
কৌশল করিয়া বাহুলতা লয়ে, দৃঢ় করি
রাখিতাম বাঁধি ॥
ইহা স্মরিয়া যবে যদি না মরিল তবে, বুঝি বড়
হৃদয় পাষাণ।
হেমগিরিকুমারী-চরণ হৃদয়ে ধরি, কবি
বিদ্যাপতি ভাণ ॥

৩৪

সখী সঁ নায়িকা বচন।

কি কহব আহে সখি নিঅ অগেআনে।
সগরো রইনি গমাওলি মানে ॥
জখন হরসন পরসন ভেলা।
দারুণ অরুণ তখন উগি গেলা ॥
গুরুজন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝপইত হম আকুল ভেলী ॥
অধিক চতুরপন ভেলহুঁ অজ্ঞানী।
লাভক লোভ মুরহু ভেল হানী ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহিঁ রোসে ॥

কি কহব আহে সখি নিজ অজ্ঞানে।
সকল রজনী গোঙাইনু মানে।
যখন আমার মন প্রসন্ন হইল।
দারুণ অরুণ তখন উদিত হইল ॥
গুরুজন জাগিল কি করিব কেলী।
তনু ঝাঁপাইতে আমি আকুল হইনু ॥
অধিক চতুরপনে হইনু অজ্ঞানী।
লাভের লোভে মূলে ত হ'ল হানি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিজ মতি দোষ।
অবসর কালে উচিত নহে রোষ।

৩৫

নায়িকা কৃত স্বদুখ বর্ণন।

মাধব তোঁ হে জনি জাহ বিদেসে।
হমরো রংগ রভস লয় জৈবহ, লৈবহ কোন সনেসে ॥
বনহিঁ গমন করু হোএতি দোসর মতি, বিসরি জাএব
পতি মোরা।
হিরা মনি মানিক একো নহিঁ মাঁগব, ফেরি মাঁগব
পহু তোরা ॥
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু, দেখিও ন ভেল
পহু তোরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস, কৈসে পুরত
মন মোরা ॥
পহু সংগ কামিনি বহুত সোহাগিনি, চন্দ্র নিকট
জৈসে তারা।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি, অপন হৃদয়
ধরু সারা।

মাধব তুঁহু যদি যাও বিদেশে।
আমার রঙ্গ রভস লয়ে যাবে হে,
রাখিবে কোন সন্দেশে ॥
বনে গমন কর হইয়া দুসর মতি (ভিন্ন মতি),
বিসরি যাইবে পতি মোরে।
হীরা মণি মাণিক কিছু নাহি মাগিব,
ফির মাগিব প্রভু তোরে ॥
যখন গমন কর নয়নে নীর ভরি,
দেখিতে না পাইনু প্রভু তোরে।
এক নগরেতে বসি প্রভু হইল পরবশ,
কেমনে পুরিব মন মোর ॥
প্রভুসঙ্গে কামিনী বড়ই সোহাগিনী,
চন্দ্র নিকটে যেন তারা।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী,
আপন হৃদয়ে ধর সারা ॥

৩৬

নায়িকা বিরহ

মোহি তেজি পিআ মোর গেলাহ বিদেস।
কৌনি পর খেপব বারি বএস ॥
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাস।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥
সুমরি২ চিত নহীঁ রহে থীর।
মদন দহন তন দগধ শরীর ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কো করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥

মোরে তেজি পিয়া মোর গেল যে বিদেশ।
কার পরে ক্ষেপিব এ বালিকা বয়েস॥
শয্যা হৈল সুগন্ধি ফুলের হৈল বাস।
আমার ভ্রমর কত করিবে উপাস॥
স্মরিয়া২ চিত নাহি রহে স্থির।
মদন দহন দগধে শরীর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কী করিবে নাথ দৈব হ'ল বাম॥

৩৭

নায়িকা বিরহ।
সুংদরি বিরহ শয়ন ঘর গেল।
কি এ বিধাতা লিখি মোহি দেল॥
উঠিল চিহায় বৈসলি সির নায়।
চহু দিসি হেরি২ রহলি লজায়॥
নেহক বংধু সেহো ছুটি গেল।
তুহু কর পহুক খেলাওন ভেল॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি অপরুপ নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ॥
সুন্দরী বিরহ শয়ন ঘর গেল।
কি যে বিধাতা কপালে লিখি দিল।
চিয়াইয়া উঠিল বসিল শির নোয়ায়।
চৌদিশ হেরি২ রহিল লজ্জায়॥
স্নেহের বন্ধু সেও চলি গেল:
তুহু কর প্রভুর খেলেনা হইল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
যেমন বিরহ হয় তেমনি সিনেহ॥

প্রবাসী পথিক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অশ্রুবাদলে বিদায়ের পালা শেষ ক'রে দাও তবে!
প্রবাসী পথিক ঘরে ফিরে চলো,—ভেঙেছে পান্থশালা।
দাঁড়াবে কোথায় দুর্য্যোগ রাতে?—এ কি নিষ্ঠুর জ্বালা!
জীবনের গীতি সকলি ভুল্‌তে হবে।

মনের আকাশে জলভরা মেঘ চলেছে বেদনাভারে,
বনের বিহগ পূবালী বাতাসে হারায়ে গিয়েছে আজ।
হাজার ফুলের প্রণয়-মুখর কুঞ্জে পড়িছে বাজ,
বিশ্বভুবন এখনি দুল্‌তে পারে।

মাটির ঘরের মায়ার বাঁধন শিথিল হ'ল যে কবি,
আঙিনার ধূলো দিক্‌বধূদের অন্ধ করেছে আঁখি।
শূন্যঘাটের শ্মশানের বুকে হৃদয়ের চিতা রাখি
উদাসী বাউল আঁকিছে একলা ছবি।

কুটজ-কদম-কেয়ার কাননে এলো যারা পথ চিনে
চরণের ধ্বনি বাজে কি তাদের পত্রবীথির তলে?
ওরা কি এখনো ভাবে নি বন্ধু সময়ের রথ চলে
মৃত্যু-পতাকা উড়ায়ে মেঘ্‌লা দিনে!

হাজার যুগের সঞ্চিত স্মৃতি উড়ে যায় চারি ধারে,
প্রবাসী পথিক ঘরে ফিরে চলো অচেনা সিন্ধুপারে।

শান্তিনিকেতনের চিত্র, নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়ের সূচনা

শ্রীসাধনা কর ও শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সংস্কৃতি হোলো জাতির প্রাণ। তার জন্য চাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে সেদিকে তেমন দৃষ্টি নেই দেখে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম; তাঁর পিতার সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে। দিনে দিনে তার কাজ অগ্রসর হোতে লাগল, কিন্তু সম্পূর্ণতার উপাসক রবীন্দ্রনাথ তাতেও তৃপ্ত নন; তিনি মনে মনে জানেন, শিল্প ও সংগীত কলা প্রভৃতি ছাড়া সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ। তাই এখানে শিল্পকলার সার্বভৌম সাধনা প্রবর্তিত করবার দিকেই তিনি ক্রমে হোলেন উদ্যোগী। হয়তো অনেকেই জানেন না, সব-প্রথমকার দিনে চিত্র-শিক্ষক ছিলেন আজকের আশ্রমের স্বাবলম্বী সুগৃহস্থ শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্র। শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁকে এখানে পাঠান। অনেক উৎসবক্ষেত্র তাঁর হাতের রঙের প্রলেপে এক সময় বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। তারপরে আসেন স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়। ১৩৪৮ সনের 'অলকা'য় লিখিত তাঁর 'পঞ্চাশের পাঁচালী'তে শান্তিনিকেতনের তখনকার দিনের অনেক ছবি চিত্রিত আছে। শ্রীযুক্ত অসিত হালদারের পরে শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র প্রসারিত হয়। এলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়। শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ১৯১৪ সালে প্রথমে এমনি একবার আশ্রমে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসেন। প্রথম আগমনে তাঁর অভ্যর্থনা হোলো আশ্রমের আম্রকুঞ্জে। গুরুদেব সস্নেহে উপহার দিলেন নিম্নলিখিত কবিতাটি—

ওঁ

শ্রীমান নন্দলাল বসু
পরম কল্যাণীয়েষু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মীভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতা আশিষ মন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে,
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে নন্দ।
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।
চির সুন্দরে করো গো তোমার
রেখা বন্ধনে বন্দী
শিবজটা সম হোক তব তুলি
চিররস-নিষ্যন্দী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১২ বৈশাখ, ১৩২১

এ প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ ব্যাপারে এবার শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের কাছ থেকে এই কবিতাটি এক রকম নূতন ক'রে আবিষ্কৃতই হোলো তাঁর পোর্ট-ফোলিওগত কীটদষ্ট জীর্ণ অভিনন্দনপত্র থেকে। গুরুদেব প্রথম উপহারে তাঁকে বহুদিন আগে যে নন্দিত করেছিলেন তার পূর্ণচ্ছেদ টেনে গেলেন শেষ জীবনে, এই ছোটো একটি কবিতার মধ্যে—

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার
সে গোপন কক্ষে জানি জনম তোমার।
সেথা হতে রচিতেছ রূপের যে নীড়,
মরুপথশ্রান্ত সেথা করিতেছে ভীড়॥

রবীন্দ্রনাথ

৩।১২।৪০
শান্তিনিকেতন

প্রথমবার এসে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এখানে বেশি দিন থাকেন নি। কিন্তু এ জায়গার লোকজন, এর মনোহর প্রাকৃতিক আবেষ্টন তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। কিছুদিন পরেই তিনি এসে আত্মনিবেদন করলেন এখানকার শিল্পপ্রচেষ্টায়। এখানে তাঁর এই আসা নিয়েও অবশ্য আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা বলা বাহুল্য, তবে তার মোট কথাটা এই যে, গুরুদেবের উগ্র একাগ্রতাই নন্দবাবুকে এখানে শেষাবধি নিয়ে আসে আকর্ষণ ক'রে। আজ আশ্রমের কলা-বিদ্যার যে-দান, যে-বিকশিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় তা শেষোক্ত দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তার মধ্যেও গুরুদেবের প্রবল অনুরাগের অনুপ্রেরণা নিহিত। এঁদের পাঠিয়েছেন এবং নিজের সঙ্গে তিনি নিয়েও গেছেন দেশভ্রমণে নানা জায়গায়; বিভিন্ন সভ্যতা এবং তার শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন নানাভাবে। আশ্রমের শিল্পভাণ্ডারে দ্রব্যসম্ভার আহরণ করবারও ব্যবস্থা করেছেন যথেষ্ট। আশ্রমের আনন্দলোক সৃষ্টির মূল প্রেরণা এবং ভাষা ও ছন্দ, এককথায় তার যা প্রাণবস্তু, সে সৃষ্টি হোলো গুরুদেবের; কিন্তু এর বহিরঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি, একে বিভূষিত করে তুলবার ভার দিয়েছিলেন তিনি নন্দবাবু, সুরেনবাবু ও প্রতিমা দেবীর উপর।

সুকুমার শিল্পকলার ক্ষেত্রে নৃত্য আশ্রমের আধুনিকতম প্রবর্তনা। লোকে এক রকম পথেঘাটে এখন এর আসল বা নকল পরিচয় পাচ্ছে বটে, কিন্তু কোথা থেকে এর উৎপত্তি ও কেমন করে প্রসার, সে বিষয়ে ধারাবাহিক তথ্য খুব কম লোকেই জানেন। শান্তিনিকেতনের সংগীত বা চিত্রশিল্পের মতো এর সেই ইতিহাস এখনো সুপরিচিত হয়ে ওঠে নি। তাই ঋতু-উৎসব অনুষ্ঠানাদির প্রবর্তনার মতো এর পরিচয়টিও একটু বিশদ করে বলাই দরকার মনে করি।

এখানে প্রথমেই বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকার কথা এই যে, উৎসবের সাজসজ্জা সুসম্পাদনের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় শিল্পগুরু নন্দলাল বসু ও সুরেন কর মহাশয় দ্বয়ের প্রতিভার প্রকাশ তাঁদের নতুন নতুন সৃষ্টিতে, নাচের ক্ষেত্রে তেমনি আশ্রমের নৃত্য আধুনিক রূপ পেয়েছে প্রথম এবং প্রধানত গুরুদেবেরই ক্রমিক চেষ্টায়, তার পরে তাঁর সহকারিতায় ছিলেন আরেকজন, তিনি স্বয়ং গুরুদেবেরই পুত্রবধূ পূজনীয়া শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী।

এক সময়ে নৃত্যের স্থান ছিল বৈদিক যাগযজ্ঞের পুণ্যক্ষেত্রে। তার পর শৈব এবং বৈষ্ণব মন্দিরে তার স্থান ছিল পূজার সঙ্গে। সামাজিক এবং সাংসারিক জীবনেও তার প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। নৃত্যের আদিগুরু হচ্ছেন স্বয়ং নটরাজ তাণ্ডবী মহাদেব। শিবানুচর নন্দিকেশ্বর এবং দেবর্ষি নারদ নৃত্যের প্রথম শাস্ত্রকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু ভারতের কী দুর্ভাগ্য বলতে পারি নে, পরে এক সময়ে নৃত্য তার মহনীয় প্রতিষ্ঠা হোতে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। পড়ল গিয়ে অত্যন্ত কলুষিত পরিবেশে। বৈষ্ণব দেবমন্দিরে দেবদাসীরা তাকে উপাসনার অঙ্গ ক'রে রাখলেও এই অধোগতি হোতে তাকে বাঁচাতে পারে নি। ফলে তাদের নিজেদেরও নেমে আসতে হোলো। তবু এই রকম একজন দেবদাসীরই চরণচ্ছন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে জয়দেব লিখলেন তাঁর অপূর্ব গীতগোবিন্দ কাব্য। সে কথা 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' জয়দেব শ্লাঘার সহিত ঘোষণা করে গিয়েছেন।

কুস্থানে পতিত হোলেও এত বড়ো একটি মহাবস্তুকে যদি অবজ্ঞা করা যায় তবে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন অধ্যাত্ম এবং সংস্কৃতির ইতিহাসকে করা হবে দারুণ অপমান। ধুলায় পড়ে থাকলেও শিবনির্মাল্য চরণে দলিত করবার বস্তু নয়। এই যুগে এই কথাটি অনুভব ক'রে নৃত্যের এই মহাসাধনাকে যিনি আবার তার পুরাতন গৌরবের আসনে উন্নীত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এর জন্যও কম দুঃখ, আঘাত ও লাঞ্ছনা তাঁকে সইতে হয় নি কিন্তু তাঁর শিল্পদরদী মন কিছুতেই মানে নি পরাভব। একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, শান্তিনিকেতন থেকেই এ যুগে প্রথমত নৃত্যকে শিক্ষার একটি অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকার করে নিয়ে, দেওয়া হয়েছে তাকে স্থায়ী সাংস্কৃতিক গৌরব, তাকে সনাতনী প্রথা থেকে সংস্কার করে নিছক ললিতকলার খাঁটি রূপে সভ্য সমাজের চলমান জীবনে স্বভাবোচ্ছলিত আনন্দধারার লীলাচ্ছন্দের মতোই প্রবাহিত করে দেওয়া হোলো নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে, যার মধ্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও সঙ্গীত-রসানুভূতি হয়ে রইল প্রধান লক্ষ্য।

এক্ষেত্রেও শুধু আইডিয়া, পরামর্শ বা মৌখিক উৎসাহ দিয়ে নয়, একেবারে আসরে নৃত্য করা মানে হাতে কলমে কাজের ব্যাপারে গুরুদেবই হচ্ছেন আগরওয়ালা (Pioneer)। তাঁর ভিতরে পরিণত বয়সেও নৃত্যের প্রবর্তনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর গোড়ার দিকের নাটকগুলি অভিনয়কালে তিনি বাউল বা ঠাকুরদা প্রভৃতির ভূমিকায় গানের সঙ্গে নিজে নেচেছেন প্রকাশ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং সাধ্যমতো নাচিয়ে ছেড়েছেন তাঁর অভিনয়-

সহচরদেরও। প্রথম দিককার "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের অভিনয়ে জনসাধারণের দৃষ্টে "মাধবপুরের দলের নৃত্য" পুরানো আশ্রমিকদের কাছে ছিল রসালাপের একটি মধুর প্রসঙ্গ। তা ছাড়া, 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে একতারা হাতে অন্ধ বাউলের বিখ্যাত ছবিতে তাঁর সেদিনের মনোহর নৃত্যভঙ্গিমা হয়ে আছে উজ্জ্বল।

আশ্রমের নৃত্যের ইতিহাসে গুরুদেবের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। বন্ধু ত্রিপুরাধিপতির আমন্ত্রণে আগরতলায় গিয়ে তিনি দেখলেন বড়ো ঠাকুরের পরিবারে তাঁর কন্যাদের শালিনতা-গরিষ্ঠ অপূর্ব সুন্দর নৃত্য-কলা। জিনিসটা তাঁর মনে বাসা গেড়ে বসল। পরে যখন গেলেন শ্রীহট্টভ্রমণে, মণিপুরীদের পল্লীঅঞ্চলে নিয়ে গেল তাঁকে উদ্যোক্তারা মণিপুরী নাচ দেখাতে। শ্রীহট্টে দেখা হোলো সেবারে মণিপুরীদের রাসনৃত্য। স্বস্থানীয় পরিবেশে, তদ্দেশীয় কিশোর কিশোরীদের সংঘবদ্ধ নৃত্যের বিরাট রূপ দেখার পর এর ঐতিহ্যিক মূল্যবানতা এবং আধুনিক কালে এর পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে তুলল বিশেষরূপে উৎসাহী করে।

মনে মনে চলতে লাগল সংগীত ও শিল্পকলার মতো নৃত্যকে দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জলন্ত আকাঙ্ক্ষা। আশ্রমে নৃত্যশিক্ষা দানের জন্য নিযুক্ত করলেন আগরতলাবাসী মণিপুরী নর্তক মণিপুর রাজপরিবারের বুদ্ধিমন্ত সিংহকে। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার পাশের খোলা প্রাঙ্গণে ছিল নৃত্য-শিক্ষার আসর। গুরুদেব নিজে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়ে সকলের নৃত্যানুশীলন করতেন পর্যবেক্ষণ; গানও অনেকগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন নাচের সঙ্গে গাইবার জন্য, তার একটি গান ছিল, 'আয় আয়রে পাগল ভুলবি রে চল্ আপনাকে।' কিছুদিন পরে নবকুমার ঠাকুরকে ত্রিপুরা থেকে আনিয়ে তিনি নৃত্যের আঙ্গিক শিক্ষাদানের আয়োজন করলেন দ্বিতীয়বার। যাতে নৃত্য অনুশীলন গভীরভাবে হয় এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

একেবারে নূতন জিনিস। এই নৃত্যের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কী ক'রে বাড়ে,—মাথায় ঘুরছে তখন তাঁর সে-ব্যগ্রতা। কোনো জিনিস শেখবার সেরা উপায় তিনি মনে করতেন তার ভালো ভালো নিদর্শনকে ভালো করে বারবার দেখা। তাই তখন কোথায় নাচের কী বিশেষ রূপ আছে, কেমন করে ছাত্রছাত্রীদের এনে তা দেখানো যায় তারই চলছে অক্লান্ত চেষ্টা। নূতন কোনো ভালো জিনিস প্রবর্তনা করবেন—এজন্য অর্থব্যয়, পরিশ্রম, লোকনিন্দা, বাধাবিঘ্ন, কোনো প্রতিকূলতাকেই তিনি আমল দিতেন না, এই নাচের ক্ষেত্রেও সে-স্বভাব তাঁকে চালিয়েছে রাত্রিদিন উদ্ব্যস্ত ক'রে। অজস্র অর্থব্যয় করেছেন, আনিয়েছেন দূর দেশ থেকে নানা গুণীকে, সংগ্রহ করে চলেছেন নানা শিল্প-নিদর্শন আশ্রমবাসীর রুচি ও যত্ন জাগাবার জন্য। গেলেন যখন পশ্চিম-ভারত পরিভ্রমণে, কাঠিয়াওয়াড়-ভাবনগর থেকে নিয়ে এলেন সে-দেশী প্রবীণা মহিলাদের এক দলকে, তাঁরা পূজারত হয়ে বসে বসে মন্দিরা বাজিয়ে ভজন গানের সঙ্গে অঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গি বিস্তারে করতেন উপাসনা। নৃত্যে পূজা নিবেদনের অপূর্ব অধ্যাত্ম রূপ দেখা গেল তাঁদের মধ্যে। নৃত্যের এই বিশিষ্ট ধরণটি গুরুদেবকে এবং আশ্রমের আর-সকলকে মুগ্ধ করল খুবই। কিন্তু অনভ্যস্ত জায়গায় দিন কয়েকের বেশি তাঁদের থাকা সম্ভব হোলো না। সে নৃত্যচ্ছন্দ আশ্রমে তাই পেল না প্রবর্তনের অবসর; শুনেছি, নিজেদের গুজরাট-কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চল থেকেও আজ তা নাকি অযত্নে একরূপ অবলুপ্ত। শ্রদ্ধানুরাগ জাগিয়ে আশ্রমে এই নৃত্যটি এতটা সমাদরে গৃহীত হয়েছিল যে, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের দ্বারা একখানি বিখ্যাত চিত্র আঁকা হয়েছিল এঁদের নৃত্য-আসর অবলম্বন ক'রে।

এর পরেই নৃত্যেরই তিহাসে আসে গুরুদেবের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সংগঠন-প্রতিভার বিশিষ্ট দানের কথা। নিজে প্রতিমা দেবী শিশুকালে তাঁর মামা মহা-শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্যে মানুষ হয়েছেন; তাঁর শিল্প-রুচি ও রসানুভূতি গড়ে উঠেছিল তাঁদেরি পরিবেশের ভিতর দিয়ে। ৫০ বৎসর আগে অভিজাত পরিবারে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষভাবে ঠাকুর-পরিবারে নৃত্যগীতের চর্চা ছিল বর্তমান। অন্তঃপুর-চারিণীরা তখন পূজাপার্বণে নৃত্যগীতের দ্বারা করতেন নিজেদের চিত্তবিনোদন। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে বালিকাকন্যা ও বধূর অভাব ছিল না এবং উৎসাহী গৃহিণী অবনীন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণী নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী রেখে বালিকাদের অনেক সময় সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষায় দিতেন উৎসাহ। শিশুকাল থেকেই মনে ললিতকলার একটি আদর্শ চেতনার অন্তরালে ছিল অস্ফুট। পরবর্তী-কালে প্রতিমা দেবী যখন গুরুদেবের সঙ্গে য়ুরোপ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নানা প্রদেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সেই সময় নানা প্রকারের দেশীয় নৃত্য দেখবার তাঁর সুযোগ হয়েছিল। সেই থেকে তাঁর মনে নৃত্যের বিকশিত সৌন্দর্যরূপ এবং তার শীলতা বাঁচিয়েও আনন্দরস স্ফুরণ

করবার সম্ভাবনা উঠে জেগে। আশ্রমবাসী নৃত্যের রস পেয়েছে কিছু কিছু,—এই ভূমিকায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালিকা গৌরী দেবী, অমিতা দেবী, যমুনা দেবী, এঁদের নিয়ে প্রতিমা দেবী সুরু করলেন নৃত্যে নানা প্রকারের রূপসৃষ্টির চেষ্টা। সেই চেষ্টার বিচিত্র ভঙ্গীগুলিই নানা উৎসবে আশ্রমবাসীদের করত আনন্দ দান। বেরিয়ে এল সেই সময়ে গুরুদেবের হাত দিয়ে প্রসিদ্ধ নাটক 'নটীর পূজা'। নটীর পূজা-নৃত্যকে প্রাণপণ যত্নে রূপ দিলেন আত্মনিবেদনের প্রেরণায় অপূর্ব কলাসৌষ্ঠবে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা গৌরী দেবী। দেশে জাগল অভূতপূর্ব সাড়া (২৪ জানুয়ারি, ১৯২৭)।

নৃত্যকে লোকে দেখত আগে হেয় স্তরে রেখে। গুরুদেব দেখলেন, সেখান থেকে একে তার নিজস্ব লক্ষ্য-স্থানে পৌঁছতে হোলে বিশেষ করে ভারতভূমিতে চাই এর অধ্যাত্ম গরিমার বিকাশ। তীরের মাথায় যেমন ফলা লাগায় শিকারীরা, জিনিসটাকে লক্ষ্যবস্তুর মর্মে বিঁধিয়ে দিতে তেমনি ব্যাপার করলেন তিনি নৃত্যের এই নব-উজ্জীবন-আন্দোলনের মুখে 'নটীর পূজা'কে বসিয়ে। মুখে ব'লে ব'লে বুঝিয়ে, অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়ে, গৌরী দেবীকে করে তুললেন অনুপ্রাণিত। শেখালেন অনেক ভঙ্গির আভাস। এই সব প্রেরণা পেয়ে গৌরী দেবী এক-রকম আপন অন্তরের ধ্যানের থেকেই শেষে সৃষ্টি করে তুললেন, "নটীর পূজা"র দেশ-জাগরণী বিখ্যাত নৃত্যকে। সেই নৃত্যের সেই প্রদর্শনী সেবার ঐ একবারই যা হয়েছে অনুষ্ঠিত, পরে আর কোনো বছরে ঠিক সেই অনুষ্ঠান অর্থাৎ "নটীর পূজায়" গৌরীদেবীর সেই নৃত্যাভিনয় দুবার হয় নি, দেখা যায় নি তার তুলনা। সেটা নৃত্য নয়, সেটা ছিল নৃত্যের পূজা-অঙ্গ, যার মহনীয় সম্বেদনা জাগিয়েছিল দেশের রূপরসিক ছাড়াও ধর্মনিষ্ঠ বিশিষ্ট প্রবীণমহলকে। নৃত্যের প্রতি এই আগ্রহ এবং অনুরাগ-প্রাচুর্যই সম্ভব করল পরে দেশে নৃত্যের ক্রমিক প্রসার। এই সাফল্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে "নটীর পূজা" আজকের ভারতীয় "নৃত্য-অনুষ্ঠান-সমুদ্রে," বলা যেতে পারে, দেখা দিয়েছিল একটি প্রথম দৃষ্টি-গ্রাহ্য ডাঙাভূমি হয়ে।

নৃত্যের প্রবর্তনাক্ষেত্রে কবির সেই সময়কার (আগস্ট, ১৯২৭) জাভা ও বলীদ্বীপ ভ্রমণও কাজে এসেছে অনেক দিক দিয়ে। সে দেশের নৃত্যে রূপ ও রস,—তার বাদ্যযন্ত্রাদি, রঙ্গমঞ্চসজ্জা, রূপ-প্রসাধন ইত্যাদি কত গভীরভাবে যে শিল্পী-কবির রসবোধ এবং সৃষ্টিপ্রেরণাকে উদ্বোধিত করেছে, "যাত্রী" গ্রন্থের 'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশে তার বিস্তারিত পরিচয় মিলবে। প্রবন্ধের আয়তন-বৃদ্ধি আশঙ্কায় সেই বই থেকে উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে হোলো, কিন্তু বিশেষ ক'রে তার থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১১ নং পত্র, আর, পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে লেখা ১৩ নং পত্রখানির প্রতি আমরা আগ্রহশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নৃত্যের মধ্য দিয়েই একটি সমগ্র নাটককে রূপায়িত করবার আভাস দেখা যায় এই পত্রগুলিতে। সে দিক থেকে রবীন্দ্র-নৃত্য ও গীতিনাট্যের আদি পরিকল্পনা-উৎসের গৌরব নিয়ে গুরুদেবের এই জাভা-ভ্রমণটি আর তারই সঙ্গে এই 'যাত্রী' গ্রন্থ রবীন্দ্র-জীবনী ও শান্তিনিকেতনের নৃত্যক্ষেত্রে অধিকার ক'রে আছে একটি বিশিষ্ট স্থান।

গুরুদেবের 'নটীর পূজা' 'ঋতুরঙ্গ', 'নবীন', 'শাপমোচন' ও 'চিত্রাঙ্গদার' প্রযোজনায় পুত্রবধূ এই প্রতিমা দেবীর হাতও ছিল বহুল পরিমাণে। গুরুদেবও নৃত্যের সংগঠন (কম্‌পোজিশন্) এবং ভঙ্গীর আঙ্গিক সম্বন্ধে প্রতিমা দেবীর রুচির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেন। ঋতুরঙ্গ আর শাপমোচনের সময় গুরুদেব নিজে তো সবটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতেনই, তা ছাড়া বিশেষ ক'রে দিনুবাবুর উপর থাকত গানের ভার, আর প্রতিমা দেবী দেখতেন নৃত্যের ভঙ্গী ও রূপ-ব্যঞ্জনা। গুরুদেবের ৭০ বৎসরের জয়ন্তী উৎসবে বাংলার ছাত্রছাত্রীরা ঐ বিশেষ দিনে অভিনয় করবার জন্য তাঁর কাছে একটি লেখা চেয়েছিল; তাদের সকলের মুখপাত্রী হয়ে ক্ষিতিমোহন বাবুর ছোটো মেয়ে অমিতা দেবী ও নন্দবাবুর মেয়ে যমুনা দেবী গুরুদেবের কাছ থেকে "শাপমোচনে"র প্লটটি আদায় করেছিলেন। তারপরে তাঁদের অনুরোধে প্রতিমা দেবী এই নাটকের কম্‌পোজিশন্-এর ভার নেন; 'শাপমোচনে'র এই কম্‌পোজিশনের মধ্যে হোলো নৃত্য-নাট্যের বিশিষ্ট সূচনা। আগেকার নৃত্যগুলি ঋতু-উৎসবের অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। এক-একটি গানের সঙ্গে তার ভাব ও ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রত্যেক নৃত্যটি হোত রচিত। যদিও ইতিপূর্বে গীতোৎসবের অঙ্গরূপে 'শিশুতীর্থ' কাব্য নাটিকার নৃত্যাভিনয় একবার করা হয়েছিল, কিন্তু তখনো এই ক্ষেত্রে গুরুদেবের পরীক্ষার কাজই চলছে মাত্র বলা যেতে পারে; "শিশুতীর্থ"টি গদ্য কাব্য। গদ্যেরও যে একটি সাংগীতিক নৃত্যছন্দ আছে, সেইটি রঙ্গমঞ্চে গুরুদেবের পাঠের মধ্যে সুরে-সুরে হয়ে ওঠে কলনাদিনী তরঙ্গভঙ্গে সঞ্জীবিত; তাকেই বাস্তব দৃশ্যে রূপায়িত করে তোলেন নৃত্যে-নৃত্যে
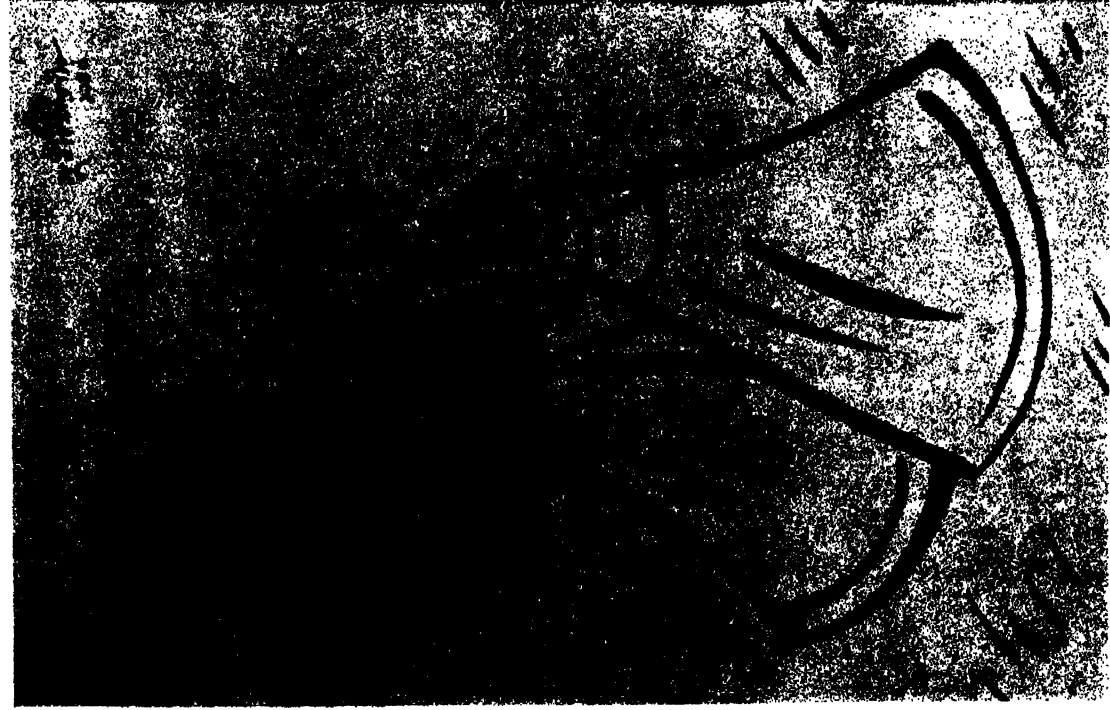
গ্রামের মেয়ে
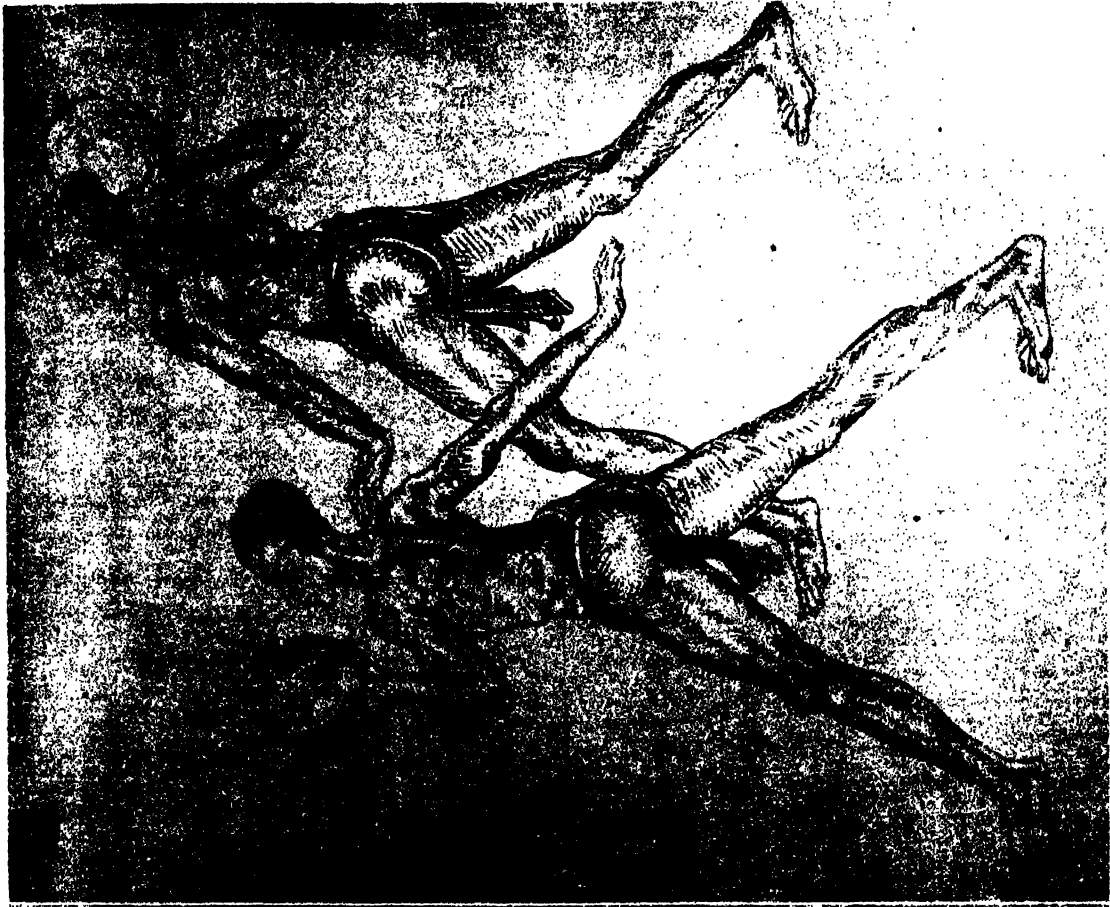
পালোয়ানী খেলা

নৃত্যকুশলা শ্রীযুক্তা শ্রীমতী দেবী। সেই পরীক্ষার যুগ পেরিয়ে নৃত্যের একটি নাটকীয় রূপ শান্তিনিকেতনে প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে সংঘটিত হোলো 'শাপমোচনে'র মধ্যে; সেই জিনিস গুরুদেবের জীবিতকালে ক্রমে চিত্রাঙ্গদায় ও সবশেষে চণ্ডালিকায় গিয়ে বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা লাভ করেছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, গদ্যে সুর বসিয়ে নাটকের পাত্রপাত্রীর কথা-অংশকে প্রাচীন কথকদের প্রণালীতে গান ক'রে ক'রে বলার সূচনাও হয় "শাপমোচনে"ই, এ আঙ্গিক সবচেয়ে বেশি সার্থক ভাবে রূপ পেয়ে কাজ দিয়েছে গুরুদেবের শেষ নৃত্যনাট্য এই "চণ্ডালিকাতে"।

এরই পূর্বে এসে গেছে আশ্রম-নৃত্যে দক্ষিণী প্রভাব। কথাকলির আকর্ষণে দাক্ষিণাত্য থেকে গুরুদেব আশ্রমে আনিয়েছেন দক্ষিণীনৃত্যশিক্ষয়িত্রী প্রবীণা রুক্মিণী দেবীকে। তাঁরই নাচের ছন্দে, আনুষঙ্গিক তাঁর সেই গানের দক্ষিণী সেই সুরটি বসিয়েই বাংলা গান রচনা করে দিলেন গুরুদেব,—

"তুমি তৃষ্ণার শান্তি,
স্নিগ্ধ শোভন কান্তি।"

তার পর গিয়েছেন সদলে নৃত্যগীতঅভিনয় উপহার নিয়ে সিংহল ভ্রমণে। মুগ্ধ করেছেন সেদেশবাসীকে তাঁর নিজের দানে, মুগ্ধ হয়ে ফিরেছেন সেদেশবাসীদের প্রদর্শিত ক্যাণ্ডীয় নৃত্যে। তার রস উপভোগ ক'রে উপহার দিয়েছেন সে আনন্দ "ক্যাণ্ডীয় নৃত্য" কবিতাতেও। এ রকম গিয়েছেন যখনই যেখানে, নৃত্যের রূপ-রস আহরণ করেছেন সম্ভব মতো সবখান থেকেই। এই ক'রে ক'রে নানা ফুলের সঞ্চয়ন দিয়ে আশ্রম-নৃত্যের অর্ঘ্য-সাজিখানি সাজিয়ে তুলেছেন কত যত্নে।

ক্রমে পরবর্তীকালে আসে আরেকজনের কথা, নৃত্য এবং অভিনয়-পটুতায় স্বকীয় কৃতিত্বে যিনি হয়ে আছেন উজ্জ্বল। তিনি হচ্ছেন কবি-দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা দেবী। তাঁর প্রতিভা প্রথম উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রকাশ পায় 'অরূপরতন' নাটকে 'সুরঙ্গমা' ভূমিকার অভিনয়ে। পরে তাঁর শ্রেষ্ঠতর পরিণতি হয় 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' 'শ্যামা' প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যের ক্রমিক অভিনয়ে। মহাত্মাজী তাঁর "চণ্ডালিকা" ভূমিকার অভিনয় দেখে হয়েছেন মুগ্ধ। শেষোক্ত প্রায় সব নাট্যতেই প্রধান ভূমিকা ছিল তাঁর। এ কথা ঠিক যে, গুরুদেবের নৃত্যনাট্যের যথাযথ স্বরূপটি প্রকাশ করতে পেরেছেন তিনি তাঁর আপন রসবোধ এবং রসসৃষ্টির নিপুণতার দ্বারা।

এই নৃত্যবিবরেই আরো যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। তিনি এখানকারই ছাত্র, অনেক অধ্যবসায়ে, অনেক সাধনায়, জাভা, দক্ষিণ-ভারত সিংহল প্রভৃতি নানা দেশ-বিদেশ ঘুরে এনেছেন এই নৃত্যের ক্ষেত্রে কত ভাব, ব্যঞ্জনা এবং আঙ্গিক। তাঁর নাম আরেক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য, গানের আসরে। আনন্দলোকের একেবারে গোড়ার কথা এবং প্রধান কথা হচ্ছে—গান, আর চলেছেও সে গান নিয়েই। এক্ষেত্রে গুরুদেবই স্বয়ম্ভূ, যেমন কথা ও সুরের সৃষ্টিতে, তেমনি প্রযোজনার কাজে। গান নেই অথচ উৎসব, এ যেন রবি নেই প্রভাতের মতোই অসম্ভব ব্যাপার। এ সম্বন্ধে বেশী বলাই বাহুল্য। গুরুদেবের পরেই এক্ষেত্রে যাঁর দান সান্ত্বনাহীন বেদনায় স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আচার্য দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভার কথা লোকের অবিদিত নেই। নিজের প্রীতিময় ব্যক্তিত্বে সাহিত্যিক বৈদগ্ধ্যে এবং সবার উপর সর্বজ্ঞাত সংগীতের পরিচালনার গৌরবেই তিনি হয়ে থাকবেন চির ভাস্বর। এর বেশি করে রবীন্দ্রনাথের গড়া এই আনন্দলোকে তাঁর দানের পরিচয় দিতে গেলে, প্রদীপ জ্বেলে সূর্যকে দেখাবার সেই মামুলি তুলনাটাই আসে মনে। শুধু স্মৃতি-পূজায় একটা কথা সেই সংকোচ পেরিয়েও বেরিয়ে আসে, যে, কণ্ঠস্বরে এবং কুশল শিক্ষাকৌশলে রবীন্দ্র-সংগীতের সুরের জাদু লীলায়িত করবার মতন, স্বরলিপিযোগে সেই সুরকে পরবর্তী কালে অক্ষয় গৌরবে রক্ষা করবার মহৎ কীর্তিটিও তাঁর সশ্রদ্ধ-কৃতজ্ঞতায় দেশবাসীকে করবে কালে কালে অভিভূত। গানের ক্ষেত্রে এঁর পরেই বলতে হয় গুণী এবং শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুত ভীমরাও শাস্ত্রীর কথা। তিনি ভাতখণ্ডে প্রভৃতির পরম বন্ধু এবং স্বয়ং প্রাচীন ভারতীয় গীতশাস্ত্রে অপূর্ব বিদ্বান্, মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত; তিনি কেবল মাত্র গুরুদেবের সংগীতের সুর ও তালের অনুরাগে এই রবীন্দ্র-সংগীতের তপস্যায় করলেন আত্মোৎসর্গ। এখানে তেরো-চোদ্দো বৎসর সংগীত ও শাস্ত্রাধ্যাপনায় কাটিয়ে এখনো তিনি বোম্বে অঞ্চলে আছেন গুরুদেবের গানের রসধারা বিস্তারের সাধনাতেই। "হিন্দী গীতাঞ্জলি" "স্বরলিপিসুদ্ধ প্রকাশ ক'রে অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যেও রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচারের প্রয়াস তাঁর আগেও ছিল। বীণাবাদ্যের রসবিতরণে অন্ধ্র দেশীয় গুণী পণ্ডিত সংগমেশ্বর শাস্ত্রীর কথাও এখানে মনে পড়িয়ে দেয় গুরুদেবকেই, তাঁর আশ্রমের সংগীত-পরিবেশের পূর্ণ সংগঠনের বিচিত্র উদ্যমের পরিচয়ে। বিশিষ্ট গায়িকা অধুনা স্বর্গীয়া রমা দেবী (নুটু) ও অমিতা সেনের (খুকুর)

পরে দিনেন্দ্রনাথের অন্ত আরো অনুবর্তী হিসাবে যাঁরা আজ আশ্রমের সংগীত-আসর জমিয়ে রেখেছেন, তাঁদের একজনের নাম করা হয়েছে আগেই, অন্ত জন হচ্ছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার। রবীন্দ্র-সংগীতের দুষ্প্রাপ্য সুর সংগ্রহ ও সমস্ত স্বরলিপি সম্পাদনার কাজে গুরুদেব এঁকেই করে যান বহাল। গুরুদেবের শেষ দিকের অনেক গানের সঙ্গে এঁর আগ্রহের যোগ উল্লেখযোগ্য।

এবারে উদ্ভাসিত হবে আনন্দলোকের আর-একটি বড়ো দিক। অভিনয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র করেই বলা দরকার। দেশে অভিনয়ের কোনো স্কুল গড়ে উঠেছে কিনা আমাদের জানা নেই, অন্তত শান্তিনিকেতনে এ জিনিসটি হয়ে ওঠে নি কোনো স্বতন্ত্র বিভাগীয় শিক্ষার বিষয়। সংগীতের আনুষঙ্গিক হিসাবে সাময়িকভাবে এর চর্চা হয়ে আসছে। কিন্তু গুরুদেব তাঁর প্রথম বয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত এত নাটক-নাটিকা, গীতনাট্য, নৃত্যনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য নিজে লিখেছেন এবং নিজে অভিনয় করেছেন সকলকে শিখিয়ে নিয়ে-যে, সে-রকম সংগঠন-উদ্যোগী কেউ সঙ্গে থাকলে গুরুদেবকে দিয়ে বাংলা দেশে অভিনয়ের স্কুলও রীতিমত-ভাবে দাঁড় করিয়ে নিতে পারতেন। অন্তত দেশের আব-হাওয়ায় এ-বিষয়ে কঠিন প্রতিকূলতা না থাকলে, শান্তি-নিকেতনে হয়তো যথারীতি অভিনয়ের আঙ্গিক এবং শাস্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়ে উঠত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অভিনয়শাস্ত্র সম্পর্কে "ক্যালকাটা ওরিয়েন্টাল সিরিজে" প্রকাশিত "অভিনয়-দর্পণ" নামক গবেষণামূলক গ্রন্থের সূচনা এবং সম্পাদনা হয় শান্তিনিকেতনেই। তার গ্রন্থ-কার অদ্যকার ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ছিলেন তখন এখানকার বিদ্যাভবনের গবেষক। গুরুদেবের উৎসাহ এবং আশীর্বাদই গ্রন্থকারকে জুগিয়েছে তাঁর কঠিন কাজের দুরূহ পথে আনন্দময় প্রেরণা। যা হোক, আর কিছু না হোলেও শান্তিনিকেতনে মহর্ষির তপস্যাকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে যেই প্রতিষ্ঠান সেই বিশ্বভারতীতেও,—যতখানি এই শিল্পের চর্চা গুরুদেবের সাক্ষাৎ উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছে এবং দেশের এই বর্তমান রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থায় যে-মানদণ্ডে তিনি বরাবর একে উন্নীত রেখে শুচিতা, আনন্দ, ও একই কালে সৌন্দর্য্যের রসোপভোগে প্রেরণা বিতরণ করে এসেছেন, তা কেবল তাঁরই বিরাট শক্তি ও মহত্ত্বের পরিচয় দান করে। অবশ্য তাঁদের পারিবারিক প্রেরণা এবং উদ্যোগই এ কীর্তির মূল উৎসস্থান। এক সময় বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের এক রকম উদ্বোধনই হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির উৎসাহ-সম্ভব "নব নাটকে"। ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন কর্তাব্যক্তিরা সে বই, এবং অভিনয় করে-ছিলেন ঠাকুরগণ নিজেরা আর পরিবারের সব বন্ধু-বান্ধব মিলে। তারপরে "অলীক বাবু", ক্রমে আসে গুরুদেবের বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, বিসর্জন, রাজা ও রাণী, শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, তপতী আরো কত গীতি ও নৃত্যনাট্যের অভিনয়। ভদ্র মহলের ছেলেমেয়ে মিলে অভিনয়, তাও পরিবারগতভাবে ঠাকুরবাড়ী থেকেই পায় প্রথম প্রবর্তনা। গুরুদেবের নিজের অভিনয়ের রসসৃষ্টি সম্বন্ধে বলতে হয় যে, কোনোদিন সে-রকমটি আর হয় নি, হবেও না। সে-অভিনয় কলাসৌন্দর্যে ছিল এত সুন্দর, গৌরবে তা এতই মহান, বিশিষ্টতায় তা এমনি উজ্জ্বল। আশ্রমের প্রাচীন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, তিনি দেখেছিলেন গুরুদেবের বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়—সেই সুদূর অতীতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেইটি ছিল বোধ হয় গুরুদেবের দ্বিতীয় বারের অভিনয়। "শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা"—এই বিখ্যাত গানটি গাইতে গাইতে বাল্মীকির বেশে যখন তিনি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখনকার সে-দৃশ্য অবর্ণনীয়। লোকের চক্ষে অশ্রুবন্যা বইয়ে দিয়ে, ঘন ঘন উচ্চরবের অনুরোধের মধ্যে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হোত পাদপ্রদীপের সামনে। তাঁর বাল্মীকি, জয়সিংহ, ঠাকুরদা, রাজা, বিক্রম, নটীর পূজার 'ভিক্ষু উপালী'—এ সব ভূমিকাগুলি তিনি যেমন লিখেছিলেন, তার রূপও দিয়ে গেছেন তিনি তেমনি জীবন্ত ক'রে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কলকাঠি যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন তাঁর নানা ভূমিকায়, ভাষণে ও ব্যাখ্যায়,—তেমনি রবীন্দ্র-নাটকের জটিল ও রসঘন নায়ক চরিত্রগুলিকে বুঝবার বা রূপায়িত করবার কলা-কৌশলের আদর্শও তিনি রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত অভি-নয় কার্যে। দুঃখের বিষয়, সে-দৃশ্য-বস্তুকে কালের কবল থেকে রক্ষা ক'রে পরবর্তী দর্শন-ভাগ্যহীন কৌতূহলীদের কাছে ধরে দেখাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। বাল্মকী-প্রতিভা, বিসর্জন, ডাকঘর, ফাল্গুনী ও তপতীর কয়েকখানি আলোকচিত্র স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে বটে, রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে মাঝে মাঝে তার সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু তা কত অযথেষ্ট! এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শিল্পাচার্য গগনেন্দ্র-নাথ ও অবনীন্দ্রনাথের তপস্যা। সে আবার তাঁদের নিজেদেরই এক অপূর্ব কীর্তি। রবীন্দ্র-নাটকের গোড়াকার

বইয়ের ভূমিকাতে এঁরা দু'ভাইই যেমন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত হয়ে করেছেন অভিনয়, সাজিয়েছেন রঙ্গমঞ্চ এবং নিজেদের উদ্ভাবনায় সৃষ্টি করেছেন অভিনেতাদের প্রসাধন-কৌশল, তাঁদের সাজসজ্জা,—তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন এঁরা নানা রঙ্গমঞ্চে নানা ভূমিকায় অভিনেতার বেশে; এমন কি সাজিয়েছেন তাঁকেও বিচিত্র ভূমিকার সজ্জায়, আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন তাঁর মহড়ার মধ্যে অভিনয়কে, অংশে অংশে এবং সমগ্রভাবেও, তাঁর রূপ দেওয়ার কাজ। তাতেই উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে এই দুই মহা-শিল্পীর শিল্প-চেতনাকে। এঁকেছেন দুজনেই "অভিনেতা-গুরুদেবে"র নানা ছবি; সেগুলি অভিনয়ের ফোটো নয়,—নূতন এক রবীন্দ্রনাথ, সেই চিত্রগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও আনন্দ দান ক'রে হয়ে আছে চিরকালের কলা-রসিক, অভিনয়রসিক এবং রবীন্দ্রানুরাগীদের আগ্রহের বস্তু। ফোটোতে রবীন্দ্রনাথ যত বাঁচবেন, তার চেয়ে বেশি করে বাঁচিয়ে রাখবে তাঁকে শিল্পগুরুদের আঁকা এই ছবিগুলি। কেন না, তার মধ্যে রয়েছে ভক্তেরও প্রাণের পূজাঞ্জলি। মনে পড়ে তথাগত বুদ্ধদেবের কথা,—কত শিল্পীকে এই মহামানবের লীলাবৈচিত্র্যের বিভিন্ন অবস্থাগুলি জুগিয়েছে কত প্রেরণা, কত যুগে সমৃদ্ধ হয়েছে তা থেকে ভারতের কতই না শিল্পভাণ্ডার।

এই সূত্রে বলতে হয় আরো দুইজন শিল্পীর কথা, যাঁরা এঁদের পরে নিয়েছিলেন ভার এই অভিনয় বা উৎসব রঙ্গমঞ্চের প্রসাধনের। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর এবং তাঁদের সঙ্গে নন্দবাবুর কন্যা নৃত্য, অভিনয় ও চিত্রশিল্পে বিশিষ্টা গুণী শ্রীযুক্তা গৌরী দেবী,—এঁরা তিন জনে নিজেদের পরিকল্পনা ও সজ্জাশিল্পসম্পাদনা দ্বারা এই ক্ষেত্রে হয়ে থাকবেন স্মরণীয়। আরেক জন গুণীর নামোল্লেখও এই সঙ্গে অপরিহার্য, অভিনয়-কলাসৃষ্টি ও তার শিক্ষাদান ব্যাপারে গুরুদেবের প্রধান সহায় এবং যোগ্যতম শিষ্য একমাত্র তিনিই। এ ব্যক্তি আর কেহ নন, স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই অভিনয়-অনুষ্ঠানে, বিশেষ ক'রে শেষ দিকে, পারিবারিক দিক থেকে আরও যাঁরা যুক্ত ছিলেন ঘনিষ্ঠ-ভাবে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীযুক্তা অমিতা দেবী। বিশেষত এই অমিতা দেবী ছিলেন নায়িকার ভূমিকা-অভিনয়গুণে গুরুদেবের বিশিষ্ট স্নেহ-পাত্রী। প্রধানত এঁদের কয়জনের সাধনাতেই গড়া গুরুদেবের অভিনয়-জগৎ।

এ ক্ষেত্রে শেষ কথাটি মনকে যা ভারাক্রান্ত করে সে হচ্ছে এই যে, আশ্রমে গুরুদেবের প্রথম অভিনয় যেমন "শারদোৎসবে", তাঁর ব্যক্তিগত শেষ অভিনয়ও তেমনি এই "শারদোৎসবেই"। ১৩৪২ সালের আশ্বিনে শান্তি-নিকেতনে গ্রন্থাগারের বারান্দায় পূজার ছুটির পূর্বে শারদোৎসব উপলক্ষ্যেই হয় তা অভিনীত। তিনি নিজে সেজেছিলেন ঠাকুর্দা; এই অভিনয়ের মহড়ার সময় নিজে ব'সে ব'সে আগাগোড়া এক রকম হাতে ধ'রে ধ'রে দেখিয়ে দিয়েছেন সব অভিনয়-কৌশল প্রত্যেক অভিনেতাকে। আজ তাই সে-অভিনয়টি, আমাদের স্মরণের সুযোগ দিয়ে, নিজ বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতায় হয়ে আছে চিরকালের মধ্যে অবিনশ্বর।

এই আনন্দলোকের মন্ত্র চয়ন, আবৃত্তি এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদির কাজ সম্পূর্ণতই সম্পাদন করেছেন পূজনীয় আচার্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়দ্বয়। শাস্ত্রীমশাই অভিনয় করেন নি বটে, তবে মাঝে মাঝে অভিনয়ের সময় নান্দী রচনা করে দিয়েছেন। একবার 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় সেজেছিলেন 'মোহন'। অভিনয় কালে শেষের দিকে তিনি এতটা অভিভূত হয়ে পড়েন যে, ষ্টেজেই ফেললেন কেঁদে। অভিনয় তাতে খুবই জমে গেল। শাস্ত্রীমশাই সে উপলক্ষ্যে এক শ্লোক লিখে দেন, তার এক জায়গায় ছিল 'মোহনঃ মোহনশ্চ...' বাকিটা এখন লোকের বিস্মৃতিতলে অবলুপ্ত। আরেকবার 'মুকুট' অভিনয়েও তিনি দুই লাইনে লিখলেন এক নান্দী,—

'কবীন্দ্রেণ রবীন্দ্রেণ বিশ্রুতেন সমন্ততঃ।
বালকানাং কৃতে কিঞ্চিৎ নাটকং মুকুটং কৃতম্‌॥'

গুরুদেব কাউকে ছাড়েন নি। সবাইকে তিনি আকুল করে তুলেছিলেন প্রাণে তাঁদের তাঁর আনন্দলোকের সাড়া জাগিয়ে। এই প্রাচীন ইতিহাসের ধারার সঙ্গে আরো কতজনের স্মৃতি, কত দান মালার ফুলের মতো স্মরণডোরে গাঁথা, এঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য আছেন আরেক জন, প্রায় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই অলক্ষ্যে যাঁর অবস্থান তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের নীরবকর্মীপুত্র পূজনীয় রথীন্দ্রনাথ। বিশেষ করে, জনসাধারণ যেখানে কবির এই আনন্দলোকের রূপরসের অঞ্জলি উপহার পেয়েছেন রঙ্গমঞ্চের উৎসব-অভিনয়াদিতে, সেখানে তার পরিবেশনের ব্যবস্থা, তার সংগঠনের দিকটায় বরাবরই রয়েছেন এই কর্মীপুরুষ, সঙ্গে রয়েছেন তাঁরই মতো আত্মগোপনকারী তাঁর সহকর্মী আশ্রমসচিব শিল্পীপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়।

এ যাবৎ যা বলা হোলো সে হচ্ছে আনন্দলোকের সূচনার কথা। সৃষ্টির পটভূমি হয়েছে তৈরী, গুণী কর্মীরা এসে মিলেছেন একে একে, আশ্রমের পরিধি, লোকজন ও কর্মসংস্থা গেছে বেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসী ও আশ্রমবন্ধুবর্গের আনন্দের ব্যগ্রতা মেটাতে আনন্দোৎসবের রূপও হয়েছে বিচিত্র এবং ব্যাপকতর। এবারে আসে তার বিস্তৃত পরিচয়ের অপরূপ কথা।

প্রাচীন ভারতে নগররক্ষী

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি-এইচ্‌-ডি, ডি-লিট্‌

আজকাল বড় বড় শহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নগররক্ষী নিযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতেও নগরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নগররক্ষী নিযুক্ত হইত। কপিলবাস্তু নগরের[১] চারিদিকে চারিটি সিংহদ্বার ছিল এবং যাহাতে নাগরিকগণ নগরের বাহিরে যাইতে না পারে সেই জন্য ঐ দ্বারে নগররক্ষী রাখা হইত। যে সকল লোক রাজগৃহ নগরে[২] আসিত বা নগরের বাহিরে যাইত, রক্ষীরা তোরণের উপর হইতে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত। রাত্রিকালে কোন লোকের উপর সন্দেহ হইলে নগররক্ষীরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিত। কোন এক জন লোক রাত্রিকালে তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বাটী হইতে পলায়ন করে এবং নগররক্ষীদিগের হস্তে পড়ে। বাটীতে তাহার বৃদ্ধা মা আছে জানিয়া তাহারা তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেয়। তোরণের উপর হইতে তাহারা সন্দিগ্ধ লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত। কোন কিছু অন্যায় দেখিলে তাহারা রাজার নিকট নালিশ করিতে পারিত। রাত্রির প্রথম প্রহর হইতে চতুর্থ প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা অনিদ্রিত অবস্থায় পাহারায় নিযুক্ত থাকিত এবং বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বেড়াইয়া সময় অতিবাহিত করিত। কোথাও চুরি বা ডাকাতির খবর পাইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে দৌড়াইয়া আসিত এবং দুর্ব্বৃত্তদের অনুসরণ করিত। কৌশাম্বী নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ নগরে কোন এক ধনীর গৃহে ডাকাতি হয়। গৃহস্বামী ও নগররক্ষীরা 'চোর, চোর' বলিয়া চোরের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু চোর শ্মশানের নিকটে অপহৃত দ্রব্যগুলি ফেলিয়া দিয়া নর্দ্দমার মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

প্রত্যেক নগরে এক জন প্রধান নগররক্ষী থাকিত এবং সে নগরের স্থানে স্থানে চোর ধরিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত রাখিত। বারাণসী নগরে ধনীদের গৃহে কোন একটি চোর প্রত্যহ রাত্রিকালে অবাধে চুরি করিত। নাগরিকগণ রাজার নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে রাজা প্রধান নগররক্ষীকে নগরের স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া যে কোন উপায়ে চোর ধরিতে আদেশ দিতেন। সিঁদেল চোর, দিনে-ডাকাত, নরহত্যাকারী, দস্যু প্রভৃতি ধৃত হইবামাত্র কারাগারে প্রেরিত হইত। প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশেও এক দল নগররক্ষী থাকিত এবং তাহাদের শিরোভূষণ ও পোষাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত। প্রাচীন কালে দস্যুতস্করের হাত হইতে বণিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক-রক্ষী ভাড়া করিয়া আনা হইত এবং উহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া নগর রক্ষা করিত।

নগররক্ষীর প্রধান কাজ ছিল নাগরিকগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং গ্রামবাসীদের ধানের ক্ষেত ও সম্পত্তিরক্ষা করা। প্রাচীন মগধে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নগররক্ষী গলায় লাল ফুলের মালা ব্যবহার করিত। প্রধান নগররক্ষী নগরের প্রত্যেক নরনারীর নামধাম, আয়ব্যয়, পেশা প্রভৃতির হিসাব রাখিত। ইহা ব্যতীত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে প্রতিদিন কয় জন বিদেশী সেখানে আসিয়া বাস করে এই সংবাদটি লইত। বিদেশীগণের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাহার আর একটি কাজ ছিল। যাহারা কোনও বিপজ্জনক কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইত তাহারাও তাহাকে তাহাদের

১। বর্ত্তমান নেপাল তরাই।

২। বর্ত্তমান রাজগীর।

কার্য্যাবলীর বিবরণ দিত। যাহারা কোন নিষিদ্ধ স্থানে বা নিষিদ্ধ সময়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত, বণিকেরা ইহার নিকট তাহাদের সংবাদ পাঠাইত।

কোনও ক্ষত-রোগীর গোপনে চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসককে নগররক্ষীকে জানাইতে হইত, নতুবা সে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইত। বাড়ীতে কোনও আগন্তুক আসিলে গৃহস্বামীকে প্রধান নগররক্ষীর নিকট সংবাদ দিতে হইত। পরিত্যক্ত গৃহ, কারখানা, জুয়ার আড্ডা প্রভৃতি স্থানে সন্দিগ্ধ লোকের অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিত। কোন জন্তুর মৃতদেহ নগরের ভিতর ফেলা হইয়াছে কিনা, অথবা কোন লোকের মৃতদেহ সাধারণ দ্বার ভিন্ন অন্য দ্বার দিয়া নগরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে নগররক্ষীকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। কোন লোক হাতে লাঠি কিংবা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাস্তায় বেড়াইলে অথবা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিলে নগররক্ষী তৎক্ষণাৎ তাহার গতিবিধি বন্ধ ক'রিতে পা'রিত। এই প্রকার অপরাধিগণের অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ড হইত। নগররক্ষী প্রত্যহ জলাশয়, রাস্তা প্রভৃতি পরিদর্শন করিত। রাত্রে কোন অন্যায় কার্য্য ঘটিলে রাজার নিকট নালিশ করিতে পারা যাইত। অপরের হৃত, বিস্মৃত অথবা পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখা হইত।

প্রধান নগররক্ষী রাত্রিকালে নিম্নলিখিত লোকগুলিকে বাহিরে যাইবার অনুমতি দিত :—

(১) ধাত্রী যাহাকে ধাত্রীবিদ্যা অথবা চিকিৎসার জন্য বাহিরে যাইতে হইত, (২) যাহারা শ্মশানে মৃতদেহ লইয়া যাইত, (৩) যাহারা আলো লইয়া বাহিরে আসিত, (৪) যাহারা প্রধান নগররক্ষীর সহিত দেখা করিতে যাইত, (৫) যাহারা অগ্নি নিবাইবার জন্য বাহির হইত এবং (৬) যাহারা ছাড়পত্র লইয়া বাহিরে আসিত।

শ্মশানে নগররক্ষীরা মৃতদেহগুলি পরিদর্শন করিত এবং কোনরূপ অন্যায় করা হইয়াছে কিনা লক্ষ্য করিত। ইহা ব্যতীত যাহারা শ্মশানে মৃতদেহ লইয়া আসিত তাহাদের প্রতিও ইহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত।

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যোগমায়াকে দেখিয়া লবঙ্গলতা একরূপ ছুটিয়াই দাওয়া হইতে নামিয়া আসিলেন। যোগমায়াও মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছোট মেয়েটির মতই ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা নিজের চোখের জল মুছিবেন, না মেয়েকে সান্ত্বনা দিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া উঠানের মাঝখানেই হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় কলুপাড়ার রাঙাখুড়ি খিড়কির দুয়ার দিয়া এ বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই আলিঙ্গনাবদ্ধ মা ও মেয়েকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, কে, যুগি না? কাঁদছিস কেন? অসুখ কি কারও হয় না। ধন্যি অসহ্যি তোর লবঙ্গ। বুড়ো মাগী—কোথায় মেয়েকে বোঝাবি—না হাউ হাউ করে কেঁদে মরছিস! ছি!

লবঙ্গ যোগমায়াকে ছাড়িয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, মন যে বোঝে না, খুড়ি।

কপালখানা মনের! বোঝে না বলে কাঁদলেই রোগ সেরে যাবে? তোর কান্না শুনলে রুগী হৃদ্‌ভাজা হবে না? ওর—অমঙ্গল হবে না? আয় যুগি, উঠে আয়। হাত মুখ ধো, একটু জিরো। যোগমায়ার হাত ধরিয়া তিনি দাওয়ায় উঠিলেন।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোন্ ঘরে?

লবঙ্গ বলিলেন, বড় ঘরে। একটু ঘুম আসছে বোধ হয়।

রাঙাখুড়ি বলিলেন, ভালই তো, ঘুমুক। হৈ চৈ করে—ঘুম ভাঙাস নে। রুগী মানুষ—ঘুমুলেই সেরে যাবে।

যোগমায়ার ছোট ভাইটি এমন সময় বাড়ির মধ্যে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে উঠান হইতে হাঁকিল, মা, পাল্কী নিয়ে ওরা চলে গেল যে।

রাঙাখুড়ি বলিলেন, চুপ, চেঁচাস নে। চলে গেল তো মা কি করবে?

বাঃ রে, মা যে বললে, জল খাবার খেয়ে—

আচ্ছা—আচ্ছা, তুই থাম তো বাবা।

ছেলেটি চলিয়া যাইতেছিল, রাঙাখুড়ি ডাকিলেন, ও হরি, শোন। কবিরাজ মশায়ের বাড়ি গিয়েছিলি আজ? কি বললেন তিনি?

কি আবার বলবেন! বেলপাতার রস মধু দিয়ে সকালের ওষুধ, আর সন্ধ্যে বেলায় তুলসী পাতার রস। বললেন, ভয় নেই, ভাল হ'য়ে যাবে।

ভাল হয়ে যাবে—আমি জানি। তবে যে কাল বলছিলেন—জ্বরটা বাঁকা, কিছুদিন সময় নেবে।

তা আমি কি জানি? বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

লবঙ্গ বলিলেন, ছেলের কেবল চব্বিশ ঘণ্টাই যাই-যাই। বাড়িতে রুগী, একটু কাছে বসলেও তো উবগার হয়।

উঠান হইতে মুখ ভেংচাইয়া ছেলে বলিল, হাঁ হয়! হাওয়া করে করে আমায় বলে হাত ব্যথা হ'য়ে যায়! ঐ তো দিদি এলো, করুক না হাওয়া। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না।

রাঙাখুড়ি বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওরা তো ছট্‌ফট্‌ করবেই। রুগীর কাছে বসে থাকতে কি ওরা পারে!

লবঙ্গ বলিলেন, তুমি জান না, রাঙাখুড়ি—হরিটা ছেলেবেলা থেকেই অমনি আপ্তসারা। কেউ মলেও চোখ মেলে দেখে না।

রাত তখন ন'টাই হইবে। এ বাড়ির আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। মেঝের উপর ঢালা বিছানা পাতা; হরি একটা ছোট পাশবালিশ জড়াইয়া তাহার এক কোণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাঝখানে রামজীবন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। ঘুমাইতেছেন কি না বুঝা যায় না। মাঝে মাঝে তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ বাহির হইতেছে। লবঙ্গলতাও শুইয়াছেন। এবং শুইবামাত্রই তাঁহার ঘুম আসিয়াছে। একা মানুষ; দিনে সংসারের ও রাত্রিতে রোগীর সেবা করিয়া দুই দিনেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যোগমায়ার হাতে আজ রোগীর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। ওঘরে রাঙাখুড়ি আসিয়া শুইয়াছেন। দুই দিনই তিনি লবঙ্গকে আগলাইবার জন্ত এ বাড়িতে শয়ন করিতেছেন। নিশুতি রাত্রিতে একটা গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িলেও মানুষ সেই শব্দে চমকাইয়া উঠে, ঘরের কানাচ দিয়া কত কুকুর শিয়াল যে খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ শব্দে সারারাত্রি ছুটাছুটি করে! যদিও ওঘর হইতে—রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাঙাখুড়ির নাসিকাধ্বনি শোনা যায়, তথাপি নিদ্রিত মানুষকে সঙ্গী করিয়াও জাগ্রত মানুষের বুকে সাহস জাগে। রাঙাখুড়ি বিধবা মানুষ। রাত্রিতে আচমনী জিনিস অর্থাৎ তেল বা ঘিয়ে ভাজা কোন জিনিস খান না। কোনদিন কাঁচা ময়দায় ঘি মাখিয়া, কোনদিন একটু দুধ, কোনদিন বা একটা কলা ও দু'খানা বাতাসা জল খাইয়া তিনি রাত্রির আহার সমাধা করেন! যোগমায়াদের বাড়িতে শুইতেছেন বলিয়া—রাত্রির জলযোগের ব্যবস্থা লবঙ্গলতাকেই করিতে হয়।

রামজীবনের শিয়রে জাগিয়া বসিয়াছিল—যোগমায়া। হাতের পাখাটা তার বহুক্ষণ চালনার ক্লান্তিতে কিছু শিথিল হইয়াছে; রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝে নিজের বুকের শব্দটিও সে যেন কান পাতিয়া শুনিতেছে। মার নিশ্বাস পড়িতেছে জোরে জোরে, বাবার মুখ হইতে মাঝে মাঝে একটা চাপা নিশ্বাস গোঙানির মতই বাহির হইতেছে, হরি নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে। বাবার সারা গা হইতে একটা গন্ধ বাহির হইতেছে। ঠিক দুর্গন্ধ নহে—'অসুখ' 'অসুখ' গন্ধ। এই গন্ধটা নাকে অসহ্য না হইলেও, মনে ঈষৎ ভাবনা ও ভয়ের সঞ্চার করে বৈ কি! মৃদুস্বরে যোগমায়া দুই-এক বার ডাকিল, বাবা, ও বাবা। তিনি উত্তর দিলেন না। সেই মৃদুস্বর দেয়ালে ঠেকিয়া যোগমায়ার বুকেই ফিরিয়া আসিল! বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইল। হাতের পাখাটাও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হইল। ঘরের কোণে রেড়ির তেলের অনুজ্জ্বল প্রদীপটির আয়ুও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

সিন্দুকের ওপাশে খুট্‌ করিয়া ইঁদুর চলার শব্দ হইল। বিড়ালটা চটের উপর শুইয়া ঘড়র ঘড়র শব্দে ঘুমাইতেছে। যোগমায়া দ্রুততর বক্ষ স্পন্দনের সঙ্গে প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া ডাকিল, এই কালি—কালি—ইস্—স্।

বিড়াল চোখ মেলিয়া চাহিল; চাহিয়াই ডাকিল, মিউ। যোগমায়ার শুষ্ক কণ্ঠ সরস হইয়া উঠিল, হাতের পাখা ধীরে ধীরে আবর্তিত হইতে লাগিল, প্রদীপের শিখাটা মনে হইল—আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যা ভয় ভয় করিতেছিল!

চোখ মেলিয়া রামজীবন চাহিলেন, একটু জল—দাও না?

যোগমায়া জীবনের জগতে নামিল। জল খাবে, বাবা, জল?

রামজীবন উত্তর না দিয়া হাঁ করিলেন। পার্শ্বের

কুলুঙ্গিতে রেকাব ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস ছিল, যোগমায়া তাড়াতাড়ি গ্লাস লইয়া পিতার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল।

জল খানিকটা পান করিবার পর রোগী মাথা নাড়িলেন। হাত নড়িয়া খানিকটা জল তাঁহার মুখের উপর গড়াইয়া পড়িল। রামজীবন চমকাইয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, কে? এতক্ষণে তিনি বুঝি সম্পূর্ণ চৈতন্য লাভ করিলেন।

আঁচল দিয়া তাঁহার মুখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে যোগমায়া উত্তর দিল, আমি, বাবা।

হরি?

না, বাবা, আমি তোমার মায়া।

মায়া! আরক্ত চক্ষু মেলিয়া তিনি যোগমায়ার পানে চাহিলেন। দৃষ্টিতে রোগযন্ত্রণার মধ্যেও অর্দ্ধ পরিচয়ের রশ্মি যেন ফুটিয়া উঠিল। খানিকটা বিস্ময় ও খানিকটা আনন্দের আলোও সেই পরিশুষ্ক আরক্ত চক্ষুর তারায় প্রতিবিম্ব ফেলিয়া খানিকক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিবার পর তিনি অস্ফুটে উচ্চারণ করিলেন, মায়া? আঃ!

দৃষ্টি আবার ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে দেখিয়া যোগমায়া তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, আমায় চিনতে পারলেন না, বাবা?

ঘোলাটে দৃষ্টি পুনরায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। তিনি মাথা নাড়িয়া—মুখে হাসি টানিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, চিনিতে পারিয়াছেন।

যোগমায়া বলিল, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে? বুকে হাত বুলিয়ে দেব?

হুঁ। বলিয়া তিনি ডান-হাতখানি শূন্যে তুলিয়া যোগমায়ার একখানি হাত টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

যোগমায়া বলিল, কিছু খাবে, বাবা?

আবার তিনি মাথা নাড়িলেন; অস্ফুট স্বরে দুই-এক বার কি বলিলেন ও যোগমায়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া কাঁথার মধ্যে হাতখানি ঢুকাইয়া পৈতার গোছাটা টানিয়া বাহির করিয়া করাঙ্গুলি আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যোগমায়া বুঝিল না—জ্ঞানের রাজ্যে পা দিয়াই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের তাড়নায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন! ভয়ে সে নিদ্রিত মাতাকে টানিয়া উঠাইল। মা, ওমা, বাবা কেমন করছে দেখ না?

লবঙ্গলতার নিদ্রা আজ গাঢ়। গুরু চিন্তার অংশ ভাগ করিয়া দিয়া মানুষ এমনই নিশ্চিন্ত হয়। উঃ, বলিয়া পাশ ফিরিয়া তিনি শুইলেন।

যোগমায়ার আর্ত্তকণ্ঠস্বরে রামজীবনের মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল, পৈতায় জড়ানো হাতখানি দিয়া যোগমায়ার বাহুমূল ধরিয়া কহিলেন, কখন এলে, মা?

আজ সন্ধ্যেবেলায়। তুমি অমন করছিলে কেন, বাবা?

না—রে, অমন করি নি। হাসিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন, ওকে ডাকিস নে, বুড়ি। অনেক দিন ও ঘুমোয় নি—ভারি কষ্ট গেছে। আজ কি বার রে? মঙ্গলবার?

মঙ্গলবার।

জ্যৈষ্ঠ - না আষাঢ় মাস?

কাল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি।

কাল! একটু থামিয়া বলিলেন, তাই ত বুড়ি, এবার অম্বুবাচীর পরেই যে রথ। তোর শ্বশুরবাড়িতে তো যাওয়া হ'ল না।

আমি তো এখানে এসেছি, বাবা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে—

যাবি? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবি? না বুড়ি, রথের দিন পাঁপড় ভাজা, কাঁঠাল, আনারস আর ইলিশ মাছ দিয়ে তত্ত্ব পাঠাব ভেবেছিলাম! তা তখন কি সেরে উঠব?

উঠবে—উঠবে।

একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দে। না না, বসে থাকিস নে, শুয়ে পড়; অনেক পথ এসেছিস—শুয়ে পড়।

অগত্যা যোগমায়াকে শুইতে হইল।

রামজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর শাশুড়ী যে বড় পাঠালে তোকে?

বাঃ, তোমার অসুখ, পাঠাবেন না!

তা হ'লে কার জিত হ'ল, বুড়ি? সেবার তুই আসতে চাইলি—আমি আনলাম না। এবার আমি আনলাম না—অথচ তুই এলি! কার জিত হ'ল বল দেখি?

তোমার।

ইস! বোড়ের চালে তুই কিস্তিমাত করলি—না? দেখ বুড়ি, ওরা যদি বেশি চালাকি করে, ওদের অশ্বচক্র করিয়ে দেব, বুঝলি? টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

যোগমায়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। রামজীবনের চোখের দৃষ্টি আবিল হইয়া উঠিতেছে আবার; কথায় অসংলগ্নতা আসিতেছে। ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া বিড়বিড় করিতে করিতে তিনি আবার বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভয় হইলেও শ্রান্ত জননীকে যোগমায়া আর ডাকিল না। পাখার বেগটা ঈষৎ বাড়াইয়া দিয়া অকম্পিত দীপ-শিখা ও কুণ্ডলীকৃত কালি বিড়ালটার পানে চাহিয়া রহিল। তার পর কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

৭

মধ্য রাত্রিতে সেই যা একটু জ্ঞানের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল—আর রামজীবন চোখ মেলিয়া বড় একটা চাহেন নাই। যদি বা চাহিয়াছেন, রক্তবর্ণ চক্ষুতে তাঁহার পরিচয়-বোধের কোন চিহ্নই ফুটিয়া উঠে নাই। পূর্ণ বিকার দেখা দিয়াছে। সেই প্রলাপের মধ্যে ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রপাঠ চলিতেছে, দাবা খেলার চাল ও কিস্তির উচ্চধ্বনিও শোনা যাইতেছে, অত্যাসন্ন রথের দিনে যোগমায়ার শশুরালয়ে যাওয়ার উদ্যোগ ও সাংসারিক অনটনের কথাটাও এক একবার উচ্চারিত হইতেছে। লবঙ্গলতা চোখের জল মুছিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। যোগমায়া কখনও জল, কখনও বা আনারসের রস দিয়া বাপের শুষ্ক ওষ্ঠ ভিজাইয়া দিতেছে, হাতের পাখার তো বিরাম নাই। ভরসার মধ্যে পাড়ার পাঁচ জনে হাসিমুখেই সাহস দিতেছেন। কবিরাজ-জ্যেঠাও দুই একটি রসিকতা-মাখা কথা দ্বারা যোগমায়াকে প্রফুল্লিত করিয়া যাইতেছেন। কি সব দামী দামী ঔষধ তিনি দিবেন—যাহার মূল্য তাঁহাকে আজকালের মধ্যে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

লবঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, সবই তো জান, রাঙাখুড়ি, হাতে সোনারূপোর গুঁড়ো নেই—কি দিয়ে চিকিচ্ছে চালাই ?

রাঙাখুড়ি বলিলেন, যুগীর হাতের নারকোল ফুল জোড়াটা না হয় বাঁধা দে।

ওর শশুর বাড়ির জিনিস ; সেবার বাঁধা দিয়ে দু'মাস ঘুমুতে পারি নি, খুড়ি।

বলি—ধারকর্জ্জ কি মানুষের চিরকাল থাকে ? সেবার বাঁধা দিয়েছিলে—আবার ধার শুধে জিনিস খালাস করে মেয়ের হাত ভর্ত্তি করে দিয়েছ। আগে মানুষ, না আগে গহনা ?

সবই জানি, খুড়ি—কিন্তু আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ !

দেখ বউমা, সত্যি কথা বলি—জীবন যদি বেঁচে ওঠে তুমি যে রাজরাণী—সেই রাজরাণী। একটু থামিয়া বলিলেন, মেয়ে কিছু বলে নাকি ?

লবঙ্গলতা বলিলেন, দুধের বাছা—ওরা ভালমন্দ কি বোঝে। কিন্তু আমার ভাবনা—

খুড়ি স্বর নামাইয়া বলিলেন, কবিরাজ হাজার বন্ধু লোক হোক, টাকাটা পেলে যেমন প্রাণ ঢেলে চিকিচ্ছে করবে—যেমন ভাল ভাল ওষুধ দেবে—

লবঙ্গলতা বলিলেন, যাই হোক, খুড়ি—যুগীকে একবার জিগ্‌গেস করি।

তোর মাথা খারাপ হয়েছে, ওকে আবার জিগ্‌গেস করবার কি আছে! দাও আমাকে, পেটকোঁচড়ে করে লুকিয়ে মল্লিকবোয়ের কাছ থেকে গোটা পঁচিশেক টাকা নিয়ে আসি গে।

পিত্রালয়ে এক গা গহনা প'রিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়াই—হাতের দু'গাছি মুড়কি মাদুলি ছাড়া—আর সবই যোগমায়া মায়ের হাতে দিয়াছিল সিন্দুকে তুলিয়া রাখিবার জন্য। গহনাগুলি তার নিজের হইলেও বা দুই এক দিন পরিয়া থাকিতে বাধা ছিল না। কিন্তু কমলার জিনিস পাছে ময়লা লাগিয়া বা কোন কিছুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগিয়া ভাঙিয়া বা তোবড়াইয়া যায়—এই ভয় সর্ব্বক্ষণই তার মনে জাগিয়াছিল। কমলা মুখ ভার করিবে বলিয়া শশুরবাড়িতে গহনা খুলিবার সুবিধা হয় নাই, বাপের বাড়ি আসিয়াই তাই সেগুলি খুলিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। গহনা সম্বন্ধে মা-ও কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই—সেও কিছু খুলিয়া বলে নাই। পিতা অসুস্থ না হইলে হয়ত এই সম্বন্ধে স্ত্রী-জাতি-সুলভ কৌতূহলকে ঠেকাইয়া রাখা দুষ্করই হইত!

দিন সাতেক পরে পিসিমাকে লইয়া কমলা যখন যোগ-মায়ার পিতাকে দেখিতে আসিল, তখন রামজীবন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়াছেন। লবঙ্গলতা ও যোগমায়াকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া কমলা আর বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসা-বাদ করিতে পারিল না। এমন কি যোগমায়ার নিরাভরণ দেহের পানে চাহিয়াও সে সম্বন্ধে যে কোনরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে—এ ধারণাও কমলার রহিল না। শুধু হাতের মিছরির ঠোঙাটা যোগমায়ার জননীর হাতে দিয়া তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি ভাবছেন কেন আঁবুই মা, ভগবান্ ভালই করবেন।

অনেক অনুরোধ করিয়াও পিসিমাকে জল খাওয়ানো গেল না। বলিলেন, গাড়িতে এসেছি—ছোঁয়া নেপা—তুমি ব্যস্ত হয়ো না, বেয়ান। বেয়াই ভাল হয়ে উঠুন—এক দিন এসে নেমন্তন্ন খেয়ে যাব।

লবঙ্গলতা চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন, সেই আশীর্ব্বাদ করুন—বেয়ান। উনি ছাড়া আমাদের যে কি অজল-অস্থল অবস্থা—দেখছেন তো। আপনাদের বুড়ো

সিদ্ধেশ্বরী শুনেছি খুব জাগ্রত, ওঁর নাম করে যদি সওয়া পাঁচ আনার পূজো দেন—

দেব বৈকি, বেয়ান, দেব।

দাঁড়ান একটু। বলিয়া দ্রুতপদে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া ছোট কাঠের বাক্সটি খুলিয়া পয়সা বাহির করিলেন।

বাহিরে আসিয়া বলিলেন, যে দিন যুগী এখানে আসে ওর মুখে শুনে—মার নাম করে ওঁর কপালে ছুঁইয়ে রেখে ছিলাম।

পিসিমা বলিলেন, পূজো দিয়ে পেসাদ চন্নামেত্তর পাঠিয়ে দেব। আর মা বাগ্‌দেবীর পূজো মানত করো, বেয়ান। সিদ্ধপীঠ।

হাঁ, জোড়া পাঁঠা দিয়ে মাকে পূজো দেব। বুড়ো-বারোয়ারি তলায় ধুনো জালিয়ে বুকের রক্ত দেব।

সপ্তাহ পরে আরও কিছু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় লবঙ্গলতা আর একবার সিন্দুক খুলিলেন। রাঙাখুড়ির নিষেধ সত্ত্বেও সেদিন রাত্রিতে তিনি যোগমায়াকে চুপি চুপি বলিলেন, তোকে না জিগ্‌গেস করে একটা কাজ করে ফেললাম, যুগি। হাতে একটা পয়সা ছিল না, তোর দু'খানা গহনা বাঁধা দিয়ে—

যোগমায়ার মুখ শুকাইয়া গেল। লবঙ্গলতা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উনি ভাল হ'য়ে উঠলে মাসখানেকের মধ্যে—সেবার যেমন ছাড়িয়ে এনেছিলেন—

যোগমায়ার আর্তকণ্ঠ হইতে শুধু বাহির হইল, মা।

কি রে, যুগি, অমন করছিস কেন?

যোগমায়া ঢোঁক গিলিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল। সামলাইতে খানিকটা সময় গেল বৈকি।

লবঙ্গলতার ভয় হইল, লজ্জাও বোধ করিলেন। যেন মেয়েকে বঞ্চনা করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন—এমনই কুণ্ঠিত ভাবে মুখ নামাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, ওঁর অসুখে—চারিদিকে যেন কূল পেলাম না, মা। কি যে করি—

যোগমায়া বলিল, গহনা তো আমার নয় মা, ও যে ঠাকুরঝির।

লবঙ্গলতা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোর গহনা নয়? তা তুই আমায় বললিনে কেন আগে! কোন্‌গুলো তোর আর কোন্‌গুলো তোর নয়—আমি কি করে জানব, বল?

এমন ভাবে তিনি কথা বলিলেন যেন মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই এই কাজ করিয়াছেন; সে ঠিকমত না বলিয়া দেওয়াতেই যত অনর্থ ঘটিয়াছে।

যোগমায়া ধীরস্বরে বলিল, ওর মধ্যে একখানি গহনাও তো আমার নয়, মা; সব ঠাকুরঝির।

অতি বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া লবঙ্গলতা বলিলেন, তোর গহনাগুলো তবে কি হ'ল? একখানা দু'খানা তো নয়—এক গা গহনা!

যোগমায়া বলিল, জেঠশ্বশুরের দরুন বাড়িটা যে ও-মাসে কেনা হ'ল। চার-পাঁচ-শ টাকা লাগলো। হাতে তো টাকা ছিল না—তাই—

লবঙ্গলতার বাক্যস্ফূর্তি হইল না অনেকক্ষণ। ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তিনি যোগমায়ার মুখের পানে চাহিয়া বুঝিতে চাহিলেন, সে রহস্য করিতেছে কি না? কিন্তু যোগমায়া—শান্ত যোগমায়া তো কোন কালেই রহস্য করে না। দুরন্তপনা সে করে, মায়ের কথাও অনেক সময় শোনে না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া মাকে অকূল পাথারে ফেলিয়াছে—এমন একটি দিনের কথাও তো মনে পড়ে না লবঙ্গলতার। কিন্তু হাতেই যদি টাকা ছিল না—তো বাড়ি কিনিবার কি দরকার ছিল?

অনেকক্ষণ পরে একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া লবঙ্গ-লতা বলিলেন, জানি নে অদৃষ্টে কি আছে। তোকে একি জালে জড়ালাম, যুগি?

যোগমায়া বলিল, তুমি ভাবছ কেন, মা, বাবা ভাল হয়ে উঠলে—সেবারকার মত গহনা ছাড়িয়ে এনো। ঠাকুরঝি তো এখনই বাপের বাড়ি যাচ্ছে না। বাবা ভাল না হ'লে আমিও সেখানে যাব না।

তোর শাশুড়ী যদি নিতে আসেন?

আসেন—যাব না। বাবা না সারলে আমি কক্‌খনো যাব না।

লবঙ্গলতা কহিলেন, হে হরি, ধম্মে ধম্মে উনি ভাল হয়ে আমার মুখ রক্ষে করুন, নৈলে—

নহিলে কি যে হইবে তাহার আভাস তিনি যোগ-মায়াকে আর দিলেন না। যোগমায়াও এ বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা করিল না। বাবা যেখানে জীবন-মরণের সম্মুখীন অন্য চিন্তা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করিবে কি করিয়া!

দুপুর বেলায় সাগুর বাটি লইয়া যোগমায়া ডাকিল, বাবা, সাবু এনেছি।

আরক্ত চক্ষু মেলিয়া রামজীবন চাহিলেন। এবং

প্রাণপণে মাথা নাড়িতে নাড়িতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, ওয়াক্—থু। খালি সাবু নাকি খাওয়া যায়। না লেবু—না, যা, যা, নিয়ে যা। আমি খাব না, খাব না—খাব না—আ—আ—

তাঁহার একটানা অস্বীকৃতিতে যোগমায়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মা সংসারের কোন বিষয়ে খেয়াল করেন না বড় একটা। রোগীর পথ্য নির্ব্বাচনে তাঁহার কোন মতামত নাই। সাধারণ সুস্থ লোকে যেমন ভাত ডাল খায় রোগীও তেমনি দুধ নতুবা সাগু খাইবে। সেই দুধে মিছরি বা সাগুতে লেবু দিয়া মুখরোচক করিবার কল্পনাও তাঁহার মাথায় আসে না। বর্ষাকালে লেবুর অভাব নাই। কিন্তু এমন দুরদৃষ্ট, উঠানের ঝাঁকড়া গাছটিতে লেবু এবার ধরে নাই। গ্রীষ্মের উত্তাপে গাছটি প্রায় শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, মরে নাই শুধু পিতার অক্লান্ত জল ঢালিবার ফলে। গাছ মরে নাই, এবং মুমূর্ষু গাছে একটিও ফুল ধরে নাই।

লেবু আছে ঘরের ওপিঠে হারু-কাকাদের গাছে। কাকার জীবিত কালেই ইহারা পৃথগন্ন। এবং জ্ঞাতি-সম্পর্কীয়েরা পৃথগন্ন হইলে যা হয়—দুই বাড়ির মধ্যে বিরোধের প্রাচীরটিও বেশ কায়েমি হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রাচীরের গাঁথনি পাকা, শীঘ্র ভাঙ্গিবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এমন কি কাকার মৃত্যুর পর কাকিমা বীরাঙ্গনার মত মৃত স্বামীর ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞাকে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিয়াছেন। যোগমায়ার বিবাহে যে ভাঙ্‌চি পড়িয়াছিল, পাড়ার লোকে বলে, সে ওই হারাধনের স্ত্রীরই কীর্ত্তি। অবশ্য সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার সৎসাহস কাহারও হয় নাই। বিবাহ যখন ভাঙ্‌চিতেও রোধ করা যায় নাই তখন সেই সব পল্লী-পাচালী পাঁচ কান করিয়া বেড়ানো রামজীবন পছন্দ করিতেন না বলিয়াই কথাটার ইতিহাস বিবাহের আনন্দ-পর্ব্বের মধ্যেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কাকিমা অর্থাৎ হরিমতী কিন্তু ভোজ খাইতে এ বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই। সগর্ব্বে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, আমি যাব পাত পাত্‌তে বটঠাকুরের বাড়িতে? ওঁরার সঙ্গে যে ব্যাভার ও করেছে, মুচি-মুদ্দোফরাসেও তেমন করে না। ওদের বাড়ির ঢাকের বাদ্যি আমার কানে গেলে প্রাশ্চিত্তির করতে হবে না!

বিবাহের কয়েক দিন আগে তিনি তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাব্‌লা গ্রামে তাঁহার মেজমেয়ের বাড়ি গিয়াছিলেন, এবং পনেরো দিন পরে সেখান হইতে ফিরিয়াছিলেন।

ঘরের পিছনে যে পড়ো জমিটায় লেবুগাছ আছে সেটা ঠিক হারু-কাকাদেরও নহে। তবে এ পক্ষ হইতে প্রতিবাদ না হওয়াতে, অপর পক্ষ দিব্য ভোগদখল করিয়া চলিয়াছেন। গাছটির ইতিহাস এইরূপ:

রামজীবনের পিতারা ছিলেন তিন ভাই। একান্নবর্ত্তী পরিবার। এধারের কলমি ডোবা হইতে কুড়ি বিঘা-ব্যাপী আম বাগানটা সবই ছিল তাঁহাদের। মাঝখানে ওই বাঁশঝাড়, ওই বড় তেঁতুল গাছটা, জাম গাছটা, দুটি বেল গাছ ও সারি সারি কলিকা ও কুরচি ফুলের গাছ—যাহা জঙ্গলে রূপান্তরিত হইয়াছে—সবটাই পরিপাটি করিয়া সাজানো-গোছানো ছিল। সদ্ভাবে কাটাইয়া তিন কর্ত্তাই পরলোকগত হন। উত্তরাধিকার-সূত্রে ছোটকর্ত্তার ছেলে রামজীবন ও বড়কর্ত্তার ছেলে হারাধনে এই বিষয় বর্ত্তিয়াছে। মেজকর্ত্তা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া যোগমায়াদের ঘরের পিছনে ওই খণ্ড জমিটুকু—অর্থাৎ যে ঘরখানিতে তিনি বাস করিতেন মাত্র সেইটুকু আজও পড়িয়া আছে। জমিজমা সবই টুকরা টুকরা করিয়া চুল চিরিয়া ভাগ হইয়া গিয়াছে। অবিভক্ত রহিয়াছে ওই জমিটুকু। অপুত্রকের ভিটা দখল করিতে দুই পক্ষেরই আন্তরিক অনিচ্ছা ছিল। জমির আর ছিলই বা কি! ঘরের মাটির দেয়াল মাটিতে মিশিয়াছে, চালের খড় কোন্ কালে খসিয়া পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, দরজা জানালাগুলি সহসা যে কোন্ পথে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস জানিলেও কেহ প্রকাশ করিয়া কলহ সৃষ্টি করিতে চাহে নাই। আর দাওয়ার খুঁটি ও চালের কাঠামোর বাঁশ-বাখারি দুই বাড়ির চুলার খাদ্যরূপেই আহৃত হইয়াছে, সুতরাং দুই বাড়ির অভিযোগ ইহাতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার কথা নহে। গোল বাধাইয়াছে ওই লেবুগাছটা। পড়ো ভিটের উর্ব্বর মাটিতে সেটির স্বাস্থ্য শুধু অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। নীচের ডালপাতাগুলি ছাগল গরু মুখ বাড়াইয়া যতটা পারিয়াছে মুড়াইয়া খাইয়াছে, তবু গাছটির অদ্ভুত জীবনীশক্তি। উর্দ্ধমুখে বহু শাখা-প্রশাখা মেলিয়া ফাঁকা জায়গায় অবাধ আলো-হাওয়ায় সেটি যেন উর্দ্ধগ দেবতার অভয় আশীর্ব্বাদ সমস্ত দেহপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতেছে। যেমন থরে থরে ফুলের সমারোহ সারা ঋতুতে তার সর্ব্বশাখায় উৎসব আনিয়া দেয়, তেমনই থলো থলো ফলের প্রাচুর্য্যে সে নয়নমনলোভন। হারু-কাকার বিধবা জোর গলায় বলেন, লজ্জাও করে না বেহায়া মিন্‌সের! আমার কি রোজগার করবার কেউ আছে,

না অরুণের গতর নিয়ে কেউ বাইরের পয়সা ঘরে তুলছে? ওই নেবু ক'টি ভরসা করে বিধবা মানুষ সম্বচ্ছর চালাই। দু-আনা করে শ; পরণের ঠেঁটি এক খানা জোটে কি তাই। আবার বলে ভাগ? বেহায়া কোথাকার!

রামজীবন স্ত্রীকন্যাকে নিষেধ করিয়াছেন—পিছনে ওই পড়ো ভিটার লেবুগাছে তাঁহারা যেন হাত না দেন।

অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, সে নিষেধের স্মৃতি ফিকা হইয়া আসিবারই কথা। পিতার সহিষ্ণুতার গুণে নূতন করিয়া খুড়িমার সঙ্গে বিরোধ বাধে নাই। বিষ খুড়িমাই হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছেন; সকালে—সন্ধ্যায়—দুপুর বেলায় বা মধ্য রাত্রিতে—কর্ম্মের অবসরে সেই বিষ উদ্গার করিয়া থাকেন। নিত্যকার বলিয়া সে জিনিস এ-বাড়ির লোকেদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। পাড়ার লোকেও এদিকে কর্ণপাত করে না।

লেবুর সন্ধানে যোগমায়া ঘরের পিছন দিকে আসিল। গাছটায় লেবু কমই আছে। খুড়িমা দিন দুই আগে প্রায় এক হাজার লেবু বেচিয়া উচ্চৈঃস্বরে দাম হিসাব করিতেছিলেন। লেবুবিক্রেতার অসাধুতা ও নিজের ভালমানুষিত্বের কথা সেই হিসাব রাখার ফাঁকে ফাঁকে—হয়ত লোকজনকে, হয়ত বা পিছনের বাঁশঝাড় বা আমবাগানকে শুনাইতেছিলেন। ইহাদের না শুনাইলে কাহাকেই বা শুনাইবেন! মেয়েরা সব শ্বশুরালয়ে, ছেলে নাই।

যোগমায়ার লেবু চাই, বেশি নহে—একটি মাত্র। ঘোষালদের বাড়িতেও লেবু আছে, কিন্তু সে অনেকটা দূর। যাওয়া-আসায় দণ্ডখানেক সময় যাইতে পারে। মা বাড়ি নাই, একা রুগ্ন পিতাকে ফেলিয়া কিছু লেবু সংগ্রহে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া, খুড়িমা বোধ হয় বাড়ি নাই। দুপুরে বাড়িটা এমন নিস্তব্ধ হইয়া থাকে না। গাছপালার সঙ্গে কথা না কহিলেও, কুকুর বিড়ালটার সঙ্গেও এই সময় তিনি নিত্য বকাবকি করেন। যোগমায়াদের বাড়ির বিড়ালটা প্রত্যহ নাকি ও-বাড়ির হাঁড়ি খাইয়া আসে! আশ্চর্য্য বিড়াল! মাছ মাংসে বীতস্পৃহ, অথচ বিধবার আতপ চাউলের অন্ন কি তার এতই মিষ্ট লাগে? জ্ঞাতি-শত্রু আর বলিয়াছে কেন?

আর থাকিলেনই বা খুড়িমা। দু'টা নয়, দশটা নয়—একটিমাত্র লেবু লইবে যোগমায়া। যদিই তিনি কিছু বলেন, ও বেলা ঘোষালদের বাড়ি হইতে লেবু আনিয়া একটার বদলে দুইটা লেবু সে খুড়িমাকে দিয়া আসিবে।

উঁচু গাছ, আঁকশি দিয়া ঠেঙাইতেই গোটা চারেকই লেবু পড়িল, এবং এদিককার দুয়ার খুলিয়া সাধা গলায় খুড়িমা হাঁকিলেন, কে রে, নেবু পাড়ে কে?

যোগমায়া মৃদুস্বরে বলিল, আমি, খুড়িমা।

খুড়িমা লেবুতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। যোগমায়াকে দেখিয়া মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, তুমি না হ'লে এত বড় বুকের পাটা আর কার যে হরি বামনীর গাছ ঠেঙায়? ও মা গো, একটা নয়—দুটো নয়—একেবারে এক গাদা নেবু পেড়ে ডাঁই করেছ? বলি তোর রকমখানা কি, যুগি?

যোগমায়া বলিল, বাবার অসুখ বলে—একটা নেবু—

এই কি তোর একটা নেবু? চোখের মাথা খেয়ে দেখ দিকি—বলি এই কি তোর একটা—? একেবারে বেড়িয়ে বেড়িয়ে গাছটার দফা রফা করেছ! পাড়ার লোকে বলে—আমি মন্দ! এসে দেখুক তারা—

যোগমায়া বলিল, চেঁচাচ্ছ কেন, খুড়িমা, ও বেলা না হয় দুটো লেবু দিয়ে যাব'খন।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। খুড়িমা লেবুতলার এধার হইতে ওধারে একরূপ নাচিয়াই প্রখর কণ্ঠে বলিলেন, ভারি যে তোর নেবু হ'য়েছে লো? ভারি যে নেবুর ভব্‌ভবানি দেখাচ্ছিস চুন্নি কোথাকার! নিজের গাছ ভর্ত্তি থাকতে পরের গাছে এসেছ নেবু চুরি করতে। ওলো বেহায়ি, এত যদি বড়মানুষী তো রাঁড় হাত করে রয়েছিস কেন? নিজের গহনাগুলো বাঁধা দিয়ে বাপের চিকিচ্ছে চালাচ্ছিস! লজ্জাও নেই—হায়াও নেই!

লবঙ্গলতা বাড়ি আসিয়া ওধারে জায়ের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া তাড়াতাড়ি লেবুতলায় গিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, এদিকে আয়, মা। ছিঃ—!

ঝর ঝর করিয়া যোগমায়ার চোখের জল ঝরিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, আমি কিছু বলি নি, মা। খুড়িমা শুধু—শুধু—

শুধু—শুধু? মেয়ে কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুধ খান? শুধু—শুধু!

মেয়েকে একরূপ টানিয়াই লবঙ্গলতা বাড়ির মধ্যে আসিলেন।

পিছনে তাড়া করিয়া ভিটার সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া কণ্ঠের জোরে এ বাড়ি প্রকম্পিত করিয়া খুড়িমা বলিতে লাগিলেন, দাঁড়াও, ভাঙছি তোমার তেজ। বড় অংখার তোর। শ্বশুরবাড়ির গহনা বাঁধা দিয়ে বাপ-সোহাগী চিকিচ্ছে চালাচ্ছে। দাঁড়া, তোর ফাঁড়ে পা দিয়ে আজই বলে আসছি তাদের। পরের গাছের নেবু চুরির মজাটা বুঝবি তখন!

সত্যই তিনি গজ গজ করিতে করিতে খানিক পরে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা গদ্য

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম শিক্ষিত বাঙালীর একান্ত সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর তেজস্বিতা, স্বদেশানুরাগ ও উদার হিন্দুত্ববোধ সম্বন্ধে লোকের অল্পবিস্তর সুস্পষ্ট ধারণা থাকলেও বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসনীয় দানের কথা অল্প লোকেই জানে। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের বিপুল যশ সমসাময়িক গদ্য অন্য লেখকদের মতো ভূদেবের কৃতিত্বকে আড়াল ক'রে বর্ত্তমান। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে বিদ্যাসাগরপন্থী লেখক ব'লে মনে হ'লেও তিনি যে বেশির ভাগে তা নন এমন কথা ভাববার হেতু আছে। ভূদেবের প্রথম গদ্য পুস্তক Vernacular Literature Society থেকে প্রকাশের জন্য রচিত হয়েছিল। সুবিখ্যাত রুশ সম্রাট্ 'পিটার দি গ্রেট'-এর ইংরেজী জীবনকাহিনী অবলম্বনে লেখা এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি উক্ত সোসাইটি রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কৃষ্ণ বন্দ্যো পুস্তকখানিকে প্রকাশযোগ্য ব'লে মত দিলেও তাঁর সহকর্ম্মীর প্রতিকূল মতের জন্যে উহা প্রকাশিত হয় নি।[১] বিদ্যাসাগর যে কেন এই বইখানির প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না; তবে এ পুস্তকের ভাষা বিদ্যাসাগর রচিত 'জীবন চরিতা'দির ভাষার মতো প্রায় তদ্ভব শব্দহীন ও কঠিন সংস্কৃত শব্দময় এবং দীর্ঘ সমাসের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল না ব'লেই মনে হয়। কারণ ভূদেবের উপন্যাস দুখানি ছাড়া পরবর্ত্তী কোন রচনায় কঠিন সংস্কৃত শব্দ ও সুদীর্ঘ সমাস একান্ত দুর্লভ। উপন্যাসে যে তিনি কখনো কখনো প্রচুর সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে বৈচিত্র্যসঞ্চারের জন্যে। জীবনচরিতাদির ভাষায় ঘটনার যথাযথ বর্ণন মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে তিনি ওরূপ স্থলে সমাসবাহুল্য বা শব্দাড়ম্বর পরিহার করেছেন। গদ্য প্রয়োগের এরূপ মাত্রাজ্ঞান তিনি হয়ত 'তত্ত্ববোধিনী'র রচনা থেকে পেয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত ভূদেবের 'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তিকার ভাষাকে এ প্রসঙ্গে প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গ্রন্থের আরম্ভে তিনি লিখছেন :—

'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ' অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাসই বিদ্যার্থীদিগের প্রধান তপস্যা। যিনি এই কথার তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, তিনি কাহারও বিদ্যাশিক্ষা অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন না। তিনি জানেন, বিদ্যাভ্যাসের অন্য ফল আর যত হউক বা না হউক, তদ্দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলের অনেক সদ্গুণ জন্মে—তিনি জানেন যে, অধ্যয়নরূপ তপস্যা দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দমন, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরোক্ষজ্ঞান এবং পরিণাম দর্শন প্রভৃতি গুণ সকল অবশ্য কিঞ্চিন্মাত্রও বর্দ্ধিত হয়। ইহা জানিয়া তিনি কোন ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েন না—অতি নিকৃষ্টবৃত্তি লোকদিগেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ থাকা প্রার্থনীয় বোধ করেন। এই জন্যই অস্মদ্দেশীয় কোন প্রধান পণ্ডিত কহিতেন, যদি কেহ সামান্য কৃষিকর্ম্মও করিতে যায়, তথাপি একরূপ ব্যাকরণ পড়িয়া যাওয়া ভাল।"

এ উল্লিখিত অংশটিকে অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি' বা 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' আদির ভাষা ব'লে অনায়াসে চালানো যেতে পারে। সংস্কৃতানুগ হলেও গদ্য রচনা কত দূর প্রাঞ্জল হতে পারে ভূদেবের রচনা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধাদিতে মুখ্যত এরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ ভাষা দেখে কেউ যেন না ভাবেন ভূদেবের কাব্যগুণসম্পন্ন রচনার ক্ষমতা ছিল না। কারণ ১৮৫৭ সালে তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তা এক বৈচিত্র্যময় গদ্যে রচিত। এই বইয়ের স্থানে স্থানে দুয়েকটি দীর্ঘ সমাস থাকলেও বিষয়বস্তু এবং কল্পনার অভিনবত্বের দিক্ দিয়ে এর ভাষা বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র ভাষার চেয়ে বহুলপরিমাণে পৃথক্ অথচ উপাদেয় হয়েছে। এ বইখানি থেকেই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের যথার্থ নূতনত্বের সূত্রপাত হ'ল। এই পুস্তকের রচনারীতিকে বঙ্কিমের গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলির (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) রচনারীতির সুনিশ্চিত পূর্ব্বাভাস ব'লে মনে করতে ইচ্ছা হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বইখানির গোড়ার দিক্ থেকে কিয়দংশ নিচে উদ্ধার করা গেল :—

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুযুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক ও অদ্ভুত রসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড়

১। "ভূদেবচরিত—১ম ভাগ, ১৩২৪ বাং, চুঁচুড়া পৃঃ ১৬৩।

বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পূর্ণ-চন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বনহস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি অনুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্যসম্বন্ধবর্জ্জিত, নিঃশব্দ শান্তরসাস্পদ স্থানে স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্যগুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎ-কর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।"

উল্লিখিত স্থানটির উপসংহারে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাদি দে'খে দ্রষ্টার মনে প্রকৃতির মূল কারণ পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাবের উদ্রেক কল্পনা করা অক্ষয়কুমারের এক বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব এত প্রকট যে এর জন্যে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁকে একটু উপহাসও করেছেন[২]। কিন্তু সে যাই হোক উদ্ধৃত রচনাংশ মাধুর্য্যগুণে বিদ্যাসাগরের বা অক্ষয়কুমারের গদ্যের বহু উপরে। ভূদেবের রচনায় যে এরূপ উৎকর্ষ এসেছে তার কারণ, তিনি ইংরেজী রোমান্সের ভাষার ইঙ্গিত নিয়ে গদ্য লিখেছিলেন। তাই প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলেও তাঁর গদ্য বেশ সচল (dynamic) ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এতে সংস্কৃত পণ্ডিতদের রচনার মত মামুলি উপমা ও অনুপ্রাসাদির ছড়াছড়ি না থাকলেও ভাষার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য সমধিক ভাবে বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাষাকে আদর্শ করেই দুর্গেশনন্দিনীর রচনায় হাত দিয়েছিলেন ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। উভয় লেখকের গদ্যবন্ধের সাদৃশ্যের সঙ্গে ভূদেব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাবাদের উদারতা লক্ষ্য করলে এ অনুমান আরও দৃঢ় হয়[৩]। এ কথার অধিকতর পোষকতার জন্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' থেকে আর একটি অংশও উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।—

"রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডল নিঃসৃত জ্যোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বনদেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্ক পত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি মিশ্রিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয় সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনী শক্তি প্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্তশক্তি হইয়াছে।"

উপরে উদ্ধৃতাংশের রচনায় যে মৌলিক সাহিত্য রস সৃষ্ট হয়েছে তা বিদ্যাসাগর বা তাঁর অনুবর্ত্তী যে কোন লেখকের রচনায় একান্ত দুর্লভ। গদ্য রচনার এরূপ নৈপুণ্য সত্ত্বেও ভূদেব 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭৫) ও 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৫ ?) ছাড়া আর কোন উপন্যাস জাতীয় বই লেখেন নি। এ দুই পুস্তকের গদ্য রচনাও 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভাষার মতো সুন্দর ও প্রাণবান্। কিন্তু ভূদেব গল্প উপন্যাস ছেড়ে প্রবন্ধ রচনার দিকে গেলে উপন্যাস সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছিল সে ক্ষতির পূরণ হয়েছে তাঁর সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধাবলীর দ্বারা। কিন্তু এ সকলের বিষয়-বস্তুর আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে। তাঁর গদ্যরীতির উৎকর্ষই এখানে বিবেচ্য। সে দিক দিয়ে বিচার করলেও তাঁর প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পৎ। তাঁর রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস-তৃতীয় ভাগ' (১৮৬৫) এই প্রবন্ধাবলীর অন্যতম। এ পুস্তকের গদ্য বিশেষ অলঙ্কৃত না হলেও সরল ও সতেজ প্রকাশভঙ্গীর জন্যে প্রশংসার যোগ্য। নিচে এর রচনার কিছু নমুনা উদ্ধার করা গেল :—

"* * আর একটি সভাও ঐ সময় সংস্থাপিত হয়। ইহা উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার ফল অধিকতর কাল-ব্যাপী হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্ব্বতোভাবে রাজকীয় কার্য্য-বিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্মপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভ ফল তেমনি দূরতর পরবর্ত্তী পুরুষগণের ভাগ্যে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে নদী পর্ব্বত সমুদয় হইতে নির্গত হয় তাহার প্রবাহও তেমনি দূরগামী হইয়া থাকে।"

উল্লিখিত স্থলটির অন্য যে কোন গুণই থাক্ উহা বিশুদ্ধ সাধুভাষায় রচিত। এতে প্রাকৃতমূলক বা তদ্ভব শব্দের একান্ত অভাব, কিন্তু এ সত্ত্বেও ভূদেব বিষয়ানুরোধে রচনায় দেশজ বা বিদেশী শব্দের ব্যবহারে ইতস্তত করতেন না। এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর আদির চেয়ে ঢের উদার ছিলেন। এরূপ ভাষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' থেকে কিয়দংশ নিচে তুলে দেওয়া গেল :—

"অতি বালক কালে শিকারী পাখীর শিকার শিক্ষা দেখিয়াছিলাম।

(২) বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ৩য়, সংস্করণ, পৃঃ ২৫৪-২৫৫

(৩) ভূদেব সম্বন্ধে Calcutta Reviewতে প্রকাশিত বেনামি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :—

"One of the masters of a pure and vigorous Bengali style—neither characterized by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tek-chand and Hutom—one of the best masters, we may say, of Bengali style is Babu Bhudev Mukherji. He has unfortunately written little, except works of a technical character, but his little volume of historical tales . . . . is enough to show that he might have done a great deal more than he actually has done."

একজন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটা টিয়া পাখী সেইমাত্র পলাইয়া নিকটবর্ত্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিকরে বসিয়াছিল সে বোধ হয় আমার দৃষ্টি অনুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল এবং তাহার শিকরেকে ছাড়িল। তীর বেগে শিকরে গিয়া টিয়ার উপর পড়িল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকারী বুঝিতে পারিল টিয়াটি পোষা। সে একটী শীষ দিল, শিকরে অমনি টিয়াটিকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপর আসিয়া চঞ্চুপুট দিয়া আপনার পক্ষ কুট্টন করিতে লাগিল—কে বলিবে এই শিকরে সেই শিকরে।"

প্রয়োজনবোধে ক্বচিৎ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দ (তদ্ভব এবং দেশী ইত্যাদি) ব্যবহার করলেও ভূদেবের রচনা সাধারণ ভাবে সংস্কৃতবহুলই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রচনা কখনও শব্দাড়ম্বর পূর্ণ বা অযথা গম্ভীর হয়ে ওঠে নি। এ দুর্লভ গুণের জন্যে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী বহুকাল যাবৎ পাঠকদের নিকট সমাদর লাভ করবে এরূপ আশা করা যায়। ভূদেবের শেষের দিককার (১৮৯২) রচনা থেকে একটি নিদর্শন দিয়ে এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করা যাচ্ছে :—

'সামাজিক প্রবন্ধে' তিনি লিখেছেন :—

"তবে কি প্রাচীন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলে মনুষ্যের উন্নতির পথ মুক্ত থাকে? তাহাও নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিবেচনা পূর্ব্বক অথবা অনুকৃতি পরবশ হইয়া পরিত্যাগ করিলেই দোষ। যদি কোন নূতন ভাব আইসে তাহা ঐ প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। যদি ঐ ভাব তাহাতে সম্মিলিত করিলে পূর্ব্ব চিন্তাদর্শের জ্ঞানচক্ষে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয় তবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ উহাকে গ্রহণ করিতে হয় না।"

প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে নবীন আদর্শের সমন্বয় সম্বন্ধে ভূদেব যে এক উদার মত পোষণ করতেন তাঁর লেখার গুণে সেটি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের এ দিকটি যে তাঁর গদ্যরীতিকে এক বিশেষ ভঙ্গী দান করে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই অসামান্য ভঙ্গীর জন্যেই বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাঁর নাম এক মুখ্যস্থান অধিকার ক'রে বর্ত্তমান থাকবে।*

* ভূদেব প্রবর্ত্তিত গদ্যের আদর্শ তাঁর সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা দ্বারাই বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বাহুল্যভয়ে উপস্থিত প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি।

পরশুরামের পথে

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

হিমালয়ের পূর্ব্বাংশ যেখানে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের সীমারেখা নির্দ্দেশ করে রেখেছে, সে সীমারেখা অতিক্রম ক'রে আরও প্রায় চার মাইল উত্তরে পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত পরশুরাম তীর্থ। পিতার আদেশে জামদগ্ন্য পরশুরাম মাতাকে বধ করেছিলেন; এখানকার জলে স্নান ক'রে মাতৃবধ-জনিত পাতক থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন, ইহাই পৌরাণিকী। পৌরাণিকী যাহাই থাক্, কোন্ স্মরণাতীত—হয়ত বা কাল্পনিক—যুগের এক অনৈতিহাসিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে যে স্থান সুদূর অতীত কাল থেকে প্রতি বছর হাজারে হাজারে পুণ্যলোভাতুর নরনারীকে আকর্ষণ ক'রে আসছে, সে স্থানে কি কিছু নেই? হয়ত যুক্তি দিয়ে দেখাবার কিছু নেই। কিন্তু আকর্ষণ ত মিথ্যা নয়! পুণ্যলুব্ধ চিত্তের ভাবপ্রবণতা নিয়ে বিচার করছি না; পুণ্যাভিলাষী আমি নই। কিন্তু যে শুভক্ষণে পরশুরাম তীর্থে যাবার সুযোগ এল, নানা প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা ক'রে থাকতে পারলাম না।

নিকটতম কোন আত্মীয়ার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে ডিগ্‌বয় গিয়েছিলাম। পৌষ-সংক্রান্তির আর মাত্র চার পাঁচ দিন বাকী। আত্মীয়াকে একটু সুস্থ দেখে সবাই একটু আশ্বস্ত। বিকেলবেলা চা খেতে খেতে বিজয়বাবু প্রস্তাব করলেন, "এ সুযোগে পরশুরাম তীর্থ ভ্রমণ ক'রে আসা যাক্;—বাবুও যখন এসেছেন। মাও যাবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করছেন।" আমার আত্মীয়টি গভীর উৎসাহে বললেন, "তথাস্তু।" তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "পরশুরাম তীর্থ না দেখে আপনার ঢাকা ফেরা হবে না।" আত্মীয়টি ডিগ্‌বয়ের তেলের খনির কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন-বিভাগের বড়বাবু। বিজয়বাবু

তাঁরই আপিসে কাজ করেন। নিজের মোটর আছে; স্বয়ং সুদক্ষ মোটরচালক।

২৭শে পৌষ শনিবার ভোরবেলা আমাদের যাত্রা করবার কথা ছিল। শুক্রবার রাত থেকে সুরু হ'ল অবিরাম বৃষ্টি। মন গেল একেবারে দমে। ছুটি যে ক-দিন নিয়ে এসেছিলাম তা আগেই শেষ হ'য়ে গেছে। আবার ছুটির জন্য আর্জ্জি পেশ করেছি। পরশুরাম যাওয়া না হ'লে ছুটিটা নেহাৎ মাঠে মারা যায়। আত্মীয়টি কিন্তু দমবার পাত্র নন। বয়সে যদিও আমার চেয়ে বড়, মনেপ্রাণে কিন্তু আমার চেয়েও নবীন। শনিবার বিকেলের দিকে বৃষ্টি থেমে গেল; কিন্তু আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়ে রইল। সন্ধ্যার দিকে বিজয়বাবু এসে জানিয়ে গেলেন, আর বৃষ্টি না হ'লে শেষরাত্রে রওনা হ'তে হবে। তাই ঠিক হ'ল।

শনিবার রাত তিনটায় রওনা হলাম। সঙ্গে বিজয়বাবুর মা ও বিজয়বাবুর আট-নয় বছরের এক ভাইপো। ছোকরা পঞ্জাবী ড্রাইভারও আছে; কিন্তু তাকে কখনও মোটর চালাবার দায়িত্ব নিতে হয় নি। পূর্ব্বদিনের অবিশ্রাম বৃষ্টিতে পথ পিচ্ছিল; স্থানে স্থানে জল জমে আছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; তাই অন্ধকার যেন জমে শক্ত হয়ে রয়েছে; পাশে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। মোটরের আলো যেন গাঢ় অন্ধকারের পর্দ্দা ঠেলে পথ বের করতে পারছে না। কাঁচা রাস্তায় মোটর মাঝে মাঝে ভীষণ আন্দোলিত হয়ে উঠছে; ভয় হয়, বুঝি পথভ্রষ্টই হ'ল। ভোরের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সাইকোয়াঘাটে এসে পৌচেছি। ডিব্রু-সদিয়া রেলপথ এখানে এসে শেষ হয়েছে। সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র নদ। ওপারে সদিয়া। শীতের ব্রহ্মপুত্র—আড়ষ্ট নিজ্জীব! কে বলবে, বর্ষার সূচনা হতে না-হতেই এই কুব্জপৃষ্ঠ ম্রিয়মাণদেহ নদটি তাণ্ডব-লীলায় মেতে উঠবে। ব্রহ্মপুত্র নদের সে প্রলয়ঙ্কর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তি আমি দেখেছি। সে ভীষণ গর্জ্জন, ফেনিল জলোচ্ছ্বাস, চঞ্চল আবর্ত্ত, কূল-বিধ্বংসী আবেগ—সে ভোলবার নয়। আজ সম্মুখে দেখতে পেলাম সেই ব্রহ্মপুত্র—প্রমত্ত মাতালের অবসন্ন, বিধ্বস্ত, বিলুণ্ঠিত দেহ! ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে বিস্তীর্ণ বালুচর। দু-দিকে জল। প্রথম দিকটা মোটর-এঞ্জিন লাগানো জোড়া-নৌকায় খানিক গিয়ে প্রায় এক মাইল ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে আবার কিছু দূর নৌকায় গিয়ে ওপারে পৌছানো গেল। এ অঞ্চল ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব দ্বার। কাজেই এখানে সীমান্ত-রক্ষকের অনুমতি না নিয়ে যাবার অধিকার নেই। সীমান্তের বাইরে যেতে হ'লেও ছাড়-পত্র চাই। আমাদিগকে অবশ্য সেজন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। আমার স্বগ্রামবাসী শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী, ওরফে 'ছোট নীলামবাবু' (আমাদের অম্বিকাদা) সদিয়া পলিটিক্যাল অফিসে কাজ করেন। তাঁরই সৌজন্যে এবং অক্লান্ত চেষ্টায় শুধু ছাড়-পত্রই নয়, আরও অনেক সুবিধা আমরা লাভ করেছি যা তিনি না হ'লে সম্ভব হ'ত না। আমরা সদিয়া পৌছি সকাল প্রায় আটটায়। অম্বিকাদা তখন বাসায় একা, স্ত্রী-পুত্রকে দেশে পাঠিয়েছেন। যাক্, চায়ের জন্য আর তাঁকে ভাবতে হ'ল না। পাশের বাসার সুবিমলবাবু আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করে গেলেন। সুবিমলবাবুর সৌজন্য ভুলবার নয়। শীতের রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে গরম চা এবং সঙ্গে প্রচুর খাবার খেয়ে পথশ্রম ও অনিদ্রাজনিত অবসাদ দূর হয়ে গেল। লৌকিকতা রক্ষার জন্য সুবিমলবাবুকে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। তিনি যে আমাদের একেবারে অপরিচিত নন কথাবার্ত্তার পর তাহাই প্রমাণিত হ'ল।

চা খাবার পর অম্বিকাদা আমাদের নিয়ে গেলেন পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ ওএবস্টারের কাছে। সেদিন রবিবার, কাজেই অফিস বন্ধ। অম্বিকাদা তাঁর বাংলোয় গিয়ে আমাদের কথা তাঁকে বললেন। তিনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট ভদ্রতা দেখিয়েছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁর কাছে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। ছাড়-পত্র পাওয়ার পর পেট্রল ও সঙ্গে নেবার জন্য আরও জিনিসপত্র কিছু কিনে নিতে প্রায় ১২টা বেজে গেল। আমাদের অনুরোধে অম্বিকাদা নিজেও আমাদের সঙ্গে পরশুরাম রওনা হলেন। এই বার সত্যই আমাদের পরশুরাম যাত্রা সুরু হ'ল। আমরা চলেছি সম্পূর্ণ নূতন রাজ্যে, সভ্য জগতের সীমারেখা অতিক্রম ক'রে; যে-রাজ্যে সমাজের অনুশাসন নেই, লৌকিকতার বন্ধন নেই, নীতির বাধা-নিষেধ নেই, আইনের শৃঙ্খল নেই—সে এক অভিনব রাজ্য—অবাধ, মুক্ত, নগ্ন প্রকৃতির লীলানিকেতন। আমাদের যাত্রা সুরু হয়েছে—আমার তীর্থযাত্রা!

মোটর চলেছে। শহর ছেড়ে দু-মাইল এসে কুণ্ডিল নদী পাওয়া গেল। কুণ্ডিল নদী শহরের কাছে এসে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশে গেছে। এই নদীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণের কাহিনী জড়িত। শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডল নাকি এই নদীতে পড়ে গিয়েছিল, তাই এর নাম হয়েছে 'কুণ্ডিল'। মিস্‌মীদের এক সম্প্রদায় 'চুলিকাটা মিস্‌মী'

নামে পরিচিত। এরা নাকি শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিতে এসে পরাস্ত হয়ে মাথার সামনের দিকের চুল কেটে ফেলেছিল। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণের কাহিনী সত্য কি না কে জানে? কিন্তু লোকমুখে আজও সে কাহিনী চলে আসছে। নদী পার হয়ে বন-রাজ্যের দিকে ছুটেছি। মাঝে মাঝে নেপালীদের কুঁড়েঘর; ঘরের পাশে ছোট এক একখানা শাকসব্জীর বাগান। শাকসব্জী শহরে বিক্রয় ক'রে হয়ত দু-চার পয়সা এরা পায়। তা ছাড়া দুধের ব্যবসাও এরা করে ব'লে মনে হ'ল; সকলের বাড়ীতেই দুই-একটা গরু আছে। সমতল অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে চলেছি। পাহাড় এখনও দূরে। রাস্তা ভাল; মাঝে মাঝে কাঠের পুলগুলোর কাছে এসে মোটরের বেগ কমাতে হচ্ছে। রাস্তার পাশে কোথাও ঘন নিবিড় বনভূমি; কোথাও সুদূর বিস্তৃত নগ্ন প্রান্তর। আট মাইল পথ পেরিয়ে এসে দিপু পৌছলাম। এখানে রাজনৈতিক দপ্তরের এক শাখা আছে। দিপু থেকে শোণপুরা আট মাইল। এখানেও রাজনৈতিক দপ্তরের এক শাখা আছে। শোনপুরা থেকে পায়া আর আট মাইল। পায়া ছেড়ে তেজু বার মাইল। এখানে বড় কড়াকড়ি ব্যবস্থা। শত শত যাত্রী এখানে এসে ভিড় করেছে। প্রত্যেকের ছাড়াপত্রগুলো ভাল ক'রে পরীক্ষা করে তবে যেতে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মোটরও থামাতে হ'ল। 'ছোট নীলামবাবু' সঙ্গে, তাই যে ভদ্রলোকটি ছাড়পত্র তদারক করছেন আমাদের একটু বিশেষ খাতির করলেন। যাত্রীদের পোঁটলাপুটলী তন্ন তন্ন ক'রে দেখবার বিধি এখানে আছে। বহু দূর হ'তে আগত যাত্রীরা জটলা পাকিয়ে বসেছে। স্ত্রী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ, গৃহী-সন্ন্যাসী—তেজু এক মহাসমন্বয়ের ক্ষেত্র হয়েছে। সবার মুখে এক কথা—পরশুরাম আর কত দূর। ঘন ঘন গম্ভীর চীৎকার—পরশুরামজী কি জয়! দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ক্লান্তি হঠাৎ মধ্য-পথের এ ভ্রমণ-বিরতিতে যেন সবাইকে অভিভূত করে ফেলেছে। কেহ কেহ বা এ সুযোগে ঘাসের উপর লম্বা হয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। কেহ কেহ বা পুঁটুলী থেকে শুষ্ক রুটি ছিঁড়ে ঘটীর জলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিচ্ছে। ঘড়ীতে প্রায় তিনটা বেজে গেছে। এবার ঠিক বন-রাজ্যে এসে পৌছেছি। অতি সঙ্কীর্ণ কাঁচা পথ। পরশুরাম যাবার উদ্দেশ্যে দুর্ভেদ্য বন কেটে একটা সরু পথ বছর বছর করা হয়। এ পথ দিয়ে অতি সন্তর্পণে আরও নয় মাইল পথ গিয়ে তিমাই পৌছে মোটর ছাড়তে হবে। তিমাই থেকে পাহাড়-রাজ্য সুরু হয়েছে। তেজু ছাড়বার আগে সমবেত যাত্রীদের পানে একবার তাকালাম। কী এদেরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এই গভীর অরণ্যানীর বিপদসঙ্কুল পথে! নৈশ-অন্ধকার এদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না; শ্বাপদসঙ্কুল পথ এদের মনে ভীতি উৎপাদন করবে না! নিজের কথা মনে হ'ল—আমিও ত যাচ্ছি। কিন্তু ওদের দলে যাবার আমার কি কোন দাবী আছে? আমিও পরশুরামযাত্রী সত্য; কিন্তু তীর্থযাত্রীর চিত্তের সে অনির্ব্বচনীয় মাদকতা আমার কোথায়? তবুও আমার যাত্রা মিথ্যা নয়। আমায় শুধু পরশুরাম তীর্থ আকর্ষণ করে নি। একটা বিশেষ স্থান দেখবার জন্য আমার চিত্ত উদগ্রীব নহে। আমায় আকর্ষণ করেছে পরশুরামের ঐ পথ, ঐ গভীর অরণ্যানী, ঐ সম্মুখের অভ্রভেদী নীলাভ পর্ব্বতশ্রেণী, শ্লথ-বসনা পাহাড়ে নদীর ঐ নগ্ন মূর্ত্তি, পিছনের ঐ দিক্‌বলয়-বিলম্বিত বিশাল জনহীন নিস্তব্ধ-মুখর প্রান্তর, প্রকৃতির এই গোপন প্রসাধন-কক্ষ। প্রকৃতির আপন মনে গেয়ে-যাওয়া গান, আপন মনে রচা প্রসাধন, স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত ভাব-বিলাস। লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত নিভৃতে প্রকৃতি যে সাজে সেজে উঠে, আমি তাই প্রাণ ভরে দেখব। কোলাহল-মুখর রাজ্যে যে ভাষা কানে এসে পৌছায় না, আজ সঙ্গোপনে আমি তাই শুনব। কী ভাবোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠে তার মর্ম্মস্থলে, কী পুলক-স্পন্দন জেগে উঠে তার সর্ব্বদেহে, আজ আমি মনে-প্রাণে তাই উপলব্ধি করব।

সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে মোটর চলেছে। আরও মোটর আসা-যাওয়া করছে। একটা অস্থায়ী মোটর সার্ভিস সদিয়া থেকে তিমাই পর্য্যন্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। প্রতি বছরই এমনি ব্যবস্থা হয়। পথ এত সঙ্কীর্ণ যে স্থল-বিশেষ ছাড়া কোথাও পাশাপাশি মোটর যাতায়াত করতে পারছে না। দু-পাশে ঘন নিবিড় অরণ্য। বিশাল বৃক্ষরাজি কত বসন্তের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে কে জানে? শীতের প্রভাবে সবাই একটু আড়ষ্ট—যেন নেশা করে ঢুলছে; পাশ দিয়ে কে যাচ্ছে নেশার ঝোঁকে তাকিয়েও যেন ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। বাঁশের ঝাড়ে আঁধার জমে আছে। মাঝে মাঝে কলাগাছের ঝোপ বনস্থলীকে গভীর রহস্যময় করে রেখেছে। ভেতরে দৃষ্টি দেবার উপায় নেই। ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে লতাগুলো উঁকি মেরে দেখছে—পথ দিয়ে কে যায়। লতানে গাছগুলোর কী স্বভাব! আশ্রয় না পেলে এমনি ত দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই; কিন্তু একটু প্রশ্রয় পেয়েছে, অমনি মাথায় না উঠে ছাড়বে না।

তিমাই নদীর একটি দৃশ্য। পিছনে পর্ব্বতমালার এক অংশ দেখা যাচ্ছে

সব ক'টা গাছের মাথায় তারা চেপে বসেছে। মোটরের গতির শব্দ ঠিক যেন মোটরের শব্দ বলে মনে হচ্ছে না। একটা ক্রুদ্ধ জনতা চীৎকার করে যেন পিছন থেকে তেড়ে আসছে। মোটরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বনস্থলীর দিকে দিকে; এ অনধিকার-প্রবেশে সবাই যেন ক্ষুব্ধ, অশান্ত হয়ে উঠেছে।

কিছু দূর গিয়ে পেলাম বিশীর্ণা পাহাড়ে নদী। এখন আর নদী বলা চলে না—যেন নদীর একটা নগ্ন কঙ্কাল পড়ে আছে। এক পাশ দিয়ে বালুচরের গা বেয়ে ক্ষীণ জলস্রোত চলেছে; ঐটুকুই প্রাণের স্পন্দন। যৌবনে এ নদী কি খরস্রোতা হয়ে উঠে, আমূল-উৎপাটিত, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত, বিধ্বস্ত বিশাল বৃক্ষগুলো তার সাক্ষী দিচ্ছে। প্রস্তরময় নদী-সৈকত। স্রোতবেগে পাথরগুলো ঘষে ঘষে শ্বেত পাথরের মত ধব্‌ধবে সাদা হয়ে গেছে। শুনলাম, বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ নদীটিই নাকি প্রথম পথ আগ্‌লে দাঁড়ায়। ওপারের গোপন, গহন বন-রাজ্যের এইই দ্বার-রক্ষিণী। শীর্ণকায়া নদীর উপর ছোট বাঁশের পুল নদীটিকে জড়িয়ে ধরে যেন ব্যঙ্গ করছে।

ওপারে পৌছে আর এক নূতন রাজ্যে পৌছলাম। নিবিড় ঘন বন ছোট বড় তরুলতাগুল্মে সমাকীর্ণ; কিন্তু সবাই আড়ষ্ট। ঘুমন্ত পাতালপুরীর গল্প মনে পড়ে। সত্যি, এ যেন এক পাতালপুরী। ঘন বন কেটে যে সঙ্কীর্ণ পথ করা হয়েছে, তারই উপর কদাচিৎ সূর্য্যের আলো ছিট্‌কে এসে পড়েছে; আর সবই অসূর্য্যম্পশ্যা পাতাল-পুরী! সবাই আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। শীতের হিমেল-হাওয়ার ছোঁয়াচ লেগে সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে; কবে দখিনা পবন সঞ্জীবনী মন্ত্রে সবাইকে জাগিয়ে তুলবে তারই প্রতীক্ষা করছে। ঘুমন্ত পুরী! আমি চলেছি! রাজকন্যা কোথায়, কে জানে? মোটরের হর্ণের শব্দ প্রকম্পিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়ায়; বেরুবার যেন পথ পায় না। বনানীর নিস্তব্ধতা নেশা লাগিয়ে দেয়—মনে বিশেষ কোন চিন্তা নেই, অথচ কেমন একটা উপভোগ্য অনুভূতি মনে-প্রাণে জেগে থাকে।

প্রায় সাড়ে চারটায় তিমাই এসে পৌছলাম। এখান থেকে পাহাড়-রাজ্য সুরু হয়েছে। মোটর আর এগিয়ে যেতে পারবে না। কাজেই তিমাই পৌছেই মোটর ছাড়তে হ'ল। এখানে একখানা ডাকবাংলা আছে; একটা অস্থায়ী ছোট চায়ের দোকানে সামান্য খাবার পাওয়া যায়। মুটেরা সার-বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পৌছবার পূর্ব্বেই আরও বিশ-পঁচিশ খানা ট্যাক্সি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু গিয়েই তিমাই নদী। গাছ খোদাই করে হয়েছে নৌকা। এমনি দুটো নৌকা পাশাপাশি করে বেঁধে মিস্‌মী মাঝি নদী পার করছে। ওপারে যেতে প্রত্যেককে পাঁচ আনা করে ভাড়া দিতে হচ্ছে। রাজনৈতিক দপ্তরের এক জন লোক দাঁড়িয়ে সবার ছাড়পত্র শেষ পরীক্ষা করছে। দুটি সশস্ত্র গুর্খা খেয়াঘাট পাহারা দিচ্ছে। নদীর পারে এসে যে দৃশ্য দেখেছি তা কখনও ভোলবার নয়। সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী একটা দুর্ভেদ্য প্রাকারের ন্যায় একদিকে চলে গেছে। খরস্রোতা তিমাই নদী পর্ব্বতশ্রেণীর গা ঘেঁষে চলেছে—যেন সুরক্ষিত কোন দুর্গের পরিখা। নদী-সৈকত উপলখণ্ডে সমাকীর্ণ। নদীর ওপারে পৌছে জলযোগের ব্যবস্থা করছি, দূরে দেখতে পেলাম একটি ভদ্রলোক, স্ত্রী এবং দুটি তরুণী (সম্ভবত: ভদ্রলোকের মেয়ে) নিয়ে উত্তরায়ণের পূর্ব্ব দিনই

মিস্‌মী মুটেরা জিনিস-পত্র বাঁধছে। মুখের পাইপ লক্ষ্য করবার বিষয়

পরশুরাম তীর্থের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে নদীর একটি দৃশ্য। দু-দিকে উপলখণ্ড-আস্তীর্ণ সৈকত; মধ্যে উচ্ছ্বাসময়ী স্রোতস্বিনী

পরশুরাম তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে ফিরছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং গতি-ভঙ্গী দেখে বাঙালী নন এ সন্দেহ হবার কারণ নেই। সম্ভবতঃ বিশ্রামের জন্য তাঁরা আমাদের নিকট হ'তে খানিক দূরে বসলেন। তরুণী দুটির অনাবশ্যক এবং অস্বাভাবিক জোরে পরস্পর কথা বলবার কারণ কি ছিল জানি না; "আমরাও বাঙালী" হয়ত এ পরিচয়টুকু আমাদের দেবার ইচ্ছা ছিল। দু-জনই আমাদের দিকে মুখ ক'রে বসে। চোখ দুটো বার বার ছুটে যায় তরুণীদের কাছে। পরশুরামের যাত্রী আমি! যাত্রাপথের সেই মাধুর্য্যভরা স্মৃতি—এক দিকে খরস্রোতা তিমাই নদী, অন্য দিকে তেমনি চঞ্চলা দুটি সুন্দরী তরুণী; দিনান্তের প্রচ্ছায় স্নিগ্ধ পথ, দুগ্ধফেননিভ উপলখণ্ড-আস্তীর্ণ নদী-সৈকত, পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত বন-রাজ্য, অব্যক্ত ভাষাময় গভীর রহস্য। সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন সেদিন যদি সে দৃশ্য মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করে থাকে, তবে তাকে অপরাধী করব না। চলার পথের স্মৃতিই আমার যাত্রাপথের পাথেয়। যাত্রী আমি—পরশুরামের যাত্রী। পথের স্মৃতি বাদ দিলে পরশুরাম-যাত্রা আমার অর্থহীন হয়ে পড়বে।

আবার চলেছি। অগণিত যাত্রী পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সরু পথ দিয়ে চলেছে। প্রায় চার মাইল পথ যেতে হবে। দুর্গম, বন্ধুর পথ। এবার দু-পাশে মহারণ্য। উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-গাত্রে বিশাল বিটপীশ্রেণী। ধরিত্রীর অন্তরের আবেগ উদ্বেলিত হয়ে কবে এ গিরিশ্রেণীর অভ্যুদয় হয়েছিল, কে জানে! ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি। অস্তরাগের রক্তিম-রশ্মি মাথায় পড়েছে; তপস্যার দীপ্ততেজ যেন ফুটে বেরিয়ে আসছে। তাকালে দৃষ্টি ফেরানো যায় না; বিস্ময়ে মন ভরে উঠে।

পাশ দিয়ে চলেছে নদী; ইহাই শেষে ব্রহ্মপুত্র নাম নিয়েছে—কোথায় এর জন্মস্থান কেউ জানে না। লোকে বলে, 'পরশুরামকুণ্ড'; ছেলেবেলা তাই জানতাম; কিন্তু সত্যি তা নয়। পরশুরামকুণ্ডে পৌঁছে দেখেছি, নদীর উৎপত্তিস্থান সেখানে নয়। দুর্ভেদ্য পাহাড়ের প্রাচীর ভেদ করে কোন্ সুদূর অজ্ঞাত গৈরিক প্রস্রবণ হ'তে এ নদী জন্মলাভ করেছে তা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলে মানস-সরোবর নাকি নদীর উৎপত্তিস্থান। হয়ত বা সত্য, যাচাই করা সম্ভব নয়; কিন্তু এরই জন্য নদীটি নিগূঢ় রহস্যময়। পর্ব্বতশ্রেণী যেখানে নদীটিকে দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে, সেখান থেকে মন ছুটে যায় নদীর উৎস-সন্ধানে—পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, বনানীর যবনিকা ঠেলে, পর্ব্বতের প্রাচীর ডিঙিয়ে!

আঁধার হয়ে আসছে। এখনও প্রায় দু-মাইল পথ সম্মুখে পড়ে আছে। অদূরে হরিণের করুণ চীৎকার শোনা গেল। "ঠাকু'মা, ওটা কি?" চমকে উঠে গোপাল (বিজয়বাবুর ভাইপো) জিজ্ঞাসা করে। যাত্রীদের একজন বললে, "ওটা হরিণ, বাঘ তাড়া করেছে কি না তাই ডাকছে।" বাঘ তাড়া করেছে! গোপালের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। সবারই যে ভয় একটু হ'ল তা বলা নিষ্প্রয়োজন। পর্ব্বতরাজ্য প্রকম্পিত করে সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে সঘন চীৎকার উঠল, "পরশুরামজী কি জয়!" অম্বিকাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, "লোকালয়ে গেলে

মিস্‌মীদের বাস-গৃহের একটি দৃশ্য। একটি মিস্‌মী গৃহের প্রবেশ-পথে বসে কাজ করছে

বাঘগুলো যত হিংস্র হয়ে উঠে, বনে সাধারণতঃ তত হিংস্র হয় না।" সত্যি ?

আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দু-হাত দূরের রাস্তাও ঠিক পরিষ্কার দেখা যায় না। পূর্ণিমা তিথি; পথ তবুও আঁধারময়। গোপাল চলেছে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে। পায়ে জুতোয় ফোস্কা পড়েছে, তাই বেচারা একটু কাবু হয়ে পড়েছে; কিন্তু উৎসাহ তার একটুও কমে নি। একটি বাঙালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক চলেছেন পরশুরাম তীর্থে। পথে নিজের জ্বর হয়েছে; চলেছেন অতি কষ্টে; স্ত্রীটি তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের পেয়ে তাঁরা যেন একটু স্বস্তি পেলেন।

পরশুরাম তীর্থ আর বেশী দূর নয়। সমবেত সন্ন্যাসীদের বম্ বম্ নাদ; যাত্রীদের মুহুর্মুহুঃ 'পরশুরামজী কি জয়' চীৎকার ক্রমে স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর শোনা যাচ্ছে। দূরাগত যাত্রীদের কথাবার্তায় একটা স্বস্তির ও আনন্দের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। নিজের মনেও একটা পুলক জেগে উঠল। এবার দেখব সেই স্থান, যার আকর্ষণে শত শত নরনারী কত দূর দেশ হতে দুর্গম, শ্বাপদসঙ্কুল পথ স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে অতিক্রম করে আসছে। রাত প্রায় ৭টায় পরশুরাম তীর্থে এসে পৌছলাম।

পার্থিব সুখ-সম্পদ মুনি-ঋষিদের কাছে তুচ্ছ, কিন্তু সৌন্দর্য্য-বোধ তাঁদের কতখানি গভীর, পরশুরাম তীর্থ তার সাক্ষী। কি মনোরম সে স্থান! দু-দিক থেকে পর্ব্বতমালা এসে যেন দু-বাহু জড়িয়ে পরশুরাম তীর্থকে কোলে করে আছে। সুউচ্চ গিরিশ্রেণী—তাকালে বিস্ময় জাগিয়ে দেয়। এক পাশে কলনাদিনী গৈরিক নির্ঝরিণী যেন নেচে চলেছে—ক্ষীণকায়া, স্বচ্ছতোয়া। স্রোতবেগে উপলখণ্ড পরস্পর ঘর্ষিত হয়ে এক মধুর শব্দ উত্থিত হচ্ছে। বাতাসের একটানা বোঁ বোঁ শব্দ—মনে হয় যেন অহরহ একটা মাদল বাজছে চটুলা পাহাড়ে-নদীর নাচের তালে তালে; উপলখণ্ডের টুক্‌টাক্ শব্দ যেন কাঠি-বাদ্যের তান। আমার পরশুরাম তীর্থ! পরশুরাম তীর্থ ভ্রমণ আমার ব্যর্থ হয় নি।

দু-ধারে দুটি ধর্ম্মশালা: কাঁচা ঘর, উপরে টিন। কোন সহৃদয় মাড়োয়ারী কিছু দিন পূর্ব্বে তৈয়ের করে দিয়েছেন। ঘরের ভেতরে যে ক'খানা চৌকী পাতা ছিল, সেগুলো বহু পূর্ব্বেই যাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। আমরা যেতেই একটি বৃদ্ধগোছের মাড়োয়ারী যাত্রী গম্ভীরভাবে বললে, "বাবুজী, এহি ধরমশালা মাড়োয়ারী যাত্রী কোবাস্তে তৈয়ারী হোয়া; আপ্ লোগ্ দুসরা

একটি মিস্‌মী যুবতী। সাধারণতঃ মিস্‌মীরা ক্যামেরা দেখলেই ছুটে পালায়। অনেক চেষ্টা করে এ ফোটোখানা নেওয়া হয়েছে

জায়গা দেখ্ লিয়ে।" এ অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না। ঘরের ভিতর যে পরিমাণ ধোঁয়া এবং যে ভাবের ভিড় ছিল, এ অবস্থায় কারও আপত্তি না থাকলেও সেখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিজয়বাবু অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মা ও ভাইপোও একেবারে অবসন্ন; কাজেই সেই ধরমশালার এক দিকে মাটিতে কম্বল পেতে তাঁরা শুয়ে পড়লেন। আমার আত্মীয়টি বললেন, "চলুন, বাইরে কোথাও যাই।" দু-জনে বেরিয়ে পড়লাম। অম্বিকাদাকে ডেকে নিলাম সঙ্গে। আমাদের ভাষা কেউ বুঝবে না। অম্বিকাদা ছিলেন তাই একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'ল। ধরমশালা থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দৃশ্য দেখবার সুযোগ পেলাম। অগণিত সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ উপবিষ্ট। উদাত্ত কণ্ঠে শাস্ত্র-পাঠ চলেছে; মুহুর্মুহুঃ বম্ বম্, পরশুরামজী কি জয়, নাদ। সম্মুখে ধুনি। ধোঁয়ার জন্য তাকানো যায় না; চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে—তবুও একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে রাত্রির জন্যে। এক দিকে আসামের এক বড় ধনী ব্যবসায়ী সপরিবারে তাঁবু খাটিয়ে আছেন; সঙ্গে চাকর, রাঁধুনি বামুন সব কিছু আছে। আমাদের আপশোষ হ'ল—একটা তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এলে আমাদেরও এত অসুবিধা হ'ত না। সে ভদ্রলোকটির পাশেই একটু নিরিবিলি একটা জায়গা পেলাম। কিন্তু রাত কাটাব কি করে? চার দিকে যদি একটা ঘেরাও না থাকে এবং উপরে যদি কিছু না থাকে তবে শীতে একেবারে জমে যাব। অম্বিকাদা বেরুলেন সে ব্যবস্থা করতে। মিস্‌মীরা জানালে, এত রাত্রে কিছুই করা যাবে না। অনেক চেষ্টা

সাধুর বেশে একটি ভিক্ষুক যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করছে

এবং অধিক পয়সার লোভ দেখিয়ে চারটে বাঁশের খোঁটা, পাতাসহ কয়েকটা গাছের ডাল ও কিছু খড় পাওয়া গেল। খড়গুলো নীচে বিছিয়ে তার উপর একখানা কম্বল পাতা হ'ল। বাঁশের খোঁটার চার দিকে এবং উপরে আমাদের ক'খানা কাপড় টাঙিয়ে ও চার দিকে গাছের ডাল পুঁতে একটা আশ্রয় করা গেল। মিস্‌মীদের সঙ্গে অম্বিকাদা'র যে কথাবার্ত্তা হ'ল তার একটু নমুনা দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। অম্বিকাদা সদিয়া থেকে আসামী ভাষা চমৎকার আয়ত্ত করেছেন। অনেক মিস্‌মী আসামী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে না পারলেও আসামী ভাষা বোঝে। অম্বিকাদা আসামী ভাষায় যে কথাবার্ত্তা বলেছিলেন পরে মুটেদের জিজ্ঞাসা করে মিস্‌মী ভাষায় তা অনুবাদ করেছি।

(আসামী ভাষা)	(দিগারু মিস্‌মী ভাষা)
কিমান্ পয়সা লবি—	কাদে সিয়া।
তিনি জনা মানু লাগিব—	মে কাছং হান্নুয়া।
বেগেত্তে আহিবি—	কাৰ হানা না।
ঘৰটু বনাই দিবি—	আং তাৰি হাংনা।
ভাল কৰি বনাবি—	প্রাবা না।
এ টকা দিম্—	পং কিং হাংনে।

তিন জন মিস্‌মী একটা টাকা পেয়ে আমাদের নৈশাবাস তৈয়ের করে দিয়েছিল। আশ্রয় হল। এবার খাবার কথা সকলের মনে পড়ল। সবাই ক্ষুধার্ত্ত; কিন্তু খাবার ব্যবস্থা করবে কে? সঙ্গে চা'ল, ডাল, নুন, হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়ো এবং ঘি আছে। একটা হাঁড়িও সদিয়া থেকে আনা হয়েছে। অম্বিকাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ভাই যদি পাকের ভার নাও, তবে আমি আর সব বন্দোবস্ত করে দেবো। সম্মতি জানালাম—পেটে ক্ষুধা ছিল বলে ঠিক নয়; এমন জায়গায় এসে রান্না করে খেয়ে যাওয়ার একটা উপভোগ্য মধুর স্মৃতি নিয়ে যাব বলে। মিস্‌মীরা এসে পাথর বসিয়ে একটা উনুনের মত করে কাঠ ধরিয়ে দিয়ে গেল। অশান্ত দম্‌কা বাতাস আগুন নিয়ে খেলা করছে; এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছি না। উনুনের চার দিকে ঘুরছি; হাতা দিয়ে মাঝে মাঝে হাঁড়ির ভেতরে নাড়াচাড়া দিচ্ছি। বেশ লাগছে! মশলা কতখানি দিতে হবে জানা নেই। তা হোক্ গে,. রান্না করছি, সে ত মিথ্যা নয়? আত্মীয়টি সেই নৈশাবাস থেকে বললেন, "এভোলিউশনের একটা জাজ্জ্বল্য প্রমাণ আজ রাত্রে পাওয়া যাবে—ডাল, চাল, নুন, হলুদ, লঙ্কা ও ঘি সংমিশ্রণে কি অভিনব বস্তুর উদ্ভব হয় আপনি আজ তা দেখাবেন; কলেজে ছেলে পড়াতে আপনার এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।" হেসে বললাম, "উদ্ভব নয় হে, একেবারে সৃষ্টি—সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি হবে, যা কেউ কোন দিন আস্বাদ করে নি।" খিচুড়ী হ'ল। নিজের সুখ্যাতি নাকি নিজে করতে নেই; কিন্তু তাই ব'লে সত্য গোপন করব কি ক'রে? খিচুড়ী আরও খেয়েছি; কিন্তু এত আস্বাদ খিচুড়ীতে আছে তা জানা ছিল না। সবাই এ কথা স্বীকার করলে। ইংরেজীতে কথা আছে, hunger is the best sauce —খাদ্যের সারাংশ হচ্ছে ক্ষুধা। এ ক্ষেত্রে হয়ত তাই ভাল লাগার কারণ। তা যাই হোক্, সে রাত্রে খিচুড়ী খেয়ে সবার অবসন্ন দেহে বল এসেছিল, একথা সত্য।

রাত যত ঘনাতে লাগল, শীতের প্রকোপ তত বাড়তে লাগল। গায়ে পুলোভার-এর উপর গরম কোট, তদুপরি ওভারকোট—সব নিয়েই কম্বল মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছি। শীত যেন তবু বাগ মানতে চায় না। পাশে একটি সাধুর ধুনি থেকে আগুনের তাপ লাগছে। ঘুম আসতে চায় না। আজ রাত্রের প্রতি মুহূর্ত্তকে মন যেন স্মৃতির স্বর্ণ-সূত্রে গ্রথিত করে রাখতে চায়। একটি রজনী! পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ জুড়ে আপনার মহিমা বিস্তার করেছে—চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। পাহাড়-

পরিবেষ্টিত বন-রাজ্যে গৃহহীন, সমাজবন্ধনহীন, দুর্ভাবনাহীন, আপনার একান্ত কাছে, সম্পূর্ণ একা!

শেষ রাত্রের দিকে সমস্ত তীর্থক্ষেত্র কোলাহলমুখর হয়ে উঠল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীর্থস্নান করতে হবে। ভোরবেলা পরশুরাম কুণ্ডের পাশে এক মহান্ দৃশ্য দেখলাম—স্ত্রী-পুরুষ-গৃহী-সন্ন্যাসীনির্বিশেষে তীর্থস্নানের জন্য সমবেত হয়েছে। ঘাটে তিলার্দ্ধ দাঁড়াবার স্থান নেই। ভিড় ঠেলে কেহ কেহ কুণ্ডের জলে স্নান করে আসছে; কেহ বা কুশ-পত্র নিয়ে কোন মতে দাঁড়িয়ে পিতৃ-পিতামহের উদ্দেশে তর্পণ করছে। পাথর-বাঁধানো ঘাট; ঘাট থেকে প্রায় দু-হাত দূরে জলের উপর একগাছি তারের বড় কাছি ঘাটের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাঁধা আছে—যাত্রীরা যাতে গভীর জলে গিয়ে না পড়ে। নীলাভ জল। অসংখ্য মাছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের যাতায়াত দেখে। কুণ্ডের দক্ষিণে একটা উষ্ণ-প্রস্রবণ। কুণ্ডের হিম-শীতল জলে স্নান সেরে ঐ উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে পুনর্ব্বার স্নান করবার বিধি। বরফের স্নায় ঠাণ্ডা জলে একবার স্নান করে আবার উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে স্নান করবার আধ্যাত্মিক রহস্য কি আছে ঠিক জানি না, কিন্তু দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া একটা অর্থপূর্ণ যুক্তি দেওয়া এ ক্ষেত্রে খুবই সহজ। কুণ্ডের জল যে কী ঠাণ্ডা তা ভাষায় ঠিক বুঝানো যাবে না। স্নান সেরে কি করে উপরে উঠেছি, ঠিক বলতে পারব না। সমস্ত দেহটা যেন অসাড় হয়ে গেল—দেহ যে আছে এ জ্ঞান যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। পরে নিজে ভেবেছি—এও কি সম্ভব? বাঁদিকে নদী। পাহাড়ের এক অংশ জলের উপর এসে নদী এবং কুণ্ডকে আলাদা করে রেখেছে। নদী যেন একটু এলিয়ে এসে কুণ্ডকে স্পর্শ ক'রে আবার ছুটেছে। চঞ্চলা পাহাড়ে নদীর স্পর্শেও কুণ্ডের জল অচঞ্চল। স্নান সেরে যারা উঠছে মিস্‌মী স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে তাদের পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে—ভিজে কাপড়খানা নেবে ব'লে। কুণ্ডে যাবার পথের দু-পাশে যাচকের দল বসেছে; স্নান সেরে যারা ফিরছে তাদের কাছ থেকে দু-এক পয়সা পাচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, বেলা দশটায়ও কুণ্ডের ফটো নিতে পারলাম না। বিকেলবেলার দিকে হয়ত যথেষ্ট আলো পাওয়া যেত, কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বিজয়বাবু তাড়া দিলেন ছিয়ানব্বই মাইল পথ যেতে হবে; দেরি করলে চলবে না। রওনা হলাম প্রায় সাড়ে দশটায়। পরশুরাম তীর্থ দর্শন শেষ হয়েছে। অনৈতিহাসিক পৌরাণিক যুগে কবে কোন্ পথে পরশুরাম এখানে এসেছিলেন, কেউ জানে না; কিন্তু আজও যে মহাপুরুষের স্মৃতি বক্ষে নিয়ে এই সুদূর, দুরধিগম্য, শ্বাপদ-সঙ্কুল, বিজন পার্ব্বত্যভূমি সহস্র নরনারীর তীর্থক্ষেত্র হয়ে রয়েছে, তাঁকে বার বার উদ্দেশে প্রণাম করলাম।

ডুরে শাড়ী

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

শহরতলী হইতে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিয়া শহর হইতে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাইতে হয়।

নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেন চলিতে থাকে। গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া বসিয়া থাকি, কেমন যেন একটা আবেশ লাগিয়া যায়।

...ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে...ডাইনে, বাঁয়ে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত...দূরে—বহুদূরে যেখানে বৃদ্ধ আকাশ ঝুঁইয়া পড়িয়া যুবতী পৃথিবীর সঙ্গে ভাব জমাইয়াছে—সেখানে কয়েকটি কুটীর...আকাশে বনটিয়ার ঝাঁক...দলবদ্ধ বকের সারি...গাছের ডালে কোকিল, শালিক বা অন্যান্য দুই-এক জাতীয় নাম-না-জানা পাখীর রোদপোহানো...মাঝে মাঝে দুই-একটা ঘাসের গালিচা বিছানো মাঠ...তাহার মাঝে কুমারীর সিঁথির মত সরু সোজা পথটির উপর দিয়া লাউ, কুমড়া, কলমী-শাক ইত্যাদি মাথায় নিম্নজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সবল চলনভঙ্গী...পুকুরঘাটে ঘোমটার ফাঁকে গৃহস্থবধূর কৌতুক-

চঞ্চল চোখে ট্রেন দেখা···ডোবার নোংরা জলে পাতি-হাঁসের জলকেলি···লাইনের পাশে বাব্‌লাবনের ঝোপ···হোগলা পাতার বন···নারিকেল তাল গাছের জটলা···বেড়া-ঘেরা মটরশুঁটির ক্ষেত···পানপাতার চাষ··গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া রাখাল বালকদের কাণামাছি খেলা···গৃহস্থের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দেওয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলহাস্যমুখরিত ক্রীড়াকৌতুক···শিশির-স্নাত বন্য শিউলীর গ্রাম্য বধূর মত শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোহর শোভা—বড়ই ভাল লাগে দেখিতে।

···একটা ছোট্ট স্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামিল। রোজই থামে।

প্লাটফর্ম্মের উপর চোখ পড়িল। দেখিলাম, একটি বছর সাত-আটেকের ছোট্ট মেয়ে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া লাল জিবটি বাহির করিয়া ভেঙ্‌চি কাটিতেছে, আর সুডৌল একটি হাত এমন ভঙ্গিতে আর একটি হাতের পাতায় স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—যাহার মানে, 'বক দেখেছ!'

ভাল লাগিল, কেন লাগিল জানি না। হয়ত ভাল লাগিবার মত মেয়েটি কিছুই করে নাই; রাগ হইলে বা বিরক্ত হইলেই আশা করি ঠিক হইত। তবু ভাল লাগিল।

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানি না সে আমার নীরব ভাষা বুঝিল কিনা। আমি বলিতে চাহিলাম, ওগো, ছোট্ট মেয়েটি, পেয়েছি; তোমার ভেঙ্‌চি কাটা, বক দেখানো সবই আমি দেখতে পেয়েছি এবং আমার ভাল লেগেছে।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

রোজই যাওয়া-আসা করি। রোজই দেখি মেয়েটি তাহার সেই রাঙা ফ্রক পরিয়া ঠিক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কর্ত্তব্য রোজই সে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া যায়। আমিও যেন তাহা দেখিবার জন্য পাগল হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকি, কখন সেই স্টেশনটি আসিবে!

রবিবার কলেজ বন্ধ থাকে, আমার ভাল লাগে না, মনে হয় লাল ফ্রক-পরা মেয়েটি যেন সেইভাবে জিব বাহির করিয়া বক দেখাইতেছে। কেহ বা তাহার দিকে তাকাইয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া চোখ ফিরাইয়া লইতেছে, কেহ বা তাহার দিকে তাকাইতেছেও না। তাহার কৌতুক-চঞ্চল ডাগর চোখ দুইটি যেন কোন চেনা মুখ দর্শন করিবার জন্য এ গাড়ীর কাম্‌রা হইতে ও-গাড়ীর কাম্‌রা পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। সে চায় সেই মুখটি দেখিতে যে তাহার এই ভেংচি-কাটায় রাগ করে না, বক-দেখানোয় হাসিয়া মাথা নাড়ে···এটা নেহাৎ কল্পনা, তবুও কেমন যেন খারাপ লাগে। আহা, ছোট মেয়েটাকে কেউই আমল দেয় না। আহা বেচারী!

সেদিন কি মনে হইতেই খাতাপত্র হাতে সেই স্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম মেয়েটি ঠিক দাঁড়াইয়া আছে। কাছে গিয়া ডাকিলাম—খুকী শোন।

—'আমার নাম খুকী নয়, মিনু।' চটপট জবাব।

মৃদু হাসিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ মিনু, শোন।' সে নির্ভয়ে আগাইয়া আসিল।

তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, 'ভেংচি কাট কেন রোজ, আর বকই বা দেখাও কেন?'

—'তোমায় একা দেখাই নাকি?' বাবারে, বাবা, মেয়েটি কথায় একেবারে বৃহস্পতি যে!

কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম, 'সকলকেই বা দেখাবে কেন?'

এবার মিনু রাগিল, বলিল, 'বেশ করি, আমার খুশী।' কথা বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ক্ষুদ্র সর্পিণীটি এমন ভাবে আমার দিকে তাকাইল যে, হাসি সংবরণ করাটা আমার প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিল।

কোন মতে হাসি চাপিয়া বলিলাম, 'সব সময় খুশী মত কাজ করা কি চলে? দাদার পেনটা তোমার ভাল লাগে, তাই ব'লে তুমি কি—'

—'আমার দাদা নেই—' মিনু প্রায় ফাটিয়া পড়ে আর কি!

কৌতুক হাস্যে বলিলাম, 'আছে গো আছে।'

—'কই, না তো!'

—'হ্যাঁ আছে, এই তো তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।'

মিনুর তখন যা অবস্থা তাহা না দেখিলে বর্ণনা করা যায় না। কতক্ষণ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তার পর শুক্‌নো গলায় একটা ঢোক গিলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'হ্যাঁ বললেই হ'ল কিনা! চল না মার কাছে, দেখি কেমন দাদা।' হাতে একটা মৃদু টান পড়িল।

হাসিয়া বলিলাম, 'পাতান দাদা যে! মা চিন্‌বেন কি করে!'

মিনু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল,—'ও, তাই বল! আমি বলি,—হুঁ:, ভারী আমার বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে দাদা পাতাতে।'

—'হুঁ, ভারী বয়ে গেছে, কেমন। এবার, দেখ

তো চেয়ে!' পকেট হইতে এক প্যাকেট চকলেট বাহির করিয়া মিনুর চোখের সামনে ধরিলাম। মিনু ভাল করিয়া একবার তাকাইল, স্পষ্টই দেখিলাম তাহার চোখ দুইটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, 'চাই নে।'

—ছি, ওকথা বলে না। দাদার দেওয়া জিনিস কি ফিরিয়ে দিতে আছে!

—'হুঁ, ফেরৎ দিতে নেই। আর উনি যে এত গালমন্দ করলেন, তা যেন কিছু নয়। হুঁ. ভারী তো—' মিনুর চোখের গোড়ায় জল আসিয়া গেছে বুঝি।

আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, 'আর করবো না। নাও চকলেট খাও, শুনছো, ও ডেঁপো মেয়েটি!'

ছোট হাত বাড়াইয়া প্যাকেটটি লইয়া মিনু ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, 'ফের!'

অপ্রতিভের ভান করিয়া বলিলাম, 'ও, বড় ভুল হ'য়ে গেল। থুড়ী। ছি, ডেঁপো কি তোমায় বলতে পারি। আহা কথাটি পর্য্যন্ত তুমি সেরে বলতে পার না—'

—না পারে না। সবই যেন জান তুমি।

মহা মুশ্‌কিলে পড়িলাম, তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'আচ্ছা জান-জান-জান। এবার হ'ল তো! ঐ যে গাড়ী এসে গেল, যাই এবার।'

মিনু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—যাও না, কে বেঁধে রেখেছে তোমায়।' কথা বলিয়া নেহাৎ গিন্নী-বান্নীর মত হেলিয়া-দুলিয়া সে গৃহের দিকে রওনা হইয়া গেল।

গাড়ী আসিল: এক ঘণ্টা পরের গাড়ী। প্রথম পিরিয়ড করা আর হইল না দেখিতেছি!

...কোন দিনই প্রায় আমার পুরা ক্লাস করা আর হইয়া উঠে না। রোজই সেই স্টেশনে নামিয়া পড়ি, স্টেশনের ছোট্ট অপরিসর বেঞ্চিটার উপর বসিয়া আমার আর মিনুর গল্প চলিতে থাকে। কোন দিন পরের ট্রেন ধরিতে পারি। কোন দিন বা গল্পের মত্ততায় সেই ট্রেনটাও চোখের উপর দিয়া চলিয়া যায়। ফিরতি ট্রেনে বাড়ী ফিরিয়া আসি।

কত রকম গল্পই না হইতে থাকে আমাদের মধ্যে! অধিকাংশ সময়ই মিনু বকিয়া যায়, আমি নির্ব্বাক্ শ্রোতাটি যেন তাহার কথা গিলিতে থাকি। এত ভাল শ্রোতা সে জীবনে হয়ত পায় নাই। কী বকিতেই যে পারে মিনু! কখনও বলে, 'ভূত দেখেছ'। জবাব দিবার আগেই আবার বলিয়া উঠে—কি রকম দেখতে, বল না?' ভূতের অস্তিত্ব নাই, ইহা শুধু মানুষের চোখের ভ্রম বা মনের একটা বিকৃত কল্পনা মাত্র, মিনু এ কথা বিশ্বাস করে না।

—'হ্যাঃ, তুমি জান কি না সব!' তাচ্ছিল্যের একটা পোচ মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া আবার বলে, 'আছে গো আছে। সেদিন টেঁপু বলছিল সে একটা ভূত দেখেছে; সেটা যেম্‌নি লম্বা—'

—তোমার মাথা।

—ভাল হবে না বলছি, কথায় বাধা দেবে তো—

হাসিয়া বলিলাম, 'কি করবে, মারবে নাকি?'

—'হ্যাঁ, মারবোই তো—' জিবের ফাঁক দিয়া কথাগুলি বাহির হইয়া পড়িল।

গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম, 'দ্যাখ্ মিনু, তোর আজকাল বড্ড বাড় হয়েছে! যা মুখে আসবে, তাই বলবি?' মিনু কিছুই বলিল না, শুধু ঘাড় বাঁকাইয়া শিমুলগাছের ডগায় উপবিষ্ট একটা দাঁড়কাকের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকাইয়া রহিল। চোখের জলে দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে হয়ত। আমি আর কিছুই বলিলাম না, জনমানবহীন প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া রহিলাম।

গাড়ী আসিল। বাড়ী ফিরিলাম। মনটা যেন কি রকম খচ্‌খচ করিতে লাগিল। ছি, এত কটু কথা না বলিলেও হইত মিনুকে! ছোট মেয়ে, সব সময় অত হিসাব করিয়া কথা বলিতে পারে নাকি! কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে!

পরদিন কলেজে যাইবার পথে পকেট ভরিয়া নানা জিনিস কিনিয়া লইলাম। দাম খুবই সামান্য, সাধারণ লোকের চোখে হয়ত ইহার বিশেষ মূল্য নাই। কিন্তু মিনুর চোখে আছে। আছে বৈকি, আছেই তো! এক পয়সার জাপানী বাঁশী, দুই প্যাকেট চকলেট, একটা ছোট ডল পুতুল, এই রকম আরও দুই-চারিটা টুকিটাকি জিনিস—মিনুর কাছে ফেলনা নয়।

ট্রেন আসিয়া সেই স্টেশনে থামিল।

দেখিলাম মিনু এককোণে দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ট্রেনের এদিক হইতে ও-দিক পর্য্যন্ত চোখ বুলাইয়া লইতেছে। কাছে গিয়া ডাকিলাম, 'মিনু!' মিনু আমাকে দেখিতে পায় নাই, প্রথমটা যেন কি রকম অপ্রতিভ হইয়া গেল, পরক্ষণেই সামলাইয়া আর এক দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কাছে গিয়া হাত ধরিতে

গেলাম, সে ঝটকা মারিয়া হাত সরাইয়া মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝিলাম আজ মাত্রাটা একটু চড়িয়াছে। সমস্ত জিনিস তাহার চোখের সামনে ধরিয়া বলিলাম, 'নাও, খুব হয়েছে, আর রাগ দেখাতে হবে না।' বলিয়া নিজের মনে খানিকটা হে-হে করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। মিনু ফিরিয়াও তাকাইল না। আশ্চর্য্য ব্যাপার তো!

হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দি খেলিয়া গেল, দেখি কি রকম কথা না বলিয়া পারে মিনু!

ঊর্দ্ধে টিনের চালটার দিকে তাকাইয়া বোধ করি সেইটাকে শুনাইয়াই বলিতে লাগিলাম,—'একা যাচ্ছি। রাত প্রায় দুটো! অন্ধকার—ঘুটঘুটে অন্ধকার! একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছের নীচে দিয়ে আসছি, এমন সময়—' আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম মিনু ভীতিবিহ্বল ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। একটু থামিয়া আবার শুরু করিলাম,—এমন সময় গোঁ গোঁ ব'লে একটা শব্দ—' মিনু সরিয়া আসিয়া আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। হাসি চাপিয়া আবার শুরু করিলাম,—বললাম, কে? উত্তর হ'ল নাকি সুরে—আঁমি। আমি কে? ব'লে আমি এগিয়ে যাচ্ছি—

—এ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! এগিয়ে যাচ্ছ, রাত দুপুরে, একা—একা—

মিনু আর স্থির থাকিতে পারে না। তাহার কথার উত্তর না দিয়াই বলিলাম, 'এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়—ট্রেন গেল থেমে, ঘুমটাও গেল ভেঙে, স্বপ্নটাও গেল মিলিয়ে।' কথা বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। মিনু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, কিন্তু পরক্ষণেই ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। হাত ধরিয়া ফেলিলাম, মিনু এবার আর হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত খেলনা, খাবার তাহার সম্মুখে ধরিলাম। সে একবার ইতস্ততঃ করিয়া সবই গ্রহণ করিল। তাহার দাদার কিছুই হয় নাই, ইহাতেই মিনুর রাগ ধুইয়া জল হইয়া গিয়াছে যে!

মিনু, ভারী তো মিনু! তাহার রাগ ভাঙাইতে আর কি-ই বা লাগে!

এই রকম ভাবে মান-অভিমানের ভিতর দিয়া দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এমন সময় আসিয়া পড়িল, পূজার ছুটি। ছুটিতে দেশে যাইতে হইবে। বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে।

সেদিন মিনুকে বলিলাম কথাটা। প্রথমে ত শুনিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল,—'হুঁ, মিছে কথা ব'লে পালিয়ে যেতে চাও! তুমি আর আসবে না দাদা, আমি জানি।'

তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, 'ছি, কাঁদতে নেই। আমি তো আর একেবারে যাচ্ছি না। এক মাস পরেই তো কলেজ খুলবে। তখন তো আবার আসব।'

কিন্তু পাগলী মেয়ে যদি কিছুতেই কথা শোনে! শেষে নিরুপায় হইয়া বলিলাম, 'ও-রকম করে কাঁদলে যে দাদার অকল্যাণ হয় মিনু। দাদা তা হ'লে—' ব্যস্তভাবে আমার মুখে হাত চাপা দিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিল মিনু। হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কৈ, আর কাঁদছি নে তো! এখন আর কিছু হবে না, না দাদা?'

গাঢ়কণ্ঠে বলিলাম, 'না, আর কিছু হবে না।'

মিনু হাত ধরিয়া বলিল, 'চল আজ আমাদের বাড়ী। সেদিন বলছিলে যাবে।'

বলিলাম, 'আজ যাই কি করে, বল। আজ কলেজ ছুটি হয়ে যাবে, মাইনেটা ত দিতে হবে। আর এক দিন যাব বরং।'

—'কবে যাবে, বল?' উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া রহিল মিনু। একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'কবে? আচ্ছা এই ধর—ভাইফোঁটার দিন যাব। তুমি আমায় ফোঁটা দেবে। আমি ত আর ফোঁটা পাই নি কোন দিন। কেই বা দেবে? বোন ত আর নেই আমার।'

মিনু নাচিয়া উঠিল—'ঠিক তো! ঠিক আসবে তো! যদি না আস ত আমার—'

হাসিয়া ফেলিলাম, 'থাক্, আর দিব্যি দিতে হবে না। আমি আসব ঠিক। তার পর মিনুরাণীর জন্যে সেদিন কি আনবো গো?'

মিনু প্রথমে কিছুই বলিল না, শুধু পিট্ পিট্ করিয়া হাসিতে লাগিল, আবার বলিলাম, 'লজ্জা কি বল না, কি চাই। পুতুল, চকলেট—'

'—না।' মাঝপথে কথা বন্ধ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া সলজ্জ কণ্ঠে মিনু বলিল, 'একটা ডুরে শাড়ী।'

বলিলাম, 'বেশ ত, তাতে এত লজ্জার কি আছে।' কিন্তু মিনু সহজে লজ্জা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। মুখ ফুটিয়া ইহার আগে সে আমার কাছে কিছুই চায় নাই কোন দিন।

ট্রেন আসিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম, হুইসিল বাজাইয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল। মিনু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, শুধু একবার হাত নাড়িয়া বলিল, 'মনে থাকবে তো দাদা।' ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম মনে আমার খুব থাকিবে।

মিনুকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গেলাম।

* * *

আজ ভাইফোঁটা লইব মিনুর হাতে।

কয়েক দিন হইল দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কাল রাত্রে মিনুর জন্য একটা রাঙা ডুরে শাড়ী কিনিয়া আনিয়াছি। চমৎকার মানাইবে মিনুকে! কল্পনায় একটা দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল…সদ্যস্নাতা মিনু শাড়ীটা পরিয়া অপটু হাতের আঙুল দিয়া আমার কপালে ফোঁটা দিতেছে; আর কি এক রকম মিষ্টি হাসি হাসিতেছে যেন পিটু পিটু করিয়া…তার পর মিনু প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিব মিনুকে কি বলিয়া?…বলিব, রাণী হও…সুখী হও…খুব বড় ঘরে তোমার বিয়ে হবে…কোন অকল্যাণ যেন কোন দিন তোমায় স্পর্শ না করে…

গাড়ী আসিয়া স্টেশনে থামিল। শাড়ী-হাতে নামিয়া পড়িলাম। মিনুদের বাড়ী স্টেশনের গায়েই। ঐটুকু পথ আসিতে দুই-তিন মিনিটের বেশী সময় লাগিল না। বাড়ীর সামনে আসিয়া যেন কি রকম লজ্জা করিতে লাগিল। মিনুর মা আছেন, বাবা আছেন, তাঁহারা হয়ত কি ভাবিবেন। পরক্ষণেই আবার মন শক্ত করিয়া লইলাম, ভাবিবেন কি আবার, বোন ভাইকে ফোঁটা দিবে, তাতে আবার ভাবাভাবি কিসের?

দরজার কড়া নাড়িলাম। দুই-তিন বার কড়া নাড়িতেই এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—মিনু আছে?

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকাইয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন,—মিনু?

তার পর কি মনে হইতে বলিয়া উঠিলেন, 'ও আগের মালবাবুর মেয়েটি তো! দিন-পনর হ'ল মালবাবু কলেরায় মারা গেলেন—'

চমকিয়া উঠিলাম—'মিনুর বাবা মারা গেছেন? কোথায় আছে মিনু—তার মা?'

—তা তো জানি নে মশাই। তবে, তার কাকা না কে এসে তাদের নিয়ে গেছে। আপনি বুঝি তাদের আত্মীয়?

কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার হাতে লাল ডুরে শাড়ীটা! সেই দিকে তাকাইতেই দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল,—আহা, রাঙা ডুরে শাড়ীটায় মিনুকে বেশ মানাইত, সুন্দর মানাইত, বড় চমৎকার মানাইত কিন্তু…

মথ-প্রজাপতি ও রেশম-কীট

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রজাপতির মত সুদৃশ্য পতঙ্গ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের অনুপাতে প্রজাপতির ডানা অসম্ভব বড় হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির ডানা বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট। ডানার মনোরম বর্ণবৈচিত্র্যে সহজেই ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটবড় বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য রকমারি প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে দিবাচর ও নিশাচর হিসাবে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণতঃ দিবাচর প্রজাপতিই আমাদের নজরে পড়ে। উজ্জ্বল দিবালোকে ইহারা ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়। দিনের আলো নিষ্প্রভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা লতাপাতা বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। নিশাচর প্রজাপতিরা কিন্তু সারাদিন আনাচে-কানাচে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ইহাদের ডানাগুলি দিবাচর প্রজাপতির মত হাল্কা নহে এবং ডানার বর্ণবৈচিত্র্যও কম। বিশ্রাম করিবার সময় দিবাচর প্রজাপতিরা পিঠের উপরদিকে ডানা মুড়িয়া বসে; কিন্তু নিশাচর প্রজাপতিরা
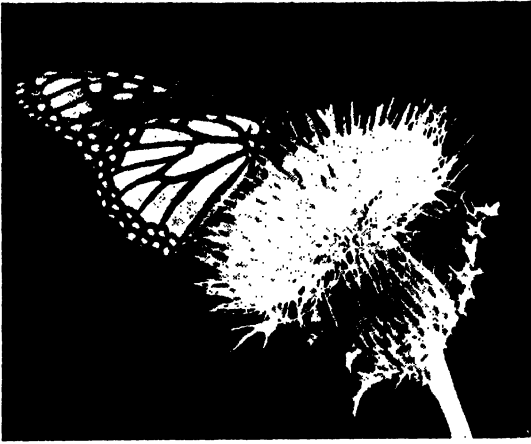
মনার্ক নামক দিবাচর প্রজাপতি ফুলের উপর ডানা মুড়িয়া বসিয়া আছে

ডানা প্রসারিত করিয়াই বিশ্রাম করিয়া থাকে। তা ছাড়া ইহাদের মস্তকের শুঁড় দুইটি কতকটা পালকের আকৃতি-বিশিষ্ট; কিন্তু দিবাচর প্রজাপতির শুঁড় দুইটি মসৃণ এবং প্রান্তভাগ বর্ত্তুলাকৃতি। নিশাচর প্রজাপতিরা 'মথ' নামে পরিচিত। ইহাদের বাচ্চাগুলিই রেশমসূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে।

যৌন-মিলনের পর স্ত্রী-প্রজাপতি গাছের পাতার উপর খানিকটা স্থান জুড়িয়া পর পর ডিম পাড়িয়া যায়। ডিমগুলি প্রায়ই গোলাকার; কিন্তু কোন কোন মথ ও প্রজাপতির ডিমের গায়ে 'ম্যাগ্নিফাইয়িং গ্লাসে'র সাহায্যে সুদৃশ্য কারুকার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ প্রজাপতিই ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে ডিমগুলিকে সাজাইয়া রাখে। আবার কেহ কেহ পৃথক পৃথক পাতার উপর এক-একটি মাত্র ডিম পাড়ে। অল্প কয়েক দিন পরেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। অধিকাংশ প্রজাপতির বাচ্চার গায়েই বিষাক্ত শোঁয়া থাকে। আবার অনেকের গাত্র মসৃণ। এই বাচ্চাগুলিই শোঁয়া-পোকা বা 'ক্যাটারপিলার' নামে পরিচিত। ডিম হইতে বাহির হইয়াই বাচ্চাগুলি পাতার সবুজাংশ কুরিয়া কুরিয়া খাইতে থাকে। খাওয়াই বাচ্চাগুলির প্রধান কাজ। তিন-চার দিন অনবরত আহার কার্য্য চালাইবার পর কিছুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিয়া প্রথম বার খোলস পরিত্যাগ করে। তাহার কিছুকাল বাদে আবার খাওয়া সুরু করে। এইরূপে সাধারণতঃ চার বার খোলস বদলাইবার পর পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। পরিণত অবস্থায় শোঁয়া-পোকা আড়াই ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি বা ততোধিক লম্বা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলেই শোঁয়া-পোকা খাওয়া বন্ধ করিয়া লতা-পাতার কোন সুবিধাজনক স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সূতার সাহায্যে একটি শক্ত বোঁটা প্রস্তুত করে এবং সেই বোঁটা হইতে শরীরটাকে বঁড়শীর মত বাঁকা করিয়া ঝুলিতে থাকে। নিশ্চল ভাবে এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা ঝুলিয়া থাকিবার পর তাহার পিঠের দিকের চামড়া লম্বালম্বিভাবে খানিকটা ফাটিয়া যায়। ভিতর হইতে লাল্‌চে আভাযুক্ত একটা লম্বাটে পদার্থ তখন মোচড় দিতে দিতে বাহির হইয়া আসে। সর্ব্বশেষে উপরের চামড়াটা এক টুকরা কালো ঝুলের মত খসিয়া নীচে পড়িয়া যায়। লাল্‌চে আভাযুক্ত পদার্থটা তখন বোঁটার সঙ্গে ঝুলিতে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লাল্‌চে পদার্থটা ধীরে ধীরে একটা আস্ত চীনাবাদামের আকৃতি পরিগ্রহ করে। উপরের পর্দ্দাটা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উজ্জ্বল কাচ-খণ্ডের মত ঝকমক্ করিতে থাকে। ইহাই প্রজাপতির গুটি বা পুত্তলী অবস্থা। বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির গুটি—সোনালী, রূপালি, লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল কাচখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এক একটি গাছে হীরা, মাণিকের দুলের মত এরূপ অনেক পুত্তলি ঝুলিতে দেখা যায়। দশ-পনর দিন পরে এই গুটির পিঠ চিরিয়া ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে। পুত্তলি হইতে বাহির হইবার পর ইহাদের ডানাগুলি থাকে খুবই ছোট এবং পাতলা চামড়ার ন্যায় তক্‌তকে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ডানাগুলি তরতর করিয়া বাড়িয়া যায়

ক্লিয়ার মথ নামক নিশাচর প্রজাপতি

লুনা মথ

এবং বর্ণবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ডানাগুলি শক্ত ও হাল্কা হইলে প্রজাপতি আকাশে উড়িয়া যায়। ইহাই হইল মোটামুটি দিবাচর প্রজাপতির জন্মের ইতিহাস। মথ জাতীয় নিশাচর প্রজাপতির জন্মেতিহাস অনেকাংশে উক্তরূপ হইলেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। যৌন-মিলনের পর মথেরাও এক স্থানে অনেকগুলি করিয়া ডিম পাড়ে। ইহাদেরও শোঁয়াযুক্ত ও শোঁয়াবিহীন দুই রকমেরই 'ক্যাটারপিলার' দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতির 'ক্যাটারপিলার'গুলি গুটি বাঁধিবার সময় বোঁটা প্রস্তুত করিতে অতি সামান্য সূতা বোনে; কিন্তু মথের বাচ্চাগুলি গুটি বাঁধিবার সময় মুখ হইতে অজস্র রেশমসূত্র বাহির করিয়া ডিম্বাকার আবরণ প্রস্তুত করে। যাহাদের গায়ে শোঁয়া আছে তাহারা আবার শোঁয়াগুলি ছিঁড়িয়া সূতার সহিত মিশাইয়া তাহারই সাহায্যে বহিরাবরণ প্রস্তুত করে। সূত্রনির্ম্মিত আবরণীর অভ্যন্তরে কিছুকাল নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিবার পর ক্যাটারপিলার পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দেহের চামড়াটি পরিত্যাগ করিয়া জলপাইয়ের আঁঠির মত আকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় কেহ এক মাস, কেহ দুই মাস, কেহ কেহ বা নয়-দশ মাস কাটাইবার পর মথের আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া আসে। অনেক জাতীয় স্ত্রী-মথেরা গুটি কাটিয়া বাহির হইবার পর সেই স্থানেই অবস্থান করে। ডানা থাকিলেও তাহারা উড়িতে অক্ষম। গুটি হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুং-মথ তাহার নিকট উড়িয়া আসে। সময় সময় পাঁচ-সাতটি পুং-মথকে স্ত্রী-মথের নিকট অবস্থান করিতে দেখা যায়। যৌন-মিলনের কিছুকাল বাদেই স্ত্রী-মথ একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মথ জাতীয় প্রজাপতির গুটির আবরণীর সূত্র হইতেই বিবিধ প্রকারের রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কেবল বন্য জন্তু-জানোয়ারকেই বশীভূত করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, তাহারা কীটপতঙ্গের মধ্য হইতেও মধুর জন্য মৌমাছি এবং রেশমের জন্য রেশম-কীট বা মথ জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চাগুলিকে পোষা প্রাণীতে পরিণত করিয়াছে। প্রতি বৎসর এই রেশম-কীট হইতে কি বিপুল পরিমাণ রেশম উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহার সঠিক হিসাব নির্ণয় করা দুষ্কর। যতদূর হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে একমাত্র চীন দেশের অভ্যন্তর ভাগ হইতেই বৎসরে ১১২৫০০০ মণেরও বেশী রেশম উৎপাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই রেশম-কীট প্রতিপালনের রীতি প্রচলিত আছে। এই কীট প্রতিপালনের দেশীয় পদ্ধতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

বিভিন্ন জাতীয় রেশম-কীটের গুটি বা কোয়া হইতে সূত্র সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশে গরদ, তসর, এণ্ডি, বাফ্‌তা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। যে জাতীয়

রেশম প্রজাপতি গুটি কাটিয়া বাহির হইয়াছে

নীচে রেশম-কীট। ডালের গায়ে রেশম-কীট গুটি বাঁধিয়াছে

রেশম-কীট হইতে গরদের কাপড় প্রস্তুত হয় তাহারা পলু-পোকা বা তুঁত পোকা নামে পরিচিত। ইহারা বিভিন্ন জাতীয় মথ নামক প্রজাপতির বাচ্চা বা ক্যাটারপিলার। আমাদের দেশে বড়-পলু, ছোট-পলু, নিস্তারী-পলু ও চীনা-পলু নামক কয়েক জাতীয় তুঁত-পোকা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বড়-পলু ও বিলাতী-পলুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের কোয়াগুলি খুবই বড় এবং শুভ্রবর্ণের প্রচুর পরিমাণ রেশম উৎপাদন করে। আমাদের দেশে বিলাতী পলু প্রতিপালিত হইলেও তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে। বড়-পলু ও বিলাতী-পলু প্রতিপালনের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাদের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইতে প্রায় দশ মাস সময় লাগিয়া থাকে। বড়-পলু ও বিলাতী-পলু খুব সম্ভব একই জাতীয় পোকা; কিন্তু উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হয়ত বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বংশানুক্রমে এই পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাহা হউক, বড়-পলুর ডিম মাস দশেক হাঁড়ির ভিতর রাখিবার পর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে হাঁড়ির ঢাকনা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। এই দশ মাস ডিমসমেত হাঁড়িটাকে ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে শিকায় ঝুলাইয়া রাখে। আলোকময় বা উষ্ণস্থানে রাখিলে ডিম ভাল করিয়া ফোটে না। খুব ঠাণ্ডা জায়গায় না রাখিলে বিলাতী-পলুর ডিম মোটেই ফোটে না। বিলাতী-পলুর ডিম বরফের মত ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হয়। ফুটিবার পূর্ব্বে দুই-তিন সপ্তাহ ৩২ হইতে ৩৪ ডিগ্রি ফারেনহিট উত্তাপে রাখা দরকার। তাহার পর উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলে বাচ্চা বাহির হইতে থাকে। ৭৪ বা ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহিট উত্তাপে এই পলুপোকা পুষিতে হয়।

ছোট-পলু, নিস্তারী-পলু ও চীনা-পলুর ডিম গ্রীষ্মকালে আট-দশ দিনে, বর্ষাকালে দশ-পনর দিনে এবং শীতকালে পঁচিশ-ত্রিশ দিনে ফুটিয়া থাকে। ডিম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোঁয়া-পোকা বা ক্যাটারপিলার বাহির হইয়াই তুঁত পাতা খাইতে আরম্ভ করে। ডালা বা কাগজের উপর পোকাগুলি রাখিয়া তাহার উপর কচি কচি তুঁত পাতা কুচি কুচি করিয়া ছড়াইয়া দিলেই পোকাগুলি উপরে উঠিয়া পাতা খাইতে থাকে। ভুক্তাবশিষ্ট পাতা ও নাদি পরিষ্কার করিবার জন্য তুঁতপোকাগুলির উপর এক খণ্ড সরু জাল বিছাইয়া তাহার উপর নূতন পাতা কুচাইয়া দিতে হয়। জালের ফাঁক দিয়া নীচের পোকাগুলি উপরের পাতায় উঠিয়া আসে, তখন জালসমেত পোকাগুলিকে আর একখানি ডালায় রাখিয়া পূর্ব্বের ডালাটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারা যায়। এই উপায়ে সর্ব্বদাই পোকা-গুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। প্রথম অবস্থায় পোকাগুলিকে প্রত্যহ পাঁচ-ছয় বার তাজা পাতা দিতে হয়। চার-পাঁচ দিন পরেই পোকাগুলি নিশ্চলভাবে অবস্থান করে এবং কিছুকাল বাদেই প্রথম বার খোলস

এক জাতীয় মথ-প্রজাপতির গুটি। উপরের দুইটি পুত্তলীর আকার ধারণ করিয়াছে

পরিত্যাগ করে। এই সময়ে উহারা কিছু খায় না। এই সময় অন্ততঃ এক দিন পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিতে হয়। পোকাগুলি নড়াচড়া আরম্ভ করিলেই পুনরায় পাতা দেওয়া দরকার। এইরূপে ইহারা প্রায় চার বার খোলস ছাড়ে এবং তাহাদের দেহের আকার ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। ইহারা গ্রীষ্মকালে তিন-চার দিন অন্তর এবং শীত কালে পাঁচ-ছয় দিন অন্তর খোলস পরিত্যাগ করে। তৃতীয় বার খোলস ছাড়িবার পর পাতা আর কুচাইয়া দিতে হয় না—গোটা পাতা দিলেই চলে। চতুর্থ বার খোলস ছাড়িবার পর পোকাগুলি শন্ শন্ শব্দে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাতা খাইয়া শেষ করে। তৃতীয় বার খোলস পরিত্যাগের পরই পাতার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ এই সময় বেশী খাইলে প্রায়ই তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। চতুর্থ

এক জাতীয় মথ-প্রজাপতির ক্যাটারপিলার

বার খোলস ছাড়িবার পর পোকাগুলি গ্রীষ্মকালে ছয়-সাত দিন ও শীতকালে দশ-বার দিন আহার করিবার পর খাওয়া বন্ধ করিয়া গুটি বা কোয়া প্রস্তুত করে। কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় হইলেই পোকাগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মুখ হইতে অল্প অল্প রেশম বাহির করিতে থাকে। এরূপ অবস্থা দেখিলেই তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া শুষ্ক ডালপালা বা বাঁশের চেটাই দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার স্বচ্ছিদ্র পাত্রের মধ্যে স্থানান্তরিত করিতে হয়। সেখানে দুই দিনের মধ্যেই গুটি বা কোয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলে।

পলু-পোকাগুলি যেন ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে না থাকে সেজন্য বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রথম অবস্থায় ডালার উপর পলুগুলিকে পাতলা ভাবে রাখিতে হয়। বড় হইলে একটু ঘন ভাবে রাখিলেও তত ক্ষতি হয় না। প্রথমাবধি অযত্ন করিলে অথবা অপরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিলে

অ্যাটলাস মথ

বড় হইলেই তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পলু যে-ঘরে রক্ষিত হয় তাহার হাওয়া খুব গরম বা ঠাণ্ডা হওয়া খুবই মারাত্মক। ঘরে হাওয়া প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে নাতি-শীতোষ্ণ অবস্থায় থাকিতে পারে তাহাই করা উচিত। কিন্তু দেখিতে হইবে—যেন পলুর গায়ে টানা হাওয়া লাগিতে না পারে। কারণ টানা বাতাসে পলু রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গুমট পড়িলে পাখার হাওয়া করিয়া ঘর ঠাণ্ডা রাখিতে হয় নচেৎ সল্‌ফা বা হাঁসা নামক রোগে আক্রান্ত হইয়া পলু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগাক্রান্ত মথের ডিমে মাতৃরোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। তাহার ফলে যত্ন করিলেও পলু মরিয়া যায়। এজন্য ডিম পাড়িবার পর প্রত্যেকটি স্ত্রী-মথের শরীর হইতে এক ফোঁটা রস বাহির করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে যদি কাহারও রসে দানার ন্যায় কোন পদার্থ দেখা যায়, তবে সেই মথের ডিম নষ্ট করিয়া ফেলাই

এক জাতীয় মথ-প্রজাপতির বাচ্চা

প্রজাপতির ডিমের কারুকার্য্য। বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

বিধেয়। তা ছাড়া তুঁতিয়ার জলে ঘর, ডালা ও অন্যান্য উপকরণ ভাল করিয়া ধুইয়া লইয়া তাহাতে সুস্থ পলু-পোকা প্রতিপালন করা উচিত। তুঁতিয়ার জলে ধুইবার পরও ঘরের ভিতর গন্ধক পোড়াইয়া স্থানটিকে যত দূর সম্ভব দূষিত বীজাণুমুক্ত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ কাগজের উপর ডিম পাড়াইয়া ডিমসমেত কাগজখানিকে তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া পরে শীতল স্থানে ঝুলাইয়া শুষ্ক করিয়া লয়। ইহাতে ডিমগুলি বীজাণুমুক্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত এক রকম বড় বড় মাছি পলুর গন্ধ পাইলেই তাহাদের পিঠের উপর ডিম পাড়িয়া যায়। এই ডিম ফুটিয়া কৃমি বাহির হয়। তাহারা পলুর শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রস রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। পলু-পোকা প্রতিপালন করিতে হইলে এই মাছি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নচেৎ পলুর মড়ক নিবারণ অসম্ভব।

পলু-পোকার খাদ্যহিসাবে বঙ্গদেশে তুঁত গাছের চাষ করা হইয়া থাকে। এই তুঁত গাছ সাধারণতঃ পেয়ারা গাছের মত বড় হয়। সেজন্য জমিতে তুঁতের কলম লাগাইবার পর গাছগুলি বড় হইলেই ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া হয়। বৎসরে এরূপে তিন-চার বার কাটিয়া দিলে গাছগুলি বেশী বড় হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট পাতা জন্মাইবার জন্য তুঁত চাষে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় অন্যথায় যে কোন রকম তুঁত পাতা খাইয়াই পলু উৎকৃষ্ট কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে না।

তসর-কীটেরা কিন্তু রেশম-কীটের মত তুঁতপাতা খায় না। ইহারা শাল, আসন, অর্জ্জুন, মহুয়া, সিধা, ঘুটের, বাদাম প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া গাছের উপরই কোয়া প্রস্তুত করে। রেশম-কীটের মত তসর-কীটকে আগাগোড়া গৃহমধ্যে পালন করা যায় না। তসর-মথেরা ঘরের মধ্যেই ডিম পাড়ে; কিন্তু ডিম ফুটিবার পূর্ব্বেই ছোট ছোট ঠোঙার মধ্যে রাখিয়া তাহাদিগকে গাছের স্থানে স্থানে ঝুলাইয়া দিতে হয়। কীট বাহির হইয়া ইচ্ছামত গাছের পাতা খাইয়া বড় হয় এবং গ্রীষ্মকালে এক মাস এবং শীতকালে দুই মাস, আড়াই মাসের পর গাছের ডালেই কোয়া প্রস্তুত করে। বর্ষাকালই তসর-কীট প্রতিপালনের প্রশস্ত সময়। গ্রীষ্ম বা শীতকালে হঠাৎ কোন দিন বেশী বৃষ্টি হইলেই অনেক পোকা 'রসা' হইয়া মরিয়া যায়। এণ্ডি-কীট পালন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে, স্যাঁৎসেঁতে বা আর্দ্র স্থানে এই কীট পালন করা দরকার, আসাম প্রদেশে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া সকল ঋতুতেই সেখানে এণ্ডি পালন করা চলে। এণ্ডি-কীটেরা ভেরেণ্ডা পাত খাইয়াই বড় হইয়া থাকে এবং রেশম-কীটের মতই উহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়। আট দশ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া এণ্ডি-পোকা বহির্গত হয়।
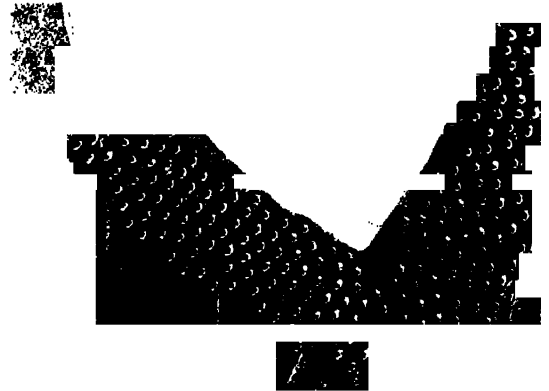
পাতার উপর মথ ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে

কোয়া প্রস্তুত হইয়া গেলে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া গরম জলের ভাপে ভিতরের পুত্তলিগুলিকে মারিয়া ফেলিতে হয়। পরে ক্ষারের জলে সিদ্ধ করিয়া সূত্র বাহির করিয়া লইতে হয়। রেশমের কোয়া ভাপাইবার পর জলে সিদ্ধ করিয়া যেরূপ সহজে সূত্র বাহির করিতে পারা যায়, তসরের

সূত্র বাহির করা তত সহজ নহে। সোডা, পটাশ, সাজিমাটি, কলাগাছের ছাই প্রভৃতির সঙ্গে তসর-কোয়া সিদ্ধ করিবার পর তাহার সূত্র বাহির হয়। জলের সহিত পেঁপের রস মিশাইয়া তাহাতে তসরের কোয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিলেও সহজে সূত্র বাহির হইতে পারে। সিদ্ধ করিবার পর কোয়াগুলি পরিষ্কার করিয়া ঈষৎ ভিজা থাকিতেই লাটাইয়ে জড়াইয়া সূত্র বাহির করিতে হয়। এণ্ডি কোয়া হইতে এক খাই সূতা বাহির করা যায় না। এণ্ডি প্রজাপতিগুলি কোয়া কাটিয়া বাহির হইয়া গেলে সেই কর্ত্তিত কোয়া হইতে কার্পাস সূত্রের মত টাকু বা চরখার সাহায্যে সূতা কাটিতে হয়। এই জন্যই এণ্ডির কাপড় অন্যান্য রেশমী বস্ত্র হইতে অধিকতর স্থায়ী।

শেষ অর্ঘ্য

শ্রীঅবনীনাথ রায়

অবশেষে সেই দিনটি আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুদিন কল্পনায় এই দিনটির আশঙ্কা করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছি, সেদিন না জানি কি করিয়া আমরা বাঁচিব যেদিন রবীন্দ্রনাথ ভারত-গগনে উদিত থাকিবেন না—সেদিন বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতাই বা কতটুকু? কিন্তু সেই দিন যেদিন সত্যই সমাগত হইল তখন দেখিলাম বাঁচিয়া ত আছিই, হয়ত অনেক দিন এই ভাবেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! বড় গর্ব ছিল জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের আমরা দেশবাসী, সমসাময়িক, তাঁর ছাত্র। সেই গর্ব আজ নিঃশেষ হইয়াছে।

কবি যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রোগশয্যায় শয়ান, তখন মিরাটে এক দিন গুজব রটে যে কবীন্দ্র নাই। গুজব এমন জোর রকমের ছিল যে স্থানীয় কন্‌ট্রোলার আপিসে ছুটি দেওয়ার জন্য দরখাস্ত পর্য্যন্ত পেশ হইয়া যায়। সন্ধ্যা নাগাদ জানা যায় গুজবটা আগাগোড়াই মিথ্যা, কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবেরা বলাবলি করিতে থাকেন যে এই মিথ্যা গুজবের ফলে কবিগুরুর গ্রহ কাটিয়া যাইবে এবং তিনি আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া যাইবেন।

সেদিনও বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ঠাকুর, তাই যেন হয়। এই সব গুজবের কিছুমাত্র সার্থকতা যদি থাকে তবে তার সুফল যেন কবীন্দ্রের উপর অর্শায়, কিন্তু নিয়তির অনিবার্য পরিণাম আমাদের আকুল প্রার্থনাও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের সংবাদ এবং তার ফলে একটা বিরাট্ শূন্যতা যখনই বুকের মধ্যে অনুভব করিতেছি তখনই সেই পরিপ্রেক্ষণীর সাহায্যে নিজের সত্তার একটা বৃহৎ অংশ উদ্ঘাটিত এবং আলোকিত দেখিতে পাইতেছি। বুঝিতে পারিতেছি আমার জীবন এমন ভাবে পরিবর্তিত হইত না যদি না রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতাম। আমার অজ্ঞাতসারে, হয়ত তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতসারে, আমাকে তিনি ভাঙিয়া গড়িয়াছেন। এ যে আমার কবি-কল্পনা নয়, অতিশয়োক্তি নয়, সেকথা নিজের দিকে তাকাইলেই টের পাই—কিন্তু সেকথা অপরের কাছে প্রকাশ করিয়া বুঝাইতে হইলে অনেক দিন আগেকার অনেক ঘটনা বর্ণনা করিতে হয়। আজ তাহাই করিব—কেননা ভবিষ্যতে হয়ত আর সময় পাওয়া যাইবে না।

তিরিশ বৎসর আগেকার কথা। কিন্তু তবু মনে হইতেছে যেন এই সেদিন। এক গ্রীষ্ম-অপরাহ্নের ম্লান আলোকে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কাছারিখানার বারান্দায় বসিয়া আছি। আমাদের গ্রামের এক দূরাত্মীয় রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে চাকরি করিতেন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। হঠাৎ ডাক পড়িল দোতালার বারান্দায়। বেয়ারার নির্দেশে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া যাঁর সামনে উপস্থিত হইলাম তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই বয়সেও তাঁর ছবি দেখিয়াছিলাম —সুতরাং চিনিতে বিলম্ব হইল না। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। বীণানিন্দিত কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইল, 'তুমি আমার সঙ্গে বোলপুর যাবে?' পথহীন অরণ্যানীর মধ্যে নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার আহ্বান শুনিয়াছিলেন, 'পথিক,

তুমি পথ হারাইয়াছ?' তখন তিনি যুগপৎ পুলকিত এবং রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে আমিও যে তদপেক্ষা কম পুলকিত এবং রোমাঞ্চিত হই নাই, এ কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

আমার ইহজীবনের কল্পনা সার্থক হইতে চলিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি বোলপুর যাইতে চাহি কিনা। আর আমাকে পায় কে? সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিলাম, যাইতে চাই—শুধু যাইতে চাই নয়—খুব যাইতে চাই। কবি যাওয়ার তারিখ এবং সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। এক শুভদিনের দ্বিপ্রহরে কবির সঙ্গে বোলপুর যাত্রা করিলাম।

এত দিন পরে সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া ভাবি, ঘটনাচক্রের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া যিনি অদৃশ্য হস্তে চক্র ঘুরাইতেছেন তাঁর হিসাব কি নির্ভুল! কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবি নাই কখনো বোলপুর যাওয়ার সম্ভাবনা আছে—কবিও নিশ্চয় একটি অপরিচিত কিশোর বালককে বোলপুর লইয়া যাওয়ার দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র হন নাই কিন্তু এমনি ঘটনা সাজানোর কারসাজি যে অপ্রত্যাশিত ভাবে কোথা হইতে কি হইয়া গেল। অজ্ঞাত শক্তির এক ঝাপটে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের এক অপরিণতবুদ্ধি বালক একেবারে সভ্যতার এবং সংস্কৃতির পীঠস্থানে গিয়া উত্তীর্ণ হইল।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে স্নেহ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছেন এ কথাটা কেমন করিয়া যেন সেই বয়সেও বুঝিয়াছিলাম। নচেৎ আশ্রমের ব্যয় সংকুলান করিবার ব্যবস্থা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। দিনের মধ্যে একবার কোন অছিলায় তাঁর কাছে যাওয়া আমার রুটিনের অন্তর্গত ছিল। কখনো কবিতা রচনা করিয়া তাহা সংশোধন করিবার জন্য লইয়া যাইতাম, কখনো "শান্তিনিকেতন সিরিজে"র কোন দুরূহ অংশ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য ধরিয়া পড়িতাম। আশ্চর্য এই, কোন দিন এই সব ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখিয়া বিরক্ত হন নাই—এমন কি 'আর এক সময় আসিও' বলিয়া ঘুরাইয়াও দেন নাই। আগ্রহ সহকারে সব লইয়া বসিয়াছেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে কবিতা সংশোধন করিয়াছেন, "শান্তিনিকেতন সিরিজ" বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিণত বয়সে জগতের অন্যান্য লোকের ব্যবহারের সঙ্গে কবির এই ব্যবহার মিলাইয়া লইয়া মনে মনে ভাবিয়াছি, জগতে এই একজন মাত্র ব্যক্তি দেখিলাম যিনি মানুষের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাকেও ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারিলেন না।

কবি তখন 'শান্তিনিকেতন' নামক বাড়ীটির উপরের তলায় থাকিতেন। এক দিন সন্ধ্যার পর সেখানে ডাক পড়িল। দেখি থিয়েটারের মহড়া চলিতেছে। উন্মুক্ত ছাত জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। সকলের মাঝখানে একটা লম্বা আরাম-কেদারায় কবি দেহ এলাইয়া দিয়া শুইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, তোমাকে অভিনয় করতে হবে। একটু থামিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তা তোমার কোন ভয় নেই, তুমি পারবে।

রবীন্দ্রনাথের "রাজা" যথাসময়ে অভিনীত হইল। সিন-টিনের বিশেষ বালাই নাই, দেবদারুর পাতা, ফুল, ক্রোটনের ঝাড় সব অভাব সারিয়া লইল। অভিনয় দেখিতে কলিকাতা হইতে আসিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন দত্ত—আর কাহাকেও চিনিতাম না। দুই দিন অভিনয়ের মধ্যে একদিন ঠাকুরদাদার ভূমিকা গ্রহণ করিলেন কবি স্বয়ং, আর এক দিন দিনু বাবু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। সুদর্শনার ভূমিকায় অজিতবাবু (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী), সুরঙ্গমার ভূমিকায় লেখক। যত দূর মনে পড়িতেছে কাঞ্চীরাজ হইয়াছিলেন জগদানন্দ রায়।

আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন কবির পদ্মাবক্ষে বোটে বাস করার জীবন শেষ হইয়াছে। কিন্তু শিলাইদহে তখনো কুঠিবাড়িটা আছে। একবার গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে ধরিয়া বসিলাম ছুটিটা কবির সঙ্গে শিলাইদহে কাটাইব। দার্জিলিং যাইবার ব্যবস্থাটা ফাঁসিয়া গিয়া শেষ নাগাদ স্থির হইল যে শিলাইদহে যাওয়া হইবে। সন্ধ্যার পূর্বে ফুটবল খেলার মাঠে দাঁড়াইয়াছিলাম, কবির নিকট হইতে জোর তলব আসিল। কবি বলিলেন, আজ ভোর রাত্রে আমরা রওনা হইব—তুমি খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে আসিয়া শুইয়া থাক। তাহাই হইল। ভোররাত্রে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া আশ্রম হইতে স্টেশনে আসিয়া ট্রেন ধরিলাম এবং বেলা দশটার মধ্যে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পৌছিয়া গেলাম। কবির সঙ্গে দিনুবাবু এবং আমি।

আশ্রমে জুতা পায়ে দেওয়ার রীতি নাই—সুতরাং আমার জুতা ছিল না। বেশ মনে আছে কবি জমিদারি সেরেস্তার বড়বাবুর সঙ্গে আমাকে জুতার দোকানে পাঠাইলেন এবং জুতা কিনিয়া দিলেন। রথীবাবু শিলাইদহ হইতে পিতাকে লইবার জন্য কলিকাতা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। সকালে চট্টগ্রাম মেলে আমরা রওনা হইলাম। কুষ্টিয়া স্টেশনে নামিয়া দেখি আমাদের জন্য ছোট্ট একখানি ষ্টীম লঞ্চ গোড়াই নদীতে

অপেক্ষা করিতেছে। ষ্টীম লঞ্চযোগে গোড়াইয়ের বক্ষের উপর দিয়া দুই তীরের ভাঙন দেখিতে দেখিতে রওনা হইলাম। ক্রমে গোড়াই গিয়া পদ্মায় মিশিল, পাবনা শহর বাম দিকে রহিল, দূর হইতে পাবনা শহরের দোকানের টিনের উপর রৌদ্র পড়িয়া চক্ চক্ করিতে লাগিল—আমরা বোধ করি বেলা একটা আন্দাজ শিলাইদহের ঘাটে পৌছিলাম। ঠিক ঘাটে পৌছিলাম বলিতে পারি না, কেন না ষ্টীম লঞ্চ নদীর তীর পর্যন্ত গেল না। কবি, দিনুবাবু, রথীবাবু সম্ভবত একটা কাঠের সিঁড়ি বহিয়া নামিলেন—আমাকে একজন বরকন্দাজ কোলে করিয়া ডাঙায় নামাইয়া দিল।

কুঠিবাড়ির বর্ণনা আমি আর কি দিব—কবির নানা গল্পের মধ্যে এবং নানা কবিতার মধ্যে শিলাইদহের এবং পদ্মার ছবি উজ্জ্বল হইয়া আছে। আমার কেবল এতটাই মনে পড়ে যে এমন শান্ত এবং নিস্পন্দ গ্রাম আর দ্বিতীয়টি দেখি নাই—দিনের বেলাতেও যেন গ্রামখানি ঘুমাইয়া আছে। অথচ তাই বলিয়া প্রকৃতির প্রাচুর্যের এতটুকু কৃপণতা নাই—কুঠিবাড়ির চারি পাশে গগনচুম্বী মাঠে ধানের ক্ষেতে শ্যামলিমার অশ্রান্ত ঢেউ আর তারই উপর কুঠিবাড়ির গেটের দুই পাশে দুই ঝাউগাছের অবিশ্রাম সোঁ সোঁ শব্দ!

কবি তখন জমিদারির কাজ দেখাশোনার ভার পুত্র রথীবাবু এবং জামাতা নগেনবাবুর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা দরকার। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, ঠাকুর বাবুরা (রবিবাবুদের লক্ষ্য করিয়া) বড় কড়া জমিদার—নিজেরা কলিকাতায় থাকিয়া জমিদারির উপস্বত্ব ভোগ করেন কিন্তু প্রজাদের সুখ-দুঃখের কোন খোঁজখবর রাখেন না এবং এক পয়সা খাজনা কখনো ছাড়িয়া দেন না। ইহার উল্টো ঘটনারই কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। ঘটনাটি যদিচ আমার সামনে ঘটে নাই কিন্তু যাঁদের সামনে ঘটিয়াছে তাঁদের মুখেই আমি শুনিয়াছি এবং তাঁদের মিথ্যা বলিবার কোন হেতু নাই।*

রবীন্দ্রনাথ তখন বোটে থাকিতেন। তাঁহার নিকট একবার নালিশ হইল যে শিলাইদার কয়েক জন প্রজা খাজনা দেয় নাই। জমিদারের সামনে তাহাদের পেশ করা হইল। ধান ভাল হয় নাই, ঘরের চালে খড় নাই ইত্যাদি মামুলি অজুহাত দেখাইয়া যখন তাহারা খাজনা দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইল না, তখন তাহাদের মাথায় যেন সুবুদ্ধির উদয় হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন "তবে আর বাড়ি গিয়ে কি করবো, এখানেই প্রাণ বিসর্জন দেব", এই কথা বলিয়া সশব্দে পদ্মার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কবি একেবারে হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন—ব্যস্তসমস্ত হইয়া বোটের বাহিরে আসিলেন এবং লোকজন দ্বারা জল হইতে সেই ব্যক্তিটির উদ্ধার সাধন করা হইল। বলা বাহুল্য, এইবার খাজনা মকুব হইতে আর বিলম্ব হইল না। প্রজারা জমিদারের এই দুর্বলতার সংবাদ সম্ভবত পূর্বাহ্ণেই সংগ্রহ করিয়াছিল।

আমরা যখন শিলাইদহে ছিলাম তখন কবি "জীবন-স্মৃতি" এবং "অচলায়তন" একসঙ্গে লিখিতেছিলেন। "অচলায়তনে"র নাম প্রথম দিয়াছিলেন "গুরু"। কবি সমস্ত দিন ধরিয়া যাহা যতটা লিখিতেন সন্ধ্যার সময় পড়িয়া শোনাইতেন। কুঠিবাড়ির দোতালা ঘরে সেই সান্ধ্য বৈঠক বেশ মনে আছে। সেখানে লোকের ভিড় ছিল না—শ্রোতা কেবল দিনুবাবু, রথী-দা, প্রতিমা বৌদি, নগেনবাবু, মীরা-দি, আর আমি। কোন কোন দিন কবি একতালার রকের উপর আসিয়া একটা আরাম-কেদারায় আসন গ্রহণ করিতেন, পায়ের কাছে আমি বসিতাম। অনেক রাত পর্যন্ত কবি কত গল্প করিতেন। শান্তি-নিকেতনের আশ্রমে এমন ভাবে একলা গুরুদেবকে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

টুক্‌রো টুক্‌রো অনেক ঘটনাই আজ মনে পড়ে—সবগুলিকে মালার আকারে গাঁথা আজ দুঃসাধ্য হইয়াছে। চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়—বুঝিতে পারি কত বড়লোকের স্নেহের অংশ পাইয়াছিলাম। সেদিন কিন্তু ইহার মূল্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। অনায়াসে লাভ করার ফলে ভাবিয়াছিলাম ইহা বুঝি আমার পাওনা। শুধু আমি নয়—তাঁর সব স্নেহভাজনেরাই নিশ্চয় এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। কত উঁচু হইতে নামিয়া আসিয়া কত নীচে যে আমাদিগকে তাঁহার কোল দিতে হইত, এ ধারণা যদি সেদিন থাকিত!

অনেকেরই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ পয়সাকড়ি সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর রাজোচিত জীবনযাত্রা-প্রণালী এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এই ধারণা আদৌ সত্য নয়। মানুষকে অর্থ দান করিলে মানুষকে যে প্রকারান্তরে ছোট করা হয়, এ-

* আমরা জানি, তিনি যখন পৈতৃক জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন তখন এক বার এক লক্ষ টাকা খাজনা মকুব করেছিলেন এবং সেই জন্যে পুরাতন নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করেছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বিশ্বাস কবির বরাবরই ছিল। সেই জন্ত হাতে করিয়া পয়সাকড়ি কাহাকেও দিতে দেখি নাই। কিন্তু পয়সা-কড়ির ব্যবস্থা যে তিনি করিতেন তার প্রমাণ আমি নিজে। আমি দরিদ্রের সন্তান। আমার আশ্রমবাসের সমস্ত খরচা এবং কলিকাতায় বি. এ. পড়ার সমস্ত ব্যয় কবি জোগাইয়াছেন; এই তথ্য আজ স্বীকার করা প্রয়োজন। তাঁর জীবিতকালে বলার প্রয়োজন হয় নাই কিন্তু আজ বলা দরকার। আর এই পর্যায়ে যে শুধু আমি একলা নয়, আরও আছেন, এ সংবাদও আমার অবিদিত নয়। কিন্তু কবির চরিত্রের এই দিক লইয়া কেহ কোন উল্লেখ করেন নাই।*

এখানেও বলা প্রয়োজন, কবি স্নেহ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অর্থসাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। আগে আসিয়াছিল স্নেহ, পরে অর্থ। নচেৎ মানুষকে ছোট করা হইত। সে কাজ কবি পারিতেন না। তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, যাহাকে তিনি প্রশংসা করিতে পারেন না, তাহার নিন্দা করিতে তাঁর বাধে।

কবি জানিতেন আমি মিরাটে থাকি। শেষের দিকে এলাহাবাদে থাকার কথাটা তাঁর মনে থাকিত না। মিরাট-নিবাসী এক হিন্দুস্থানী অধ্যাপক দেশ দেখিবার জন্ত একবার বাংলা দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি সোজা একেবারে বরিশালে যান, বরিশাল হইতে ঢাকা এবং ঢাকা হইতে কলিকাতা। কলিকাতা আসিয়া তিনি ভাবিলেন দেশ ত দেখিলাম—এখন মানুষ দেখা দরকার। তিনি মনে করিলেন বাংলা দেশে দ্রষ্টব্য মানুষ দুই জন—এক সর্ পি. সি. রায় আর দ্বিতীয় টেগোর। সায়েন্স কলেজে গিয়া পি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা করিলেন, তার পর বোলপুরে গেলেন টেগোরের সঙ্গে দেখা করিতে। ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী হইলেও বাঙালীর মত করিয়া ধুতি পরিতেন, রংও ফর্সা এবং মুখে বাঙালীসুলভ লাবণ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাঙালী মনে করিয়াছিলেন। খানিক নিজের ঝোঁকে কথাবলার পর যখন আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন তিনি অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন, তখন কবির হুঁস হইল। ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিলেন যে আগন্তুক যে বাঙালী নন সেকথা এতক্ষণ বলেন নাই কেন? অধ্যাপক বলিলেন, "আমি আপনার কথার মাঝখানে বাধা দিতে চাহি নাই। আর আমার কোন অসুবিধাও হয় নাই। প্রত্যেক কথাটি না বুঝিলেও কবির মন্তব্য মোটের উপর আমি বুঝিতে পারিয়াছি।" তখন ইংরেজীতে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। অধ্যাপক মিরাট হইতে গিয়াছেন শুনিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, Do you happen to know one Mr.—বলিয়া আমার নাম করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক আমাকে বিশেষ ভাবে চিনিতেন। সুতরাং তিনিও বেকুব হইলেন না, কিন্তু মিরাটে ফিরিয়াই তিনি সোজা আমার দরজায় আসিয়া হানা দিলেন। আমার বাহুমূলে সজোরে নাড়া দিয়া ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ট্যাগোর আপনাকে কেমন ক'রে জানলেন? আমি হাসিয়া জবাব দিলাম, "আপনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না? টেগোরের মত জগৎ-জানিত লোক আমাকে জান্‌লেন কেমন ক'রে? কিন্তু বিশ্ববিশ্রুত লোকেদেরও কি আত্মীয়স্বজন বা সন্তান থাকে না? তাদের তিনি চেনেন কোন গুণের জন্ত নয়, কেবলমাত্র সন্তান ব'লেই তাদের চেনেন। আমার বেলায়ও সেই কথা।"

আজ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমাদের দেশের ললিতকলার সৌজন্যের, সহবতের এবং সংস্কৃতির একটা অধ্যায় নিশ্চিতরূপে শেষ হইয়া গেল। গত অর্ধ শতাব্দীরও অধিক, শুধু বাঙালী কেন, ভারতবাসীই বা বলি কেন, জগতের লোক মানব-চরিত্রের এই শোভন এবং সুন্দর দিকের জন্ত রবীন্দ্রনাথেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। তাঁহার নির্দেশই ছিল এ বিষয়ে সর্বজনমান্য। আবার কত দিন পরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা এই দিকের যবনিকা উত্তোলন করিবেন কে বলিতে পারে!

কিন্তু কি কারণে রবীন্দ্রনাথের বাণী সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছিল তাহার মর্মমূলে পৌঁছিতে হইলে সর্বাগ্রে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি ভারতের ঋষিদের বাণী, ভারতের অন্তরাত্মার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই মন্ত্রের তিনি ছিলেন উদ্গাতা। তাঁহার বিধাতা দেশ কাল পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলেন না বলিয়াই সকল দেশের এবং সর্বকালের মানুষের মনকে তিনি স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। সর্বত্র ঈশ্বরানুভূতি যাহা উপনিষদের বাণী অথবা যাহাকে তিনি 'বনবাণী' নাম দিয়াছিলেন, তাহাই ছিল তাঁর উপজীব্য। তাই "গীতাঞ্জলি"র যখন ইংরেজী তর্জমা পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইল তখন সে দেশের লোক একেবারে মুগ্ধ এবং আশ্চর্য হইয়া গেল। সে কেবলমাত্র তাঁর কাব্যের পদলালিত্যের জন্ত নয়—সে কাব্য তাদের নিকট জীবনের এক নূতন অর্থ বহন

---

* আমরা জানি, তিনি পরলোকগত জনৈক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাকে এক সময় মাসিক এক শত টাকা ক'রে সাহায্য করতেন।—প্রবাসী-সম্পাদক।

করিয়া আনিল, এক নূতন আলোকের সন্ধান দিল। সমগ্র "গীতাঞ্জলি" গ্রন্থে এবং রবীন্দ্রনাথের বহু লেখায় এবং চিঠিপত্রে পর্যন্ত তাঁর জীবনের এই একমাত্র বক্তব্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তার বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, তার স্থানাভাবও আছে। তাই নীচে গুটিকয়েক উদ্ধৃত করিতেছি :—

'চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে
বল্‌তে যেন পাই।'

* * *

'তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে বল্‌তে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে ব'লতে দাও।'

* * *

'প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।'

* * *

'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই,
শয়নে স্বপনে।'

* * *

'ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়
তবু জানো, মন তোমারে চায়।'

* * *

'আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎসভায়
এইটুকু মোর স্থান।'

* * *

'আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রবো।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো।'

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই
মনের মতো ক'রে।

* * *

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

* * *

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

*

যাবার দিনে এই কথাটি
ব'লে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।

*

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

(When I go from hence let this be my parting word.)

একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে আমরা যে অলঙ্কার দিই তার রত্নগুলি ঠাকুরেরই সৃষ্টি; আমাদের পূজা তাঁকে ভূষণ পরায়—সেই ভূষণের রত্নগুলি আমাদের মনে, সে তো একটি রত্ন নয়। যত রত্ন সাজাতে পারবো ভূষণের মূল্য ত ততই বেশী হবে—অর্থাৎ পূজার ষোড়শোপচার ত ততই পূর্ণ হবে। রামচন্দ্রের পূজায় একশো পদ্ম থেকে একটি পদ্ম কম পড়েছিল ব'লে বিপত্তি ঘটেছিল, মানবপ্রকৃতিতেও একশো পদ্মই আছে, সবগুলিই পূজায় লাগে। * * *"

আর এইগুলি শুধু তাঁর কথা নয়, তাঁর জীবনও বটে। রাত্রি চার ঘটিকার পর তাঁর শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস ছিল—বোধ হয় অত্যন্ত অসুস্থ না হইলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। তার পর ঘণ্টাখানেক সময় তাঁর নিয়মিত সাধনভজনে কাটিত। তাই তিনি একখানি চিঠিতে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, " * * জরা চিরজীবন তোমাকে স্পর্শ না করুক, স্বচ্ছ থাক তোমার বুদ্ধি, প্রশস্ত হোক্ তোমার হৃদয়, উদার হোক মানুষের সঙ্গে তোমার ব্যবহার—এক দিন যাঁর সঙ্গে তোমার মিলন হবে তিনি যেন নির্মল মুক্তির পথেই তোমাকে অগ্রসর ক'রে দেন এই আমার আশীর্বাদ।"

অসংখ্য সংস্কারপ্রপীড়িত আমাদের জাতির উপর সংস্কারমুক্ত কবির এই আশীর্বাদ!

কয়লার মালগাড়ী

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ভারতের বিভিন্ন স্থানের ইংরেজ বণিক সমিতিদিগের সংযুক্ত সভা এসোসিয়েটেড চেম্বার অব্ কমার্সের কলিকাতার বিগত অধিবেশনে মিঃ জে. বি. রসের এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কয়লার জন্ত মালগাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা শিল্পের প্রয়োজনের দিক হইতে নিয়ন্ত্রিত করা হউক। বর্ত্তমানে যত মালগাড়ী হাতে থাকে তাহা পর পর নিম্নলিখিত কার্য্যে বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্বানুসারে দেওয়া হয়, যথা:—জাহাজে রপ্তানি, রেলপথ, সরকারী প্রয়োজন ও বিভাগসকল, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, সাধারণের প্রয়োজনমূলক প্রতিষ্ঠান (যেমন মিউনিসিপ্যালিটি, জলের কল, গ্যাস ও বিদ্যুতের কারখানা) এবং সাধারণ সরবরাহ (public supply)। এই সাধারণ সরবরাহের ভিতর দিয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের রন্ধনের কার্য্যে ব্যবহৃত পোড়া কয়লা (soft coke) চালান হয়। ইহাতেই কলিকাতায় পোড়া কয়লা পাঁচ আনা ছয় আনা দামের স্থলে পাঁচ সিকা মণ অবধি বিক্রীত হইতেছে। মিঃ রসের কথা সরকার যদি মানিয়া লন, তাহা হইলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে অর্থাৎ পাটকল, চা-বাগান, কাপড়ের কল প্রভৃতি এখন পোড়া কয়লার সমপর্য্যায়ভুক্ত আছে, এগুলিও তখন উপরে উঠিয়া যাইবে এবং সকলকার ক্ষুধা মিটাইয়া আমাদিগের পোড়া ভাগ্যে পোড়া কয়লা জুটিবে। অথচ পোড়া কয়লাকে দরিদ্রের নিত্যপ্রয়োজনীয় হিসাবে অনেক উচ্চে স্থান দেওয়া উচিত। মিঃ রস বলিয়াছেন, কয়লার ব্যাপারটি সরকার কর্ত্তৃক আগাগোড়া পরিচালিত হউক। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ও কিছু দিন পর পর্য্যন্ত তাহাই হইয়াছিল এবং সেই সময়কার কয়লাশিল্পের বিবরণ মহারাণীর রাজ্যভার গ্রহণের পর ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় হইয়া আছে। তখন হাওড়া শহরের ইংরেজ ঢালাই কারখানাওয়ালারা পঞ্চাশ টাকা টন দরে হার্ড কোক কিনিয়াছিলেন আর স্বর্গীয় নফরচন্দ্র আটা প্রভৃতি দেশীয় ঢালাই কারখানাওয়ালাদিগকে এক-শ কুড়ি টাকা পড়তায় লরী করিয়া ঝরিয়া হইতে হার্ড কোক আনাইতে হইয়াছিল। বাঙালী কয়লার খনির ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করিয়াছিল। স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র সরকারের চল্লিশটি খনি ছিল। তিনি পৃথক্ জাহাজ ভাড়া লইয়া কয়লা বোঝাই করিয়া এডেন, পোর্টসৈয়দ প্রভৃতি বন্দরে চালান দিতেন। বোম্বাই যেমন কাপড়ের কলের ব্যবসায়কে ধরিয়া বড় হইয়াছে, বাংলা তেমনই কয়লার ব্যবসায়ের সাহায্যে উন্নতি করিতেছিল। এই লাভের টাকায় বাঙালী ধনীরা এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, দেশলাইয়ের কল, চা-বাগান প্রভৃতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সরকারের মালগাড়ী-সরবরাহের নীতি বাঙালীর উদীয়মান শিল্পপ্রতিভাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিল। নহিলে আজ, 'বাঙালী ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ', এই আক্ষেপের কারণ থাকিত না, এবং বেকারের আর্ত্তনাদে বাংলার গগন পবন পূর্ণ হইত না। মিঃ রস সেই বহুনিন্দিত যুগের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন। তাহা অপেক্ষা প্রত্যেক কয়লার খনিকে তাহার ভিত্তি (Basis—ইহা সাধারণতঃ যত কয়লা উত্তোলিত হয় তাহার উপর নিরূপিত হয়) অনুসারে মালগাড়ী দেওয়াই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। খোলা বাজারে যাহার যেমন প্রয়োজন, সে কিনিয়া লইতে পারে। রেলপথগুলির টাকা কম নাই; তাহারা গরীবের পোড়া কয়লা বন্ধ রাখিয়া আগের ভাগের কয়লা লয় কেন? যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হইলে সরকার সকলের উপর যুক্তিসঙ্গত ভাবে কর বসান। সমগ্র দেশের বহনযোগ্য যে ভার, তাহা এক শ্রেণীর উপর অধিক চাপান হয় কেন?

পাটকলের লাভ, কৃষক ও বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

এই সময়ে যে সকল অর্দ্ধবাৎসরিক হিসাব বাহির হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বহু পাটকল সরকারকে অতিরিক্ত লাভকর দিয়া শতকরা ২০ টাকা লভ্যাংশ দিতেছে। অতিরিক্ত লাভকরের পরিমাণ বড় কম নহে, লাভের শতকরা ৬৬⅔ অংশ। এত কর, এত লভ্যাংশ কি করিয়া সম্ভব হয়? পাটের দর কম রাখিয়া চট ও থলিয়ার দর খুব চড়া রাখিতে না পারিলে ইহা কখনও হইতে পারে না। যে চাষী রৌদ্রে বৃষ্টিতে চাষ করিতেছে, এক গলা জলে দাঁড়াইয়া পাট কাটিতেছে, সে যৎসামান্য পাইতেছে, আর কলওয়ালা পাটটি কলে একবার ঘুরাইয়া আনিয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতেছে। বাংলা-সরকার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ সিবিলিয়ান মিঃ ফিনলোর সভাপতিত্বে যে পাট-তদন্ত-কমীটি নিয়োগ করেন, তাহা ১৯২০-২১ খৃঃ অঃ হইতে ১৯৩১-৩২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পাট ও পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রস্তুত করেন :—

	টন প্রতি কাঁচা পাটের কলিকাতার দর	পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের টন প্রতি দর
১৯২০-২১	২১৪৲	৬৪১৲
১৯২১-২২	২১৪৲	৪৬৫৲
১৯২২-২৩	৩২৩৲	৬০২৲
১৯২৩-২৪	২৯৬৲	৫৬৯৲
১৯২৪-২৫	৩৭৮৲	৬৪০৲
১৯২৫-২৬	৫৬৩৲	৭২৬৲
১৯২৬-২৭	২৭৫৲	৬১৮৲
১৯২৭-২৮	২৭৫৲	৬০৬৲
১৯২৮-২৯	২৯৬৲	৬২৭৲
১৯২৯-৩০	২৬৮৲	৫৪৩৲
১৯৩০-৩১	১৪৭৲	৪১৪৲
১৯৩১-৩২	১৩৯৲	৩৩৩৲

গত মহাযুদ্ধের সময়ে কৃষক গড়ে পাঁচ টাকা মণ পাটের দর পাইয়াছিল, কিন্তু পাটকলগুলি গড়ে শতকরা ৯০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছিল। এখনও কৃষক-শোষণ সেই ভাবেই চলিতেছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, পূর্ব্বে সমস্ত লাভ কলওয়ালা হস্তগত করিতেছিল, এখন সরকার একটা মোটা অংশ লইতেছেন। পাটের উপযুক্ত মূল্য যদি কৃষক পাইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশ আজ ভারতের এক শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন প্রদেশ হইতে পারিত। পাটের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে—(১) পাটচাষীর শতকরা ৯৫ জন মুসলমান। (২) ভারতের সমগ্র মুসলমান-সংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ জন বঙ্গদেশে বাস করে, এবং (৩) ইংরেজের সর্ব্বাধিক মূলধন এদেশে রেল পথের পর পাটকলেই নিবদ্ধ। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ পামার্ষ্টন বলিয়াছিলেন, হিসাবের অঙ্কের উপর দেবতারও কথা চলে না, "Even gods have no power over figures।" কত বহু লোকের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে ও কত প্রভূত পরিমাণ অর্থ তাহাদিগের নিকট হইতে অন্যায় ভাবে লওয়া হইয়াছে, এই হিসাবের দ্বারা বিচার করিলে অকুণ্ঠকণ্ঠে বলা যায় যে, বঙ্গদেশে পাটচাষীকে যে-ভাবে শোষণ করা হইয়াছে বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর কোন অংশে তদ্রূপ শোষণ সম্ভবপর হয় নাই। বাংলার ব্যবস্থাপক সভা দুইটির মুসলমান সদস্যদিগের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহাদিগের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, মূক স্বধর্ম্মীর স্বার্থ ও ইংরেজ পাটকলওয়ালাদিগের স্বার্থ পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির বিষয়ে হিন্দুর স্বার্থ ও ইংরেজ বণিকের স্বার্থ এতটা পরস্পরবিরোধী নহে। সুতরাং গত কয়েক বৎসর মন্ত্রিমণ্ডল ইউরোপীয় সদস্যদিগের সমর্থনে চালিত হওয়ায় বাংলার মুসলমানের আর্থিক ক্ষতিই অধিক সাধিত হইয়াছে। তাহার একটি নিদর্শন ১৯৩৮ খৃঃ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের অর্ডিনান্স। ইহাতে প্রধানতঃ কয়েকটি ভারতীয় পাটকলওয়ালাকে ইংরেজ পাটকল-ওয়ালাদিগের সমিতির নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য করা হয়। ঐ সমিতি তৎপূর্ব্বে লর্ড উইলিংডনের গবর্ণমেণ্টকে দুই বার অনুরোধ করিয়াও এ বিষয়ে রাজী করাইতে পারেন নাই দুইটি বিবদমান শক্তির কোন্‌টিকে মন্ত্রিমণ্ডল সাহায্য করিলেন? তাহা ছাড়া আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ কমাইবার চেষ্টা গত ফসলের পূর্ব্বে ইহারা অত দিন ধরিয়া কিছুই করেন নাই। লোকমত অত্যন্ত অসহিষ্ণু হওয়ায় ইহারা গত ফসলে প্রথম হাতে খড়ি করিলেন। তাহাতে "বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া"র মত পাটচাষী উপযুক্ত না হইলেও অন্য বৎসরের তুলনায় ভাল

দর পাইয়াছে কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল যাইবার পূর্ব্বে মরণ কামড়ের মত নির্দ্দেশ দিয়া গেলেন যে, গত বৎসরের দ্বিগুণ জমিতে এবার পাটচাষ করিতে দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ইউরোপীয়দিগের ভোটের উপর নির্ভর করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের অবিলম্বে এই ব্যবস্থা রদ করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের অনধিক জমিতে পাটচাষের বন্দোবস্ত করা উচিত; নতুবা আগামী ফসলের পাটের দাম অনেক কম হইবে। ইহা করিতে গেলে অবশ্য ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ তুমুল আন্দোলন করিবেন ও শেষ অবধি হয়ত গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিবেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের দেশবাসীর মঙ্গল-সাধনে বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। পাটের দর উঠিলে মুসলমান পাটচাষীর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, দোকানদার প্রভৃতি উপকৃত হয়। ১৯২৫-২৬ খৃঃ অব্দে পাটের দর ২৫ টাকা মণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সে বৎসর যত ঢেউ-টিন পূর্ব্ববঙ্গে রপ্তানী হইয়াছিল তত কলিকাতার বন্দরের ইতিহাসে কখনও হয় নাই। কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে কাপড়ের চালানও সে বৎসর অভূতপূর্ব্ব হইয়াছিল। ঢালাই কারখানা হাওড়ার একটি প্রধান শিল্প। সে বারের মত ঢালাই লৌহের কড়ার বিক্রয় কোন সময়ে হয় নাই। কেবল মাত্র পাটসমস্যার সমাধান করিতে পারিলে বাংলার সুদিন ফিরিয়া আসে।

হাসি ও অশ্রু

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

সন্ধ্যার আগেই চোখ বুজিয়া শুইয়া আছি। ঘুম আসিবে না জানি, তবু চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকিতেই ভাল লাগিতেছিল, শীতের সায়াহ্নে, কন্‌কনে একটা শীতলতাও যেন শরীরকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। এ সময় শুইয়া থাকা ছাড়া করিবারই বা কি আছে?

'আপনার চিঠি।'

এক মুহূর্ত্তে অবসাদ দূর হইয়া গেল, ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম; কালেভদ্রে এই চিঠির মধ্য দিয়াই বাহিরের সহিত আমাদের যোগসূত্র রক্ষা হয়। কিন্তু আমাকে চিঠি লিখিবার ত কেহ নাই। তবে আজ কে লিখিল? ভুল হয় নাই ত!

লাল খাম, উপরে সোনালি অক্ষরে 'শুভ বিবাহ' লেখা রহিয়াছে। আতরের গন্ধে চিঠিখানা ভুর্‌ভুর্ করিতেছে। হ্যাঁ, আমার নামেই চিঠি, ভুল হয় নাই।

চিঠিখানা হাতে করিয়াই কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম, কল্পনানেত্রে একখানা হাস্যকোলাহলমুখরিত বিবাহবাড়ী মনে পড়িল। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা সেই বিবাহ বাড়ীখানাকে আজ ঘিরিয়া রাখিয়াছে!

কোন সময় অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিলাম, চিঠির স্বাক্ষরের দিকে চোখ পড়িতেই চম্‌কাইয়া উঠিলাম, একনিশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিলাম। বীরেশ রায় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মেখলার বিবাহে আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন।

অনেক বার পড়িয়া পড়িয়া চিঠিখানা প্রায় মুখস্থ হইয়া গেল, খুলনা সেনহাটি ৺ নিবারণ দাশ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র প্রভাসের সহিত উনিশে মাঘ মেখলার শুভ বিবাহ! পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি গ্রহণ না করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ! লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদই বাঞ্ছনীয়, ইত্যাদি সমুদয় কথাই যথাযথ সন্নিবেশিত আছে।

দুই-শ এক নম্বর রাসবিহারী এভিন্যু, হয়ত ছাদের উপর ভিয়েন বসিয়াছে। বীরেশবাবুর অবস্থা সচ্ছল, ছোট মেয়েটির বিবাহে নিশ্চয়ই ভাল খরচ করিতেছেন। উনানের তাতে কার্ণিশের টবের ফুলগুলো শুকাইয়া উঠিবার আশঙ্কায় টবগুলো নিশ্চয়ই সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। ছোট বেলার ঝাড়টিতে—যেটা আমি নিজের হাতে লাগাইয়াছিলাম, হয়ত সেটাতে ফুল ফুটিয়াছে; কে জানে, হয়ত ফোটে নাই।

নীচে বাগানের পাশে প্রশস্ত উঠানে নিশ্চয়ই বিবাহের আসর বাঁধা হইয়াছে। মেখলার ছোট কাকীমা শান্তি-নিকেতন হইতে ছবি আঁকা শিখিয়াছেন, আজ আলিপনার

মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেন নাই।

সম্মুখের মাঠে ত্রিপল খাটাইয়া হয়ত অভ্যাগতদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। কর্মব্যস্ত কত লোক আসিতেছে যাইতেছে, কত মহিলা, কত বালিকা, কত শিশু:বিচিত্র রকমের বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বিয়েবাড়ী সরগরম করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও এতটুকু অভাব নাই, এতটুকু খুঁৎ নাই, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে মেখলার বিবাহ হইতেছে।

আজ বাইশে মাঘ, তবু উনিশে মাঘের আশায় আকাঙ্ক্ষায় সমুজ্জ্বল বিবাহ-বাড়ীখানা চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। ভাঁড়ে ভাঁড়ে দই সন্দেশ আসিতেছে, রন্ধনের সুমিষ্ট গন্ধে চারি দিকের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। গেটের সম্মুখে নহবৎ—হ্যাঁ, নহবৎ নিশ্চয়ই বসিয়াছে, বীরেশ রায়ের আভিজাত্যজ্ঞান আছে, কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহে তিনি কোনো অসম্পূর্ণতা রাখিবেন না, আড়ম্বরের কোনো ত্রুটি রাখিবেন না; নানা রকম বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, পাড়া-প্রতিবেশী হয়ত বা বিরক্তই হইতেছে, বিশেষ মেখলাদের পাশের বাড়ীর যে ছেলেটির ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ আছে, সে হয়ত ক্ষেপিয়াই গিয়াছে।

চিঠিখানা উল্টাইয়া-পালটাইয়া আবার পড়িলাম, তার পর পকেটে রাখিয়া দিয়া ঝুপ্ করিয়া শুইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া দিলাম।

এই সমস্ত চিন্তার অন্তরালে যে চিন্তা বার বার মাথা তুলিতে চাহিতেছিল, আর তাহাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিলাম না। মেখলার মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

রক্তাম্বরপরিহিতা, ললাটে চন্দনসজ্জা, রত্নালঙ্কার-ভূষিতা মেখলার অধরেও কি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে? হয়ত ওঠে নাই, হয়ত উঠিয়াছে, এ চিন্তায় আমার লাভ কি? তবু মেখলার বধূমূর্ত্তিকে মন হইতে সরাইতে পারিলাম না।

বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় এক বৎসর আগেকার কথা। আমার হাতের মধ্যে নিজের ঘর্মসিক্ত শীতল ভীরু হাতের মুঠাটি রাখিয়া মেখলা বলিয়াছিল, অন্তরদেবতাকে সাক্ষী করিয়া সে আমাকেই হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে, জীবনে সে অন্যের হইবে না!

পাগ্‌লী মেয়ে! কি আছে আমার, যে সে আমাকে আত্মসমর্পণ করিবে! ছোট মেয়ে, অন্তরদেবতা কাকে বলে তাও জানে না, আত্মসমর্পণ কাকে বলে, তাও জানে না, সবই যেন মুখস্থ কথা বলে!

কিন্তু মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না! তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিয়া বলিয়াছিলাম, 'কিন্তু মেলা, আমার যে কিছু নেই, আমি যে নিঃস্ব!'

'কিছু নেই? কতকগুলো টাকা থাকাই কি যথার্থ থাকা?' মেখলার রাগের যেন সীমা রহিল না, 'তোমার মত বিদ্যে বুদ্ধি আর মহৎপ্রাণ ক'জনের আছে?'

'কিন্তু তাতে ত সাংসারিক দুরবস্থা ঘোচে না মেলা, তুমি যে অনেক কষ্ট পাবে!'

'আমি সব জানি গো জানি, সব জেনেই তোমাকে ভালোবেসেছি—'

তাদের বাড়ীর কাছেই মেসে থাকিতাম। বীরেশ-বাবু আমাদের গ্রামের লোক। সেই সুবাদে তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকিতাম। সে বাড়ীর পর্দ্দা আমার কাছে অনেক দিনই উঠিয়া গিয়াছিল, কাজেই মেখলাকে যখন-তখন কাছে পাওয়ার কোনো বাধা আমার ছিল না।

এম-এ পাস করিয়াছিলাম, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়া রাজদ্বারে বার-দুই আতিথ্য গ্রহণ করার ফলে কোথাও কোন কাজ স্থায়ী হইল না। সুতরাং মেসের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইবার সামর্থ্য ছিল না। নিজের আহার্য্য নিজেই স্টোভে রাঁধিয়া লইতাম, ফলে বহু দিনই উপবাসী থাকিতে হইত। তাই লইয়া মেখলা কত অনুযোগ করিয়াছে, কত দিন গোপনে ভৃত্যের হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়াছে!

প্রতিদিন প্রতিকাজে তাহার অন্তরের স্পর্শ অনুভব করিয়াছি, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমি ছিলাম লেবার পার্টির এক জন নেতা, অথচ অর্থাভাবে কত কাজ যে কত সময় অচল হইয়া পড়িত, তাহার সংখ্যা নাই। নিজের গায়ের গহনা খুলিয়া দিয়া মেখলা আমাকে কত সাহায্য করিয়াছে, আমি তাহার দান লইতে অসম্মত হইলে তাহার অভিমানের সীমা থাকিত না। আমি যে তাহাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া, দেশসেবার অযোগ্য মনে করিয়াই তাহার দান গ্রহণ করিতেছি না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার চোখে যখন জল আসিয়া পড়িত, তখন তাহার সেই শ্রদ্ধার দান আমাকে গ্রহণ করিতে হইত। অসতর্কতার ফলে গায়ের গহনা হারাইয়াছে বলিয়া নিঃশব্দে কত তিরস্কারই না সে সহিয়াছে!

দেশকে কি ভালই সে বাসিত, আর ভালবাসিত দেশের যথার্থ সেবককে।

ইহার পর পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া আত্মগোপনের প্রয়োজন হইল; পলাইলাম। তাহার পূর্ব্বে ছোট্ট এক খণ্ড কাগজে মেখলাকে গন্তব্য স্থানের বিষয় একটু জানাইয়া আসিলাম। নয়ত পাগ্‌লী মেয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া হয়ত শেষ হইয়া যাইবে!

কারাবাস আমার জীবনে নূতন নয়, কিন্তু তখন বন্দীজীবনে বাহিরের কোনও আকর্ষণ ছিল না, এখন কারামুক্তির জন্য প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করি; আমার মুক্তির সঙ্গে মেখলার জীবনের আনন্দ নির্ভর করিতেছে। প্রায় ছয় মাস তাহাকে দেখি নাই; আমার এ কঠোর জীবনে তাহা হয়ত সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু মেখলার কোমল প্রাণে এই আঘাত যে কত বড় হইয়া বাজিয়াছে, ভাবিলে আমার মত পাষাণেরও চোখে জল আসিয়া পড়ে। তাহার সেই আনন্দময় তরুণ জীবন, আজ আমার জন্যই বিষাদময়, ম্লান!

এই সপ্তাহেই কম্‌রেড্‌ অমর মিত্র দেখা করিতে আসিয়াছিল। ছেলেটা আগে ছিল ভাল, এখন তাহার অহঙ্কারের সীমা নাই, আমার সম্মুখে রূঢ় স্বরে সে বলিল যে বীরেশ রায়ের মেয়েই আমাদের গুপ্ত ঠিকানা পুলিসকে জানাইয়াছে!

সহকর্ম্মী বলিয়াই তাহাকে অক্ষত দেহে যাইতে দিয়াছি, কিন্তু বলিয়া দিয়াছি তাহার এই মনোভাব পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত সে যেন আমার সম্মুখে আর না আসে! সেও দৃঢ়স্বরে জানাইয়া গিয়াছে যে, অকাট্য প্রমাণ সে আমাকে দেখাইবে! কি স্পর্দ্ধা ছেলেটার!

হয়ত লুকাইয়া থাকার যোগ্যতা ছিল না, ধরা পড়িলাম, তার পর সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে বাস করিতেছি। দিব্যি আছি। মেসের ঘরভাড়ার তাগিদ নাই। দুই বেলা স্টোভের উপর কি চড়াইব তাহার ভাবনা নাই; শুধু একটা ভাবনা ছিল মেখলার জন্য, আজ তাহাও ঘুচিল, যাক্—বাঁচা গেল।

জেলে আসিয়া মেখলার মাকে খান দুই চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে একটু স্নেহ করিতেন। সেই দাবি লইয়া লিখিয়াছিলাম তাঁহারা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে বড় সুখী হইব। কিন্তু চিঠির কোন উত্তর আসে নাই। তিনি নিজে যে আসেন নাই সে কথা বলাই বাহুল্য! কিন্তু সত্যই কি মেখলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে? এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? ইহা অসম্ভব! মেখলার আত্মসমর্পণ কখনও ঝুটা হইতে পারে না।

দু-হাতে দু-গাছা চুড়ি, ডুরে শাড়ী পরা, মাথার দু-পাশে দুটি বিনুনি ঝোলানো মেখলার সেই অনুরাগ-রাঙা হাসিমুখ যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই মনে হইল মিথ্যা, মিথ্যা এ চিঠি মিথ্যা! ইহা কখনও সম্ভব নয়, ইহা অসম্ভব!

খুট্‌ করিয়া আলো নিবিয়া গেল, চারি দিক্‌ নিস্তব্ধ হইয়া আসিল; অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রভাতে ঘুম ভাঙিয়াই দেখিলাম মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, মনে হইল রাত্রে কি একটা দুঃস্বপ্নই দেখিয়াছি! মেখলা, সে নাকি অন্যের হইতে পারে! সে যে আমারই পথ চাহিয়া দিন কাটাইতেছে, জন্মজন্মান্তর হইতে সে আমার! সে নাকি আবার অন্যের হইতে পারে!

নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পকেটে হাত দিতেই খচ্‌ করিয়া চিঠিখানা হাতে ঠেকিল, তবে কি স্বপ্ন নয়? তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া আনিলাম, লাল বর্ণের সুগন্ধি শুভ পত্রিকাখানি যেন আমাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। চিঠিখানা আবার পড়িলাম!

তবু এ মিথ্যা! মিথ্যা! কাহার যেন গভীর ষড়যন্ত্র! ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না।

সম্মুখেই একখানা খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সেখানা হাতে তুলিয়া লইতেই বড় বড় অক্ষরে 'শুভবিবাহ' লেখা চোখে পড়িল। খুলনা সেনহাটি নিবাসী ৺নিবারণ দাশগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র প্রভাস দাশগুপ্ত আই-সি-এসের সঙ্গে বীরেশ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা মেখলার শুভ বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি কে কে বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, বীরেশ বাবু কন্যার বিবাহে কিরূপ প্রচুর আয়োজন ও সমারোহ করিয়াছেন, সমস্ত ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে। নবদম্পতীর মুখচ্ছবিও ছাপা হইয়াছে, কি সুন্দর চেহারা প্রভাসের! প্রতিভায়, বুদ্ধিমত্তায় সমুজ্জ্বল দীর্ঘ সৌম্য চেহারা! প্রভাস একখানা কৌচে বসিয়া আছে, কাছে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া রত্নালঙ্কারভূষিতা, রক্তাম্বরপরিহিতা মেখলা বধূবেশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। কী চমৎকার মানাইয়াছে! মাণিকজোড় কথাটি যেন আজ সার্থক হইয়াছে!

কিন্তু মেখলার ওষ্ঠাধরে কি সত্যই তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে! নয়নের দৃষ্টিতে অন্তরের গোপন ব্যথার আভাস

মাত্র কি ফুটিয়া ওঠে নাই! একি আমার দৃষ্টির ভুল, না সত্যই?

অন্তরের পরিতৃপ্তিতে মেখলার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বেদনার ছায়ামাত্র নাই। তাহার অধরে একটু বেদনার আভাস, নয়নে একটু বিষাদের চিহ্ন দেখিলে আজ আমার সমস্ত বেদনা সার্থক, পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। মেখলা অন্যের হইয়াছে হোক্, এ জীবনে তাহাকে আমি পাইব না, না-ই বা পাইলাম, তাহাতেও কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু বিবাহ-রজনীতে স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মেখলার অধরে পরিতৃপ্তির অম্লান হাসি দেখিয়া মনে হইল এ জীবনটা নিরর্থক, কারাবাস নিরর্থক, কারামুক্তি নিরর্থক, এ জীবনকে সার্থক করিবার জন্য এ জগতে কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।

কিন্তু মেখলা সুখী হোক্, এই আশীর্ব্বচন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের অভিব্যক্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ক্ষুদ্র একটা বীজ, প্রাণের টানে মাটি শুষে আকাশের আলোবাতাস নিঙ্ড়ে আপনাকে গ'ড়ে তোলে। মানুষও তাই করে, তবে কতকটা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে, তার মননশক্তির বশবর্তী হয়ে। আমাদের দেশে পরিচয় গ্রহণের একটা প্রচলিত রীতি আছে—পিতার নাম ও গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করা। জৈব-বিজ্ঞানীও ওই প্রশ্ন করেন—Heredity বা বংশপরিচয় আর Environment বা পরিস্থিতির সংবাদ খোঁজেন কোনো জীবের তথ্য সন্ধানের জন্যে। রবীন্দ্রকাব্যে কোন্ পথ দিয়ে প্রেম-জাহ্নবী সাগরসঙ্গমে উত্তীর্ণ হয়েছে, উজানে বৈঠা টেনে সেই ধারার গঙ্গোত্রীতে একবার উপনীত হওয়া যাক্।

পৈত্রিক উত্তরাধিকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যানুভূতি, গভীর অধ্যাত্ম দৃষ্টি এবং সেই প্রবল গতিশক্তি যা অন্তরকে তীর্থযাত্রী করে, নিত্য নব জ্ঞান সৌন্দর্য ও অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হিমারণ্যে ভ্রমণ ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে পর্যটন পর্যবসিত হয়েছিল ধ্যানের অচলাসনে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যে পিতৃদেবের সঙ্গে ডালহাউসি পাহাড়ে গিয়েছিলেন এবং এই পথিক-ধর্মে পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম দীক্ষা। উত্তরকালে বিশ্ব-পরিক্রমার মধ্যে কবির ধ্যানের আসন অটল ছিল তাঁর অন্তরে। এই ত্রিবিধ আত্মিক সম্বল নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করলেন যে-যুগে সে সময়ে পূর্বপশ্চিমের সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র হ'ল এই ভারতবর্ষে, পরাধীনতার অন্তরালে। রামমোহন-প্রবর্তিত যে সার্বভৌমিক ধর্মের বীজ উপ্ত হ'ল বাংলা দেশে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাকে অঙ্কুরিত ও পরিপুষ্ট করলেন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদে। উপনিষদের মন্ত্রগুলি, রবীন্দ্রনাথ আশৈশব অন্নজলের মতই নিত্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে এসেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান ও খ্রীষ্টধর্মের পঞ্চধারা। রবীন্দ্রনাথ আজন্ম অধ্যয়নশীল ছিলেন। বোঝা ও না-বোঝার ভিতর দিয়ে বাল্যে ও কৈশোরেই পাশ্চাত্য কবিদের রচনার সঙ্গে তাঁর হয়েছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তার সঙ্গে মিলিত হ'ল প্রাচীন যুগের ইতিকথা, সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের রসপ্রস্রবণ। গানের মজলিস ও সাহিত্যিক বৈঠকের পীঠস্থান ছিল জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসন, কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রসাদে। এইরূপ সমসাময়িক ও পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে তাঁর কাব্যজীবনের সূত্রপাত।

"জল পড়ে, পাতা নড়ে" এই লাইনটি কবির জীবনীতে—'আমার জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা।' এই মিত্রাক্ষরযুক্ত পদটুকু হ'ল তাঁর 'আগুনের পরশমণি।' একটি অতি ক্ষীণ স্পন্দনের ছন্দানুবর্তিতায় কী প্রবল প্রকম্পন জেগে উঠতে পারে, সে রহস্যের কথা শুনি গণিত-বিজ্ঞানের কাছে। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাণে নবসৃষ্টির আনন্দ-স্পন্দন কবিতায় ছন্দোবদ্ধ হ'ল তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে লেখা "বনফুলে"।

আমাদের দেশে নানা বিধিনিষেধের চাপে যে সহজ প্রেম প্রাগ্‌বৈবাহিক পূর্বরাগে মুকুলিত হতে পারে না, তাদের বিরুদ্ধে সেদিন কিশোর কবির প্রাণে জেগেছিল বিদ্রোহ। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে পুষ্ট বালকের অন্তরে স্বাধীন ভাব ও চিন্তার ঝঙ্কার বেজে উঠল প্রতীচ্যের রোমান্টিক সুরে। এই ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যের পটভূমি হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্যবেষ্টিত একটি নিভৃত কোণ। মাতৃহীনা নায়িকা কমলা ঋষিতুল্য অরণ্যবাসী পিতার একমাত্র কন্যা ও সঙ্গিনী, যেন জনহীন দ্বীপে অন্তরায়িত প্রস্‌পিরো-কন্যা মিরাণ্ডা। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তরুণ যুবক বিজয়ের আবির্ভাব। তার সঙ্গে কমলা বনবাস ত্যাগ ক'রে লোকালয়ে এল। শকুন্তলার মত আশৈশবের সঙ্গী বনের হরিণ, গাছের পাখী আর তরুলতাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে। প্রেমানভিজ্ঞা নববিবাহিতা কমলার পরিচয় হ'ল বিজয়ের বন্ধু নীরদের সঙ্গে এবং কমলার হৃদয়কমল উঠল ফুটে এই নীরদের প্রেমে। কমলার পল্লী-সখী নীরজা পড়ল বিজয়ের প্রেমে, সুতরাং ব্যাপারটা হয়ে উঠল জটিল। বিজয় ভালবাসে তার স্ত্রী কমলাকে, কমলা ভালবাসে স্বামীর বন্ধু নীরদকে। নীরদকে আবার গোপনে ভালবাসে নীরজা। কমলার প্রেম সরল অকৃত্রিম। "বিবাহ কাহারে বলে জানি না ত আমি"—এই হ'ল তার দাম্পত্যজীবনের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। সখী নীরজা হ'ল কমলার প্রতি ঈর্ষান্বিতা, যেহেতু সে তার বাঞ্ছিত নীরদকে ভালবাসে। নীরদ কমলাকে জানায় যে, বিজয়ের অনুরোধে সে চিরদিনের জন্যে অন্যত্র চলে যাবে। কমলা উত্তেজিত হয়ে বিজয়ের উদ্দেশে বলে—

> "পদতলে পড়ি মোর দেহ কর্ ক্ষয়,
> তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয় ?"

এমন সময়ে বিজয় এসে করল নীরদকে ছুরিকাঘাত। পাষাণ-প্রতিমার মত কমলা নীরবে চিতার আগুনে নীরদের ভস্মাবসান প্রত্যক্ষ করল, তার পর পড়ল মূর্চ্ছিত হয়ে। কমলা ফিরে গেল তার পূর্বাশ্রমে। প্রেমবিরহিত জীবন তাকে প্রকৃতির মাতৃকোলের মধ্যেও সান্ত্বনা দিতে পারল না। হিমাদ্রি-শিখরে হ'ল তার তুষারসমাধি। এই কাল্পনিক ভূমিকায় কিশোর কবি প্রেমের হর্ষবিষাদ ঈর্ষা জিঘাংসার চিত্র ফুটিয়েছেন তাঁর অনভিজ্ঞ লেখনীর প্রথম উদ্দীপনার আবেগে। বর্ণনায় বিশ্লেষণে সহানুভূতিতে ও স্বাধীন চিন্তায় স্থানে স্থানে অশিক্ষিত পটুত্বের সহজ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁর প্রেমকাব্য-রচনার প্রারম্ভিক চেষ্টায়। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিস হচ্ছে, কিশোর কবির সদ্যোস্ফুট দৃষ্টিতে অনাবিল রোমান্টিক প্রেম লৌকিক বিধিনিষেধের সংঘাতে কী ট্রাজিডিতে পরিণত হ'ল এবং সত্য ও কৃত্রিমতার দ্বন্দ্বের মধ্যে তরুণ হৃদয়ের সত্যানুকূল সহানুভূতি। "বনফুলে"র নান্দীমুখ স্বরূপ নিম্নলিখিত বিদ্রোহের শ্লোকটি বোধ করি কমলার মর্মবাণীরূপে কবি প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করেছেন।

> "চাই না জেয়ান, চাই না জানিতে
> সংসার মানুষ কাহারে বলে,
> বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
> শুকায়ে যেতাম বনের কোলে।"

দ্বিতীয় প্রেমকাব্যের নাম "কবি-কাহিনী"। প্রকাশিত হ'ল যখন, তখন কবির বয়স ষোল বছর। এই বইখানি সম্বন্ধে "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথের সকৌতুক টিপ্পনী এই—"যে বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়া-মূর্তিকেই বড় করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। * * * লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হ'লে অন্য দশ জন মাথা নাড়িয়া বলিবে—হাঁ, কবি বটে!—ইহা সেই জিনিসটি।" বনস্পতি তার শৈশবের চারা মূর্তিটির ফটোগ্রাফ দেখলে হয়ত মানুষের বুদ্ধিও ভাষায় তর্জমা ক'রে এই কথাই বলত কৌতুকে। আপনাকে আপনি একটু ঠাট্টা তামাশা করার সুবিধা এই, এতে রুষ্ট হবার কেউ থাকে না। তবে, আমরা পাঠকরা এ কথা অকুণ্ঠিতেই বলতে পারি যে, এ পুস্তিকার কোথাও আত্মবিঘোষণা নেই, স্ফুটনোন্মুখ চিত্তের আত্মোক্তি আছে। মাঝে মাঝে এমন সব ভাব চিন্তা অনুভূতি সূক্ষ্মদর্শন ও বর্ণনার নৈপুণ্য আছে, যা অনুদিত কবির অরুণরাগের মতই ভবিষ্যদ্বাণীময়। নৈশ অন্ধকারের মাধুর্য, প্রলয়ের ভীষণ সুন্দর রূপ, উষার মোহিনী মূর্তি, প্রথম প্রণয়ের ব্যাকুলতা, প্রেমের চিরন্তন অতৃপ্তি, অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ের পথিকবৃত্তি, অশ্রুধৌত শোচনাহীন প্রশান্তি, এমন কি মানবসভ্যতার বর্বরতা, বিশ্বমৈত্রী, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনপনেয় আশাশীলতা এই পুস্তকটিকে ভাবী পূর্ণতার আভাস-ব্যঞ্জনাময় কোষ্ঠিপত্রের মর্যাদা দান করেছে। এই কাহিনীর 'কবি' পরমবাঞ্ছিতা নলিনীকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে বাহির হ'ল ভূপ্রদক্ষিণে। প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের চিরসন্ধানী চিত্তে এই সুরই ফুটেছে। নিখিলের পক্ষবাদ্যে—

> "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।"

"তৃতীয় রোমান্টিক নাটিকার নাম 'রুদ্রচণ্ড'। এর ভিতর নির্মল অস্ফুট প্রেমের একটি কাহিনী আছে—চাঁদ কবি আর অমিয়ার বিয়োগান্ত অপূর্ণ মিলনে। লিরিক্-মাধুর্যে পূর্ণ দুটি গানে, হর্ষ-বিষাদের বৈপরীত্যে প্রেমের আরম্ভ ও অবসানের যুগ্মচিত্র কী করুণ বর্ণাভা-সেই কবি এঁকেছেন, একটি মালতী ফুলের ছবিতে, বসন্তের ভোরে যার প্রেম বা জীবন ফুটল, আর পড়ল ঝ'রে সন্ধ্যায়। আন্দাজ সতের বছর বয়সে 'রুদ্রচণ্ড' রচিত।

'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি কবির উনিশ বছর বয়সে লিখিত। এই গ্রন্থে চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত একটি দীর্ঘ আখ্যায়িকার ক্ষীণসূত্রে কবি নানা পুষ্পে একটি বিচিত্র প্রেমের মালা গেঁথেছেন।

কতকগুলি তরুণ-তরুণী এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা। প্রেমের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকটি তরঙ্গায়িত। এ গ্রন্থেও প্রধান নায়কের নাম 'কবি', তাকে মুরলা ভালবাসে। কিন্তু প্রিয়সখী চপলার কাছেও তার নাম পর্যন্ত মুখে আনতে পারে না।

"আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ সে নাম যে অতি উচ্চ
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার।"

এ প্রেমের নাম পূজা। ইষ্টদেবতার নাম অন্তরের জপমালা, মুখে আনতে বাধে। দূর থেকে সে কেবল কবিকে দেখিয়ে দিল। কবি তার বাল্যবন্ধু। সে কাছে এসে মুরলাকে প্রশ্ন করে, কেন সে এমন আনমনা, কাউকে ভালবাসে নাকি? তার পর নিজের মনের কথা খুলে বলে, প্রাণের নিরুদ্দেশ ব্যাকুলতার কথা জানায়।

"প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে,
মহা-উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে।"

যে তার সব অভাব দূর করতে পারত আপনাকে উজাড় ক'রে দিয়ে, সেই মুরলাকে কবি এখনও চিনতে পারে নি নিত্য পরিচয়ের অমনোযোগে। তবু কবি বাল্যসখিত্বের সরল নির্ভরে মুরলার কাছেই ব্যক্ত করে নলিনীর সম্বন্ধে তার আকুলতা। মুরলার বুক যেন ভেঙে যায়, তবু মুখ ফুটে পারে না কিছু বলতে। নলিনীর প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অসূয়া তার মনে জাগে না। সখী চপলাকে বলে—

"নলিনীবালারে ভালবেসে যদি
কবি মোর সুখে থাকে,
তাহা হ'লে সখী, বল দেখি মোরে,
কেন না বাসিবে তাকে?"

নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়—

"যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে;"

এই নলিনী হৃদয়হীনা চপলপ্রকৃতির 'ফ্লার্ট'। তার ভক্তবৃন্দের অভাব নেই। সে সকলেরই হৃদয় হরণ করতে চায়, কিন্তু কাউকে হৃদয় দান করতে নারাজ। বিজয়কে টানতে চায়। তার অগভীর ভালবাসার জন্যে অনুযোগ করে। খেয়ালী সে, হঠাৎ কামিনীফুলের গুচ্ছ তুলে এনে দিতে বলে। বিজয় সানন্দে এনে পুরস্কারপ্রার্থী হয়। নলিনী সে ফুল তৎক্ষণাৎ পদদলিত ক'রে বলে—

"অনুগ্রহ করি এ চরণ দিয়া
ফুলগুলি তব দিলাম দলিয়া
এই তব পুরস্কার।"

বিজয় না-ছোড়-বান্দা, তবুও প্রেম নিবেদন করে। দূর থেকে অশোক সুরেশ বিনোদ প্রমোদ, বিজয়ের কল্পিত সৌভাগ্যে হিংসায় জ্বলে মরে। প্রমোদ কাছে এসে গান গেয়ে মিনতি জানায়। নলিনী পাল্টা গানে তাকে বিদ্রূপ ক'রে বিজয়ের কাছে ফিরে যায় বটে, কিন্তু এবার পায় তার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান। চপলচিত্তার প্রেমে সে পড়বে না, এই তার পণ।

অনিল ও ললিতা নববিবাহিতা দম্পতী। ললিতা বড় লাজুক, বড় অল্প কথা বলে, বুকভরা ভালবাসা রাখে লুকিয়ে। অনিল স্ত্রীকে ভালবাসে, তার সোহাগ আদর অতিমাত্রায় চায়, কিন্তু পায় না; প্রেমের অভাবে নয়, সঙ্কোচের আত্মবোধে। এই নিয়ে চলেছে ওদের মান-অভিমান আর ভুল বোঝার অফুরন্ত পালা।

এরূপ চিত্তবিক্ষোভের সময় অনিলের দৃষ্টিটা হাস্যময়ী কৌতুকপরা রূপসী নলিনীর দিকে একটু ক্ষুধাতুর হয়ে যে আড়চোখে না চায় তা নয় তবু সে খতিয়ে হিসেব ক'রে দেখে—

"ললিতা নলিনী কাছে না হয় রূপেতে হারে,
ভালবাসি ভালবাসি তবু আমি ললিতারে।"

একটু মন খুলে কথা বললেই যেখানে সব গোল মিটে যেত দুটি প্রেমাকুল হৃদয় পেত শান্তি ও সান্ত্বনা, সেখানে কেবল বেজে ওঠে অতথ্য বেদনার বেসুর, আসন্ন মিলন-মুহূর্তে পড়ে যেন নিয়তির হাঁচি। অনিল উৎসুক হয়ে কাছে আসে, বিতৃষ্ণাভরে চলে যায়। ললিতা ব্যাকুল হয়ে পিছু ডাকে

"বলো সখা কোথা যাও, চাও কি করিতে?"

অনিলের সরোষ উত্তর—

"মরিতে মরিতে বালা! যেতেছি মরিতে!"

নলিনীর মৃগয়াপরা নাগরী প্রকৃতির গুণে প্রসাদ-ভিক্ষুরা একে একে স'রে পড়ল। সে আর কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না। তার নিঃসঙ্গ প্রাণ কেঁদে বলে

"আজ আমি নিতান্ত একাকী
কেহ নাই, কেহ নাই হায়।"

আশঙ্কা হয়, বুঝিবা রূপে পড়ল ভাঁটা। প্রসাধনের ব্যগ্রতা জেগে ওঠে। সখীদের অনুরোধ করে—

"ভাল করে সাজায়ে দে মোরে।
বুঝি রূপ পড়িতেছে ঝ'রে।
করিতে করিতে খেলা জীবনের সন্ধ্যাবেলা
বুঝি আসে তিলতিল ক'রে।"

কবির চোখেও নলিনীর মোহ কেটে গেছে, তাই তার ব্যাকুল কম্পাসের কাঁটা ফিরল মুরলার দিকে। মুরলার কাছে এসে দেখে সে তার অন্তিম শয়নে। তবু কি আনন্দ মুরলার! কবিকে অনুরোধ করে, আমার চিতাশয্যা ফুলশয্যার মত সাজিয়ে দাও। মুরলার ভাই অনিল ফুল এনে দিল। কবি মুরলার সঙ্গে মালা বদল ক'রে তার শেষশয্যাটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতে দিতে বলে—

"বিবাহ মোদের আজ হ'ল এই ভবে।
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আর একদিন ফুলশয্যা হবে।"

'ভগ্নহৃদয়ে'র মূল আখ্যানবস্তু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'নলিনী' নামে একটি ক্ষুদ্র গদ্য নাটিকা লিখেছিলেন। সেটিকেই আবার রূপান্তরিত করেছিলেন 'মায়ার খেলায়'। যে তরুণ কবি 'ভানুসিংহের পদাবলী' লিখেছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, তার পরিচয় ব্রজবুলিতে লেখা এই কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। দেশাচারের কারাগারে বন্দীর চোখে, জানালার ফাঁকে বৃন্দাবনের অবাধ লীলাক্ষেত্র এক দিকে যেমন উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, অপর দিকে যে 'বিলাত দেশটা মাটির' সেখানে কবি ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষের প্রাঙ্গণে তরুণ-তরুণীদের প্রেমনর্ম দেখেছেন। বিলাতে অবস্থিতির সময় কবি "ভগ্নহৃদয়" লিখতে সুরু করেন। তাঁর দৃষ্টি ও বাণী ছিল অধুনার রুচি ও রীতির দ্বারা নিয়মিত, পশ্চাতে ছিল প্রাচ্য সাহিত্য ও পুরাণের পরিপ্রেক্ষিত। উভয়ের শোভন ও সুশ্লীল সমন্বয় হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে।

এইখানে কবির প্রেমকাব্য রচনার আদিকাণ্ড সমাপ্ত করি। প্রতিভার চোখে আছে দুরবীন, অনাগতাকে সে প্রত্যক্ষ করে সেই দূর দর্শনে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের সমাজে সংসারে ভালোয় মন্দে বিপুল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়েছে। অনবরোধের ভিতর নরনারীর প্রেম যে নব রূপ ধারণ করবে তার অরুণরাগে রবীন্দ্রকাব্যের পূর্বাশা অনুরঞ্জিত।

কবির কাব্যকুঞ্জে যে বসন্ত বহু বৎসর ধ'রে ফুল ফুটিয়েছে তাকে তিন পর্বে ভাগ করা যেতে পারে যথা, যৌবন বসন্ত, প্রৌঢ় বসন্ত ও প্রান্তিক বসন্ত। আদ্য পর্বে আমরা পেয়েছি 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'উৎসর্গ'; মধ্যপর্বে 'খেয়া', 'বলাকা', 'পূরবী', শেষ পর্বে 'মহুয়া', 'বনবাসী', 'পরিশেষ', 'বিচিত্রিতা', 'বীথিকা'। এই সব কাব্যপুস্তকের প্রত্যেকটিতেই প্রেমের কবিতা আছে। সব পর্বাধ্যায়ই পরিপূর্ণ গানে। তাদের মধ্যে কতকগুলি 'ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি', কতকগুলি 'জীবন-মরণের সীমানা হারায়ে' ব্রহ্মসঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে।

'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হ'ল যখন, তখন কবির বয়স পঁচিশ বৎসর। "প্রাণ" শীর্ষক প্রথম কবিতাটিতে কবির প্রেম একটি সনেটে জমাট বেঁধেছে। যেন স্বচ্ছ বেদানার দানার থকে রক্তাভায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর অনুরাগ এই সুন্দর বিশ্বের জন্যে, ঘনীভূত হ'তে চাচ্ছে মানবের সুখদুঃখময় অন্তরে, আত্মপ্রকাশ খুঁজছে সঙ্গীতের পুষ্পে পুষ্পে।

আকাশের মেঘ যেমন গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় নিয়ে আপনাকে শুভ্র তুষারে ঘনীভূত ক'রে তোলে, তার পরে বিগলিত হয় সহস্র প্রপাতে, কবির প্রেম যেন তেমনি নারীর দেহকে অবলম্বন ক'রে সাগরাভিসারিণী নির্ঝরিণী ধারা সৃজন করেছে, গুটিকতক অনবদ্য সনেটের উৎস-মুখে। "নূতন" শীর্ষক কবিতার ভিতর চিরবাসন্তিক কবির সৃজনোল্লাস অতীত ও অধুনার জীর্ণতাকে আগামীর নবীনতায় উদ্ভিন্ন করবার জন্যে ব্যাকুল। "মঙ্গল গীতি"তে কবি ডাকছেন যাত্রাপথে—

"যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ'তে
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।"

কবি জানেন,

"সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশি-দিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাই অবসান।"

'মানসী' প্রকাশিত হ'ল কবির ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে।

আকাশভরা তারা যদি একটি অণুর আয়তনের ভিতর পুরতে পারা যেত, তা হ'লে গ্রহ-নক্ষত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব

ও দূরত্বের কোনো হ্রাস হ'ত না। আকাশ মহাশূন্তময়, গ্রহ তারাদের মাঝে কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান। পরমাণুর মধ্যেও সেই একই দশা। প্রোটন ইলেকট্রনদের অণিমার অনুপাতে তাদের চারি দিকও সমান শূন্যে ভরা। এ বিশ্বে সংস্পর্শের লেশ নেই কোথাও। অণুপরমাণুর মধ্যেও না, নিবিড় ভুজবন্ধনে আবদ্ধ প্রণয়িযুগলের মধ্যেও না। অথচ সর্বত্র রয়েছে প্রবল আকর্ষণ। এ জ্ঞান শুধু বিজ্ঞানীর নয়, আসঙ্গলিপ্সার চির অতৃপ্তির মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মা জানে। বিদ্যাপতির 'কত লাখ লাখ যুগ', ব্রাউনিঙের 'the instant made eternity' হচ্ছে প্রেমিকের সেই চিরন্তন ক্ষণ, যখন সে বলে,

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।"

'মানসী'র নানা লিরিক্ কবিতার বর্ণচ্ছত্রে অভিজ্ঞ প্রেমের ভাব-বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ আছে। সব রঙগুলি একত্রে মিশালে একটা সোনালি আভা ফোটে, সেটা যেন ইন্দ্রিয়বিবাগী প্রেমের বিষাদ করুণ অন্তরাগ। প্রেম ঠেকে শিখেছে—

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'
"নাই—নাই—কিছু নাই শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
* * *
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?"
—হৃদয়ের ধন
"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের
* * *
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।"
—নিষ্ফল কামনা।

জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে স্ত্রীপুরুষের নানা কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতির পথ নাই, সেখানে আবেগবান্ প্রাণ কেবলমাত্র ভাবালুতার মধ্যে তৃপ্তি পেতে পারে না, সে ভাবোচ্ছ্বাস যতই উচ্চাঙ্গের হোক। "দেশের উন্নতি", "বঙ্গবীর", "ধর্মপ্রচার" ইত্যাদি কবিতাতে কবির ভাবরসধারা মোড় ফিরেছে কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে। সেখানে অসত্য, মিথ্যা দম্ভ ও কাপুরুষতা যে বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে, তা প্রকাশ পেয়েছে বিদ্রূপাত্মক অন্তর্গূঢ় বেদনায়। স্বদেশী যুগের কবির স্বদেশ ও বিশ্বপ্রেম উত্তরকালে কবিতায় গানে ও স্বার্থত্যাগী কর্মোদ্যমে যে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার সূত্রপাত 'মানসী'তে লক্ষ্য করা যায়। "নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপে" বাসরঘরের যে কথাগুলি কবি ছন্দোবদ্ধ করেছেন, সেই ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে সামাজিক প্রথার অসঙ্গতি চোখে আঙুল দিয়েই কবি দেখিয়েছেন। অব্যবহিত পরেই "চিত্রাঙ্গদা"য় সম্ভোগলোলুপ দেহজ প্রেমকে কবি যেন পাহাড়ের চূড়ায় তুলেছেন, কেবল তাকে সেখান থেকে উপত্যকায় আছড়ে ফেলে চূর্ণ করবার জন্যে। চিত্রাঙ্গদার যে তেজস্বিনী প্রেমময়ী নারীমূর্তিটি উপসংহারে উন্মোচিত হয়েছে, সে চিত্র বাংলা-সাহিত্যে কবির অতুলনীয় সৃষ্টি।

'সোনার তরী' যখন প্রকাশিত হ'ল তখন কবির বয়স বত্রিশ বৎসর।

মানুষের প্রেমপ্রবণ প্রাণ চায় উৎসর্জন, নিঃশেষে আপনাকে দিতে। তার সর্বস্ব দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যদি না থাকে দানের পাত্র। নদীতীরে একাকী কৃষাণ। তার—"রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা"। এই বিজন একাকিত্বের মধ্যে দৈবযোগে যে এল তটে, উৎসুক হৃদয়ে তাকেই সে দিয়ে ফেলল সব। কিন্তু দুর্বল প্রেম নিষ্কাম নয়, শুধু দিয়েই তৃপ্ত হয় না, কিছু পেতে চায় বিনিময়ে। যে সব নিল, চায় তার সাহচর্য, স্বয়ম্বরণ। কিন্তু সে চলে যায়, প্রত্যাখ্যান-লাঞ্ছিত সর্বহারার নৈঃসঙ্গ্য দ্বিগুণিত ক'রে। কবিতাটি যেন পদ্মাচরে পাশাপাশি দুখানি ছবি। প্রথমটিতে শস্য সঞ্চয় ক'রে বসে আছে চাষী, অদূরে আসছে ভরাপালে একটি নৌকা। দ্বিতীয়টিতে সে নৌকা আবার ভরাপালে চলে যায় শস্যসম্ভার নিয়ে, কৃষক পড়ে থাকে জনহীন সৈকতে।

'সোনার তরী'তে প্রেম নারীর দেহপিঞ্জরে আর বন্দী নয়। প্রেম কখনো এই বন্ধন-নীড় আশ্রয় করে, কখনো বা উদার মুক্তির মাঝে উড্ডীন হয়। তার আত্মপ্রত্যয় জেগেছে। "বৈষ্ণব কবিতা"য় কবি অকুণ্ঠিতে বলছেন,

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

"মানস সুন্দরী"তে নারীকে কবি বলছেন,

"গৃহের বনিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতা রূপে হয়েছ উদয়।"

"বিশ্ব নৃত্যে" মুক্তগতি কবির প্রেম বলে—

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব হৃদয়ে মিলিতে।
নিখিলের সাথে মহারাজপথে
চলিতে দিবসে নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত

একটি বিন্দুজীবন অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে !"

"ঝুলন" কবিতায় কবি ঝড়কে আহ্বান করছেন—

"আয়রে ঝঞ্ঝা, পরাণ বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর"

পরক্ষণেই বলছেন—

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখী আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল !
দে দোল্ দোল !"

এই ঝঞ্ঝার ধাক্কায় ধাক্কায় স্বপ্নবিলাসের আবেশ থেকে জাগবে অসাড় প্রাণ, নবোদ্বুদ্ধ আনন্দময় চেতনায়। প্রেম প্রিয়া-সম্মিলন লাভ করবে এই প্রলয় হিন্দোলায়।

"হৃদয় যমুনা"য় কবির বাঁশি অভিসারিকাকে আহ্বান করেছে, যমুনাপুলিনের কুঞ্জকুটীরে নয়, প্রাণের অ-থই গহনে—

"যেখানে—নাহি রাত্রি, দিনমান আদি অন্ত পরিমাণ
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিলবন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে।"
'উদেতি সবিতা তাম্র স্তাম্র এবাস্তমেতি চ।'

'সোনার তরী'র প্রথম ও শেষ কবিতায় একই গৈরিক-রাগ। কবিতাটি পড়লে Prometheus Unbound-এ Asia's Song মনে পড়ে। সেখানে শেলি "Through Death and Birth to a diviner day" উত্তীর্ণ হয়েছেন, সহযাত্রিণীর সঙ্গে। কিন্তু "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র সঙ্গিনী মাঝদরিয়ায় যখন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে তখন বুঝিবা শূন্যে গ'লে যায়।

"বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
'কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি'
কহিবে না কথা, শুনিতে পাব না
মধুর হাসি।"

'সোনার তরী'তে যে এসে চাষীর সোনার ধান নিয়ে গেল, নদীতীরে তাকে একলা ফেলে, সে-ই কি আবার "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় তাকে ডেকে নিলে আপনার তরণীতে, অসীম অকূল অজানায় পাড়ি দিতে ? ঘনায়মান অন্ধকারে জলকলরবের সঙ্গে, কেবল উতলা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়া কেশস্পর্শ ও দেহসৌরভ এবং সকল জিজ্ঞাসার উত্তরে মৌন হাসির আভাস রেখে আকাশে বিলীন হ'ল ? এ রহস্যের কতক সমাধান কবি করেছেন তাঁর উত্তর কাণ্ডে। এখন জীবন কেবল নিরাকুল প্রশ্ন ও অতৃপ্তিময়।

'চিত্রা' বাহির হ'ল যখন, তখন কবির বয়স ৩৪ বৎসর। কদর্যতা, দেহের হোক অন্তরের হোক্, আনে মনঃপীড়া। যা কিছু সুন্দর জাগায় আনন্দ। এই ভাললাগা হৃদয়কে গ্রন্থিবদ্ধ করে ভালবাসায়। কবির হৃদয় সানন্দে নিখিল সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছে। চিত্রা কবিতাটিতে এই বিচিত্র-রূপিণী ভুবনমোহিনীকে কবি অঙ্কিত করেছেন।

ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি তিনি সম্রাট্। তাঁর আধিপত্য সবার উপর। কিন্তু বাহিরের সম্পদে ত প্রাণের নিঃস্বতা ঘোচে না। প্রাণের দৈন্য নিঃশেষে দূর হয় যখন মানুষ হয় প্রেমধনে ধনী। নারীর প্রেমের অধিকারী যে, সে সত্যই গর্ব ক'রে প্রিয়াকে বলতে পারে—"তুমি মোরে করেছ সম্রাট্"। "প্রেমের অভিষেকে" কবি এই উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন।

নারীর হৃদয়বৃত্তিবর্জিত যে অনিন্দ্যদেহসৌষ্ঠবের উন্মাদনায় "মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল," ত্রিভুবন হয় যৌবনচঞ্চল যে রূপসীর কটাক্ষপাতে, ত্রিদিবের সেই রূপজীবিনীকে কবি অপূর্ব ছন্দের নির্মল স্থাপত্য-সৌন্দর্যে বেঁধেছেন 'উর্বশী'তে।

দেহাশ্রয়ী হয়েও, প্রেম যে রূপজ মোহের অতীত আর কিছু, এই 'নেতি' জ্ঞানের আলোকে প্রেমের অপাপবিদ্ধ শুদ্ধরূপটি কবি দেখিয়েছেন তাঁর "বিজয়িনী" কবিতায়, অচ্ছোদের তীরে সুন্দরীর চরণপ্রান্তে কন্দর্পকে ধনুর্বাণ অর্পণ করিয়ে।

"অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু।" এই আত্মা সর্বভূতের মধু, সর্বভূতও এই আত্মার মধু। রবীন্দ্রনাথের "জীবন দেবতা" কবিতায় প্রেমের এই আত্মিক রূপ ফুটেছে। এই অভিব্যক্তিই তাঁর যৌবন-প্রত্যন্ত ও যৌবনোত্তর কাব্যে প্রেমের নিরুপাধি বা বহু-উপাধিক রূপ। 'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হয় কবির ৩৯ বছরে। এই বইখানিতে কবি যেন হঠাৎ একটি নূতন রচনার রীতি আবিষ্কার করেছেন।

শুনতে পাই, ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন্-কণা এক কক্ষপথ থেকে আর একটি কক্ষবৃত্তে উপনীত হয়, মাঝখানের ব্যবধান এক লম্ফে উল্লঙ্ঘন ক'রে। সেই সময়ে ইথর-সাগরে জাগে তরঙ্গমালা। রবীন্দ্রনাথের নব নবোন্মেষ-শালিনী প্রতিভা অকস্মাৎ যেন এই রকম এক ঝম্পে উত্তীর্ণ হ'ল নূতন ছন্দলোকে, অভিনব প্রকাশ ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর ব্যঞ্জনা নিয়ে। চিন্তায়, ভাবে, কার্যে একটা অনিবার্য গতানুগতিকতা আছে। কেবল প্রবল আবেগের তাড়নায় মানুষ নূতনপন্থী হয়।

অতি অল্প কথায় গভীরতম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি কবি প্রকাশ করেছেন যেন নৃত্যনিপুণা ছন্দসীর ললিত লাস্যে, কৌতুককটাক্ষে ও মুদ্রা-মাধুর্যে।

আপাত-নির্লিপ্তি ও রহস্যের ছলেই গভীরতম মর্মবাণী আনন্দে বেদনায় কৌতুকে প্রকাশ পেয়েছে কবিতার পর কবিতায়।

> "সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে,
> দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে,
> যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার আশা
> হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে।"
> —উদাসীন

বিপুল চাপে আর জলকণার যোগে খনির কয়লা হয় হীরা। কাজল বাসনা আর বেদনার অশ্রু যখন জমাট বাঁধে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ আবেগে, তখন প্রেম হয় স্ফটিক স্বচ্ছ। 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলি এই হীরকদীপ্তিতে ভাস্বর।

এতক্ষণে আমরা কবির প্রৌঢ় বসন্তে এসে পৌছলাম।

'খেয়া'র রচনাকাল নিরুদ্দিষ্ট হ'লেও কবির বয়স তখন আন্দাজ ৪৫ বলা যেতে পারে।

প্রেমের কবিতা হিসাবে মুক্তিপাশ, বালিকা বধূ, অনাবশ্যক, গোধূলি লগ্ন, ফুল ফুটনো, বিচ্ছেদ প্রভৃতি কবিতাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। Ariel-এর গান মনে পড়ে।

> "Full fathom five thy father lies ;
> Of his bones are coral made
> Those are pearls that were his eyes :
> Nothing of him that doth fade
> But doth suffer a sea-change
> Into something rich and strange."

কেবল "father" কথাটির বদলে beloved বসিয়ে দিলেই কবিতাগুলির গূঢ়রহস্যময় অতীন্দ্রিয় তাৎপর্যটি ফোটে। এই কবিতাগুলির পদলালিত্য মাঝে মাঝে 'ক্ষণিকা'র কোল-ঘেঁষা। কিন্তু সুর একেবারে স্বতন্ত্র। ঝিঁঝিট-খাম্বাজের জায়গায় কানে জাগে পূরবী।

'বলাকা' যখন প্রকাশিত হ'ল তখন কবির বয়স ৫৫ বৎসর।

ঋষিবালকরা তপোবন থেকে সমিৎ সংগ্রহ করে। ঋত্বিক হোমকুণ্ডে সেই ইন্ধনভার নিক্ষেপ ক'রে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত রাখেন। বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের তপোবন। সারাজীবনের স্মৃতিসঞ্চ সুরভিকাষ্ঠপুঞ্জ, সংগ্রহ করেছে অগ্নিহোত্রী কবির জন্য। 'বলাকা'য় দেখি সেই যজ্ঞধূম, যা সৃজনের নবনীহারিকায় আচ্ছন্ন করেছে কবির আকাশ।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি ছবি দেখেছিলাম। একটা বিপুলাকার জন্তু। অপূর্ব আলোছায়ার আবরণে তার দেহ আবৃত। খানিকক্ষণ অপলক চোখে দেখতে দেখতে মনে হ'ল—

> 'রাশি রাশি বীজের বলাকা'

তার প্রতি লোমকূপে নানা মুখ নানা মূর্তির আভাস। এই ত বিশ্বসৃষ্টির ছবি—রূপ আর অরূপের ফেনপুঞ্জ বুদ্বুদ্ দিয়ে উঠছে তার সর্বাঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে এই রকম একটা সৃজনোদ্বেল রূপের খেলা আছে, যা বিচিত্র আকারে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। জলপরীরা যেন ডুবছে ভাসছে সিন্ধুতরঙ্গে। কারও মুখ, কারও কেশপাশ, কারও উৎক্ষিপ্ত বাহুর সুবঙ্কিম রেখা একটা চকিত পরিচয়ের বিস্ময় চোখে রেখে যায়।

বিদগ্ধ চিত্তের বহুদর্শন, তার শোকদুঃখ ক্ষতি ত্যাগ মিলন বিরহ সব পরিপাক লাভ ক'রে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিঘন আনন্দে কবির দৃষ্টি ও বাণীকে সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রৌঢ় রচনা নানা উৎসমুখে উচ্ছ্রিত হয়েছে বিচিত্র ধারায়, যা ভাবঋদ্ধির রাসায়নিক বিশ্লেষণে নানা ধাতুর সংবাদ দেয়।

বলাকার মূল সুরটি গতির সুর, যে গতি বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তাল রেখে কবির আত্মসৃষ্টিকে সৃজনচঞ্চল করেছে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা যেমন গঙ্গার স্রোতে সমচ্ছন্দে জাগে। যে আবেগ বন্ধনগণ্ডীকে বলয়পরম্পরায় দিগন্তে ঠেলে নিয়ে চলে, সীমাতীতের আশ্বাসকে সেই ত অনধিগতের মধ্যেও টেনে আনে—নিরন্ত গতির সম্ভাব্যতায়। ক্ষুদ্র ধারণ করে বিরাটরূপ অন্তহীন দেশকালে, আগ্রার তাজমহল বিশ্বমানবের অন্তরে নিত্য কালের জন্য প্রেমস্মৃতি ও সুন্দরের প্রতীক হয়।

শাশ্বত যৌবনের সোঽহং স্বামী আত্মোপলব্ধির আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন প্রথম কবিতায়—

> "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
> ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
> আধ্-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!"
> *　　*　　*
> "চিরযুবা তুই যে চিরজীবী!
> জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
> প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার্ দিবি!"

পূরবীর অধিকাংশ কবিতা কবির ৬৩ বৎসর বয়সে লিখিত।

শীতের মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা দখিনে হাওয়া আসে। কোকিল মৌন ভেঙে পঞ্চমে তান ধরে, অসময়ের ফুল শুকনো ডাল ফুঁড়ে বাহির হয়।

পূরবীতে অনেকগুলি প্রেমের কবিতা আছে, বিশেষতঃ কতকগুলিতে নারী-প্রেম তীব্র বেদনায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। 'তপোভঙ্গ,' 'লীলা-সঙ্গিনী', 'পূর্ণতা,' 'ক্ষণিকা,' 'সমুদ্র,' 'কৃতজ্ঞ', 'কিশোর প্রেম' 'আশঙ্কা,' 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায় বিগত যৌবনের বিস্মৃত বাসনা যেন সুষুপ্তির মধ্যে স্বপ্নের মত প্রত্যক্ষানুভূতি এনেছে, 'যৌবন-বেদনা-রসে উজ্জ্বল' কবির মর্মোক্তিতে। পুরান বেহালায় নতুন সুরের উপধ্বনি জাগে, বহুবৎসর-ব্যাপী ঝঙ্কারপরম্পরার অক্লান্ত সাধনলব্ধ সান্দ্রতায়। পূরবীতে যেন 'Old Stradivarins-এর সুরমূর্চ্ছনা শুনি, যা মানসী, সোনার তরী, চিত্রার যুগে ফোটে নি। প্রবীণ অধ্যাপকের গণজনবোধ্য সহজ বক্তৃতায় এমনি একটা সাধারণ-লভ্য ব্যঞ্জনা আছে, যেটা অনভিজ্ঞের ব্যাখ্যায় প্রকাশ পায় না। এই ভাবঋদ্ধ সংযত সাবলীল ভণিতি কানে আসে পূরবীর প্রেমোচ্ছ্বাসে।

এইবার আমরা কবির প্রান্তিক বসন্তে উপনীত হলাম। 'মহুয়া' এই পর্বের প্রথম পুস্তক। কবির বয়স এখন ৬৭। বিবাহ উপলক্ষে উপহারের উপযুক্ত একটি কাব্যগ্রন্থ রচনার তাগিদে মহুয়ার উৎপত্তি। কবি একটি পত্রে লিখেছিলেন,

"কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটু সঙ্গতি আছে—মহুয়া বসন্তেরই অনুচর আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।"

পুনশ্চ

আমি নিজে মহুয়ার কবিতায় দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান পেয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন বেগই প্রবল।"

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রোটেসিলেয়াসের মুখে বলেছেন—

"Be taught, O faithful consort, to control
Rebellious passion: for the gods approve
The depth, and not the tumult of the soul.;"

পার্বতী-শঙ্করের মিলনে সুগভীর অপ্রমত্ত প্রেমের একটি আদর্শ আছে যা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। একাধিক কবিতায় ও প্রবন্ধে কবি হরগৌরীর প্রেমের সম্বন্ধে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যে পুষ্পধন্বা আপনি ভস্মশেষ হয়েও প্রজাপতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'তে দেয় নি মহাদেবের জীবনে, তাকে বীরের জন্মে পুনরুজ্জীবিত করবার বোধনমন্ত্র মহুয়ার প্রথম কবিতা। এই বলিষ্ঠ প্রেম বাংলার তরুণদের যুগল জীবনে উদ্বুদ্ধ হউক কবির এই উৎপ্রেক্ষা।

"ভয় অপমান লজ্জা ছাড়ো, পুষ্প ধনু,
রুদ্র বহ্নি হ'তে লহো জ্বলদর্চি তনু।"

কবিতার শেষের দিকে বলছেন,

"দুঃখ সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

কবির পুরানো একটি গানে আছে

"আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।"

এই গানের ধ্বনি পূর্ণতর হয়ে ফুটেছে "মায়া" শীর্ষক কবিতায়—

"হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচ্‌ব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিল্‌বে রসের রেখা
মায়ার চিত্র লেখা—
বস্তু চেয়ে সেই মায়া ত সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন করো।

প্রকাশ, অপরাজিত, পরিচয়, নির্ভর, দায়-মোচন, সর্বনাশ, প্রতীক্ষা, দীনা, সৃষ্টিরহস্য, ছায়ালোক, প্রত্যাগত, বিদায় প্রভৃতি কবিতায় নানা দিক দিয়ে প্রেমের লীলাবৈচিত্র্য ফুটেছে এই কাব্যে। "বিদায়" কবিতাটি 'শেষের কবিতা' নামক উপন্যাস থেকে গৃহীত হয়েছে। অবরোধমুক্ত নরনারীদের মধ্যে প্রেম-সৌহার্দের বিচিত্র সম্বন্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। উপন্যাসটিতে কবি দেখিয়েছেন যে দুজনের বিবাহ হ'ল, তাদের উভয়েরই ইতিপূর্বে অপরের সঙ্গে সখ্যতা হয়েছিল। চিরজীবনের জন্য দাম্পত্য বন্ধন পরস্পরের প্রকৃতিগত সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই আদর্শের অনুবর্তী হয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল যাকে, তার জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রইল অন্তরে অমর হয়ে।

রোমান্টিক প্রেমের অপূর্ব কবিতা "সাগরিকা"। ছন্দের মাধুর্যে ও কল্পনার প্রত্যক্ষ-দর্শনে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি। একদা সমরবিজয়ী হিন্দুস্থানের সঙ্গে যব-দ্বীপিকার হয়েছিল আসুরিক পরিণয়। কিন্তু পরে সে মিলন হয়েছিল শুভ, যার ফলে নব স্থাপত্য ও গীতিশিল্পকলার মাতৃভূমি হ'ল সে দ্বীপলক্ষ্মী। কত যুগ ধরে বাণিজ্যের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গ্রন্থির বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল। বহু জন্মান্তরের পরে সেই ভারত যেন কবির দেহ ধারণ ক'রে পূর্বজন্মের প্রিয়ার দ্বারে অতিথি। এবার তার যোদ্ধবেশ নাই। হাতে কৃপাণের পরিবর্তে বীণা, কণ্ঠে সঙ্গীত। কবির

নবদ্বীপ-পরিক্রমা অতুলনীয় রূপকশ্রী লাভ করেছে এই কবিতায়।

'বনবাণী' প্রকাশিত হ'ল কবির ৭০ বৎসরে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী মন জীবের ক্রমবিবর্তনবাদকে বহু দিন আগেই প্রেমের নেত্রকোণ থেকে দেখেছে। 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি গেয়েছেন

"জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।"

পরে আবার লিখেছেন—

"এই প্রাণভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।"

'বনবাণী'তে কবি তরুলতাদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছেন। তাদের নামে লিখেছেন কবিতা। নটরাজের 'ঋতুরঙ্গশালা'য় তাঁর প্রেমানন্দ উদ্বেল হয়ে উঠেছে প্রকৃতির বিচিত্র সুষমায়। তরুলতার মৌন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রে তিনি তাদের মর্মবাণী জেনেছেন এবং তাদের মনের কথা অনুবাদ করেছেন নূতনতর ছন্দস্বরে। প্রান্তিক বসন্তে কবি গাছপালাদের সঙ্গে বসে গেছেন আনন্দের ভোজে।

'পরিশেষ' বাহির হ'ল, কবির বয়স যখন ৭১ বছর।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এক বিদ্রোহী বুকে বন্দুকের গুলি খেয়ে বলেছিল—'গোলি খা ডালা!' "মৃত্যুঞ্জয়" কবিতায় কবি রুদ্রের শেল বক্ষে ধারণ ক'রে বলছেন—

"এই মাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।"

এই বলে কবিতাটি শেষ করেছেন—

"যত বড়ো হও
তুমি ত মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।"

প্রেমের কবিতার তালিকায় এই নামগুলি দেওয়া গেল—তুমি, প্রতীক্ষা, অন্তর্হিতা, ভীরু, মিলন, বোবার বাণী।

"তুমি" কবিতার মধ্যে সোনার তরীর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র উত্তর পাওয়া যায়।

"দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নব-জাগরিত বিশ্বে।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।
* * *
প্রেমের দীয়ালী দিয়েছিলে জ্বালি
তোমার দীপের দীপ্তি।
মোর সঙ্গীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়
মরণ সভায় তোমার আমার
গাব আলোকের জয়।"

'বিচিত্রিতা' কবির ৭২ বছর বয়সে লেখা। অনেকগুলি প্রেমের কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যথা:—পুষ্প, পসারিণী, কুমার, হার, শ্যামলা, প্রকাশিতা, পুষ্পচয়নী, ভীরু, বেসুর, নীহারিকা, অনাগতা, দ্বারে, বিদায়।

উৎসর্গপত্রে কবির আশীর্বাণীটি উদ্ধৃত করি—

"পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।"

কবির বহুবসন্তের পুষ্পসৌরভ ঘনীভূত হয়ে আছে এই শেষ বসন্তের ফুলগুলিতে। প্রগাঢ় অনুভূতিতে ও পদমাধুর্যে এরা 'তাজ বে তাজ বে নো বে নৌ' চিরনবীন, চিরসুন্দর।

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য শেষগ্রন্থ 'বীথিকা' কবির ৭৪ বছরের রচনা।

বীথিকায় অনেকগুলি প্রেমের কবিতা আছে। এদের বিশেষত্ব এই, এরা কেবল mood বা মনের আবহাওয়ার ভাবচ্ছবি সৃষ্টি করে না, বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার মধ্যে প্রেমের উদ্দীপনা কি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তার পরিচয় দেয়। কবিতাগুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করি। দুজন, রাত্রিরূপিণী, ধ্যান, কৈশোরিকা, বিচ্ছেদ, বিদ্রোহী, আসন্ন রাতি, গীতচ্ছবি, উদাসীন, দান-মহিমা, ঈষৎ দয়া, ক্ষণিক, মিলন যাত্রা, বাধা, অপ্রকাশ, দুর্ভাগিনী গরবিনী, মাটিতে-আলোতে, মুক্তি, দুঃখী, মূল্য।

অপরাধিনী

"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি।" ছিদ্র পেলেই অনর্থ ছুঁচ্ হ'য়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুতে চায়। একটু শৈথিল্য বা ভাললাগার আনুকূল্য নিয়ে যে প্রণয়ী অনভিজ্ঞা তরুণীর হৃদয় হরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় ও তাকে বেদনা দেয়, তখন সে নারী তার অসতর্ক হৃদ্যতার ত্রুটি অস্বীকার করলেও প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষ জানে

"বিষম দুঃসহ বোঝা এ ভালোবাসার
সেখানে দিয়েছি চেপে ভালোবাসা নাই যেখানেতে।"

তাই পলাতকার উদ্দেশে বলে

"আজ হতে মোর শাস্তি সুরু হবে, বিধির বিধানে।"

পাঠিকা

সাধারণ মানুষের মনে সুগভীর অভাব আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তি অস্পষ্ট থাকে তাদের নিজের চোখেও। কবি মনের কথা যখন টেনে বলেন, তখন আমরা আপনাকে চিনি। এই কবিতায় একটি পাঠিকার চিত্তকে কিরূপে নৈর্ব্যক্তিক প্রেমে আবিষ্ট করেছে অজানা দরদী কবির উদ্দেশে, তারই একটি বিশ্লেষণ-চিত্র ফুটেছে।

বিচ্ছেদ

কবিতাটি পড়লে কবির সুদূর কৈশোরে লিখিত 'ভগ্ন-হৃদয়ে'র অনিলও ললিতাকে মনে পড়ে। প্রণয়ীযুগলের সঙ্কোচ ও মৌনের ট্রাজিডির করুণ ছবি।

বাধা

চিরাগত সংস্কারে শৃঙ্খলিত নারীর পার্থিব প্রেমকে ভগবৎ-প্রেমে রূপায়িত করবার ব্যর্থ চেষ্টার প্রতি কবির দরদী দৃষ্টি দেখতে পাই এই কবিতায়।

মিলনযাত্রা

রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি ক'রে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে এই দীর্ঘ কবিতায়। 'পলাতকা' গ্রন্থে ও নানা গল্পে উপন্যাসে, দেশাচারের পীড়নে নারীজীবনের দুর্গতি দেখিয়েছেন। পুষ্পধন্বা তরুণ-তরুণীর মর্মস্থল বিদ্ধ ক'রে ক্ষান্ত হয় না, তাদের দিয়ে অচলায়তনের দেয়াল ভাঙায় কেমন ক'রে, সে কাহিনী আছে এই কবিতায়।

অপ্রকাশ

কবি নারীকে আহ্বান করছেন—

> "মুক্ত হও হে সুন্দরী।
> ছিন্ন করো রঙীন কুয়াশা,
> অবনত দৃষ্টির আবেশ
> এই অবরুদ্ধ ভাষা,
> এ অবগুণ্ঠিত প্রকাশ।"

পরে আরও জোরে বলছেন—

> "ছায়াচ্ছন্ন যে লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি'
> সত্তার ঘোষণা বাণী স্তব্ধ করে, জেনো সে অশুচি।"

শেষ লাইন দুটিতে তাঁর সাবধানী বাণী—

> "ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে।
> খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।"

"দুর্ভাগিনী"তে চিরবৈধব্যের সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন, 'বিচিত্রিতা'র দ্বারে-শীর্ষক কবিতায় সেই একই সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন। 'গরবিনী'তে কৃত্রিমতার ঘেরে নারী নিজের মনুষ্যত্ব ও সহজলভ্য প্রেমকে কেমন ক'রে ব্যর্থ করে, তার আভাস দিয়েছেন। মাটির ধূলিতে প্রেম নন্দন রচনা করতে পারে যে আলোকে, তার কথা কবি বলেছেন 'মাটিতে-আলোতে' নামক কবিতায়। দুঃখী—নৈঃসঙ্গ্যের দুঃখ দুর্বিষহ। কিন্তু তার চেয়েও ভীষণ প্রেমের অভাব, যা নিত্যযুক্ত দুজনের মাঝে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের একাকীত্ব সৃজন করে।

> "দুই জনে পাশাপাশি যবে
> রহে একা তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।"

এইখানে কবির প্রেমকাব্যের আনুপূর্বিক বিকাশধারার একটা অপূর্ণ খাপ্-ছাড়া খসড়া শেষ করি। কবির ব্রহ্মসঙ্গীত, স্বদেশ ও শিশু প্রেমের কাব্য এ আলোচনায় বাদ দিয়েছি।

কবির প্রেমসঙ্গীতের উল্লেখ না করলে এ আলোচনায় মস্ত একটা ফাঁক থেকে যাবে। লিরিক্-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ একটি দৃষ্টি, একটি হাসি, একটি চপল মুহূর্তের ভিতে তাঁর কল্প-সৌধ রচনা করেন, পদ্ম যেমন তার ক্ষীণ বৃন্তের উপর ফোটায় তার শতদল।

> একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি,
> তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
> কিছু পলাশের নেশা,
> কিছু বা চাঁপায় মেশা
> তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি।
> যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে,
> চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
> যেটুকু যায় রে দূরে
> ভাবনা কাঁপায় সুরে,
> তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি।

এই গানে কয়েকটি রেখায় কবি নিজের নিখুঁৎ ছবিটি এঁকে দেন। 'লোকসাহিত্যে' তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান—এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার কাছে মোহমন্ত্রের মত ছিল এবং এখনও সেই মোহ ভুলিতে পারি নাই।" যখনই অণুকণার সংঘাত লাগে কবির চেতনায়, অমনই তাঁর অবচেতন মন থেকে যেন বন্যা নামে কবিতার উদ্বেল তরঙ্গে—নদেয় আসে বান।

কথা আর সুর যমজের মত ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাঁর গানে। এ সুর কথার গেলাপ নয়, তার শব্দকঙ্কালের ফাঁক ভরাট ক'রে উদ্বেল হয়েছে প্রাণময় তনুতরঙ্গে। সোনার কাঠির স্পর্শে নিস্পন্দ বাণী উজ্জ্বল হয়েছে সুরমূর্ছনায়।

> "ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে
> আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে।"

কথাগুলি ছন্দের বাঁধনে সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই

গানটি যেদিন স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছিলাম—প্রায় চল্লিশ বছর আগে, তাঁর সে গানের ঝঙ্কার আজও আমার প্রাণে থামে নি। রবীন্দ্রনাথের গানে কথাগুলি যেন সুরে বাষ্পীভূত হয়ে উঠেছে। গানগুলি বাক্য-চয়নে অনবদ্য হ'লেও যতক্ষণ না সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে, ততক্ষণ ওদের অন্তর্গুপ্ত মাধুরী ও তাৎপর্য অনেকটা প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। ময়ূর পেখম না মেললে তার রঙের বাহার অগোচরেই থেকে যায়। এই সুরগুলি আবার কথারই সূক্ষ্মতন্তু, যাদের মূল রয়েছে বাক্যের অন্তস্তলে। মরমী গায়ক ছাড়া কারুর সাধ্যি নাই সুরের ভিতর দিয়ে বাক্যের অনির্বচনীয় স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলতে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে কণ্ঠে আয়ত্ত করতে হ'লে তাঁর কাব্যচর্চা সুরসাধনার অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে গভীরতর করতে হবে।

অপূর্ণ আজন্ম চলেছে পূর্ণতার অভিসারে। নদীর মত তার আবেগ প্রস্থ ও গভীরতা বেড়ে চলে যত সে অকূলের কাছে পৌছায়। প্রাণবান্ গতিমান যিনি, তাঁর কাছে বার্দ্ধক্য হচ্ছে "The last of life for which the first was made"। রবীন্দ্রনাথ Rabbi Ben Ezra ওরফে ব্রাউনিঙের সঙ্গে এই অসীমের পথে সহযাত্রী। মাঝে মাঝে দু-চারটি লেখা অতৃপ্তির বেদনায় রাঙা হয়ে ওঠে, যখন পুরানো লাল কালির কলমটা দৈবাতে কবির হাতে পড়ে। এই রকম দু-একটা আঁচড়ে পূর্বস্মৃতির রক্তাভাসটুকু ফুটেই মিলিয়ে যায় ভবিষ্যের আশা ও আনন্দে। তাঁর কাব্যলক্ষ্মী মাঝে মাঝে যেন সখ করে রাঙা পাড়ের শুভ্র শাড়ী পরেন।

ছেলেমেয়ের মুখে বাপ-মার আদল থাকে, কিন্তু তার উপরেও থাকে তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যেটা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব। রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যে তাঁর জন্মগত সংস্কার ও জীবনগত উপলব্ধিকে অতিক্রম ক'রে রয়েছে এমন একটি অভিব্যক্তি, যাকে স্বয়ম্ভু বলা যেতে পারে, যা কবির অজ্ঞাতসারেই নিজ রহস্যে ও মাধুর্যে আপনাকে গ'ড়ে তুলেছে, ছন্দঘূর্ণীর আকর্ষণে নানা ভাসমান শব্দপুঞ্জের চয়নিকা রচনা ক'রে।

রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ এক দিন না এক দিন চিতায় ভস্মসাৎ হবে। কিন্তু তাঁর অমর আত্মাকে আমরা যেন আমাদের জীবনে নিরায়ু না করি—হিংসায়, দ্বেষে, অসহযোগে ও ভীরুতায়। 'অনিরাকরণমস্তু'। রবীন্দ্রনাথ চিরসুন্দরের পূজারী। সেই সুন্দরের উপাসনায় আমাদের অন্তরে সাহিত্যে লোকাচারে কদর্যতা বিলুপ্ত হোক। আমাদের চিত্তশুদ্ধিতেই 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' পুণ্য হবে, বাঙালীর পণ আশা কাজ ভাষা সত্য হবে, বাংলার নরনারী একতায় বলিষ্ঠ হবে।

জীবনের আলো

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

ঘুম ভেঙে দেখি রাত্রির শেষে প্রভাত এসেছে ফিরে
দূর হ'তে শুনি বিহগ-কাকলী গহন-কানন ঘিরে।
একমনে তাহা করি সঞ্চয়, স্থির হয়ে পাতি কান
পাখীর কণ্ঠ ফুকারিয়া যায় অর্থ-বিহীন তান।
দূরের সে সুর প্রভাত-সমীরে ভেসে আসে যবে কাছে
মনে হয়, এই জীবনের সাথে কোথা এর যোগ আছে?
চোখের সামনে বেড়ে যায় বেলা, মনে প'ড়ে যায় নিতি
বাঁচিয়া থাকার বিড়ম্বনার অতি সুকঠোর রীতি।

দুর্গম পথে চলিতে চলিতে প্রতি দিবসের কাজে
প্রতি পদে পদে দুঃসহ বাধা কণ্টকসম বাজে।
ঊর্দ্ধ্ব গগনে প্রখর রৌদ্রে তপন যখন ঘুরে
দগ্ধ জীবন পায় না খুঁজিয়া প্রভাত-পাখীর সুরে।
দিন-শেষে তাই ডুবে গেলে রবি ক্ষণেক চক্ষু বুজি
মৃত্যুর সাথে হারানো আলোর সম্বন্ধটা খুঁজি।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

"শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" মন্ত্র সাধন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি]

ওঁ

কুষ্টিয়া

কল্যাণীয়েষু

আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও 'পিতানোঽসি' এবং 'অসতোমা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি—করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত আমার মন ঐ দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্', এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে—কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনো প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো আমি গায়ত্রীমন্ত্রও ধ্যান করিয়া থাকি।

কিছু দিনের জন্য শিলাইদহে আসিয়াছি। মাঘের আরম্ভে কলিকাতায় যাইব। ৬ই মাঘে পিতৃদেবের মৃত্যুদিনের সাম্বৎসরিক সভা। ঐ সভায় আমাকে কিছু পাঠ করিতে হইবে।

৭ই পৌষে সকালে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মাঘের প্রবাসীতে বাহির হইবে। রাত্রে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ৬ই মাঘে আমি পাঠ করিব। ও পরে তাহা ভারতীতে বাহির হইবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ১৮ই পৌষ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

শীল সাধন* সম্বন্ধে তুমি যে চেষ্টা করচ সেটা আমার কাছে ভাল বোধ হচ্চে। একে একে একটু একটু করে মনটা পরিষ্কার করে না ফেল্লে অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত হয় না। কিন্তু বুদ্ধদেব যে কয়টি শীল ঠিক করে দিয়েছেন ঠিক তাই এখন চলবে না—নিজের চিত্তের মধ্যে অবগাহন করে নিজের হৃদয়ে যে যে গ্রন্থি আছে বিশেষ ভাবে সেইগুলি একে একে মোচন করবার চেষ্টা কোরো।

হস্তসার বলে বৌদ্ধ গ্রন্থে বৌদ্ধ সাধনার অনেকগুলি ক্রম আছে। এখানকার লাইব্রেরীতে আছে—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতেও বোধ হয় কিনতে পাওয়া যায়।

মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—মন্ত্র-সাধন ছাড়া তার অন্য কোনো পথ আমি ত জানি নে। যখন একটু অবকাশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং

ব্রহ্ম—শান্তম্ শিবমদ্বৈতং এই মন্ত্রটাকে মনের একেবারে তলা পর্য্যন্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো—ঐ কথাগুলো যেন তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। ইতি ৯ই ফাল্গুন ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* শীল সাধন সম্বন্ধে 'শান্তিনিকেতনে' প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মৈত্রী সাধন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি]

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কি সেটা দেখ্‌তে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ্ সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ দূরই চরম কথা হয় তাহলে বাসনা লোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মৈত্রী ভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য—আমাদের অহং আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে, বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে আনন্দের দিকে নয়—এই জন্যই অহংকে নির্ব্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। আমার "পূর্ণিমা" বলে 'চিত্রা'র একটা কবিতা পড়েছ? তাতে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় বোটে বসে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেমনি বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি দেখি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে। ঐ ছোট্ট একটি বাতি আমার টেবিলে জ্বলছিল বলে আকাশভরা জ্যোৎস্না আমার ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি—বাইরে যে এত অজস্র সৌন্দর্য্য দ্যুলোকভূলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি নি। অহং আমাদের সেই রকম জিনিষ—অত্যন্ত কাছে এই জিনিষটা আমাদের সমস্ত বোধশক্তিকে চার দিক থেকে এমনি আবৃত করে রেখেছে যে অনন্ত আকাশভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারচি নে—এই অহংটার যেমনি নির্ব্বাণ হবে অমনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্ত্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলচেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ঐ প্রকৃতি—সে যে, যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্ব্বাপিত করতে হয় এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আস্‌ত না। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবিধ প্রসঙ্গ

এমারি, আমেরি, না "আ-মরি !" ?

বর্তমান ভারত-সচিবের নাম বাংলা অক্ষরে কেউ লেখেন 'এমারি', কেউ-বা লেখেন 'আমেরি'; কেউ "আ-মরি !" লেখেন কি না জানি না। কিন্তু কেউ যদি "আ-মরি !" লিখতেন, তা হ'লে, ভারত-সচিবের কৃতিত্ব বিবেচনা করলে, তা নিতান্ত বেমানান হোত না।

—

এক-জবাবি ভারত-সচিব

সুবিখ্যাত ইংরেজ বাগ্মী এড্‌মণ্ড্‌ বার্কের সমসাময়িক পার্লেমেণ্ট-সদস্য উইলিয়ম জেরার্ড হামিল্টন ইতিহাসে 'এক-ভাষণ হামিল্টন' (Single-speech Hamilton) ব'লে বিদিত। তিনি জীবনে আরও বক্তৃতা যে করেন নি, এমন নয়। কিন্তু তাঁর একটি বক্তৃতাই শ্রোতাদের ও সর্বসাধারণের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ ক'রেছিল ব'লে তাঁর নামের গোড়ায় "সিংগল-স্পীচ্‌" (এক-ভাষণ) বিশেষণটি ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে।

আমাদের বর্তমান ভারতসচিব এমারি সাহেবকেও সেই রকম "একোত্তর" বা "এক-জবাবি" বিশেষণে বিভূষিত করা যেতে পারে। কারণ, যদিও তিনি পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের অনেক জবাব দিয়েছেন, তথাপি অনেক প্রশ্নের উত্তরে "ভারতবর্ষের সব দলের মিল আগে হোক, তার পর ভারতের শাসনতান্ত্রিক আরো অগ্রগতির বিষয় বিবেচিত হবে," তাঁর এই মামুলি জবাব তাঁকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। তিনি বাংলা কিম্বদন্তীর সেই প্রসিদ্ধ 'ভদ্রলোকে'র মতন যিনি ঋণশোধের তাগিদের উত্তরে প্রত্যহ বলতেন, "বলেছি তো কা'ল দেবো— ভদ্রলোকের এক কথা।" এই 'এক-কথা ভদ্রলোক'এর উল্লেখ এমারি সাহেবের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনেক মাস আগেও করেছিলাম। বার বার একই কথা বলার এমারি-ছোঁয়াচ আমাদিগকেও লেগে গিয়ে থাকলে তা বিস্ময়ের বিষয় বিবেচিত হবে না। মিঃ এমারিও এই এক-কথা ভদ্রলোকের ভূমিকায় পার্লেমেণ্ট-রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, "বলেছি তো, ভারতের সব দলের লোক সম্মিলিত দাবী করলেই কিছু একটা দিয়ে ফেলব; বার বার কেন বিরক্ত করেন? জানেন না, ভদ্রলোকের এক কথা?"

দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ইংলণ্ড কোন বিদেশী জা'তের অধীন হোত এবং যদি সেই জা'ত ইংরেজদিকে ব'লত, "তোমাদের সব দল সম্পূর্ণ একমত হ'লেই তোমরা স্বরাজ পাবে" তা হ'লে ইংরেজরা কখনও স্বরাজ পেত কি-না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

গত ৮ই জানুয়ারী পার্লেমেণ্টে সাধারণ তর্কবিতর্কের সময় কয়েক জন 'ভারত-বন্ধু' সদস্য মিঃ এমারিকে অনেক প্রশ্ন করেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিতে বলেন। তাতে তিনি বলেন :—

"I have noted the resolutions passed by leaders of political parties in India towards the end of December and various statements made by political leaders in connection therewith, but I regret I cannot discover in them any satisfactory response to the Viceroy's recent appeal for unity and co-operation in the face of common danger. Government will not abate their efforts to promote that measure of agreement which is essential to the fulfilment of their pledges in India, pledges which though given independently of the Atlantic Charter are in complete accord with the general principle affirmed in that declaration."

তাৎপর্য। "ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলসমূহের নেতারা ডিসেম্বরের শেষের দিকে যে-সব প্রস্তাব ধার্য করেছেন এবং সেই সম্পর্কে নেতারা যে-সব বিবৃতি দিয়েছেন, আমি তা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু রাজপ্রতিনিধি (বড়লাট) সম্প্রতি সকলের সাধারণ আসন্ন বিপদে একতা ও সহযোগিতার জন্যে যে আপীল করেছিলেন, ঐ সব প্রস্তাবে ও বিবৃতিতে সেই অনুরোধের কোন সন্তোষজনক সাড়া আমি আবিষ্কার করতে পারছি না ব'লে আমি দুঃখিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলি পূর্ণ করবার জন্যে সব দলের যতটা ঐকমত্য আবশ্যক, ততটা ঐকমত্য জন্মাবার চেষ্টা গবর্মেণ্ট কমাবেন না। ঐ অঙ্গীকারগুলি আটলাণ্টিক সনদের সহিত নিঃসম্পর্ক ভাবে দেওয়া হয়ে থাকলেও, সেই ঘোষণার স্বীকৃত নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

গবর্মেণ্ট সকল রাজনৈতিক ও অন্য দলগুলির মধ্যে ঐকমত্য ও সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা কিরূপ ক'রে আসছেন, তার বর্ণনা অনাবশ্যক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তার একটা প্রধান দৃষ্টান্ত। কর্তৃপক্ষ সেই চেষ্টা কমাবেন না ব'লেছেন। না-বাড়ালেই বাঁচি! গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষকে

যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলা আটলান্টিক সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ভারতবর্ষের কোন দলের কোন নেতা কিম্বা কোন বে-দল নেতা, বা কোন ভারতীয় কাগজের ভারতীয় সম্পাদক তা স্বীকার করেন না।

এমারি সাহেবকে যত পার্লেমেণ্ট সদস্য যত প্রশ্ন করেছেন, প্রত্যেকটি উদ্ধৃত করে তার উত্তর এখানে মুদ্রিত করা অনাবশ্যক। কেবল তাঁর কতকগুলি উত্তরের তাৎপর্য দিচ্ছি।

মিঃ এমারি একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেন :—

"রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ায় উপনীত হবার প্রকৃত ইচ্ছুকতার সুযোগ গ্রহণ করতে গবর্মেণ্ট স্বভাবতই আগ্রহান্বিত।"

এই "স্বাভাবিক" আগ্রহের প্রমাণ কী? দলগুলির একমত হবার ইচ্ছুকতা "প্রকৃত" কিনা, তার বিচারক কি তাঁরা হ'তে পারেন, ভারতীয়েরা এক হ'লে যাঁদের প্রভুত্ব টিকবে না?

মিঃ এমারির উক্ত উক্তিতে অন্য এক জন সদস্য প্রশ্ন করেন :—

খাতিরনাদারৎ উপেক্ষাসূচক প্রভুত্বব্যঞ্জক ('masterful') নিক্রিয়তার নীতি বজায় না রেখে আপনিই নিজে কেন রাজনৈতিক দলগুলির মিলন ঘটাবার জন্যে কিছু করুন না?"

মিঃ এমারি বললেন,

"আমি তা ক'রব যখন তাতে কোন ফলের সম্ভাবনা দেখব।"

যিনি না-দেখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি কেমন ক'রে দেখবেন?

অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব বলেন :—

"আমার 'আশঙ্কা' হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির যে-সব প্রস্তাবের কথা আপনি বলছেন, সেগুলি সর্ববাদিসম্মত হওয়ার থেকে বহু দূরে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের বিপরীত।"

সোজা বাংলায় এর মানে এই যে, মুসলিম লীগের মনিব জনাব জিন্না সাহেব যা মঞ্জুর করবেন না, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তা মঞ্জুর করবেন না। আবার, জিন্না সাহেবও পণ করে বসে আছেন যে, তিনি যা চান, ঠিক সেইটি না-পেলে তিনি কারো কোন প্রস্তাবে রাজী হবেন না। আরো মজার কথা এই যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় স্বাজাতিকদের (ন্যাশন্যালিষ্টদের) দাবী অগ্রাহ্য করবার বেলা জিন্না-সাহেবের আপত্তির 'সুযোগ' গ্রহণ করছেন, কিন্তু তাঁর যে প্রধান দাবী পাকিস্তান তাও মঞ্জুর করছেন না—করতে পারেন না! কারণ, পাকিস্তানের দাবী অনুসারে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত ক'রে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কোন লাভ নাই, বরং অসুবিধা খুব আছে; অধিকন্তু পাকিস্তানি প্রস্তাব মঞ্জুর করলে দলনির্বিশেষে ভারতবর্ষের সব হিন্দু, সব শিখ, সব খ্রীষ্টিয়ান ও অন্য সব অমুসলমান এবং বিস্তর মুসলমানও খুব বেশী অসন্তুষ্ট হবে—বিদ্রোহী হবে বললেও চলে।

মিঃ গর্ডন ম্যাকডন্যাল্ড ভারতসচিবকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ভারতবর্ষে একটি শুভইচ্ছা মিশন (Good-will mission) পাঠিয়ে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির পন্থা ও উপায় আলোচনার বিষয় চিন্তা করেছেন কিনা। উত্তরে ভারতসচিব বলেন,

"আমি মধ্যে মধ্যে বড়লাটের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করেছি, কিন্তু এ রকম মিশন পাঠিয়ে কোন সুফলের সম্ভাবনা দেখি নি।"

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যখন প্রভুত্ব একটুও ছাড়তে চান না, তখন এ রকম মিশন পাঠান যে নিষ্ফল হবে, এ সিদ্ধান্ত খুবই ঠিক।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব বলেন :—

"We cannot make further progress constitutionally in India until there is some willingness on the part of the leading parties to work together. It is not in our power to bring them together."

"প্রধান প্রধান দলগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবার কিছু ইচ্ছুকতা না থাকলে আমরা শাসনতান্ত্রিক উন্নতির পথে আর এগুতে পারি না। দলগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি আনা আমাদের শক্তির বাইরে।"

দলগুলির ঐক্যসম্পাদন গবর্মেণ্টের সাধ্যাতীত হ'তে পারে, কিন্তু অতীত ও সমসাময়িক ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, দলগুলিকে পরস্পর থেকে দূরে রাখা বা তাদের মধ্যে দূরত্ববৃদ্ধি গবর্মেণ্টের সাধ্যাতীত নয়।

যে-সব প্রদেশে মন্ত্রীদের সব ক্ষমতা গবর্নর নিজের হাতে নিয়েছেন, সেই সব প্রদেশের মধ্যে উড়িষ্যায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে—ভারতসচিব বলেন। আর কোথাও মন্ত্রিসভা গঠিত হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"যখন মন্ত্রিসভাসমূহ কাজ করতে প্রস্তুত হবে, তখন আমরা যা কিছু সম্ভব করব।"

আসামে ত শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী মন্ত্রিসভা গঠন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন ও আছেন। তাঁর সহযোগী মন্ত্রী হবার লোকও রয়েছেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টাকে সফল করবার জন্যে গবর্মেণ্ট যা-কিছু সম্ভব করেছেন কি? আসামে স্বাজাতিক নূতন নেতার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতাই আসামের গবর্নর করেন নি কি?

—

"পাষাণ-প্রাচীর-ভঙ্গী"

ভারত-সচিব এমারি সাহেব সম্বন্ধে আর একটি কথা লিখতে হবে। পার্লেমেণ্টে গত ৮ই জানুয়ারী প্রশ্নোত্তরের সময় তাঁকে সদস্য মিঃ হাডেন্ গেস্ট্ প্রশ্ন করেন :—

'Whether his attention had been called to the appeal in the name of the Rt. Hon'ble Srinivasa Sastri and other persons—three of them members of the Privy Council—which does indicate a new centre and rallying point of Indian opinion and in view of that appeal, which was backed up by the "Times" this morning, will not he reconsider **this stonewall attitude ?** Does not he feel that that is doing a great deal of harm to India and is a great danger to war effort in the Far East ?'

No answer was returned.—(Reuter).

মিঃ হাডেন গেস্ট্ জানতে চান,

"শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতি নেতাদের আবেদন ভারত-সচিবের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে কিনা। "টাইমস্" ঐ আবেদন সমর্থন করেছেন। মিঃ এমারি তাঁর এই পাষাণ-প্রাচীর-ভঙ্গী সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করবেন কিনা ? তিনি কি মনে করেন না যে, ঐ ভঙ্গী ভারতবর্ষে খুব বেশী পরিমাণ অনিষ্ট করছে এবং সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ-চেষ্টার পক্ষে ঐ ভঙ্গী মহা বিপজ্জনক ?"

মিঃ এমারি এই প্রশ্নগুলির কোন উত্তর দেন নি।—রয়টার।

উত্তর না দেওয়াটা পাষাণ-প্রাচীর-ভঙ্গীরই একটা অঙ্গ হ'তে পারে, কিম্বা উত্তরদান-সামর্থ্যের অভাবও সূচিত করতে পারে।

ভারতবর্ষে বড়লাট ১৯৪০ সালের "আগষ্ট মাসের অফার্" ধ'রে ব'সে আছেন, আর ভারত-সচিব সর্বদল-সম্মিলনের প্রতীক্ষায় আছেন ;—কেউ এই পাষাণ-প্রাচীর-ভঙ্গী থেকে একচুলও নড়বেন-চড়বেন না।

পাষাণপ্রাচীরের বাধা দূর করবার দুটা উপায় আছে। এক হচ্ছে প্রাচীরটা ভেঙ্গে ফেলা; আর দ্বিতীয় হচ্ছে উল্লঙ্ঘন, ডিঙ্গিয়ে যাওয়া। ভাঙতে হ'লে বল প্রয়োগ করতে হবে, প্রাচীরের গায়ে ঘা লাগাতে হবে। সুতরাং ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে সে উপায় অবলম্বনীয় নয়—মহাত্মা গান্ধীর মতে কোন অবস্থাতেই অবলম্বনীয় নয়। কাউকে আঘাত না ক'রে কিন্তু দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। আমরা বাধাটাকে ডিঙিয়ে অতিক্রম করতে পারি।

বাংলায় একটা কথা চলিত আছে, 'ভাঙবে, তবু মচ্‌কাবে না।' পাষাণ-প্রাচীরের ভঙ্গীটা কতকটা সেই রকম। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে কখনো নরম হ'তে জানেন না, তা নয়। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে নাৎসীদিগকে ও হিটলারকে খুশি করবার জন্যে তাঁরা যথেষ্ট নতি স্বীকার ক'রেছিলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে এখন পর্য্যন্ত তাঁরা আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের কাছে যথেষ্ট নতি স্বীকার ক'রে খুব শিষ্ট ব্যবহার করে আসছেন ;—কারণ এরা সবাই স্বাধীন ও শক্তিমান্। কিন্তু ব্রিটেনের পদানত ভারতবর্ষের ন্যায্য দাবীও গ্রাহ্য তাঁরা কেমন ক'রে করবেন ? সেটা যে দুর্বলতার লক্ষণ ব'লে বিবেচিত হবে। অতএব, যারা তাঁদের অধীন ও তাঁদের বিবেচনায় দুর্বল, তাদের সম্বন্ধে উদ্ধত উপেক্ষার ভঙ্গীই তাঁদের বিবেচনায় যথাযোগ্য ও শোভন ব্যবহার।

—

উদারনৈতিক নেতাদের অনুরোধ

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কাছে সর্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ উদারনৈতিক নেতারা যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং যে অনুরোধ আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়েছে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তা উপেক্ষা করেছেন। তথাপি তার সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা আবশ্যক।

এই অনুরোধের প্রধান কথা এই যে, ব্রিটেন যেন ভারতবর্ষের প্রতি আর এরূপ ব্যবহার না করেন যা অধীন দেশের (dependencyর) প্রতি করা হয়ে থাকে—স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, ভারতবর্ষের প্রতিও যেন সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। তাঁরা চেয়েছিলেন বড়লাটের শাসনপরিষদের সমুদয় আসনগুলিতে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় কোন-না-কোন ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করা। সব দপ্তর—দেশরক্ষা বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগও—এই বেসরকারী সদস্যগণকে দেওয়া হোক, এই তাঁদের অভিলাষ ছিল। শাসনপরিষদে সরকারী চাকর্যে কেউ থাকবে না, এই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন, এই সদস্যেরা 'মুকুটে'র ("Crown"এর) কাছে দায়ী থাকবেন। মুকুটধারী ইংলণ্ডেশ্বর সাক্ষাৎভাবে কারো কাছ থেকে কোন কৈফিয়ৎ নেন না—যাঁরা তাঁর মন্ত্রী বা প্রতিনিধি তাঁদের কাছে জবাবদিহি হ'লেই তাঁর কাছে জবাবদিহি হওয়া হয়। অতএব, মুকুটের কাছে দায়ী হওয়ার মানে বড়লাটের ও ভারতসচিবের কাছে দায়ী হওয়া। তা হ'লে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থাকে স্বরাজ বলা যায় না। শাসন-পরিষদের সদস্যেরা কেন্দ্রীয় আইন-সভার কাছে দায়ী হবেন, ব্যবস্থা এই রকম হ'লে তাকে কতকটা স্বরাজ ও জাতীয় গবর্মেণ্ট বলা চলে। কিন্তু

বর্ত্তমান ভারতশাসন-আইন না বদলালে শাসন-পরিষদকে ব্যবস্থাপক সভার নিকট জবাবদিহি করা যায় না এবং ঐ আইনের যে-রকম পরিবর্ত্তন করলে তাকে ঐ সভার কাছে দায়ী করা যায় সে-রকম পরিবর্ত্তন যুদ্ধের সময় হওয়ার আশা নাই।

এই কারণে বোধ হয় উদারনৈতিক নেতারা শাসন-পরিষদকে বড়লাট ও ভারতসচিবের নিকট দায়ী করতে চেয়েছিলেন—এখন যেরূপ ব্যবস্থা আছে।

প্রদেশগুলি সম্বন্ধে উদারনৈতিক নেতারা চেয়েছিলেন যে, গবর্ণররা যে-সকল প্রদেশে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন, সেখানে পুনর্বার মন্ত্রিসভা গঠিত হোক; যদি তা সম্ভব না-হয়, তা হ'লে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে যেমন সকল দলের বেসরকারী সদস্য নিয়ে শাসন-পরিষদ গড়বার কথা বলা হয়েছে, সেই রকম শাসন-পরিষদ গঠিত হোক।

উদারনৈতিক নেতারা যা চেয়েছিলেন, তা ঠিক স্বরাজ না হলেও ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার চেয়ে তা কিছু ভাল নিশ্চয়ই হোত—এখনকার চেয়ে কিছু বেশী ক্ষমতা দেশের লোকদের প্রতিনিধিস্থানীয় কতক-গুলি নেতার হাতে আসত। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ততটুকু ক্ষমতাও ছেড়ে দিতে চান না।

—

"অচল অবস্থা" দূরীকরণের উপায়

ভারতবর্ষের অনেক খবরের কাগজে ও অনেক নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে "অচল অবস্থা"র ("deadlock"এর) উল্লেখ ও তা দূর করবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা অনেক মাস ধ'রে দেখা যাচ্ছে। বিলাতী অনেক কাগজ ও পার্লেমেণ্ট-সদস্যও এই অচল অবস্থার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সবাই এই অবস্থা দূর করবার কোন-না-কোন উপায় বাৎলাচ্ছেন এবং গবর্মেণ্টকে সেই রকম কোন উপায় অবলম্বন করতে বলছেন। কিন্তু অবস্থাটা যে 'অচল' হয়েছে, গবর্মেণ্টের ত সে রকম ধারণা হয় নি। দেশের লোকদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা না-দিয়েও গবর্মেণ্ট যত সৈন্য চান, তত পাচ্ছেন, যত যুদ্ধসম্ভার চান তত পাচ্ছেন, যত টাকা খরচ করতে চান তা খরচ করতে পারছেন। সুতরাং তাঁদের বিবেচনায় অবস্থাটা অচল হয় নি।

যদি ভবিষ্যতে আরও অনেক সৈন্যের, আরও অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্রের ও যুদ্ধসম্ভারের, এবং রাজকোষে আরও অনেক টাকার আবশ্যক হয়, কিন্তু যদি গবর্মেণ্ট দেখেন যে তা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাঁরা বুঝবেন অচল অবস্থা (deadlock) হয়েছে বটে;—তখন তাঁরা সচলতার উপায় খুঁজবেন, এবং বেসরকারী লোকদের পরামর্শে কান দিতেও পারেন।

—

স্বাধীনতার দাবী কি দরকষাকষি ?

সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজরা ভারতীয়দিগকে বলছেন, "তোমরা এই যুদ্ধটাকে নিজেদের যুদ্ধ ব'লে গ্রহণ কর এবং আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কর।" তার উত্তরে অনেক ভারতীয় নেতা বলেছেন, "তোমরা স্বাধীন, নিজেদের স্বাধীনতা, সাম্রাজ্য ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যে লড়ছ এবং কেমন ক'রে লড়তে হবে তাও নিজেরাই স্থির করছ। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা নাই, আমাদের স্বদেশ ভারতসাম্রাজ্যটাও আমাদের নয়, সম্পত্তিও নিজের কিনা বলা কঠিন। তোমাদের ও আমাদের অবস্থার মধ্যে অনেক তফাৎ। তফাৎটা ঘুচিয়ে আমাদিগকেও স্বাধীন হতে দাও, নিজের দেশের ও সম্পত্তির মালিক হতে দাও; তা হ'লে প্রভেদ ঘুচে গিয়ে যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের ও আমাদের আচরণ একই রকম হবে।" তাতে ইংরেজরা চটে গিয়ে বলছেন, "তোমরা সহযোগিতার দাম চাচ্ছ, দরকষাকষি করছ।" কিন্তু এ ত দরকষাকষি নয়; স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই এবং ব্রিটিশাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই, এই উভয়ের পশ্চাতের মনোভাব স্বভাবত আলাদা হবেই। কোন দুই পক্ষের অবস্থা ও মর্যাদা সমান না হ'লে তাদের মনোভাব ও আচরণ একই রকম হোতে পারে না।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর ও অন্য কোন কোন রাজপুরুষ, ভারতবর্ষ নাৎসীদের অধীন হ'লে আমাদের কি রকম দুর্দশা হবে, তার বর্ণনা ক'রে ভয় দেখিয়েছেন। নাৎসীরা (এবং জাপানীরাও) ইংরেজদের চেয়ে খারাপ, তা স্বীকার করে নিলেও কিন্তু এ কথাটা ত স্বীকার করা যায় না যে, ইংরেজাধীনতা স্বাধীনতার সমান। এবং আমরা ত ইংরেজাধীনতার পরিবর্তে নাৎসী, জাপানী বা অন্য কারো অধীনতা চাচ্ছি না;—স্বাধীনতাই চাচ্ছি।

—

বাণী-মাল্যের বন্ধন

বাংলা ভাষা যত দিন বাংলা ভাষা ব'লে পরিচিত, বাংলা সাহিত্য যত দিন বাংলা সাহিত্য ব'লে বিদিত,

বাংলা যত দিন বাংলা ব'লে পরিজ্ঞাত, তার কোনো দিনই শ্রীহট্ট বঙ্গের বাইরে ছিল না। এখন শাসকেরা তাকে বাংলা প্রদেশের বাইরে ফেললেও, শ্রীভূমি বঙ্গের অঙ্গীভূতই আছে ও চিরকাল থাকবে। বঙ্গের সহিত তার ভাষার ও সাহিত্যের বন্ধন কখনো ছিন্ন হবার নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্যহাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙালীর আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।"

শ্রীহট্ট থেকে "কবি-প্রণাম" নাম দিয়ে যে সুন্দর পুস্তকখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তার গোড়ায় এই কবিতাটি আছে।

কেবল শ্রীহট্টের সঙ্গেই যে বঙ্গের বাণী-মাল্যের এই বন্ধন রয়েছে তা নয়। বঙ্গের অঙ্গীভূত আরো কোন কোন ভূভাগকে বাংলার রাষ্ট্রসীমা হ'তে নির্বাসিত করা হয়েছে; যেমন মানভূম। কিন্তু বাণী-মাল্য এই সব ভূখণ্ডকে বাঙালীর হৃদয়ের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। তারা সাংস্কৃতিক বঙ্গের অঙ্গীভূত।

বঙ্গের এই সকল অঙ্গের সহিতই যে বাঙালীর হৃদয়ের বাণী-মাল্য বন্ধন তা নয়; বঙ্গের ভিতরে বা বাইরে যে কোনো স্থানে যে কোনো বাঙালী বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন পড়েন, তিনিই বঙ্গের সহিত বাণী-মাল্যে বাঁধা প'ড়ে আছেন। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন এই বন্ধনের বাহ্য রূপ।

—

"কবি-প্রণাম"

বঙ্গভূমির সঙ্গে শ্রীভূমি যে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, "কবি-প্রণাম" বইখানি তার অন্যতম প্রমাণ। পুস্তকখানি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। তাঁর সঙ্গে যাঁদের সংস্পর্শ ঘটেছে, এরূপ অনেক লেখকের লেখা এতে আছে। কবিতা অনেকগুলি আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্বন্ধীয় লেখাগুলি—যেমন প্রমথ চৌধুরীর "ছড়া", ক্ষিতিমোহন সেনের "ভারতের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথ", বুদ্ধদেব বসুর "রবীন্দ্রনাথের গদ্য", জগদীশ ভট্টাচার্যের "তিন পুরুষ", নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রকাব্যে ভূলোক ও দ্যুলোক"—পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। যে-সব প্রবন্ধে মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সম্পাদকেরা সেই রকম প্রবন্ধ বেশি ক'রে সংগ্রহ ও প্রকাশ ক'রে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা পাঠকসমাজের বর্তমান চাহিদা কি রকম জিনিসের বেশি তা তাঁরা বুঝেন। এই রকম কয়েকটি লেখার নাম করছি। ক্ষিতিমোহনবাবুর একপৃষ্ঠাব্যাপী ছোট প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের মানুষটির পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের ভাবী জীবন-চরিত-লেখকেরা সতীশচন্দ্র রায়ের "রবীন্দ্রস্মৃতি", ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলীর "গুরুদেব", রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আশ্রমের পুরানো কথা", প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের "রবীন্দ্র-রচনার নেপথ্য বিধান", নলিনীকুমার ভদ্রের "যোগাযোগ", সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের "শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ", রাধানন্দ ভট্টাচার্যের "রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব", সত্যভূষণ সেনের "গৌহাটিতে রবীন্দ্রনাথ", হেম চট্টোপাধ্যায়ের "শিলঙে রবীন্দ্রনাথ", এবং যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরীর "অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ" থেকে অনেক উপকরণ পাবেন। ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন মুসলমান ছাত্র। সেই কারণে তাঁর লেখাটির বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু শুধু সেই কারণেই নয়। অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। আলীর বালক-বয়সের চেহারা অস্পষ্ট মনে পড়ছে।

পুস্তকটিতে এমন কয়েকটি ছবি আছে যা অন্য কোথাও বেরয় নি। রবীন্দ্রনাথের "বাঙালীর সাধনা" ও "আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক দুটি বক্তৃতার অনুলিখন আছে যা অন্য কোন বইয়ে নাই। তাঁর অনেকগুলি চিঠি আছে যা অন্যত্র পাওয়া যাবে না। তাঁর কয়েকটি কবিতার তাঁর হস্তলিপির প্রতিলিপিও আছে। পুস্তকের নামানুসারী প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিয়েছেন নন্দলাল বসু।

বহিটি পাওয়া যায় দেড় টাকা দামে শ্রীহট্টের বাণী-চক্রভবনে নলিনীকুমার ভদ্রের নিকট।

একখানি পুস্তকের সম্বন্ধে এত কথা লিখলাম এই জন্যে যে, বিস্তর বাঙালী আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মুদ্রিত সব কথা জানতে চান, এবং তাঁরা এ রকম একখানি বই পড়তে চাইবেন। এই বইটি বের ক'রে শ্রীহট্ট তাঁর কর্তব্য যথাসাধ্য করলেন। বঙ্গের আর যেখানে যেখানে

রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন, তাঁরা সেই সেই জায়গায় তিনি কি ক'রেছিলেন, খুব ছোট ছোট পুস্তিকার আকারেও প্রকাশ করুন না?

"ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ **ছিলেন**, কিন্তু নিত্যকালের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ **আছেন**। 'এখানে নামলো সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হলো।...সূর্য্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত; 'এদের তুমি মিলিয়ে দাও'।"

—"কবি-প্রণাম" পুস্তকে লীলাময় রায়।

—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন এবার বারাণসীতে হ'য়ে গেল। প্রথম অধিবেশনও সেই-খানে হ'য়েছিল, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। কে কোন্ শাখার সভাপতি হবেন, তার সংবাদ অভ্যর্থনা-সমিতির কার্যালয় হ'তে পেয়ে পৌষের প্রবাসীতে দিয়েছিলাম। মূল সভাপতি কে হবেন, সে সংবাদ আমরা না-পাওয়ায় দিতে পারি নি। শিশুসাহিত্য বিভাগ একটি হবে, তার খবরও আমরা আগে পাই নি। অধিবেশন আরম্ভ হবার পর দৈনিক কাগজে দেখলাম, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক বিখ্যাত প্রবাসী-বাঙালী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু সশরীরে উপস্থিত হ'তে পারেন নি, তাঁর অভিভাষণটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ও তা পঠিত হয়েছিল। শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণগুলিও যথারীতি পঠিত হয়েছিল। অন্যান্য কাজ কি রকম হ'য়েছিল, তার কোন ধারাবাহিক বিস্তারিত বর্ণনা দেখি নি। আশা করি ভালই হ'য়েছিল।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সাংবাদিক মাসিক পত্রিকা "প্রবাসী সম্মেলনী"র গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "সম্মেলনের মর্ম্মকথা—কেহ শুনিবে কি?" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যা লিখেছিলেন তার কিছু আলোচনা এই অধিবেশনে হয়েছিল কিনা জান্‌তে ইচ্ছা হয়। ঐ সংখ্যাতেই তাঁর যে দুটি প্রস্তাব মুদ্রিত হ'য়েছিল, তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হ'ল তাও জান্‌তে ইচ্ছা হয়।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন আমাদের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এর অনেক অধিবেশনে যোগ দিয়ে আনন্দ পেয়েছি; আহূত, রবাহূত বা অনাহূত হ'য়ে গিয়েছি, তার বিচার করি নি। এবার কোন রকমেই যেতে পারতাম না, যাই নি। জানা অজানা বহু বন্ধুর সহিত মিলনের আনন্দ হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জন্মের ছাব্বিশ বৎসর আগে প্রবাসী বাঙালী সমাজের সহিত আমাদের যোগ স্থাপিত হয়। একচল্লিশ বৎসর পূর্বে সেই যোগ থেকে "প্রবাসী" মাসিক পত্রের উৎপত্তি।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ড

যুদ্ধের দরুন ছাপাখানার কাজে নানা বাধাবিঘ্ন ঘটেছে। সুতরাং পুস্তকপ্রকাশও কঠিন হ'য়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-রচনাবলীর নিয়মিত প্রকাশ চলছে; তার নবম খণ্ড অন্যান্য খণ্ডের সুশোভন বেশে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বভারতী এর জন্য প্রশংসার্হ।

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশে ক্রেতা ও পাঠকদের সুবিধা এই যে, যাঁরা পঁচিশ খণ্ড বই একসঙ্গে কিনতে পারতেন না, তাঁরাও কয়েক মাস অন্তর অন্তর এক এক খণ্ড কিনতে পারছেন। পাঠকদের সুবিধা এই যে, দুটি খণ্ড প্রকাশের মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান তার মধ্যে শুধু যে এক-একটি খণ্ড তাঁরা প'ড়ে ফেলতে পারেন তা নয়, মন দিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এবং বহুবিষয়ক মতের ক্রমবিকাশও লক্ষ্য ক'রতে পারেন।

এই নবম খণ্ডে কবিতা ও গান বিভাগে "শিশু", নাটক ও প্রহসন বিভাগে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক, উপন্যাস ও গল্প বিভাগে "যোগাযোগ" উপন্যাস এবং প্রবন্ধ বিভাগে "আধুনিক সাহিত্য" আছে। তা ছাড়া পরিশিষ্ট, গ্রন্থপরিচয় ও বর্ণানুক্রমিক সূচী আছে। চারিখানি সুমুদ্রিত উৎকৃষ্ট চিত্র আছে:—(১) রবীন্দ্রনাথের কন্যাগণ ও কনিষ্ঠপুত্র, (২) অশ্বপৃষ্ঠে শমীন্দ্রনাথ (কনিষ্ঠ পুত্র), (৩) রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা, (৪) ঠাকুর-পরিবার ১৩১১ (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদ্যশ্রাদ্ধান্তে গৃহীত)।

"শিশু"র অধিকাংশ কবিতা মাতৃহীন তাঁর পুত্রকন্যাদের পরিতোষের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা ক'রেছিলেন। তারা ভিন্ন আরো অগণিত শিশু এর থেকে আনন্দ পেয়ে আসছে ও পাবে। এই-জাতীয় অতি মনোজ্ঞ উৎকৃষ্ট কবিতাসমষ্টি অন্য কোন দেশের সাহিত্যে আছে ব'লে আমরা অবগত নই। এরই অনেকগুলি কবিতা কবি "ক্রেসেন্ট মুন" নাম দিয়ে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। "ক্রেসেন্ট মুনে"র বহু কবিতা বিদেশীদের কিরূপ প্রিয় তা আমরা ১৯২৬ সালে জার্মেনীতে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলাম।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটক ১৩১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে পুনর্লিখিত হ'য়ে এই নাটক ১৩৩৬ সালে

"পরিত্রাণ" নামে প্রকাশিত হয়। এই উভয় নাটকের—বিশেষতঃ "পরিত্রাণ" নাটকের—ধনঞ্জয় বৈরাগীর আচরণে, কথাবার্তায় ও গানে 'আইন-অমান্য' ও 'ট্যাক্স না-দেওয়া' প্রচেষ্টার পুরা ও সুস্পষ্ট সূচনা আছে। সেই প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত ও ভিত্তীভূত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বও তাতে পাওয়া যায়।

"যোগাযোগ" উপন্যাসটির কয়েক অধ্যায় প্রথমে অধুনালুপ্ত "বিচিত্রা" মাসিক কাগজে "তিন পুরুষ" নাম দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বারে কবি এর নাম বদলে "যোগাযোগ" নাম দেন। এই নাম-পরিবর্তনের যে কৈফিয়ৎ কবি "বিচিত্রা"য় "নামান্তর" নাম দিয়ে প্রকাশিত করেন, এই নবম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে সেটি মুদ্রিত হয়েছে।

"আধুনিক সাহিত্য" অনেকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রথম প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে। কোন অত্যুক্তি না ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় কবি এতে দিয়েছেন। তার পর "বিহারীলাল"। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম কিয়দংশে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁর এই প্রবন্ধটিতে বিহারীলালের বহু কবিতাংশ উদ্ধৃত ক'রে কবি তাঁর সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট ক'রেছেন। তার পরের প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পালামৌ" ভ্রমণবৃত্তান্তের চমৎকার সমালোচনা। অতঃপর "বিদ্যাপতির রাধিকা" প্রবন্ধ। কবি যে খুব অভিনিবেশসহকারে বিদ্যাপতির পদাবলী পড়েছিলেন, তা তাঁর কতকগুলি পদাবলীর প্রবাসীতে প্রকাশিত অনুবাদ থেকে বুঝা যায়।

"আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অনেক পুস্তকের সমালোচনা ক'রেছেন। পুস্তকগুলি এক রকমের নয়। তাতে কবিতার বহি আছে, উপন্যাস আছে, ধর্মতত্ত্ব আছে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে, ইতিহাস আছে; যেমন—কৃষ্ণচরিত্র, রাজসিংহ, ফুলজানি, যুগান্তর (শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত উপন্যাস), আর্য্যগাথা, "আষাঢ়ে", মন্দ্র, শুভবিবাহ, মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, সিরাজদ্দৌলা, ঐতিহাসিক চিত্র, সাকার ও নিরাকার, জুবেয়ার। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থসমালোচনার যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, অন্য সমালোচকেরা তার অনুসরণ করলে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ হবে।

পরিশিষ্টে "শোকসভা" ও "নিরাকার উপাসনা" এই দুটি প্রবন্ধ আছে।

—

"অচলিত" রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের যে-সকল পদ্য ও গদ্য রচনার পুনর্মুদ্রণে তাঁর আপত্তি ছিল, কিন্তু যে-গুলি তাঁর রচনাবলীর অনুরক্ত পাঠকদের নির্বন্ধাতিশয়প্রযুক্ত তিনি ছাপতে অনিচ্ছাসহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেইগুলি বিশ্বভারতী "অচলিত সংগ্রহ" নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ড আগেই বেরিয়ে গেছে, তার পরিচয়ও আমরা আগেই দিয়েছি। সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে। তার কিছু পরিচয় দেবার আগে "অচলিত" নামটি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। "অচলিত সংগ্রহ" না ব'লে আর কি বলা যেতে পারত, হঠাৎ বলতে পারি না। কিন্তু "অচলিত" বলায় লোকের হয়ত ধারণা হ'তে পারে যে, এই রচনাগুলি "অচল" টাকার মত মূল্যহীন। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরবর্তী সময়ের উৎকৃষ্ট রচনাগুলির চেয়ে এগুলির উৎকর্ষ কম বটে, কিন্তু এগুলিরও নিজস্ব উৎকর্ষ আছে। অন্য অনেক লেখক এ রকম লিখতে পারলে অধিকতর যশস্বী হ'তে পারতেন। সেই জন্য বিশ্বভারতীর পুস্তক-প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলির আমরা সমর্থন করি।

"ইতিহাসের খাতিরেই যে এই বর্জিত রচনাগুলি পুনঃ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি তাহা নয়—যদিও তাহা করিলেও অন্যায় হইত বলিয়া মনে করি না; এই রচনাগুলি যে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয়, যে বয়সে এগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন সে বয়সের পক্ষে বিস্ময়কর, এমন নহে; এগুলির রচনাকালে বাংলা সাহিত্য উৎকর্ষের যে পর্য্যায়ে ছিল তাহার পক্ষে এগুলির অধিকাংশই পরম বিস্ময়, এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন রবীন্দ্রনাথকে জয়মাল্য পরাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাব-ঐশ্বর্য্যে দিক দিয়াও এগুলি যে রচয়িতার হীনতা ঘোষণা করিতেছে, এমন কথা অনেক পাঠকই মনে করেন না।"

ত্রিপুরা রাজ্যের স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য দেববর্মা মহোদয় পরে 'অচলিত' "ভগ্নহৃদয়" প'ড়েই কবিকে সম্মানিত করবার নিমিত্ত রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি ও কাব্যরসিক ছিলেন।

সুকবি ও রসসন্ধানী সমালোচক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র বর্তমান মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমের অভিব্যক্তি" প্রবন্ধে 'অচলিত' "বনফুল", "কবি-কাহিনী" প্রভৃতি কাব্যের ও রসের সন্ধান দিয়েছেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যে লিখেছেন, 'অচলিত' রচনাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "পরিণত জীবনের বহু মনন ও কল্পনার সূত্র মিলিবে," সে কথা সত্য।

"অচলিত সংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ডে "আলোচনা" ও "সমালোচনা" নামক অনেকগুলি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ গদ্য রচনা আছে। তদ্ভিন্ন আছে "মন্ত্রি অভিষেক" নামক রাজনৈতিক বক্তৃতা, এবং "ব্রহ্ম মন্ত্র" ও "ঔপনিষদ ব্রহ্ম" শীর্ষক দুটি ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যান।

রবীন্দ্রনাথ যতগুলি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন, সেগুলিও এই খণ্ডে আছে। এর অনেকগুলি বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, এবং সবগুলিই বিদ্যালয়ে ব্যবহারের যোগ্য। এই পুস্তকগুলি হ'তে কবির শিক্ষাদানবিষয়িণী প্রতিভার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। এতে কবির একক দুটি এবং অন্যের সঙ্গে দুটি চিত্র আছে।

—

আশ্রয়-অভিলাষীদের জন্য বিশ্বভারতীর ব্যবস্থা

যুদ্ধজনিত আতঙ্কে অনেকেই কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে গেছেন বা যেতে চান। অনেকে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাসার জন্য চিঠি লিখেছেন। শান্তিনিকেতনে যদিও বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের জন্যও যথেষ্ট বাড়ী নাই, তথাপি কর্তৃপক্ষ কোন কোন সর্তে বাড়ী তৈরি ক'রে দিতে রাজী আছেন—সর্বাগ্রে তাঁদিকে যাঁরা শান্তিনিকেতনে সন্তানদের শিক্ষা দিতে চান। সর্তগুলি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখলে জানা যাবে।

শান্তিনিকেতনের স্বাস্থ্য ভাল। সেখানে ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিখবার ব্যবস্থা আছে, এবং বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কেন্দ্র শ্রীনিকেতনে কৃষি ও নানাবিধ কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বঙ্গে এরূপ শিক্ষাকেন্দ্র দ্বিতীয় নাই। শান্তিনিকেতনের আর এক আকর্ষণ বিদ্বান্ সজ্জনের সংসর্গ।

—

কৃত্তিবাস-স্মৃতিউৎসব

আগামী ২৫শে মাঘ রবিবারে শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে শান্তিপুরের অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিউৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য দেশের সুধী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সর্বসাধারণকে শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছেন।

উৎসবের সহিত একটি 'রামায়ণ-প্রদর্শনী' খোলার আয়োজন হইতেছে। বিভিন্ন সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাচীন মুদ্রিত রামায়ণ, রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত নানা গ্রন্থ, রামায়ণ চিত্রাবলী প্রভৃতি উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে। প্রদর্শনীর সাফল্য বিধানের জন্য দেশের রামায়ণ ও তৎসম্পর্কিত গ্রন্থের প্রকাশক ও লেখকগণের নিকট উদ্যোক্তাগণ এক একখানি গ্রন্থ প্রার্থনা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা ইতিপূর্বে গ্রন্থাদি দান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

কৃত্তিবাস বাঙ্গলার চিরপ্রিয় কবি। দীর্ঘকাল হইতে শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ এই কবি-স্মরণোৎসবের আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। পরিষদের শক্তি সামান্য—উৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য বিধানের জন্য দেশের সমস্ত সংপ্রতিষ্ঠান, সুধীসমাজ ও সর্বসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা পরিষদ্ একান্তভাবে কামনা করিতেছেন। উৎসব সম্পর্কে পত্রাদি প্রেরণের ঠিকানা—সম্পাদক, শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ্, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।

কলিকাতায় ফলের প্রদর্শনী

গত মাসে এই শহরে একটি ফলের প্রদর্শনী খোলা হ'য়েছিল। রক্ষিত ফল ও ফল থেকে প্রস্তুত নানাবিধ খাদ্যও তাতে প্রদর্শিত হ'য়েছিল। এ রকম প্রদর্শনী যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। কল্‌কাতাতেও হওয়া সন্তোষের বিষয়। পঞ্জাবে ফলের চাষ বাড়াবার জন্য একটি বোর্ড ও একটি সাময়িক পত্র আছে। দেশে ফল উৎপাদন ও ফল আহার যত বাড়ে ততই ভাল। বাংলা প্রদেশে উচ্চ ও নিম্ন, পার্বত্য ও সমতল, ঠাণ্ডা ও গরম, শুষ্ক ও আর্দ্র সব রকম অঞ্চল আছে। এতে নানা রকম উৎকৃষ্ট ফলের চাষ হ'তে পারে।

—

বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভা

গত ৬ই পৌষ বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় কর্মসচিব যে রিপোর্ট পড়েন, তা থেকে বুঝা যায় এর সকল বিভাগের কাজ অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রধান সহায়ক মিঃ এল্মহার্স্ট ও তাঁর পত্নী তাঁদের বার্ষিক সাহায্য যুদ্ধজনিত আর্থিক টানাটানি সত্ত্বেও বন্ধ করেন নাই বা কমান নাই। এই দানের পরিমাণ বার্ষিক চল্লিশ হ'তে পঞ্চাশ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত তাঁরা বহু লক্ষ টাকা দিয়েছেন। তদ্ভিন্ন, মিঃ এল্মহার্স্ট বহু বৎসর স্বয়ং শ্রীনিকেতনে পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি যে পরিচালকের কাজই ক'রতেন তা নয়, সাধারণ চাষী মজুরের মতও খাটতেন। এই বিদেশী দম্পতির রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁহার আদর্শ ও অনুষ্ঠিত কার্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ যেমন তাঁদের সেইরূপ রবীন্দ্রনাথেরও মহত্ত্ব সূচনা করে।

বিশ্বভারতীর আর্থিক অভাব যথেষ্ট—প্রতি বৎসর ত্রিশ হাজার টাকা ঘাটতি পড়ে। অথচ বাংলা-গবর্মেণ্ট তাঁদের বার্ষিক সাহায্য দিতে রাজী হন নাই। আশা করি নূতন মন্ত্রিমণ্ডল রাজী হবেন।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য নিখিলভারতীয় যে কমীটি গঠিত হয়েছে, তাঁরা যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করতে পারলে তার দ্বারাও বিশ্বভারতীর আর্থিক অভাব দূর হ'তে পারবে।

—

অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সভাপতি নির্বাচিত

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বভারতীর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা এই নির্বাচন অন্তরের সহিত সমর্থন করি।

—

বিষ্ণুপুরে সাহিত্য সম্মেলন

প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে গত ডিসেম্বর মাসে একটি সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। প্রধানতঃ তথাকার মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রায়ের উদ্যোগিতায় এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণও নানা প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। বাঁকুড়া-নিবাসী ব'লে প্রবাসীর সম্পাদককে সভাপতি মনোনীত করা হয়। কল্‌কাতা থেকে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন ও বক্তৃতা ক'রেছিলেন। বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁহার পত্নী অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর বক্তৃতায় এইরূপ সম্মেলনে সাহিত্যিকদের পরস্পরের মেলামেশা এবং সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা ও গতি সম্বন্ধে চিন্তাবিনিময় ও আলোচনার আবশ্যকতা বিবৃত করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই সকল সম্মেলনে সাহিত্যক্ষেত্রে উপেক্ষিত বাউল প্রভৃতি রচয়িতাদের সাদর নিমন্ত্রণ হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা প্রভৃতি সুধীবৃন্দ প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ পঠিত হ'য়েছিল। বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ অনুসারে সঙ্গীতের মজলিস হ'য়েছিল। যাঁরা বিষ্ণুপুরের বাইরে থেকে এসেছিলেন তাঁদিকে বিষ্ণুপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ, কামান, প্রাচীন বহু মন্দির প্রভৃতি পুরাকীর্তি দেখান হ'য়েছিল।

এই সম্মেলনের একটি প্রধান ঘটনা রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা। এটি বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর একজন শিল্পীর দ্বারা নির্মাণ করিয়ে উপহার দিয়েছেন।

সম্মেলনে অনেকগুলি সময়োচিত প্রস্তাব ধার্য এবং সাহিত্য ও ললিতকলাদির অনুশীলনের ও প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি সমিতি স্থাপিত হ'য়েছে। দৈনিক বসুমতীতে এই সম্মেলনের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

পুঃ—দৈনিক বসুমতীর প্রতিবেদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্তী বিষ্ণুপুর গিয়ে এই সম্মেলনটির সমগ্র বিবরণ প্রকাশিত করেছেন। তাঁর রিপোর্ট আমরা বিলম্বে পাওয়ায় ব্যবহার করতে পারি নি বটে, কিন্তু তাতে দৈনিক বসুমতীর ও তাঁর রিপোর্টারের নিকট বিষ্ণুপুরের ও বাঁকুড়া জেলার লোকদের ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায় নি।

—

পৌষ মাসে নানা সভাসমিতির অধিবেশন

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত, এবং সেই সময় অন্য অনেক সভাসমিতিরও অধিবেশন হ'ত; কিন্তু কংগ্রেসের বক্তৃতা ও প্রস্তাবসমূহ এবং নানা আলোচনাই সর্বসাধারণের অধিকতম মনোযোগের বিষয় হ'ত। বিশেষতঃ কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণের আলোচনা সংবাদপত্রে সকলের চেয়ে বেশি হ'ত।

কয়েক বৎসর থেকে কংগ্রেসের অধিবেশন শীতকালে হচ্ছে না। কিন্তু পৌষ মাসে রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক বিস্তর সভাসমিতির অধিবেশন এখনও হয়। এ বৎসর যুদ্ধের জন্যও কোনটিরই অধিবেশন বন্ধ রাখা হয় নি বটে, কিন্তু কেবল ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার (নিষিদ্ধ অথচ অনুষ্ঠিত) অধিবেশন ভিন্ন অন্য কোনটির অধিবেশন খবরের কাগজগুলিতে বেশী জায়গা দখল ক'রতে পারে নি।

পৌষ মাসে যেসব সভাসমিতির অধিবেশন হ'য়েছিল তার মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে, নিখিলভারত ছাত্র ফেডারেশনের দুই দলের পাটনায় দুটি অধিবেশনে, ভাগলপুরে হিন্দু যুবজনের সম্মেলনে, উদার-নৈতিক সম্মেলনে, যুক্তপ্রদেশের বে-দল নেতৃসম্মেলনে, কোকনদ নিখিলভারত নারীসম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের অভিভাষণে, এবং মুসলিম লীগের অধিবেশনে রাজনীতির চর্চা হয়েছিল।

অরাজনৈতিক যতগুলি সভাসমিতির অধিবেশন হ'য়েছিল, তাদের গুরুত্ব কম নয়। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে প্রাচ্য প্রত্নতাত্ত্বিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে মুসলমান বিদ্বানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। এই সংখ্যাধিক্যে মনে হ'তে পারে যে, ভারতবর্ষে প্রাচ্য

পুরাতত্ত্বের অনুশীলন প্রধানতঃ মুসলমানরাই ক'রে থাকেন; কিন্তু তা সত্য নয়। এত মুসলমান বিদ্বান প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান রাখেন, তা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুরা আগেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না, এখনও নাই। প্রাচ্য প্রত্নতাত্ত্বিক কন্‌ফারেন্সের এই অধিবেশন সম্বন্ধে আর একটা কথা ব'লবার আছে। এতে দেখছি বাংলা দেশের যে দুজন বিদ্বানকে শাখা সভাপতির আসন দেওয়া হয়েছিল, দুজনই মুসলমান। যাঁরা আসন পেয়েছিলেন, তাঁদের পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধে আমরা কোন সন্দেহ প্রকাশ করছি না। কিন্তু অ-মুসলমান বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক কি বঙ্গে একজনও নাই?

প্রত্নতাত্ত্বিক কন্‌ফারেন্স ছাড়া, বৈজ্ঞানিক কংগ্রেস, ঐতিহাসিক কংগ্রেস, অর্থনৈতিক কন্‌ফারেন্স ও রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞান কন্‌ফারেন্সের সম্মিলিত অধিবেশন, সংখ্যাতাত্ত্বিক (স্ট্যাটিষ্টিক্যাল) কন্‌ফারেন্স, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতির অধিবেশন হ'য়েছিল। এই সকল বিদ্বজ্জন-সম্মেলনে সভাপতিদের অভিভাষণ ছাড়া অনেক সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হ'য়েছিল।

এই অভিভাষণ ও প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য আছে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের (এবং হয়ত অন্য কোন কোন সম্মেলনেরও) একটি নিয়ম আছে যে, সব প্রবন্ধের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্তসার (summary) দিতে হবে। এই নিয়মটি সমুদয় বিদ্বজ্জন-সম্মেলনের সমুদয় অভিভাষণ ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনুসৃত হ'লে ভাল হয়। নতুবা কেবল কোন কোন দৈনিক কাগজেই কোন কোন অভিভাষণ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, অন্যগুলির কোন খবরই সর্বসাধারণে পায় না। ছোট ছোট সংক্ষিপ্তসার পেলে অনেক কাগজেই, এমন কি মাসিক পত্রেও, অনেকগুলি প্রকাশিত হ'তে পারে, এবং তাতে শিক্ষিত সমাজের জ্ঞান বাড়ে ও এই সম্মেলন-গুলির সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের চিত্তাকৃষ্টি (interest) বাড়ে। নিয়মটির অনুসরণ করতে হ'লে লেখকদিগকে কিছু অধিক সময় দিতে ও কিছু অধিক শ্রম করতে হবে বটে, কিন্তু তাঁরা অভিভাষণ ও প্রবন্ধ লিখতে যত সময় দেন ও পরিশ্রম করেন, অতিরিক্ত এই আর একটু সময় ব্যয় ও পরিশ্রমে তাঁদের উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হবে।

দৈনিক কাগজগুলিতে যে শীঘ্র শীঘ্র অন্ততঃ কতক-গুলি অভিভাষণ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়ে যায়, এ খুব ভাল। কিন্তু সম্পাদকেরা সংক্ষিপ্তসার পেলে আরও বেশী অভিভাষণ ও প্রবন্ধের সার মর্ম লোকে পড়তে পারে। যদি এই সংক্ষিপ্তসার-সমষ্টি মাসিক কাগজে ছাপবার মত অনতিদীর্ঘ হয়, তা হ'লে তাতে আরও একটি এই লাভ হবে যে সেগুলির আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বাড়বে। কারণ, মাসিক কাগজ অনেকে বাঁধিয়ে রাখে, দৈনিক ও সাপ্তাহিকের ফাইল খুব কম জায়গাতেই থাকে।

আর একটি কথা খুব ভয়ে ভয়ে বলি। বিদ্বজ্জন-সম্মেলনের অভিভাষণ ও প্রবন্ধগুলি (অবশ্য বাংলা, হিন্দী প্রভৃতির সাহিত্যিক সম্মেলন ছাড়া অন্যত্র) ইংরেজীতে লেখা হয়। বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে সেগুলির সঠিক্ অনুবাদ করিয়ে ছাপবার মত যোগ্য যথেষ্ট কর্মী অনেক কাগজেরই নাই। অতএব সম্মেলনগুলির উদ্যোক্তারা যদি কোনক্রমে সংক্ষিপ্তসারগুলির বাংলা অনুবাদ সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করতে পারেন, তা হ'লে শুধু যে সম্পাদকদের উপকার হয় তা নয়, সম্মেলনগুলিরও সাফল্য বাড়ে এবং দেশে জ্ঞানের অধিকতর বিস্তার হয়।

—

বিষ্ণুপুর কটন মিল

বাঁকুড়া জেলার কটন মিলে অনেক তাঁত এসে পৌছেছে ও বসান হচ্ছে।

—

শান্তিনিকেতনে উৎসব ও পৌষের মেলা

শান্তিনিকেতনে প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ উৎসব হয়, এবং তার পর মেলা হয়। উৎসব এই বৎসরও হয়েছিল। গত বৎসর মেলা হবে না স্থির হওয়া সত্ত্বেও অনেক ব্যবসায়ী দুরবর্ত্তী জায়গা থেকে এসে দোকান ফেঁদেছিল। এ বৎসর দস্তরমত মেলা বসেছিল। জনতা, নাগরদোলা, হরেক রকমের দোকান, নানা পণ্যদ্রব্যের ফেরিওয়ালা, সাঁওতাল নাচ, কবির লড়াই, যাত্রা, সাঁওতালদের খেলা প্রভৃতি মেলার সব অঙ্গই এবার ছিল, কেবল বাজী পোড়ান হয় নি। কিন্তু তার জায়গায় বিদ্যালয়ের ব্যায়ামশিক্ষক ও ছাত্রেরা লাঠি, তলোয়ার ও ছোরার খেলা এবং নানা রকম কুস্তি দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিলেন। এই মেলা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্ত্তন করেন।

এক জন পত্রলেখক আমাদের নিকট এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন যে, দেশের আপামরসাধারণ সকলকে বৎসরে অন্ততঃ ২।১ দিন রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেবার নিমিত্ত তাঁর নামে একটি মেলা প্রবর্তিত হোক, যেমন কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলা হয়। পত্রলেখক তাঁর প্রস্তাবিত মেলা রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের মাসে করবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বর্ষা মেলার উপযুক্ত ঋতু নয়। রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ

মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জলের দুষ্প্রাপ্যতা না ঘটলে সেই সময় তাঁর নামে মেলা করা যায়।

কিন্তু মোটের উপর আমাদের মনে হয় ৭ই পৌষের উৎসবের পর যে মেলা হয়, সেইটিকেই আরও অধিক ২।১ দিন স্থায়ী ক'রে তাতে নূতন কিছু অঙ্গ যোগ ক'রে দিলে অতিরিক্ত দিনটির বা দিনগুলির মেলাকে রবীন্দ্র-মেলা বলা যেতে পারে।

—

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদিগকে নিয়ে গঠিত। রবীন্দ্রনাথ এই সংঘের আজীবন সভাপতি ছিলেন। তাঁর পদে আসীন হবার যোগ্য অন্য কোন মানুষ নাই। তথাপি এ বৎসর সংঘ প্রবাসীর সম্পাদককে এক বৎসরের জন্য সভাপতি মনোনীত করেছেন। তার কারণ বোধ হয় এই যে, শান্তিনিকেতনে প্রথম যখন কলেজ খোলা হয় এবং কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে,তখন প্রবাসীর সম্পাদক কিছু কাল ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেছিলেন এবং ইণ্টারমীডিয়েট ক্লাসের একমাত্র ছাত্রী শ্রীমতী স্বর্ণরেখা দেবীকে তার ইংরেজী সাহিত্য-পুস্তকের গদ্য অংশটি পড়িয়ে দিয়েছিলেন। আশ্রমিক সংঘের সহিত সংযুক্ত হ'তে হ'লে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র হ'লেও চলে। সে 'যোগ্যতা'ও প্রবাসীর সম্পাদকের আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীতে শেলীর Hymn to Intellectual Beauty প্রভৃতি কঠিন কবিতা পড়াতেন, তখন প্রবাসীর সম্পাদক সেই ক্লাসে ভর্ত্তি হতে চেয়েছিলেন। কবি রাজী হন নাই, কিন্তু প্রবাসীর সম্পাদককে অ-শ্রেণীভুক্ত ছাত্ররূপে ব'সে ব'সে শুনবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতও করেন নি। সেই ক্লাসের একটি ছাত্রী ও একটি ছাত্রের নাম মনে আছে। ছাত্রীটি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা মমতা, ছাত্রটির নাম কানাই। এরা প্রবাসীর সম্পাদকের সতীর্থ।

—

কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির বারদোলী নির্দ্ধারণ

বারদোলীতে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি কয়েক দিন আলোচনার পর যে নির্দ্ধারণে উপনীত হ'য়েছেন, তার ফলে, এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ অনুসারে, গান্ধীজীকে কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হ'য়েছে। গান্ধীজী বর্ত্তমান যুদ্ধে বা কোন অবস্থায় কোন যুদ্ধেই সহযোগিতা করতে রাজী নন। তিনি সকল অবস্থায় সকল যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির অধিকাংশ সভ্য তাঁর মত অবস্থানির্বিশেষে পূর্ণ অহিংসাবাদী নহেন। তাঁরা কোন কোন সর্ত্তে বর্ত্তমান যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁরা যে কংগ্রেসের অহিংসনীতি ছেড়ে দিয়েছেন তাও নয়। তাঁরা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টা পূর্ণ অহিংস-ভাবেই চালাতে চান, এবং ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে তখন স্বাধীন ভারতের সব কাজও যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য অহিংসভাবেই চালাতে চান। কংগ্রেসের কোন কোন সদস্য—যেমন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনি, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ—বিবৃতি প্রকাশ ক'রে জানিয়েছেন তাঁরা গান্ধীজীর মতই অবস্থানির্বিশেষে পূর্ণ অহিংসাবাদী।

ওআর্কিং কমীটি বর্ত্তমান যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজী আছেন, কেবল এইটুকু মাত্র ব'লেছেন; কিন্তু কি সর্ত্তে বা কি কি সর্ত্তে রাজী হবেন, তা বলেন নি ও বলবেনও না। কংগ্রেস আগেকার এক নির্দ্ধারণ দ্বারা গবর্ন্মেণ্টকে জানিয়েছিলেন যে, যদি গবর্ন্মেণ্ট কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট (ন্যাশন্যাল গবর্ন্মেণ্ট) স্থাপন করেন, তা হ'লে কংগ্রেসের সহযোগিতা পাবেন! গবর্ন্মেণ্ট কংগ্রেসের তখনকার প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রেছিলেন। কংগ্রেস আবার নূতন কোন প্রস্তাব ক'রে আবার অপমানিত হ'তে চান না। কংগ্রেস সহযোগিতা করবার জন্যে কয়েক পা এগিয়েছেন। গবর্ন্মেণ্টও যদি দুএক পা এগিয়ে কংগ্রেসের বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে চান, তা হ'লে সহযোগিতার সর্ত্ত কি হবে, গবর্ন্মেণ্টই বলতে পারেন।

কংগ্রেস বার বার বলেছেন, পূর্ণ স্বরাজ চান। তার মানে এ নয় যে, কংগ্রেস এখনি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ভারতবর্ষ ত্যাগ চান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'লে এবং যুদ্ধান্তে সেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার পূর্বাহ্লিক সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা এখনই করলে কংগ্রেস সহযোগিতা করতে পারেন, আমরা বারদোলী নির্দ্ধারণের অর্থ এই রকম বুঝেছি।

আমরা কখনও মনে করি নি যে, গবর্ন্মেণ্ট এরূপ কোন ব্যবস্থা করবেন। গত ৮ই জানুয়ারি ভারত-সচিব পার্লেমেণ্টে যা বলেছেন, তাতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে গবর্ন্মেণ্ট সে রকম কিছুই করবেন না। সর্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ নেতারা যা চেয়েছিলেন, তা স্বাধীনতার চেয়ে কম, ডোমীনিয়ন স্টেটসের চেয়েও কম; অথচ ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাও উপেক্ষা করেছেন।

ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যে কংগ্রেসের বন্ধুত্ব-আভাস বা বন্ধুত্ব-সঙ্কেত উপেক্ষা করলেন, তার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, গবন্মেণ্ট মনে করেছেন, কংগ্রেসের এই ভঙ্গী দুর্বলতার চিহ্ন—দুর্বলের কাছে তাঁরা এগিয়ে যাবেন কেন, নরম হবেন কেন? ব্রিটিশ সরকার এ রকম অনুমানও ক'রে থাকতে পারেন যে, কংগ্রেস-নেতারা মন্ত্রিত্বত্যাগটাকে ভুল ব'লে বুঝতে পেরে এখন আবার ক্ষমতাপ্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু সরকার তাঁদিকে আর কোন প্রকার শাসন-ক্ষমতা লাভ করতে দেবেন না স্থির ক'রেছেন ব'লে মনে হয়।

—

ব্রিটেনের ক্ষমতাত্যাগে অনিচ্ছার কারণ

ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের, হিন্দু মহাসভার, উদার-নৈতিকদের, বে-দল নেতাদের, মুসলীম লীগের—কারো প্রস্তাবে রাজী নন;—"সব দলের মিল হোক, সকল দলের সম্মিলিত প্রস্তাব পেশ করলে তা বিবেচিত হবে"—ভঙ্গীটা এই রকম। এতে ভারতীয় সব দলের লোকেরাই বুঝেছে, ব্রিটিশ সরকার প্রকৃত ক্ষমতা, চূড়ান্ত ক্ষমতা, একটুও ভারতীয়দিগকে ছেড়ে দিতে চান না। এই অনিচ্ছার কারণ কি?

কারণ খুবই স্বাভাবিক। প্রভুত্ব যারা দীর্ঘ কাল সম্ভোগ ক'রে আসছে, প্রভুত্বের প্রতি তাদের একটা আসক্তি, একটা মোহ জন্মে। তার উপর আছে ঐশ্বর্যে আসক্তি। ভারতের প্রভু হ'য়ে ব্রিটেন প্রভূত ধনশালী হয়েছে। ব্রিটেনের নিজের জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ ভারতবর্ষ থেকে আহৃত হয়ে আসছে। ক্ষুদ্র দেশ ব্রিটেন যে যুদ্ধে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারছে, তার মূলে রয়েছে ভারতবর্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রভূত ধন। এত ধনের লোভ ছাড়া কি সোজা? যেদিন ভারতবর্ষের উপর ব্রিটেনের প্রভুত্ব লুপ্ত হবে বা কমে যাবে, সেই দিন থেকে তার জাতীয় আয়ের একটা প্রধান পথ রুদ্ধ হবে, এই আশঙ্কা ব্রিটেনের আছে। তার উপর আর একটা কারণ ঘটেছে। সবাই জানে, যুদ্ধটা চালাবার জন্য ব্রিটেনকে অত্যন্ত বেশী ঋণ করতে হচ্ছে। এই ঋণ শোধ কেমন ক'রে হবে? ভারতবর্ষের খনিজ ও অন্য নানা প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও বিস্তর অনাহৃত হ'য়ে আছে। এদেশে অল্প মজুরিতে সন্তুষ্ট ও পরিশ্রমী শ্রমিকও অগণিত পাওয়া যায়। অপর্য্যাপ্ত ধন আহরণের জায়গা ভারতবর্ষের মত আর কোথায় আছে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য বড় বড় অংশ স্ব-শাসক। তারা তাদের ধন ব্রিটেনে নিয়ে যেতে দেবে না। ভারতবর্ষ যদি স্ব-শাসক হয়, তা হ'লে ভারতবর্ষও স্বয়ং দরিদ্র থেকে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা অন্য দেশকে, ব্রিটেনকে, ধনী হ'তে দেবে না। অথচ ভারতের ধনে ধনী হওয়া যুদ্ধের অবসানে ব্রিটেনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হবে, নতুবা তার ঋণ শোধ হবে না। সুতরাং ভারতবর্ষকে স্ব-শাসক হ'তে না-দেওয়া ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষ স্ব-শাসক হবেই। যদি ব্রিটেন তাতে বাধা না-দেয়, তা হ'লে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব পেয়ে সে লাভবান হবে ও শক্তিশালী থাকবে। কিন্তু যদি ব্রিটেন ভারতবর্ষের স্বরাজলাভে বাধা দেয়, তা হ'লে সে বাধাদান ব্যর্থ হবে—লাভের মধ্যে ব্রিটেন ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হ'য়ে তার বিরাগ ও বিরোধিতা অর্জন করবে।

—

আটলান্টিক সনদ-সমর্থক রূজভেল্টের বাণী

গত ৬ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি রূজভেল্ট আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসের উদ্দেশে যে রেডিয়ো বক্তৃতা করেন, তার মধ্যে তাঁর এই বাণী আছে:—

Our objectives are the liberation of the subjugated nations, the securing of freedom of speech, freedom of religion, freedom from want and freedom from fear everywhere in the world. We shall not stop short of these objectives. I know we speak for the American people—and I believe I speak for all other peoples who fight with us—when I say that this time we are determined not only to win the war but also to maintain the security of the peace which will follow.

তাৎপর্য। আমাদের লক্ষ্য—পরাজিত ও বশীকৃত জাতিদিগকে মুক্তিদান এবং পৃথিবীর সর্বত্র অভাব ও ভয় হইতে মুক্তি, মত ও মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ক স্বাধীনতা স্থাপন। এই সব লক্ষ্যে উপনীত না হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইব না। আমি জানি, আমি আমেরিকার সব লোকদের পক্ষ হইতে কথা বলিতেছি—এবং বিশ্বাস করি অন্য যাঁহারা যুদ্ধে আমাদের দলে তাঁহাদের পক্ষ হইতেও কথা বলিতেছি—যখন বলিতেছি যে, এবার আমরা কেবল যুদ্ধে জয়লাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহি, কিন্তু যুদ্ধের পরে যে শান্তি আসিবে, তাহারও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রাষ্ট্রপতি রূজভেল্টের এই কথাগুলি স্তোকবাক্য নয়, ছেঁদো কথা নয়;—এগুলি তাঁর অন্তরের কথা। "আটলান্টিক সনদে"র প্রয়োগক্ষেত্র যে সমুদয় পৃথিবী, তাও এর থেকে বুঝা যায়। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব এবং ভারতসচিব এমারি সাহেব—এঁরাও ঠিক্ এ কথা বলেন না যে, আটলান্টিক সনদ ভারতবর্ষে প্রযোজ্য

নয়;—তাঁরা বলেন, ঐ সনদের আগেই ত আমরা "১৯৪০ সালের আগস্ট অফার" দ্বারা ঐ রকম প্রতিশ্রুতিই দিয়েছি! তা কিন্তু সত্য নয়।

—

ভারতবর্ষ কেমন করে স্বাধীন হবে?

আমরা মনে করি না যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর মতন পুরা অহিংসাবাদীদের মতে স্বাধীনতা লাভের জন্যও সশস্ত্র যুদ্ধ করা উচিত নয়; স্বাধীনতাকামী অন্যেরা মনে করেন, পলিসি অর্থাৎ অবস্থার অনুরূপ কর্মনীতির দিক্ দিয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে অহিংসসংগ্রামই শ্রেয়ঃ। সুতরাং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত অহিংস সংগ্রামের পথেই চলবে।

যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ বাদ দেওয়া গেল, তা হ'লে ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার উপায় ও আশা কি রইল?

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অনুকূল হবে ব'লে আমরা মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন ও তাদের সহযোগীরা জয়ী হবে; জার্মেনী ও জাপান হারবে, ইটালী ত গণনার বাইরে চলে গেছে। আমেরিকা, রাশিয়া, ও চীন গণতান্ত্রিক দেশ। যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষের অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই গণতান্ত্রিক দেশগুলির নৈতিক সমর্থন ('moral support') আমরা পাব। ভারতীয়েরা মনে করে, আটলাণ্টিক সনদ সকল পরাধীন দেশেই প্রযোজ্য, শুধু নাৎসীবিধ্বস্ত দেশগুলিতে নয়। ইংলণ্ডের ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী মেজর য়্যাটলীর মত এইরূপ। আমেরিকায় সর্ যমুগম্ চেট্টির সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথনে রাষ্ট্রপতি রুজভেণ্টও এই মত প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় রুজভেণ্ট এই রকম মত প্রকাশ ক'রেছেন, তা আমরা পূর্ববর্তী টিপ্পনীতে দেখিয়েছি। প্রশ্ন হ'তে পারে যে, রুজভেণ্টের মত যদি এই রকমই হয়, তা হ'লে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলকে আটলাণ্টিক সনদের সারা পৃথিবীব্যাপী প্রযোজ্যতা স্বীকার করতে তিনি অনুরোধ করেন না কেন? রাষ্ট্রনীতিবিদ্ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা কখন কি করেন বা ক'রতে নিবৃত্ত থাকেন, তা তাঁরা সব সময় খুলে বলেন না—অন্যেরাও অনুমান করতে পারে না। আমাদের মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় ব্রিটেনের যেমন আমেরিকার সাহায্য দরকার, আমেরিকারও সেইরূপ ব্রিটেনের সহযোগিতা আবশ্যক; এই কারণে কেউ কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চান না। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে যখন সঙ্কট অবস্থা থাকবে না, তখন আমেরিকার গণতান্ত্রিক জনমতের চাপ নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের উপর পড়বে।

রাশিয়া আগে জান্‌ত যে, ভারতবর্ষের সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টরা তার বন্ধু। এখন ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়ায় অন্য ভারতীয়েরাও রাশিয়ার প্রতি আপনাদের শুভইচ্ছা জানাতে পারছে। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে রাশিয়া নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের এই বন্ধুভাবে আন্তরিক সাড়া দিবে।

চীনের সহিত ভারতবর্ষের মনের মিল নূতন নয়। আগে উভয় দেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগ ও আদান-প্রদান ছিল, রবীন্দ্রনাথ তা পুনরুজ্জীবিত ক'রে গেছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রিক দিক্ দিয়ে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু অল্প কিছু ক'রেছেন। চীনে ভারতীয় য়্যাম্বুল্যান্স পাঠানতেও কিছু কাজ হয়েছে। যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষের অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামে চীনের নৈতিক সমর্থন অবশ্যই পাওয়া যাবে।

তবে কি আমরা মনে করি আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন ব্রিটেনকে বুঝিয়ে পড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়াবে? তা নয়। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে বা দেওয়াতে পারে না। যারা স্বাধীনতা চায় তাদিককেই সেই অমূল্য সম্পদ অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টায় অন্য কারো সহানুভূতি পেলে ভারতীয়দের উৎসাহ ও মানসিক শক্তি বাড়বে, এবং ইংরেজরা যখন দেখবে যে, তাদের মিত্রশক্তিরা ভারতবর্ষের সহায়, তখন তাদের বিরুদ্ধতাও কিছু কমতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, অহিংস সংগ্রামটা ভারতবর্ষকেই করতে হবে।

ইতিপূর্বে যে ব্যাপক "আইন অমান্য" আন্দোলন হয়েছিল, তা ছিল কেবল মাত্র কংগ্রেসীদের প্রচেষ্টা। তাতেই গবর্মেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হ'য়েছিল। যুদ্ধের পরে, আবশ্যক হ'লে, শুধু কংগ্রেসীরা নয়, হিন্দু মহাসভার সভ্য ও সমর্থকেরাও এইরূপ আন্দোলন ক'রবেন—ভাগলপুরে তাঁদের হাতে খড়ি হ'য়ে গেছে। কংগ্রেসী মুসলমানরা ত এই অহিংসা সংগ্রামে যোগ দেবেই, অন্য অনেক মুসলমানও যোগ দিতে পারে।

এইরূপ ব্যাপক "নিষ্ক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ" ঠিক্ কি আকার ধারণ করবে, এখন বলা যায় না। কিন্তু কালক্রমে এর দ্বারা ব্রিটেনের এই বোধ জন্মিবেই যে, ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করা আর সুসাধ্য ত নয়ই, সম্ভবপরও নয়; এই বিশ্বাসও ব্রিটেনের জন্মিবেই যে, ভারতবর্ষ শাসন করা

আর লাভজনক নয়। তখন ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করতে পারবে।

ইতিমধ্যে সকল রকম গঠনমূলক কাজের দ্বারা বহু-সংখ্যক ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ দেশের সব কাজ চালাবার মত শিক্ষা ও সামর্থ্য লাভ ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে থাকবেন।

—

হিটলারের জাপানী জা'তকে নিঃশেষ করবার সংকল্প

আমেরিকার প্রসিদ্ধ সচিত্র মাসিক পত্রিকা "এসিয়া"র সদ্যঃপ্রাপ্ত নবেম্বর সংখ্যায় একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তার নাম "Hitler Means to *Destroy* Japan। "হিটলারের সঙ্কল্প জাপানের **বিনাশ-সাধন**"। প্রবন্ধটিতে এই উক্তির সমর্থক অনেক কথা আছে। সে-সব উদ্ধৃত করবার স্থান নাই। গোড়ার তিনটি প্যারাগ্রাফ এই :—

One of the most extraordinary illusions in history is Japan's innocent faith that Hitler, if he should win, would share the rule of the world with the race which he has denounced as "yellow vermin" and as less than men—"undermen."

On the contrary, Hitler's intention is not merely to rule Japan, but to *destroy* the Japanese people—not to enslave them as he has enslaved others—but literally to *exterminate* them, with poison gas and bacteria. This intention is written plain on the record.

The Nazis do not consider the coloured races to be human beings. They are animals or "undermen." According to *Mein Kampf*, those who have come in contact with European culture and civilization are "trained monkeys."

তাৎপর্য্য। যে জা'তকে হিটলার "হলদে পোকা" এবং মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট জীব বলে নিন্দিত করেছে, তাদের সঙ্গে সে পৃথিবী ভাগ করে শাসন করবে, জাপানের এই 'সরল' বিশ্বাস ইতিহাসে একটি অসাধারণতম ভ্রান্ত ধারণা। তার বিপরীতে হিটলারের অভিপ্রায় শুধু জাপানকে শাসন করা নয়, অধিকন্তু জাপানী জা'তকে বিনাশ করা—অন্য অনেক জা'তের মত জাপানীদিগকেও শুধু দাসে পরিণত করা নয় কিন্তু তাদিগকে একেবারে নির্মূল নির্বংশ নিঃশেষ করা, বিষাক্ত গ্যাসের এবং রোগের ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা। তার এই সংকল্প মুদ্রিত 'দলিলে' স্পষ্ট লেখা রয়েছে। নাৎসীরা অশ্বেত জা'তদিগকে মানুষ বিবেচনা করে না—তারা জন্তু বা মানবাধম জীব। Mein Kampf নামক তার পুস্তক অনুসারে, যারা য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, তারা 'শেখানো বাঁদর।"

—

"রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-উৎসবের সূচনা" সম্বন্ধে বক্তব্য

"রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-উৎসবের সূচনা" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পৌষের প্রবাসীতে বেরিয়েছে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করকে একটি চিঠিতে অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছেন :—

…পুরাতন দুই চারি জন সামান্য লোককেও একটু বেশি আলোকের মধ্যে দাঁড় করাইয়াছ। ইহাতেই একটু সংকোচ হয়।…

…অন্য দিকে ইহাও ভাবিতে হইবে যে এই উপলক্ষ্যে মুখ্য ও গৌণের মধ্যে গোল পাকাইয়া যেন আসল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হও।

গুরুদেবই তো ছিলেন আসল স্রষ্টা। তিনিই তাঁর আপন গুণে নানা স্থান হইতে নানা বস্তু কুড়াইয়া আনিয়া রচিয়াছেন তাঁহার এই আনন্দ-লোকটি। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন ইহা ঘটিয়াছে সেই সব উপকরণেরই মাহাত্ম্যে তাহা হইলে হইবে বিষম ভুল। অন্নপূর্ণার হাতের গুণে দুই চারিটা সামান্য শাক ও দুই একটা মসলাতেই অমৃতোপম ভোগ বনিয়া ওঠে। যদি কোনো মশলা মনে করে ইহা ঘটিয়াছে সেই বিশেষ মশলারই গুণে, তবে সেই ভুল মারাত্মক। রচয়িতার হাতে পড়িয়া মাটির পিণ্ডও হইয়া ওঠে দিব্য মূর্তি, কিন্তু তাহা ঘটে রচয়িতারই গুণে। মাটির পিণ্ড যে সে মাটির পিণ্ডই।

যাহা হউক, পুরাতন কথা লিখিতে যদি হয় তবে খুব সাবধান থাকিবে যেন মূল সত্যকে না হারাইয়া ফেল। গুরুদেবকে যেন কোনো উপকরণই আচ্ছন্ন না করে, তিনিই যেন থাকেন সবার উপরে। মনে করাইয়া দিই গুরুদেবেরই কবিতা—

"রথযাত্রা লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।"

—

নারী-নিগ্রহ-বিষয়ক মোকদ্দমাসমূহের তদন্ত-কমীটি চাই

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এল্ এ, বঙ্গীয় লেজিসলেটিব য়্যাসেম্ব্লীতে প্রশ্ন ক'রে ১৯৩৯ সালের ২৮শে মার্চ ও ১৯৪১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি যে উত্তর পান, নিম্নমুদ্রিত তালিকাটি তার থেকে সংকলিত।

নারীনিগ্রহ-বিষয়ক মোকদ্দমা।

বৎসর	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০ নবেম্বর পর্যন্ত
মোকদ্দমার সংখ্যা	৮২৫	৮৫৬	৮৬৭	৮৯৩	১০১৫	১২২৩	১১৯৯
কতগুলিতে আসামী দণ্ডিত	২৯৭	২৯৪	৩০৭	৩২৫	২৭৩	২৮৫	২২০
নিগৃহীতা হিন্দুনারী	৩৯৪	৩৭৫	৪২৮	৩৯৩	৪৮২	২২২	৫৫০
নিগৃহীতা মুসলমান নারী	৪২৫	৪৪০	৪২৫	৪৮৪	৫১৫	২৪১	৬৪৯
হিন্দু আসামী	৪৭৭	৪৩৯	৫২৭	৫১২	৫৬৫	১৬২	৫৮২
মুসলমান আসামী	১০২৬	৯৬৩	৯০৭	৯৫৩	১২৭৮	৩০৫	১৩০৮

তালিকাটি দেখলেই বুঝা যায়, অতি অল্প মোকদ্দমাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দণ্ডিত হয়েছে, অধিকাংশ স্থলে তারা খালাস পেয়েছে। কেন এইরূপ হয় তারই অনুসন্ধানের নিমিত্ত এবং আইন পরিবর্তন দ্বারা প্রতিকারের ব্যবস্থা

করবার নিমিত্ত হরেন্দ্রবাবু নিম্নলিখিত মত একটি প্রস্তাব আইন-সভায় এনে একটি তদন্ত-কমীটির নিয়োগ চেয়েছিলেন :

"This Assembly is of opinion that a small committee of Judicial officers with a Judge or Ex-Judge of the Calcutta High Court as Chairman be formed to investigate why in a large majority of cases persons accused of offences against women escape conviction and to suggest what steps should be taken to prevent such failure of justice and how the existing law should be amended for the better control and prevention of offences against women in this Province."

কিন্তু তিনি এরূপ প্রস্তাব আইন-সভায় উপস্থিত করবার অনুমতি পান নি, যদিও ঐ রকম প্রস্তাব পেশ করবার অনুমতি আগে আগে দেওয়া হ'য়েছিল।

আমাদের বিবেচনায় নারীনিগ্রহবিষয়ক মোকদ্দমায় অধিকাংশ স্থলেই আসামীরা কেন খালাস পায় তার কারণ অনুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং সেই কারণ দূরীকরণের ব্যবস্থাও হওয়া আবশ্যক। আইন-সভার কোন সদস্য এ-বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত না করলেও, গবন্মে'ন্টের নিজে থেকেই এ কাজটি করা উচিত। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের নিরাপত্তা ও মান ইজ্জৎ রক্ষা এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করা গবন্মে'ন্টের একটি প্রধান কর্তব্য।

তদন্ত-কমীটি নিয়োগের প্রস্তাবের ভাষার চুলচেরা বিচার হ'তে পারে ও তা হোক, কিন্তু এ রকম বিচার দ্বারা নারীকল্যাণ ব্যাহত হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

—

সর্ আকবর হাইদরী

সর্ আকবর হাইদরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন অতি অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদের সেবা হতে বঞ্চিত হ'ল। গত সিকি শতাব্দীতে নিজামের রাজ্যে ভাল যে-সব ব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্য প্রশংসা তাঁরই বেশী প্রাপ্য। নিজামের রাজ্যে হিন্দুদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা এখনও সন্তোষজনক নয়; কিন্তু তাদের অবস্থার যদি কিছু উন্নতি হ'য়ে থাকে, তার জন্য প্রশংসাভাজন প্রধানতঃ সর্ আকবর হাইদরী। তিনি সেখানে না থাকলে সেটুকুও হোত না।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। ভারতীয় ললিতকলা তাঁর অনুরাগের বস্তু ছিল। নিজামের রাজ্যে অবস্থিত অজণ্টাগুহাবলী এবং তার মধ্যস্থিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নিদর্শনগুলি যে সুরক্ষিত হয়েছে, তা তাঁর মত রাজপুরুষদের চেষ্টাতেই হয়েছে। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী তিনি অনুবাদের সাহায্যে অধ্যয়ন করতেন। তাঁর চেষ্টায় বিশ্বভারতী নিজামের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা সাহায্য পেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবার সাহস তিনি হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর এই প্রশংসা করবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে বটে যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষা—উর্দু ভাষা—নিজামের রাজ্যের অধিবাসীদের সামান্য অংশেরই ভাষা। অধিকাংশের ভাষা উর্দু নয়। কিন্তু ভাষা নির্বাচনে, আমাদের বিবেচনায়, ভুল হয়ে থাকলেও, ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চতম শিক্ষাও যে ভারতবর্ষেরই একটি ভাষার মাধ্যমে হ'তে পারে এই বিশ্বাসপোষণের এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করবার দৃঢ় অধ্যবসায়ের প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য।

হায়দরাবাদে দীর্ঘ কাল কাজ ক'রে তিনি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবন্মে'ন্টের শাসনপরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত-গবন্মে'ন্ট একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সদস্য হারালেন।

—

বিহার গবন্মে'ন্ট ও হিন্দু মহাসভা

নিখিলভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন অনেক বৎসর হ'তে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন শহরে হয়ে আসছে। স্থির হয় যে, ১৯৪১ সালের অধিবেশন হবে বিহারের ভাগলপুর শহরে। বিহার গবন্মে'ন্ট নিষেধ জারি করেন যে, শুধু ভাগলপুরে নয় বিহারের আরও পাঁচটি জেলায় ঐ অধিবেশন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হ'তে পারবে না। বিহার সরকার এই নিষেধের এই কারণ দেখান যে, ঐ সময়ে মুসলমানদের বকরীদ্ হবে, সেই জন্য তখন হিন্দু মহাসভার অধিবেশন করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'তে পারে, এবং তা নিবারণ করতে হ'লে ভাগলপুরে যত পুলিস মোতায়েন করতে হবে তত পুলিস পাওয়া যাবে না। বিহার সরকারের এই হুকুমে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই অবিচার করা হয়েছে।

হিন্দু মহাসভা বকরীদে বা মুসলমানদের অন্য কোন উৎসবে ব্যাঘাত জন্মাবার জন্য ভাগলপুর যাচ্ছিলেন না, সুতরাং আইনসঙ্গত সভার অনুষ্ঠান করবার যে অধিকার সকল পৌরজনের আছে, তা নিষেধ করা বেআইনী হয়েছিল। যদি ধ'রে নেওয়া যায়, যে, ভাগলপুরের মুসলমানরাই অকারণ উত্তেজিত হ'য়ে হিন্দু মহাসভার

চীনের অধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক

বিমান-আক্রমণে আহত ব্যক্তিদের সেবাকার্য্যে মাদাম চিয়াং কাই-শেক

চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিঙের উপর বোমাবর্ষণের একটি দৃশ্য

সিঙ্গাপুর—নৌকার ঘাট
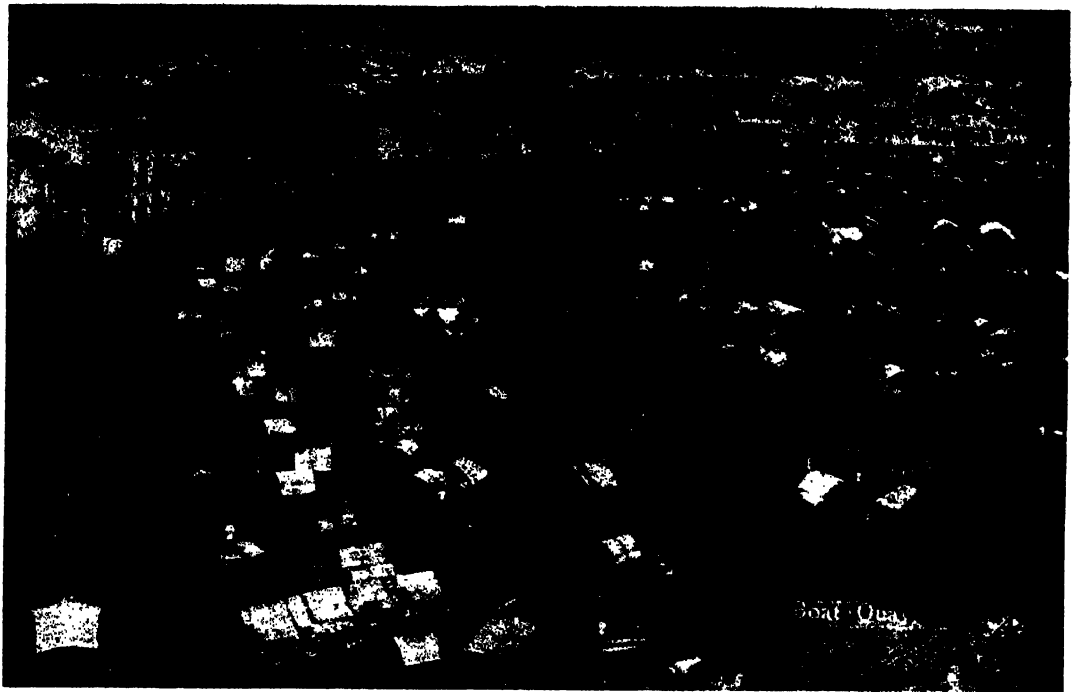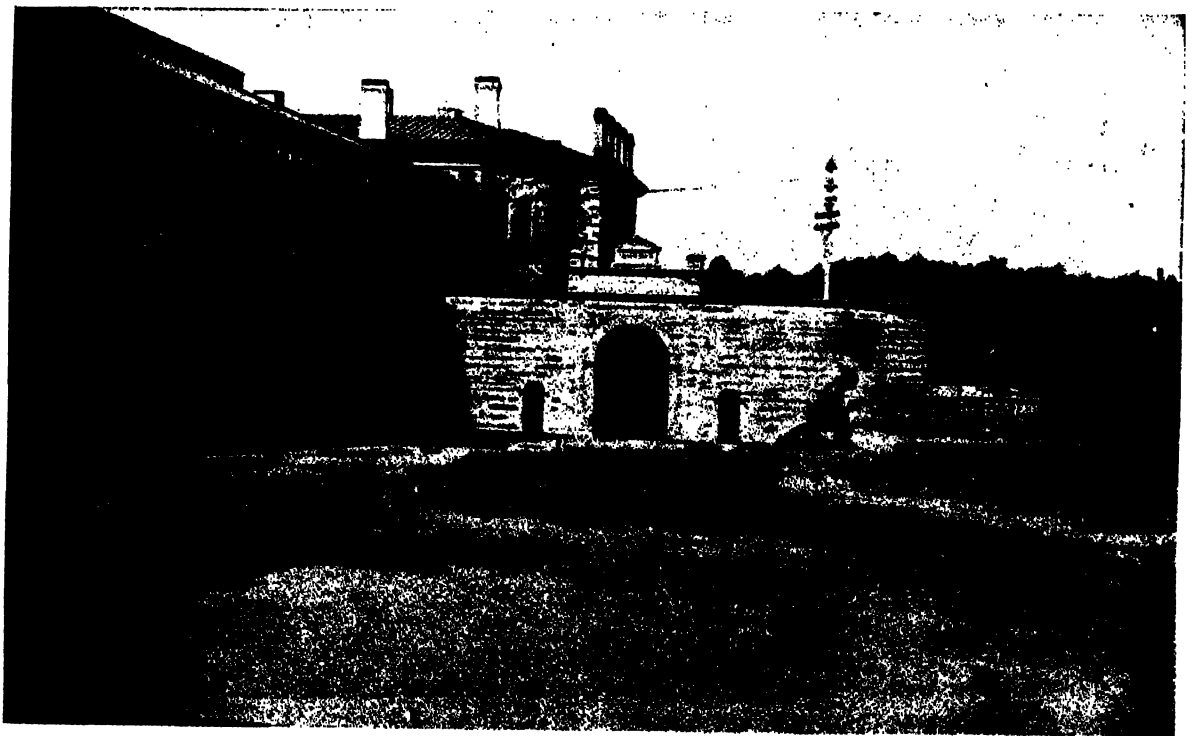
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার দুর্গ

শ্রীযুত চমনলালের সৌজন্যে

হংকং
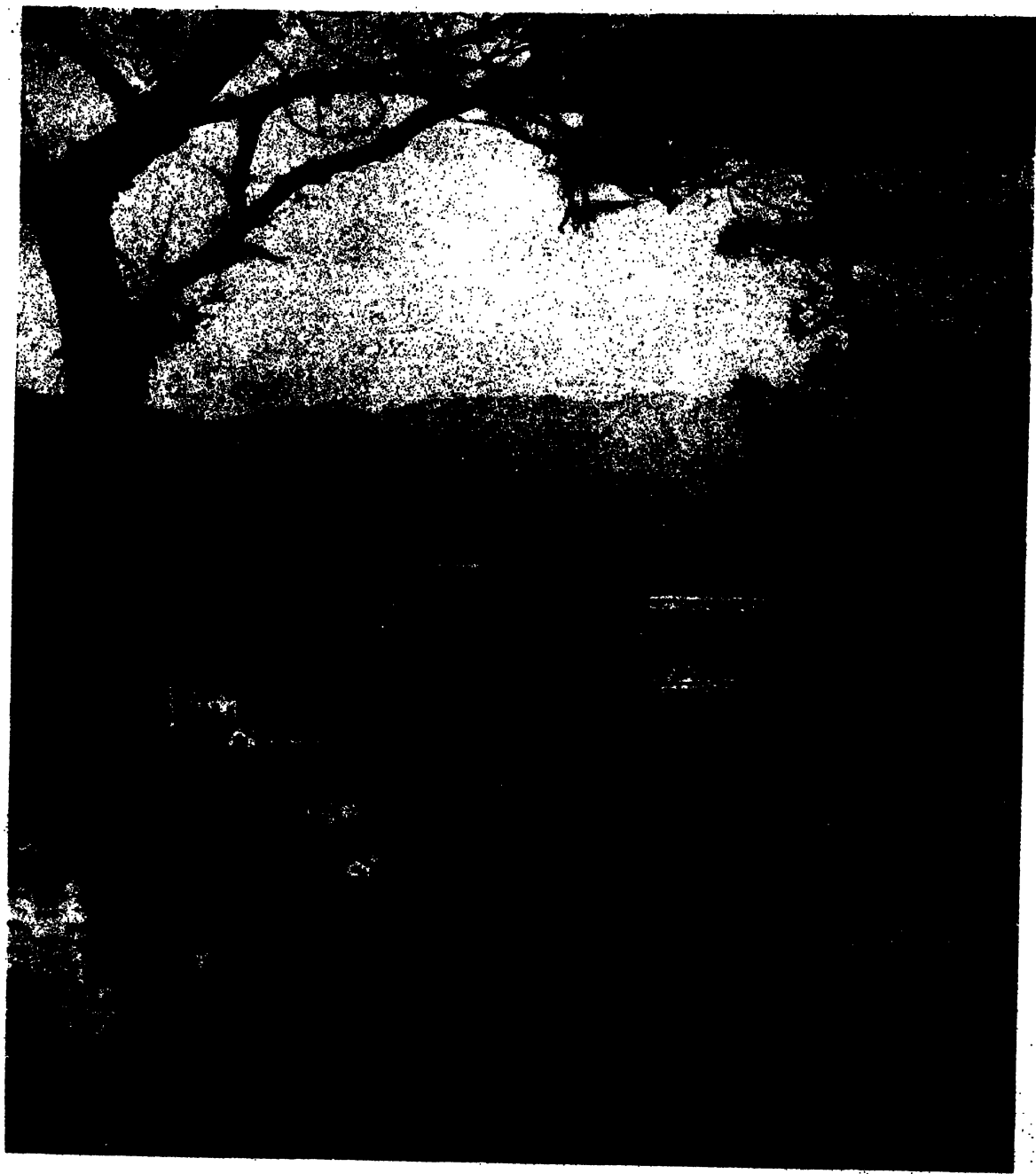
অধিবেশনে বাধা দিত, তা হ'লে অধিবেশন নিষিদ্ধ না-ক'রে উপদ্রব-ইচ্ছুকগণকেই সংযত করবার চেষ্টা গবর্মেণ্টের করা উচিত ছিল। অন্য কেউ শান্তিভঙ্গ করবে ব'লে, যারা শান্তিভঙ্গ করবে না তাদের বৈধ কাজে বাধা না দিয়ে, যাদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা তাদিকেই বাগ মানান উচিত।

কিন্তু মুসলমানরা যে শান্তিভঙ্গ করবে, এই অনুমান দ্বারা তাদের উপর অবিচার করা হয়েছে। ভাগলপুরের মুসলমানরা বিহারের গবর্মেণ্টের এই অনুমান-মূলক অজুহাতের প্রতিবাদ করেছিল। বাস্তবিকও দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের নানা দিক থেকে ভাগলপুরে বিস্তর হিন্দু আসা সত্ত্বেও সেখানকার মুসলমানরা কোন রকম উপদ্রব বা শান্তিভঙ্গ করে নি। কেউ উস্কে না দিলে, কেনই বা করবে?

তার পর যথেষ্ট পুলিসের ব্যবস্থার কথা। বিহার গবর্মেণ্ট ব'লেছিলেন, শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য যথেষ্ট পুলিস পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন তাঁদের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে বহু হিন্দুনেতা ও হিন্দু মহাসভার বিস্তর সদস্য ও প্রতিনিধি এবং বহু দর্শক ভাগলপুরের দিকে অগ্রসর হ'লেন তখন অধিবেশন বন্ধ করবার জন্য এবং নেতা, সদস্য ও প্রতিনিধি প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করবার জন্য হাজার সশস্ত্র পুলিস এবং কিছু সৈন্যও বিহার গবর্মেণ্ট ভাগলপুরে আমদানী করেছিলেন। যথেষ্ট পুলিস আনা যাবে না তাঁরা ব'লেছিলেন। এগুলি কি তবে আকাশ থেকে প'ড়েছিল?

হিন্দু মহাসভা বরাবর গবর্মেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য করতে হিন্দু সমাজকে অনুরোধ ক'রে আসছেন এবং নিজে এ বিষয়ে সহযোগিতা ক'রতে সর্বদাই প্রস্তুত। অথচ গবর্মেণ্ট তাঁর উপর বিরূপ। অবশ্য হিন্দু মহাসভা দেশের স্বাধীনতা চান। কিন্তু কে তা না-চায়? ভাগলপুরে যে সময়ে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন নিষিদ্ধ হয়েছিল ঠিক সেই সময়েই সেখানে হিন্দু যুবক সম্মেলন হয়েছিল। বিহার গবর্মেণ্ট তাতে বাধা দেন নি। এটাও একটা রহস্য। শোনা যায়, গবর্মেণ্ট হিন্দু মহাসভাকে সন্দেহ করেন। অনুমিত এই সন্দেহের গোটা দুই কারণও, বোধ হয় অনুমান ক'রে, কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। একটি কারণ নাকি এই যে, হিন্দু মহাসভা নেপালের মহারাজার প্রশংসাসূচক প্রস্তাব ধার্য ক'রেছেন। তাতে কি দোষ? হিন্দু মহাসভা হিন্দু, নেপালের মহারাজাও হিন্দু। সমধর্মীকে অভিনন্দিত করা ও প্রীতি জ্ঞাপন করা দোষের বিষয় হ'তে পারে না। যদি নেপাল ব্রিটেনের শত্রু হ'ত, তা হ'লে বরং গবর্মেণ্ট আপত্তি করতে পারতেন। কিন্তু নেপাল ব্রিটেনের মিত্র। তার কাছ থেকে ব্রিটেন অর্থসাহায্য ও সৈন্যসাহায্য পেয়েছেন ও নিয়েছেন। আর একটা কারণ নাকি এই যে, গবর্মেণ্ট সন্দেহ করেন হিন্দু মহাসভার জাপানের প্রতি টান আছে। এই সন্দেহের ভিত্তি কি? ইহা সত্য যে, হিন্দু মহাসভা বৌদ্ধদিগকেও হিন্দু মনে করেন এবং তার কোন কোন অধিবেশনে কয়েক জন জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বোধ হয় চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষুও প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা বর্তমান যুদ্ধের বহু পূর্বে। তখন কে জানত যে, জাপান ব্রিটেনের শত্রুদেশ হবে? আগে ত বড় বড় খ্রীষ্টিয়ান সম্মেলনে জার্মান খ্রীষ্টিয়ান মিশনরীরাও যোগ দিয়েছেন। তার সঙ্গে সংস্রবযুক্ত ঐ খ্রীষ্টিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলি কি তার জন্য সন্দেহভাজন হয়ে আছে?

হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভরকর বেশ নরমভাবে ধৈর্য সহকারে বিহার গবর্মেণ্টের সম্মতিক্রমে, কিছু অদলবদল ক'রে, ভাগলপুরে অধিবেশন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রাদেশিক সরকার নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন। ধীরবুদ্ধি সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বড়লাটের সঙ্গে দেখা ক'রে বিহার সরকারের নিষেধ প্রত্যাহার করাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু বড়লাট এই প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোন কারণ দেখতে পান নি! বিহার ছাড়া বাংলা, যুক্ত-প্রদেশ ও মাদ্রাজেও কিছু দিন পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত হ'তে অনুমিত হয়েছে যে, বিহার গবর্মেণ্টের কাজটা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টেরই একটা পলিসির অঙ্গীভূত।

বিহার গবর্মেণ্টের হুকুম সকল রাজনৈতিক দলের দ্বারা নিন্দিত হ'য়েছে, বহু মুসলমানের দ্বারাও নিন্দিত হয়েছে। বাংলা দেশে মুসলিম লীগের ইংরেজি মুখপত্র স্টার অব্ ইণ্ডিয়া এই হুকুমের তীব্র সমালোচনা করেছে।

—

ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

বিহার গবর্মেণ্টের নিষেধ সত্ত্বেও ভাগলপুরে নির্দিষ্ট দিনে নিখিলভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হয়েছিল—যদিও তথাকার লাজপৎ পার্কে নির্মিত মণ্ডপ সরকারী হুকুমে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং পাহারাওয়ালারা পার্ক দখল করে বসেছিল। অধিবেশন অন্যত্র হয়েছিল। তাতে সভাপতির

বক্তৃতা পঠিত হয় এবং সমুদয় প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হয়।

সমুদয় হিন্দু নেতাকে ও অনেক প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার ক'রে আটক ক'রে রাখা হয়েছিল। অনেকের ভাগ্যে অধিকন্তু প্রহারও জুটেছিল।

তাঁরা জানতেন তাঁদের নিগ্রহ হবে। তা সত্ত্বেও তাঁরা ভাগলপুর গিয়েছিলেন। তাঁদের এই দৃঢ়তা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখবার অধ্যবসায় সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। তাঁদের আচরণে হিন্দু ভারতে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। খালাস পাবার পর নেতারা যেখানেই গেছেন সেখানেই হিন্দু সাধারণের সম্বর্ধনা পেয়েছেন।

গবর্মেণ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ককে দাবিয়ে দমিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফল তার বিপরীত হয়েছে। যাঁরা দেশের ও প্রদেশের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত, তাঁরা অদূরদর্শী ও অবিবেচক হ'লে এই রকমই হয়।

স্বর্গীয়া প্রভাবতী দাস

কলকাতায় যে প্রতিষ্ঠানটি এখন "দি রেফিউজ" নামে পরিচিত, সেটি পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে "দাসাশ্রম" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে-সব নিরাশ্রয় দুরারোগ্য-রোগ-ক্লিষ্ট মানুষ রাস্তায় প'ড়ে থেকে বা কোন প্রকারে চলাফেরা ক'রে ভিক্ষা দ্বারা প্রাণরক্ষা করত, তাদের কুড়িয়ে এনে দাসাশ্রমে রাখা হ'ত। উনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের কোটায় "দাসী" নাম্নী যে মাসিক পত্রিকা ছিল, তাতে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণ প্রকাশিত হ'ত।

যাঁরা দাসাশ্রম স্থাপন ক'রেছিলেন তাঁদের অন্যতমা ছিলেন শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাস। সম্প্রতি বাণীবন গ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর স্বামী স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র দাসও দাসাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এর প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীযুক্তা প্রভাবতীর বয়স বোধ হয় কুড়ি বৎসরের অধিক ছিল না। এঁরা শুধু যে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, তা নয়, দাসী নাম নিয়ে স্বহস্তে দাসাশ্রমের আতুরদের সকল রকম সেবাশুশ্রূষাও করতেন। শ্রীযুক্তা প্রভাবতীর স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বোমার আতঙ্কে গ্রাম আশ্রয়

যাঁরা বরাবর প্রবাসী পড়েন তাঁদের মনে থাকতে পারে, বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেক আগে, বোধ হয় ১৯৩৯ সালেরও আগে (ঠিক সময় মনে নাই), আমরা লিখেছিলাম যাঁদের মফস্বলে, বিশেষতঃ গ্রামে বাড়ী আছে, তাঁরা যেন সেগুলি বাসযোগ্য ক'রে রাখেন, তাহ'লে কলকাতা ও অন্য বড় শহরগুলি আক্রান্ত হ'লে তাঁরা সেখানে আশ্রয় পেতে পারবেন।

কলকাতায় যদি বোমা পড়ে এখন সেই ভয়ে বিস্তর লোক কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাচ্ছেন। অনেকে খুব বেশী ভাড়া দিয়ে মফস্বলে বাড়ী নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

কলকাতায় বোমা পড়বার সম্ভাবনা মোটেই নাই, এমন নয়; কিন্তু সদ্য সদ্য বোমা পড়বার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যদিই তা থাকত, তা হ'লেও আতঙ্কে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হওয়া মানুষের মত ব্যবহার নয়। যাঁদের কলকাতায় না থাকলেও চলে এবং কলকাতার বাইরে গিয়েও খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান আছে, তাঁরা বাইরে যেতে পারেন। নারীদের ও ছেলেমেয়েদেরও বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল—যদি সেখানে তাদের থাকবার বন্দোবস্ত থাকে বা করা যায়। যে-সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে, তাদের এমন স্থানে পাঠানই শ্রেয়ঃ যেখানে যথাযোগ্য শিক্ষালয় আছে।

প্রাপ্তবয়স্ক ও কার্যক্ষম যাঁরা গ্রামে গেছেন বা যাবেন, আশ্রয়স্থল গ্রামগুলির সেবা করা তাঁদের কর্তব্য। গ্রামগুলিতে তাঁরা যে আশ্রয় পাচ্ছেন তার প্রতিদান করা উচিত। কেউ যদি গ্রামে গিয়ে কোন কুটীর-শিল্পের দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করেন, তাও এক প্রকার গ্রামসেবা। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা সকলেই করতে পারেন। যাঁরা লেখাপড়া অল্পও জানেন তাঁরাও গ্রামে শিক্ষার বিস্তার করতে পারেন।

আতঙ্কগ্রস্ত না হ'য়ে ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে সাহসে বুক বাঁধা উচিত। ভয় ও আতঙ্ক যেমন সংক্রামক, সাহসও তেমনি সংক্রামক।

আকস্মিক বিপদে বিপন্নের ও পরস্পরের সাহায্য যাতে কলকাতায় ও অন্যত্র হ'তে পারে, এ রকম অনেক নির্দেশ কর্তৃপক্ষ দিচ্ছেন। এইগুলি যথাসাধ্য পালন করা ভাল। আমরা স্বশাসক হ'লে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হবার সব বন্দোবস্তই নিজেরা করবার চেষ্টা করতে পারতাম। তা পারছি না বটে; কিন্তু যতটুকু পারি প্রত্যেকেরই করা উচিত।

স্বাবলম্বী গ্রাম

আগে আমাদের গ্রামগুলির একটি স্বাবলম্বিতার আদর্শ ছিল। মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত যে-যে শ্রেণীর লোক আবশ্যক, বড় বড় গ্রামে ও ছোট ছোট গ্রামের সমষ্টিতে সেই সকল শ্রেণীর লোকই থাকতেন; যেমন কৃষক, গোপ, তন্তুবায়, সূত্রধর, কুম্ভকার, কর্মকার, চর্মকার, তৈলিক, মোদক, রজক, ক্ষৌরকার, শিক্ষক, পুরোহিত, প্রহরী ইত্যাদি। বর্তমানে আমাদের গ্রামগুলিকে চিরাগত আদর্শ অনুযায়ী স্বয়ম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করা দুঃসাধ্য, হয়ত বা অসাধ্য—বাঞ্ছনীয়ও না-হতে পারে;

কিন্তু প্রধান কোন কোন বিষয়ে স্বাবলম্বী করা যেতে পারে —যেমন খাদ্য, বস্ত্র, ও চিত্তবিনোদন, এবং কতকটা শিক্ষা সম্বন্ধে। যাঁরা এখন গ্রামে যাচ্ছেন তাঁদের এই বিষয়ে মন দেওয়া উচিত। গান্ধীজী ত কংগ্রেসীদিগকে এই প্রকার গঠনমূলক কাজ করতেই বলেছেন। হিন্দু মহাসভার সভ্যদেরও গ্রামসেবার কাজে ব্যাপৃত হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ প্রধান কয়েকটি বিষয়ে শান্তিনিকেতনকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, আশ্রম নিজের খাদ্য ও নিজের পানীয় দুগ্ধ নিজে উৎপন্ন করবে, বস্ত্র নিজে উৎপাদন করবে, চিত্তবিনোদনের স্বকীয় ব্যবস্থা করবে এবং সকল রকম সাংস্কৃতিক সৃষ্টি ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে। এই বিষয়টির আলোচনার নিমিত্ত "উত্তরায়ণে" অনেক বৎসর আগেকার এক দিনের বৈঠক আমাদের মনে পড়ছে। তাতে স্বর্গত জগদানন্দ রায় উপস্থিত ছিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কিছু প্রশ্ন করেছিলেন ও কবি তার উত্তর দিয়েছিলেন। এই বৈঠকের আলোচনার বিবৃতি কেউ লিখে রেখেছিলেন কিনা জানি না।

রবীন্দ্রনাথের দুটি আঁকা-ছবি

রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের এত রকম সুন্দর ফোটোগ্রাফ ও তার প্রতিলিপি আছে, যে যাঁরা তাঁকে ভালবাসেন ও ভক্তি করেন, তাঁরা সেইগুলিই রাখেন। তাঁর ছবি হাতেও কেউ কেউ এঁকেছেন। তার প্রতিলিপি পাওয়া যায় কিনা জানি না। শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী রাণী চন্দ তাঁর যে দুখানি ছবি এঁকেছেন তার প্রতিলিপি প্রস্তুত হয়েছে। একটি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে, অপরটি ১৩৪৭ সালের ১১ই মাঘ আঁকা। দুটিই উৎকৃষ্ট ও রাখবার যোগ্য।

মক্কা-তীর্থযাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণিত

আরব দেশের জেড্ডা থেকে রয়টার নিম্নমুদ্রিত যে খবরটি পাঠিয়েছেন, তাতে দেখা যায় ভারতের মক্কাযাত্রীর সংখ্যা এ বৎসর গত বৎসরের দ্বিগুণ হয়েছে, এবং তার কারণ, গবর্মেণ্ট ও ইংরেজ জাহাজব্যবসায়ীরা তাদের সুবিধা ক'রে দিয়েছেন।

JEDDAH, Dec. 27.

Owing to the support of the British mercantile marine and the co-operation of the Egyptian, Indian and Saudi Arabian Governments, the total number of this year's pilgrims to Mecca is double that of the last year. The pilgrimage starts to-morrow with the traditional visit to Mount Ararat. Arrivals at Jeddah, to date, total 8,500 from the Sudan and West Africa, which is a record for any year, 5,000 from Egypt and 11,000 from India.—*Reuter.*

গত দু-বৎসর ভারতীয় মক্কাযাত্রীর সংখ্যা ছিল মোটামুটি ৫০০০ ও ৫৫০০। এ বৎসর গত দু-বৎসরের মোট সংখ্যার চেয়েও বেশী হয়েছে। মক্কাযাত্রীদের নানা রকম সুবিধা গবর্মেণ্ট ক'রে দিয়েছেন। সোনা রপ্তানী সাধারণতঃ নিষিদ্ধ, কিন্তু মক্কাযাত্রীদিগকে সোনা নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে। তারা যে জাহাজে গেছে, সেইগুলিকে সবমেরীন্ ও এরোপ্লেনের আক্রমণ থেকে রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছে। বিলাতী গবর্মেণ্ট ও ভারত-গবর্মেণ্ট মক্কাযাত্রীবাহী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে অর্থসাহায্য করেছেন যাতে ক'রে তারা সস্তা ভাড়ায় যাত্রী নিয়ে যেতে পারে। গবর্মেণ্ট যে মুসলমানদের অনুরাগভাজন হ'তে চান, সেটা রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিপ্রসূত হ'লেও হিন্দুরা তাতে আপত্তি করে নি। কিন্তু এখন হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সম্বন্ধে কি করা হয়েছে, তা দেখুন।

কুম্ভমেলায় যাত্রায় ব্যাঘাত

মুসলমানরা মক্কায় হজ্ প্রতি বৎসরই করতে পারেন ও করেন। কিন্তু প্রয়াগে কুম্ভ মেলা হয় ১২ (বার) বৎসর অন্তর। সেই জন্য গবর্মেণ্ট অপক্ষপাত ব্যবহার করতে চাইলে কুম্ভমেলায় যাতে যাত্রীরা সহজে যেতে পারে, তার জন্য খুব বেশী সুবিধা ক'রে দিতেন। কিন্তু সুবিধার পরিবর্তে সরকার অসুবিধাই ক'রে দিয়েছেন। তাদের জন্য কোন স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা বা অন্য কোন সুবিধা করা হয় নি। উল্টা ব্যবস্থাই হয়েছে। সেটি হচ্ছে— কুম্ভমেলাযাত্রীদিগকে রেলের টিকিট বিক্রীর সরাসরি নিষেধ ("the summary prohibition of the sale of railway tickets to pilgrims to the forthcoming Kumbha Mela at Prayag", *The Indian Social Reformer.*)। এ রকম কেন করা হ'ল? বলা হবে, যুদ্ধ। কিন্তু এই হুকুম যখন জারি হয় তখন জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয় নি, এবং এখনও জাপান ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের রেলওয়ে আক্রমণ করে নি। মক্কা যেতে হয় জাহাজে ক'রে; কিন্তু য়ুরোপীয় যুদ্ধের গোড়ার দিকেই বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ভারত-সাগরে শত্রুজাহাজ গবর্মেণ্টের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। তাতেও মক্কাযাত্রীদিগকে জাহাজের টিকিট বিক্রী বন্ধ হয় নাই, বরং যাতে মক্কাযাত্রী জাহাজের উপর সবমেরীন বা এরোপ্লেনের আক্রমণ না হয় তারই উপায় যথাসাধ্য অবলম্বন করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের রেলওয়েগুলির সৈন্যবাহী গাড়ী ছাড়া ১৮৭০০ সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ী আছে। সেগুলিতে যে

সৈন্য চলাচল হচ্ছে, এমনও নয়; কারণ যুদ্ধ এখনও ভারতবর্ষে আসে নি।

আমরা একাধিক কুম্ভমেলা দেখেছি। একবারের কথা মনে আছে (বোধ হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের) যাতে ত্রিশ লক্ষ যাত্রী প্রয়াগে এসেছিল।

মুসলমান সম্প্রদায় চান নি যে, তীর্থযাত্রা বিষয়ে তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করা হোক ও হিন্দুদের অসুবিধা করা হোক। সুতরাং এ বিষয়ে মুসলমানদের কোন দোষত্রুটি নাই। দোষ সেই সব কূটরাজনীতিবিশারদদের যাঁরা উপদেশ দেন, "তোমরা সব ভেদ ভুলে গিয়ে এক হয়ে যাও", কিন্তু নিজেদের ব্যবহারে ভেদটা খুবই জাগিয়ে রাখেন, সকলের প্রতি এক রকম ব্যবহার করেন না।

সাম্রাজ্যাসক্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা চায় না যে, হিন্দুরা কোন প্রকারে সংঘবদ্ধ হয়—তারা ধর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত এক মাসের বা ২।৪ দিনের জন্যও সম্মিলিত হয়, এও ঐ বিদেশীরা চায় না। কারণ, ভারতীয় স্বাধীনতা-কামীদের মধ্যে হিন্দুরাই অগ্রগণ্য।

—

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

"পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী জনপ্রিয় জমিদার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে গত ২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার মধ্যাহ্নে তাঁহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। নিখিলবঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন তাঁহারই উদ্যোগে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার বহির্বাটীর দেওয়ালে বিশ্ববিখ্যাত গায়ক তানসেন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ওস্তাদগণ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক সঙ্গীতজ্ঞের আবক্ষ তৈলচিত্র সুসজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। এই কার্যে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলের জন্য ভূপেন্দ্রবাবুর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। তিনি আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন। ভূপেন্দ্রবাবু মিষ্টভাষী, পরোপকারী, আশ্রিতবৎসল এবং প্রজারঞ্জক ছিলেন। বহু অনাথা বিধবাকে গোপনে মাসিক সাহায্য করিতেন। তাঁহার অভাব সহজে পূরণ হইবার নয়। তিনি মজলিসী লোক ছিলেন। তাঁহার গৃহ ভারতের নানা স্থানের গায়কদিগের মিলন-স্থল ছিল। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলকেই তিনি আশ্রয় দিতেন। শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী।"

—

বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত

অল্প বয়সে (৫২ বৎসর বয়সে) শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ পালিতের মৃত্যু হওয়ায় কংগ্রেস—বিশেষতঃ বাংলা দেশের কংগ্রেস কমীটি—ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির সভ্য ছিলেন এবং আত্মোৎসর্গপরায়ণতার সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে কংগ্রেসের সমুদয় কাজ করবার ও করাবার চেষ্টা করতেন।

—

কেন্দ্রীয় আইন সভায় ঢাকার প্রতিনিধি নির্বাচন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিরুদ্দেশ হওয়ায় কেন্দ্রীয় আইন-সভায় তাঁহার আসন শূন্য হয়েছে। তাঁর জায়গায় ঢাকার একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। প্রার্থী তিন জন আছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী আমাদের পরিচিত। তিনি দীর্ঘকাল আইন-সভার সদস্য ছিলেন। তার কাজ তিনি এরূপ যোগ্যতা, দক্ষতা, ধীরতা ও স্বদেশহিতৈষণার সহিত সংযত ভাবে ক'রেছিলেন যে, এক সময় তাঁকে আইন-সভার সভাপতি করবার কথাও উঠেছিল।

—

গান্ধীজী এখন কি করবেন

গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ কংগ্রেসের নেতারা আবশ্যক হ'লেই নেবেন ও পাবেন। বাহ্যতঃ তিনি নেতা না-থাকলেও, আন্তরিক নেতা তিনিই থাকবেন।

তাঁর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ বন্ধ হবে না, চলবে; কিন্তু চলবে সীমাবদ্ধ ভাবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশের স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা তিনি এই প্রকারে চালাতে থাকবেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ এরূপ ব্যাপক করা হবে না যাতে গবর্মেণ্ট কোন প্রকারে ব্যতিব্যস্ত হন।

গান্ধীজীর তিনখানি সাপ্তাহিক—ইংরেজী হরিজন, গুজরাটী হরিজনবন্ধু ও হিন্দী হরিজনসেবক—আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

যুদ্ধের দরুন দেশের অবস্থা নানা দিক্ দিয়ে সঙ্কটময় হয়ে উঠছে। কংগ্রেসীরা এ অবস্থায় দেশের লোকদের নানা প্রকারে সাহায্য ও সেবা যাতে করতে পারেন, গান্ধীজী তাঁদিকে সেইরূপ পরামর্শ ও উপদেশ দেবেন।

—

গান্ধীজীর অহিংসাবাদ

গান্ধীজী যে প্রকার পূর্ণ অহিংসাবাদী, আমরা তা নই। এ বিষয়ে আমাদের মত অনেক বার বলেছি, পুনরুক্তি করব না।

তিনি পূর্ণ অহিংসাবাদী ব'লে তাঁকে উপহাস বিদ্রূপ ত করিই না; বরং তিনি ভগবদ্বিশ্বাসী ব'লে এবং মানব জাতি অহিংসা ও মৈত্রীর মন্ত্রে কোন-না-কোন-দিন সাড়া নিশ্চয়ই দিবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর আছে ব'লে, এবং একলা চলবার সাহস তাঁর আছে ব'লে, তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত।

—

ভিন্ন ভিন্ন রণাঙ্গন

ব্রিটেনের উপর জার্মেনীর আক্রমণ কিছু দিন থেকে আগেকার মত প্রচণ্ড নাই। কিন্তু শীতের অবসানে জার্মেনী ব্রিটেন আক্রমণ করতেও পারে; তার শক্তি নিঃশেষ হয় নি। তা হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেন হারবে না।

জার্মেনী রাশিয়ায় নানা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত হচ্ছে বটে। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত তার একটি কারণ। বসন্তঋতুতে জার্মেনীর অভিযান প্রবলতর হ'তেও পারে। কিন্তু আমাদের ধারণা, শেষ পর্যন্ত রাশিয়া জিতবে ও জার্মেনী পরাস্ত হবে।

রাশিয়া এখন ব্রিটেনের বন্ধু, জাপান ব্রিটেনের শত্রু। কিন্তু রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে এখনও যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। তার কারণ দুটি হ'তে পারে। প্রথম, এই দুটি দেশের মধ্যে পাঁচ বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তি আছে; দ্বিতীয়, রাশিয়া জার্মেনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করবার আগে অন্য কোন প্রবল জা'তকে শত্রু ক'রতে চায় না।

অবাক্ হ'তে হয় জাপান কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার আগে ব্রিটেনের ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডে জাপানকে নির্বিবাদে আড্‌ডা গাড়তে দেওয়াতে। ব্রিটেন কি জাপানের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে নি—এতই বেকুব ও অসতর্ক ছিল? না, উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও অসামর্থ্যবশতঃ কিছু করতে পারে নি? সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেদ্য ভেবেই ব্রিটেন নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর থাকা সত্ত্বেও জাপান মালয়কে বিপন্ন করেছে ও ব্রহ্মদেশে বোমা ফেলছে, এবং সিঙ্গাপুরও বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। জাপান তার যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও যুদ্ধ-আয়োজন এরূপ দক্ষতার সহিত ও গোপনে করেছে যে, সে মালয় ও ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ছাড়া প্রাকৃতিক নানা সম্পদে সমৃদ্ধ ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Duch East Indies) এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করতে বসেছে। ওলন্দাজদের দ্বীপগুলি নিতে পারলে ও মালয় নিতে পারলে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক নানান্ জিনিস সে পাবে ও তৈরি করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন, আমেরিকা ও চীন জাপানকে পরাস্ত করতে পারবে বটে, কিন্তু সহজে নয়। চীন মোটের উপর জাপানকে হারিয়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত জিতবে।

ব্রিটেনের চূড়ান্ত অদূরদর্শী-স্বার্থপরতা ও বেকুবী হয়েছে ভারতবর্ষকে জাহাজ ও এরোপ্লেন তৈরি করতে না দেওয়া এবং যন্ত্রসজ্জাসজ্জিত যথেষ্ট সৈন্য প্রস্তুত রাখতে না দেওয়া। জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষকে পুরামাত্রায় প্রস্তুত থাকতে দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করবার দুঃসাহস জাপানের হ'ত না। এখন মালয় ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি রক্ষার জন্য চীনা সৈন্য আসছে চীন থেকে, এরোপ্লেন আসছে আমেরিকা থেকে।

জাপানের শক্তি ও দুঃসাহস

চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও জাপান যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে লড়তে দুঃসাহসী হয়েছে, তার কারণ সে আভিজাত্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জন ক'রে নিজের সমাজকে সুধ্‌রে', দেশের সকলকে শিক্ষিত ক'রে, দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ক'রে, জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধের সমুদয় আয়োজন ক'রে, শক্তিমান্ হ'তে পেরেছে। ভারতীয়েরা শক্তিমান্ হ'তে চায়, কিন্তু জাপানের মত ব্যবস্থা ও আয়োজন তাদের কোথায়? সমাজকে আমূল সংস্কার করবার ইচ্ছা ও উদ্যম কোথায়? নারীপুরুষভেদ-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে শিক্ষিত করবার চেষ্টা কোথায়?......।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে যার তাৎপর্য, "দানবের মত শক্তি থাকা ভাল, কিন্তু সেই শক্তি দানবের মত প্রয়োগ করা ভাল নয়।" জাপান নিজের প্রভূত শক্তির অপব্যবহার দৈত্যের মত করছে। সেই জন্য তার সাফল্য চাই না, ব্যর্থতাই চাই।

—

অশ্বেতগণকে ভুলাবার জাপানী অপচেষ্টা

শুনতে পাই জাপানীরা ভারতীয় ও অন্য অশ্বেতদিগকে বিশ্বাস করাতে চায় তারা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের চেয়ে ভাল। কিন্তু জাপান কোরিয়ায় কি করেছে তা কি জগৎ জানে না? কোরিয়ার উপর ভীষণ অত্যাচার ত ক'রেইছে, অধিকন্তু কোরিয়ার নামটা পর্যন্ত লুপ্ত ক'রে "চোজেন" নাম রেখেছে! আর, জাপানীরা যদিই-বা ভাল হয়, আমরা ত এক মনিবের বদলে আর এক মনিব চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি স্বাধীনতা।

বঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা

বঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় যদি অন্ততঃ সাম্প্রদায়িকতার উপদ্রব থামে বা কমে, তাও খুব লাভ বলতে হবে।

নূতন মন্ত্রিসভায় যে-যে মন্ত্রীকে যে-যে দপ্তর দেওয়া হয়েছে, তাঁরা তার যোগ্য নন্ এমন কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শিক্ষার দপ্তর না দিয়ে অন্য এক জনকে কেন দেওয়া হয়েছে, এর কারণ আমরা বুঝতে পারি নি।

—

মানুষের কীর্তি ও অপকীর্তি

সকল দেশের সব রকম সংস্কৃতি ও সভ্যতা মানুষের কীর্তি; আর, জল জলগর্ভ স্থল ভূগর্ভ এবং আকাশ—কোথাও মানুষ মানুষের হিংসা দ্বেষ থেকে আপনাকে নিরাপদ মনে করতে পারে না, এইটা মানুষের অপকীর্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন রণতরী "নর্থ ক্যায়োলিনা"

সোভিয়েট-জর্ম্মান যুদ্ধ ও প্রাচ্যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের নূতন গতি ক্রমেই দুর্বোধ্য হইয়া আসিতেছে। যে সকল সূত্রে যুদ্ধের খবরাখবর পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অন্যতম—অর্থাৎ বেতারবার্ত্তা—সূত্রটি এখন যুদ্ধাস্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হইতেছে। প্রোপাগাণ্ডা নামক পশ্চিম দেশীয়-গণের আবিষ্কৃত শত্রুনিপাত ও স্বার্থসিদ্ধির—বিশেষতঃ স্বার্থসিদ্ধির—অমোঘ ইন্দ্রজাল যে কিছু নূতন বস্তু নহে তাহা এশিয়াবাসী মাত্রেই, বিশেষতঃ ভারতবাসী, ভুক্তভোগী হিসাবে জানে। কিন্তু সম্প্রতি জগদ্ব্যাপী পরস্পরবিরোধী সংবাদাবলীর ধূলিজালের আবরণের মধ্যে যুদ্ধের গতি বিচার করা অতি অভিজ্ঞ সমর-বিশারদের পক্ষেও জটিল প্রশ্ন হইয়াছে নিশ্চয়—আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকের কথা বলাই বাহুল্য। উদাহরণ-স্বরূপ লিবিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর এবং সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্রিটিশ সংবাদ-পরিষদের প্রথম খবরাখবর ও টিপ্পনী এবং পরে প্রধান সচিব চার্চ্চিলের মন্তব্য এবং তাহার পর অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সর্ব্বশেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুই অংশের মন্তব্যগুলির উল্লেখ করা যায়। এই সকল বিষয়ে এদেশের দৈনিকে, এমন কি বিদেশী-পরিচালিত সংবাদপত্রেও যথেষ্ট লেখালেখি হইয়াছে, সুতরাং তাহার সবিশেষ পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলা চলে যে এখন যুদ্ধ সর্ব্বদিকেই অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে। অনেক বিষয়ে, যথা, বিভিন্ন স্থলের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন যুদ্ধবিশারদের সামরিক অভিযান-ক্ষমতা সম্বন্ধে, অল্পদিন পূর্ব্বেও জগৎ যাহা শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে এখন সে সকলই সন্দেহের ক্ষেত্রে আসিয়াছে। মালয়-অঞ্চল সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত ইহা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, রুষদেশের নিদারুণ শীতেও হিটলারের সেনানায়কগণের অভিযান রোধ করিতে পারা যাইবে কিনা সন্দেহ ইহা সোভিয়েটের লণ্ডনস্থ দূত মায়স্কিও বলিয়াছিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগর, চীন ও মালয় উপদ্বীপের যুদ্ধক্ষেত্র-গুলিতেও নানা প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার বিচার করার মত সম্যক্ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অনেক বিষয়ই দুর্বোধ্য রহিয়াছে। হংকঙের অবরোধ ও পতন সম্পর্কে যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি, তাহার মধ্যে অনেক কিছুরই কারণ দর্শান হয় নাই। মালয় উপদ্বীপে জাপানীদিগের অগ্রগতি, প্রিন্স অব ওয়েলস ও রিপল্‌স্ নামক যুদ্ধজাহাজদ্বয়ের ধ্বংস ইত্যাদি অনেক ঘটনারই কোন সম্পূর্ণবোধগম্য জবাবদিহি সাধারণ লোকে পায় নাই। শুধু যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা হইতে বলা যায় যে জাপান এই অল্প সময়ের মধ্যে যে এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে এবং তাহার বিপক্ষ দলকে এখনও বিপন্ন ও দুর্ব্বল করিতে পারিতেছে—তাহার প্রধান কারণ যুদ্ধের প্রাক্কালে জাপানের যুদ্ধশক্তি সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সমর-পরিষদের

জ্ঞানের বিশেষ অভাব ছিল এবং জাপান কোথায় কিভাবে তাহার শক্তিকেন্দ্রগুলি স্থাপন করিয়াছে ও করিতেছে সে বিষয়ে গুপ্তচর বিভাগের অনুসন্ধানও যথাযথ হয় নাই। অতর্কিত আক্রমণে জাপান অনেকখানি কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে এতটা ব্যাপক-ভাবে মিত্রদলের ক্ষতি এতদিন ধরিয়া চলিতে পারে না।

* * *

রুষদেশের প্রচণ্ড শীত ও হিমঝঞ্ঝাবাতে জার্ম্মান বাহিনী প্রায় জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির এরূপ বিরুদ্ধভাবে অভ্যস্ত সোভিয়েট সেনা অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাপন্ন থাকায় এবং তুষারমরুক্ষেত্রে যুদ্ধযন্ত্র অপেক্ষা যোদ্ধা সেনাদল অধিক কার্য্যকরী হওয়ায় সোভিয়েট সেনানায়কগণ এই বিপরীত অবস্থায় যতটা সম্ভব জার্ম্মান-বাহিনীকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিপুণভাবে অভিযান চালিত হওয়ায় জার্ম্মান-ব্যূহ ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইতেছে। তবে গতি অতি মন্থর এবং এখনও সেরূপ আশুফলপ্রদ কোনও বিশেষ যুদ্ধ হয় নাই যাহাতে সোভিয়েট কোনও ব্যাপক ও স্থায়ী জয়লাভের আশা করিতে পারে। এখন পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা এই, ইতিপূর্ব্বে লোকের মনে ধারণা ছিল যে জার্ম্মান সেনাবাহিনী সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত এবং সকল প্রকার ব্যবস্থা থাকায় তাহাদের ব্যূহ ও অভিযানকেন্দ্র এতই সুদৃঢ় এবং তাহাদের রণবিশারদ নায়কগণ এতই অভিজ্ঞ যে জার্ম্মানসেনাকে হটান অসম্ভব, সে বিশ্বাস ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। জার্ম্মানদল আত্মরক্ষার যুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত-প্রতিঘাতের আদানপ্রদানে পিছুই হটিয়াছে। যদিও তাহাতে সোভিয়েট এখনও বিশেষ এমন কোনও লাভ করে নাই যাহাতে বসন্তকালের জার্ম্মান-অভিযান অতি দুরূহ হয় বা সোভিয়েট সেনাদলে অস্ত্র নির্ম্মাণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা সরল হয়। ক্রিমিয়া, ডনেৎজ ও ডন-নদের অববাহিকাদ্বয় এবং কারেলিয়া অঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশ শত্রুশূন্য হইলে সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই সোভিয়েট সেনাদলের প্রাণপণ চেষ্টা চলিয়াছে এবং এখনও দুই মাস শীতের আধিপত্য চলিবে, সুতরাং অসীম শৌর্য্যশালী ও অশেষ কষ্ট সহিষ্ণু সোভিয়েট গণ-সেনার পৌরুষ ও ধৈর্য্য অঘটন ঘটাইতেও পারে। জার্ম্মান সেনানায়কগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে সন্দেহ নাই—প্রধান সেনাপতির অপসারণ তাহার প্রমাণ—এবং জার্ম্মান সেনাদল অতি ক্লিষ্ট তাহারও প্রমাণ শীতবস্ত্রাদির আবেদনে পাওয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় ও যন্ত্রযুদ্ধ]

থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম) মানচিত্র

বিরতির অবসরে সোভিয়েট সেনাদল অল্প কিছু সুবিধার স্থলে অধিষ্ঠিত, সুতরাং এই সময়ে আগামী বসন্ত-অভিযানের জন্য সেনা চালনের আয়োজন, যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের ও সরবরাহের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং আত্মরক্ষা ও যুদ্ধচালনার কেন্দ্রগুলির সংরক্ষণের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনা করিতে পারিলে সোভিয়েট ভবিষ্যৎ বিপদের অনেকটা প্রতিকার করিতে পারিবে। জার্ম্মানগণ অজেয় নহে, ইহা প্রমাণিত হওয়ায় সোভিয়েটের আত্মবলে বিশ্বাস এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু অন্য সকল ব্যবস্থাও অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি না পাইলে নিপুণ ও রণকুশলী সেনানায়কচালিত যন্ত্রশকট অভিযান—যাহা বসন্তকালে চলিবেই—প্রতিরোধ করা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র সহজ হইবে না। জার্ম্মানগণ এখন পিছু হটিতেছে, সুতরাং তাহাদের পুনর্ব্বার বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া—দুইবার একই অঞ্চলে—অভিযান চালাইতে হইবে এবং তাহাদের ক্ষতিতে রুষদলের লাভ

থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম) প্রধান-মন্ত্রী লুয়াং বিপুল সংগ্রাম

সে বিষয়েও সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধে শেষ লাভই চরম ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

* * * *

জাপানের নৌবল ও আকাশবাহিনী এখন প্রশান্ত মহাসাগর, মালয় উপদ্বীপ ও দ্বীপময় ভারতে শক্তিগরিষ্ঠ। জাপানের অভিযানগুলি এখনও ঐ দুই শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়াছে। যন্ত্রশকট বলেও জাপানী সেনাদল এবিসিডি পক্ষ হইতে ঐ সকল স্থানে অনেক অধিক শক্তিশালী। সুতরাং এই সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই জাপান এখন ইচ্ছামত এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অভিযান পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ চালাইতে সক্ষম। এবিসিডি পক্ষের নৌবলের বিশেষ কোনও শক্তিপ্রয়োগের নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই, যদিও ইহা সম্ভব নহে যে আর বেশী দিন এই অবস্থা চলিবে কেননা তাহা হইলে জাপান সুদূর পূর্ব্বের ঘাটিগুলিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। সে অবস্থায় তাহার কাঁচা মালের অভাব সম্পূর্ণ দূর হইবে এবং এবিসিডি পক্ষের সুদূর প্রাচ্য অভিযান বিষম বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। এরোপ্লেন ও যুদ্ধশকট হিসাবেও এবিসিডি পক্ষের অবস্থা এখনও হীন যাহার ফলে তাহাদের ক্রমাগতই পিছু হটিতে হইতেছে।

মালয় অঞ্চলে জাপানীগণের সহজ অগ্রগতির কারণ এক দিকে তাহাদের সুচিন্তিত অভিযানের পরিকল্পনা, পরে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থার সহিত অতর্কিত আক্রমণ এবং অন্য দিকে এবিসিডি পক্ষের অসংখ্য ভুল ও ভ্রমপ্রমাদ। এখন যেভাবে জাপানী অভিযান চলিয়াছে তাহাতে এবিসিডি দলের পক্ষে ঐ ভুলভ্রান্তির কুফল অপসারণের কার্য্য ক্রমেই দুরূহতর হইতেছে। যুদ্ধচালনার অধ্যক্ষ পরিবর্ত্তন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন উচ্চতম অধিনায়ক স্থাপনা—এই দুই ব্যাপারে মনে হইতেছে যে এতদিনে এবি-সিডি সমর-পরিষদগুলি জাপানী আক্রমণের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এবিসিডির মধ্যে "সি"—অর্থাৎ চীন—বহুকাল হইতেই জাপানের সমরশক্তি ও সাম্রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা হইতে এ-অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বি—অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—এবং ডি—অর্থাৎ ওলন্দাজ দ্বীপময় ভারত—রাষ্ট্রগুলির বিপদের সম্ভাবনার কথা জগৎকে জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এতদিন স্বার্থ ও আত্মশ্লাঘায় অন্ধ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি "এশিয়াটিক" জাপানের সমরশক্তিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছে এবং স্বার্থহানি করিয়া বিপন্ন চীনকে সাহায্য করিতে বিশেষ কোনও ইচ্ছা দেখায় নাই। এতদিনে তাহাদের হুঁস হইয়াছে যে চীন প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় কি প্রবল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দিয়াছে এবং দিতেছে।

জাপান এখনও সমানভাবে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের বল পরীক্ষা করে নাই। মালয় অঞ্চলে যে সকল সৈন্যদল—যাহার অধিকাংশ ভারতীয়—দেশরক্ষার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের রণসজ্জা কোনমতেই আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী

ফিল্ড মার্শাল ফন ব্রাউশিট্‌স্

নহে। তাহাদের যন্ত্রশকট, এরোপ্লেন ও অন্যান্য যন্ত্রযুদ্ধের উপকরণ অতি অল্পই আছে। এরূপ অবস্থার নানা কারণ দেখান হইয়াছে যাহার মধ্যে প্রধান রুশকে সাহায্য দান এবং লিবিয়ার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ অভিযান। কিন্তু এই দুই ব্যাপারই বিগত ছয় মাসের মধ্যে বর্ত্তিয়াছে। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই মালয় ও ওলন্দাজ দ্বীপময় ভারতে জাপানের উদ্দেশ্য কি তাহা জানা গিয়াছিল। বর্ম্মা রোড পুনর্ব্বার খুলিবার পর জাপান ইন্দো-চীনে প্রবেশ করে এবং তাহাদের পূর্ব্বেই থাই দেশের সহিত তাহার বহু পরামর্শ চলিয়াছিল। ইংরেজী ও আমেরিকান বহু পত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া ইহার কি শেষ ফল হইবে তাহার বিচার চলিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মালয় অঞ্চল কি ভাবে শত্রুআক্রমণের বিরুদ্ধে সুসজ্জিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহারও অনেক কথার চর্চ্চা হইয়াছিল। লিবিয়ায় ব্রিটিশ অভিযানের আয়োজন পাঁচ মাস ধরিয়া হয় ইহা স্বয়ং চার্চ্চিলের উক্তি, অতএব উহার আরম্ভ বিগত জুলাই মাসে এবং রুশদেশে যন্ত্রশকট ও এরোপ্লেন পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় বিগত সেপ্টেম্বরে। তাহার পূর্ব্বে কি এদিকের ব্যবস্থা কিছুই করা যাইত না?

চীনা ট্যাঙ্ক-সেনানী

আর একজন ব্রিটিশ মন্ত্রী বলিয়াছেন, "আমাদের পক্ষে সকল দিকেই সমান বলশালী হওয়া সম্ভব হয় নাই।" অর্থাৎ মালয়, হংকং ইত্যাদি অঞ্চলে রণসম্ভার পাঠাইবার মত যোগাড় "আমাদের" ছিল না, যাহা ছিল তাহা লিবিয়া ও রুশদেশে পাঠাইতেই নিঃশেষপ্রায়। এই উক্তি বুঝা যায় কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্ন হয় যে যদি তোমাদের এরূপই এরোপ্লেন, যুদ্ধশকট ও রণসম্ভারবাহী জাহাজের অভাব তবে ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ প্রমুখ ভারতীয় কারবারীগণ যখন ঐ তিনটি বিষয়েই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উদ্যোগ করেন তখন তাহাতে তোমরা এরূপ "আদাজল খাইয়া" বাধা দিয়াছিলে কেন? এরোপ্লেনের কারখানা শেষ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় মহীশূরের পরলোকগত মহারাজার উৎসাহদানে, সিন্ধিয়ার জাহাজ কারখানা কলিকাতায় স্থাপিত না হইয়া—কাহার বাধাদানে সে কথা সকলেই জানে—শেষে ভিজাগাপটম বন্দররূপ অসুবিধাপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপিত হইয়া প্রায় অচল হইয়া আছে এবং মোটরচালিত শকট নির্ম্মাণে বাধা এই সেদিন পর্য্যন্তও দেওয়া হইয়াছে। মালয় অঞ্চল রক্ষণভার প্রাপ্ত, অধুনা পদচ্যুত, এয়ার মার্শাল ব্রুক-পপহামকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় "নিন্ কম পুপ্"—অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য গোমূর্খ—পদবীতে ভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা উল্লিখিত রূপে ভারতে রণসম্ভার নির্ম্মাণে বাধা দিয়াছে ও দিতেছে এবং যাহাদের বিশ্বাস যে ভারতে বিদেশীর স্বার্থরক্ষাই সাম্রাজ্য রক্ষার মুখ্য কার্য্য তাহারা কি শ্রেণীর কীর্ত্তিধ্বজ পণ্ডিত তাহা বলা হয় নাই এবং

সর্ব্বশেষে যাহারা মনে করে যে ভারতের রণসম্ভার নির্ম্মাণ-শক্তি ও সৈন্যদল গঠনশক্তি এখন চরমে উঠিয়াছে তাহারা ব্রুক পপ্‌হাম অপেক্ষা শতগুণ অধিক অকর্ম্মণ্য ও মূর্খ কি না এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে তাহার সংখ্যা কত এ বিষয়েও কিছুই বিচার হয় নাই।

জাপানের অভিযান-পথ দ্বীপময় ভারতের দিকে, এখন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। গত বারেই আমরা তাহা লিখিয়াছিলাম। দ্বীপময় ভারত, ইন্দোচীন, মালয়, ফিলিপিন ও চীনদেশের অধিকৃত অঞ্চলে জাপান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিলে তাহার "হ্যাভ নট"—অর্থাৎ সম্বিৎবিহীন—অবস্থা সম্পূর্ণ বদল হইবে। ঐ অবস্থায় খনিজ তৈল, টিন, রবার, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়ম, লৌহখনিজ, কার্পাস, চিনি, চাউল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক পদার্থের জন্য তাহাকে আর বিদেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলে নিজের সুদৃঢ় অধিকার স্থাপনের জন্য জাপান তাহার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবেই। তাহাকে বাধা দিতে হইলে এবিসিডি দলেরও আপ্রাণ চেষ্টার প্রয়োজন এবং বিপরীত বুদ্ধির প্রেরণা কিছু কমিলে তাহা হওয়াও অসম্ভব।

চীনদেশ-নেতা মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের উপযুক্ত পত্নী ম্যাদাম চিয়াং কাই-শেক কিছুদিন পূর্ব্বে এক মার্কিন সাংবাদিককে বলিয়াছিলেন যে চীন যদি মরে তবে তাহার মৃত্যু তিনটি ফাঁসীর রজ্জুর চাপে হইবে। এই তিনটি ফাঁসীর রজ্জু যথাক্রমে জাপানের সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটেনের সুবিধাবাদ ও আমেরিকার অর্থলোলুপতা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীন চীনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জগতে "ডিমক্রাসী" রূপ সাম্যবাদেরও লোপ হইবে। ডিমক্রাসী মত প্রচারক রাষ্ট্রগুলিতে এই শেষ উক্তি তখন বোধ হয় অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপার সহিত গৃহীত হয়। এখন সেই রাষ্ট্রগুলিরই নেতৃবর্গ মার্শাল চিয়াং কাই-শেককে সম্মান প্রদর্শনে ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দানে তৎপরতা দেখাইতেছেন। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বরাবরই স্বাধীন চীনের পক্ষ লইয়াছেন।

এই যুদ্ধের নূতন পরিণতিতে জাপান যদি চীন দেশের রণাঙ্গনগুলিতে বিশেষ ভাবে জড়াইয়া না থাকিত, তবে অবস্থা যে কি হইত তাহা বর্ণনার অতীত। জাপানের সৈন্যবলের তিন-পঞ্চমাংশ ও তাহার এরোপ্লেনের এক-তৃতীয়াংশ চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধজালে জড়িত। চীন নেতৃবর্গ যদি হতাশ হইয়া বর্ম্মা রোড বন্ধ করিবার সময় দেশ সমর্পণ করিতেন তাহা হইলে জাপান আরও অনেক পূর্ব্বে আরও দ্বিগুণ শক্তির সহিত এই আক্রমণ আরম্ভ ও চালনা করিত। তখন কি ভাবে কোথায় যুদ্ধ চলিত তাহা অনুমান করা—বর্ত্তমান অবস্থা দেখিবার পর—সহজ।

চীনের অটুট সংকল্প এবং সকল দুঃখ-বিপদ-ক্ষতি অগ্রাহ্যকারী পৌরুষ জগতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। সোভিয়েটের শৌর্য্য ও ধৈর্য্য অতি উন্নত আদর্শের, কিন্তু সোভিয়েটের রণসম্ভার ছিল ও আছে, অর্থবল, জনবল ছিল ও আছে এবং শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই পরাক্রান্ত মিত্রলাভও হইয়াছে। চীন দেশের বিপদে বন্ধু বলিতে কেহই ছিল না, অস্ত্রসজ্জা এখনও অতিশয় হীন এবং এখন যাহারা মিত্র, দরিদ্র চীন সম্প্রতি তাহাদিগকেই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। চাংশায় জয়লাভের সম্পূর্ণ গুরুত্ব আমরা না বুঝিতে পারি কিন্তু ইহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি যে এই অত্যাধুনিক যন্ত্রময় জগতে এখনও বীরত্বের ও অটল প্রতিজ্ঞার মূল্য আছে।

মার্টিনিক বন্দর ও দুর্গ

গ্রামে ও পথে—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীঅজিতকুমার বসু। ১৯ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ১৯৪১।

১৯২০ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়া যাঁহারা গ্রামে ও পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, লেখক তাঁহাদের একজন। তাঁহার সহকর্মীরা বিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশের পল্লীতে কতকগুলি গ্রাম জুড়িয়া মহাত্মাজীর বাণীকে রূপ দিবার জন্য কাজ করিতেছেন; তাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনার সুন্দর পরিচয় পাঠক এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। অস্পৃশ্যতা, খাদি, যন্ত্রবাদ, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য ও অনুরূপ প্রসঙ্গ লেখক সুকৌশলে ও সরসভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বাংলার পল্লীচিত্র—প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয়বিধ চিত্র—লেখক অতি নিপুণভাবে আঁকিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় তেজ ও মাধুর্য দুই-ই আসিয়া মিশিয়াছে।

"গান্ধীবাদ বরবাদ" ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার পূর্বে আমাদের দেশের চিন্তাশীল ও পঠনশীল সুধীবৃন্দ এই পুস্তকখানি একবার পড়িলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত ভূমিকা পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

জীবনের শিল্প—এস. ওয়াজেদ আলি, বি. এ. (কেন্টাব), ব্যার-এট্-ল। পৃ. ২৬৬। মূল্য ১।০ টাকা।

পুস্তকটি কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি, তাহাদের একটির নামে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। অধিকাংশ প্রবন্ধই মুসলমান পাঠককে উদ্দেশ করিয়া লেখা; কোনও কোনও প্রবন্ধ তাহা নয়, যেমন 'বাগান', 'জীবনের শিল্প'। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে ভাবিবার কথা আছে যথেষ্ট। "সেই পরম শিল্পীর অনুসরণ করে আমাদেরও শিল্পী হতে হবে। জীবনের বিবিধ উপকরণগুলি নিয়ে আমাদেরও নিত্য নূতন শিল্পনিদর্শনের সৃষ্টি করতে হবে। এই শিল্পসাধনার বলেই আমরা নিরঞ্জনের স্বরূপ দর্শন করে ধন্য হব।" (২৫৫ পৃ.) লেখকের ধর্মে জ্বলন্ত বিশ্বাস, এবং তাহা কি সাহিত্যে, কি রাষ্ট্রে, কি বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে কোথাও তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ হইতে দেয় নাই। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি বাঙালী বটে, কিন্তু তারও

ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। বাংলার রঙ্গালয়ের ইতিহাসের প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। নৈতিক হিসাবে ইহার কোন কোন দিক সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য না হইলেও জাতির অভিব্যক্তির দিক দিয়া রঙ্গমঞ্চের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালার সৃষ্টিযুগের বহু ঐতিহাসিক উপকরণ আহৃত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের কাহিনী রচনা করিবার সময় আসিয়াছে। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁহার নাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নাট্যজীবনের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন একসূত্রে গ্রথিত। তাঁহার নাম করিতে হইলে সেই সঙ্গে ক্লাসিক নাট্যমঞ্চের নামও উল্লেখ করিতে হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। আবাল্য তিনি নাট্যকলার ভক্ত। তিনি যখন ক্লাসিকের অধ্যক্ষ ও অধিকারী হন তখন তাঁহার বয়স একবিংশতি। পরে তিনি অন্যান্য নাট্যশালার অধ্যক্ষতাও গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক পত্র "রঙ্গালয়" এবং মাসিক পত্র "নাট্যমন্দির" প্রকাশ করিয়া তিনি অভিনয় এবং নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও ইতিহাস-রচনার পথ সুগম করিয়া যান। অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী হইয়া তিনি অষ্টাদশ বর্ষাধিক কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রঙ্গজগৎ পরিচালনা করেন। অভিনেতা হিসাবে প্রতিভা এবং নাট্যকার হিসাবে শক্তি প্রদর্শন করিয়া তিনি দর্শকমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ না হইতেই অমরেন্দ্রনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "অমরেন্দ্রনাথ মানুষ ছিলেন—অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি, অদম্য অধ্যবসায়, অসাধারণ মনোরঞ্জনশক্তি ছিল তাঁহার। কিন্তু তিনি দেবতা ছিলেন না ... তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঢাকিয়া তাঁহাকে অতিমানবরূপে অঙ্কন করিবার প্রয়াস কখনও লেখকের ছিল না।" চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত অমরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী সম্বলিত এই পুস্তকখানি তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা—শ্রীসরসীলাল সরকার। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য পুস্তকখানি সে-সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। এই গ্রন্থে লেখক প্রধানতঃ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াই রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার একটি বিশেষত্ব আমার চোখে পড়িয়াছিল, সে বিশেষত্বটি এই যে, তাঁহার অনেক কবিতাতেই প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত পর পর আছে। যেমন—

"ছোট ছোট ঢেউ ওঠে আর পড়ে,
রবির কিরণ ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি, চলে যায় ডাকি'
বায়ু বহে যায় ধীরে।"

অন্যত্র—

"ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্ কারা
আঘাতে আঘাত কর্,
ওরে, কী গান গেয়েছে পাখি
এসেছে রবির কর।"

'এই উদ্ধৃতাংশ দুইটির প্রথমটিতে "ওঠে আর পড়ে" কথাটির ভিতর ঢেউয়ের উত্থান-পতনের তাল আমরা সুস্পষ্ট ভাবে পাই; তাহার পর আকাশে পাখী ডাকিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহাতে গানের ইঙ্গিত এবং পরিশেষে বায়ু বহিয়া যাওয়ায় গতির ইঙ্গিত রহিয়াছে।

"ভাঙ্. ভাঙ্. ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্"
এই দু'টি ছত্রে তালের ইঙ্গিত, তৃতীয় ছত্রে পাখীর গানে গানের ইঙ্গিত ও শেষ ছত্রে রবিকরের আগমনে গতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।'

বহু কবিতা এবং প্রবন্ধ হইতেও লেখক তাঁহার মতের স্বপক্ষে এইরূপ নজীর উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই তাল, গান ও গতির ভিতর দিয়াই যথাক্রমে শান্তম্, শিবম্ ও অদ্বৈতমের প্রকাশ। ইহাই ত্রয়ী পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনায় আলোচিত প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে লেখকের নির্দেশ এইরূপ :—

"১ কবির কবিতায় সহিত স্বপ্ন-চৈতন্যের গভীর সংযোগ।

২ কবির কবিতায় পর পর তাল, গান ও গতি বিশেষ কোনও গূঢ়ভাবের প্রতীকরূপে স্বতঃস্ফূরিত হইয়াছে।

৩ এই গূঢ় ভাবের মর্মকথা কোনও কোনও স্থলে কবির ঈষৎ গোচর আবার কোনও স্থলে একেবারে অগোচর।

৪ যে মর্মকথা বা Latent content কবির সম্পূর্ণ অগোচর রহিয়া গিয়াছে, সেইটিই সকল গূঢ় ভাবের উৎস-স্বরূপ। সেটি হইতেছে উপনিষদের মহাবাণী "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্"।

৫ কবির জীবনে এই বাণীর বিশেষ প্রভাব। এই বাণীকে কেন্দ্র করিয়া কবির সমস্ত রচনা ও খণ্ড কবিতা একটি অখণ্ড তাৎপর্যে গ্রথিত হইয়া নব নব বিচিত্ররূপে ক্রমবিকশিত হইয়াছে।

৬ "সীমার মধ্যে অসীম" শান্তম্ শিবমদ্বৈতমেরই অঙ্গীভূত এবং প্রকাশস্বরূপ। কবি তাঁহার গভীর মনে যে 'সীমার মধ্যে অসীমে'র সুর ঝংকৃত হইতেছে তাহা অনুভব করিয়াছেন কিন্তু পর পর তাল, গান ও গতির সহিত সীমার মধ্যে অসীমের যে একান্ত সম্বন্ধ আছে এবং "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" যে এই তাল, গান, গতিরূপ প্রতীকের ভিতর গূঢ় মর্মকথা রূপে বিরাজিত তাহা কবির অগোচর।

৭ যাহা নিজে ধরিতে পারা যায় না অথচ যাহা বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের উৎসস্বরূপ তাহাই Latent content বা গভীরতম মর্মকথা।"

প্রধানতঃ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচিত হইলেও এই পুস্তকে রবীন্দ্র-কাব্যের রসাস্বাদনে কোনরূপ অসুবিধা ঘটে না; পরন্তু কবির কাব্য এক নূতন রসময় রূপে পাঠকের মনোরঞ্জন করে।

রবীন্দ্র-কাব্য-রস-পিপাসুগণের নিকট এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—উনবিংশ অধিবেশন, কাশী। প্রতিনিধি, বিভিন্ন শাখার সভাপতি এবং অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মপরিচালকগণ
ফটো—ইভান এণ্ড কোং, কাশী

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, কাশী

গত বড়দিনের অবকাশে কাশীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ করেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত অভিভাষণ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় পাঠ করেন। পৃথিবীব্যাপী এই দুর্য্যোগের মধ্যেও ভারতের নানা প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি ও অতিথি হিসাবে প্রায় সত্তর জন ভদ্রমহোদয় ও মহিলা সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতি অধিবেশনেই স্থানীয় দর্শক, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য, ভদ্রমহোদয় ও মহিলা সকলেই আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। সভামণ্ডপটি পত্রে, পুষ্পে, ধূপে, গন্ধে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দিনে মূল-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

নির্ব্বাচিত সভাপতিগণের মধ্যে শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় ব্যতীত সকলেই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ প্রত্যেকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

সঙ্গীতের আসরে স্থানীয় সঙ্গীতশিল্পিগণের চিত্তাকর্ষক গীতবাদ্যাদি ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'সুর-শৃঙ্গার' সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিল।

এবার সম্মেলনে 'শিশু ও কিশোর সাহিত্য' নামে নূতন বিভাগটি সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিয়াছে। সমাগত শত শত শিশু ও কিশোরের মেলায় অধিবেশন স্থানটি সত্যই আনন্দ-মেলায় পরিণত হইয়াছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পুরোধারূপে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্য-স্মৃতিকল্পে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন 'রবীন্দ্র-স্মৃতি বাসর' উদ্‌যাপন করেন। এই দিন জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ মানসে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার এই 'স্মৃতি বাসরে'র কথা সমাগত সকলের মনে চির-জাগরূক থাকিবে। বিশেষ সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের অপূর্ব্ব ভাষণ কোন শ্রোতাই সহজে বিস্মৃত হইবে না। তা ছাড়া কবির অমৃতোপম গীতাবলী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীগণ পরিবেষণ করেন। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও ভাষণে সেদিন সত্যই স্থানটি কলালোকে পরিণত হইয়াছিল।

সম্মেলনের শেষ অধিবেশন দিনটিতে নূতন পরিচালক সমিতি গঠিত হয় ও প্রবাসী বাঙালীর উন্নতিমূলক কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর বিদায়-অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করার পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্যামল পল্লী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীগোপাল ঘোষ